প্রথম খণ্ড

১

রু শের্‌স্‌-মিদিতে আঁদ্রের স্টুডিও। প্রাচীন রাস্তাটার দু ধারে শ্রীহীন বাড়ী— সামনের দিকের জানলার খড়খড়িতে কালো কালো দাগ, অনেকগুলো রকমারি দোকান। বড় বড় লেখবার টেবিল, গোলগাল মুখওলা পরী, হাতীর দাঁতের বোতাম, লাল রঙের মণি বসানো নেকলেস, চীনদেশের মুদ্রা, চুলের গুচ্ছ লাগানো লকেট আর আশ্চর্য কবচ—এই জিনিসগুলো প্রচুর রয়েছে প্রত্যেকটি দোকানে, এই সব বিচিত্র পণ্যের ব্যবসায়ী একদল নিরীহ বৃদ্ধ যাদের লালচে মুখ পরিষ্কারভাবে কামানো আর মাথায় কাল রঙের বাটি-টুপি, কিংবা একদল গম্ভীর প্রকৃতির স্ত্রীলোক। রাস্তাটার কোণে একটা তামাকের দোকান ও কাফে, নাম 'তামাকখোর কুকুর'। এখানে ঢুকলেই চোখে পড়বে একটা বুড়ো ফক্স্‌-টেরিয়ার কুকুর সিগারেটের পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ক্রেতারা অত্যন্ত কৌতুক বোধ করছে এই দৃশ্যে। প্রায় উল্‌টো দিকে একটা রেস্তোরাঁ—'আঁরি এং যোসেফিন'। যোসেফিন পাকা রাঁধুনী—সব্‌জির সঙ্গে ভেড়ার মাংস, কাবাব ইত্যাদি রান্নায় তার জুড়ি মেলে না। মাটির নীচে ভাঁড়ার থেকে মদের বোতল নেবার জন্যে আঁরি যাতায়াত করছে আর একটা শ্লেটের ওপর যোগ দিচ্ছে বিলগুলো। লোকটা সব সময়েই হাসিখুশি, বৌয়ের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, হেসে হেসে কথা বলছে প্রত্যেকের সঙ্গে আর থাবার মত চওড়া হাত বাড়াচ্ছে করমর্দন করবার জন্যে। পাশের ঘরটা একজন মুচীর। বয়স ষাট পার হয়ে গেছে কিন্তু এখনো জুতোর ওপর হাতুড়ীর ঘা দিতে দিতে 'দস্যুর মত প্রেম'-এর গান করে লোকটা। একটু দূরে একটা ফুলের দোকান— নানা জাতের ও রঙের ফুলে সাজানো। পরিচ্ছন্ন, শুকনো দেহ, বৃদ্ধা একটি স্ত্রীলোক এই দোকানটি চালায়। প্রতিদিন ভোরে দরজার ওপর এক একজন ঋষির নাম লেখে স্ত্রীলোকটি—সেই বিশেষ দিনটি যে ঋষির নামে উৎসর্গীকৃত। স্বর্গ, নরক, ইতালি ও ইথিওপিয়া—ফুটপাথের ওপর বাঁকা বাঁকা অক্ষ[illegible] দিয়ে লেখা এই কথাগুলো ; ছেলেদের একটা খেলা। ভোরবেলা [illegible]র কর্কশ চিৎকার শোনা যায়—'কমলালেবু', 'টমাটো'। ফেরী করে একদল বৃদ্ধা যাদের ঠোঁটের ওপর গোঁফের রেখা সুস্পষ্ট। বাঁশী বাজিয়ে একজন পুরনো পোষাকের ব্যবসায়ী রাস্তাটা পার হয়—বাঁশীর শব্দটা তার

নিজের একটা বিজ্ঞাপন। পাড়ার লোকেরা পুরনো জামা আর ছেঁড়া চাদর বার করে আনে। সন্ধ্যার দিকে একদল গাইয়ে বাজিয়ের আবির্ভাব হয়। তারা গান গায় ও নাচে; ওপরতলার জানলা থেকে পয়সা পড়ে রাস্তার ওপর।

কিন্তু বাড়ীগুলোর ভেতর দিক শান্ত, বিষণ্ণ ও চাপা। ফার্নিচার ও টুকিটাকি জিনিসে ঠাসা ঘরগুলো। অনেক পুরনো সব জিনিস। সব কিছুরই দাম আছে এখানে, আবর্জনা বলে কিছু নেই। আর্ম-চেয়ারের আচ্ছাদনগুলো জীর্ণ, তালিমারা। তাকের ওপর পেয়ালাগুলো ভাঙা, আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো। এখানে ঢুকে আপনি যদি অসুস্থ বোধ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ লেবুর রস মেশানো চা আসবে আর সর্ষের পুলটিস তৈরী হবে আপনার জন্যে। অনুপান, সেঁক ও মালিশের জন্যে নানা রকম লতাপাতা বিক্রি হয় ডাক্তারখানায়। বেড়ালের চামড়াও পাওয়া যায়—ওতে নাকি বাত সারে। পথে দোকানে সর্বত্র অসংখ্য মোটা মোটা হুলো বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরোওয়ানদের কুঠরিতে সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মাংস রান্না হয়—সেখানেও বেড়ালগুলোর ঘড় ঘড় আওয়াজ। সন্ধ্যার দিকে রাস্তাটা আশ্চর্য মনোরম—নীলাভ আলো চারদিকে, ডুবছে ভাসছে সব কিছু।

ওপরতলায় আঁদ্রের স্টুডিও, চারদিকের দৃশ্য চমৎকার। ছাদের পর ছাদ—লাল টালির সমুদ্রে উঁচু নীচু ঢেউ উঠছে যেন। অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা ছাদের ওপর—আর দূরের ধূসর রক্তিমাভা ভেদ করে ঈফেল টাওয়ারের চূড়া ভাসছে।

স্টুডিওর ভেতরে নড়বার জায়গা নেই। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ছবির ফ্রেম, ভাঙা চেয়ার, রঙের টিউব, ছেঁড়া জুতো, অপরিষ্কার ফুলদানি। জিনিসগুলো শুধু যে রয়েছে তা নয়, শেকড় চালিয়ে আঁকড়ে ধরেছে যেন এখানকার মাটিকে। মাঝে মাঝে মনে হবে, বসন্তের ছোট ছোট ঝাড়গাছ মাথা তুলেছে মাটির ওপর। বিশেষভাবে এই উপমা মনে আসবে যখন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সূর্যের আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকবে স্টুডিওর ভেতর। অবাক হয়ে তাকাবে আঁদ্রে আর গুন গুন করে দু লাইনের অর্থহীন কবিতা আবৃত্তি করবে। কখনো কখনো বিলীয়মান অরণ্যের মত মনে হবে স্টুডিওকে—সব কিছু ভাঙছে, ক্ষয়ে যাচ্ছে। বিপুলকায়, ধীরগতি, অল্পভাষী আঁদ্রে নিজেও সেখানে বনস্পতির মত। ভোরবেলা উঠেই সে কাজ

করবে—বাড়ীর ছাদ আঁকবে, আঁকবে বিশেষ কোন ফুলের একটা , ফুলকপি বা বোতলের ছবি। সন্ধ্যার সময় প্রকাণ্ড একটা প ধরিয়ে বেড়াতে বার হবে রাস্তায় রাস্তায়, কখনো বা ঢুকবে ন সিনেমায়, মিকি-মাউসের কৌতুক দেখে হাসবে মনে মনে, তারপর ী ফিরে শুয়ে পড়বে।

গতিতে আঁদ্রের কাজকর্ম, আর তার জীবনও ধীরগতি। বত্রিশ বছর সও সে প্রথম যৌবনের বিস্ময় নিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাচ্ছে। ইতিমধ্যেই লী চিত্রকর হিসাবে সে পরিচিত। কিন্তু তার নিজের ধারণা, তার কাজের ই তো সবেমাত্র শুরু। নরমান্ দেশের চাষী তার বাবা। কত ধীর গতিতে পেল গাছ বড় হয় এবং কত দীর্ঘ সময় পার হয় গরু দুগ্ধবতী হতে, সে র্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট। বাবার এই ধৈর্য আঁদ্রে পেয়েছে এবং এই ধৈর্য য়ে সে অপেক্ষা করছে সব কিছুর পূর্ণ পরিণতির জন্যে।

দিন—পারীর আসন্ন চঞ্চল বসন্তের এক বিকেলে—আঁদ্রে এনেমন ফুলের চ্ছ আঁকছিল। দরজায় টোকা পড়তেই বিরক্ত হয়ে সে তাকাল। অনর্গল থা বলতে বলতে ঘরে ঢুকল তার পুরনো বন্ধু পিয়ের। পিয়েরের ভাবই এই—সব সময়েই বেশী কথা বলে। অন্যমনস্কভাবে হাসল আঁদ্রে র বার বার তাকাল ছবির ক্যানভাসটার দিকে—এইমাত্র তার নজরে ড়েছে ছবির হলদে দাগগুলো বড় বেশী অস্পষ্ট।

াদ্রের তুলনায় পিয়ের ক্ষুদ্রাকার। পাখীর মত চঞ্চল, গায়ের চামড়ায় অলিভ ঙের আভাস, বড় বড় চোখের প্রখর দৃষ্টি, দীর্ঘ বাহু। কর্কশ গলায় সে কথা লছে আর অস্থির চঞ্চল পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছবির ফ্রেম ও ফুলদানিগুলোর রপাশে।

র্ম-জীবনে পিয়ের ইঞ্জিনিয়ার, মঞ্চের প্রতি তার একটা আগ্রহ আছে, মাঝে কছুদিন কবিতা লিখেছিল—এমন কি ছোট একটা কবিতার বই প্রকাশও রেছিল ছদ্মনামে, সব সময়েই কারও না কারও সঙ্গে প্রেমে পড়ছে আর প্রেমের ব্যাপারে কোন গোলমাল হলেই আত্মহত্যা করবার জল্পনা কল্পনায় রাখছে নিজেকে। কিন্তু জীবনের প্রতি তার তীব্র আসক্তি, জীবনকে বেসেছে পরিপূর্ণভাবে। দুর্বল ইচ্ছা-শক্তি, কিন্তু তার সংস্পর্শে অপরের প পড়ে। বন্ধু বান্ধবের কথায় প্রলুব্ধ হয়ে মাঝে মাঝে বহু অপ্রত্যাশিত করে ফেলেছে সে। কোন একটা কাফেতে একজন পিয়ানোবাদকের

সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় ফরাসী পার্লামেণ্টের বিরুদ্ধে
আন্দোলন চলছিল পারীতে; স্টাভিন্‌স্কি-সংক্রান্ত ব্যাপারে বহু ডেপুটি জড়ি
খবরও আর চাপা ছিল না। জাতীয় 'সম্মান' সম্পর্কে যত কথাবার্তা হয়েছি
কিছু রীতিমত উত্তেজিত করে তুলেছিল তাকে—এবং হাঙ্গামার দিন রাত্রে
লা কঁকর্দ-এ সে যোগ দিয়েছিল দাঙ্গাকারীদের দলে। ছ-মাস পরে কোন
ফ্যাশিস্টবিরোধী সভায় ভীইয়ারের বক্তৃতা সে শুনল তারপর সেই পি
বাদকের সঙ্গে তুমুল তর্ক করল সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে। প্রায় এক
সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন সে গিলত এবং প্রত্যেকটি মিছিলে যোগ দিত।
ফ্রান্সের জীবনে নতুন পরিবর্তন এনেছিল ১৯৩৫ সাল। ফ্যাশিস্ট
অল্প কাল পরেই 'পপুলার ফ্রণ্ট'-এর জন্ম—দেশের আশা, ভরসা ও সংগ্রাম
পেল এই সংগঠনে। ১৪ই জুলাই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর—বারবুসের মৃত্যু-দি
লক্ষ লোকের জনতা বেরিয়ে এল পারীর রাস্তায়, সংগ্রামের পথে পা ব
জনসাধারণ। লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাতের অসহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল
বলা হল আগামী নির্বাচন সকল সমস্যার সমাধান করবে। জনসাধা
মনে যুদ্ধের বিভীষিকা সেই প্রথম। জার্মানী সৈন্য পাঠিয়েছে রাইনল্যা
আবিসিনিয়া ইতালিয়ানদের অধিকারভুক্ত আর ফ্রান্সের ভাগ্য নির্ভর ক
কয়েকজন নগণ্য ব্যক্তির ওপর, প্রতিবেশী দেশগুলো সম্পর্কে তাদের
ভয় তেমনি ভয় দেশের জনসাধারণকেও। নিজেদের তারা মনে করত বি
সমরবিদ—মিষ্টি কথা বলত বৃটিশকে যাদের কিছুমাত্র ভাবপ্রবণতা নেই, আ
লণ্ডনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করত রোমকে। জ্ঞানীরা নি
হয়ে উঠেছিল। একটির পর একটি ছোট ছোট রাষ্ট্র ফ্রান্সের বিপক্ষে
গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বার উপক্রম হল ফ্রান্সের, কিন্তু দেশের ভবি
সম্পর্কে মন্ত্রীদের কোন চিন্তা নেই—তারা ব্যস্ত আগামী নির্বাচনের তো
জোড়ে। দ্বিধান্বিতদের ঘুষ দিয়ে আর দুর্বলচিত্তদের ভয় দেখিয়ে পপু
ফ্রণ্ট-এর ভেতর ভাঙন আনবার চেষ্টা করল শাসনকর্তারা। নতুন ন
ফ্যাশিস্ট সংগঠন মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় দেখা যেত, অভি
বংশের যুবকেরা রাজধানীর সমৃদ্ধ অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর চিৎকার ক[illegible]ছে—
'অনুমোদন নিপাত যাক', 'ইংলণ্ড ধ্বংস হোক', 'মুসোলিনি জিন্দাবাদ'!
শহরের উপকণ্ঠে শ্রমিক-অঞ্চলে আসন্ন বিপ্লবের কথা শোনা যেত। আতঙ্কিত
নাগরিকদের মনে ভয় জাগাত সব কিছু—গৃহযুদ্ধ ও জার্মান আক্রমণ, গুপ্ত

ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, সামরিক কার্যের কালবৃদ্ধি ও হরতাল। নতুন বছরকে চূড়ান্ত বলে মনে করত সকলে।

আর এই সমস্ত ঘটনার আবর্তে পিয়েরের জীবন সতর্ক প্রহরীর মত একাগ্র হয়ে উঠেছিল।

আঁদ্রের সঙ্গে পিয়েরের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। কিন্তু দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হত খুব কম। পিয়েরের জীবনে প্রচণ্ড ব্যস্ততা ও আলোড়ন কিন্তু আঁদ্রে সব সময়েই নিঃসঙ্গ, একক। দু বন্ধুতে দেখা হলেই পিয়ের বন্ধুর কাছে নিজের সর্বশেষ উন্মত্ততার কথা বলতে শুরু করে—নতুন গাড়ী, আঁদ্রে ব্রেতঁর কবিতা, ফ্যাশিস্টবিরোধী লেখক কংগ্রেস। আঁদ্রে হেসে ওঠে ওর কথা শুনে তারপর দুজনে 'তামাকখোর কুকুর'-এ ঢুকে বিয়ার বা ভারমূথ নিয়ে বসে। আবার হয়ত এক বছর দুজনের দেখা হয় না। হঠাৎ আর একদিন পিয়েরের মনে পড়ে যায় আঁদ্রের কথা, ছুটে আসে তার স্টুডিওতে, চিৎকার করে বলে, 'কাল কি হয়েছে জান...' এমনভাবে কথা বলে যেন আগের দিনও দুজনের দেখা হয়েছে।

এবারেও ঠিক তাই।

পিয়ের বলল, 'ভীইয়ার কি বলেছে জান? জার্মানদের সামরিক প্রস্তুতি সত্ত্বেও নিরস্ত্রীকরণের নীতি আমরা নিশ্চয়ই মেনে চলব, সকলেই যুদ্ধের কথা বলছে, যুদ্ধ হবে কি হবে না—এই এক কথা। আমাদের কারখানার কর্তা জ্যোতিষীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন। মনে হচ্ছে একোয়্রিয়স যুদ্ধের পক্ষে কিন্তু টরাস বিপক্ষে—যত সব বাজে কথা। অবশ্য হিটলারও পাগল ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু পপুলার ফ্রণ্ট যদি জেতে তাহলে কক্ষনো যুদ্ধ হবে না। তুমি কি মনে করো?'

'জানি না, এ বিষয়ে আমি ভাবিনি।' আঁদ্রে বলল।

পিয়ের হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'কৃষ্টি পরিষদে। ওরা বলছে যে সবাইকে ওরা আজ অবাক করে দেবে। চলো, দুজনেই যাই। এখানে চুপ করে বসে থাকা অসহ্য। কৃষ্টি পরিষদ সত্যি ভাল লাগবে তোমার, সবাই আছে ওর ভেতর—শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার এমন কি তোমার সগোত্র শিল্পীরাও। আমারও এই মত। জ্যোতিষীর সাহায্য

না নিয়েই কর্তাকে বলে দিয়েছি একথা। কর্তা তো চটে আগুন। কিন্তু যাই বলো, কেউ আর একে আটকাতে পারবে না...'

'কি ?'

'কি আবার—বিপ্লব। দেখো না, আমাদের কারখানাতেই কি কাণ্ড হয়। চলো এবার যাওয়া যাক।'

আঁদ্রে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ক্যানভাসটার দিকে কিন্তু পিয়ের একরকম টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গেল তাকে।

ভীড় ঠেলে দুজনে ভেতরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর, তামাকের ধোঁয়ায় চারদিক অস্পষ্ট। ঝাড়বাতিগুলো কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে, আবছা মুখগুলো রঙ-মাখা বলে মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে রয়েছে ক্যাপ-মাথায় শ্রমিক, চওড়া হ্যাট মাথায় শিল্পী এবং ছাত্র, কেরানী ও একদল মেয়ে। পারীর সংশয়ী অবিশ্বাসী জনসাধারণের রূপ বদলে গেছে এখানে, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে তারা—গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, হাততালি দিচ্ছে আর সংকল্পে দুর্বার হয়ে উঠছে। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী, তরুণ কারিগর যে সম্প্রতি একটা নির্বোধ কবিতা লিখেছে 'নতুন জীবন'-এর ওপর—বিভিন্ন কর্মজীবনের বিচিত্রতম মানুষ পরস্পর করমর্দন করছে এখানে। 'ল্য ফ্রঁ পপুল্যার'—কথাগুলোর ধ্বনি 'দ্বার-খোলো-সীসেম' মন্ত্রের মত কাজ করছে। পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভের অপেক্ষা শুধু—তার পরেই খনির শ্রমিকেরা শিল্পীর তুলি হাতে নেবে, বোকা বোকা যে লোকটা সব্জির চাষ করে—পিকাশোর ছবির সমজদার হবে সে, কবিতার ভাষায় কথা বলবে সকলে, মৃত্যুকে জয় করবে জ্ঞানতপস্বী আর বহু ঘটনার লীলাভূমি সীন নদীর দুই তীরে নতুন এথেন্স সৃষ্টি হবে।

আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। একটি শ্রমিক এমনভাবে বক্তৃতা শুনছে যেন গিলছে প্রত্যেকটি শব্দ। হাই তুলছে আর একজন—লোকটা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। বহু স্ত্রীলোক—প্রত্যেকেই ধূম পান করছে।

মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে যে ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি বক্তৃতা দিচ্ছে সে একজন

বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিদ, কিন্তু আঁদ্রে তাকে চেনে না। নীচু গলায় সে কথা বলছে আর কাশছে বারবার। কয়েকটা টুকরো টুকরো কথা আঁদ্রের কানে এল—'সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি...নতুন মানবতা।'

রাজনৈতিক বক্তৃতা শুনতে আসা আঁদ্রের জীবনে এই প্রথম। ফিরে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছা জাগল হঠাৎ—স্টুডিও আর ফেলে-আসা কাজ তাকে টানছে। তারপর হঠাৎ মঞ্চের দিকে চোখ পড়তেই একটা চিৎকার বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে—'আরে লুসিয়ঁ যে!'

বোঝা গেল, সবাইকে 'অবাক' করবার মত ঘটনাটা হচ্ছে এই। স্কুলের কথা আঁদ্রের মনে পড়ল। 'তন্বীর রোষ-বহ্নি আমার প্রেমই জাগায়'—কবিতাটা স্কুলে লুসিয়ঁ প্রায়ই আবৃত্তি করত আর সবার কাছে বলে বেড়াত সে আফিং-খোর। আর এখন সে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। হ্যাঁ, কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। মানুষ সত্যিই বদলায়।

উঠে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করল। আবেগময় ভঙ্গীতে দ্রুত বক্তৃতায় লুসিয়ঁ বলল—'বোমারু বৈমানিক বা পিকার্ডি-রূঢ়-সাইলেসিয়ার খনি শ্রমিক—পৃথিবীর অনেক ওপরে বা অনেক নীচে যারা রয়েছে—তাদেরই ওপর নির্ভর করছে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ। ছয়শো ডেপুটি? একজন কীটতত্ত্ববিদের মুখে আমি শুনেছি—এক রকম গোবরে পোকার শরীরে মাছি ডিম পাড়ে, সেই ডিম থেকে যখন কীট বেরিয়ে আসে মৃত গোবরে পোকাও চলতে শুরু করে। আসলে গোবরে পোকাকে চালাচ্ছে কীটগুলো...'

হিটলার, যুদ্ধ, বিপ্লব—অনেক কথা লুসিয়ঁ তারপর বলল। বক্তৃতা শেষ হবার পর কিছুক্ষণ একটি শব্দও হল না, লুসিয়ঁর আশ্চর্য কণ্ঠস্বর তখনো সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তারপর হঠাৎ ফেটে পড়ল সমস্ত হলঘরটা, হাতব্যথা না হওয়া পর্যন্ত হাততালি দিল পিয়ের, পাশের একটি শ্রমিক গান গেয়ে উঠল—'এগিয়ে চলেছে শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা...' শ্রমিকটির দিকে তাকিয়ে তার চিত্র আঁকবার ভয়ানক একটা ইচ্ছা পেয়ে বসল আঁদ্রেকে; কীট, যুদ্ধ, লুসিয়ঁ—এতক্ষণ শোনা অন্য সমস্ত কথা মুছে গেল তার মন থেকে।

মঞ্চের ওপর ক্ষুদ্রাকার বৃদ্ধ লোকটি অনেকক্ষণ ধরে করমর্দন করল

লুসিয়ঁর সঙ্গে। হঠাৎ একটি লোক উঠে দাঁড়াল—বয়সে তরুণ, রুগ্ন বিবর্ণ মুখ, স্বল্প পরিচ্ছন্ন বেশভূষা।

'আমি কিছু বলবার অনুমতি চাই' চিৎকার করে বলল সে।

বিপন্ন মুখে সভাপতি ঘণ্টা টিপল।

'আপনার নাম?'

'গ্রি-নে। শুধু আমার নাম আপনাকে আমার কোন পরিচয় দিতে পারবে না। এই মাত্র যিনি বক্তৃতা দিলেন, তার নাম এই হিসেবে অনেক কার্যকরী। আমি যতদূর জানি এই শেষ বক্তার বাবা মঁশিয় পল তেসা জোচ্চোর স্টাভিন্‌স্কির কাছ থেকে আশি হাজার মুদ্রা পেয়েছে। বেশ বোঝা যায়, এই অর্থের সাহায্যে...'

প্রচণ্ড গোলমালে বাকী কথা ডুবে গেল। দেখা গেল, গ্রি-নে একটা লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মুখের বিকৃতিতে স্নায়বিক উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। তার পাশ থেকে একজন লম্বা চওড়া লোক একটা টুল ছুঁড়ে মারল কাকে যেন। অনেক চেষ্টায় আঁদ্রে ভীড় ঠেলে বাইরে চলে আসতে পারল। পেছন থেকে পিয়ের ডেকে বলল, 'একটু দাঁড়াও, লুসিয়ঁ আসছে, এক সঙ্গে কাফেতে ঢুকব।'

'তোমাদের সঙ্গে আমি যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

লুসিয়ঁ বেরিয়ে এসে ওদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল, সে বলল, 'কেন পারবে না? চল একটু বিয়ার খাওয়া যাক, ভেতরে তো রীতিমত গরম লাগছিল। বক্তৃতাটা ভালভাবে শেষ করতে পারলাম না। গোলমাল হবে আমি আগেই জানতাম।'

পিয়ের হাসল, 'ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এই গ্রি-নে লোকটাকে আমি ভালভাবে চিনি। গত ৬ই ফেব্রুয়ারী ওকে আমি প্রথম দেখেছিলাম। লোকটা অদ্ভুত, সেদিন ও একটা ক্ষুর হাতে নিয়ে ঘোড়া-গুলোকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছিল। ওর মত লোককে যে ওরা আজকের সভা পণ্ড করবার জন্যে পাঠিয়েছে, তার কারণ তো খুব স্পষ্ট। কিন্তু তোমার বক্তৃতা চমৎকার হয়েছে, লুসিয়ঁ। কালকের কাগজে যে সব মন্তব্য লেখা হবে তা আমি স্পষ্ট কল্পনা করতে পারছি। প্রথমত, সাহিত্যিক হিসাবে তোমার খ্যাতি আছে, তারপর পল তেসার ছেলে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে, এটাও কম কথা নয়। অবশ্য,

তোমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নাটক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু রীতিমত জমকালো খবর এটা। এই জন্যেই ওরা এই সভা পণ্ড করবার চেষ্টা করেছে। তুমি কিন্তু আজ সত্যিই রীতিমত সাহসের পরিচয় দিয়েছ। আঁদ্রে, কথা বলছো না যে?'

'কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'কেন, বুঝতে পারছো না কেন?'

'এই সমস্ত ব্যাপারে কথা বলতে হলে রীতিমত চিন্তা করা দরকার, বিশেষ করে আমার মত লোকের পক্ষে। তুমি নিজেই বলেছ, সব কথাই আমি একটু দেরিতে বুঝি।'

একটি তরুণী মেয়ে আসছিল ওদের সঙ্গে। মেয়েটির মাথায় টুপি ছিল না, কোঁকড়ানো চুল, বিস্ময়-চকিত মুখের ভঙ্গী। দুই চোখের দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কোন রাত্রিচর পাখীর মত। মেয়েটি একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ, কিন্তু হঠাৎ সে দাঁড়াল।

'লুসিয়ঁ, তোমার কাছে চাবি আছে? কাজে যাবার আগে আমি একবার বাড়ী ঘুরে আসব।'

লুসিয়ঁ ফিরে তাকাল, মেয়েটির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে এদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। জিনেৎ ল্যাবেয়ার—অভিনেত্রী। এরা দুজন আমার স্কুলের পুরনো বন্ধু। আঁদ্রে কর্নো, পিয়ের দ্যাবোয়া। চল এবার একটা কাফেতে ঢোকা যাক। তোমাকে আমি স্টুডিওতে পৌঁছে দেব।'

কাফে প্রায় জনশূন্য। পরদার ওপাশে কারা যেন তাস খেলছে। 'আরে ভায়া, রানীটা যে আমার হাতে'—মাঝে মাঝে দু-একটা কথা ভেসে আসছে। এক ঢোঁক বিয়ার গিলে আঁদ্রে গলা ভিজিয়ে নিল। তারপর আড়চোখে একবার তাকাল জিনেতের দিকে। আশ্চর্য চোখ মেয়েটির! কেমন একটা শিহরণ অনুভব করল আঁদ্রে। স্কুলের দিনগুলোর কথা মনে করতে চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু কথাবার্তা বেশী দূর অগ্রসর হল না। এমন কি পিয়েরও চুপ করে রইল। ঘরের বদ্ধ বাতাস আর পরদার ওপাশের গোলমাল ক্লান্তিকর মনে হল ওদের।

দুজন লোক ঢুকল। দুজনেই সামান্য অপ্রকৃতিস্থ। একজনের বয়স প্রায় চল্লিশ, মাথায় সংবাদবাহকের মত টুপি।

'ধরো ওরা যদি আমাদের ঠ্যাঙ দুটো খসিয়ে নেয়, তাহলেই তো সব খতম—কি বলো ?' চিৎকার করে বলল লোকটা।

'না হে ধাড়ী মোরগ, না। দুয়ে দুয়ে চার হয়—এ নিয়ম এখনো পালটে যায়নি।' উত্তর দিল অল্পবয়স্ক সঙ্গীটি।

যন্ত্রচালিত পিয়ানোটার খোপে একটা মুদ্রা ফেলল প্রথম লোকটা। পিয়ানোটার কর্কশ আওয়াজ অসহ্য মনে হল ওদের।

অস্পষ্ট নীচু গলায় পিয়ের বলল, 'তোমারই সন্ধানে ঘুরি হে ছলনাময়ী···মনে পড়ে ? গত যুদ্ধের শেষে এই গান আমরা গেয়েছিলাম। অসম্ভব কল্পনা—না ? সে সময় সবার মুখে কি রকম বড় বড় কথা শোনা যেত মনে আছে ? আর এখন ওরা বলছে, দুয়ে দুয়ে চার হয়। খুব সহজ হিসাব ! জার্মানদের হাত থেকে বিনা দ্বিধায় সমস্ত সম্পদ কেড়ে নাও—এই হল প্রথম কাজ। তারপর বৈঠক বসল—জার্মানদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে, কি হবে না। দেশের 'সমৃদ্ধ' অবস্থা ঘোষণা করা হল। কিন্তু আমি দেখেছি, রোজ রাত্রে কাতারে কাতারে লোক ব্রিজের তলায় রাত কাটিয়েছে, আগুন জ্বালিয়ে কফি ধ্বংস করা হয়েছে, মাছ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমুদ্রের জলে, ভেঙে ফেলা হয়েছে যন্ত্রপাতি কলকারখানা। এই ছিল দ্বিতীয় কাজ। তারপরে হিটলারের আবির্ভাব। চুলোয় গেল সন্ধি-চুক্তি। নতুন করে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠল সবাই। ওদের দেখে আমরা শুরু করলাম, আমাদের দেখে ওরা শুরু করল, তারপর ওরা, আবার আমরা···এই হচ্ছে তৃতীয় কাজ। চতুর্থ কাজ কি হবে তাও আমরা জানি। হিটলারের দাবী শোনা যাবে—স্ট্রাসবুর্গ আর লিল আমার চাই। তারপর আমাদের ঝোলায় টিনের খাবার দেওয়া হবে, গ্যাস-মুখোস উঠবে আমাদের মুখে—সভ্যতাকে রক্ষা করছি আমরা। বোমা পড়বে এই বাড়ীর ওপর, এখানে, ওখানে, সর্বত্র। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না যে জনসাধারণ এই পরিণতি মেনে নেবে। ভীইয়ারের বক্তৃতা খুব কার্যকরী হয়েছে, এমন কি বুর্জোয়া সমাজেও কিছুটা আলোড়ন তুলেছে। আগামী নির্বাচনে বামপন্থী শক্তি বহু ভোটে জয়লাভ করবে।'

লুসিয়ঁ হাসল। পিয়েরের কথায় আঁদ্রে কান দেয়নি, কিন্তু লুসিয়ঁর হাসি দেখে ওর রাগ হল। 'স্নব !' মনে মনে ও বলল। তবুও লুসিয়ঁকে ওর ভাল লাগছে। আশ্চর্য রকমের সুন্দর মুখ লুসিয়ঁর—বিবর্ণ উত্তেজিত

মুখ, অস্পষ্ট সবুজ চোখ, তাম্রাভ চুল। লুসিয়ঁকে দেখে মনে হয় মধ্যযুগীয় দস্যুর ভূমিকায় অবতীর্ণ কোন অভিনেতা।

লুসিয়ঁ বলল, 'চমৎকার! কিন্তু তারপর? ভীইয়ার ঠিক আগের মতই যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকবে। হয়ত আগের চেয়েও খারাপভাবে—কারণ ভীইয়ার দুর্বল-চিত্ত। কিন্তু আসল প্রশ্ন এ নয়। আমার বাবা দক্ষিণপন্থী, কারণ ওই দলেরই সংখ্যাধিক্য। নির্বাচনের পর উনি আন্তরিকভাবেই বামপন্থী হয়ে উঠবেন। যদিও বুর্জোয়া কিন্তু উনি খাঁটি লোক। সুতরাং উনি গতকাল যা বলেছেন, আগামীকালও তাই করবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ওঁর মত লোক কখনো বদলায় না। তুমি কি বলবে আমি জানি। কিন্তু বাঁচবার পথ মাত্র একটিই আছে। জনসাধারণ বিপ্লব আনবে, একথা যদি সত্যি হয়, তবে সেই বিপ্লবের প্রস্তুতি করবে সংগঠন—একথাও সত্যি। এটা একটা আর্ট। তাই নয় কি আঁদ্রে?'

'আমার মতে আর্ট সম্পূর্ণ অন্য একটা জিনিস। ছবি আঁকা কিংবা বাগান তৈরী করা নিশ্চয়ই একটা আর্ট। কিন্তু বিপ্লবকে আমি বলব একটা দুর্ভাগ্য—এমন একটা দুর্ভাগ্য যা জনসাধারণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তোমরা পরিবর্তন চাও এবং সেজন্যে কোন সুযোগ হাত ছাড়া করো না। কিন্তু আমি ভালবাসি জীবনের স্থির অচঞ্চল রূপ—কারণ সেই হচ্ছে সময় যখন খুশিমত তাকিয়ে থাকা যায় আর সত্যিকার দেখাও হয় অনেক কিছু। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা চলে—সিজেনের মত। সিজেন-এর সারা জীবন কাটল আপেলের দিকে তাকিয়ে এবং অনেক কিছু দেখলও সে। আমার মতে এই হচ্ছে আর্ট।'

পিয়ের লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'খুশিমত 'তাকিয়ে' যতক্ষণ স্টুডিওর ভেতর বসে আছ, এসব কথা বলা খুব সহজ। কিন্তু মেশিনগানের মুখ যখন তোমার ওপর উদ্যত হয়ে উঠবে, তখন আর চিন্তা করবার অবসর থাকবে না, বাস্তব দৃষ্টি নিয়ে স্পষ্টভাবে দেখাটাই বড় কথা হয়ে দাঁড়াবে। তখন তুমি কি করবে, আঁদ্রে?'

একথার উত্তর দেবার ইচ্ছা আঁদ্রের ছিল না, কিন্তু কখন যে সে কথা বলতে শুরু করেছে নিজেই তা জানতে পারেনি। জিনেতের অবিশ্বাস্য রকমের বড় বড় দুই চোখের দৃষ্টি পড়েছে তার ওপর আর সেই দৃষ্টির প্রভাবে তার আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে, নতুন মানুষ হয়ে উঠেছে সে।

সে বলল, 'পিয়ের, তোমাকে বা লুসিয়ঁকে আমি বুঝতে পারি না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছ কখনো—কী আশ্চর্য দৃশ্য! এ নিয়ে কত কবিতা লেখা হয়েছে, এর প্রভাব পড়েছে কত দর্শনের ওপর। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এই তারাভরা আকাশের চিত্র আঁকবার চেষ্টা করেনি। আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিষয়বস্তু শিল্পীর মনকে আকর্ষণ করেছে, তা হচ্ছে মানুষের দেহ—সেই দেহের অসামঞ্জস্য, তার আকস্মিক ভঙ্গী, তার উত্তাপ আর তার নির্ভুল ছন্দ। কিংবা এমন কোন দৃশ্য যা দেহেরই রূপান্তর—পাহাড়ের বিন্দুক্রম চূড়া, পাতার বিচিত্র রঙ, মাটির ওপর নেমে আসা আকাশ। যখন তোমরা বিপ্লবের কথা বলো—সেটা চিন্তাজগতের একটা ধারণা আর কতকগুলো অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু যে জনতা আজ লুসিয়ঁর বক্তৃতা শুনল, তারা জীবন্ত মানুষ। আমি তাদের দেখেছি, তাদের দুঃখ অনুভব করেছি...'

আঁদ্রে হঠাৎ থেমে গেল। কেন সে এত কথা বলছে, আশ্চর্য হয়ে সে ভাবল। কোন সার্থকতা নেই এসব কথার, এভাবে কথা বলতে সে চায়নি। মেয়েটির দিন কাটে কি করে? লুসিয়ঁ বলেছে, ও অভিনেত্রী। অসম্ভব, হতে পারে না। ও তো এখনো শিশু। কিংবা পাগল। লুসিয়ঁ, তুমি সত্যিই অভিনয় করতে পারো। লুসিয়ঁর কাছে ও চাবি চেয়েছিল, তার মানে ওরা দুজনে এক সঙ্গে থাকে...আঁদ্রে বুঝতেও পারল না যে লুসিয়ঁকে সে হঠাৎ হিংসে করতে শুরু করেছে। একটার পর একটা ভুল হচ্ছে তার। এক গ্লাশ কোনিয়াক্ মদ চেয়েছিল জিনেৎ, হঠাৎ আঁদ্রে বাধা দিয়ে বলে উঠেছে, 'ও ভালো নয়। বেড়ানোর মত আর কিছু নেই। তুমি ভুলে যাবে যে...'

জিনেৎ উত্তর দিল না। কিন্তু লুসিয়ঁ চোখ বোঁচ করে কঠিন স্বরে বলল, 'নীতি কথা আওড়াচ্ছ? জিনেৎ ওঠবার সময় হয়নি তোমার?'

জিনেৎ ঘাড় নাড়ল। বিব্রত ও লজ্জিত হয়ে উঠল আঁদ্রে।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। পরদার ওপাশে তাস-খেলোয়াড়রা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—'কি আপদ, তোমার তুরুপ কোথায়?'...সন্ধ্যার কাগজ হাতে একটি ছেলে ঢুকল,—'শেষ খবর! যুদ্ধ লাগল!'

পিয়ানোর ধারে জিনেৎ দাঁড়িয়ে। খোপের ভেতর সে একটা মুদ্রা ফেলল। এবারেও সেই পুরনো ফক্স্-ট্রটের আওয়াজ। আঁদ্রেকে সে বলল, 'আসুন,

আমরা নাচি। গত যুদ্ধের পর সবাই নেচেছিল। আমি তখন খুব ছোট, কিন্তু আমার মনে আছে...এবার ওদের হারিয়ে দেব আমরা, যুদ্ধ শুরু হবার আগেই আমরা নাচব, নাচতে পারলাম না বলে পরে আর কোন দুঃখ থাকবে না।'

আঁদ্রে নাচ জানত না সুতরাং নাচে সঙ্গী হতে রাজী না হওয়াই উচিত ছিল তার। আর এই ছোট নির্জন কাফের ভেতরে কেউ কোন দিন নাচেনি। কেরানী আর দোকানদারেরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাস খেলেছে, আর শীতে কাঁপতে কাঁপতে সোফাররা দ্রুত আনাগোনা করেছে। কিন্তু জিনেতের প্রস্তাবে খুশিতে লাল হয়ে উঠল আঁদ্রে, জিনেতের দেহের স্পর্শে কেঁপে উঠল তার রক্তাভ বৃহৎ হাত। ক্যাশ ডেস্কের পেছন থেকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে দেখল কাফের মালিক। এক মিনিটও নয় বোধ হয়, জিনেৎ হঠাৎ থামল।

'এবার আমি যাই,' চাপা ক্লান্ত গলায় বলল সে, 'লুসিয়ঁ, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।'

জিনেৎ চলে যাবার পর পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ থিয়েটারে ও কাজ করে?'

কেমন যেন অনিচ্ছার সঙ্গে লুসিয়ঁ বলল, 'ও আপাতত রেডিওর 'পোস্ট পারিসিয়েন'-এ কাজ করছে। অবশ্য খুব ছোট অনুষ্ঠান—থিয়েটার আর তার মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন। কিন্তু সবাই বলে যে ওর প্রতিভা আছে। তবুও এসব ব্যাপারে ভাল সুযোগ পাওয়া যে কত কষ্ট তা তো তোমরা জান...'

লুসিয়ঁ তার বন্ধুদের নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করল—'চলো, আরো খানিকটা গল্প করা যাবে।' পিয়ের তৎক্ষণাৎ রাজী, কিন্তু আঁদ্রে বলল, 'না।' লুসিয়ঁ ছাড়তে চাইল না—'আরে, চলে এস। আবার কখন দেখা হবে কেউ বলতে পারে না। যদি যুদ্ধ শুরু হয়...'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়াল—'কোন ভয় নেই, যুদ্ধ হবে না। কিন্তু আমি এবার যাই। আজকের এই সব কথাবার্তার পর খানিকটা বেড়িয়ে আসা দরকার আমার। রাগ কোরো না, লুসিয়ঁ। আমার স্বভাবটাই ঘরকুনো। এসব আমার ভাল লাগে না—এই মিটিং বা থিয়েটার বা...'

সে বলতে যাচ্ছিল 'বা অভিনেত্রী,' কথাটা শেষ করল না, একবার হাত নেড়ে বেরিয়ে গেল।

২

আঁদ্রে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল। শহরের ঠিক মাঝখান দিয়ে তার যাবার রাস্তা। মোটর-হর্ণের তীক্ষ্ণ আর্তনাদে বাতাস চিরে যাচ্ছে, লাল-সবুজ-বেগুনী রঙের গুচ্ছ গুচ্ছ আলো জ্বলে উঠেছে চারদিকে। দলে দলে লোক বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়—কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বিক্রি করছে খবরের কাগজ আর নেকটাই, হোটেলে সান্ধ্য নাচের আসরের জন্যে খদ্দের যোগাড় করবার চেষ্টা করছে কেউ কেউ, মধুর আমন্ত্রণ জানিয়ে কর্কশ গলায় চিৎকার করে চলেছে রূপজীবীরা। একটা বন্ধ অন্ধকার গলির ভেতর থেকে লাউড-স্পীকারের গলা ভেসে এল : আবার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ওঠবার প্রয়োজনীয়তা...জায়গাটা আঁদ্রে দ্রুত পার হয়ে গেল, ডুবুরী যেমন করে ঘন কাল জলরাশি ভেদ করে বেরিয়ে আসে—তেমনিভাবে। তারপর সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল একটা ব্রিজের ওপর—নীচে সীন নদীর জল কালির মত কাল, প্রতিফলিত আলো কেঁপে কেঁপে উঠছে। হঠাৎ বাতাস বইতে শুরু করল, তারপরেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। জিনেতের চোখ দুটির কথা আঁদ্রের মনে পড়ল ; সত্যিই, আশ্চর্য মেয়ে জিনেৎ।

রূ শের্‌স্-মিদির কোণে 'তামাকখোর কুকুর'-এ সে ঢুকল তামাক কেনবার জন্যে। ভেতরে রীতিমত হৈ-হল্লা চলছে। এক গ্লাশ কাল্‌ভাদো আনবার আদেশ দিয়ে বসে পড়ল আঁদ্রে হঠাৎ। মদ্যপানের উষ্ণতা রীতিমত খুশি করে তুলল তাকে। মনের ভেতর যে সব উদ্দেশ্যহীন চিন্তা জট পাকিয়ে রয়েছে, সেগুলো দূর করে দেবার চেষ্টা করল সে—মনের এই অবস্থা তার কাছে একটা সম্পূর্ণ নতুন ও দুর্বোধ্য অনুভূতি। তিন গ্লাশ কাল্‌ভাদো পান করে যখন সে উঠতে যাবে, একটি লোক এল তার কাছে। লোকটির চেহারা রোগা ধরনের, চোখের ভুরু ও পাতা শাদা, গায়ে প্রকাণ্ড ওভারকোট।

লোকটি বলল, 'মাফ করবেন, আমার ফরাসী ভাষা খুব খারাপ। আমি আপনাকে প্রায় প্রতিদিনই দেখি; তবুও আপনার কাছে আসবার আগে আমাকে বহুক্ষণ ইতস্তত করতে হয়েছে। আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই আমি থাকি—মাদাম কোয়াদের বাড়ীর চার তলায়। 'স্যালো'-এ আপনার আঁকা ছবি আমি দেখেছি এবং আমার খুব ভাল লেগেছে, বিশেষ করে শহরতলীর দৃশ্যগুলো ও সেই ধূসর...'

হঠাৎ বাধা দিয়ে আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি সমালোচক?'

'না। আমি মৎসবিজ্ঞানবিদ। আমার নাম, এরিক নিবার্গ। দেশ, লুবেক।'

জ্বলজ্বলে নির্বোধ চোখের দৃষ্টি, প্রায় ছেঁটে-ফেলা গোঁফ, কড়া স্টার্চ কলার—লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আঁদ্রে।

'আমি বুঝতে পারছি না...'

'আমি জার্মান।'

'সে কথা বলছি না। আপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বিদ-ভাগান্ত যে শব্দটি উচ্চারণ করলেন, তার অর্থ জিজ্ঞাসা করছি।'

'মাছ।'

আঁদ্রে জোরে হেসে উঠল, 'মাছ! যাক্, তাহলে কথা দাঁড়াল এই: আমার আঁকা কনটেনি অ-রোজেজ দৃশ্যটি ও তার ধূসর রঙ আপনার ভাল লেগেছে, আর লুবেক-এর মাছ সম্পর্কে আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, সমস্ত মিলিয়ে কোন অর্থই হল না। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন। কাল্‌ভাদো ভালবাসেন আপনি? চমৎকার! মাদাম কোয়াদ তো একটা নোংরা পেত্নী। আপনাকে কি জার্মানী ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে?'

'না। চার মাসের জন্যে এখানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। মৎসবিজ্ঞান ইন্‌স্টিটিউট-এ আমি কাজ করেছি, কাল লুবেক ফিরে যাব। একথা শুনে আপনি কি খুশি হলেন?'

'আমি? আমার কি আসে যায়। মাছ সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। অবশ্য একথা সত্যি, কতকগুলো মাছ দেখতে বেশ সুন্দর আর খেতেও চমৎকার। তাছাড়া অন্য মাছ যা আছে, সে সম্পর্কে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আপনিই ভাল বুঝবেন। লুবেক যদি আপনার ভাল লাগে, তবে লুবেক-এ থাকুন, পারী যদি ভাল লাগে, পারীতে থাকুন...'

প্রথম গ্লাশের পর জার্মানটির একটু নেশা হয়েছে। চকচক করছে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো। সে একটা সিগারেট বার করল, কিন্তু ধরালো না। বহুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'কার কোন্ জায়গা ভাল লাগে, সে প্রশ্ন উঠছে না। পারী আমার ভাল লাগে, এমন কি আমার মনে হয়

পারীকে আমি বুঝতে পারি। আসল কথা, কে কোথায় জন্মেছে—যদিও নিজের জন্মস্থানকে সচেতনভাবে বাছাই করে নেবার ক্ষমতা কারও নেই। যেমন ধরা যাক, আমার জন্মস্থান জার্মানী। এই জন্যেই জার্মান ভাষা, জার্মান গাছ, এমন কি জার্মান খাবার পর্যন্ত আমার ভাল লাগে আপনার জন্ম ফ্রান্সে এবং আপনি...'

'আপনি কি মনে করেন ফ্রান্সকে আমি ভালবাসি? একটুও নয়। এদেশের কেউ একথা ভাবে না। স্কুলে এবং সরকারী অনুষ্ঠানে অবশ্য বলা হয়, আমাদের দেশ সুন্দরী ফ্রান্স, স্বদেশ বিপন্ন। কিন্তু আমরা ওসব কথায় কান দিই না, আমাদের হাসি পায়। কেউ হয়ত বলবে, মস্কো এর চেয়ে অনেক ভাল। কেউ বলবে, লুবেক একটা আশ্চর্য দেশ—কিন্তু পারী সম্পর্কে এই ধরনের কথা কারও মুখে শুনতে পাবেন না। পারীতে আমরা বাস করি তার চেয়ে বেশী আর কিছু নয়।'

'তার মানে আপনি বলতে চান যে দেশকে আপনি ভালবাসেন না?'

'একথা আমি কখনো ভেবে দেখিনি। গত যুদ্ধের সময় লোকগুলোকে এসব কথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করানো গিয়েছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এখন তারা বলবেঃ আমাদের মাথায় কতগুলো বাজে ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি নিজে কিছু বলতে পারব না। আমার ঠাকুরদাদা ১৮৭০ সালের কথা বলতেন। সে সময়ে সকলে বলেছিল, ফ্রান্স জিন্দাবাদ। অবশ্য জার্মানদের বেয়নেট তখন উদ্যত হয়ে উঠেছিল এবং প্রুসিয়ানরা নরম্যাণ্ডিতে পৌঁছে গিয়েছিল...কিছুক্ষণ আগে কয়েকজন চমৎকার লোকের সঙ্গে আমি ছিলাম। তাদের একটিমাত্র দোষ যে বড় বড় কথা বলতে সবাই খুব ভালবাসে। এমন সব মাথা-খারাপ যে সারাটা সন্ধ্যা শুধু যুদ্ধের কথাই আলোচনা করেছে। তাদের কারও মনে কোন সন্দেহ নেই যে, যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ শুরু হতে পারে।'

'নিশ্চয়ই পারে। গত বছরের বসন্তকালেই যুদ্ধ বাধবে বলে আমার মনে হয়েছিল...যাই হোক আরো এক বছর বেশী সময় পাওয়া গেছে সেটা আমাদের পক্ষে ভালই। আপনি এবং আমি—আমাদের দুজনেরই দুর্ভাগ্য যে দুই যুদ্ধের মাঝখানে আমাদের জীবনের বিকাশ সম্ভব হয়ে উঠল না। যাই হোক, সময় থাকতে পারীকে আমি দেখে নিয়েছি, এই জন্যে আমি আনন্দিত, কারণ...'

'কারণ ?...'

'কারণ, এর পর পারীর কোন অস্তিত্ব থাকবে না।'

আঁদ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনিও আর একটি মাথা-খারাপ। কাল্ভাদো আপনার সহ্য হয় না, সেই জন্যে এই সব আজগুবী কথা আপনার মনে আসছে, মাছের ব্যবসায়ে আপনার সাফল্য কামনা করি।'

আঁদ্রে বাইরে চলে এল। হঠাৎ জিনেতের কথা তার মনে পড়েছে। মনে হল, বহুদূর থেকে জিনেতের কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে এবং প্রতিদিনকার শোনা অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলো গভীর তাৎপর্য লাভ করেছে। অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়িটা দ্রুত পার হয়ে সে বেতার-যন্ত্রটার সামনে দাঁড়াল। যন্ত্রটার ভেতর থেকে একজন পুরুষের কর্কশ অনুনাসিক গলা শোনা যাচ্ছে : 'ব্রাডোক্লোরিণ মিকশ্চার মাথাধরা ও প্লীহার পক্ষে উপকারী...'

দু হাতে মুখ ঢেকে একটা টুলের ওপর সে বসল। বহুক্ষণ সে বসে রইল এই ভাবে, তারপর হঠাৎ চমকে উঠল—একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর বাতাসে ভেসে আসছে। জিনেতের চোখ দুটো সে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু রেডিওর আলোকোজ্জল ডায়ালটি ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পেল না।

'লাইপজিগ', 'রোম', 'পোস্ট পারিসিয়েন'—কথাগুলো হঠাৎ শোনা গেল। 'আমার অনুভূতিকে যতই গোপন করবার চেষ্টা করছি, ততই আমার হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে পড়ছে...' তারপর জিনেৎ দুবার একটা কথা উচ্চারণ করল—'ছেলেমানুষি।'

তারপরেই একটা গম্ভীর গলায় শ্রোতাদের অনুরোধ জানানো হল যেন তাঁরা খাবারের পর মার্তিনি ভারমুথ পান করতে না ভোলেন। অনুরোধটা এত অপ্রত্যাশিত যে আঁদ্রে হেসে উঠল। ইতস্তত পায়চারি করতে করতে সে মনে মনে বলল, 'আচ্ছা বেশ। মার্তিনি পান করব। হৃদয় উন্মুক্ত করব। ছেলেমানুষি',...কিন্তু যন্ত্র শাসিয়ে উঠল, 'জার্মান বিমান-বাহিনী ...লীগ অব নেশনস্-এ ভাঙন...বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা...'

খোলা জানলার সামনে আঁদ্রে দাঁড়াল। মার্চ মাসের ঝোড়ো রাত্রি। ক্যানেলের নৌকোগুলো দুলে দুলে উঠছে, ভয়ার্ত দৃষ্টিতে ধর্ম-কবচ মুঠো করে চেপে ধরেছে নৌকোর মাঝিরা। সমুদ্রের নোনা বাতাস ছুটে এসেছে পারী পর্যন্ত, আছড়ে পড়ছে পারীর ঘরবাড়ীর ওপর। সমুদ্রের ধারে মানুষ হয়েছে আঁদ্রে, সে জানে—সমুদ্রতীরের আপেল গাছগুলো এখন বিক্ষুব্ধ,

আন্দোলিত। সহস্র গ্রন্থিপথে ধীরে ধীরে রস সঞ্চিত হচ্ছে আর বাতাসে পাগলের মত দুলে দুলে উঠছে গাছগুলো। কী বিশ্রী বাতাস! নতুন মানবতা, গোবরে পোকা, বিপ্লব, যুদ্ধ। সত্যিই কি তাই? জার্মান লোকটা বলেছিল—কারণ, এর পর পারীর অস্তিত্ব থাকবে না...আর—জিনেৎ তো গাড়ী-চাপা পড়তে পারে কিংবা ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতে পারে ওর। পৃথিবীটা কী ভঙ্গুর! ওরা মতবাদ নিয়ে তর্ক করছিল—নিষ্প্রাণ পাথর, আকাশচারীর দল! নরমাণ্ডির ঝড়-বিক্ষুব্ধ উপকূলের আপেল গাছগুলোকেই একমাত্র ভালবাসা সম্ভব। আপেল গাছ আর জিনেৎ।

৩

প্রচুর আসবাবে সাজানো অস্বাচ্ছন্দ্যকর একটা ঘরে পিয়েরকে নিয়ে এল লুসিয়ঁ। ভেতরে ঢুকলে মনে হয় যেন এই ঘরের মালিক অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে, ঘরের দামী আসবাবের প্রতি কারও কোন মমতা নেই। লুসিয়ঁ থাকে তার বাপ-মার সঙ্গে, এই ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে জিনেতের জন্যে, যদিও কথায় কথায় সে বলে—'আমার ফ্ল্যাট'। এঙ্গেল্‌স্-এর একটা বই আর রঙিন সিল্‌ক্‌ দিয়ে তৈরী একটা পুতুল পড়েছিল চওড়া সোফাটার ওপর।

অনেকগুলো বোতল বার করে পানীয় তৈরী করবার কাজে লেগে গেল লুসিয়ঁ। নাটক সম্পর্কে কথা তুলল পিয়ের—সেক্‌স্‌পিয়রের উৎসাহী অনুরাগী সে।

বাধা দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'আগামী একশো বছরের জন্যে নাটক বাদ দিতে হবে। গতকাল জিনেৎকে বলতে শুনেছিলাম—আমাকে সঙ্গী করবার ইচ্ছা তোমার নাও থাকতে পারে, কিন্তু তুমি চাও আর না চাও আমি চিরকাল তোমার সেবা করব...মিরাণ্ডা এবার কথা বন্ধ করলেই ভাল করবেন, কমরেড কালিবানের যুগ উপস্থিত।'

সিগারেটটা শেষ না হতেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল, তারপর কথার সুর পালটে খানিকটা সহজ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করল—'বাবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। সব কিছু ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। আজকের এই বক্তৃতা...তা ছাড়া কয়েকদিনের মধ্যেই আমার নতুন বই বার হচ্ছে...যা হোক একটা পথ বেছে নিতে হবে আমাকে! আঁদ্রের মত

লোককে আমি সত্যি বুঝি না। বাজি রেখে খেলতে বসে 'খেলব না' বলার কোন যুক্তি নেই।'.

পিয়ের বলল, 'আঁদ্রের জন্যে ভেব না, ও আমাদের সঙ্গেই আসবে। ওকে তুমি জান না, সব কিছু ও একটু দেরিতে বোঝে,—কিন্তু চমৎকার লোক ও। তোমার অসম্ভব মনে হতে পারে, কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, প্রত্যেকটি লোককে আমরা আমাদের সঙ্গে পাব, একজনও বাদ যাবে না। এখন আমি সীন কারখানায় কাজ করছি এবং দেসেরের সঙ্গে আমার সংঘর্ষ বেধেছে। কিন্তু সত্যি অদ্ভুত লোক এই দেসের। সাধারণ-ভাবে যদি দেখ তো সে আমাদের শত্রু, মাথাওলা পুঁজিপতি। ৬ই ফেব্রুয়ারীর আগে পর্যন্ত সে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'কে সমর্থন করত। কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে কত সহজে আমরা ভুল করি...দেসের অনেক কিছু বোঝে—জীর্ণ বস্তুকে আঁকড়ে থাকবে, এত বোকা সে নয়। তুমি দেখো, এক বছরের মধ্যে সেও আমাদের সঙ্গে আসবে। ভীইয়ার ঠিক কথাই বলেছে—আমরা সমাজতন্ত্রীরা দেশের সমস্ত লোকের সহযোগিতা অর্জন করতে পারব।'

পুতুলটা হাতে নিয়ে অস্থিরভাবে নাড়া চাড়া করতে করতে লুসিয়ঁ হাই তুলল—'নিশ্চয়ই। সেজন্যে দরকার প্রথমে দেসেরকে গুলি করে মারা তারপর ভীইয়ারের ফাঁসি দেওয়া।'

রাগে জ্বলে উঠল পিয়ের, লম্বা ঘরটায় এদিক ওদিক দ্রুত পায়চারি করতে করতে বলল, 'সবাইকে শত্রু করে তুলবার পথ ওটা! তোমার জানা উচিত, সব লোক এক রকম হয় না, এক একজন এক একভাবে আমাদের কাছে আসে। আমাদের কারখানায় মিশো নামে এক মিস্ত্রী আছে, সত্যিই আশ্চর্য লোক কিন্তু বড় একগুঁয়ে। তার কাছে দেসের পুঁজিপতি ছাড়া আর কিছু নয়। কমিউনিস্টরা...'

লুসিয়ঁ বলল, 'ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারের চেয়েও কমিউনিস্টদের বেশী পছন্দ করি. ওদের সাহস ও উৎসাহ আছে। কিন্তু রাজনৈতিক আবর্তে পড়ে ওরাও ঘুলিয়ে গেছে। আসলে পপুলার ফ্রন্ট কি? সেই পুরনো রথকেই তিন ঘোড়া টেনে নিয়ে চলেছে—গাড়ীর আল ধরেছে মাঝখানের ঘোড়া ভীইয়ার, বাঁ দিকের ঘোড়া তোমার কারখানার মিস্ত্রী—আর ডান দিকের? হয়ত আমার বাবার গলাতেই ডানদিকের লাগাম

পরানো হবে। সাহস্কুতার জয়!' হঠাৎ লুসিয়ঁ হেসে উঠল—'স্কুলের ইতিহাসের শিক্ষকের কথা আমার মনে পড়ছে, তিনি একবার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলেছিলেন—অসহিষ্ণুতার জন্যে বিপ্লব ধ্বংস হয়েছিল। তখন মোটা ফ্রেদি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—আমার বাড়ীর লোকেরা আমার প্রতি বড় বেশী সহিষ্ণু, সেজন্যেই আমি ধ্বংসের পথে চলেছি। ফ্রেদিকে স্কুল থেকে বার করে দেবার কথা উঠেছিল, মনে আছে?'

অনেকদিন আগেকার সেই সব কৌতুককর কাহিনী আবার মনে পড়ল দুজনের। লুসিয়ঁ অনবরত পানীয় ঢালতে লাগল, কেমন কোমল হয়ে উঠল পিয়ের। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে পিয়ের তার নতুন পরিচিতার কথা বলতে শুরু করল।

'ওর সঙ্গে নিশ্চয়ই আলাপ কোরো। আমরা বিপ্লবের কথা বলি, দেখবে এই হচ্ছে একটি মেয়ে যে ব্যারিকেডের সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবে। ওর বাবা মজুর, জোরের সঙ্গে পরিচয় ছিল, জেলও খেটেছেন। বেলভিল-এর শিক্ষয়িত্রী ও। ওখানে ছোট-বড় সবাই ওকে কী শ্রদ্ধার চোখে দেখে! ওখানকার সব কিছুতেই ও একটা পরিবর্তন এনেছে।'

লুসিয়ঁ হাসল—'এটা কি তোমার ওপর নিয়মিত আক্রমণগুলোর একটা না সত্যি সত্যিই বিয়ে করবে বলে স্থির করেছ?'

'ঠাট্টা নয়, আমার কাছে এটা জীবন-মরণের প্রশ্ন, গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মধ্যে এখনো সেই রকম কিছু হয়নি, আনে কল্পনাও করতে পারে না...'

'জুল লাফোর্গ কি বলেছে জান,—নারী রহস্যময়ী কিন্তু প্রয়োজনীয় জীব।'

'তোমার কাছে প্রয়োজনীয়, এই বোধ হয় তুমি বলতে চাও।' ক্রুদ্ধ হয়ে পিয়ের বলল। কিন্তু আর কোন কথা সে বলল না কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে জিনেৎ ঘরে ঢুকল।

টুপি ও দস্তানা খুলে জিনেৎ আয়নার সামনে দাঁড়াল, নানা ভঙ্গীতে বেঁকে চুমড়ে নিজেকে দেখল অনেকক্ষণ, একটি কথাও না বলে একটা সিগারেট ধরাল—তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আঁদ্রেকে আসতে বললে না কেন?'

লুসিয়ঁ চটে উঠল কিন্তু একটি কথাও বলল না। একটা গ্লাশ একপাশে সরিয়ে রেখে জিনেৎ হঠাৎ পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'কি রকম অভ্যর্থনা পেলেন এখানে? এতক্ষণ কি বন্ধুর বাবার সম্পত্তির বিবরণ শুনছিলেন না বিপ্লবের বুদবুদ উঠছিল ককটেল গ্লাশে?'

মুসিয়ঁ বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেতের দিকে তাকাল।
'কি হল তোমার ? এত বিদ্রূপ কেন ?'
'বিদ্রূপ ? বিদ্রূপ নয়। বড় ক্লান্ত আমি।'
পিয়ের চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, বলল, 'এবার আমার যাওয়া উচিত, ভোর ছটায় আমাকে উঠতে হবে।'

৪

'এই তো চমৎকার একটা বেঞ্চ', উৎসাহিত হয়ে মিশো বলল পিয়েরকে।
তারপর তারা রাজনীতি আলোচনা শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই পিয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল ভীইয়ারের। একটি কথাও না বলে মিশো শুনল তার কথা। মিশোর বয়স ত্রিশ, ধূসর রঙের সংশয়ী চোখ। নীচের ঠোঁটে একটা পোড়া সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। মাথায় ক্যাপ, সার্টের হাত গোটানো। জাহাজের নোঙর আর হৃৎপিণ্ডের ছবি আঁকা উল্কি হাতে—এক সময়ে নাবিকের কাজ করত। পরিশ্রমী বলে তার সুনাম আছে কিন্তু তার জিভের ধার বড় বেশী—কারখানায় সবাই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করে তেমনি ভয়ও করে।
পিয়ের এমনভাবে কথা বলছে যেন মিশো তার চেয়ে বড়। ভীইয়ারের শেষ বক্তৃতা মিশো সমর্থন করে কিনা জানবার জন্যে পিয়ের উৎকণ্ঠিত। মিশো কোন উত্তর দিচ্ছে না।
'মনে হচ্ছে ভীইয়ারের স্লোগানগুলোর সঙ্গে তুমি একমত নও ?'
'কেন নয় ? ওগুলো তো পপুলার ফ্রন্ট-এর স্লোগান আর ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।'
'তাহলে কি তুমি ভীইয়ারকে বিশ্বাস করো না ?'
'পপুলার ফ্রন্ট-এর কথা যদি বলো তাহলে এ প্রশ্নই ওঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি ভীইয়ারকে আমার ঘড়ি বা টাকার থলে সম্পর্কে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু আমাদের আন্দোলন সম্পর্কে নয়।'
'আমি তোমাকে বুঝতে পারি না, মিশো। এই বেঞ্চটা তো তোমার নয়, আমাদেরও নয়। বেঞ্চটা 'সীন'-এর সম্পত্তি—দেসের এর মালিক। বোমারু বিমানের জন্যে অর্থাৎ যুদ্ধের জন্যে আমরা ইঞ্জিন তৈরী করছি।

অথচ এই বেঞ্চটাকে তুমি নিন্দা করো না। কিন্তু যে লোকটা তার সমস্ত জীবন আমাদের জন্যে উৎসর্গ করেছে, তার সম্পর্কে তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সে আমাদের শত্রু।'

মিশো বলল, 'এই যে কারিগরদের বেঞ্চটা, এতো শুধু দেসেরের সম্পত্তি নয়, এটা একটা যন্ত্রও—রীতিমত দরকারী যন্ত্র। বর্তমানে এই যন্ত্রের মালিক আমরা নই, ভবিষ্যতে হতে পারি সেজন্যেই এই যন্ত্রকে যত্ন করতে হবে। বোমারু বিমান সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? কার বিরুদ্ধে এবং কেমন করে? ভীইয়ারের কথা যদি বলো তো সব কিছু একেবারে স্পষ্ট। আপাতত আমরা এক সঙ্গে রয়েছি। এতে ওরও সুবিধা, আমাদেরও সুবিধা। এর পর আমরা ওকে জাহান্নমে পাঠাব বা ও আমাদের পাঠাবে, কে আগে পারবে আমি জানি না। কিন্তু একটা বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—আমরা যদি ঠিক সময়ে ওকে চেপে ধরতে না পারি তবে ও আমাদের গুলি করে মারবে। ঠিক তাই! যাক্, অনেক কথা বলেছি, এবার আমাকে হাইড্রলিক প্রেস পরীক্ষা করতে হবে।'

কাজের শেষে আনের কাছে যাবার পথে পিয়ের এই কথাগুলো আবার ভেবে দেখল। তখন দিনের শেষ, গোধূলির সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন সব কিছু অদ্ভুত ও আশ্চর্য বলে মনে হয়। দিনের বেলা যে বাড়ীগুলোর গায়ে চর্মরোগের মত কুৎসিত দাগ, এখন সেগুলো দেখাচ্ছে নীল পাহাড়ের মত। বার্ধক্য ও দুঃখের রেখায় ক্লান্ত ও বিকৃত বা স্থূল প্রসাধনের প্রলেপে কুৎসিত মুখগুলোকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। শিল্পীর মায়াস্পর্শে দৃশ্যমান জগৎ রহস্যময় হয়ে উঠেছে যেন।

মিশোর কথাগুলো বড় রূঢ় মনে হল পিয়েরের। হয়ত মিশো ঠিক কথাই বলেছে। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তো সব কিছুই অর্থহীন—সংগ্রাম, জয়লাভ, সব কিছুই। সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের মনে হল, না, ভুল বুঝেছে মিশো। ভীইয়ারের জীবনের দিকে তাকালেই তো এই সত্য প্রত্যক্ষ,—ভীইয়ারের লিজিয়ন-অব-অনার সম্মান প্রত্যাখ্যান এবং তার ওপর গোঁড়া দেশভক্তদের সেই আক্রমণ এই একটি ঘটনা মনে করাই তো যথেষ্ট। আপোষ-মনোভাবাপন্ন লোকই নয় ভীইয়ার।

মিশোকে পিয়ের ঠিক বুঝতে পারে না। মিশোর চিন্তাধারা যেমন ঘোরালো তেমনি প্রত্যক্ষ, যেন পাহাড়ে-ঝরনার মত পাথর চিরে ছুটে চলেছে। পারীতে ও মানুষ, পারীর লোকের মত অবিশ্বাসী ও অচঞ্চল। কিন্তু

পিয়েরের জন্ম রুসিয়ঁর আঙুরক্ষেত ঘেরা দক্ষিণদেশে। পেরপিঞঁার ছাপাখানায় তার বাবা কাজ করত। সেখানে মাটি লাল, আলো চোখ ধাঁধাঁনো আর তরল এনামেলের মত গাঢ় নীল সমুদ্র। পিয়ের ভালবাসত উদ্দাম হাসি, প্রবল অঙ্গভঙ্গী, উচ্ছ্বসিত কান্না, ভিক্তর হুগোর কবিতা, জ্যাকোবিনদের মত আবেগময়ী বক্তৃতা আর জীবনের প্রত্যক্ষ প্রকাশ্য রূপ।

আবছা নীলিমায় বাগানের বাদামগাছগুলো প্রায় অদৃশ্য, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বসন্তের আবির্ভাবে রীতিমত একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেছে—সেদিকে তাকিয়ে মনে মনে সে বলল, 'আমাদের জয় হবেই, কারণ, জনসাধারণ চায় সুখ, স্বাস্থ্য, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বস্ততা। কাঁচা হাতের লেখা নিজের কবিতার লাইনগুলো মনে পড়ল, 'ঝড় ও সংগ্রাম—রুটি ও জীবন...' তারপর নিজের অজ্ঞানতেই আনের চিন্তা এল—ও আজ কি ভাবে তাকে গ্রহণ করবে ?

পিয়েরের জীবন সব সময়েই উদ্দাম, আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা তার স্বভাব, কিন্তু এই মেয়েটির একাগ্র মৌন-র মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলত। 'ওকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না' মনে মনে সে বলল। মেয়েটির প্রতি তার এই প্রেম লুসিয়ঁর কাছেও সে গোপন রাখেনি, কিন্তু আনের কাছে নিজের মন খুলে ধরবার সাহস আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যেও পায়নি সে। প্রায়ই সে যেত ওর কাছে, বিভিন্ন সভা, বই আর গাড়ী সম্পর্কে অনেক কথা বলত, ওর স্কুল আর ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু হঠাৎ দুজনে চুপ করে যেত, জানলার ওপর বৃষ্টির শব্দ শুনত কান পেতে।

একদিন সাহস করে সে ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই অভিজ্ঞতা যে কি, তা কি তুমি জান ?' প্রশ্ন করবার ঠিক আগে সে কথা বলছিল হুট্ হামসুনের একটা উপন্যাস সম্পর্কে। মনে মনে তার আশা ছিল যে ও বলবে 'হ্যাঁ, এখন জানছি।' কিন্তু ও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কর্কশ গলায় বলেছিল, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে।' সেই দিন থেকে পিয়েরের কামনায় ঈর্ষা এসেছে এবং আনের বিষণ্ণতা ও নির্লিপ্ততার কারণ সে ভেবেছে তার অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্যে ওর বিরহী প্রতীক্ষা।

রু বেলভিলে আসার পর রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠতে শুরু করল। বেগুনী আলোয় উদ্ভাসিত মাংসের দোকানের জানলায় কাগজের গোলাপ

ফুল দিয়ে সাজানো শূকরশাবকের মাথাগুলো পাথরের মত দেখাচ্ছে। একটা সিনেমার দেওয়ালে কোন পেইন্ট করা সুন্দরীর ছবি, একটি নাবিকের হাত জড়িয়ে ধরে বড় বড় ফোঁটায় চোখের জল ফেলছে, চারদিকের কাফেগুলোতে কাঁচের গ্লাশের মধুর টুং-টাং আওয়াজ, বিলিয়ার্ড টেবিলের সবুজ জমির ওপর শাদা বলের ইতস্তত পরিক্রমণ। সন্ধ্যাবেলা এই রাস্তাটা রাংতা-মোড়া পাতের মত ঝলমলে ও করুণ। দু দিকে নালার মত সরু সরু অন্ধকার গলি বেরিয়েছে, মার্গারিন, পেঁয়াজ আর প্রস্রাবের দুর্গন্ধ সর্বত্র। রাস্তার ছেলেগুলো খেলে বেড়াচ্ছে সব সময়ে, গলা ফাটিয়ে পরস্পরকে গাল দিচ্ছে বুড়ীগুলো, প্রচণ্ড কলরব তুলছে একপাল ছেলেমেয়ে আর বেড়াল। পারীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম, দারিদ্র্যের তলায় রোমান্স চাপা পড়েছে—জোড়াতালি দিয়ে দিনের পর দিন সংসারের বোঝা টেনে চলা আর সাবধানী হিসাবের গণ্ডি দিয়ে প্রতিটি মুদ্রাকে বেঁধে রাখা।

একটা নোংরা গলির ভেতরে নতুন একটা বাড়ী তৈরী হয়েছে দোকানদার, কর্মচারী আর চাকুরেদের জন্যে। ছোট ছোট ফ্ল্যাট। দেওয়ালে আঁটা রংবেরঙের কাগজ আর এখানে ওখানে সাজানো কয়েকটা উদ্ভট আর্ম-চেয়ার—এটুকুই ফ্ল্যাটগুলোর অক্ষম বিলাস। বড়লোকদের বাড়ীর মত এই বাড়ীরও সাততলায় চাকরদের জন্যে ছোট ছোট ঘর। কিন্তু দোকানদার ও আপিস কর্মচারীদের বৌরা নিজেরাই রান্না করে, সুতরাং ছাদের ঘরগুলো ভাড়া দেওয়া হয়েছে গরীব নিঃসঙ্গ লোকদের। একজন বেকার দোকান সরকার, একটি বৃদ্ধা—শরীর মালিশ করা যার পেশা, একজন ব্যর্থ ব্যবসায়ী বাস করত এখানে; পিয়েরের হৃদয়জয়ী আনে লেগ্রাঁদ্‌ এখানেই ঘর ভাড়া নিয়েছিল।

আনের ঘরের ভেতর একটা ছোট ভাঁজ করা বিছানা, একগাদা স্কুলের খাতা সমেত একটা টেবিল, দুটো বেতের চেয়ার ও হাত-মুখ ধোবার জন্যে জলের কল; দেওয়ালগুলো ফাঁকা, ছবি বা ফটোগ্রাফশূন্য; বইয়ের তাকে কতকগুলো স্কুল বই, একটা অভিধান, মাদাম বোভারি ও লুই মাইকেল-এর জীবনী; জানলা দিয়ে তাকালে চাঁদ দেখা যায়—কেমন অস্পষ্ট আর অদ্ভুত চাঁদ।

আনেকে কোন রকমেই সুন্দরী বলা চলে না। উঁচু কপাল, ক্ষীণদৃষ্টি ধূসর চোখ, উঁচনো নাক, কর্মঠ রক্তিম হাত। কিন্তু তার একটা আকর্ষণী শক্তি

আছে—তার চাপা স্বভাব, তার একাগ্রতা, তার কর্মিষ্ঠ আত্মত্যাগ তাকে মাধুর্য দান করেছে। আনের হাসিটুকু নিষ্পাপ ও মধুর—সেই মেয়ের মত যে ভালবাসে অরণ্য ও পুষ্পোদ্যানের প্রভাত, সহজেই যে প্রতারিত ও ক্রুদ্ধ হয়। খুব কম সময়েই আনের মুখে হাসি দেখা যেত, কিন্তু যখন সে হাসত—সেটা আনন্দের জন্যে নয়, অন্তরের গভীর প্রশান্তির জন্যে। অত্যধিক আনন্দের মুহূর্তে তার চোখে জল আসত।

আনেকে এত বিমর্ষ পিয়ের এর আগে আর কোন দিন দেখেনি। লুসিয়ঁর বক্তৃতার কথা বলতেই আনে শুধু বলল, 'বিরক্তিকর! ওরা সবাই ওর বাবার নাম ভাঙাচ্ছে।'

পিয়ের তর্ক তুলল। লুসিয়ঁর অকপটতা, দুই যুগের পার্থক্য, প্রচারের প্রয়োজনীয়তা—এই সব কথা বোঝাতে চেষ্টা করল সে, কিন্তু আনের সেই এক কথা, 'রাজনীতি একটা খেলা, নীচ কাজ। জনসাধারণ এখনো না খেয়ে মরছে।'

পিয়ের ভাবল, 'ও বোধ হয় কোন শিল্পীর প্রেমে পড়েছে।' তার এই প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজে বার করতেই হবে তাকে।

সে বলল, 'সেই লোকটি কে আমি জানতে চাই। কার কথা বলছি বুঝতে পারছ বোধ হয়। সে কি কবি?'

'না, রাসায়নিক। কিন্তু ও কথা এখন কেন? বিশেষ করে আজকের দিনেই বা কেন? ও ছাড়াও আমার আরো অনেক দুশ্চিন্তা আছে।'

'তুমি কি ওর কথা ভাবছ?'

আনে উত্তর দিল না। পিয়েরের দিকে সে তাকাল। তার চোখের দৃষ্টিতে সাধারণত কেমন একটা অসহায় ভাব—ক্ষীণদৃষ্টি লোকের যেমন থাকে। কিন্তু সেই চোখ দুটোই হঠাৎ কঠিন ও ক্রূর হয়ে উঠেছে। শান্ত অনুত্তেজিত গলায় সে বলল, 'আজ খবর পেয়েছি স্কুলের চাকরি আমার আর নেই। এর চেয়ে গদ্যময় চিন্তা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বোধ হয়।'

'চাকরি নেই?' পিয়ের উত্তেজিত হয়ে উঠল। ছোট ঘরটার ভেতর দম বন্ধ হয়ে আসছে তার।

'কে তোমার চাকরি নিচ্ছে? কার এত সাহস? এ অসম্ভব!' চিৎকার করে বলল সে।

আনে বলল যে, সম্প্রতি মন্ত্রী-দপ্তর থেকে একটি সাকুলার জারি হয়েছিল। কোন রাসায়নিক দোকানের মালিক এই অভিযোগ জানিয়েছেন যে স্কুলে তাঁর ছেলেকে 'বিপ্লবী রচনা' লিখতে বাধ্য করা হয়েছে।

'লেখাটা আমার কাছেই আছে। পড়ে দেখ। ছেলেটির বয়স আট বছর।'

পিয়ের চেঁচিয়ে পড়ল, "আমাদের ছটা কুকুরের বাচ্চা ছিল। পাঁচটা বাচ্চা মা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলল। মা বলে যে দুধ নেই। রেনি বলছিল যে ওর একটা বোন হবে। রেনিদের বাড়ীতেও দুধ নেই। রেনির বোনকেও বোধ হয় ওরা মেবে ফেলবে। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাদের অনেক দুধ ছিল। মা বলে যে আমি যখন বড় হব, আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে। মা বলে যুদ্ধে গেলে আমি মরে যাব। আমি বল খেলতে আর ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসি।"

'আমি ছেলেদের বলেছিলাম, কি ভাবে তোমাদের দিন কাটে তাই নিয়ে একটা রচনা লেখ। কয়েকটা লেখা আশ্চর্য মনে হয়েছিল আমার, পড়ে দেখতে পার। মন্ত্রী-দপ্তরের চিঠিতে 'জাতীয়তাবিরোধী' মনোভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। স্কুলেব ইন্‌স্‌পেক্টর আজ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, তোমার শিক্ষাদানের পদ্ধতি পরিবর্তন করবে যদি এই কথা দাও, তবে তোমার চাকরি যাওয়ার ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করব। আমি রাজী হই নি।'

'এর পরেও রাজনীতির কথা শুনলে তুমি চটে উঠবে!'

'এটা তো আর রাজনীতি নয়, সত্যি ঘটনা। রাজনীতি আমি ভালবাসি না। রাজনীতির সব কিছুই রবারের মত—চেপে ধরাও যায়, টেনে তোলাও যায়। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ জানবার কোন উপায় নেই। শুধু কথা আর কথা, কিন্তু জনসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।'

'এখন তুমি কি করবে?'

'আমি সেলাই জানি। কোন দোকানে কাজ নেব।' কিছুক্ষণ পর সে আবার বলল, 'কিন্তু কি জান, ছেলেমেয়েদের পড়াতে আমি সত্যিই ভালবাসি। আমার বাবাও এইজন্যে কম ভোগেন নি। যদিও তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, কিন্তু সেই ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। রেনোর কারখানায় বাবা কাজ করতেন। একবার কারখানায় ধর্মঘট হল। অনেক

দিন ধরে চলল সেই ধর্মঘট। বাড়ীতে খাবার জোটে না এমনি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত ঘড়ি বন্ধক রেখে বাবা আমাদের খাইয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি ভেঙে পড়েন নি, হাসি-ঠাট্টায় হৈ-হল্লায় মাতিয়ে রাখতেন আমাদের। শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট ভেঙে গেল। কিন্তু আমার বাবাকে আর কাজে ফিরিয়ে নেওয়া হল না, কারণ তিনি ছিলেন 'দলের সর্দার'। সারা শীতকাল বাবা বেকার বসে রইলেন। সেলাইয়ের কল সারানো বা এই ধরনের দু-একটা খুচরো কাজ মাঝে মাঝে পেতেন তিনি। কিন্তু কারখানার কাজেই তিনি ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন, এমন কি বিনা মাইনেতেও কাজ করতে রাজী হয়েছিলেন। আমাদের কাছে প্রায়ই বলতেন যে কারখানার যন্ত্রকে ছেড়ে তাঁর পক্ষে দিন কাটানো রীতিমত কষ্টকর।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। নীচের তলায় কে যেন এক আঙুলে টিপে টিপে পিয়ানো বাজাচ্ছে। 'তুত ভা বিঁয়, মাদাম লা মারকিস'— গানটার পরিচিত সুর ভেসে আসছে বাতাসে। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে একটি ছেলের খাতার দিকে তাকিয়েছিল পিয়ের। ছোট ছেলেটি ভবিষ্যতের স্বপ্ন এঁকেছে—নীল সমুদ্র আর একটা জাহাজ। হঠাৎ মেয়েটির হাত চেপে ধরল পিয়ের।

'আনে!' ..

গত কয়েক মাস ধরে সে মনস্থির করবার চেষ্টা করেছে। কি ভাবে কথা বলবে, বোঝাবে, প্রমাণ করবে—সব কিছু মনে মনে বহুবার কল্পনা করেছে। আর এখন শুধু নামটুকু ছাড়া আর কোন কথাই তার মুখ থেকে বার হল না। কথা খুঁজে পাচ্ছে না সে। কিন্তু আনের বুঝতে বাকী রইল না। পিয়েরের হাতের মুঠোয় তার হাত কথা বলে উঠল যেন।

'ডার্লিং!...তুমি জান, কত দুঃখ আমি সয়েছি। কি করে তোমায় বোঝাব জানি না।' পিয়ের বলল।

'আর আমি ভেবেছিলাম ভালবাসার দুঃখ শুধু আমিই পেয়েছি; আমার মনে হয়েছিল আমি তোমার জীবনে সামান্য একটা ঘটনা মাত্র, অন্য কাউকে তুমি ভালবাস। কিন্তু আমার সঙ্গে কেন যে তুমি বারবার দেখা করতে আসতে বুঝতে পারতাম না।'

পিয়ানোর শব্দ বহুক্ষণ আগেই থেমে গেছে। সাততলা বাড়ীটা ঘুমন্ত, নোংরা গলিগুলো নিস্তব্ধ। যারা সিনেমায় বসে এতক্ষণ হেসেছে আর

চিৎকার করেছে, তারাও বাড়ী ফিরে এসেছে। শেষ বাস শব্দ করে চলে গেল। শুধু ছাদের ওপর চাঁদটা ঝুলছে—ভুলে যাওয়া বাতির মত এখনো নেবানো হয় নি। হঠাৎ পিয়েরের মনে পড়ল, আরো একজন প্রণয়ী ওর আছে। ও বলেছে সে রাসায়নিক। আর একটি রাসায়নিক দোকানের মালিক ওর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। দুটো ঘটনার মিলটুকু কি কিছু নয়? না, ওই রাসায়নিক দোকানের মালিকই ওর প্রণয়ী। লোকটা প্রতিশোধ নিয়েছে। কী ভীষণ লোক! নিজের ছেলের গায়ে চাবুক তুলতেও বোধ হয় বাধবে না। লোকটার নিশ্চয়ই গোঁফ আছে, পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ—আর লোকটা নিশ্চয়ই ডোরা-কাটা ট্রাউজার পরে, বোধ হয় একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লোকটা থানায় হাজির হয়েছিল। আর ঐ লোকের সঙ্গেই কিনা ও থেকেছে! পিয়ের চুপ করে রইল, কেমন বিশ্রী লাগছে তার, মাথা ঘুরছে বোধ হয়।

'পিয়ের, কি ভাবছ?'

'সেই লোকটির কথা, তুমি বলেছিলে সে রাসায়নিক।...'

'হ্যাঁ, তার নাম থিভাল। সে-ই ইন্‌স্‌পেক্টরকে জানিয়েছিল।'

'সে কথা নয়। তোমার প্রণয়ীর কথা বলছিলাম।'

'বোকা কোথাকার! কথাটা তুমি বিশ্বাস করেছিলে? তখন যে কথাটা সবচেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছিল তাই বলেছিলাম। যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে, তার কথাই ভাবছিলাম, তাই বলেছি—একজন রাসায়নিক।'

'কিন্তু সে কে?'

'তুমি। তোমার আগে কেউ ছিল না।'

দু হাতে ওকে জড়িয়ে ধরল পিয়ের। হঠাৎ সে অনুভব করল, চোখের জলে তার গাল ভিজে গেছে।

'আনে, তুমি কাঁদছ?'

'দূর!'

৫

প্রকাণ্ড ঘরটার জানলা দিয়ে তাকালে খানিকটা ফাঁকা অন্ধকার জায়গা দেখা যায়। মাঝে মাঝে ভোরবেলাও আলো জ্বালতে হয় ঘরের ভেতর। বড় টেবিলটার ওপর স্তূপাকৃত ফাইল, খবরের কাগজের কাটিং আর চিঠি। এই কাগজগুলোর তলা থেকে যে কোন জিনিস বেরিয়ে আসতে পারে—সিগারেটের টুকরো ভর্তি ছাইদানি, ডিটেকটিভ গল্পের বই, দস্তানা বা অন্য কিছু। টেবিল ও ডেস্ক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ঘরের মালিকের ইচ্ছা নয়। পুরনো যুগের এম্পায়ার আলমারি, ধাতব নলযুক্ত আধুনিক ধরনের আরাম-কেদারা, বেখাপ্পা চেয়ার—ঘরের আসবাবের ভেতর কোন সামঞ্জস্য নেই। দেওয়ালে টাঙানো মারকেতের আঁকা একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য: সবুজাভ ধূসর জলের ওপর নৌকো ভাসছে, তার পাশেই একটা মানচিত্র, আগাগোড়া লাল পেন্সিলের দাগ, বৃত্তাকার ও ত্রিভুজাকার চিহ্নের সাহায্যে তেল ও কয়লা-খনির স্থান নির্দেশ করা হয়েছে। ঘরটির মালিক পুঁজিপতি জুলে দেসের—ফ্রান্সের প্রকৃত শাসনকর্তাদের একজন।

দেসেরের বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কেমন ফাঁপা-ফুলো চেহারা, ঘন আর দীর্ঘ ভুরুর তলায় চোখ দুটো তীক্ষ্ণ। মাঝে মাঝে তাকে আরো বৃদ্ধ মনে হয়—শোথ রুগীর মত শরীর ফুলে উঠেছে, গায়ের চামড়ায় অসুস্থ বিবর্ণতা, ঝুলে পড়া কাঁধ। আবার কোন কোন সময় তাকে দেখায় যেন চল্লিশ বছরও পার হয় নি—যুবকের মত দ্রুত চালচলন, আশ্চর্য প্রাণবন্ত দুই চোখের দৃষ্টি। বেশভূষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় না সে, অত্যধিক পরিমাণে পান করে আর একটা ছোট কালচে পাইপ মুখ থেকে সরায় না কখনো।

অন্যান্য পরাক্রান্ত পুঁজিপতিদের মত জাঁকজমক পছন্দ করে না দেসের—রিপোর্টার বা ফটোগ্রাফারদের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না, রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতে সোজাসুজি অস্বীকার করে, কখনো বলে না যে রাষ্ট্রের ব্যাপারে তার কোন হাত আছে—যদিও তার অনুমোদন ছাড়া কোন মন্ত্রী সভার পক্ষে এক মাসও টিঁকে থাকা সম্ভব নয়। দৃশ্যপটের অন্তরাল থেকে অদৃশ্য হাতে সে আইন কানুনের নির্দেশ দেয়, বৈদেশিক নীতি পরিচালনা

করে, মন্ত্রীসভার নির্বাচন ও পতন ঘটায়। এই উদ্দেশ্যে যে সব লোকের সাহায্য সে নেয়, তাদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্কার দিতে ইতস্তত করে না।

দেসেরের শক্তি সঞ্চিত হয়েছে সংখ্যা থেকে—সংখ্যার সংযোগ ও বিরোধ থেকে। এই শক্তি নির্ভর করছে পুঁজির ওপর—যে পুঁজি খাটছে পোলাণ্ডের রেল-পথে, আমেরিকার তেলে, ইন্দো-চীনের রবারে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিমান কারখানার মালিক—দ্রুত যুদ্ধ প্রস্তুতিতে যার স্বার্থসিদ্ধি, শেয়ার বাজারের দালাল—হিটলারের প্রত্যেকটি যুদ্ধ বক্তৃতায় যে উল্লসিত, বক্সাইট রাজা—জার্মানীর কাছে কাঁচা মাল যে বিক্রী করে, জুতোর ব্যবসায়ীদের ট্রাস্ট—যারা স্বপ্ন দেখে জুতো-সম্রাট বাটাকে বাজার থেকে হটিয়ে দেবে আর রেনেস্‌কে হাতের মুঠোয় আনবে, উদারপন্থী সূতাকলের মালিক—যারা নিগ্রোদের নাগরিক অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত যদি নিগ্রোরা বিদেশী প্যান্ট পরে, 'কমিতে দে ফর্জ্‌'-এর পরিচালক—যারা মজুরী কমাবার জন্যে পোপের কাছে আবেদন করেছিল, মোটর-পথ ও রেল-পথের বিরোধ—যাত্রীহীন ট্রেন আর মোটরবাস কোম্পানীর অস্তিত্বলোপ, আটাকলের মালিক—কানাডার গম চালান করে যে বড়লোক হয়েছে, বস্‌-এর জমিদারদের অন্ধ দেশভক্তি—রক্ষণ শুল্ক প্রয়োগের দাবী যারা তুলেছে। বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত হৃৎপিণ্ডের মত ধুক ধুক করছে সব সময়ে।

তুলো ও দস্তার শেষ মুহূর্তের দাম দেসেরের নখদর্পণে। কোন্ মন্ত্রীকে কত দিতে হবে সব তার জানা। মৌমাছির গুঞ্জনের মত বিভিন্ন সংখ্যায় ঠাসা মাথার ভেতরটা। কিন্তু তবুও কোনদিন সে নিজের লাভ খতিয়ে দেখেনি—ভাস্কর যেমন পাথরের ওপর কাজ করে অর্থ সম্পর্কে তেমনি তার মনোভাব। ব্যক্তিগত জীবনে সে অত্যন্ত সাদাসিধে। পরিবার-পরিজন বলতে কিছু নেই, দানধ্যান করতে ভালবাসে না—তার যে কোন কর্মচারীর বেতনেই অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবে তার জীবন কাটতে পারে। রবার ও তামা তার কাছে একটা নিরাকার বস্তুস্বতন্ত্র ভাব মাত্র। সাইগন কোথায়, একথা সে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল। গম এবং যবের পার্থক্য সে বলতে পারবে না, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

পলিটেক্‌নিকাল স্কুল থেকে ডিগ্রী নেবার পর দেসের দু বছর ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেছিল। কিন্তু মনে মনে তার ধারণা ছিল যে অর্থের জন্যে তার সর্বনাশ হচ্ছে, অর্থলিপ্সার জন্যে সে কর্মজীবনের প্রতি বিশ্বাস-

ঘাতকতা করছে। পিয়ের এবং অন্যান্য ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে সে এই সব কথা বলত আর অসহায় উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করত তাদের মতামতের জন্যে। কিন্তু দাম্ভিক প্রকৃতির লোক বলে কোন দুর্বলতা স্বীকার করত না, বলত, 'আমার কথায় কান দিও না। আমার প্রকৃতি ইঞ্জিনিয়ারের নয়, শিল্পীর।'

দেসেরের মানসিক বৃত্তি স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত প্রবল। বিপদকে সে ভালবাসে। অনায়াসে সে টেস্ট পাইলট হতে পারত, হতে পারত অভিযাত্রী বা দুর্ধর্ষ বিপ্লবী। অবশ্য নিজের ব্যবসাতেও ঝুঁকি নিতে সে ভালবাসে—মেয়েলী ছলাকলার মত লণ্ডন বা নিউ ইয়র্কের শেয়ার-বাজারের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন, গতকালের বন্ধুর বিরুদ্ধে গতকালের শত্রুর সঙ্গে মিতালি, কূটনৈতিক আলোচনায় ভাঙন, এক কথায় এমন সব ঝুঁকি যেখানে সহজেই হিসাব ভুল হতে পারে।

এই ধরনের লোকের পক্ষে ফ্যাশিস্ট মতবাদ গ্রহণ করা আশ্চর্য নয়—ফ্যাশিস্টদের অদৃষ্টবাদ, এ্যাডভেঞ্চার প্রীতি ও সর্বনেশে প্রতীক সহজেই এদের আকৃষ্ট করে। ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দেসেরও প্রচুর অর্থ দিয়েছে 'ক্রোয়া দ্য ফ্য'-র নেতাদের। অবশ্য এই অর্থদান দেসেরের কাছে জুয়ার চালের মত, সে চেয়েছিল মন্ত্রীসভার পতন। তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পর সে তার বন্ধু ব্রতৈল্‌কে শান্তভাবে বলেছিল, 'আজ থেকে আমার ঠিকানা ভুলে যেও।' পার্লামেন্টের গবীমহলের সর্বশেষ চমকপ্রদ খবর—এবার দেসের বামপন্থীদের দিকে ঝুঁকেছে, এমন কি ভীইয়ারের সঙ্গে তার দহরম-মহরম চলছে রীতিমত। প্রকৃতপক্ষে দেসের র‍্যাডিকাল-সমাজতন্ত্রী দলের পক্ষপাতী। এই বিরাট 'সাধারণ লোকের' দলে জড় হয়েছে বড় বড় ব্যবসায়ী, ছোটখাটো ভাটিখানার মালিক, বিখ্যাত অধ্যাপক আর অর্ধ-শিক্ষিত দোকানদার। অসংখ্য বক্তা এই দলে, তারা যেখানে সেখানে দাতঁ বা গ্যামবেতার মত বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এই র‍্যাডিকাল দলটি সব চেয়ে বেশী ভয় করে র‍্যাডিকাল কাজকর্মকে। মর্যাদা বা কর্মক্ষমতার মাপকাঠিতে দেসের 'সাধারণ লোক' নয়, কিন্তু ফ্রান্সের মাটি ও বাতাসের মত সে ভালবাসে এই দলটির নিরীহ জ্যাকোবিনদের আলাপ আলোচনা এবং ধীর ও কষ্টসাধ্য কাজকর্ম। নিজেকে সিনিক বলে প্রচার করে দেসের, তা সত্ত্বেও একটা স্পষ্ট রাজনৈতিক আদর্শ আছে তার। ফ্রান্সকে সে রক্ষা করবে, যে ফ্রান্সকে সে ছেলেবেলা থেকে চিনেছে—ফ্রান্সের

প্রাচুর্য আর অবিচ্ছিন্নতা; পারিবারিক জীবনের দৃঢ় ভিত্তি, তার মধুর সম্পর্ক, প্রেমের চেয়েও তীব্রতর ঈর্ষা, সম্পত্তি লাভের জন্যে স্মরণীয় বিরোধ; ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলের মধুর ক্লান্তি; গৃহকর্ত্রীদের উৎকণ্ঠাহীনতা, মিতব্যয়িতা, এমন কি নীচতা; ফ্রান্সের লোকের শ্রমশীলতা—ধনী বৃদ্ধেরও নিজের হাতে সব্জি-বাগান তৈরী করা, মাছের জাল সারানো; আবেগপ্রবণতা—একটিও মাছ ধরবার আশা না রেখে ছিপ ফেলে বসে থাকা; ক্ষেতের মিষ্টি মটর আর সবুজ মটর—পৃথিবীর অন্য কোথাও যা হয় না; চেম্বারের খাবার ঘরে বিশ্ব-রাজনীতি আলোচনা আর ক্ষুধা উদ্রেককারী সুরা সম্পর্কে চুলচেরা তর্ক; পৃষ্ঠপোষকতার অধিকার, তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক নিশ্চয়তা, গোষ্ঠিবদ্ধতা যা উঁচু রাজনীতিতেও আরাম ও ঘনিষ্ঠতর আবহাওয়া এনেছে; চরিত্রের কঠোরতা যা ঈশ্বর, ওষুধ, ফ্রান্স, এমন কি নিজের স্ত্রীকেও অব্যাহতি দেয়নি।

অবশ্য দেসেরের এই মনোভাবের মূলে রয়েছে তার বাল্যজীবন। নিউ ইয়র্ক, এমন কি মেলবোর্নেও সে পরিচিত, কিন্তু তার বাবা ছিলেন সামান্য লোক, আঁজের-এর একটি ছোট কাফের মালিক—'লে রঁদেভু দেসামি' পার্লামেন্টের নির্বাচনপ্রার্থীরা এখানে তাদের প্রচারকার্য চালাত, বৃদ্ধ লোকেরা আলোচনা করত গত শতাব্দীর নানা ভয়ংকর ঘটনা—বন্যা, চিড়িয়াখানার শেকল-ছেঁড়া বাঘ, যুদ্ধ—আর গ্যাসের স্পষ্ট আলোয় যুগল তরুণ তরুণীরা গভীর আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরত পরস্পরকে। দেসেরের বাবা ছেলের ঐশ্বর্য দেখে যেতে পারেন নি, গত যুদ্ধে টাইফাস রোগে তিনি মারা যান। কিন্তু লক্ষপতি হবার পরেও দেসের শৈশবের অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেনি—বাগানের পুরনো মালীর সঙ্গে দাবা খেলতে এখনো ভাল লাগে তার, খাবার সময় এখনো সে মাংসের ঝোলের একটুও অবশিষ্ট রাখে না—রুটিতে মাখিয়ে সবটা তুলে নেয়। কোন কোন রবিবার সে আসে শহরের বাইরের গ্রামাঞ্চলে, মার্ন ও সীনের ধারে ধারে কাফেগুলো মনে করিয়ে দেয় রঁদেভু দেসামির স্মৃতি, কোট খুলে হঠাৎ সে নাচতে শুরু করে কোন ঘর্মাক্ত মেয়ের হাত ধরে।

পারীর কাছে দেসেরের ছোট একটা জমিদারী আছে, সেখানে সে থাকে। ভোরবেলা ওঠে সে, টমাটো, পনীর আর এক গ্লাশ মদ নিয়ে বসে প্রাতরাশ খাবার জন্যে, খবরের কাগজ পড়ে, তারপর রওনা হয় পারীর দিকে। যাবার পথে রাস্তায় স্কুলের ছেলে-মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হাসে, কুকুর দেখলে শীষ দেয়, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ভুলে যায় সব কিছু—তখন মাথার ভেতর সংখ্যা ছাড়া

আর কিছু থাকে না। সকালের ডাকে চিঠি, কেব্‌ল্‌, গোপন সংবাদ অনেক কিছু আসে, তাই নিয়ে সে ব্যস্ত থাকে দশটা পর্যন্ত তারপর দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করে একে একে। পারীর মন্ত্রী, কূটনীতিক, পুঁজিপতি—সকলেরই ঘন ঘন যাতায়াত আছে এখানে, ডেন্টিস্টের মত সাজানো এই ঘরটির সঙ্গে সকলেই বিশেষভাবে পরিচিত।

সেদিন সকালে পিয়ের যখন এল, তার আগে থেকেই দুজন ব্যাঙ্কার ও রুমানিয়ার দূতাবাসের পরামর্শদাতা অপেক্ষা করছিল দেসেরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। পিয়েরের কেমন মনে হল যে ওরা জানে কেন সে এসেছে। সন্ত্রস্তভাবে সে খবরের কাগজটা খুলে ধরল এবং জেনেভা-প্রস্তাবের ওপর একটা প্রবন্ধে ডুবে থাকবার ভান করল।

'মঁশিয় পিয়ের দ্যুবোয়া' চাপা গম্ভীর গলায় ঘোষণা করল দেসেরের চাকর। প্রথমে পিয়েরের সঙ্গেই দেখা করছে দেসের। পিয়েরকে তার ভাল লাগে, ভাল লাগে পিয়েরের দক্ষিণাঞ্চলীয় উচ্ছ্বাসপ্রবণতা, তার নিরীহ কথাবার্তা, আর বিশেষ করে তার দারিদ্র্য। পিয়ের কৃতী ইঞ্জিনিয়ার, কোনরকমে তার দিন চলে—পিয়েরকে দেখলে নিজের যৌবনের কথা মনে পড়ে দেসেরের। তাছাড়া, পিয়েরকে প্রথমে ডেকে পাঠাবার আর একটা উদ্দেশ্য—ব্যাঙ্কার ও কূটনীতিকদের জানিয়ে দেওয়া যে তারা দেসেরের কাছে অতিথির মত নয়, অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র।

পিয়েরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল দেসের। কি ভাবে কথা আরম্ভ করবে ভেবে না পেয়ে একটু ইতস্তত করল পিয়ের, তারপর অসংলগ্ন ও এলোমেলো ভাবে দেসেরকে সে জানাল আনের চাকরি যাবার কাহিনী।

'ও আমার বন্ধু, এ প্রশ্ন এখানে ওঠে না। অবশ্য আমি বলছি না যে ওর চাকরি থাকুক বা না থাকুক তাতে আমার কিছু আসে যায় না। কিন্তু এটা সত্যিই খুব অবিচার হয়েছে।'

দেসের হাসল, 'শোন বন্ধু, পৃথিবীতে ন্যায়বিচার বলে কিছু নেই। যাই হোক, তোমার এই তরুণী বান্ধবীটির চাকরি যাতে না যায় সে ব্যবস্থা আমি এক্ষুনি করছি।'

টেলিফোনটা তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল সে।

'মঁশিয় তেসার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই। আমি, দেসের কথা বলছি। তারপর, কেমন আছ? তোমার স্ত্রীর খবর কি? বেশ, বেশ, ধন্যবাদ।

হ্যাঁ শোন, আমার জন্যে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে। আজ পরিষদ সভায় তোমার সঙ্গে তো মন্ত্রীদের দেখা হবে, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ। ব্যাপারটা কিছু নয়, আনে লের্জাঁদ্র্ নামে একটি শিক্ষয়িত্রীকে 'জাতীয়তা বিরোধী শিক্ষাদানের' জন্যে বরখাস্ত করা হয়েছে। আচ্ছা কি মানে হয় এসবের! তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ। আর নির্বাচনের সময় এসব দিকে নজর দিতে নেই। এভাবে এগিয়ে চললে কোনদিন বলে বসবে যে আমরাও এ্যানার্কিস্ট, বা কবলেনৎস-এর বিশ্বাসঘাতক। চমৎকার! আচ্ছা আজ বিকেলে কি তোমার সময় হবে? তোমার সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা করবার আছে। চমৎকার! ঠিক একটার সময় আমি তোমায় উঠিয়ে নিয়ে যাব।'

তারপর পিয়েরের দিকে ঘুরে সে বলল, 'আর কোন গোলমাল হবে না। শ্রীমতী লের্জাঁদ্র্ যেমনভাবে খুশি শিক্ষাদান করতে থাকুন, তাঁর শিক্ষায় ছেলেমেয়েরা যা খুশি হয়ে উঠুক—কমিউনিস্ট বা টলস্টয়পন্থী বা বর্বর, বা যা হোক একটা কিছু। হ্যাঁ, তোমরা কি বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ?'

'না। মানে, তা হ্যাঁ। আমি জানি না। একথা কেন তোমার মনে হচ্ছে?'

'আজ সন্ধ্যায় তোমার কোন কাজ নেই নিশ্চয়ই। আমার এখানে এস। আজ রাত্রিটা আমি শহরে কাটাব। তুমি এলে খানিকটা গল্পগুজব করা যাবে। আচ্ছা, এবার আমাকে তিনটি পাগলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। পোলাণ্ডের ঋণ সম্পর্কে ওরা কথা বলতে এসেছে। ওদের বলে দিতে হবে, 'ভুল ঘোড়ার ওপর তোমরা বাজি ধরেছ'। প্রথমত, ফরাসীদের কাছে ডানজিগের দাম কড়ে আঙুলের সমানও নয়। দ্বিতীয়ত, পোলদের বিশ্বাস নেই, ওরা একেবারে চোর। আর ওই কুটনীতিককে দেখেছ তো? উনি হচ্ছেন গিয়ে তোমার ওই ক্ষুদে মাসতুতো ভাইদের একজন। ওদিকে হাবসীদের তো ইতালিয়ানরা গিলে বসে আছে। ওদের মুখে হয়ত বলকান্‌কেও ছেড়ে দিতে হবে—আমরা শান্তি চাই। আচ্ছা, সন্ধ্যার সময় আবার দেখা হবে।'

৬

ডেপুটি পল তেসার পেটুক বলে খ্যাতি আছে, দেসের তাকে নিয়ে ঢুকল হালে'র কাছে 'দগার্নো'তে। বাইরে থেকে বিশেষ জাঁকজমক নেই রেস্তোরাঁটার, কিন্তু এখানকার মত কাটলেট আর মদ পারীর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। মাংস-বিশেষজ্ঞ বড় বড় পশু-ব্যবসায়ীরাও এখানে আসে লাঞ্চ খাবার জন্যে। দেওয়ালের গায়ে একটা বোর্ড ঝোলানো, মাংসের বাজার দর আর বিক্রীত মাংসের পরিমাণ লেখা তার ওপর। বহু ধরনের লোকের যাতায়াত এখানে, খুঁতখুঁতে পেটুক, ভোজনবিলাসী ক্লাবের সভ্য আর মাংস বিক্রেতাদের কর্কশ ব্যবহার ও চড়া দামের জন্যে বিরক্ত স্নব।

খাবারের তালিকাটা মনোযোগ দিয়ে পড়ে অয়েস্টার, ঈল স্যুপ, কক ও ভ্যাঁ আর কাটলেট আনবার আদেশ দিল দেসের। খাবারের নাম শুনে জিভে জল এল তেসার, হেড ওয়েটারকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা কাটলেটের সঙ্গে সেই ব্রেন-সসও দেওয়া হবে তো?'

'নিশ্চয়ই, মঁশিয় তেসা।'

পেটুকের মত খাওয়া সত্ত্বেও পল তেসা রোগা। লম্বা বিবর্ণ মুখ, তীক্ষ্ণ চিবুক আর খাড়া নাক, দেখে মনে হয় অসুস্থ বা কৃচ্ছ্রসাধক। কিন্তু আসলে সে প্রবলভাবে প্রাণবন্ত, এমন কি উদ্দাম। চেম্বারের খাবার ঘরে যদি ফিসফিস কথাবার্তা আর ফেটে-পড়া হাসি শোনা যায় তাহলে বুঝতে হবে কোন অবিবেচক আটান্ন বছরের বুড়ো পল তেসার স্ত্রীলোক-ঘটিত কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দিয়েছে। নিজের মোটা বৌ আর দুটি ছেলেমেয়ের প্রতি সে অত্যন্ত অনুরক্ত। ছেলে লুসিয়ঁর জন্যে তেসার দুর্ভোগের সীমা নেই। মেয়ের নাম দেনিস— বনো ছাত্রী, লাজুক ও সুন্দরী। মেয়েটির প্রতি রীতিমত একটা শ্রদ্ধার ভাব আছে তেসার। অপেরা-গায়িকাদের আসর থেকে হঠাৎ উঠে এসে শোবার ঘরে ঢুকবার সময় তেসার মনে এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য থাকে না; শোবার ঘরে একগুলো পেতলের মদন-মূর্তি সাজানো আর দুজনের বিছানা ক্রুশের নীচে বেদীর মত।

চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকলেও তেসার কথাবার্তায় একটা আকর্ষণী শক্তি ও ঝংকার আছে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে সে, ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বক্তাদের মধ্যে একজন ধরা হয় তাকে। রাজনীতিতে সে ঢুকেছে অপেক্ষাকৃত দেরিতে, প্রথমে আইন-জীবী হিসেবে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। অর্থলোভী নির্বোধ হত্যাকারীর

পক্ষ সমর্থন করতে উঠে বিচলিত স্বরে সে বলতে পারে, 'ভদ্রমহোদয়গণ, দেখুন একটি স্বপ্নপ্রবণ মনের আত্মগ্লানির কী পরিণতি!' জুরীদের চোখে জল আসে এবং আসামীর পক্ষে নির্দোষ রায় দেয়।

র‍্যাডিকালদের পক্ষ থেকে পশ্চিমের একটি বিভাগে তেসা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। জয়লাভ করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি তাকে। নির্বাচনে দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তার; একজন কমিউনিস্ট—রেলওয়ে ইয়ার্ডের কামারশালার মিস্ত্রী, একটু তোতলা, বক্তৃতায় বড় বড় প্রতিশ্রুতি না দেবার দিকে ঝোঁক; আর একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক সেনাপতি—নাবালকদের বেত্রদণ্ড দেবার দাবী নিয়ে সে দাঁড়িয়েছিল। চেম্বারের ভেতর তেসা বিশেষ কথাবার্তা বলত না। দু বার সে মন্ত্রীপদ প্রত্যাখ্যান করেছে। র‍্যাডিকাল দলের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা নেই, সুতরাং মন্ত্রীপদ গ্রহণ না করে উপযুক্ত সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে তার মনে হয়েছে। লবী-মহলে এমন কথাও উঠেছে যে তেসা র‍্যাডিকালদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন দক্ষিণপন্থী গ্রুপে যোগ দেবে।

চেম্বারের ডেপুটিপদ তেসার কাছে নতুন নতুন আয়ের পথ খুলে দিয়েছে। কন্ট্রাক্টর ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের কাছ থেকে সে টাকা নেয়, মোটা দক্ষিণা পেলে লিমিটেড কোম্পানীর ডিরেক্টর হতেও আপত্তি নেই। ভেনিজুয়েলার খনি, মার্তিনিকের বাগান—এই ধরনের বহু সন্দেহজনক ব্যবসায় কার্যে সে তার নাম ধার দিয়েছে। তেসা অর্থলোভী নয়, কিন্তু স্বচ্ছলভাবে থাকতে সে ভালবাসে। পরিবারের বা নিজের রক্ষিতার কোন দাবী সে অপূর্ণ রাখে না এবং সহজেই ঋণে জড়িয়ে পড়ে।

'সমগ্র পারী' তেসার জানা, হাজার হাজার লোকের সঙ্গে তার 'তুমি' সম্পর্ক। বিদেশী-দূত আর এটর্নিদের প্রায়ই সে ভোজ-সভায় আমন্ত্রণ করে, সাংবাদিকদের ঘুষ দেয়, নির্বাচক-মণ্ডলীর নানা অনুরোধ স্বেচ্ছায় পালন করে—হয়ত স্থানীয় শুল্ক পর্যবেক্ষকের জন্যে মন্ত্রী-দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন সম্মান-পদকের ব্যবস্থা করে, বীর সৈনিকের বিধবা স্ত্রীর জন্যে তামাকের দোকানের লাইসেন্স করে দেয়, ধাপ্পাবাজের বিরুদ্ধে ঝোলানো মামলা চেষ্টা করে তুলিয়ে নেয়।

একটা অয়েস্টার মুখে দিয়ে এক ঢোঁক মদ গিলে তেসা বলল, 'যে তরুণী শিক্ষয়িত্রীর কথা বলেছিলে, সে কি কমিউনিস্ট?'

'জানি না। কিন্তু যাই হোক না কেন সে নিশ্চয়ই তৃতীয় রিপাব্লিকের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক নয়।'

'তুমি একটি সিনিক। এখানকার শাদা মদটা কিন্তু চমৎকার! তাহলে তোমার মতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। কথাটা ভুল। আমার মনে হয় আগামী নির্বাচনে সব কিছু উল্‌টে যাবে! র‍্যাডিকালরা তো আত্মহত্যা করতে বসেছে। আর পপুলার ফ্রন্ট যদি জেতে, তবে তো তাদের গিলে ফেলা হবে—ঠিক এইভাবে,' বলেই সে একটা অয়েস্টার গিলে ফেলল, 'আইন পরিষদের ব্যাপারেও এই চালের কাছে সবাই হার মেনেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এর বিরুদ্ধে, আগামী নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল হিসেবে আমি দাঁড়াচ্ছি কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে...' অয়েস্টারের ওপর লেবুর রস টিপে নিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বলল, 'এবার আমি নির্বাচিত হতে পারব কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'তুমি কি নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছ?' দেসের জিজ্ঞাসা করল।

'আগামী শনিবার প্রথম সভা ডাকা হয়েছে। আজই আমি রওনা হব।'

'তাহলে আর কোন ভয় নেই, সব ঠিক আছে।'

'তার মানে? কি ঠিক আছে?'

'মানে খুব সহজ। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে তোমাকে বক্তৃতা দিতে হবে।'

হাতের একটা ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ন্যাপকিনটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গীতে তেসা চিৎকার করে বলল, 'অসম্ভব। এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। মৃত্যু বা সর্বনাশ বা অন্য যা কিছু হোক, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই নয়! পপুলার ফ্রন্ট ফ্রান্সের চিরকেলে শত্রু। ওই ব্লুম, ওর নামটা পর্যন্ত ফরাসী নয়, কী ধূর্ত আর খুনে লোক; তারপর ওই দরময়, কী ভীষণ কুচক্রী; মশ—সুযোগ পেলেই ও ফ্রান্সের যানবাহন ব্যবস্থা ধ্বংস করবে; মনে—কৃষির এত বড় শত্রু আর নেই; আর আছে ভীইয়ার—হিটলারকে দেখেও ওর শিক্ষা হয়নি, বলে কিনা নিরস্ত্রীকরণের নীতি মানতে হবে; এই ভীইয়ারই...'

'ভীইয়ারের কথা বাদ দাও। বোকার মত বেশী কথা বলে ও। ওর জন্যে ভেব না, ওকে মন্ত্রী করে দাও—দেখবে ঠিক হয়ে গেছে।'

'কিন্তু কমিউনিস্টরা?'

দেসের বলল, 'ফ্রান্স ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দেশ—মহাজন, দোকানদার আর চাষী। তবুও দু-একজন কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট দেয় কেন? কারণ, কাউকে হয়ত বেশী ট্যাক্স্ দিতে হয়েছে, কারও ছেলে হয়ত স্কুলে ভর্তি হবার সুযোগ পায়নি—কমিউনিস্টদের পক্ষে ভোট দিয়ে এরা প্রতিবাদ জানায়, আর কিছু নয়।'

তেসা চুপ করে রইল, ঈল স্যুপ নিয়েই সে ব্যস্ত।

দেসের বলে চলল, 'তুমি কি মনে করো কমিউনিস্টরা তোমাকে বিশ্বাস করবে? কক্ষনো না। কিন্তু তবুও নির্বাচনে তুমি তাদের সমর্থন পাবে—যুদ্ধের কৌশলই এই। আমরাই বা বোকা হতে যাব কেন? পপুলার ফ্রন্টকে ওরা সংগঠিত করেছে এই উদ্দেশ্যে যে দক্ষিণপন্থীদের প্রথমে ওরা ধ্বংস করবে। আমাদের ওপর আক্রমণ আসবে তার পরে। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির কাছে ওরা হেরে যাবে। নির্বাচনে আমরাও দক্ষিণ-পন্থীদের নিশ্চিহ্ন করে দেব এবং আমাদের শক্তির কাছে কমিউনিস্টরাও তখন হটে যেতে বাধ্য হবে।'

'এই ঈল স্যুপটা সত্যি চমৎকার! কিন্তু জুল আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, দক্ষিণপন্থীদের কেন নিশ্চিহ্ন করতে হবে?'

'কারণ, আমরা যদি আঘাত নাও করি, তাহলেও ওদের অস্তিত্ব থাকবে না। রাজনীতির গতি পেণ্ডুলামের মত—একবার বাঁ দিকে দুলছে, তারপর ডানদিকে আবার বাঁ দিকে। আমাদের শুধু এটুকু দেখতে হবে যে পেণ্ডুলাম যেন একই দিকে বড় বেশী চলে না যায়। ১৯২৪ সালে বামপন্থীরা জয়লাভ করেছিল। তার ফলে 'কার্তেল' ব্যবস্থা চালু হল, স্মৃতি মন্দিরে পাঠানো হল জোরের মৃতদেহ এবং লাল ঝাণ্ডা দেখা দিল দিকে দিকে। দু বছর পরে র‍্যাডিকালরা দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠল, তখন ক্ষমতা এল পোঁয়াকারের হাতে। ১৯৩২ সালে নির্বাচন কার্যকরী হতে পারল না, তাই কোন মন্ত্রীসভার পক্ষেই টি‍ঁকে থাকা সম্ভব হয়নি। কিন্তু দেশে দক্ষিণপন্থী মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল। ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে রু স্যাঁ জেরম্যাঁতে রোজ মিছিল বার হত। 'ডেপুটিরা নিপাত-যাক!' এই ছিল তখনকার স্লোগান। কোন্ দক্ষিণ-পন্থীদের ওপর সব চেয়ে বেশী আক্রমণ এসেছিল? র‍্যাডিকালদের? স্টাভিন্স্কি-সংক্রান্ত ব্যাপারে ওরা কি তোমাকে জড়িত করবার চেষ্টা করেনি? তারপর এল রক্ত-চিহ্নিত ৬ই ফেব্রুয়ারী। ফ্রান্সের বাইরে সকলেই ভেবেছিল

যে এখানে এবার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু রাজনীতির পেণ্ডুলাম গতি পরিবর্তন করল অপ্রত্যাশিতভাবে। ৯ই ফেব্রুয়ারী বেরিয়ে এল কমিউনিস্টরা। মাঝামাঝি একটা পথ পাওয়া গেল যখন ছুমের্গ হঠাৎ মাথা তুলে শক্ত হাতে চেপে ধরল পেণ্ডুলামটা। পেণ্ডুলাম থেমে যায়নি, গভীরতর প্রদেশে এসে ধীরগতি হয়েছে, ফিরে আসতে এখনো অনেক দেরি। সুতরাং পপুলার ফ্রন্টকে জিততেই হবে। এবং জিতবেও। কিন্তু আমাদের সাহায্য নিয়ে যদি পপুলার ফ্রন্ট জেতে তবে আর এক বছরের মধ্যেই র‍্যাডিকালরা দক্ষিণপন্থী হয়ে উঠবে এবং আবার তিন চার বছরের জন্যে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু এস এবার একটু বোর্দো মদ ঢেলে নেওয়া যাক।'

তেসা বলল, 'তাহলে কথাটা দাঁড়াল এই যে, আমাকে জিততে হলে শত্রুপক্ষের দলে যোগ দিতে হবে।'

'একটা চলতি কথা আছে—পাত্রের মদ ফেলে রাখা চলে না। সেজন্যে মাঝে মাঝে মদের সঙ্গে জল মেশাতে হয়। অবশ্য এই "মুতোঁ-রথস্‌চাইল্ড"-এর সঙ্গে নয়...'

কক্ ও ভ্যাঁ দেওয়া হল। রাজনীতির সমস্ত দুঃখ ভুলে গেল তেসা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে সমস্ত মনোযোগ দিল খাবারের ওপর।

দেসের বল্‌ল, 'বলতে পার, এখানকার মত এত ভাল কক্ ও ভ্যাঁ আর কোথাও পাওয়া যায় না কেন? আমাদের কপাল খারাপ, তাই মোরগ জুটেছে, বুড়ো মোরগের শক্ত মাংসকেও মদের সঙ্গে রান্না করে চমৎকার খাদ্যে পরিণত করবার কায়দা এদেশের লোকের জানা আছে। মোরগের চেয়ে মুরগীর মাংস অনেক বেশী ভাল, 'দোগার্নোর' কক ও ভ্যাঁ এত ভাল হবার আসল কারণ এই, কক্ ও ভ্যাঁ আসলে মোরগের মাংস নয়, মুরগীর। মুরগীর মাংসকে মোরগ বলে চালাবার কারণ কি? কারণ, বিনয়। অহংকারও হতে পারে। যাই হোক না কেন, ব্যবসাদারী চাল এটা।' দেসের হাসল, তারপর আবার বল্‌ল, 'এই উদাহরণটি অনুসরণ করা ছাড়া তোমাকে আর কিছু করতে হবে না। আসলে তুমি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকাল, কিন্তু তোমাকে জাতীয় ফ্রন্টের সমর্থক হিসেবে চালানো হবে। এর নাম বিনয়। বা অহংকার...'

'এসব তো শুধু জল্পনা-কল্পনা। শেষ পর্যন্ত আমি নির্বাচিত হব কিনা,

সেটাই আসল কথা। ভালভাবে নির্বাচনী প্রচার চালাবার মত সময় আমার নেই, সামর্থ্যও নেই।'

'সময় তোমাকে চেষ্টা করে করে নিতে হবে। ফ্রান্সের সেবা করবার ইচ্ছা যখন তোমার আছে, সে চেষ্টা তোমাকে করতেই হবে। আর সামর্থ্য সম্পর্কে ভেব না, তোমার নির্বাচনী প্রচারের সমস্ত খরচ আমি দেব।'

দেসেরের কৌশল তেসার ভাল লাগেনি, কিন্তু এই প্রস্তাবে সে খুশি হল, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ আবার কাল হয়ে গেল: যাই হোক না কেন নিজের গাম্ভীর্য তো বজায় রাখতে হবে। টেবিলের ওপর কাটলেট আর ব্রেন-সসের আবির্ভাব তাকে খুশি করে তুলল আবার। তারপর এল বারগাণ্ডি, গোলাপী আভা ফুটে উঠল তেসার স্বাভাবিক বিবর্ণ গালে। কোন একটা হাল্‌কা বিষয়ে কথা বলবার ইচ্ছা হল তার—তার রক্ষিতা অভিনেত্রী পলেতের কথা বা এই ধরনের অন্য কোন কিছু। কিন্তু দেসেরের কাছে নিজের উল্লাস গোপন রাখবার জন্যে সে পারিবারিক অশান্তির কথা বলতে শুরু করল।

'আমার ছেলে লুঁসিয়ঁ খুব খারাপ একটা বক্তৃতা দিয়েছে,' কান্নার সুরে সে বলল। সে সত্যিই দুঃখ পেয়েছে না শুধু মাত্র অভিনয় করছে বোঝা গেল না, 'কাগজে আমার নামে যা-তা লেখা হচ্ছে। ওর সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছিলাম। ও কি বলল জান? বলল—এটা হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রাম। কী ভয়ানক কথা, আমার ছেলে শেষকালে আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল!'

'কোন চিন্তা কোরো না। লুসিয়ঁ জমি তৈরী করছে। শ্রেণী-সংগ্রামই যদি হবে তো ও তোমার পয়সায় থাকবে কেন? তুমি দেখে নিও ও খুব তাড়াতাড়ি ডেপুটি হবে, এমন কি জাতীয়তাবাদী র‍্যাডিকালও হতে পারে। কিছুক্ষণ আগে 'মাক্‌সিম্‌'-এ ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে ছিল ওর সঙ্গে।'

'মাকসিম্‌-এ লুসিয়ঁ? ওই হতচ্ছাড়ার আর কিছু হবে না। ত্রিশ বছরের ধাড়ী, এখনো এক পয়সা রোজগার করতে পারে না। যত আজে-বাজে লেখা নিয়েই ব্যস্ত। ওর মত ছেলে এ্যানার্কিস্ট হতে পারে, গুণ্ডা-সর্দার হওয়াও আশ্চর্য নয়। ভালমন্দ কিছু বোঝে না। হ্যাঁ, দেনিস কিন্তু চমৎকার মেয়ে। রীতিমত কাজের মেয়ে। নীরস একটা বিষয় নিয়ে ও পড়ছে, বিষয়টা বোধ হয় রোম-স্থাপত্য। কিন্তু সমস্ত বিষয়ে ওর গভীর নিষ্ঠা। এই পনীরটা তুমি খেয়ে

দেখেছ ? চমৎকার গন্ধ। আঃ, আর দশটা বছর যদি কোন রকমে শান্তিতে কাটানো যেত। আমার ভয় হয় সব কিছু ভেঙে পড়বে বোধ হয়। পপুলার ফ্রন্ট যদি জেতে, যুদ্ধ অনিবার্য।'

'বোধ হয় না। মিত্র ছাড়া যুদ্ধ সম্ভব নয়। জার্মানীকে আমরা ভয় দেখাচ্ছি, কিন্তু ইতালীর মন জুগিয়ে চলছি। 'বৃটিশরা মুসোলিনীকে তোষণ করছে কিন্তু হিটলারকে কোন কথা বলছে না। এক কথায় তোষণ নীতি মেনে চলতে হবে আমাদের।'

'অসম্ভব, আলসাস ছেড়ে দিতে ফ্রান্সের একটি লোকও রাজী হবে না।'

'আলসাস কেন ? রুদে বন্ধুরা রয়েছে। ওদের খাওয়াচ্ছি পরাচ্ছি কি জন্যে ? যদি কিছু হয়, চেক্‌দের প্রথমে উৎসর্গ করব, তারপর পোলাণ্ড—পোলাণ্ডকেও ঘুষ হিসেবে ব্যবহার করা চলতে পারে।'

'কিন্তু সে আর কতদিন ? পাঁচ বছর, বড় জোর দশ বছর।'

ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে লাভ কি ? বর্তমানে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে হবে, ফ্রান্সের শান্তি আর সম্পদ রক্ষা করতে হবে সেটাই বড় কথা।'

'তোমার কাছে বড় কথা হতে পারে কারণ তোমার ছেলেমেয়ে নেই। দেনিস আর লুসিয়ঁর কথা ভাবতেও ভয় হয় আমার।' কথাগুলো তেসা বলল; বলতে ভাল লাগল বলে।

কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে মনে মনে হেসে উঠেছে সে। তার নির্বাচনী প্রচারের সমস্ত খরচ দেসের দেবে, তার মানে সে আবার ডেপুটি হতে পারবে। আব ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার যে সমস্ত চিন্তার কথা সে বলল, সেগুলো আর কিছু নয়, চমৎকার একটা লাঞ্চের সঙ্গে একটু বিষণ্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করে নেওয়া মাত্র।

দেসের তার দিকে তাকাল। তেসার চোখ দুটো ঘোলাটে, উঁচু নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে আত্ম-সন্তুষ্টির হাসি। তেসাকে একটু চটিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারল না দেসের, বল্‌ল, 'তোমার ছেলেমেয়ের জন্যে ভবিষ্যতে কি আছে জানতে চাও ? হয়ত স্বর্গ সৃষ্টি হবে—পীকক্ ও ভ্যাঁ, গুয়াদেলুপ-এ বিমান-ভ্রমণ। কিংবা হয়ত আগেকার মতই যুদ্ধ, শ্রমিক-শিবির, বন্দীশালা, মৃত্যু। খুব সম্ভব শেষেরটাই হবে। কিন্তু তোমাকে হতাশ হলে চলবে না, এখন তুমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। সভায় দাঁড়িয়ে তুমি যখন বজ্র-মুষ্টি সেলাম তুলবে, সেটা একটা চমৎকার দৃশ্য হয়ে উঠবে কিন্তু।' দেসের জোরে হেসে উঠল,

তারপর তার এই স্থূল বিদ্রূপের আঘাত কাটিয়ে তুলবার জন্যে তেসার পিঠ চাপড়ে বলল, 'রাজনীতির নোংরামি যথেষ্ট হয়েছে। পলেৎকে কাল দেখলাম। তুমি ভাগ্যবান। সত্যিই ও পারীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।'

৭

বিখ্যাত সংবাদপত্র 'লা ভোয়া নূভেল্'-এর সম্পাদক-প্রকাশক জলিওকে লাঞ্চের পর ডেকে পাঠাল দেসের। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে হাজির হল মোটা জলিও; সে বুঝতে পেরেছিল কোন বিশেষ জরুরী কাজে তার ডাক পড়েছে।

জলিওর জীবন ঘটনাবহুল। বহুবার তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে—কখনো জুয়াচুরির অপরাধে, কখনো বা মানহানির দায়ে। কিন্তু প্রত্যেকবার সে খালাস পেয়েছে; বিভিন্ন রাজনীতিকদের অতীত জীবন সম্পর্কে বড় বেশী জানে সে।

দক্ষিণদেশে জলিওর বাড়ী। তার বাবা মার্সাই-এ মাছের দালালী করত এবং এই সম্পর্কে বড় বড় একচেটে ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে এসেছিল। এই ফাটকা-বাজারের আবহাওয়ায় জলিও মানুষ হয়েছে। কোন নীতির ধার ধারত না সে, কিন্তু অনেকগুলো কুসংস্কার ছিল তার—সরকারী কৌঁসিলীর চেয়েও বেশী ভয় তার কাল বেড়ালকে। যুবক-বয়সে পারীতে আসবার পর কিছুদিন একটা বীমা-কোম্পানীর দালালী করেছিল—বীমা কোম্পানীটা টিঁকে ছিল এই সহজ কারণের জন্যে যে কোন পলিসির ওপর টাকা দেওয়া হত না। তারপর সে সংবাদপত্রে কিছু কিছু লিখতে শুরু করল। সাংবাদিক হিসেবে তার আয় নির্ভর করত সে কি লিখল তার ওপর নয়, লেখার ভেতর সে কি বাদ দিল তার ওপর—তার মুখ বন্ধ করবার জন্যে তাকে টাকা দেওয়া হত। তারপর সে নিজেই একটা কাগজ বার করল—শেয়ার বাজারের ওপর একটা কাগজ, নাম, 'লে ফিনাঁস্'। একদিন এই কাগজটা মস্ত বড় একটা বিজ্ঞাপন নিয়ে বার হল—ক্রেদি দাল্জের্ ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখুন। পরদিন ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জলিওকে টেলিফোনে বলল, 'তোমার কাগজে ঐসব ছাইভস্ম বিজ্ঞাপন বার করেছ কেন? আমরা তো ওই বিজ্ঞাপন দিইনি।' জলিও বলল, 'আমি তা জানি, কিন্তু আমার

পাঠকদের ভাল ও নিরাপদ ব্যাঙ্কের সন্ধান দেওয়া আমার কর্তব্য।' 'দোহাই তোমার, ওটা বন্ধ কর। এর মধ্যেই লোকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা উঠিয়ে নিতে শুরু করেছে।' জলিও বলল, 'আমি কী করতে পারি, পাঠকদের প্রতি আমার কর্তব্য সবার আগে।' বিজ্ঞাপন বন্ধ করার জন্যে এক ঘণ্টা পরে ডিরেক্টর পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ গুঁজে দিয়ে গেল জলিওর হাতে। এর পর জলিও উঠে পড়ে লাগল কাগজ নিয়ে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ভোয়া নূভেল্' আত্মপ্রকাশ করল। প্রথম প্রথম কাগজটার প্রায় উঠে যাবার মত অবস্থা—জলিও নিজেই সব প্রবন্ধ লেখে আর ওদিকে ছাপাখানার লোকেরা অতিষ্ঠ করে তোলে টাকার জন্যে। তারপর কাগজটা উঠতে শুরু করল—নামজাদা লেখকদের নামে প্রবন্ধ, চমকপ্রদ রিপোর্ট আর বড় বড় বিজ্ঞাপনে ভরে গেল কাগজের পাতা। কাগজটায় এক-একবার র‍্যাডিকালদের প্রচণ্ড উৎসাহে সমর্থন করা হত, তারপরেই আবার তাদের গালাগালি দেওয়া হত 'দুর্বৃত্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়' বলে। আবিসিনিয়ার যুদ্ধের সময়ে জলিও প্রথমে হাবসী-সম্রাটের প্রতি সহানুভূতি দেখাল, কিন্তু হঠাৎ একদিন সকালে 'ইতালীর সভ্যতা-প্রসারী অভিযান'-এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে 'ভোয়া নূভেলে' প্রবন্ধ লেখা হল।

পাখীর মত দিন কাটে জলিওর। সকালে উঠে তার কোন ধারণা থাকে না দিনের শেষে তার জন্যে কি অপেক্ষা করছে—আর একটা জাঁকালো ভোজ না সরকারী কৌঁসিলীর সমন। কোন গরীব স্ত্রীলোকের হাতে এক হাজার ফ্রাঁ-র একটা নোট সে গুঁজে দিয়ে আসবে হয়ত, কিন্তু কর্মচারীদের মাইনে দেবে পুরনো চেকের সাহায্যে। কল্পনাতীত দামে মাতিসের আঁকা ছবি কিনে আনবে কিন্তু সংসার চালাবার জন্যে বাসন বন্ধক দেবে বার বার।

জলিওর বেশভূষা সব সময়েই জমকালো। কমলা রঙের সিল্কের সার্ট, ধানের শীষের মত নীলাভ টাই আর সোনালি গিরগিটির আকারের টাই-পিন তার পছন্দ! মোটা হওয়া সত্ত্বেও সে রীতিমত চটপটে, কথায় দক্ষিণ দেশীয় টান, ইতালিয়ানদের মত বক্‌বক্‌ করা স্বভাব, আর বক্তব্য যত বেশী জটিল কথার ভঙ্গীতেও তত বেশী আড়ম্বর।

দেসেরের আপিসে পৌঁছেই জলিও 'লা ভোয়া নূভেলের' প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল, আশা ছিল আরো দশ হাজার ফ্রাঁ হাতিয়ে নেবে। সে বল্‌ল, 'এই

সর্বব্যাপী অরাজকতার ভেতর শুধুমাত্র আমরাই আইন ও শৃঙ্খলার আদর্শ তুলে ধরেছি। মার্ক্সবাদের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর লেব্যোফ যে প্রবন্ধ লিখেছে তা পড়েছেন? নির্বাচনের জন্যে আমি কতকগুলো চাঞ্চল্যকর লেখার ব্যবস্থা করেছি। সোভিয়েট রাশিয়ার ভেঙে পড়া অবস্থার ওপর পর পর কতকগুলো প্রবন্ধ ফস্তেনয়কে দিয়ে লেখানো হয়েছে, সেগুলো প্রকাশ করা হবে মস্কোর নিজস্ব সংবাদদাতার তারের আকারে। এই জন্যে ফস্তেনয়কে ওয়ার্স যাবার ভাড়া দিতে হয়েছে আমাকে। তারপর ভীইয়ার সম্পর্কে একটা দলিল আমার হাতে এসেছে। যৌবনে ভীইয়ার কোন ডাক-পিয়নের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে একজন বাড়ীওলা এই মর্মে সাক্ষী দিতে রাজী। এই খবরটার দাম দশ হাজার হওয়া উচিত, আর এই খবরে যা চাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। দুশেনের কলম সত্যিই দুঃসাহসী...'
বাধা দিয়ে দেসের বলল 'তা হোক, কিন্তু ওকে এবার থেকে সব কিছু একেবারে ঘুরিয়ে লিখতে হবে। আজকালকার নতুন কলমে উল্টো দিকেও চমৎকার লেখা যায়। লেখাটা যা একটু মোটা হয় কিন্তু কলম আটকায় না। তাহলে স্পষ্ট করে বলা যাক, লা ভোয়া নূভেলকে এবার থেকে পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে লিখতে হবে।'
হাত দুটো নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রসারিত করে জলিও উঠে দাঁড়াল।
'অসম্ভব!' উত্তেজিত চাপা গলায় সে বলল, 'রাজনীতি কি, আমি জানি। এর আগে একাধিকবার আমাকে কিছু কিছু চালবাজি করতে হয়েছে, কিন্তু ফ্রান্সের প্রতি কথনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি! মঁশিয় দেসের, আপনি শুনে রাখুন, কক্ষনো নয়।'
'চুপ করো। এটা বক্তৃতা দেবার জায়গা নয়! কাজের কথাতে এস। ও সব বড় বড় ফাঁকা কথা না বলে যদি থাকতে না পার, তবে শোন! পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভ ফ্রান্সের পক্ষে মঙ্গলজনক! একটা বিপ্লবের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, যদি ঠিক সময়ে মুখ খুলে না দাও তবে বয়লার ফেটে যাবার সম্ভাবনা। ভীইয়ার পিয়নের মেয়েকে ধর্ষণ করেছে কিনা সে সম্পর্কে আমার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ কথা বিশ্বাস করি না, এমন কি ও কোনদিন নিজের বৌয়ের সঙ্গে শুয়েছে কিনা সে সম্পর্কেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ও তো একটা হিজড়ে। কিন্তু

প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভীইয়ার বিপজ্জনক, তখন ও সিংহের মত গর্জন করবে। কিন্তু ওকে মন্ত্রীর গদীতে বসিয়ে দাও, সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার মত হয়ে যাবে।'

'কিন্তু কী ভয়ংকর কথা! অর্থাৎ কাল যারা ফ্রান্সের শত্রু ছিল, তাদের হাতেই ফ্রান্সকে ছেড়ে দিতে হবে।'

দেসের বলল, 'আমার কথাটা শোন আগে। তুমি একটা বড় প্রশ্ন তুলেছ। সত্যি কথা বলতে কি এই সম্পর্কেই আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়ে ছিলাম। একটা সিগার ধরাও। লা ভোয়া নুভেল যে পপুলার ফ্রন্টকে সাহায্য করবে, সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এ বিষয়ে তুমি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তাছাড়া তোমার কাগজকে আমি সব রকমে সাহায্য করব।'

'কিন্তু......'

'এবার আসল কথায় আসা যাক্। পপুলার ফ্রন্টের লোকেরা উগ্র দেশ-প্রেমিক। ফ্যাসিজম্‌কে ওরা ঘৃণা করে। কথাটা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই, কিন্তু ওটা রীতিমত বিপজ্জনক পথ। তোমার কাগজে শুধু শান্তির বাণী প্রচারিত হবে—জাতি সমূহের একভ্রাতৃত্ব, ইউরোপের অর্থনৈতিক একতা, শিশুদের জীবনের নিরাপত্তা, মায়ের অশ্রু এবং এই ধরনের আরো সব কথা; আমাদের শান্তি চাই। শান্তির জন্য যে কোন মূল্য দিতে হবে।'

'কিন্তু ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ?...'

'কারথেজের ধ্বংসস্তূপের চেয়ে সুখী আন্দোরা বা নিশ্চিন্ত মনাকো ছোট হলেও অনেক ভাল। ফ্রান্সের জয় হবে, এ কথায় আমি বিশ্বাস করি না। আমাদের ক্লান্তি এসেছে। প্রেমে ক্লান্তি, ঈর্ষায় ক্লান্তি, ঝগড়ায় ক্লান্তি। প্রকৃতির নিয়মই এই। শুধু তেসার মত লোকেরাই ষাট বছর বয়সেও বসন্ত কালের হুলো-বেড়ালের মত চালিয়ে যেতে পারে। তুমি বলবে, ফরাসী জাতটাই উদ্যমী। নিশ্চয়ই! একদিন তারা মার্সাইয়ের সুর তুলে সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল—স্কুলে একথা এখনো পড়ানো হয় ছেলেমেয়েদের। কিন্তু এখন আমরা কুঁড়ে হয়ে গেছি, বড় বেশী আয়েশী হয়ে উঠেছি, ঝুঁকি নেবার সাহস এখন আর নেই। মর্যাদা বা ন্যায়ের জন্যে কে লড়াই করবে? লাভাল? মোরিস শেভালিএ? তুমি? এক কথায়—রেমার্কে যদি আর একটা উপন্যাস লেখে তবে তার সর্বস্বত্ব কিনে নাও। টাকার জন্যে ভাবতে হবে না।'

জলিও এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'আপনি সত্যিই প্রতিভাবান। এ পথের শেষ কোথায় ভগবান জানেন, কিন্তু প্রস্তাবটা খুব ভাল মনে হচ্ছে আমার। শান্তি, যে কোন মূল্যে শান্তি—চমৎকার! অসি ভেঙে লাঙলের ফলা তৈরী করতে হবে এবার...'

দেসের হাসল, 'ভুলে যেও না, যুদ্ধাস্ত্র-নির্মাণ শিল্পের সঙ্গেও আমার সম্পর্ক আছে। আর ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকাও নির্ভর করছে এই শিল্পের ওপর। তাছাড়া যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত না হলে যে কোন মুহূর্তে আক্রমণ হতে পারে আমাদের ওপর। আসল কাজ, এই গরম আবহাওয়াকে একটু শান্ত করা। আমার কথাগুলো তোমাকে আবার বলছি—ওরা উগ্র মুক্তিকামী ; কামান-ব্যবসায়ী আর 'দুই শত পরিবার' যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র—এই কথা অনবরত লিখতে থাক।'

ধীরভাবে চেকটা হাতে নিয়ে পকেট বইয়ের ভেতর গুঁজে রাখল জলিও।

'আমি একটা চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখব, তার নাম হবে—দুই শত পরিবারের বিরুদ্ধে দেসের।'

'তা হলে সেটা হবে অর্থহীন ও অবাস্তব। তার চেয়ে লেখ—দুই শত পরিবারের প্রতিনিধিদের মত দেসেরও রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় জনসাধারণকে। এ কথা সবাই বিশ্বাস করবে।'

দেসের হাসল, তারপর বলল, 'কথাটা কিছুটা সত্যিও।'

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি পার হয়ে আপিসে ঢুকল জলিও, তারপর টাইপিস্টকে ডেকে বলল, 'লুসিল, আজ থেকে তোমার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম, তিন হাজার, না পাঁচ হাজার করে পাবে তুমি।' আশেপাশের সবাইকে নিজের আনন্দের ভাগ দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল তার। সমস্ত দিন বসে বসে বহু রকম আদেশ দিয়ে গেল সে—'বিখ্যাত বামপন্থী লেখকদের প্রবন্ধ! মুসোলিনির ব্যঙ্গ-চিত্র! শ্রমিকদের করুণ জীবনের ওপর কিছু লেখা! যুদ্ধস্মৃতি—ভের্দ্যঁর বিভীষিকা! ফস্তেনয়কে ব্যস্ত না হলেও চলবে.......না; শোন, ওকে কিছু বলতে হবে না! ও লিখুক, এখন কাজে না লাগে বছর খানেকের মধ্যেই লাগবে।'

সেদিন সন্ধ্যায় মঁমার্ৎর্-এ ডিনার খেল জলিও এবং বাড়ী ফিরল অনেক

দেরিতে। তারপর বৌকে ঘুম থেকে টেনে তুলে গোলাপ ফুল উপহার দিল। ফুলগুলো সে কিনেছিল একটা নৈশ ক্লাবে, কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় শুকিয়ে গেছে আর কেমন বিশ্রী একটা গন্ধ উঠছে। বৌয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে জলিও বলল, 'চার লক্ষ! আজ আমার কী সৌভাগ্য!'
তারপর সে জুতো খুলে স্লিপার পায়ে দিল। জল খেল এক গ্লাশ। তার পর হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ হয়ে উঠল—তার নিজের কাছে অপরিচিত আর অবোধ্য একটা বিষণ্ণতা। মনে মনে বলল, 'ফ্রান্সের আর কোন আশা নেই, ফ্রান্স শেষ হয়ে গেল। আজ যে আমি দুজন পাদ্রীকে দেখলাম তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে—দুজন পাদ্রী তো সর্বনাশের নির্ভুল চিহ্ন।'

৮

সেদিন সন্ধ্যায় সর্বশক্তিমান দেসের ও নির্বিরোধ ইঞ্জিনিয়ার পল দ্যুবোয়া সীন নদীর ধারে নিঃশব্দে পায়চারি করে বেড়াল। পারীর আশ্চর্য ধূসর অস্পষ্টতা, নিস্তব্ধ সীনের ওপর দু-একটা ভাসমান বজরার বিক্ষিপ্ত আলো, নৎর্ দাম্ গির্জার প্রস্তর-অরণ্য যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেখানে কথা বলতে ভাল লাগছে না কারও। হাল ও ভ্যাঁর পাশ দিয়ে যাবার সময় মদের টক গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। জারদ্যাঁ দে প্ল্যাঁট-এর ঘেরা অন্ধকার জায়গাটা থেকে জান্তব চিৎকার শোনা যাচ্ছে—বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে অস্থির হয়ে উঠেছে জন্তুগুলো। গার্ দু লিওঁর পথে ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ীগুলো ছুটে চলেছে তীব্র হেড-লাইট জ্বালিয়ে। তারপর আবার ঘন হয়ে উঠল সেই শান্ত নীলাভ ধূসর অস্পষ্টতা।
নদী ও বাড়ীগুলোর সাদৃশ্য, সরু সরু পুরনো রাস্তাগুলোর বিচিত্র নাম—'কাঠের তরবারীর রাস্তা' 'সাধু বাবাজীর রাস্তা' 'দুই ঢালীর রাস্তা,'—আর জীবন-চঞ্চল নগরীর রহস্য দুজনের মনে দু-রকম মনোভাব সৃষ্টি করল। দেসের সারাটা দিন কাটিয়েছে তেসা আর জলিওর সঙ্গে, জটিল অঙ্ক আর মিথ্যাচারের আবর্তে—আর এখন সে পথ চলছে মাথা নীচু করে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে। বিশ্রাম-শান্ত নগরী তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যাত্রার পূর্বে সেই মুহূর্তের কথা যখন বাক্স্-পেঁটরা বাঁধা হয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবরা চুপ করে বসে আছে চারপাশে—বিচ্ছেদের ব্যথা কাটিয়ে তুলবার জন্যে একটি কথাও

ভীতিজনক, কিন্তু তার রক্তের ভেতর কি একটা আছে যা আগের মতই আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তাকে। মিশোর কথাবার্তা অত্যন্ত রূঢ় বলে মনে হয় তার। সে চায়, বিপ্লব আসুক মে মাসের বৃষ্টির মত উল্লাস আর কলরব নিয়ে।

মেট্রো স্টেশনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটি মেয়ে তাদের নজরে পড়ল। মেয়েটি বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে আর ঘড়ি দেখছে। বোধ হয় কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ও। শিশুর মত অভিমানী মুখ চোখের ভাব।

হঠাৎ দেসের বলল, 'তাহলে একজন শিক্ষয়িত্রীকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ!'

এবার আর পিয়ের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল না। একথা কেন দেসেরের মনে হয়েছে, তাও সে জিজ্ঞাসা করল না। তার ইচ্ছা হল, চিৎকার করে আনের নাম বলে। এই নিস্তব্ধ রাস্তা ভরে উঠুক আনের নামে।

সে বলল, 'হ্যাঁ। আনে।'

দেসের দাঁড়াল। পিয়েরের দিকে তাকাল সে—কাল চোখ, চোখের প্রকাণ্ড অংশ শাদা, আত্মসন্তুষ্ট স্মিত মুখ।

'তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়।' শান্ত গলায় বলল সে।

'কিন্তু কেন...' আমতা আমতা করে পিয়ের বলল। 'তুমি কেন বিয়ে করছ না?' এ প্রশ্ন সে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। ঠিক সময় সে থেমেছে।

দেসের বলল, 'এ একটা রীতিমত অভিশাপ। কিন্তু কিছু করবার উপায় নেই। চোখের জল ফেলে ওরা আমাকে ভালবেসেছে, আত্মহত্যা করবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু সে ভালবাসা আমার প্রতি নয়, আমার অর্থের প্রতি। আমি কি করব বলো? নিজের পরিচয় গোপন করব? অদৃশ্য পোষাক পরব?'

'অনায়াসে তুমি এই অর্থ ত্যাগ করতে পার। তুমি তো আর দালাল নও, তুমি ইঞ্জিনিয়ার। অর্থ যদি তোমার কাছে বোঝা বলে মনে হয়......'

'না, অর্থ আমি ভালবাসি। কেন? হয়ত এই কারণে যে, অর্থই হচ্ছে শক্তি। খ্যাতি বা প্রতিপত্তির কথা বলছি না, প্রকৃত শক্তি, অপরের

ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করবার ক্ষমতা। কিন্তু আমার তা কি দরকার? এ কথাই বুঝতে চেষ্টা করছি। এটা কি বোঝা? তা হোক, কিন্তু বড় মধুর। শুধু তাই নয়, এটা একটা বিষ, কোকেনের মত ধীর-ক্রিয়াশীল বিষ। শুধু দোষ এই যে, এই বিষ উপদংশের মত রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।'

একটা অন্ধকার রাস্তা দিয়ে তারা হেঁটে যাচ্ছিল। থানার লাল আলোটা জ্বলছে রক্তচক্ষুর মত। একটি মেয়ে নীচু হয়ে ডাস্টবিনের ভেতর খাবার খুঁজছে। বৃষ্টি পড়ল কয়েক ফোঁটা।

দেসের বলে চলল, 'প্রত্যেকের ওপর এই বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে। এটা একটা সার্বজনীন ব্যাধি। কিন্তু এই ব্যাধি থেকে কেউ মুক্ত হতে চায় না—দুই শত পরিবারও নয়, দু-শো লক্ষ জনসাধারণও নয়। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ওরা লড়বে, কিন্তু ফ্রান্সের জন্যে নয়, অর্থের জন্যে। যুদ্ধ? যুদ্ধ হবে না, বিপ্লবও হবে না। সঞ্চিত সম্পত্তি হারাবার ভয় আছে সকলের। কিন্তু ওই মেয়েটিকে দেখ, ওর কিছুই নেই, সুতরাং ওর ভয়ও নেই। কিন্তু ওর মত লোক কটি আছে? যে কজন আছে, তাদের ভয় দেখিয়ে চুপ করানো হবে, প্রয়োজন হলে গুলি করা হবে। অবশ্য, তার প্রয়োজন হবে না। জনসাধারণ যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছে, ওরা বোকা নয়। কোন্ কথার কি মানে ওরা ভাল করেই জানে।'

পিয়ের বলল, 'আমি সত্যি বুঝতে পারি না মানুষের ওপর এত ঘৃণা নিয়ে কি করে তুমি বেঁচে থাক। অনেক আগে জনসাধারণকে ভুল বোঝানো যেত, কিন্তু এখন সবাই বুঝতে শিখেছে। কিসের আশায় রয়েছে ওরা? আর কিছু নয়—বিপ্লব! আমাদের কারখানায় হাজার হাজার লোক আছে যারা ভবঘুরের মত সব কিছু খুইয়ে বসে নেই। তাদের কাজ আছে, পরিবার আছে, বাড়ী আছে, অনেকের সঞ্চিত অর্থও আছে। কিন্তু সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত...' ডাস্টবিনের কাছে মেয়েটির দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'মানুষের ওই অবস্থা দূর করবার জন্যে তারা সব কিছু ত্যাগ করবে। সময় সময় আমার মনে হয়, মানুষ কাদার মত। অতীতে ভগবান ও পশুকে রূপ দিয়েছে মানুষ, এখন মানুষকে নতুন রূপ দেবার চেষ্টা আমাদের।'

দেসের বলল, 'মানুষ কাদার মত, কথাটা ঠিক নয়। কাদার মত নয়, চিউয়িং গামের মত। এই জন্যেই সব কিছু বদলে যাচ্ছে, আবার সব কিছু

একই অবস্থায় রয়েছে। সত্যি সত্যিই বদলে যায়, এমন কী আছে? শুধু নাম। আসল পরিবর্তন মৃত্যু। একমাত্র মৃত্যুই পরিবর্তন আনতে পারে। এই জন্তেই মৃত্যুকে আমি ভয় করি। লোকে কেন আত্মহত্যা করে, আমি বুঝি না। অবশ্য এটা আমার বক্তব্য নয়। আমি বলতে চাই, যতই তোমরা বিপ্লবের কথা বলো না কেন—বিপ্লব মানে মৃত্যু, শুধু আমার মৃত্যু নয়, কোটি কোটি জনসাধারণের মৃত্যু।'

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইল। ছোট রাস্তাটার দু পাশের বন্ধ জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে উষ্ণ আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। একটা জানলা খোলা ছিল। তার পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা দেখল, বাড়ীর লোক টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে খেতে বসেছে, আলো রয়েছে টেবিলের মাঝখানে আর সেই আলো পড়েছে একটি স্ত্রীলোকের সুন্দর ও ক্লান্ত মুখের ওপর।

দেসের বলল, 'এত কিছু ধ্বংস হবে ভাবতেও আমার আতঙ্ক হয়। নংর্ দাম্, লুভ্র্ বা এই ধরনের কতগুলো সুন্দর ও বিখ্যাত বাড়ী ধ্বংস হবে, শুধু সে-কথা আমি ভাবছি না। আরো অনেক কিছু আছে যা ধ্বংস হলে এর চেয়েও বেশী দুঃখ আমি পাব। এই সব বাড়ীর ভেতরে যে সুখী পারিবারিক জীবন আছে, তার কথা আমি বলছি। সুখী নাও হতে পারে, যাকে ওরা ভাবছে সুখ সেটা হয়ত একটা ভ্রান্তি। কিন্তু সুখ না হোক, একটা স্বাচ্ছন্দ্য আছে আর আছে সেই স্থিরতা—পাশের ঘর থেকে ঘুমন্ত নিশ্বাস শুনে যা অনুভব করা যায়। খ্রীষ্টীয় নামকরণ—যখন চিনি দেওয়া বাদাম খেতে দেওয়া হয়, বিয়ে—যখন অজস্র ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয় সুখী দম্পতির পায়ের তলায়, এমন কি শবযাত্রা—যখন শবানুগামীরা সমাধিক্ষেত্র থেকে ফিরে খাবার ও মদ নিয়ে বসে—এই সব কিছু থাকবে না বলে আমি দুঃখ পাই। এখনো এ সবের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু চোখের পলকে সব কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে—বোমা, বন্দুকের আওয়াজ, হিটলারের পাগলামি, বজ্রমুষ্টি বা অন্য কোন গোলমালের মধ্যে। অবশ্য একশো বছর পরে সকলে বলবে এই ঘটনাটা একটা 'ঐতিহাসিক প্রয়োজন' হয়ে উঠেছিল···আচ্ছা, এবার আমাকে যেতে হবে।'

চামড়ার দস্তানা-পরা হাতটা পিয়েরের দিকে একবার বাড়িয়ে দ্রুত পায়ে চলে গেল দেসের। এই কথাবার্তা তাকে বিরক্ত করে তুলেছে। এত বেশী কথা বলেছে বলে নিজের ওপরেই তার রাগ হল। প্রেমে অন্ধ এক ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে মানবতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বক্‌বক্ করে কী লাভ!

শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে সে ফিরে চলল। রাস্তায় দিনের মত আলো। দোকানের জানলায় রংবেরঙের জিনিসগুলো ঝকঝক করছে। বাড়ীগুলোর গায়ে নীলাভ বেগুনী রঙের ছোট ছোট মূর্তি ও সাপ—ক্ষুধা-উদ্রেককারী মদ ও রোদ-ঝলসানো মরক্কো বিলাস-ভ্রমণের বিজ্ঞাপন। রাস্তায় ভীষণ ভীড়, গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছে সকলে—যেন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই; জিইয়ে রাখা মাছের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরা-ফেরা করছে এদিক ওদিক। পত্রিকার দোকানে কুড়ি রকমভাষাব খবরের কাগজ আঁটা। সেখানে একবার থেমে দেসের চোখ বুলিয়ে নিল খবরের কাগজের হেডলাইনগুলোর ওপর—'পপুলার ফ্রন্টের দাবী... সশস্ত্র সংঘর্ষের সম্ভাবনা...' ক্লান্তভাবে হাই তুলল সে। এখানে সব কিছু তার নিজের ভাষায় কথা বলছে—বাড়ী বা বিজ্ঞাপন বা শেয়ারের দাম তার জানা, মরক্কো রেল কোম্পানীর ডিভিডেন্ট কত সে বলে দিতে পারে, বিখ্যাত তিক্ত-মধুর পানীয়টি তার কাছে নতুন নয়। সব কিছুর মালিক সে—জমি, বাড়ী, খবরের কাগজ এমন কি মুখের হাসিটুকুরও। তার নিজেব রাজ্যে সে দর্শক মাত্র, কোন কিছুতে তার প্রয়োজন নেই, যাদুকরের মত নিজেকে এক ঘণ্টার জন্যে পুতুলে পরিণত করেছে সে...এই সমস্ত কিছুকে রক্ষা করবার কোন সার্থকতা নেই? নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু হে ঈশ্বর, কী গভীর ক্লান্তি......

৯

সে দিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক মালের বক্তৃতার বিষয় ছিল—পোয়াটুব রোমীয় স্থাপত্য। বক্তৃতায় সকলের প্রবেশাধিকার ছিল, সুতরাং ছাত্রদের সঙ্গে অন্য লোকও বেশ কিছু এসেছে। একদল এসেছে যারা সত্যিই স্থাপত্য-অনুরাগী এবং নিজেদের চেষ্টাতেই যা কিছু শিখেছে। অধ্যাপক মালের প্রতিটি বক্তৃতা তারা শুনতে আসে—হাতের মোটা মোটা নোট বইয়ের একই পাতায় সংস্কৃত ধাতুরূপ ও গণিতের দ্বিপদসূত্র পাশাপাশি লেখা। এমন দু-একজনও আছে যারা ভেতরে ঢুকেছে শরীর গরম করবার জন্যে আর একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে। আবার এমন লোকও আছে যারা অধ্যাপক মালের প্রতিটি কথা টুকে নেয়। একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উঠেছে পেছনের সব চেয়ে উঁচু বেঞ্চে আর একমনে মোজা বুনছে।

মালের বক্তৃতার একজন নিয়মিত শ্রোতা মিশো মিস্ত্রী। স্থাপত্য সম্পর্কে

তার কৌতূহল ছেলেবেলা থেকে, বাড়ী ঘরের মাপজোখ, মালমশলা, ইত্যাদি সব কিছুর সঙ্গে সে পরিচিত। অনেক কিছু সে জানে, পছন্দসই কোন বাড়ী দেখলে মিশো যে শুধু ইঞ্জিনিয়ার হিসেবেই বাড়ীটির গঠন সামঞ্জস্য আর পারিপাট্যে মুগ্ধ হয় তাই নয়, একথাও তার মনে হয় যে স্থপতি-বিদ্যায় এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে যা মানুষের জীবন্ত মুখের মত বা অরণ্যের মত তাকে আচ্ছন্ন করে। তার এই ধারণার মূল কারণ আবিষ্কার করবে বলেই সে স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে।

সব কিছু জানবার অতৃপ্ত আগ্রহ মিশোর। শিশু যেমন হাতের খেলনা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলে, তেমনি এই জগতটাকে টেনে ছিঁড়ে ভাল করে দেখবার একটা প্রবল আগ্রহ আছে তার। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হয়েছিল সামান্য লিখতে, পড়তে, আঁক কষতে শিখে এবং কতক গুলো নীতিকথা মুখস্ত করে। তারপর জীবনের পাঠশালায় ঢুকেছে সে। লুক মিশোর বাবা ছিলেন টুপি-ব্যবসায়ী। যুদ্ধের পরে টুপির ব্যবসায়ে মন্দা পড়ল, টুপি মাথায় দেবার অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিল সবাই। শিক্ষানবিস হিসেবেও লুককে কোথাও নেওয়া হল না। তখন একটা তিন-চাকার সাইকেলে চড়ে বাড়ী বাড়ী জমানো-দুধ পৌঁছে দেবার কাজে লেগে গেল সে। পরে সে চামড়ার দুর্গন্ধওলা ট্যানারীতে কাজ করেছে। প্রচুর বই পড়ত সে কিন্তু পড়ার ভেতর কোন নিয়ম বা সামঞ্জস্য ছিল না। নৌ-বাহিনীতে থাকবার সময় টরপেডো-বোটে কাজ করতে হয়েছিল তাকে। সেখানে কোরিএ নামে একজন নক্শা আঁকিয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরে নির্বাচনের সময় কমিউনিস্ট প্রার্থী হিসেবে কোরিএ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে, কিছুদিনের মধ্যেই মিশোকে দলভুক্ত করে নিল সে। 'সীন' বিমান কারখানায় দুজনে এল কাজ করতে। তারপর মিশো সভা-শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছে, বই পড়েছে অর্থনীতি ও শ্রমিক-আন্দোলনের ইতিহাসের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে গণিত শিখেছে, পরিচিত হয়েছে দক্ষ মিস্ত্রী হিসেবে। এখন সে ভাল রোজগার করছে। কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে তার মনে হয়, সে কিছুই জানে না। এই অনুভূতি তীব্র বেদনাদায়ক ও নৈরাশ্যজনক, যেন সে, যে কোন কারণেই হোক, একটা অমূল্য সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু তার সময় এত কম—এই সে ব্যস্ত পার্টি-সম্মেলন নিয়ে, এই সে যাচ্ছে কোন সভায়। থিয়েটারে যাবার বা যাদুঘর দেখবার ইচ্ছাটা পুরোপুরি আছে তার। মাঝে

মাঝে তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কোন্ দূর দেশের অস্পষ্ট দৃশ্য—রোমের ধ্বংসাবশেষ, তুর্কীস্তান-সাইবেরিয়ান রেলপথ বা...

গরম বাদাম-ভাজা খেতে খেতে নভেম্বরের কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে সে, কুয়াশার অস্পষ্ট আলোর নীচে পারীকে মনে হয় জাহাজের মত: নোঙর তুলবার সময় হয়ে এল। প্রায়ই সে সিনেমায় যায়। চারপাশে আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক-প্রেমিকা, বাতাসে কমলালেবুর গন্ধ—তার মাঝখানেই সে বসে, আর যখনই কোন নির্বাক মোহিনী আমেরিকান অভিনেত্রীর ছবি পরদায় ফুটে ওঠে, সশব্দে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। একজন কমরেডের মেয়ের সঙ্গে তিন বছর সে প্রেম করেছিল। মেয়েটির নাম মিমি, দেখতে ভাল, সুন্দর একটা চুলের গুচ্ছ নেমে এসেছে কপালের ওপর। মেয়েটির জন্যে সে নাচ শিখেছে, মেয়েটিকে ফুলের তোড়া আর চকোলেট উপহার দিয়েছে, এমন কি কবিতা লেখবার চেষ্টা পর্যন্ত করেছে। কিন্তু সব কিছু ব্যর্থ করে দিয়ে মিমি একজন দোকান-সরকারকে বিয়ে করে বসল। মিমি চেয়েছিল নিশ্চিন্ত শান্ত জীবন, মিশোর চিন্তাধারা আর উগ্র মনোভাব তার মনে ভয় জাগাত।

মিশোর বয়স উনত্রিশ, শক্ত সমর্থ চেহারা একটু যেন বেমানান শারীরিক গঠন, অসম্ভব বড় ও ভারী মাথা, মুখের চামড়ায় শীতকালেও হলদে হলদে দাগ, ধূসর বিদ্রূপাত্মক চোখ দুটো আকর্ষণ করে, শাদা সুস্পষ্ট দাঁত। মনে হয় যেন সব সময়েই হাসছে। হাত দুটো কখনো স্থির থাকে না—সব সময়ে দুলছে, আর একটা মুদ্রাদোষ—কথায় কথায় বলে 'ঠিক তাই!'

মালের বক্তৃতা মন দিয়ে শুনল মিশো, একটা পুরনো ছেঁড়া নোট-বইয়ের পাতায় বক্তৃতার নোট নিল মাঝে মাঝে। ঠিক তার পাশে একটি আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে বসেছে। বক্তৃতা শুরু হবার আগে মিশো দেখেছে মেয়েটিকে, বিশেষ করে লক্ষ্য করেছে চিত্র-তারকাদের মত মেয়েটির চোখের টানা টানা কাল পাতা। তার পরেই মেয়েটির কথা ভুলে গিয়ে পোয়াটুর গির্জার সৌন্দর্যে ডুবে গেছে সে।

স্তম্ভের আলোচনা প্রসঙ্গে মালে একটা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করল। শব্দটা ধরতে না পেরে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মিশো ফিস ফিস করে জিজ্ঞাসা করল, 'কি দিয়ে সাজান বললেন উনি?'

'লোহার জাল দিয়ে।'

বক্তৃতা শেষ হবার পর সামনের লোকের বেরিয়ে যাবার অপেক্ষায় কিছুক্ষণ বসে থাকতে হল। পাশের মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মিশো বলল, 'বক্তৃতার সময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিরক্ত করেছি বলে রাগ করেননি আশা করি। আপনি বোধ হয় স্থপতিবিদ্যার ছাত্রী, কিন্তু আমি ও বিষয়ে একেবারেই অনভিজ্ঞ, আমার যা কিছু জ্ঞান ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে।'

'আর আমি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে, কিছু জানি না, একেবারেই কিছু জানি না।'

মিশো বলল, 'ইঞ্জিনিয়ারিংটা অবশ্য নেহাৎ যাকে বলে একটা 'ব্যবহারিক বিদ্যা'। কিন্তু আর্ট বুঝতে না পারার মধ্যে কি যেন একটা অভাব বোধ আছে—ঠিক বুঝে ওঠা যায় না! ঠিক তাই! জানেন, এক সময়ে আমি কোন একটা আর্টকে বুঝতে চেষ্টা করতাম অন্য একটা আর্টের মারফৎ। যেমন ধরুন, বাজনা শুনতে শুনতে আমি সেটাকে কথায় রূপান্তরিত করতে চাইতাম; ভাবতাম, এই বাজনাটায় কি 'প্রেমে পড়া' বোঝায়, ওই সুরটা কি বলতে চায় 'সামরিক বিজয়' কিংবা 'সমুদ্রে ঝড়'? ব্যর্থ চেষ্টা সন্দেহ নেই, কারণ এই রকম ব্যাখ্যা হতেই পারে না। স্থাপত্য সম্পর্কেও এই কথা খাটে অবশ্য আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন এই বিষয়ে।'

হল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এল দুজনে। দু দিনের ঝড় বৃষ্টির পর শহরের রূপ বদলে গেছে। বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে সব কিছুতে। ফুলে উঠেছে বাদাম গাছের কুঁড়িগুলো, ঝলসে উঠেছে নীলাভ পীচের রাস্তা। শীতের ওভারকোট অদৃশ্য, পাতলা ম্যাকিনটস দেখা দিয়েছে তার জায়গায়। কাফেগুলো থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে রাস্তায়, বাজিয়েরা দেখা দিয়েছে আবার, সদ্য-ফোটা 'লিলি অফ দি ভ্যালি' বিক্রী করছে ছোট ছোট ছেলেরা।

বুলভার সঁ্যা মিশেল পার হয়ে গেল ওরা। আলোকোজ্জ্বল, কলরব-মুখর বুলভার সঁ্যা মিশেল—তরুণ-তরুণীরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে, প্রেম নিবেদন করছে পরস্পরের কাছে, চুমুক দিচ্ছে ক্রীমের পেয়ালায় আর আসন্ন পরীক্ষার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে। বুলভার সঁ্যা জেরম্যাঁয় আবছা অন্ধকারের রোমাঞ্চ—ছোট ছোট কুকুর নিয়ে ঝিরা বেরিয়েছে সান্ধ্যভ্রমণে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমিক-প্রেমিকা জড়িয়ে ধরছে পরস্পরকে। ঘড়িতে দশটা বাজল। মেয়েটির কাছে মিশো গল্প করছে কিভাবে সে গ্রেনোব্‌ল্‌-এর তুষার-শৈল পার হয়েছিল। মেয়েটি হাসছে দেখে সে খুশি হল।

'আপনি খুশি হয়েছেন দেখে আমার ভাল লাগছে।' সে বলল।

'আমি সাধারণত খুব হাসিখুশি নই। বাড়ীর সবাই বলে, আমি নাকি সব সময়েই মুখ ভার করে থাকি—সেজন্যে বকুনিও খাই মাঝে মাঝে। দাদা তো আমার নাম দিয়েছে 'ইঁদুরমুখী'।'

'না, না, ইঁদুরের মত দেখতে আপনি নন একটুও! স্যাভয়এ কাকার সঙ্গে থাকবার সময় আমি একটা পাহাড়ী ইঁদুর ধরেছিলাম। ইঁদুরটা পেছনের দু পায়ে দাঁড়াতে শিখেছিল। বুনো জন্তুর জীবন সত্যিই আশ্চর্য। পিঁপড়েদের সম্পর্কে সম্প্রতি কয়েকটা বই আমি পড়েছি। আশ্চর্য বুদ্ধি ওদের! কী সংগঠনী শক্তি! তারপর ঈল মাছ, ওদের সম্বন্ধে কিছু জানেন? মনে হয়, পৃথিবীর চারদিক থেকে এসে ওরা ওই সারগাসো সাগরে জড় হয়েছে। ভাল লাগে—এই বোধ-টুকুই ওদের ছুটিয়ে নিয়ে আসে, পাঁচ হাজার মাইল পথ সাঁতরে পার হয় ওরা। এমন কি মাঝে মাঝে জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে। ডাঙায় ওঠবার সময় লক্ষ লক্ষ মারা যায়, কিন্তু তবুও ওরা দমে না। একেই বলে আবেগ! মানুষ ও রকম হয় না।' মেয়েটির কাছে সে মিমির বিষয়ে বলতে চেয়েছিল—প্রেমের চেয়েও দোকান-সরকারের মাইনে মিমির কাছে বড় হল, সেই কথা। কিন্তু কোনরকমে নিজেকে সংযত করল সে, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'এত কিছু জানবার আছে! রাজনীতি ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়া আর কিছুই আমি জানি না।'

মেয়েটি বলল, 'রাজনীতির ওপর ঘেন্না ধরে গেছে আমার। বাড়ীতে সব সময়েই শুধু রাজনীতি, আর কোন কথা নেই। আমার বাবা...'

মেয়েটি একটু ইতস্তত করল। কি অদ্ভুত ব্যাপার, একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছে কেন সে এত কথা বলছে? লোকের সঙ্গে মিশতে তার ভাল লাগে না, চিরদিন একা একা থেকেছে, আর এখন সে এমন একজন লোকের সঙ্গে অসংকোচে কথা বলছে যার সম্পর্কে সে এইটুকু মাত্র জানে যে সে ইঞ্জিনিয়ার। কি বিশ্রী ব্যাপার, ছেলেমানুষি! সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, আজকের এই বসন্তের লোভনীয় সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আকস্মিক পরিচয়ও শেষ হয়ে যাবে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাসে উঠতে হবে তাকে—কেমন একটু বিষণ্ণতার আভাস এল তার মনে।

শুকনো গলায় সে বলল, 'আমার বাবা একজন ডেপুটি। আপনি হয়ত তাঁর নাম শুনে থাকবেন, তাঁর নাম তেসা।'

মিশো জোরে হেসে উঠল, 'এটা একটা আশ্চর্য হবার মত ব্যাপার বই কি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই! কিন্তু আপনার বাবার কথা উঠছে কেন? আমি

তো তাঁর সঙ্গে কথা বলছি না, আপনার সঙ্গে বলছি। ওঁরা যা কিছু রাজনীতির তালগোল পাকিয়ে তোলেন, তার মাথামুণ্ডু আমি তো কিছুই বুঝি না। সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার! আমি সম্পূর্ণ অন্য কথা বলছি। এ কি, কোথায় যাচ্ছেন? চলুন আর একটু হাঁটা যাক—অন্তত এর পরের বাস-স্টপ পর্যন্ত। আজকের সন্ধ্যাটা আশ্চর্য...'

দেনিস রাজী হল। তারপরেই আবার অবাক হল নিজের ব্যবহারে। কেন সে যাচ্ছে, কেন সে কথা শুনছে, আর কেনই বা সে হঠাৎ এত সহজ ও উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে?

মিশো বলে চলল, 'রাজনীতি জিনিসটা আমি সম্পূর্ণ অন্যভাবে বুঝি। রাজনীতির অর্থ পৃথিবীর পুনর্গঠন। এত অবিচার আর এত অবজ্ঞা এই পৃথিবীতে যে সময়ে সময়ে আমি নিজেও লজ্জিত বোধ করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকের জন্যে সুখী, সুন্দর, প্রাণবন্ত জীবন সম্ভব, সত্যিই সম্ভব। আমার কাছে বিপ্লব এক রকমের স্থাপত্য। আপনি যদি শিল্পানুরাগী হন, তবে বিপ্লব-দরদী না হয়ে উপায় নেই।'

'আপনি কি কমিউনিস্ট?'

'কমিউনিস্ট না হয়ে আর কী হতে পারি আমি?'

'আমার দাদাও ঠিক আপনার মত কথা বলে। কিন্তু দাদার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না। শুধু মুখের কথার ওপর কোন আস্থা নেই আমার।'

মিশো বলল, 'তার কারণ আপনার বাবা আইনজীবী। লোকে যখন বড় বড় কথা বলে আমার মনে কেমন সন্দেহ হয়। কমিউনিস্টদের সঙ্গে এখানেই অন্য সকলের পার্থক্য। আচ্ছা দেখুন, আজ আমাদের একটি নির্বাচন সংক্রান্ত সভা আছে। চলুন, অন্তত আধ ঘণ্টার জন্যে সেখানে যাওয়া যাক। একবার গেলেই এই পার্থক্য চোখে পড়বে আপনার! জায়গাটা খুব কাছেই—রু ফাল্‌গিয়ের-এর স্কুলে। অবশ্য আপনার যদি ভাল না লাগে ফিরে যেতে পারেন। কিন্তু গেলে আপনার ভালই লাগবে। আসুন, আসুন, সব বিষয়ে কৌতূহল থাকা ভাল। যাবেন?'

দেনিস মাথা নাড়ল। কিন্তু সে বুঝতে পারছে শেষ পর্যন্ত সে যাবেই। এমন কি, মনে মনে সে একবার বলল, 'বাড়ী ফিরে ভেবে দেখা যাবে এখন। এখন আমার ভাল লাগছে এইটেই বড় কথা।'

সভাতে এমন বহু মেয়ে পুরুষ এসেছে যাদের নাম ভোটারের তালিকায় নেই।

সেই আশ্চর্য বসন্ত ঋতুতে এই ধরনের সভা আরো হাজার হাজার হয়েছিল, আর পারীর জনসাধারণ অনেক মমতা ও আবেগ নিয়ে বারবার বলেছিল—'পপুলার ফ্রন্ট'। হলের ভেতর বেশ গরম, অনেকেই কোট খুলে ফেলেছে। প্রায় সকলেই ধূমপান করছে, মাথার টুপি ঠেলে দিয়েছে পেছন দিকে। চারপাশের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল দেনিস। দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগে ভরা এ এক জগৎ! একটি স্ত্রীলোকের কোলে ঘুমন্ত শিশু—নিশ্চয়ই বাড়ীতে এমন কেউ নেই যার কাছে শিশুটিকে রেখে আসা যায়। একটি বৃদ্ধের উত্তেজিত চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে—কাঁদছে বলে মনে হয়। কারও সঙ্গে কারও পরিচয় নেই—নতুন এক ভ্রাতৃত্বের টানে বিরাট শহরের কুৎসিত অলিগলি থেকে বেরিয়ে এসেছে এরা। ন্যায়ের জন্যে সংগ্রামের কথা যখন বলা হল, বজ্রমুষ্টি তুলে হাজার হাজার কণ্ঠে এক সঙ্গে উত্তর দিয়ে উঠল সবাই। বক্তারা তেসার মত নয় একেবারেই। সম্পূর্ণ অন্য ধরনের বক্তৃতা—দ্রুত উচ্চারণ, কথা আটকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে যেন উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না বক্তারা, নতুন সব কথা। ক্লান্ত মুখগুলোতে হাসি ফুটে উঠছে মাঝে মাঝে। ধোঁয়ায় অস্পষ্ট হলের ভেতরটা থমথম করছে সন্তানধারণের ক্লান্তিতে, জীবনের রহস্যে। একটি স্ত্রীলোক কুঁকড়ে যাওয়া শুকনো হাতের বজ্রমুষ্টি তুলে ধরেছে ওপরের দিকে—যেন অনেক সন্তান ধারণের বেদনা সয়ে আর সেই সন্তানদেরই কবরে শুইয়ে দিয়ে আসার ক্লান্তির শেষে সে খুঁজে পেতে চায় মুক্ত বাতাস, উত্তাপ আর অভ্যর্থনা, আঁকড়ে ধরেছে এমন একটা কথাকে যার সন্ধান এতদিন জানা ছিল না তার।

আধ ঘণ্টা কাটল, তারপর এক ঘণ্টা, এবং তারপর আরো এক ঘণ্টা কিন্তু দেনিস চলে গেল না, মনোযোগ দিয়ে সব কিছু শুনল। কি শুনল হয়ত সে নিজে আবার বলতে পারবে না, কিন্তু এটা তার কাছে আশ্চর্য এক নতুন জগৎ। প্রত্যেকটি লোকের প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছে সে—অনেক দিন আগে ছেলেবেলায় বৃটনির সমুদ্র প্রথমে দেখার মত একটা আশ্চর্য অনুভূতি।

বারোটার সময় সভা শেষ হল। হঠাৎ দেনিস আবিষ্কার করল সেও 'ইন্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করেছে—গানের কথা তার জানা নেই, কেন গাইছে কি গাইছে, কিছুমাত্র সে ভাবেনি, তবুও সে গাইছে।

একজন শ্রমিক মিশোর কাছে এল—লম্বা বুড়োটে চেহারা, বসা চোখ, গালের ওপর একটা কাটা দাগ। সে বলল, 'আমাদের কারখানায় চারজন লোককে আজ আমরা সভ্য করেছি। শার্লকে বোলো যে ইস্তাহারগুলো কারখানার

বিভাগ হিসেবে ছড়িয়ে দেওয়াই ভাল। বেড়াগুলো বিজ্ঞাপন মারবার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।' তারপর দেনিসের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আপনি কোন জেলা থেকে এসেছেন, কমরেড ?'

দেনিস লাল হয়ে উঠল। তার হয়ে মিশো উত্তর দিল, 'এই কমরেড একজন ছাত্রী।'

দেনিস মনে মনে ভাবল, 'তাহলে ও আমাকে নিজেদের লোক বলে ভেবেছে।' যে জন্যেই হোক, এই ভেবে খুশি হয়ে উঠল সে।

তুজনে রাস্তায় বেরিয়ে এল। পারীর নীলাভ ধূসর, উত্তপ্ত, চঞ্চল বাতাস বসন্তের কথা মনে করিয়ে দিল আবার।

'ভাল লাগল ?' জিজ্ঞাসা করল মিশো।

'ঠিক বলতে পারছি না। শুধু ভাল লেগেছে এই বললে ঠিক বলা হল না। আমি রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়েছি।'

'ঠিক বলেছেন। কেন জানেন—আজকের এই সন্ধ্যার মত, বাতাসের এই অনুভূতির মত রোমাঞ্চকর এই সভা। আশা, সব কিছু বদলে দেবার আশা—এই একটিমাত্র কথায় একে প্রকাশ করা যায়।'

'দাদার কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু এই যে লোকটি আপনার কাছে এসেছিল তার কথায় হয়। লোকটির কথাগুলো খাঁটি। অন্য সকলের সম্পর্কে এই কথা বলা চলে কিনা জানি না, কিন্তু ওর সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য আমাকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে। হঠাৎ একেবারে সব কিছু বুঝে নেওয়া খুব শক্ত।

মিশো আবার কথা বলতে শুরু করল—তার নিজের এবং অপরের আশা আকাঙ্ক্ষার কথা। এত কথা মিশো বলল যে দেনিস বিশেষ কান দিল না তার কথায়, কিন্তু মিশোর গলার স্বর ভাল লাগছে তার। বিদায় নেবার সময় মিশোর ধূসর বিদ্রূপাত্মক চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল সে। 'ঠিক তাই!' উৎসাহিত হয়ে বলল মিশো।

দেনিস হাসল, 'আবার আমাদের দেখা হবে। মালের বক্তৃতায়, বা আবার যদি কোন সভা হয় আমাকে চিঠি লিখবেন আমি আসব। আচ্ছা যাই।'

অবশেষে বাড়ী এল সে। বারান্দার দেওয়ালে ছবি ঝুলছে, বিখ্যাত বিখ্যাত বিচারের ছবি—খুনী ও অপরাধীরা প্রহরীবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর রোগা আঙুল ওপরের দিকে তুলে আইনজীবীর পোষাকে বক্তৃতা দিচ্ছে তেসা।

ফ্ল্যাট বাড়ীটা ডোবার মত—ওপরে স্থির ও শান্ত কিন্তু গভীর অন্তর্দেশে দুরন্ত চাঞ্চল্য। দেনিসের বাবা এখনো বাড়ী আসেনি। সে এখন পলেতের বুকে মাথা রেখে দেসেরের কূটবুদ্ধি ভুলতে চেষ্টা করছে। স্বামীর জন্যে অপেক্ষমানা দেনিসের মা শোবার ঘরে পেসেন্স খেলছেন; মাদাম তেসা মূত্রগ্রন্থি-প্রদাহ রোগে ভুগেছেন। মৃত্যুকে, বিশেষ করে নরককে ভয় করেন তিনি। খ্রীষ্টধর্মে তাঁর অচলা বিশ্বাস। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে নানা সাংসারিক কাজে, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়বার পর পরলোকের চিন্তা করতে শুরু করেছেন তিনি। কনভেন্ট-এ ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়েছে, আর ভেবেছেন যে, এবার শেষ বিচারের দিন আসছে, সব কিছুর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাঁকে—চেম্বারে তেসার ধর্ম-বিরোধী বক্তৃতা, আধা-ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে তেসার কীর্তিকলাপ, ছেলে লুসিয়ঁর ধর্মে অবিশ্বাস ও নৈতিক অধঃপতন, সব কিছুর জন্যে। এই সব থেকে কে তাঁকে রক্ষা করবে? দেনিস? কিন্তু দেনিস তো প্রায় সব সময়েই নির্বাক, কখনো গির্জায় যায় না, মা-র কাছে জবাবও দেয় না কখনো। হয়ত দেনিসও তার বাবার মত হয়ে উঠেছে...

'কে? দেনিস? আমি ভেবেছিলাম তোমার বাবা। একবার শুনে যাও, কোথায় গিয়েছিলে?'

'বুল মিশ্-এর একটি কাফেতে আমি বসেছিলাম। আজকের রাতটা ভারী সুন্দর।' তার মাথায় প্রথমে যা এল তাই বলে গেল দেনিস, সভার কথা বলে মার দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে তুলবার ইচ্ছা ছিল না।

কিন্তু মাদাম তেসা কেঁদে ফেললেন।

'এ্যাঁ? বুল মিশ্-এ? তুমিও তাহলে তোমার বাবার মত হয়ে উঠছ!'

নানা কথা বুঝিয়ে মাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল দেনিস। সে বলল যে মেয়েবন্ধুদের সঙ্গেই সে এতক্ষণ সময় কাটিয়েছে, রাত্রিবেলা মার দরকার হবে বলে ভেরভ্যাঁর জল নিয়ে এসেছে সে। কিন্তু মাদাম তেসা তবুও অবুঝের মত অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

মাকে শুভরাত্রি জানাবার জন্যে ঘরে ঢুকল লুসিয়ঁ। লুসিয়ঁর সঙ্গে সঙ্গে দেনিসও লাইব্রেরীতে এল। সারাটা সন্ধ্যা লুসিয়ঁ কাটিয়েছে স্যুর্রিয়ালিস্ট্‌দের সঙ্গে। সে বলল, 'ওরা ভারী মজার কথা বলে। ওদের মতে সব কিছুর যৌন প্রকৃতি আছে। চিন্তা, রং, শব্দ—কোন কিছু বাদ দেয় না ওরা। বুঝতেই পারছ ওদের এই সব কথা শুনে সকলেই অত্যন্ত

বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—বিশেষ করে কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা তো ফ্রয়েডের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। একজন গোঁড়া কমিউনিস্ট কিভাবে তর্ক করে, কোনদিন শুনেছ ?'

দেনিস মাথা নাড়ল। একজন বলী-দ্বীপের নর্তকীর কথা বলতে শুরু করল লুসিয়ঁ।

'ওকে দেখে যেন গগ্যাঁর ছবির তত্বটা বোঝা যায়। মনে হবে, পাশবিক কামনাই ওর কাছে একমাত্র বাস্তব সত্য।'

'আমাকে এসব কথা কেন বলছ ?'

'কারণ তোমার বয়স এখন বাইস হয়েছে, সতের নয়। ওই খুকীপনা আর মানায় না তোমাকে। না কি তুমি মার মত হবে ঠিক করেছ—ব্রহ্মচারীদের জীবনীপাঠ আর 'পেসারী' ব্যবহার একসঙ্গে চলতে থাকবে।' তারপর দেনিসের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্ট গলায় বলল, 'রাগ করিস নে, ইঁদুরমুখী ! তোর মনে কষ্ট দেব বলে একথা বলিনি। শুভরাত্রি !'

নিজের ঘরে ঢুকল দেনিস। জামা কাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল তারপর, কিন্তু ঘুম এল না। ঘড়িতে দুটো বাজল...আড়াইটে, তিনটে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বাবা বাড়ী এসেছে, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় গান গাইছে গুন গুন করে—তুঁত ভা বিয়ঁ, মাদাম লা মারকিস। তারপর আবার নিস্তব্ধতা।

মনে হল, সমস্ত বাড়াটা কবরের মত তাকে চেপে ধরেছে। ব্রিটনির স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ল, কত ছেলেমানুষি খেলায় তখন তারা মেতে থাকত। আর ব্রিটনির সেই সমুদ্র। জেলেরা ঘুরে বেড়াত রাস্তায় রাস্তায় বস্তার লাল কাপড়ের ট্রাউজার পরে, তাদের দেখতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গলদা চিংড়ীর মত। ঝড়ের সময় কেঁপে উঠত সমস্ত বাড়ীটা—গ্লাশকেসের ভেতর ঘড়িটা কর্কশ শব্দ করে উঠত, ঝন্ ঝন্ করে উঠত তাকের ওপর প্লেটগুলো, আর আনন্দে নেচে উঠত মেয়েদের মন।

স্কুল ছেড়ে বাড়ী আসবার পর দেনিসের মনে হল, দম বন্ধ হয়ে সে মারা যাবে। শ্বাসরোধকারী পারিবারিক ঘনিষ্ঠতায় হাঁপিয়ে উঠল সে।

কোন কিছু গোপন ছিল না তার কাছে। বাবার কীর্তিকলাপ, লুসিয়ঁ ও জিনেৎ—সব কথাই সে জানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সকলের মনে একটা পারিবারিক আনুগত্যের ভাব বজায় ছিল। প্রতিদিন একসঙ্গে খেতে বসত

সকলে, পারিবারিক একতা অটুট ছিল ওপর ওপর—সব কিছু মিলিয়ে জোড়াতালি দিয়ে চলছিল কোন রকমে।

স্থাপত্য সম্বন্ধে অকৃত্রিম আগ্রহ ছিল দেনিসের। দেনিসের পূর্বপরিচিত মানুষেরা তার মার মত নয়—তাদের পরিপূর্ণ হৃদয় ছিল একাগ্র বিশ্বাসে ভরা। ওদের চারকোনা গির্জাগুলো দেখতে যেন খামার বাড়ীর মত। বাবার ব্যর্থতা, মার গোঁড়ামি, দাদার উদ্দেশ্যহীন উচ্ছ্বাস এই সব কিছু এড়িয়ে সে অতীতের ভেতর আশ্রয় নিত।

কিন্তু আজ যা ঘটল তার ফল বহুদূর প্রসারী। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই পথের শেষ পর্যন্ত সে বুঝতে চেষ্টা করবে। বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে সে শুধু নিজেকে এই প্রশ্নই করতে লাগল, কোথায় এর শেষ? অনেক কিছু মনে পড়ল তার—বৃদ্ধা মজুরনীর উদ্যত বজ্রমুষ্টি, গালে কাটা দাগ শ্রমিক যে তাকে কমরেড বলে সম্বোধন করেছিল, মিশোর স্মিত ধূসর চোখ। বসন্ত রাত্রির বাতাস আর স্যাঁৎসেঁতে রাস্তার নিস্তব্ধতার সঙ্গে যেন সমস্ত কিছু মিশে গেল। দ্রুত হয়ে উঠল দেনিসের হৃৎস্পন্দন। ভোর বেলার ঠাণ্ডা আভাস এল পরদার ফাঁকে। ধূসর কম্পমান আবছা আলোয় ভরে গেল ঘরের ভেতরটা। অস্পষ্ট জিনিসগুলো কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দেনিসের মনে পড়ল 'ঠিক তাই!' হাসল দেনিস, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

১০

কোন কমিউনিস্ট সংবাদপত্রে নিজের বইয়ের সমালোচনা পড়ে লুসিয়ঁ চটে উঠল। বিশেষ করে খারাপ লাগল শেষ লাইনটা যেখানে সমালোচক লিখেছেন—'কয়েকটি উগ্র "বিপ্লবী" অনুচ্ছেদ সন্দেহের সৃষ্টি করে।' মূর্খ! হ্যাঁ, দল শুদ্ধ মূর্খ ওরা! সামাজিক অস্ত্রোপচারের ক্ষমতা ওদের নেই, ওরা জানে শুধু জোড়াতালি দিতে। দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলো মহা উৎসাহে বইটির সমালোচনা করেছে—তারা চায় পল তেসার দুর্নাম, র‍্যাডিকাল ভাবধারায় মানুষ হবার ভয়ংকর পরিণতির একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসেবে বইটিকে তুলে ধরছে তারা। কিন্তু যে গণসংবাদপত্রগুলোর উচিত ছিল লুসিয়ঁকে নিয়ে হৈ-চৈ করা আর তারস্বরে প্রচার করা যে লুসিয়ঁ এই যুগের ভাল, গণস্বার্থের শ্রেষ্ঠ পোষক—তারাও বিশেষ প্রশংসা করল না বইটার।

'বইটিতে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়' এই ধরনের দু একটা মন্তব্য আর শেষ পর্যন্ত 'লেখকের অবিশ্বাসী মন'—এ ছাড়া আর কিছু ছিল না তাদের লেখায়।

লুসিয়ঁ হেসে উঠল হঠাৎ: হয়ত ওরা ঠিক কথাই বলেছে। অল্প কিছুদিন আগে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে চেয়েছিল সে, তখন বন্ধুবান্ধবের কাছে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে এই কথা সে প্রমাণ করবার চেষ্টা করত যে পার্টি শৃঙ্খলা মেনে চলাই শ্রেষ্ঠ আত্মসংযম—বিধাতাপুরুষ সম্পর্কে গ্যেটে যে আত্মসংযমের কথা বলেছে, তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়। এইটেই লুসিয়ঁর প্রকৃতি—মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে, আবার নিবে যায়।

বাবার সম্পত্তি লুসিয়ঁকে রোজগার করবার প্রয়োজন থেকে মুক্ত করেছে। স্কুল থেকে বেরিয়ে অনেক কিছু করবে ভেবেছিল সে। প্রথমে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র, এক বছর পরে শারীরতত্ত্ব অসহ্য মনে হওয়ায় আন্তর্জাতিক আইন পড়তে শুরু করল। তারপর ছায়াচিত্রের ওপর ঝোঁক দেখা দিল তার এবং সহকারী চিত্র পরিচালক হিসেবে কাজে লেগে গেল। ইচ্ছা ছিল, যন্ত্র-যুগের ব্যর্থতার ওপর একটা অসাধারণ ছবি তুলবে কিন্তু তাকে তুলতে হল এমন একটা ছবি যার ভেতর নির্বোধ ভাঁড়ামি ছাড়া আর কিছু নেই—যমজ স্বামী ও প্রণয়ীকে চিনতে বারবার ভুল হচ্ছে নায়িকার, এই ছিল ছবির গল্প। ছায়াচিত্র যখন আর ভাল লাগল না, সাহিত্যিকদের আড্ডায় ঘোরাঘুরি শুরু করল সে, এমন একটা মুখের ভাব করল যেন বিপথগামী প্রতিভা এতদিনে মোহমুক্ত হয়েছে।

ছাব্বিশ বছর বয়সে লুসিয়ঁর সঙ্গে অভিযাত্রী আঁরি লাগ্রাঁজের পরিচয়, সে সময়ে আঁরি লাগ্রাঁজ দক্ষিণ-মেরু অভিযানের তোড়জোড়ে ব্যস্ত। বহুদিন থেকে লুসিয়ঁ দুঃসাহসিকতার স্বপ্ন দেখছে, লাগ্রাঁজকে সে রাজী করাল তাকে সঙ্গে নেবার জন্যে। ডায়েরীতে লুসিয়ঁ লিখল, 'পেঙ্গুইন পাখী দেখতে অনেকটা মিসত্যাঙগে-এর মত। টিনের খাবারে আমার অরুচি ধরে গেছে। মোটামুটি ভালই লাগছে আমার, কিন্তু বড় ক্লান্তিকর।' কয়েক পাতা পরে আর একটা ছোট্ট লাইন লেখা—'আজ সকাল চারটের সময় আঁরি মারা গেছে।' দূষিত ক্ষত হয়েছিল লাগ্রাঁজের, লুসিয়ঁর কোলে মাথা রেখে তার মৃত্যু হল।

পারীতে ফিরে আসবার পর আগের মতই দিন কাটতে লাগল লুসিয়ঁর। স্যুর-রিয়ালিস্টদের প্রদর্শনী ও বৈঠকে নিয়মিত যোগ দিত, কিন্তু বন্ধুবান্ধবের

আলাপ আলোচনার মাঝখানে প্রায়ই সে চুপ করে থাকত। মৃত্যু-আবিষ্ট হয়ে উঠেছিল সে।

এই মনোভাবের ভেতরে তার প্রথম উপন্যাস "মুখোমুখি"র জন্ম। দূরপ্রসারী বিচিত্র আবেদন, ইচ্ছাকৃত উত্তেজক বক্তৃতা, দরদী বর্ণনা—আশ্চর্য রকম সমাদৃত হল বইটা, একটি লোকের মৃত্যু-কাহিনীর ওপর এই উপন্যাস—লোকটি পৃথিবীতে সব চেয়ে বেশী ভালবাসত গণিতশাস্ত্রকে আর তার চার বছরের মেয়েকে, বরফের দেশে তার মৃত্যু হল। ঔপন্যাসিক হিসেবে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেল লুসিয়ঁ। ভবিষ্যৎ প্লান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে লুসিয়ঁ বলল, পারিবারিক জীবনের ভাঙনের ওপর সে একটা বড় উপন্যাস লিখছে। আসলে সে কিছুই লিখছিল না, নিঙড়ে-নেওয়া লেবুর মত নিজেকে মনে হচ্ছিল তার।

লুসিয়ঁ যে এক সময় লেখক ছিল, সে কথা ভুলে যেতে আরম্ভ করল সকলে। প্রথম প্রথম পল তেসাও বিশ্বাস করেছিল যে তার ছেলে বড় সাহিত্যিক হবে, কিন্তু লুসিয়ঁর কুঁড়েমি ও খরচে স্বভাবের জন্যে তার মুখেও আবার অনুযোগ শোনা যেতে লাগল। খরচ না করে লুসিয়ঁ থাকতে পারে না, হাজার হাজার ফ্রাঁ বিনা আড়ম্বরে উড়িয়ে দিতে পারে সে। বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে সব রেস্তোরাঁয় সে যাতায়াত করে, সেগুলো বাইরে থেকে অতি সাধারণ, কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যাবে সব কিছুর দাম অত্যন্ত বেশী। খাবারের তালিকায় যা সব চেয়ে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য, তাই দিয়ে সে আপ্যায়িত করে বন্ধুদের এবং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলে, 'এই সামান্য একটু পানীয়।' যে সব মেয়েকে তার ভাল লাগে, মূল্যবান উপহার দেয় তাদের। তাস খেলাটা তার কাছে নেশার মত, কিন্তু চড়া বাজি না হলে খেলতে বসে না। প্যারীর প্রত্যেকটি জুয়োর আড্ডায় লুসিয়ঁর বিবর্ণ সুন্দর মুখ আর বাদামী চুল অত্যন্ত পরিচিত। কুড়ি হাজার বা ত্রিশ হাজার ফ্রাঁ বাজি হারা তার কাছে কিছু নয়। তার ফল হয় এই যে, শেষ পর্যন্ত মহাজনদের কাছে হাত পাততে হয় তাকে, একজনের কাছে ধার নিয়ে আর একজনের ধার শোধ দিতে হয়। জীবনটা আবার কেমন একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। সেই রকম একঘেয়েমি, একবার দক্ষিণমেরু গিয়েও যা সে দূর করতে পারেনি—প্রাচীনকালের অভিনেত্রীর মত দেখতে যে পেঙ্গুইন পাখী আর টিনের খাবারের বাসি স্বাদ সেই একঘেয়েমিতে নতুন তীব্রতা এনেছিল শুধু।

গ্রীষ্মকালে একদল টুরিস্টের সঙ্গে সে সোভিয়েট ইউনিয়নে গেল। ব্যাপারটা একেবারে আকস্মিক—একজন বন্ধুর সঙ্গে মিশরে যাওয়া ঠিক ছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মতবিরোধ হওয়ায় এক সপ্তাহ থেকে গেল মস্কোতে। অন্য সবার মত সেও ঘুরে-বেড়িয়ে কাটাল সময়টা। মস্কোর যাদুঘর, শিশু-হাসপাতাল, প্রাচীন স্মৃতি—কোন কিছু দেখতে বাকি রাখল না। লুসিয়ঁ কিন্তু এই সবের ভেতর নতুন কিছু পেল না, সে মুগ্ধ হল সোভিয়েট জনসাধারণের প্রবল ইচ্ছা-শক্তি ও কর্মনিষ্ঠ যৌবন দেখে। একদিন ভূগর্ভ-রেলপথ নির্মাণ-কাজে ব্যস্ত একদল শ্রমিকের ভেতর একটি মেয়েকে সে দেখল। মেয়েটির পায়ে ভারী বুট, মুখখানা রোগা আর ফ্যাকাশে, কিন্তু দুই চোখের দৃষ্টিতে জলন্ত প্রতিজ্ঞা; হঠাৎ লুসিয়ঁ বুঝতে পারল—শুধু রেলপথ তৈরী নয়, তার চেয়েও বৃহত্তর কিছু করছে মেয়েটি। মনে মনে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল সে—লাগ্রাঁজের মৃত্যুর পর যেমন হয়েছিল। সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে সে পারী ফিরল।

লোত্রেয়াম ছেড়ে মার্কস্ ধরল সে। এই প্রথম সে আশেপাশের লোকগুলোর দিকে ভাল করে তাকাল। দেখল সর্বত্র মিথ্যাচার, ভণ্ডামি আর বিতৃষ্ণা; তার ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এই উপলব্ধি নিয়ে সে একটা পুস্তিকা লিখল, পুস্তিকার ভাসাভাসা বক্তব্য আর ব্যঙ্গোক্তির ভেতর দিয়ে বুর্জোয়া দর্শন, নীতি ও সৌন্দর্যবোধকে বিদ্রূপ করল সে। লুসিয়ঁর কমিউনিস্ট মতবাদে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে তেসা ভয় দেখাল যে ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু মেজোঁ দ্য কুল্তুর-এর নিয়মিত তরুণ সভ্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল, আসন্ন বিপ্লবের ওপর লুসিয়ঁর প্রত্যেকটি বক্তৃতা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে শুনল তারা, জুয়োখেলা ছেড়ে দিল লুসিয়ঁ—রাজনীতির খেলা তার কাছে অনেক বেশী উত্তেজক বলে মনে হয়েছিল।

ছ-মাস পরে লুসিয়ঁর মনে সন্দেহ উপস্থিত হল। কমিউনিস্টদের কোন বিশেষত্ব রইল না তার কাছে—একটা সাধারণ রাজনৈতিক দল ছাড়া আর কিছু নয় ওরা, পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য ওরাও ভালবাসে, মোরিস শেভালিএর রোমান্টিক গানগুলো গুন গুন করে গাইতে শোনা যায় ওদেরও। লুসিয়ঁর ধারণা, তার সাহস ও বুদ্ধি অন্য যে কোন লোকের চেয়ে বেশী। মনে মনে সে বলল, আর একবার বোকা বনলাম আমি। এই চালেই হয়ত বাজিমাত হবে, কিন্তু আমার উপযুক্ত চাল এটা নয়!

লুসিয়ঁর জীবনে পরবর্তী ঘটনা জিনেতের সঙ্গে প্রেম। নিজের অনুভূতিকে

বাড়িয়ে বলবার অভ্যাস লুসিয়ঁর নেই, কিন্তু জিনেতের সঙ্গে এই নতুন সম্পর্কের কথা খোলাখুলি বলল বন্ধুবান্ধবের কাছে। আশা ছিল, প্রেমকে খাটো করবে বিদ্রূপ করে—কিন্তু এত সহজে প্রেম হার মানে না, জিনেতের নাম উচ্চারণ করবার সময় নিজের গলার স্বরে প্রতিবার ধরা পড়ল সে।

লুসিয়ঁ ও জিনেতের প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় দুজনের অনেক মিল আছে। পৃথিবীর চারদিকে ঢুঁ দিয়ে বেড়িয়েছে দুজনেই। জিনেতের বয়স ত্রিশ, কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেকে বৃদ্ধার মত মনে হয় তার। লিয়ঁর একজন মোক্তারের মেয়ে সে। শহরের অতিনৈতিক পরিবেশ ও বৈচিত্র্য-হীন আবহাওয়া এবং বাপ-মার উগ্র স্বভাব ও সংকীর্ণ মন তার শৈশবকে চেপে ধরেছিল চারদিক থেকে। এখনো মনে আছে, টাকা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিল না বাবা-মার। সকাল-সন্ধ্যা তারা আলোচনা করত—অর্থের অপচয় বন্ধ করবার উপায়, 'ঠিকমত' বিয়ে হওয়ার প্রয়োজনীয়তা, বাড়ীর বৌদের নিন্দনীয় আচরণ, উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতা, পর-পুরুষের সঙ্গে ঢলাঢলি, বা ('জিনেৎ, বাইরে যাও তো') সতীত্বহীনতা। আর একটি লোকের কথা তার মনে আছে—বাবা-মার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল এই লোকটির ওপর। বিরাট এক কারখানার মালিক লোকটি, চোখে শাদা দাগ, শিকারী-বন্দুকের গুলিতে স্ত্রীর প্রণয়ীকে হত্যা করেছিল সে কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী লোক বলে বেকসুর খালাস পেয়েছে। মৃত লোকটি চুরি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে চুপি চুপি বাড়ীর ভেতর ঢুকেছে, এই কথা প্রমাণ হয়েছিল বিচারে। বাড়ীতে আসবাবগুলোর আচ্ছাদন সারা বছরে একবারও খোলা হত না। জিনেতের মার সব সময়ে একটা আতঙ্ক থাকত, তার স্বামীর অসাবধানে মদের কৌটা পড়ে পরিষ্কার টেবিলক্লথগুলোতে দাগ ধরে না যায়।

জিনেতের জীবনে প্রথম পুরুষ এসেছিল আঠার বছর বয়সে। লোকটি ডাক্তার, বিবাহিত। জিনেতের যেবার হাম হয়েছিল, এই ডাক্তারের চিকিৎসায় ছিল সে। আসলে জিনেৎ ডাক্তারকে ভালবাসেনি, ডাক্তারের ওপর খাঁটি বিতৃষ্ণা ছিল তার। ব্যাপারটা কিন্তু জিনেতের বাবার কাছে গোপন রইল না, 'তোর উপযুক্ত স্থান বেশ্যালয়ে' এই কথা বলে দূর করে দিল মেয়েকে। ডাক্তার দুঃখিত হয়েছিল, প্যারী যাবার জন্যে চারশো ফ্রাঁ দিল জিনেৎকে। সেই দিন রাত্রে ট্রেনে আসবার সময় নিজের কাছে জিনেৎ বারবার এই প্রশ্ন করেছে, 'কেন আমি এ কাজ করলাম?' কিন্তু কোন উত্তর সে পায়নি।

চেহারার দিক থেকে ডাক্তার এমন কিছু কন্দর্পকান্তি নয়, প্রকাণ্ড কণ্ঠমণি লোকটার, নোংরা গন্ধ লেগেই আছে মুখে সব সময়ে। তবুও এই পরিচয়ের সূত্র ধরে একদিন যে সে সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিল তার কারণ হয়ত এই যে, সেদিন পুরো তিন ঘণ্টা তার মা চাকরকে এই বলে ধমকেছিল, 'বাজার থেকে যা কিনে এনেছিস, ওগুলো কি মাংস নাকি, ও তো শুধু হাড়।'

একটি বিভাগীয় দোকানে পণ্য-বিক্রেতার কাজ পেল জিনেৎ। সকাল বেলা যখন সে কাজে আসত, তার চোখের চারপাশে কাল দাগ কারও কাছে লুকনো থাকত না। অন্য মেয়েরা বলাবলি করত, উচ্ছৃঙ্খল জীবন কাটাচ্ছে সে। আসলে সে অবসর সময়টুকুতে রাত জেগে বই পড়ত। প্রথমে আধুনিক লেখকদের বই সে ধরেছিল—আশা ছিল, তার আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর এই সব লেখার ভেতর খুঁজে পাবে। কিছুদিনের মধ্যে স্তঁদল্, দস্তয়েভ্স্কি ও শেক্স্পিয়রের অনুরাগী হয়ে উঠল সে। যে জীবনপ্রবাহ এতদিন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে হত, এখন তা নতুনতর সার্থকতা ও নাটকীয় পরিণতি নিয়ে ধরা দিল। মানুষের সংকীর্ণতা, নির্লিপ্ততা—এসব দুর্বোধ্য ছিল তার কাছে, দুর্বোধ্য ছিল বলে প্রতিকূল মনে হত, এখন সব কিছুর ভেতর একটা সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলা খুঁজে পেল সে। তার সাংসারিক অভিজ্ঞতা খুবই কম, লোকের সঙ্গে মিশতে সে ভালবাসে না, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে বহু বিষয়ে গভীরতর জ্ঞান ও জীবনের প্রতি পূর্ণতর দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করল সে।

নিজের ভাগ্যকে জিনেৎ যে ভাবে বিশ্লেষণ করত শিল্প বা সাহিত্য সম্পর্কে সেই মনোভাব তার ছিল না। জীবনের আবেগটাই বড় কথা—সেখানে সময় অসময়ের বিচার করত না সে। দোকানে খদ্দের না থাকলে চাপা গলায় অভিনয় শুরু করে দিত, রাসীনের নায়িকা বা নির্বোধ, গ্রাম্য স্বপ্নবিলাসিনীর ভূমিকায় কল্পনা করে নিত নিজেকে।

যে রেস্তোরাঁয় সে খেত, সেখানে ফিজে নামে একজন মধ্যবয়স্ক অভিনেতার সঙ্গে তার আলাপ হল। কিছুদিন পর একসঙ্গে থাকতে শুরু করল দুজনে। পরস্পরের প্রতি কিছুমাত্র প্রেম ছিল না তাদের, একটা বিষয়ে শুধু মিল ছিল যে সুখ ও সঙ্গ থেকে দুজনেই বঞ্চিত। জিনেতের চেহারা দেখে ফিজে আকৃষ্ট হয়েছিল। জিনেতের চেহারার ভেতর একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে, যেখানেই সে যায় সকলের মনোযোগের পাত্রী হয়ে ওঠে। শান্ত মুখের ওপর দুটো

বড় বড় আয়ত বিস্ফারিত চোখ কেমন যেন অদ্ভুত। তাকে দেখে মনে হয় যেন সে একটা দারুণ দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছে বা তীব্র প্রেমের দুঃখ সহ্য করছে বা এমন একটা আনন্দে ভরে উঠেছে যা মানুষের জীবনে একবার মাত্রই আসে। ফিজের আরো ভাল লাগল এই জন্যে যে মেয়েটি তাকে যত্ন করত, পাগলী মেয়েটার মনটা কিন্তু বড় নরম। জিনেতের বাবার বয়সী হওয়া সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠাহীন, খুঁতখুঁতে ও এলোমেলো অভিনেতাটিকে শিশুর মত দেখাশোনা করত জিনেৎ। লোকটিকে সে ভালবাসত না, কিন্তু একথাও কোনদিন তার মনে হয়নি যে কাউকে সে সত্যিই ভালবাসতে পারে। উপন্যাস বা নাটকের জীবনের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে কোনদিন সে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেনি। করেনি বলেই রাসীনের নায়িকা বাস্তব জগতে নিশ্চিন্ত মনে মোজা বুনছে। কয়েক মাস পরে দোকানের চাকরি ছেড়ে দিল সে, 'জিমনাসে' থিয়েটারের অভিনেত্রী হিসেবে ঢুকবার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল ফিজে। ছোট ছোট ভূমিকায় সে নামত—হঠাৎ-ভয়-পাওয়া ঝি, গাঁয়ের বোকা মেয়ে বা এই ধরনের ছোটখাটো চরিত্র। বড় অভিনেত্রী হবার উচ্চাশা পোষণ করত না সে। থিয়েটারের আনন্দমুখর আবহাওয়া ভাল লাগত তার এবং কর্মজীবনের এই পরিবর্তন ফিজের জন্যে সম্ভব হয়েছে বলে তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।

এক বছর পর ফিজে তাকে ত্যাগ করল। একজন নাম-করা গায়িকা অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছিল ফিজে। জিনেতের কাছে এই কথা প্রকাশ করবার আগে বহুদিন সে ইতস্তত করল, তার ভয় ছিল এ কথা শুনে ঈর্ষা, অভিমান, আর চোখের জলে তুমুল একটা কাণ্ড করবে জিনেৎ। কিন্তু তেমন কিছুই হল না, এমন একটা অবজ্ঞা ও নিস্পৃহা নিয়ে জিনেৎ তার কথা শুনল যে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে সে বলল, 'আমার বিশ্বাসই হয় না তুমি আমাকে কোনদিন ভালবেসেছিলে।' জিনেৎ অম্লানবদনে স্বীকার করল, কোনদিন সে ভালবাসেনি।

মারেশাল নামে মেজোঁ দু কুলতুর-এর একজন পরিচালকের খেয়াল হয়েছিল, একটা 'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়' গড়ে তুলবে। অভিনেতা, অভিনেত্রী খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। পেশাদার অভিনেতারা কেউ যোগ দিতে চাইল না, কারণ তাদের ভয় ছিল যে সমস্ত পরিকল্পনাটা শেষ পর্যন্ত ফেঁসে যাবে। একদিন মঞ্চের সিঁড়িতে জিনেৎকে দেখল মারেশাল, দেখেই বুঝতে পারল প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে মেয়েটির মধ্যে, জিনেতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে বোঝাতে

চেষ্টা করল বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা হিসেবে বড় অভিনেত্রী হতে পারে সে। বারবার বলল 'কী চোখ! কী গলা! আপনি যদি শুধু নিজের গলাটা শুনতে পেতেন!' মারেশাল ঠিক করেছিল, 'নিষ্ফল বসন্ত' নাটকটা মঞ্চস্থ করবে, এই নাটকের নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার প্রস্তাব করল জিনেতের কাছে। রিহার্শালের সময় জিনেতের অভিনয়ে অসাধারণ সংযম ও আবেগ দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সকলে। দুর্ভাগ্য বশত ঠিক এই সময়ে সুপরিচিতা অভিনেত্রী জাভোগ 'ওদেয়ঁ'-এর পরিচালককে উচিত শিক্ষা দেবার জন্যে রাগে ফুলতে ফুলতে মারেশালের কাছে ছুটে এল! জাভোগ একেবারেই দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রী, কিন্তু তার নামডাকের জন্যে প্রচারের খানিকটা নিশ্চয়তা ছিল। জিনেতের ভূমিকায় সে অভিনয় করবে ঠিক হল। এই প্রতিবন্ধককে নিঃশব্দে মেনে নিল জিনেৎ এবং ছোট একটি চরিত্রে অভিনয় করতে রাজী হল। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের পর ঘরে ফিরে এসে অভিনয়ের ভঙ্গীতে অনেকক্ষণ সে কথা বলল—সেই সব কথা যা মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বলবার সুযোগ পায়নি।

'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়' ভেঙে গেল কিছুদিনের মধ্যেই। একটা ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে বেড়াল জিনেৎ, দুটো গ্রীষ্ম কাটল ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে। তারপর যখন শরীর ভেঙে পড়েছে, দু বেলা খাবার জোটে না এমনি অবস্থা, 'পোস্ট পারিসিয়েন' বেতারে একটা চাকরি জুটে গেল তার।

লুসিয়ঁর সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল 'বিপ্লবী নাট্য সম্প্রদায়'-এর রিহার্শালে। প্রথম দৃষ্টিতেই লুসিয়ঁ তার প্রেমে পড়েছিল। ঘটনাটা ঘটেছিল যখন লুসিয়ঁ নিজেকে পুরোপুরি বিপ্লবী মনে করত। 'নিষ্ফল বসন্তের' কথাগুলোকে মনে হত উত্তেজিত পারীর আবেগময়ী প্রকাশ। জিনেতের গলার স্বর সেই সব কথায় এমন একটা পরিপূর্ণতা ও গাম্ভীর্য এনেছিল যা লুসিয়ঁ কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা বা প্রবন্ধে খুঁজে পায়নি।

লুসিয়ঁকে দেখে রীতিমত আশ্চর্য হয়েছিল জিনেৎ। উপন্যাসের নায়কের মত কথা বলে এমনি একজন পুরুষকে এই সে প্রথম দেখল। সামাজিক নীচতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাত লুসিয়ঁ, আর এই নীচতা মুছে দেবার জন্যে আসন্ন ঝড়ের কথা বলত বারবার। এই সমস্ত কথা, আর লুসিয়ঁর আগুনে রঙের চুল, বিবর্ণ মুখ ও প্রবল অঙ্গভঙ্গী—সব কিছু মিশে একাকার হয়ে যেত জিনেতের কাছে। লুসিয়ঁর প্রত্যেকটি কথা সে বিশ্বাস

করেছিল। তারপর লুসিয়ঁ যেদিন প্রেম নিবেদন করল, আত্মসমর্পণ করল জিনেৎ। এই আত্মসমর্পণের কারণ লুসিয়ঁর প্রতি তার প্রেম যদি না হয়, তবে অন্তত একটা মানসিক আবেগ তো বটেই।

হয়ত তার মনে প্রেম জাগত, কিন্তু লুসিয়ঁর জন্যেই সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি। তার কাছে এলেই লুসিয়ঁ কেমন কৃত্রিম ও বাচাল হয়ে উঠত। জিনেতের বয়স আর একটু বেশি হলে সে অনায়াসে হেসে উঠতে পারত লুসিয়ঁর আত্মপ্রচারের কাহিনী শুনে। দিনের পর দিন লুসিয়ঁর মুখে একই ধরনের আত্মপ্রচার শুনে মাঝে মাঝে তার মনে সন্দেহ হয়েছে লুসিয়ঁ তাকে সত্যিই ভালবাসে কিনা। লুসিয়ঁর দিক থেকে একথা বলা চলে, জিনেতের প্রতি তার অনুরাগ দিনের পর দিন বেড়েছে। জিনেতের প্রতি তার মনোভাব অত্যন্ত জটিল, কিন্তু জিনেৎকে সে ভালবেসেছে নিজের বিশিষ্ট পদ্ধতিতে, লিরিক কবিতার মত বা সমুদ্র-পাখীর মত জিনেৎ তার কাছে বিশেষ একটা রূপের প্রতীক। জিনেতের জন্যে সে মৃত্যুকে বরণ করতে ইতস্তত করবে না, কিন্তু জিনেৎ যদি কোন সময় অসুস্থ হয়ে তাকে সকাল পর্যন্ত থাকতে বলে তবে সে নানা রকম কথা বলতে শুরু করবে—বাড়ীতে সকলে তার জন্যে অপেক্ষা করছে, বাড়ী না গেলে মা ভাববে, ইত্যাদি। আসলে এসব ছুতো, সত্যি কথাটা এই—নিশ্চিন্ত হয়ে রাতটুকু ঘুমোতে চায় সে।

'ফিজের মত লুসিয়ঁও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে' এই কথাটা বহুবার মনে মনে ভেবেছে জিনেৎ। এই কথাও তার মনে হয়েছে যে তার নিজেরই উচিত লুসিয়ঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া। কিন্তু তার প্রকৃতি এত বেশী সহিষ্ণু যে একাজ কখনো তার পক্ষে সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ! জিনেতের মত মেয়ের পক্ষে কোন পুরুষকে ছেড়ে যেতে হলে, নিজের চেষ্টায় কখনো সম্ভব হবে না, অন্য কোন পুরুষের হাত ধরতে হবে! হয়ত এখনো তার আশা আছে, লুসিয়ঁকে নিয়ে সে সুখী হবে, নিস্তব্ধ ধূসর শান্তিতে ভরে উঠবে অন্য সকলের মত।

আঁদ্রে ও পিয়েরের সঙ্গে যেদিন লুসিয়ঁর দেখা হয়েছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত জিনেতের সঙ্গেও আর সে দেখা করেনি। জিনেৎকে টেলিফোনে ডাকল লুসিয়ঁ। জিনেৎ জানাল, তার শরীর অসুস্থ। কয়েক মিনিট পরে জিনেৎ আবার টেলিফোন করে বলল যে লুসিয়ঁর সঙ্গে তার দরকারী কথা আছে। টেলিফোনে অত্যন্ত উত্তেজিত বলে মনে হল জিনেৎকে।

সঙ্গে সঙ্গে লুসিয়ঁর মনে একটা সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল—'আঁদ্রে!' সাবধান হয়ে গেল সে। জিনেৎকে বলল যে তার সঙ্গে সে স্টুডিওতে দেখা করবে, সেখান থেকে সান্ধ্যভোজনের জন্ত দুজনে 'ফুকেৎ'-এ যাবে।

বাইরে যাবার ইচ্ছা ছিল না জিনেতের, বলল, তার শরীর অসুস্থ এবং কয়েকটি দরকারী কথা বলবার জন্তে লুসিয়ঁকে সে নিরিবিলি পেতে চায়। বাইরে দেখা করবার জন্তে লুসিয়ঁ জোর করতে লাগল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাহিত্যিক ও অভিনেতারা জড়ো হয় 'ফুকেৎ'-এ, আর সবাই যখন ঈর্ষাভরা দৃষ্টিতে জিনেতের দিকে তাকিয়ে থাকে মনে মনে খুশি হয় লুসিয়ঁ।

বইয়ের বিরূপ সমালোচনা হওয়া সত্বেও লুসিয়ঁর মনটা আজ খুব ভাল, খোশমেজাজে অয়েস্টার ও মদ আনবার আদেশ দিল সে। জিনেৎ চুপ করে রইল। লুসিয়ঁ বলতে লাগল তার বইয়ের কে কি সমালোচনা করছে। 'অবিশ্বাসী মন—তাই মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞাসা করল সে।

কোন কথা বলল না জিনেৎ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কোন একটা চিন্তায় একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে সে। লুসিয়ঁ সচেতন হয়ে উঠল। তার ওপর কমিউনিস্টদের অবিশ্বাস, জিনেতের ওপর চারদিকের বহু পুরুষের প্রশংসাভরা দৃষ্টি—সব কিছু ভুলে গেল সে। ঈর্ষা ও সন্দেহ জেগে উঠল—জিনেৎ নিশ্চয়ই আঁদ্রের প্রেমে পড়েছে। মনে মনে ঠিক করল, এই ব্যাপারের যা হোক একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজই সে করবে।

সে বলল, 'আগামী সোমবার থেকে আঁদ্রের ছবির প্রদর্শনী শুরু হবে। ওরা বলে, ওর আঁকা ল্যাণ্ডস্কেপ্‌গুলো বেশ ভাল, প্রদর্শনী শুরু হবার আগে ঘরোয়াভাবে দেখে আসবে নাকি একবার?'

'মনে হচ্ছে না যেতে পারব। ছবি দেখবার মত মনের অবস্থাই নেই।'

কথাগুলো জিনেৎ এত স্বাভাবিক ও নিস্পৃহভাবে বলল যে লুসিয়ঁ আশ্চর্য না হয়ে পারল না। জিনেতের ওপর সে ভুল সন্দেহ করেছিল, আঁদ্রের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক নেই। তারপর এক বোতল শাবলি পান করবার পর সমস্ত ভয় আর আশঙ্কা একেবারে মুছে গেল তার

মন থেকে। তখন সে পুরনো কথায় আবার ফিরে গেল—যে কথাগুলো নিয়ে আজ সারাদিন মনে মনে নাড়াচাড়া করেছে সে।

সে বলল, 'ওরা কেন 'অবিশ্বাস'-এর কথা বলছে, তা আমি মোটামুটি বুঝতে পারি। সে দিন একজন কমিউনিস্টের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। "লুমানিতে" পত্রিকার কর্মী তিনি, থাকেন পুরোপুরি বুর্জোয়া ধরনের ফ্ল্যাটে, চিরাচরিত প্রথা মত রোদ্যাঁর 'থিঙ্কার' এবং এমনি সব ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সাজিয়েছেন। আমি যেতেই তাঁর স্ত্রী প্রথামত খাবার দিয়ে গেলেন এবং তিনি স্ত্রীর রান্নার প্রশংসাও করলেন কিছুক্ষণ ধরে। চারটি ছেলেমেয়ে, বড়টি বাবার সামনে বসে হোম-টাস্ক করছে। সমস্তটা মিলিয়ে কি রকম ধারণা হয়? এই ধরনের লোকেরা শুধু ভোট দেওয়া ছাড়া আর কী করতে পারে? কিন্তু এই মধ্যবিত্তরাই যখন…'

তর্ক করতে জিনেৎ ভালবাসে না, কিন্তু আজ হঠাৎ সে অপ্রত্যাশিতভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'পুরুষের স্ত্রী-পরিবার থাকবে, এটা কি অপরাধ? তোমাকে বহুবার বলেছি আমিও স্বামী-ছেলেমেয়ে চাই, সংসার ছাড়া স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ সুখী হতে পারে না। এই কথাটুকু কি তুমি বোঝ না?...মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, তুমিও তাই চাও কিন্তু কথাটা স্বীকার করবার সাহস নেই...পরিবার-পরিজনহীন জীবনের কোন অর্থ নেই লুসিয়ঁ, সে জীবন এত নিঃসঙ্গ আর এত নিরালম্ব!'

লুসিয়ঁ বলল, 'সব সময়ে নয়। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মানসিক প্রকৃতি ও সমসাময়িক যুগের ওপর। আমাকে যদি পরিবার পরিবৃত হয়ে বাস করতে বলা হয়, আমি বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করব। আমার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অন্য কিছু আর সে জন্যে আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি। বিয়ে করে সংসারী হওয়া আমার কাছে অসহ্য মনে হয়। একি, কি হল তোমার?'

'কিছু না। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি অসুস্থ। বড় মাথা ধরেছে। এক গ্লাশ জল দিতে বল, এ্যাস্‌পিরিন্‌ খাব।'

লুসিয়ঁ বলে চলল: সময় এসেছে আত্মত্যাগের, একাকীত্বের, নির্ভিকতার। এখন পারিবারিক আরামের আশ্রয় খোঁজা বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছু নয়। জিনেৎ কোন মন্তব্য করল না, তার উত্তেজনা শান্ত হয়ে এসেছে।

'মুকেৎ' থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুজনে, সাঁজ-এলিজেতে ঘুরে ঢুকল একটা সরু অন্ধকার রাস্তায়। একটা ডাক্তারখানার সামনে জিনেৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দোকানের আলোকোজ্জ্বল জানলায় সবুজ গোলক জ্বলছে, সেই সবুজাভ আলোয় জিনেতের মুখটা মড়ার মত ফ্যাকাশে দেখাল।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা। এখন আমাকে ডাক্তার খুঁজে বার করতে হবে...' জিনেতের গলা শান্ত, অনুত্তেজিত।

করুণায় ভরে উঠল লুসিয়ঁর মন—তীব্র বেদনা বোধের মত করুণা।

'ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সত্যিই কি দরকার?' অস্ফুট স্বরে বলল সে।

তীক্ষ্ণ হাসিতে ফেটে পড়ল জিনেৎ, 'থাক, তোমার যা বক্তব্য সব শুনেছি। আর না বললেও চলবে—বিয়ে করে সংসারী হবার সময় নয় এটা।'

লুসিয়ঁর মুখে স্বাভাবিক শান্তভাব ফিরে এল। তাই দেখে রেগে উঠল জিনেৎ। আগেকার মত কৃত্রিম ও উৎফুল্ল স্বরে সে বলল, 'তোমার উত্তেজিত হবার কোন কারণ নেই। তুমি এজন্যে দায়ী নও।'

'তার মানে? বলছ কি?'

'আমি তখন ভ্রাম্যমান দলের সঙ্গে ছিলাম, ভিসিতে। পাশের ঘরে একজন অভিনেতা ঘুমোচ্ছিল। আমার ঘরের দরজা বন্ধ করা গেল না। ছিটকিনি ভাঙা ছিল। যা হবার তাই হল। বুঝতে পারছ?'

রাস্তার দিকে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্যাক্‌সি ডেকে থামাল সে। লুসিয়ঁ চিৎকার করে বলল, 'একটু দাঁড়াও! আমিও যাব।'

'কোন দরকার নেই। একাকীত্ব ও নির্ভিকতা—তাই তো তুমি বলেছিলে, না? শুভরাত্রি!'

জিনেৎ চলে যাবার পরেই লুসিয়ঁর মনে হল, ও তার কাছে মিথ্যা কথা বলেছে। অভিনেতা? ভাঙা ছিটকিনি? একেবারে বানানো গল্প। হ্যাঁ, আঁদ্রেও তো হতে পারে। ঠিক, সেদিন কাফেতে ও একদৃষ্টিতে আঁদ্রের দিকে তাকিয়েছিল আর আঁদ্রেও চোখ ফেরাতে পারেনি। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখল আঁদ্রে নেই, স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করেছিল, আঁদ্রেকে কেন আমি ডেকে আনেনি। হ্যাঁ, কোন ভুল নেই, এই ব্যাপারের মূলে রয়েছে আঁদ্রে!

বৃষ্টির পর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ রাজসভার মাজা-ঘষা মেঝের মত ঝক্‌ঝক্ করছে। ভিজে নীল পীচের ওপর ফুটে উঠেছে ঘূর্ণমান গাড়ীর চাকার কমলা ও

বেগুনী রঙের জটিল দাগ। ট্রপিকাল বনস্পতির মত উঁচু উঁচু আলোগুলো রাস্তার ধারে জ্বলছে, তুইলেরিস বাগান থেকে ভেসে আসছে ভিজে মাটি, গাছ আর বসন্তের গন্ধ। বিরাট আনন্দোৎসবের প্রস্তুতি চলছে যেন, কিন্তু তবুও চারদিকে কেমন একটা অনিশ্চয়তা ও আশঙ্কার থমথমে ভাব। গালে রুজ মেখে একটা বুড়ী বেশ্যা দাঁড়িয়েছিল, লুসিয়ঁকে দেখে হাতছানি দিল। দ্রুত পা চালাল লুসিয়ঁ। নদীর ধারে এসে হঠাৎ থামল সে, ডাক্তারখানার বাইরে দেখা জিনেতের সেই চোখ দুটো মনে পড়েছে আবার। অনেকদিন আগে লাগ্রাঁজ যেদিন তাকে বলেছিল, 'মিছে তর্ক কোরো না, আমি জানি আমার দূষিত ক্ষত হয়েছে'—তখন তার চোখ দুটোও ঠিক এই রকম হয়েছিল দেখতে। জিনেতের কাছে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি ট্যাক্সিতে চেপে বসল লুসিয়ঁ।

বালিশে মাথা গুঁজে কাঁদছে জিনেৎ। পুতুলটা পাশেই পড়ে আছে জিনেৎ কাঁদছে, কারণ রীতিমত আঘাত পেয়েছে সে আজ: এই বানানো গল্প কি করে বিশ্বাস করল লুসিয়ঁ? তার জন্যে এতটুকু সহানুভূতি নেই লুসিয়ঁর মনে, আজ সে একেবারে নিঃসঙ্গ। অবশ্য এর চেয়েও আরো অনেক বড় ব্যথা সে অনুভব করেছে শরীরের শিরায় শিরায় কিন্তু এই অবর্ণনীয় দুঃখের জন্যে তার তো কান্না আসছে না। ডাক্তারখানার বাইরে জিনেতের চোখে যে মৃত্যু-আবিষ্ট দৃষ্টি দেখে লুসিয়ঁ ভয় পেয়েছিল, সেই দৃষ্টি তো এই দুঃখেরই একটা প্রকাশ।

আজই সকালে জিনেৎ সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখেছিল।

লুসিয়ঁ ঘরে ঢুকতেই চোখ মুছে উঠে বসল সে, পাউডারের তুলিটা মুখের ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলল—

'জান লুসিয়ঁ, সব চেয়ে ভয়ংকর কথাটা এই যে আমি তোমাকে ভালবাসি না।'

১১

দেনিস ও মিশোর কাছে অধ্যাপক মালের বক্তৃতায় যে প্রাচীন ও মন্থর শহরটির স্থাপত্য বর্ণিত হয়েছিল, এখন তার রূপ বদলে গেছে, হঠাৎ এসে একেবারেই চেনা যাবে না। আগে যেখানে ছিল অভিজাত মহিলাদের গম্ভীর কথাবার্তা, স্তোত্র পাঠরত পাদ্রীদের ধীর যাতায়াত, ছেলেমেয়েদের ঘুঁটি খেলা—এখন সেখানে দেখা যাবে বহুলোক হাত পা ছুঁড়ে তর্ক করছে।

পপুলার ফ্রন্ট, ফ্যাসিবাদ, আইন ও শৃঙ্খলা, যুদ্ধ—কথাগুলো শোনা যাচ্ছে চারদিকে। বুড়ী বিধবার গালের মত ভাঙাচোরা পুরনো দেওয়ালগুলো হঠাৎ একদিনে বিভিন্ন দলের নির্বাচনী প্রাচীরপত্রে ছেয়ে গেছে। প্রস্রাব-খানার দেওয়ালে বিজ্ঞাপন এঁটে বিভিন্ন প্রার্থীরা পরস্পরের নামে কুৎসা রটিয়েছে, আর তা পড়বার জন্যে ভীড় জমে আছে সারাদিন। প্রাচীন গির্জাগুলোর অলিন্দে লম্বামুখ ঋষি-মূর্তি পাপীজনকে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, পাথরের তৈরী হাতের ওপর চঞ্চল বাবুই পাখী উড়ে বসছে বারবার।

পোয়াটুয়ের ডেপুটি পদের জন্যে আরো তিনজন প্রার্থী দাঁড়িয়েছে তেসার বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে দুজন চার বছর আগে গত নির্বাচনেও তেসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। একজন কমিউনিস্ট প্রার্থী দিদিএ, অপরজন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল গ্রঁাদমেজোঁ। গ্রঁাদমেজোঁ নিজেকে জাতীয়তাবাদী বলে প্রচার করেছে—শহরের রক্ষণশীল দল, অভিজাত শ্রেণী আর পাদ্রীরা তার সমর্থক। গতবার তেসা তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনায়াসে পরাজিত করেছিল। কিন্তু এবার জয়লাভ সম্পর্কে মোটেই নিশ্চিত নয় সে। অবশ্য দেসের তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে—তেসার সমর্থনে প্রচণ্ডভাবে লিখতে শুরু করেছে লা ভোয়া নুভেল্ এবং তিনটি স্থানীয় সংবাদপত্রের মধ্যে দুটোই কিনে নিয়েছে র‍্যাডিকালরা। কমিউনিস্টদের প্রভাব বেড়েছে গত কয়েক বছরে। দিদিএ মোটেই ভাল বক্তা নয়, তবুও তার সভায় প্রচুর লোক আসে। তার ওপর এবার আরো একজন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। তার নাম দুগার, 'ক্রোয়া দ্য ফ্য' র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কৃষিতত্ত্ববিদ। লোকটি কর্মঠ ও উৎসাহী, বাড়ী বাড়ী ঘুরে প্রচারকার্য চালাচ্ছে এবং 'পুঁজিপতি, তান্ত্রিক সম্প্রদায় ও ইহুদীদের দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে' সচেতন করে তুলছে প্রত্যেককে। দোকানদার, কারিগর ইত্যাদি বহু শ্রেণীর লোকের কাছ থেকে আন্তরিক সমর্থন পাচ্ছে সে—কারণ একচেটিয়া ব্যবসাদারদের বাঁধা দরের জন্যে সাধারণ দোকানদাররা ক্ষতিগ্রস্ত, অত্যধিক কর দিতে হয় বলে কারিগররা অসন্তুষ্ট, চাকরিজীবীদের বদ্ধমূল ধারণা যে বিদেশীরা তাদের কোণঠাসা করছে, স্টাভিস্কি-কলঙ্কের পর করদাতারা বিমূঢ় আর তেসা নিজেও এই ব্যাপারে জড়িত!

সভাগুলোতে প্রচণ্ড গোলমাল। আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আসামীকে কি রকম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় সেটা তেসার জানা, এই সব সভায় বক্তৃতা

দেবার সময় বহুবার মনে হয়েছে যেন সে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে। কূটনীতিক তাল্লিল্যোর সঙ্গে হুগার স্টাভিস্কি-প্রসঙ্গ তুলেছে। অসৎ উপায়ে পাওয়া সেই আশি হাজার ফ্রাঁ কি ভাবে খরচ হয়েছিল এখন আর তা মনে নেই তেসার, কিন্তু এই প্রসঙ্গ যতবার তোলা হয়েছে, টেবিলে প্রচণ্ড ঘুসি মেরে তেসা গর্জে উঠেছে, 'ওই অর্থ অকর্মণ্য সৈন্যদের জন্যে পৃথকভাবে বরাদ্দ হয়েছিল।' গ্রাঁদমেজোঁ জোর দিয়েছে তেসার দুর্নীতির ওপর এবং লুসিয়ঁর বই থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, 'এই দেখুন, এই তরুণ লেখক নিজের বাবার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে কি লিখছে।' তেসার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দিদিএ-র কোন কৌতূহল নেই, তার বক্তৃতার বিষয়—কি ভাবে ঘুষ দিয়ে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হয়, কি ভাবে 'দুই শত পরিবার' সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তেসা ধরে নিয়েছে কমিউনিস্ট তালা-কারিগরের বক্তৃতাও তার ওপর ব্যক্তিগত আক্রমণ। দিদিএ-র বক্তৃতার সময় শ্রোতাদের মন্তব্য তার এই সন্দেহকে আরো দৃঢ় করেছে—দিদিএ-র যখন বলে কি ভাবে সংবাদপত্রকে কিনে নেওয়া হয়, শ্রোতারা একসঙ্গে চিৎকার করে ওঠে 'লা ভোয়া নুতেল্।' দুই শত পরিবারকে যখন সে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে, বহু কণ্ঠের আওয়াজ শোনা যায় 'দেসের! দেসের!'

দাঁড়-টানা জাহাজের ক্রীতদাসের মত প্রাণান্তকর পরিশ্রম করছে তেসা। হাজার হাজার ভোটদাতার সঙ্গে কথা বলছে প্রতিদিন, প্রত্যেকের কাছে খুঁটিয়ে খোঁজখবর নিচ্ছে, বৌয়ের স্বাস্থ্য কেমন আছে, ছেলেরা পরীক্ষায় পাশ করেছে কি না, মেয়েদের কবে বিয়ে হবে। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শহরে একটা ব্রিজ ও দুটো স্কোয়ার তৈরী করে দেবে, শহরবাসীদের জন্যে অবসর-ভাতা, সম্মান-পদক ও সরকারী চাকরির ব্যবস্থা করবে। দলাদিএ ও এরিওর দলভুক্ত রক্ত-নাসিকা লোকদের সঙ্গে বার-এ বসে সে মদ খেয়েছে 'রিপাব্লিকের উদ্দেশ্যে!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছে সভায় সভায়, পুস্তিকা লিখেছে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্পাদনা করেছে, ব্যঙ্গচিত্রের পরিকল্পনা দিয়েছে। পর পর ষোলটা রাত্রি পুরো সময় ঘুমাতে পারেনি সে, ভোজ সভায় খেয়ে খেয়ে হজমশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, পলেতের নরম আলিঙ্গনের কথা ভুলে গেছে একেবারে। শহরের একটা বড় কাফের পক্ষ থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে 'পল তেসার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপলক্ষে দিন-রাত্রি খোলা।' এই কাফেতে তেসা বহু উপহার বিলি করেছে তার সমর্থকদের ভেতর—কাউকে ঘড়ি, কাউকে ফাউণ্টেন পেন,

কাউকে একশো ফ্রাঁ-র নোট। পারী থেকে সিনেটের দুজন সভ্যকে আনিয়েছে সে, তারা বক্তৃতা দিয়েছে তার হয়ে। স্থানীয় একজন গায়ক গান বেঁধেছে তেসার নামে—

কুঁদুলে আর খোসামুদেরা তফাৎ যাও,
মাঝামাঝি রাস্তাই ভাল আমাদের পক্ষে।
দু বেলার পেটভরা খাবার আর সুখী জীবন যাপন—
তেসার আমলে আর কোন ভাবনা থাকবে না আমাদের।

তেসা তার সব চেয়ে বড় চাল হাতে রেখেছিল শেষ মুহূর্তে বাজিমাত করবার জন্যে। মাদাম আঁতোয়ান নামে একটি বিধবার সরকারী-চাকুরে ছেলে তহবিল তছরুপের অভিযোগে দশ বছর কারাদণ্ডের শাস্তি পায়। আসলে আঁতোয়ানের দোষ ছিল না এবং তেসার চেষ্টায় এই মামলার পুনর্বিচার হয়েছিল। বিরাট এক সভায় এই ঘটনা প্রকাশ করা হল, বিধবা আঁতোয়ান চোখের জল ফেলে রুদ্ধ গলায় বলল, 'পল তেসা মহাপুরুষ!'

ভোট গণনা হবার দিন সন্ধ্যায় তেসা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। উত্তেজিত স্নায়ুগুলোকে শান্ত করবার জন্যে ফলের রস খেতেও কষ্ট হচ্ছিল তার। এই উদ্বেগ তার পক্ষে অসহ্য, জানলার সামনে দাঁড়াল সে। স্কোয়ারের ভেতর ঠাসাঠাসি করে লোক দাঁড়িয়েছে, ভোটের ফলাফল জানবার জন্যে অপেক্ষা করছে অধীর আগ্রহে। দূর থেকে একটি মেয়েকে মনে হল দেনিসের মত। কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল সে। কেন সে এই নোংরা রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে? দুগার বা পপুলার ফ্রন্ট—যে খুশি জিতুক, কি যায় আসে তাতে? সমস্তটাই ফাঁকা বুলি! এর চেয়ে অনেক ভাল ছিল বাড়ীতে স্ত্রী-কন্যার পরিবেশ, সুন্দরী পলেত্তের সাহচর্য। ওই তো জীবন! এই সব বক্তৃতা আর স্লোগান বড় বেশী একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর।

জনতাকে শেষ পর্যন্ত হতাশ হতে হল। নির্বাচনে একজন প্রার্থীরও সুস্পষ্ট ভোটাধিক্য হল না—এক সপ্তাহ পর আবার নির্বাচন হবে ঠিক হল। গত নির্বাচনের তুলনায় তেসা প্রায় তিন হাজার কম ভোট পেয়েছে, গ্রাঁদমেজোঁরও কমেছে, কমিউনিস্টদের ভোট গতবারের তুলনায় অনেক বেশী। সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েছে দুগার।

লোকেরা আবার জল্পনা কল্পনায় মেতে উঠল—'ক্রোয়া দ্য ফ্য'-র সমর্থনে জেনারেল যদি নাম প্রত্যাহার করে তবে দুগারের জেতবার সম্ভাবনা

যথেষ্ট রয়েছে, তেজার সমর্থনে দিদিএ কি নাম প্রত্যাহার করবে? নরমপন্থীরা কাকে ভোট দেবে? কাফেগুলোতে গোল হয়ে বসে নানাভাবে হিসেব করতে শুরু করল সকলে।

বিরক্তিভরে হাই তুলল তেসা। তার আশা ছিল, আজই যা হোক একটা কিছু হয়ে যাবে। কাল বাড়ী ফিরবে সে। এখন এই শহরে আরো এক সপ্তাহ থাকতে হবে তাকে। স্ত্রীর কাছে সে একটা তার করল—'আবার ভোট হবে। বুধবার একটায় পৌছব। ভালবাসা।' সামনের এক সপ্তাহ আবার সেই যন্ত্রণার ভেতর কাটাতে হবে তাকে। কমিউনিস্টরা যদি তার পক্ষে ভোট দিতে রাজী হয়, তাহলেও কিছু হবে না, ছ-হাজার করে ভাগ হয়ে দু পক্ষে আবার সেই সমান ভোট হবে, সবই ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। আর কমিউনিস্টরা তাকে সমর্থন করবে কিনা সে বিষয়ে খুবই সন্দেহ আছে, কমিউনিস্টরা তেসাকে ঘৃণা করে।

সেদিন বিকালে একটা সভা ডাকা হল। র‍্যাডিকালরা কমিউনিস্টদের ডেকে পাঠাল সেই সভায়। দিদিএ কি বলবে শুনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল সকলে।

তেসা নিজেই বক্তৃতা দিয়ে সভার কাজ শুরু করল। বলল, 'বন্ধুগণ, আপনারা আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। আমি আপনাদের প্রত্যেককে ডাক দিচ্ছি—রিপাব্লিকের উন্নতি যাঁরা চান, শান্তি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের যাঁরা পক্ষপাতী, পাদ্রীশাসনকে যাঁরা বাধা দিতে চান—তাঁরা আমাকে ভোট দিন। আমাকেই একমাত্র প্রার্থী দাঁড় করানো হয়েছে—' এক মুহূর্ত থেমে ফেটে পড়ল সে, 'পপুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে।'

দিদিএ তার বক্তৃতায় বলল, 'কমিউনিস্ট পার্টি কাউকে ঘুষ দেয় না বা লোভ দেখায় না। তাদের আবেদন যুক্তি ও বিবেকের কাছে। গত নির্বাচনে আমরা ছ-শো ভোট পেয়েছিলাম, এবার পেয়েছি দু হাজার তিন শো সত্তর। আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হচ্ছে, এটা তার প্রমাণ। এখন আমাদের প্রধান কাজ, দুগার ও গ্রঁাদমেজোঁদের মত ফ্যাশিস্টদের যে করে হোক বাধা দেওয়া। তেসা পপুলার ফ্রন্টের প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছে। ফ্রান্সের আজ বড় দুঃসময়। বাইরে থেকে বিপদ যেমন ঘনিয়ে আসছে, দেশের ভেতরেও বিশ্বাসঘাতকরা মাথা তুলেছে। এই রকমই হয়। শুআঁরা ইংরেজ বা অস্ট্রীয়ানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল, প্রুসিয়ানরাও ভের্সাইএর জন্যে দায়ী।

এই সময়ে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র পপুলার ফ্রন্ট। পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ! ফ্রান্স জিন্দাবাদ!'

বক্তৃতার উত্তরে বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল।

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে নাটুকে কেতায় অভিবাদন করল সকলকে। এখন সে খুশি হবে না দুঃখিত হবে বুঝে উঠতে পারছিল না। দুগার ও দিদিএ, দুজনকেই সমান ঘৃণা করে সে। হঠাৎ-ফুঁড়ে-ওঠা আগাছা যত সব! উজবুক! কমিউনিস্টরা যে তাকে ভোট দিতে রাজী হয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে একটা বড় রকমের সাফল্য। কিন্তু শ্রমিকরা ওদের কথা মানবে কিনা কে বলতে পারে? একজনকে তো সে বলতেই শুনেছে—'কি! ভোট দেব ওই জোচ্চোরটাকে!' তাছাড়া, দিদিএর সমর্থকরা যদি তার পক্ষে ভোট দেয়ও, তাহলেও দুগার আরো দু-তিন শো ভোট বেশী পেতে পারে। নরমপন্থীরা কি করবে কিছুই বলা যায় না। ওরা বলবে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তেসা প্রকাশ্যে হাত মিলিয়েছে। শয়তান দেসের! কি ওর মতলব! কি ভাবে ও টাকা করবে ভাবছে? ফ্রান্সের সর্বনাশ করে? আর সেও কিনা এই নোংরামির মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে।

সভা শেষ না হতেই তেসা হোটেলে ফিরে গেল। ভীষণ মাথা ধরেছে তার, কপালের চামড়াটা কেমন টান টান হয়ে উঠেছে।

হলঘরের পোর্টার বলল, 'মঁশিয় তেসা, একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, তিনি আপনার জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছেন।'

তেসা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। বোধ হয় আর একজন পেনসন-সন্ধানী উপস্থিত। কিন্তু দরজা খুলতেই ডেপুটি লুই ব্রতৈলকে দেখতে পেল সে।

তেসা অবাক হল। তার সঙ্গে ব্রতৈলের দেখা করতে আসার অর্থ কি? দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী, সমস্ত ডেপুটির সঙ্গে তেসার বন্ধুত্বের সম্পর্ক, ব্রতৈলের সঙ্গেও সে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। অন্য যে কোন সময় হলে অতিরিক্ত উৎসাহে সে চিৎকার করে উঠত, 'আরে ভায়া যে! কী সৌভাগ্য! তোমার স্ত্রীর খবর ভাল তো?' কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, দুগারের সেই কথাগুলো এখনো কানে বাজছে—'সেই চেক্-এর ব্যাপারটা কি?' এই অপমান ভোলেনি সে। প্যালে বুরবঁ-তে তার আসন দুগারের মত একটা গোঁয়ার গোবিন্দ এসে জুড়ে বসবে, একথা চিন্তা করাও অসহ্য। ব্রতৈল না এলেই ভাল করত।

ব্রতৈলকে সবাই ভয় করে। ভীষণ একগুঁয়ে স্বভাব, যা করবে ভাবে, শেষ

পর্যন্ত না করে ছাড়ে না। প্রবীণ খেলোয়াড়ের মত চেহারা—ছ ফুটের ওপর লম্বা শরীর, ঋজু শিরদাঁড়া, রৌদ্রদগ্ধ রক্তাভ মুখ, পাকা চুল আর ছোট গোঁফ। গত যুদ্ধে আহত হয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল উড়ে গেছে, এবং কি করে যেন এই অঙ্গহানির একটা প্রতিফলন রয়ে গেছে মুখচোখের ভাবে। কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত, আদেশের ভঙ্গীতে শব্দগুলোকে ছুঁড়ে মারে। যখনই কোন কমিউনিস্ট বক্তৃতা দিতে ওঠে, সভা-গৃহ থেকে বেরিয়ে আসে সে। এই লোকগুলোর কথা সে সহ্য করতে পারে না, সবাইকে বলে একথা। কোন কোম্পানীর অংশীদার নয় সে, ফাটকা বাজারের ধার ধারে না, অত্যন্ত সাদাসিধে তার চালচলন। নিজে যা উপার্জন করে, তার অধিকাংশই ব্যয় করে প্রচার-কার্যে। তরুণদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তার একটা বাতিকের মত, এইজন্যে বহু বাহিনী গঠন করেছে, সার বাঁধিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়েছে ছেলেদের এবং আবেগময়ী ভাষায় বর্ণনা দিয়েছে শুআঁদের, জাতীয় রক্ষীদলের, আর সামরিক বাহিনীর। মায়ের আদুরে-গোপালদের ঘর থেকে বার করে এনে ঝড়-বৃষ্টির ভেতর মার্চ করিয়েছে, সামরিক শৃঙ্খলায় শিক্ষিত করে তুলেছে। একটি কুৎসিত ও গরীব স্ত্রীলোককে সে বিয়ে করেছে শেষ বয়সে। পাঁচ বছরের ছোট্ট চঞ্চল ছেলেটিকে নিয়ে প্রগল্‌ভ উচ্ছ্বাস তার। বোধ হয় এটাই তার একমাত্র দুর্বলতা।

কি বলবে, বুঝতে না পেরে তেসা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্রতৈল।

'কেমন আছ, পল? অসুস্থ বলে মনে হচ্ছে? খুব ক্লান্ত, না?'

'খুব। কিন্তু এখানে কি মনে করে? অন্য কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

'না। আমি পারী থেকে সোজা আসছি। তুমি জান বোধ হয়, এই দুগার আমার ছাত্র। বয়সে এখনো ও যুবক, কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমান। ওকে এখন একটু উৎসাহিত করা দরকার।'

তেসা চটে উঠল। তাহলে ব্রতৈল এসেছে দুগারকে সাহায্য করতে। যাকগে, ওর ব্যাপার ওই বুঝবে। কিন্তু তেসার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা ওর পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি, বিশেষ করে তার ক্লান্ত শরীরের জন্যে ওর সহানুভূতি দেখানো তো আরো বোকামির পরিচয়।

তেসা বলল, 'আমাকে মাফ কর, আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, শুয়ে পড়ব।'

'একটু অপেক্ষা কর। তোমার সঙ্গে কথা আছে। কিন্তু এখানে সেটা হবে না। চল, তোমার ঘরে যাই।'

নিজের ঘরে ঢুকে টাই-জুতো খুলে বিছানায় শুয়ে পড়ল তেসা। ব্রতৈল যখন দরজায় টোকা দিল, তেসা ঘরের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়, এই সব কথা পরে বলাই ভাল। এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। নির্বাচনের পরে—'

ঘরের ভেতর ঢুকে বাধা দিয়ে ব্রতৈল বলল, 'তখন আর এ প্রশ্ন উঠবেই না। আমি জানি তুমি ক্লান্ত, কিন্তু আমি পাঁচ মিনিটের বেশী সময় নেব না। যা হোক, একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে আমাদের। তুমি নিজেও জান, দুগারের জয়লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে, পাঁচ-ছ-শো ভোটে জেতাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমি চাই না যে—'

'কি চাও না?' বলল তেসা।

'আমি তোমাকে নির্বাচিত করতে চাই। দুগার বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই, কিন্তু ও তো আমাদের হাতেই রয়েছে। চেম্বারে ঢুকে ও বিশেষ কিছু করতে পারবে না। তোমার সঙ্গে ওর তুলনাই হয় না। তুমি বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ, ভাল বক্তা এবং অভিজ্ঞ। তার ওপর তোমার নাম আছে। তোমার পরাজয় দেশের পক্ষে দুর্ভাগ্য।'

তেসা বলল, 'শোন লুই, তোমার বক্তব্য আমার কাছে মোটেই স্পষ্ট নয়। হঠাৎ আমাকে এত প্রশংসা করবার কারণ কি? তুমি তো দুগারের সমর্থক, আর ওই দুগার দিনের পর দিন আমার নামে দুর্নাম রটাচ্ছে।'

'আরে ওসব কথায় কান দিও না, নির্বাচনের সময় ওরকম কত কি বলে লোকে, ওসব কথা ছেড়ে দাও। পপুলার ফ্রন্টকে তো তুমি দারুণ মাথায় তুলেছ, না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে আর বলতে হবে না, আমি কি আর জানি না কমিউনিস্টদের তুমি কি মনে কর। কমিউনিস্টদের প্রতি প্রেম কার বেশী; তোমার না আমার—এ বিচার ভবিষ্যতের জন্যে তোলা রইল। এখন আমার কথাটা শোন পল, আমি চাই যে তুমিই এখান থেকে নির্বাচিত হও। তোমাকে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক বলে ভাবতে দাও লোককে, তাতে কিছু যাবে আসবে না। মানুষটাই আসল কথা, ছাপটা কিছু নয়। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়...'

'এক ঘণ্টা আগে বক্তৃতায় আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রতি সমর্থন জানিয়ে এসেছি।'

'বক্তৃতায় তুমি কি বল আর না বল, সে প্রশ্ন উঠছে না। আমার কথাটা আবার বলছি—তোমার মুখের একটা স্বীকৃতি ছাড়া আমরা আর কিছু চাই না। আমি তোমার কাছে বাজে কথা বলতে আসিনি, আমার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার। আর পল, এটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ, দলাদলির সময় এখন নয়। দেশকে রক্ষা করতে হবে! বেশ, এই কথা রইল, দুগার নাম প্রত্যাহার করবে। অবশ্য, তোমার সমর্থনে কোন বিবৃতি দেওয়া ওর পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ওর সরে দাঁড়ানোটাই যথেষ্ট। আরো দু-তিন হাজার ভোট তোমার পক্ষে যাবে।'

'কিন্তু দুগারের সমর্থকরা আমার চেয়ে গ্রাঁদমেজোঁকে বেশী পছন্দ করবে।' তেসা বলল।

'কে? ওই বুড়ো জেনারেল? আমি ওকে ভাল করে জানি। একটু বোকা, কিন্তু চমৎকার লোক। ওর সঙ্গে আমি কাল কথা বলে দেখব। আচ্ছা বেশ, আমি কথা দিচ্ছি, গ্রাঁদমেজোঁও নাম প্রত্যাহার করবে। তারপর তুমিই একমাত্র প্রার্থী। ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে যে একতা দরকার, তার প্রতীক হবে তুমি!'

প্রস্তাবটা এত লোভনীয় আর অপ্রত্যাশিত যে তেসা অসংবদ্ধ প্রলাপ বকতে শুরু করল, 'প্রতীক! তুমি তো পারী থেকে সোজা আসছ, না? ওখানে কি এখনো গরম? গরম আমার সহ্য হয় না...'

ব্রতৈল কথা বলল না। আর তেসা স্পষ্টভাবে কিছু ভাবতে পারছে না, কেমন অস্পষ্ট আর এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তার চিন্তা—ঘোলাটে জলে মাছের ঝাঁক যেমন দেখায়। শুধু একটা কথা সে স্পষ্টভাবে বুঝেছে—আবার সে ডেপুটি হবে। এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেয়ে ভিজে তোয়ালেটা কপালের ওপর বুলিয়ে নিল, ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে উঠল সে। মনে মনে বলল, 'ফ্রান্সের বড় বিপদ। শত্রুরা ওৎ পেতে রয়েছে ...দেশের ভেতরে বিশ্বাসঘাতক। জাতীয় ঐক্যের প্রতীক আমি। আসল মানুষটাই বড় কথা এখন, দলের ছাপ টাপ কিছু নয়!' সে বুঝতেও পারল না যে দুজনের মুখের কথা সে বলছে—এক একবার ব্রতৈলের, এক একবার দিদিএ-র। শিশুকে কোন আশ্চর্য খেলনা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে যেমন হয়, তেমনি হয়ে উঠল তেসা; আমতা আমতা করে বলল:

আচ্ছ 'শোন, আমাকে কি বলতে হবে?'

'শুধু একটিমাত্র কথা—তুমি রাজী।'

'হুঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর তাছাড়া, না বলার অধিকারও আমার নেই।'

তেসার হাতের ওপর জোরে চাপ দিয়ে ব্রতৈল বলল, 'আমি জানি তুমি খাঁটি লোক। আচ্ছা এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও। শুভরাত্রি।'

পরদিন অনেক দেরীতে তেসার ঘুম ভাঙল। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকেছে ঘরের ভেতর, সবুজ ভেলভেটের আর্ম-চেয়ারগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা টুকরো টুকরো জমি। হোটেলের বাইরে চোখ পড়তেই সদ্য সেঁটে দেওয়া একটা প্রাচীরপত্র চোখ পড়ল: 'জাক্ দুগার তাঁর নির্বাচক-মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এবং দেশের প্রতি তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করে প্রার্থী হিসেবে নাম প্রত্যাহার করছেন। ফ্রান্স জিন্দাবাদ!' তেসা না হেসে থাকতে পারল না। এমন কি, একটি তরুণী ফুলওয়ালীর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল একবার। মেয়েটির দিকে তাকাতেই মনে পড়ল পলেতের গ্রীবাভঙ্গী। জীবনকে সুন্দর মনে হচ্ছে আবার। এই বিশেষ সকালটিতে ভাল লাগছে সব কিছু—রোমান গির্জা, দোকানের জানলায় সাজানো ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, বাজারের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। সবাইকেই চুমু খেয়ে আদর করতে ইচ্ছা করছে। সত্যি, দুগার চমৎকার লোক। ওকে লাঞ্চ খেতে ডাকলে মন্দ হয় না, একসঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব আর দু-একটা ঠাট্টা তামাসা জমিয়ে তোলা যাবে। তেসার কোন জমিদারী নেই বলে দুঃখ হল, থাকলে দুগারকে নিশ্চয়ই একটা চাকরি দিত। আর দিদিএ-ও চমৎকার লোক—ঠিক যেন অনেক দিনের জানাশোনা তালা-কারিগর, দয়ার্দ্র মন, প্রকাণ্ড গোঁফ। ওর মত লোকেই তালা সারাতে পারবে। ...দলের ছাপে কি আসে যায়, আসল মানুষটাই বড় কথা! প্রত্যেকটি প্রাচীরপত্র খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করল তেসা। নতুন ঘোষণাটা সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। গাড়ী থেকে নেমে একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার চেঁচিয়ে পড়ল লেখাটা, তারপর থুতু ফেলে বলল, 'শালা জোচ্চোর!' মন্তব্যটা শুনতে পেয়েও তেসার আনন্দে একটুও ভাটা পড়ল না, মনের খুশিতে সে উপচে উঠেছে! হঠাৎ সে ঠিক করে ফেলল, দু-একদিনের জন্যে প্যারী ঘুরে আসবে, একটা পুরো সন্ধ্যা কাটিয়ে আসবে পলেতের সঙ্গে। মিষ্টির দোকানে ঢুকে এক বাক্স্ চকোলেট সে কিনল দেনিসের জন্যে, তারপর

ছোট একটা কাফেতে ঢুকে ব্র্যাণ্ডি নিয়ে বসল। পাশের টেবিলের লোকটি সকাল না পেরতেই একটু বেসামাল হয়েছে, খবরের কাগজে মোড়া একটা রুটি থেকে টুকরো টুকরো ছিঁড়ে চড়ুই পাখীগুলোকে খাওয়াচ্ছিল। তেসার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'পাখীর সঙ্গে কথা বলে তবু সুখ আছে। শহরে যা কাণ্ড শুরু হয়েছে—খালি নির্বাচন আর নির্বাচন...'

'আপনি কার পক্ষে?' সহজাত কৌতূহল বশে তেসা জিজ্ঞাসা করল।

'আমি? আমি নিজের পক্ষে। হ্যাঁ, শুধু নিজের পক্ষে। আর পাখীদের পক্ষে। কিন্তু ভোট দিতে আমি যাচ্ছি না। ওখানে শুধু বড় বড় কথা।'

তেসা হাসল, 'ঠিক কথা! কোন্ পানীয় আপনি পছন্দ করেন? আমি খাওয়াচ্ছি।'

চারটের গাড়ী ধরে তেসা পারী রওনা হল। তার এক ঘণ্টা পরে ব্রতৈল পা বাড়াল মারকিস স্ত নিওর-এর বাড়ীর দিকে। এখানেই পোয়াতিএর-এর মাতব্বররা প্রতি মঙ্গলবার জড়ো হয়। অধিকাংশই ক্ষয়ে-আসা জমিদার—পরিমিত জীবনযাত্রার ভেতরেও চালচলন বজায় রেখেছে। এই দলের মধ্যে আরো রয়েছে দুজন কারখানা-মালিক, প্রত্নতত্ত্ব বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক এবং কয়েকজন পাদ্রী। পাতলা চা আর স্যাণ্ডউইচের ছোট ছোট টুকরো আসে চাকরের হাতে—কিপটে বলে মারকিসের খ্যাতি আছে। অধিবেশনের সময় প্রথম পাঁচ মিনিট আলোচনা হয় বৈদেশিক নীতি ও খননকার্যের ওপর (বহু প্রাচীন নিদর্শনের জন্যে শহরটি বিখ্যাত এবং স্থানীয় অভিজাতমহল স্থাপত্য-অনুরাগী) তারপর গল্পগুজবে মেতে ওঠে সকলে। কিন্তু আজকের সন্ধ্যায় যা কিছু কথাবার্তা হল, সবই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। গ্রাঁদমেজোঁর মনোভাব দিগ্বিজয়ী বীরের মত। লোকটা রগচটা কিন্তু এমনিতে বড় ভালমানুষ, নবজাত শিশুর মত মাথার খুলি, বেতো পায়ে ফেল্টের চটি। কোন কারণে রাগ হলে বেতো পাটা টান করে সে চিৎকার করে, 'কক্ষনো না!'

চায়ের কাপে চামচ নাড়তে নাড়তে ব্রতৈল বলল, 'বুঝলে বন্ধু, যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সেখানে সব চেয়ে সম্মানজনক পথ হচ্ছে নাম প্রত্যাহার করা।'

'কক্ষনো না! আমি দুগার নই। আমি জানি তেসা জিতবে। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে জয়লাভের চেয়ে পরাজয়ই বেশী সম্মানজনক।'

ব্রতৈল বলল, 'রাগ করবার কোন কারণ নেই। নির্বাচনে দাঁড়ালে হাজার

হয়েক ভোট তুমি পাবে, কিন্তু এই দু হাজার ভোটের জন্যে তেসাকে আমরা হারাব, তেসা আমাদের শত্রু হয়ে উঠবে। মনে রেখ, ঠিক তেসার মত লোক এখন আমাদের দরকার।'

ব্রতৈলের কথার উত্তরে বহু কণ্ঠের ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত মন্তব্য শোনা গেল।

'ও তো শোতাঁদের বন্ধু! স্টাভিস্কি ব্যাপার ভুলে যেও না।'

'লোকটা যে তান্ত্রিক-সম্প্রদায়ের, এ কথা কে না জানে! "মহাপ্রতীচ্য" ভবনের সভ্য ও!'

'আর দেসেয়ের টাকা? ওকথা ভুললে চলবে কেন?'

গ্রাঁদমের্জোঁ গর্জে উঠল, 'ঠিক তেসার মত লোক আমাদের দরকার বলছ? জান ও কি লিখছে? ঈশ্বরকে ও মানে না। আর তার চেয়েও খারাপ— লোকটা একটা সিনিক। নাস্তিক ছাড়া আর কি ও! কি ফল হবে জান? একপাল ভবঘুরে জুটে সব কিছু নিজেদের ভেতর ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে।'

অস্বাভাবিক তীব্রতার সঙ্গে ব্রতৈল বলতে শুরু করল, 'আচ্ছা, তাহলে কথাটা সোজাসুজি বিচার করা যাক। দেশে একটা বিপ্লব আসন্ন। পপুলার ফ্রন্ট দেশকে যুদ্ধের পথে চালিত করবে। সেই যুদ্ধে আমাদের দেশ যদি জয়লাভও করে, তবুও সেই জয়লাভ আমাদের পক্ষে পরাজয় ছাড়া কিছু নয়। তেসা ধর্মবিরোধী? মেনে নিলাম। কিন্তু যে লোকটার রাজযক্ষ্মা হয়েছে, তার সামান্য একটু সর্দির জন্যে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? তেসা যে কমিউনিস্ট নয়, একথাটা জোর দিয়ে বলা চলে। কাল আমি ওর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, ও আমাকে সমস্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কাল যখন পপুলার ফ্রন্ট ক্ষমতা লাভ করবে আমরা কি করব? সম্মুখ আক্রমণে পপুলার ফ্রন্টকে যদি ধ্বংস করতে না পারি, তবে ভেতর থেকে উড়িয়ে দিতে হবে। এই কাজ করবে তেসার মত জনকয়েক লোক। ফ্রান্সকে রক্ষা করবার জন্যে শুধু তেসা কেন, জার্মানদের সঙ্গেও হাত মেলাতে প্রস্তুত আমি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার কথাটা শেষ করতে দিন। কাল যদি শুনি বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, আমি বলব—হিটলার আসুক।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর মারকিস দ্য নিওর ফিস ফিস করে বললেন, 'আপনি ভারী সুন্দর কথা বলতে পারেন, মঁশিয় ব্রতৈল। কিন্তু আপনার কথা শুনলে কেমন একটা হতাশার ভাব আসে! কী অন্ধকার ভবিষ্যৎ, হে ঈশ্বর!' তাঁর হাত থেকে চিনির চামচটা মেঝের ওপর পড়ে গেল।

তেসা ঠিক করল, লাঞ্চের সময় বাড়ীর লোকের কাছে তার সাফল্যের কথা খুলে বলবে। মুখরোচক আর ধূমায়িত খাবার সামনে পেলে রাজনীতির কথা বলতে ভাল লাগে তার।

সে বলল, 'অবস্থাটা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। তুগার সমানে আমার তুর্নাম রটাচ্ছিল—আবার সেই স্টাভিস্কি ব্যাপার! হ্যাঁ, ভাল কথা লুসিয়ঁ, তুমি শুনলে সুখী হবে—তোমার লেখা ছোট পুস্তিকাটা দারুণ কাটতি হয়েছে ওখানে, অবশ্য বই কাটতি হবার উপলক্ষটা ছিলাম আমি। গ্রঁাদমেজোঁ তো রোজ বইটা থেকে উদ্ধৃতি ঝেড়ে বলত—দেখ, ওর ছেলে কি লিখছে! কি গো ঠাকরুণ, এমন চমৎকার নরম হাঁস পেলে কোথায়? ওঃ, পোয়াতিএর-এ একটা খাবার খেয়েছিলাম—আ লামেরিকেন্, অমন চমৎকার গলদা চিংড়ি জীবনে আমি খাইনি। কি বলছিলাম? ও হ্যাঁ, তারপর কমিউনিস্টরাও কম গেল না। ওরা তো আমার ওপর একেবারে মারমুখো—মুখে 'স্বাধীনতা' ও 'শান্তি'র বুলি আর দায়িত্বজ্ঞানহীন ফাঁকা বক্তৃতা। ফল হল এই যে, প্রথমবারের ভোটে কিছুই হল না। মনে হল শরীরের সমস্ত শক্তি ফুরিয়ে গেছে, আর সে কী মাথার যন্ত্রণা!...একি দেনিস, তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন? তোর উচিত একবার পোয়াতিএর-এ ঘুরে আসা। ওখানকার রোমান গির্জার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা হয় না। আর সেই স্যাঁ রে দে গন্দ্—ওটাও দেখা উচিত। মনে মনে আমি হিসেব করলাম—কমিউনিস্টরা যদি তাদের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহার করে, তাহলে নির্বাচিত হবার সম্ভাবনা সমান-সমান হয়ে যায়। অবশ্য এমন গুজবও শোনা গেল, কমিউনিস্টরা দিদিএ-র পক্ষেই আবার ভোট দেবে। লুসিয়ঁর বন্ধুরা আমাকে তো আর ঠিক পছন্দ করে না। যাই হোক, মিটিংএ দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করলাম: আমি পপুলার ফ্রন্টের প্রার্থী। প্রচণ্ড হাততালি পড়ল। এমন কি, বজ্রমুষ্টি উঠল আকাশের দিকে। সত্যি কথা বলতে কি, এই অঙ্গভঙ্গীটা আমি একেবারে সহ্য করতে পারি না। বাঃ, এই হাঁসের মাংসটা সত্যি চমৎকার! হ্যাঁ, এইভাবে প্রথম বাধা দূর হল—কমিউনিস্টরা ঘোষণা করল, তারা আমার পক্ষে ভোট দেবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল—সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করে প্রস্তুত হতে লাগল ওরা। নির্বাচিত হবার সমান সম্ভাবনা তু দলের—এক দিকে লাল, অন্য দিকে কাল...'

মাংসটা কামড়ে ছিঁড়ে নেবার জন্যে কথা বন্ধ করতে হল তেসাকে।

লুসিয়ঁ বলল, 'তবুও তুমি জিতবে, ফ্যাশিস্টরা হেরে যাবে। জনসাধারণের মনোভাব...'

'তাই নাকি, কিন্তু একটু ধৈর্য ধর। ঘটনাটা কল্পনাও করতে পারবে না তুমি। আচ্ছা, বলো তো কি হতে পারে! ঠিক যেন একটা নাটক। একটু স্যালাড দাও তো গো। তুমি খাচ্ছ না যে?...স্যালাড খাওয়াও বারণ নাকি তোমার? নাঃ, খাওয়া সম্পর্কে এত বাঁধাধরা নিয়ম সত্যি ভয়ংকর! হ্যাঁ, লুসিয়ঁ বলতে পারলে না তো? দুগার পথ ছেড়ে দিল, এখন আমিই একমাত্র প্রার্থী। একেই বলে জাতীয় ঐক্য।'

লুসিয়ঁ আর চুপ করে থাকতে পারল না, বলল, 'আর তুমি রাজী হলে! এ যে রীতিমত নীচতা!'

তেসা চটে উঠল, 'আমি এর মধ্যে এতটুকু নীচতা দেখি না। সমস্ত দল একমত হয়ে আমাকে দাঁড় করিয়েছে। আমি মনে করি এটা রীতিমত গর্ব করবার বিষয়। জাতীয় ঐক্য কি নীচতা? এমন কি তোমার ঐ তালা-কারিগর পর্যন্ত সব সময় বলত—ফ্রান্স! ফ্রান্স! তুমি কিন্তু সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছ না, পিছিয়ে পড়ে আছ।'

লাঞ্চের আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল। তেসার পরিবারের লোকেরাই তাকে ঠিক বুঝতে পারে না। তেসার স্ত্রী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল। দেনিস তো এতক্ষণ কোন কথাই শোনেনি, বেড়ালছানাটা নিয়ে খেলা করেছে; আর ওই চিরকেলে বজ্জাত লুসিয়ঁ আবার বোধ হয় কোন নতুন ইতরামির মতলব আঁটছে।—কফির পেয়ালা শেষ করে তেসা টেবিল ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, তার কাজ আছে। সবাই জানে লাঞ্চের পর তেসা ঘুমোয়, কিন্তু ঘুমোতে যাবার আগে রোজই বলে 'কাজ' আছে।'

নিজের অসংযমের জন্যে লুসিয়ঁর অনুশোচনা এল। বাবার কাছ থেকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ চাইবে বলে এতদিন সে বাবার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। জিনেৎকে অপারেশন করাতে হয়েছে আর এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে লুসিয়ঁ এই অর্থ ধার করতে পারে। বাবাকে এখন চটানো বোকামি ছাড়া আর কি? বাবা হয়ত এখন স্পষ্ট না বলবে। কিন্তু জিনেতের চোখ দুটোর কথা মনে পড়তেই সব কিছু ভুলে গিয়ে লুসিয়ঁ পড়বার ঘরে ঢুকল।

কোন ভূমিকা করল না সে, সোজাসুজি কথাটা পাড়ল।'

'আমাকে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিতে হবে। অত্যন্ত জরুরী দরকার।'

তেসা চুপ করে রইল।

হঠাৎ লুসিয়ঁ বলল, 'তোমাকে অবজ্ঞা করব বলে কিছু বলিনি। আমার ওপর মিথ্যে রাগ করে কি লাভ।'

সোফার ওপর তেসা শুয়েছে। পাখীর মত মুখের রেখাগুলো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে বিরক্তিতে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, ফ্যাকাশে মুখ আর শোবার আলতো ভঙ্গী দেখে মড়ার মত মনে হচ্ছিল তাকে।

'পাঁচ হাজার ফ্রাঁ দিয়ে কি করবে? আবার কোন নতুন ইতরামি...?'

লুসিয়ঁ উত্তর দিল না। লুসিয়ঁর দিকে একবার তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল তেসা। ওর মত ছেলে সব কিছু করতে পারে! ঠিক এই রকম বাদামী রঙের চুল ছিল ওর কাকার। পরিবারের কেউ এখন কাকার নামও উল্লেখ করে না, নোট জাল করবার জন্যে তার সাত বছর জেল হয়েছে।

উঠে বসে তেসা চেক লিখে দিল। চেকটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল লুসিয়ঁ। আবার শুয়ে পড়ল তেসা। স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করবার জন্যে এখন একটু ঘুম দরকার তার। কিন্তু মাথার ভেতর নানা চিন্তা জট পাকিয়ে ঘুম আসতে দিল না। বিরক্তিতে ভরে গেছে মনটা, পোয়াতিএর-এ ব্রতৈলের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন যেমন হয়েছিল। ব্রতৈলের কাছ থেকে অনুগ্রহ নিতে হয়েছে বলে যে মানসিক কষ্ট সে ভোগ করেছে, তা কি লুসিয়ঁ বুঝতে পারে না? হ্যাঁ, সমস্ত ব্যাপারটাই বিরক্তিকর। আরো বিরক্তিকর কমিউনিস্টদের সঙ্গে দহরম-মহরম। তালা সারাবার জন্যে ওদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দেশের ভাগ্য স্থির করবার জন্যে নয়! কল্পনা করাও অসহ্য—জীবনটাই এই! কী নোংরা খেলা! এপিঠ না ওপিঠ? চেম্বারে সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনা করবার সময়...কয়েকটি ভোট 'পক্ষে' বা 'বিপক্ষে' যাওয়ার ওপর একটি মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে। আর জুরীদের বেলায়?...অপরাধীর গলা কেটে উড়িয়ে দেওয়া হবে কি হবে না? তাও নির্ভর করে কতকগুলো তুচ্ছ খুঁটিনাটির ওপর। তেসার বক্তৃতায় কি কোন দোকানদার বিচলিত হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে তবে ভোরবেলা লোকটিকে ঘুম থেকে তুলে এক গ্লাশ মদ খেতে দেওয়া হবে, তারপর এক কোপে তার গলাটা কেটে নেওয়া হবে। লটারি! সকলেই জানে পপুলার ফ্রণ্ট একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। এক বছরও টিঁকবে কিনা সন্দেহ। অবশ্য কোন কিছুরই স্থায়িত্ব চিরকাল নয়। সব

কিছুতে ঘুণ ধরে গেছে! দূর ছাই! টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে সব কিছু। যদি পড়েই তবে তার ভারী মাথাব্যথা! সন্ধ্যার সময় সে পলেতের কাছে যাবে। হ্যাঁ, পলেৎও তো একদিন আর থাকবে না। কোন কিছুই থাকবে না।

অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর চিন্তা তার মনের ওপর প্রলেপের মত কাজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল তার ঘর থেকে, আরো কিছুক্ষণ পরে নাক ডাকার শব্দটা দীর্ঘ একটানা শিসে পরিণত হল।

লুসিয়ঁ দেনিসের সঙ্গে কথা বলছিল।

'যাই বল না কেন, এটা যে অত্যন্ত নীচ কাজ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কমিউনিস্ট আর ক্রোয়া দ্য ফ্য—দুই দলের সঙ্গে একই সময়ে থাকাটা সম্মানজনকও নয়, সাধুতার পরিচয়ও নয়।'

দেনিস বলল, 'বাবার জন্যে আমার দুঃখ হয়। গত এক বছরের মধ্যে বাবা যেন বুড়ো হয়ে গেছে।'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! বাবার যা বয়স—এই বয়সের লোকের সর্বনাশের জন্যে একা পলেৎই যথেষ্ট।'

'লুসিয়ঁ!'

দেনিসের চোখের দিকে তাকিয়ে জিনেতের কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর। এই শান্তশিষ্ট মেয়েগুলো কেন যে...কিন্তু জিনেৎ তো তাকে ভালবাসে না, জিনেৎ নিজেই সে কথা বলেছে। কিন্তু কেন, কেন জিনেৎ তাকে ভালবাসে না?

সে বলল, 'আমার জন্যেও দুঃখপ্রকাশ করতে পার। হয়ত বাবার একদিন মৃত্যুও হবে, কিন্তু আমার হবে না, আমি একটু একটু করে শুকিয়ে ঝরে যাব।

সেই দিন সন্ধ্যায় একটু পুরনো ধরনের আমোদপ্রমোদে নিজেকে মাতিয়ে রাখল তেসা। প্রথমে সে গেল পলেতের কাছে, তারপর দুজনে মাক্সিম-এ গিয়ে সান্ধ্য ভোজনের জন্যে বসল। নাচের আসরে মেয়েদের পা উঠছে, নামছে—অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তেসা। এই তো জীবন—মনে মনে বলল সে। বসে বসে গ্লাশের পর গ্লাশ শ্যাম্পেন টানল সে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এতটুকু আমেজ হল না। আজ সকাল থেকেই তার মন চিন্তাক্লিষ্ট এবং এই মানসিক অবস্থা এখনো সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ছুটোর সময় সে বাড়ী ফিরে এল। পেটের ওপর গরম জলের বোতল চেপে

ধরে মাদাম তেসা রোজকার মত পেসেন্স খেলছেন। তেসাকে দেখে কেঁদে ফেললেন তিনি।

'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি ফিরে এসেছ! অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে আমার!'

'এইবার তুমি সেরে উঠবে আমালি। ডাক্তার বলেছে, আর বেশী দিন লাগবে না।'

'লাগবে। আমি জানি, এই অসুখ সারবে না। আমার মৃত্যুর আর বেশী দেরী নেই।'

'এ সব বাজে কথা বলে লাভ কি? ডাক্তার বলেছে, অসুখ নিশ্চয়ই সারবে। আমি নিজে তার সঙ্গে কথা বলেছি। এখনো বহুদিন বাঁচবে তুমি।'

'কিসের জন্যে বেঁচে থাকব? এখন আর এতটুকু দাম নেই আমার। আজ তুমি এসেছ বলেই বিছানা ছেড়ে উঠেছিলাম। কিন্তু দেখ, তার ফলে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। মৃত্যুকে আমি আর ভয় পাই না। কিন্তু আমার ভয় হয় অন্য কথা ভেবে। আমি জানি তুমি নাস্তিক...কিন্তু একদিন শেষ বিচার হবে...এসব কথা ছেলেমেয়েদের সামনে আমি বলতে চাইনি...আজকাল কমিউনিস্টদের সঙ্গে তুমি মেলামেশা করছ! আশ্চর্য, একটুও বাধে না? কালই খবরের কাগজে ওদের কীর্তিকলাপ পড়ছিলাম, মালাগাতে আটটা গির্জা ওরা পুড়িয়ে দিয়েছে, বর্বরের দল! তুমি আমার স্বামী, আর তুমিই কিনা ওদের দলে!'

জামাকাপড় খুলে তেসা শুয়ে পড়ল, তারপর বলল, 'তুমি বোধ হয় মনে করছ, এসব কাজ আমার কাছে মোটেই বিরক্তিকর নয়। তোমার ধারণা একেবারে ভুল। রাজনীতি একটা নোংরা খেলা। এর চেয়ে ফাটকা বাজারের দালালী ঢের ভাল কাজ। কিন্তু তোমার এত দুশ্চিন্তা কেন? আমাদের দুজনের জন্যে আর টাকার কি দরকার, আমাদের দিন কোনরকমে কেটে যাবে। কিন্তু ছেলেমেয়েরাই আসল সমস্যা। আজ লুসিয় আমার কাছ থেকে আরো পাঁচ হাজার ফ্রাঁ নিয়েছে। নিজের দাবী না মিটলে লোকের গলা কাটতে পারে ও। তারপর দেনিস আছে, ও যে কোনদিন কারও প্রেমে পড়তে পারে। আমি চাই না যে, বিয়ের পর দেনিস স্বামীর গলগ্রহ হয়ে থাকুক। আর ও যা অভিমানী মেয়ে! হাতে টাকা না থাকলে ওর দিনই চলবে না। আমি এমনিতেই মরে আছি আমালি, তার ওপর আমাকে আর আঘাত কোরো না।'

মাদাম তেসা স্বামীর কপালে চুম্বন করলেন, তারপর আলোটা নিবিয়ে দিলেন হাত বাড়িয়ে।

চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল তেসা। আজ আর তার চোখে ঘুম আসবে না। শ্যাম্পেনের বুদ্‌বুদের মত অনেকগুলো উজ্জ্বল কণিকা ভেসে বেড়াচ্ছে চোখের সামনে। হঠাৎ স্ত্রীর গলার অস্ফুট আর্তনাদ শোনা গেল। 'আমালি!' চাপা গলায় ডাকল সে। কিন্তু উত্তর পাওয়া গেল না। ঘুমের ঘোরে ও আর্তনাদ করছে, হঠাৎ ভয় পেল তেসা। কিছুদিনের মধ্যেই আমালি মরে যাবে...তারপর, তারপর কিছু নেই! তেসার মনে পড়ল, লারশ্‌কে কি ভাবে মৃত্যুদণ্ড দিতে হয়েছিল! একজন পুলিশকে খুন করে লারশ্‌ অভিযুক্ত হয়। তখন শরৎকাল, বুলভার দিয়ে হাঁটবার সময় পায়ের তলায় পাতার মর্মরধ্বনি শোনা যায়, লাল সূর্য ওঠে প্রকাণ্ড হয়ে। মদটুকু খেয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে লারশ্‌ বলল, 'চমৎকার!' সকলে ভাবল, লারশ্‌ শান্তভাবে মৃত্যুকে গ্রহণ করবে। কিন্তু গিলোটিনের কাছে নিয়ে যাবার সময় প্রাণপণে বাধা দিল সে, টেনে হিঁচড়ে গিলোটিনের কাছে নিয়ে যেতে হল তাকে, বুনো কুকুরের মত সে চিৎকার করল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল তেসার; সেই চিৎকার এখনো সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যেন। ছোট ছোট উজ্জ্বল কণিকাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে...আমালির কোন দুঃখ নেই। ও নরক মানে। এও একটা পরিত্রাণের উপায়,—মনে বিশ্বাস থাকলেই হয়।...কিন্তু নরক নেই। আছে শুধু মৃত্যু, শূন্যগর্ভ অন্ধকার। তেসা চিৎকার করে উঠল, মাদাম তেসা জেগে উঠলেন।

'পল, কি হল তোমার?'

'কিছু না, একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।' অপরাধীর মত বলল তেসা।

১৩

জলিওর আজগুবী গল্পের নায়ক, পিয়েরের ভক্তির পাত্র, ওগুস্ত ভীইয়ারকে দেখে মনে হবে আত্মভোলা নির্বিরোধ অধ্যাপক। চোখে প্যাঁশনে, চওড়া কাল টুপি, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণপ্রবণতা, অলংকার-বহুল বাগ্মিতা—সব দিক থেকে মানুষটি বিগত যুগাশ্রয়ী।

জন্মস্থান শালূ। তার জন্মের সন "ভয়ংকর" বছর নামে খ্যাত; শৈশবে দোলনার

চারপাশে প্রুসিয়ানদের বুলেট শিস দিয়ে ছুটেছিল। বাবা ছিলেন গোঁড়া রিপাব্লিকান, "ক্দে নেপোলিয়" কে আক্রমণ করবার অপরাধে দু বছর কারাবাস করেছিলেন। মারা, । াক্যি, গুলেক্রুস্ এঁদের নাম এবং সমাজতন্ত্রের ওপর উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে ভীইয়ার।

পারীতে এসেছিল ছাত্রাবস্থায়, ইতিহাসে ডিগ্রী নেবার জন্যে। ইচ্ছা ছিল, রাজনৈতিক সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু সে যুগের অন্যান্য বহু যুবকের মত শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে গো থকেই মেতে উঠেছিল। সে যখন "লাটিন কোয়ার্টার"-এর তরুণ ছাত্র, পারীর কোন একটি কাফেতে বৃদ্ধ ভেরলেনের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল। মাতাল অবস্থায় মাঝে মাঝে ভেরলেনের মুখ থেকে আশ্চর্য লাইন বেরিয়ে আসত—টেলিগ্রাফ তারের ওপর বসে-থাকা কোন দেশান্তরী পাখীর চিৎকারের মত সেই সব লাইন! নিজের লেখা একটা কবিতার বই ভীইয়ার প্রকাশ করেছিল—কবিতায় স্বকীয়তা না থাকলেও প্রতিশ্রুতি ছিল। এক সময় বিভিন্ন পত্রিকায় শিল্প-প্রদর্শনীর আলোচনা করত সে—বড় সমালোচক হবে আশা ছিল। তারপর দ্রেফুস সংক্রান্ত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে জোরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। স্বভাবতই সে বিনয়ী, কোন কাজে কখনো আপত্তি জানাত না। ছোট ছোট কাগজের জন্যে প্রবন্ধ লিখত সে, পাদ্রীদের স্বরূপ প্রকাশ করত, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বক্তৃতা দিত সমরতন্ত্রের বিরুদ্ধে, দাবী তুলত স্ত্রীলোকের সমান অধিকারের জন্যে। অবসর সময় কাটত প্রচুর বই পড়ে। শিল্পের প্রতি পূর্ব-অনুরাগ অটুট ছিল—বন্ধুবান্ধবরা ঠাট্টা করে বলত 'এই যে আমাদের এথেনিয়ান'। যুদ্ধের কিছু আগে পার্লামেন্টের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিল সে, একজন মেয়ে ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ে হয় প্রায় এই সময়েই। চেম্বারে কোন গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার ভার তার ওপর কখনো দেওয়া হত না, কিন্তু বিভিন্ন কমিটিতে নেওয়া হত তাকে এবং সাংস্কৃতিক ব্যাপারে তাকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ধরা হত। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে সে যোগ দিয়েছিল,—লেনিন, বেবেল ও প্লেখানভের সঙ্গে আলাপ ছিল তার। তখন তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, সমাজতন্ত্রীরা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হতে পারলে দেশে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হবে।

কিন্তু তা হয়নি, তার বদলে যুদ্ধ বাধল। এই প্রচণ্ড আঘাতে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ভীইয়ারের স্বপ্ন। যদিও জিমেরওয়াল্ড্ সম্মেলনে যোগ দিতে রাজী হল না সে; বলল, 'জাতির বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে দাঁড় করানো অসম্ভব।'

'পবিত্র মৈত্রী' সম্পর্কে কথাবার্তায় যেমন সে বিরক্ত হল, কৌতূহলও বোধ করল সঙ্গে সঙ্গে। সংবাদ নিয়ন্ত্রণ ও বিনা বিচারে হত্যার বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ জানানোটাই তার একমাত্র কাজ হয়ে উঠল তখন।

তারপর যুদ্ধশেষের ঝড়বিক্ষুব্ধ বছরগুলো একে একে পার হয়েছে। রুশ বিপ্লবকে অভিনন্দন জানিয়েছে ভীইয়ার, কিন্তু কমিউনিস্টদের নিন্দা করে বলেছে, 'নিজেদের পথেই চলতে হবে আমাদের।' মনের ভেতর রক্তপাতের আতঙ্ক আরো বেড়ে গেছে যুদ্ধের সময়, এবং একান্তভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে, মানবতার অগ্রগতি শান্তিপূর্ণ পথেই সম্ভব।

এখন সে সমাজতন্ত্রী দলের একজন নেতা। এই নেতৃত্বলাভের একটা বড় কারণ তার বয়োজ্যেষ্ঠতা ও পাণ্ডিত্য। তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে, মানসিক উৎকর্ষ নিঃশেষিত। স্ত্রী বেঁচে নেই, ছেলেমেয়েরা সকলেই সংসারী, প্রকাণ্ড একটা ফ্ল্যাটে সঙ্গীহীন স্বাচ্ছন্দ্যহীন জীবনটা কোনরকমে কেটে যায়। ফ্ল্যাটের ঘরগুলো ছবির গ্যালারির মত—তার শিল্পানুরাগ বেঁচে আছে এখনো। প্রায়ই মাঝে মাঝে যখন গোলমাল আর ভাল লাগে না, সে যায় আভাল্লঁতে। সেখানে লতায় ঘেরা গ্রাম্য কুটির আছে তার। বাগানের ভাঙা চাতালের ওপর সে বসে, ব্যাং ও মুরগীর ডাক শোনে কান পেতে। চেম্বারের অধিবেশনের পর ফিরে এসে তার মেয়ের ছবির সামনে বসে থাকে সে। ছবিটা রেনয়এর আঁকা, গোলাপী রংটা তার ভারি ভাল লাগে—টাটকা হ্যামের ওপরকার উষ্ণ ও মিষ্টি বুদ্বুদের মত সেই গোলাপী রং। অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় এতটুকু চাঞ্চল্য জাগাতে পারে এমন সব কিছুকে অত্যন্ত ভয় করে সে, এই ভয় তার রাজনীতিকেও রীতিমত প্রভাবান্বিত করে। দক্ষিণপন্থী ব্যঙ্গচিত্রকররা যে লোকটিকে দেখায় খোলা ছুরি দাঁতে চেপে ধরেছে, আসলে সে নিরীহ সংসারী জীব এবং নিতান্ত অভ্যাসবশেই বিপ্লবাত্মক বুলির পুনরুক্তি করে।

সমুদ্রের বাতাসের মত হঠাৎ একদিন আকস্মিকভাবে ঝড় উঠল। আর কোথাও ঠাঁই খুঁজে না পেয়ে তরুণের দল ঝুঁকল চরমপন্থী দলগুলোর দিকে। ফেব্রুয়ারীর দাঙ্গায় ভয় পেয়ে গেল ভীইয়ার। দেশের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে বলে ব্রতৈলের শিষ্যদের ওপর এমনিতেই ঘৃণা ছিল ভীইয়ারের। এই ঘটনার পর সে পপুলার ফ্রন্টে যোগ দিল, এমন কি কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার পুরনো বিরোধের কথা ভুলে গেল একেবারে। আসলে সে

আত্মরক্ষার পথ বেছে নিয়েছে, তার বাড়ীঘর সম্পত্তি ও চেম্বারের আসন রক্ষা করছে সে।

নির্বাচন উপলক্ষে একটা বড় সভায় তাকে ও কমিউনিস্টদের একসঙ্গে মঞ্চের ওপর দাঁড়াতে দেখে হাজার হাজার লোক উৎসাহিত হয়ে হাততালি দিল। বক্তৃতা দিতে উঠে সে গণতন্ত্রের কথা বলল, বলল পুরো মজুরিতে ছুটি আর শান্তির কথা। নিজে সে আজন্ম বক্তা, তাই কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল লোকে অন্য কথা শুনতে চাইছে। তারপর সেই আশ্চর্য বাগ্মিতার বালুচরের ভেতর থেকে জীবন্ত কথার ফুলঝুরি বেরিয়ে এল যেন, ভাঙা ভাঙা গলা জোরালো হয়ে উঠল। স্পেনের কথা বলল ভীইয়ার—সেই স্পেনের যেখানে পপুলার ফ্রণ্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেছে।

'এস্ত্রামাদুরায় চাষীরা জমিদারের জমি অধিকার করে ফসল ফলিয়েছে। ধর্মপীঠের কোশাকুশির স্থান নিয়েছে কাঁটাকম্পাস। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে শ্রমিকেরা রাইফেল হাতে নিয়েছে...'

হাজার হাজার গলায় আওয়াজ উঠল—'পপুলার ফ্রণ্ট জিন্দাবাদ!'

গ্যালারির শেষ সারিতে মিশো আর দেনিস বসেছে পাশাপাশি। সকলের সঙ্গে মিশোও আওয়াজ তুলল আর হাততালি দিল। তারপর একটু হেসে দেনিসকে ফিসফিস করে বলল, 'অভিনন্দনটা ওকে নয়, স্পেনের লোকদের।...'

তার পরের বক্তা একজন কমিউনিস্ট—নাম লে-গ্রে। দেনিস বলে উঠল, 'আরে, ওকে আমি চিনি।' গালে কাটা দাগ যে শ্রমিকটি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কোন্ জেলা থেকে সে এসেছে—সে-ই মঞ্চের ওপরে দাঁড়িয়ে।

সে বলল, 'কমরেড্স্, ভোট দেওয়াটাই আজকের দিনে খুব বড় কথা নয়। বুক পেতে পপুলার ফ্রণ্টকে বাঁচাতে হবে। কথা বলার দিন চলে গেছে, এখন কাজ করতে হবে—কঠিন কাজ! জয়লাভ করতেই হবে আমাদের, হার মানব না আমরা... !'

লে-গ্রের দু'হাত চেপে ধরল ভীইয়ার। এই দৃশ্যে খুশি হল সকলে। মনে হল, বিগত যুগ থেকে কল্পনাবিলাসী আর স্বপ্নদর্শীরা বেরিয়ে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে সেই জনসাধারণকে যারা শুধু আত্মত্যাগ করতেই জানে না বিজয় গৌরবকে ছিনিয়ে আনতেও পারে।

দেনিস আর মিশো বেরিয়ে এল। বাইরে গুমোট চাপা গরম, ঝড় আসন্ন। কাফেগুলোর বারান্দায় বসে লোকে বিয়ার খাচ্ছে আর অলস ভঙ্গীতে মুখের ঘাম মুছে নিচ্ছে।

ক্যা ফালগিয়ের-এর সেই নির্বাচনী সভার পর মাত্র ছ-সপ্তাহ কেটেছে, কিন্তু দেনিস ও মিশো কথা বলছে অনেক কালের পুরনো বন্ধুর মত।

দেনিস বলল, 'ভীইয়ার চমৎকার বক্তৃতা দেয়, কিন্তু ওর বক্তৃতায় কিসের যেন অভাব আছে।'

'বক্তৃতায় ও যা বলে তার ওপর ওর নিজেরই বিশ্বাস নেই।'

'না, বিশ্বাস আছে কিন্তু পুরো বিশ্বাস নেই। আমি জানি, আমারও ওরকম হয়। কোন কথা খুব জোর দিয়ে বলার পরেও আমার মনে কেমন সন্দেহ হতে থাকে।' দেনিস হাসল, তারপর বলল, 'অবশ্য, সভায় দাঁড়িয়ে আমি বক্তৃতা দিই না। লে-গ্রেকে আমার ভাল লাগে। ওর কথায় একাগ্রতা আছে।'

মিশো বলল, 'কথার পেছনে কাজের সমর্থন থাকা চাই।'

'তা কি সম্ভব?'

'নিশ্চয়ই। রক্তের বিনিময়ে...'

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে একটা বাজ ফেটে পড়ল, তারপরেই অজস্র ধারায় নেমে এল বৃষ্টি। একটা চালার তলায় আশ্রয় নিল দুজনে। বৃষ্টি আর বিদ্যুৎ চমকানির মধ্যে ঘন হয়ে দাঁড়াল ওরা, কথা বলল চুপিচুপি—যদিও আশেপাশে কেউ কোথাও নেই।

দেনিস নিজের জীবনের কথা বলতে লাগল, 'এত মিথ্যাচার! বাবার বিষয়ে কোন কথা তোমাকে বলতে চাই না, বলা উচিতও নয়। কিন্তু এইভাবে বেঁচে থাকা আমার কাছে অসহ্য। মাঝে মাঝে ডাঙায় তোলা মাছের মত মনে হয় নিজেকে। একটা কিছু করতেই হবে— মনে কোরো না তোমার কাছে উপদেশ চাচ্ছি। এমনি বললাম তোমাকে।'

'পথ তো সহজ...'

'না, আমার কাছে নয়। এই পথ তোমার কাছে সহজ। এই জীবনে তুমি অভ্যস্ত। হয়ত এজন্যে কোন চেষ্টার দরকার হয়নি, এমনও হতে পারে উত্তরাধিকারসূত্রে এই জীবন তুমি পেয়েছ। যাই হোক না কেন, এই ভাবেই তুমি মানুষ। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে

উঠেছি। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি একথা বুঝতে পারি না, কিন্তু সভায় গেলেই এ সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না। একটা কথা বুঝবার জন্যে সাতবার ভাবতে হয় আমাকে। তা যদি না ভাবি, আমিও বোধ হয় দাদার মত হয়ে উঠব। দাদা যে খারাপ লোক তা আমি বলছি না, দাদার একমাত্র দোষ—বড় খামখেয়ালী। হয়ত কোন মেয়ের সঙ্গে ভীষণভাবে প্রেম করবে কিন্তু পরে তার নামটুকু পর্যন্ত ভুলে যাবে একেবারে। দাদার মতামত সম্পর্কেও এই কথা খাটে। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। যে কোন কথা বুঝতে অনেকক্ষণ ভাবতে হয় আমাকে।'

'দেনিস, তুমি সত্যিই আশ্চর্য! এত বাজে কথা বলতে পার তুমি! তোমার সঙ্গে যখন কথা বলি, নিজে কিছু বুঝে উঠতে পারি না। কেন বলতে পার? কেন এমন হয়? বলো না! আচ্ছা, বাজে কথা থাকুক। তোমাকে একটা কথা বলতে চাই, কথাটার অন্য অর্থ করবে না আশা করি। যখনই তোমার কথা শুনি, আমার মন একাগ্র হয়ে ওঠে ও নতুন একটা বোধ জন্মায়। শিল্প সম্পর্কেও এই একই কথা। শিল্পের প্রতি আমার অনুরাগের মূল কারণ আবিষ্কার করব ভেবেছিলাম। কবিতা তো অজস্র আছে—কিন্তু কতগুলো কবিতা পড়েই আমরা ভুলে যাই, আবার এমন কবিতাও আছে যা আমাদের সত্তার গভীরে প্রবেশ করে। স্থপতি-বিদ্যাও আমি বোধ হয় কিছু কিছু বুঝেছি। তার কারণ তুমি। মালের সাহায্য দরকার হয়নি। ঠিক তাই!...'

অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত নাড়ল মিশো, তা দেখেও দেনিস হাসল না।

'এসব কথা এখন থাক, মিশো। আমি অন্য কথা ভাবছি...তুমিই আমাকে জীবনের সন্ধান দিয়েছ, তোমার কাছে শিখেছি কি ভাবে বাঁচতে হয় কি ভাবে কথা বলতে হয়। যেটুকু শেখা বাকী আছে, তাও আমি শিখে নেব। হ্যাঁ, তখন কাজ সম্পর্কে কি বলছিলে? কিন্তু এদিকে খেয়াল আছে, এ বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

মুখর বর্ষণের মধ্যে দুজনে রাস্তায় নামল। লোকে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওদের দিকে: ভিজে সপ্‌সপে হয়ে উঠেও হাসছে দুজনে। দেনিসের মাথায় টুপি নেই, চুলগুলো গ্রীবার কাছ থেকে বেঁকে ওপর দিকে উঠেছে, পরনে ধূসর কোট ও স্কার্ট। দেনিসের উগ্র সৌন্দর্য কেমন যেন সেকেলে। মিশোর চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিঃশব্দে হাঁটছে দুজনে,

দেনিসের বাড়ীর কাছে এসে খুশিমনে বিদায় নিল পরস্পরের কাছে। বর্ষণের যেন আর বিরাম নেই। বড় বড় ফোঁটাগুলো ফেটে পড়ছে রাস্তার বাঁধানো শানের ওপর। বাতাসে ভিজে মাটি আর ঘাসের গন্ধ।

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে ভীইয়ারের মনে হল, বক্তৃতামঞ্চে বড় বেশী উদ্দীপনা দেখিয়েছে সে। কেমন লজ্জা হতে লাগল তার, লোকের হাতে-পায়ে ধরতে হলে যেমন হয়। কেন সে এই ধরনের বক্তৃতা দিল? তার এই বক্তৃতাব ফল 'রাষ্ট্র'কে ভুগতে হবে পরে। এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দকে তখন খুঁটিয়ে বিচার করা হবে। গেঁয়ো অভিনেতার মত হাত পা নাড়লেই মন্ত্রী হওয়া যায় না নিশ্চয়ই!
পুরু গদিওলা একটা আর্ম-চেয়ারে ডুবে গিয়ে সে চেষ্টা করল এই চিন্তাটাকে দূর করতে। সামনের দেওয়ালে বোনার-এর আঁকা একটা ল্যাণ্ডস্কেপ: সবুজ আর ঘন পত্রপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে সূর্যের বিবর্ণ আলোকবিন্দু ফোঁটা ফোঁটা মধুব মত মনে হচ্ছে, ক্যানভাসের আশ্রয়ে বৈশাখী দিনেব নিথব প্রবাহ থমকে আছে যেন। নতুন একটা জগৎ ঘিবে ধরছে ভীইয়াবকে—সেই নিস্কম্প নিশ্চল জগৎ যেখানে ভীইয়ার তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলো কাটিয়েছে।
একটা রেকাবিতে সন্ধ্যার চিঠিপত্র নিয়ে চাকর ঘরে ঢুকল। মুগ্ধ আত্মবিস্মৃতি থেকে জেগে উঠল ভীইয়ার। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে প্রথম চিঠিটা খুলে চোখের সামনে ধরতেই হঠাৎ চমকে উঠল সে। টাইপ-করা ছোট চিঠি: "ফ্রান্সকে শাসন কববার বিন্দুমাত্র সাহস যদি তুমি দেখাও, তোমাকে আমবা ইঁদুরের মত পুড়িয়ে মারব। পপুলার ফ্রন্ট ধ্বংস হোক!—দেশপ্রেমিক!"
এই বেনামী চিঠি পেয়ে ভয় পেয়ে গেল ভীইয়ার। মৃত্যুকে তার ভয় নেই, ভয় দায়িত্বশীলতাকে। আর কিছুদিনের মধ্যেই তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আদেশ দিতে হবে, শাস্তিও দিতে হতে পারে। না, এ কাজের উপযুক্ত সে নয়। চিরকাল সে শুধু বিশ্লেষণ করেছে, সমালোচনা করেছে, নিজের ব্যক্তিগত মতামত জাহির করেছে। কিন্তু আজ পঁয়ষট্টি বছর বয়সের প্রান্তে দাঁড়িয়ে অভিসারিকা কুমাবীর মত কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। একদিন সে ভেবেছিল, কোথাও কোন জটিলতা নেই—নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বেরিয়ে আসবার পর তারা সমাজতন্ত্রের যুগ ঘোষণা করবে। হয়ত এই

চিন্তার ভেতর সত্যিই কোন জটিলতা ছিল না তখন। যুদ্ধের আগে লোকেরা অনেক বেশী সহজ ও সাধারণ ছিল। তখন কোন কিছু নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না, বই পোড়ানো হত না, ফ্যাশিস্ট বন্দীশালার আবির্ভাব হয় নি। আর আজ এই লোকটি লিখেছে—তোমাকে আমরা ইঁদুরের মত পুড়িয়ে মারব...হ্যাঁ, ওরা তা পারে। প্রথমে ওরা উত্তেজনার সৃষ্টি করবে, তারপর প্ররোচনা দেবে, তারপর গুপ্ত আততায়ীর গুলি ছুটবে এখানে ওখানে—মাদ্রিদে যেমন হয়েছে। পপুলার ফ্রন্টকে রক্তস্রোতে ভাসিয়ে দিতে চায় ওরা। আর ভীইয়ারের মিত্রই বা কে? কমিউনিস্টদের কাছে সে তো 'বিশ্বাসঘাতক।' কমিউনিস্টরা দৃঢ় ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং এই দাবী থেকে একচুলও তারা নড়বে না, দাবী আদায়ের জন্যে জনসাধারণের কাছে আবেদন করবে। আর র‍্যাডিকালরা? তেসার কাছে ভীইয়ার ও লেগ্রের কোন পার্থক্য নেই, দুজনে একই দলভুক্ত: 'মার্কসবাদী' শব্দটা উচ্চারণ করতে হলে তেসার কথায় যে ঘৃণা প্রকাশ পায়, তা শোনাই তো যথেষ্ট। ভীইয়ার একেবারেই একা। আজ সে সকলের প্রশংসা পেয়েছে কারণ, লেগ্রের মত বক্তৃতা দিয়েছে সে। যখন সে কোন কিছু করতে চেষ্টা করবে, এই লোকরাই আবার তাকে বিদ্রূপ করবে।

কী লাভ এসবে? আর কতদিনই বা সে বাঁচবে? পাঁচ বছর? হয়ত তার চেয়েও কম। এর চেয়ে অনেক ভাল বোনার-এর ল্যাণ্ডস্কেপের দিকে তাকিয়ে থাকা, ভাল ভাল বই পড়া, শব্দমুখর বর্ণোজ্জ্বল আভালঁর কুটিরে পালিয়ে যাওয়া...কী দুর্বোধ্য আর বিরক্তিকর এখানকার এই জীবন! ঘরের ভেতরটা কী ঠাণ্ডা! যৌবনে রচিত কবিতার কয়েকটা লাইন কেন জানি মনে পড়ল:

রাত্রির কুয়াশা, আর
মাঝে মাঝে বুকচাপা-আলো—
দেয়ালি-পোকার চোখে
মৃত্যুর হাতছানি ঘোর কালো।

সেই মে মাসের গরম সন্ধ্যাতেও হঠাৎ ভীষণ শীত করতে লাগল তার। ঘণ্টা টিপে চাকরকে ডেকে বলল, 'রবার্ট, আমার কম্বলটা নিয়ে এসো তো।'

বাইরে এসে চাকরটা হাসতে হাসতে রাঁধুনীকে বলল, 'নির্বাচনী প্রচারের ফল—গাছের পাতাটিও নড়ছে না তবুও বাবুর শীত করছে।'

১৪

রবিবার সন্ধ্যায় আনের সঙ্গে দেখা করল পিয়ের।

সে বলল, 'চল, বুলভারে বেড়িয়ে আসি। আজ নির্বাচনের ফলাফল বার হবে।'

ফলাফলের কথা চিন্তা করে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে পিয়ের, চিৎকার করছে হাত পা ছুঁড়ে। শরীরটা ভাল নেই বলে বাইরে যাবার ইচ্ছা আনের ছিল না। তা ছাড়া নির্বাচন সম্পর্কে কোন ঔৎসুক্য তার নেই। শেষ পর্যন্ত বাইরে যেতে রাজী হল সে।

সরু অন্ধকার অলিগলি থেকে জনস্রোত চলেছে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে। উত্তেজনাটা শুধু পিয়েরের একার নয়, শহরশুদ্ধ লোককে তা নাড়া দিয়েছে। চারদিকে শুধু প্রশ্ন, অনুমান, গুজব, আশা ও আশঙ্কা। বড় বুলভারে গিজগিজ করছে লোক, যতদূর দেখা যায় শুধু শ্রমিকদের মাথার ক্যাপ। রাস্তার সাধারণ পথচারীরা আজ অদৃশ্য। সাজানো কাফেগুলোর বারান্দায় কয়েকজন বিদেশী লোক ও গণিকা বসে।

একটি সান্ধ্য কাগজের আপিসের সামনে পিয়ের ও আনে দাঁড়াল। ত্রিভুজাকার স্কোয়ারটিতে বিরাট জনতা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে—যবনিকা ওঠবার আগে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শাদা পর্দাটার ওপর নাম ও সংখ্যা ফুটে উঠবে, সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত হবে ফ্রান্সের ভাগ্য। হয়ত দক্ষিণপন্থীরা জিতবে...কেমন একটা অন্ধ আশঙ্কা পেয়ে বসল সকলকে, নানা রকম গুজব শোনা গেল: চাষীরা পপুলার ফ্রন্টকে ভয় করে, জেলাগুলোতে ফ্যাশিস্টরাই বেশী ভোট পেয়েছে, কমিউনিস্ট প্রভাবান্বিত পারীর শহরতলীতে বামপন্থীরা একটিও ভোট পায়নি। পর্দাটার ওপর কয়েকটা নাম ফুটে উঠল—পারীর প্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধিদলের নাম সাগ্রহে সান্ধ্য কাগজ কিনছে সবাই—যদিও তারা জানে কাগজগুলোতে এখনো নির্বাচনের ফলাফল বার হয়নি। জনাকীর্ণ মেলার মত মনে হচ্ছে স্কোয়ারটাকে। সময় কাটাবার জন্যে কে যেন গান গেয়ে উঠল—মাদাম লা মারকিস্। লোকেরা বাদামভাজা চিবোচ্ছে, গান গেয়ে গেয়ে ছাগলের লোমের তৈরী কম্বল ফেরী করছে একদল আরবদেশী।

সন্ধ্যাটা বেশ গরম, আশেপাশের বারগুলোতে বিয়ার ও লেমনেড বিক্রীর মরশুম পড়েছে।

হঠাৎ লাউড-স্পীকারটা ফেটে পড়ল :

'তোরে মোরিস। নির্বাচিত...'

বহুকণ্ঠের আওয়াজে একটা ঝড় বয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তোরে অত্যন্ত জয়প্রিয়, স্কোয়ারের চারদিকে চিৎকার উঠল, 'মোরিস জিন্দাবাদ!' তোরে যে নির্বাচিত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। তবুও এই প্রথম সাফল্য প্রচণ্ড উৎসাহের সৃষ্টি করল। একসঙ্গে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গেয়ে উঠল সকলে। ইতিমধ্যে আশেপাশের রাস্তাগুলোতে পর্যন্ত গাদাগাদি করে মানুষ দাঁড়িয়েছে। পুলিশ বৃথাই চেষ্টা করছে গাড়ীঘোড়ার রাস্তাটুকু খোলা রাখবার। খুব যে জেদ করছে তাও নয়—কোন্ দল জিতবে এখনো অনিশ্চিত, ওরাও চালাক হয়ে উঠেছে।

'ফ্লাঁদ্যা পিয়ের। নির্বাচিত...'

'ফ্যাশিস্টরা নিপাত যাক!'

'গুলি করে মারো এই বিশ্বাসঘাতকদের!'

'ব্লুম লিয়ঁ। নির্বাচিত...'

'পপুলার ফ্রণ্ট জিন্দাবাদ!'

এক একটি নাম উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে হাততালি আর চিৎকার উঠছে। এক একবার সমর্থন জানিয়ে, এক একবার বিদ্রূপ করে। কিন্তু সমর্থনসূচক চিৎকার ক্রমশই বেশী হচ্ছে, বিদ্রূপ কমে যাচ্ছে। দশটা বাজবার আগেই স্পষ্ট জানা গেল, পপুলার ফ্রণ্ট জয়লাভ করেছে। লোকের মুখে হাসিটুকু লেগে রইল। দক্ষিণপন্থী জয়লাভের দু-একটা খবরে আর বিশেষ কেউ কান দিল না। পপুলার ফ্রণ্টের এই অনায়াস জয়লাভ একটা ভেলকির মত, প্রায় অলৌকিক ব্যাপার—যেন একটা আশ্চর্য লটারিখেলায় প্রত্যেকে পঞ্চাশ লক্ষ করে পুরস্কার পেয়েছে। জনসাধারণকে রক্ষা করেছে বন্দুক নয়, কতকগুলো টুকরো টুকরো ছাপানো কাগজ। গত কয়েক যুগ ধরে ভোটাভুটি ব্যাপারটা একঘেয়ে অনুষ্ঠানের মত হয়ে উঠেছিল : র‍্যাডিকাল সমাজতন্ত্রী বা বামপন্থী রিপাব্‌লিকান—যেই নির্বাচিত হোক না কেন, কি যায় আসে তাতে? কিন্তু এবারের নির্বাচনে একটা বিশেষত্ব আছে। এর জন্ম হয়েছে পারীর রাস্তায়, ৬ই ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত দাঙ্গার ভেতরে, মিছিলের লালঝাণ্ডার মেলায়। মে মাসের সেই রাত্রি একটা আশার বাণী বহন করে আনল, পরিবর্তনের আশা, শুধু শাসনব্যবস্থায় নয়, নিজেদের জীবনেও। পারীর স্কোয়ারে স্কোয়ারে, আর পারীর বাইরে দূর

দূর দেশে—ধোঁয়া-ধূসর লীল, আনন্দমুখর মার্শাই, নিঃশব্দ নিষ্ঠুর লিয়ঁ, আটলান্টিকের উপকূল, আলপস্‌এর পাদদেশ—লক্ষ লক্ষ লোকের হৃৎকম্পন দ্রুততর হয়ে উঠেছিল এই আশায়।

'ভীইয়ার ওগুস্ত। নির্বাচিত..'

এত জোরে আওয়াজ তুলল পিয়ের যে আনে হাসতে হাসতে কানে আঙুল দিল। পিয়েরের দেখাদেখি অন্য লোকরাও আওয়াজ তুলল, কিন্তু পিয়েরের কাছে তা যথেষ্ট বলে মনে হল না। 'কমিউনিস্টের বেলা ওরা তো চিৎকার করে মাথায় তুলতে পারে' ঈর্ষাভরা গলায় বলল সে।

'তেসা পল। নির্বাচিত...'

এই ঘোষণার উত্তরে দু-একটা অনিচ্ছুক চিৎকার শোনা গেল—'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!'

আনে বলল, 'চল যাওয়া যাক। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।'

বুলভারে ফিরে গিয়ে ছোট একটা কাফের বারান্দায় বসল দুজনে। চারদিকে ভীড়—সবাই গ্লাশে গ্লাশ ঠেকিয়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

পিয়ের বলল, 'তোমাকে খুব উৎফুল্ল বলে তো মনে হচ্ছে না। এই উৎসবের দিনে চুপ করে আছ যে?'

'কিসের উৎসব? তেসা নির্বাচিত হয়েছে, এই জন্যে? হ্যাঁ, ওই মুখপোড়া একবার আমার হয়ে দু-একটা কথা বলেছিল বটে, তাই বলে আমাকে উৎসব করতে হবে?'

'তেসার প্রশ্নই উঠছে না। ওসব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আসল কথাটা হচ্ছে এই—পপুলার ফ্রন্ট জিতেছে।'

আনে বলল, 'তুমি আমাকে ভাল করেই জান। আমার কাছে জীবনটাই খুঁটিনাটির ব্যাপার।'

'তেসা?'

'না। ঋজুতা। অকপটতা।'

সমস্ত দিনের নানা ঘটনার পর তর্ক করতেও ভাল লাগছিল না পিয়েরের। সে শুধু মাথা নাড়ল, তারপর আশেপাশের লোকদের আনন্দোৎসবের ভেতর ছেড়ে দিল নিজেকে।

কয়েকজন সৈনিক বসেছিল পাশের টেবিলে। প্রত্যেকেরই একটু নেশা হয়েছে, প্রত্যেকেই চিৎকার করছে:

'কর্ণেল তো এবার ট্রাউজার ভর্তি করে...'

'হ্যাঁ, ওরা এখন শক্তহাতে চেপে ধরবে...'

'তুমি কি কাল স্ট্রাসবুর্গ যাচ্ছ?'

'পরশু। আরে ভাই, ওখানে এই তো সময়। জার্মানরা কি সব তৈরী করছে সব সময়ে, বল্লমের মত খাড়া আর সোজা...কতকগুলো কামান বসিয়েছে একেবারে শহরের দিকে মুখ করে···'

খবরের কাগজওলারা ছুটোছুটি করছে, 'বিশেষ সংখ্যা! বিশেষ সংখ্যা! পপুলার ফ্রাণ্টের জয়লাভ!'

আনে বলল, 'পিয়ের, একটা ট্যাক্সি করা সম্ভব হবে কি? শরীরটা আর টানতে পারছি না আমি।'

বাড়ী ফিরেই আনে শুয়ে পড়ল।

পিয়ের বলল, 'তোমার কি হয়েছে বলো তো? ঠাণ্ডা লেগেছে নাকি?'

অস্পষ্টভাবে হাসল আনে, বলল, 'না তা নয়। কিছু ভেব না। কোন অসুখ করেনি আমার। এরকম মাঝে মাঝে হয়। তুমি কি বুঝতে পারছ না? ...কী বোকা তুমি!'

অবশেষে পিয়ের বুঝল। ছোট ঘরটার ভেতর লাফাতে শুরু করে দিল সে।

'চমৎকার! আর ঠিক আজকের মত দিনে এই খবর!···দেখ, মস্ত বড় হবে এই ছেলে! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ছেলে হবে। তোমার জন্যে কিছু কিনে আনব? ওষুধ? কমলালেবু?'

আনে হাসল, 'কিছু দরকার নেই। তুমি আমার সামনে একটু বসো তো। হ্যাঁ, ঠিক এইভাবে।'

দু হাতে পিয়েরের মুখটা চেপে ধরে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল আনে, তারপর হাতের আঙুল মেলে আলোর থেকে আড়াল করল পিয়েরের চোখ দুটোকে।

'এখানে শুধু তুমি আর আমি।' বলল আনে। হাসছে সে, এত হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে, এত শান্তি!

জানলা দিয়ে কার যেন গলা ভেসে এল, 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড···' কুঁজের মত উঁচু নীচু রাস্তা পার হয়ে বেলভিলের গরীব লোকরা ফিরে চলেছে তাদের অন্ধকার দুর্গন্ধ ঘরগুলোর দিকে! আজ তারা নতুন একটা রূপকথা দেখেছে—কোন আমেরিকার সুন্দরীর প্রেম-কাহিনী নয়,

শহরতলীর কোন তৃতীয় শ্রেণীর সিনেমার পর্দায় তৈরী করা দিবাস্বপ্ন নয়—তাদের নিজেদের সম্পর্কেই নতুন রূপকথা। বেলভিলের সংগ্রাম জয়যুক্ত, এবার তারা সুখী হবে।

'মিলাবে মানব জাত...'

আনের মনে পড়ল কাফের সেই সৈনিকদের কথা। স্ট্রাসবুর্গের কথা যে বলেছিল তার গাল দুটো শিশুর মত রক্তাভ। চোখ দুটো ঘোঁচ করে তাকিয়ে রইল আনে, ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো এত অসহায় আর কোনদিন দেখায়নি।

'আচ্ছা পিয়ের, বল তো সত্যিই কি যুদ্ধ হবে?'

'না।'

'এখন না হোক, পরে?'

'এখনো না, পরেও না। কোন সময়েই হবে না।'

১৫

পপুলার ফ্রন্টের জয়লাভে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। ধর্মঘট, সংকট, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি নানা সম্ভাবনার কথা আলোচনা করল তারা। শঙ্কিত গলায় গিন্নীরা কানাকানি করলেন, 'বাড়ীর ঝিটা তো এর মধ্যেই অবাধ্য হয়ে উঠেছে!' দোকানদাররা মাল লুকিয়ে ফেলল। সরকারী চাঁইরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন যে তাঁরা নতুন মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করতে রাজী নন: 'আরে ওরা তো এক ঘণ্টার খলিফা মাত্র!' ব্রতৈল সমস্ত 'খাঁটি ফরাসী'র কাছে এই আবেদন জানাল—পপুলার ফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে তাঁরা যেন বাড়ী বাড়ী জাতীয় পতাকা তোলেন। কয়েকটা রাস্তায় কোন কোন বাড়ী ত্রিবর্ণ পতাকাশোভিত হল, আর লাল ঝাণ্ডা উঠল অন্য সমস্ত বাড়ীতে। মনে হল—শুধু যে একদল লোক আর এক দলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তা নয়, পাথরগুলো পর্যন্ত পরস্পর ঠোকাঠুকি করবার জন্যে উদ্যত। কারবারী মহলে দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। গুজব উঠল, পুঁজির ওপর মোটা ট্যাক্স্ বসবে, ব্যাঙ্কগুলো জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হবে। পুঁজিপতিরা সমস্ত অর্থ দ্রুত চালান দিল আমেরিকার ব্যাঙ্কে।

শান্ত রইল শুধু দেসের। কোন একজন ব্যাঙ্কার বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এই রকম সময়ে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করছ কি করে?' দেসের বলেছিল,

'আচ্ছা, আমাকে বুঝিয়ে বলতে পার ব্লুম আর সারোর ভেতর পার্থক্য কোথায়? আমার বুদ্ধিটা একটু মোটা, এত সূক্ষ্ম তফাৎ আমি তো ধরতে পারি না।'

ভীইয়ারকে মন্ত্রীপদ দেওয়া হয়েছে শুনে দেসের ঠিক করল তার সঙ্গে কথা বলবে; হাজার হোক এই লোকগুলো এখনো শিশু তো, ফস্ করে একটা কিছু করে বসতে পারে। টেলিফোনে ডেকে ভীইয়ারকে বলল, বহুদিন থেকে তার ইচ্ছা ভীইয়ারের ছবিগুলো একবার দেখবে সে।

সভায় বক্তৃতা দেবার সময় ভীইয়ার একাধিকবার দেসেরের নাম উল্লেখ করেছে ঝুনো ব্যবসায়ীদের আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু আজ দেসের আসবে শুনে গর্বভরে ভাবল, 'শেষ পর্যন্ত ধরতে গেলে দেসেরই তো আমাকে নির্বাচিত করেছে!' বক্তৃতায় লোকটির সম্পর্কে যা কিছু বলেছিল, সব ভুলে গেল সে। আজকাল ভীইয়ারের চালচলন একেবারে যুবকের মত, সব কিছুকে নতুন দৃষ্টিতে দেখছে সে। এক সপ্তাহও পার হয়নি সে মন্ত্রী হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যেই সে ভোল পালটে ফেলেছে। চিন্তায়, হাসিতে, পায়ের ওপর পা তুলে বসার ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ সে এখন; অন্য ধরনের চিন্তা, অন্য ধরনের অঙ্গভঙ্গী, অন্য ধরনের কথাবার্তা—নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে।

দেসের কিছুই ভোলেনি, কিন্তু অপমান ও প্রশংসা—দুটোর প্রতিই সে সমান নির্বিকার। বাকসর্বস্বতাকে ঘৃণা করে সে। ভীইয়ারকে অভিনন্দন জানিয়ে সে বলল, 'আপনাকে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে আমি সত্যিই আনন্দিত।'

ছবি দেখবার সময় দেসেরের জড়তা কেটে গেল। দেসের যে উঁচুদরের শিল্প সমজদার, এ কথাটা বুঝতে একটুও দেরী হল না ভীইয়ারের। পিকাসোর প্রথম যুগের শিল্পকর্ম, মাতিস্-এর রেখাচিত্র—মনের আনন্দে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করল দুজনে। মোদিল্লিয়ানির আঁকা কতগুলো ছবিতে একটা উৎকণ্ঠিত আশঙ্কার থমথমে ভাব—সেদিকে তাকিয়ে দেসের বলল, 'নিশ্চল চিত্রের ভেতরেও যে গভীর ভাবাবেগ—এমন কি ব্যাকুলতা ফুটে ওঠে, সেটা সত্যিই আশ্চর্য!'

'পুরনো যুগের বড় বড় শিল্পীদের এই জন্যেই আমি ভালবাসি! যেমন, এল গ্রেকো, জুরবারান...'

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে নিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল দেসের। ধোঁয়ার গন্ধটা উগ্র ও কটু—কম দামের কড়া তামাকে দেসের অভ্যস্ত।

সে বলল, 'এখন এই শিল্পচর্চা একেবারে ছাড়তে হবে আপনাকে। না ছেড়ে উপায় নেই। এই কর্মজীবন আপনি নিজেই বেছে নিয়েছেন। আমার কথা ধরুন, আমার পক্ষে জুয়াড়ী হওয়া সাজে। ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও বাজী ধরতে কোন বাধা নেই আমার। কিন্তু কোন ঝুঁকি নেবার অধিকারটুকু পর্যন্ত আপনার নেই। শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন কতগুলো বিশেষ নিয়ম আছে, রাজনীতিতেও তাই। রাজনীতির এই নিয়মটা হচ্ছে—বড় বড় কথা, ছোট ছোট কাজ। নির্বাচনে আপনাকে আমি সমর্থন করেছি, ভবিষ্যতেও সাহায্য করব। কিন্তু আমার মত ক-জন আপনি পাবেন? স্টক এক্‌স্‌চেঞ্জে আপনি ঘৃণার পাত্র, ভেণ্ডেলের চোখে আপনি ডাকাত ছাড়া কিছু নন, 'ক্রেদি লিয়ঁ'র ভদ্রলোকদের কাছে আপনি একটা জোচ্চোর। আপনার সামান্য হঠকারিতার জন্যে ওরা আপনাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে; কোন ষড়যন্ত্র বা পার্লামেণ্টারি কুটনীতির ধার ধারবে না, ফ্রাঁর দর কমিয়ে দেওয়াটাই যথেষ্ট বড় কারণ ওদের কাছে। তারপর শ্রমিকরা আছে, ওদের আবদারটাও টের পাবেন এর পরে —জমিদারদের কথা নাই বা তুললাম! সবাই দাবী তুলবে—ভীইয়ারের ফাঁসি হোক! বাঃ, ব্রাক্‌এর ছবিটা তো চমৎকার! অবশ্য আমি নিজে ব্রাক্‌কে বিশেষ পছন্দ করি না। ওঁর শিল্পকর্ম বড় নীরস। কিন্তু এটা ওঁর একটা শ্রেষ্ঠ ছবি। এই ব্রাক্‌ই একবার বলেছিলেন, "শিল্পী তাঁর অনুপ্রেরণাকে যাচাই করে নেবেন রুলটানার মাপকাঠি দিয়ে," তেমনি আপনাকেও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা যাচাই করতে হবে ফ্রাঁর বিনিময় মূল্যের সাহায্যে...'

ভীইয়ার চটে উঠল। একবার ইচ্ছা হল বলে, 'বিদেশে পুঁজির চালান নিষিদ্ধ করে আইন তৈরী করব আমরা, ফ্রাঁর দর বেঁধে দেব আর তোমার মত লোকদের ধরে ধরে গারদে পুরব।' কিন্তু তার রাগ বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না, নিজের দায়িত্বের কথা মনে পড়ল।

'আমাদের ঘানিতে তেল না দিলেও চলবে। এই সমস্ত বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান একটিমাত্র অবস্থাতেই সম্ভব, সেটা হচ্ছে মন্ত্রীসভার স্থায়িত্ব।' বলল সে।

'নিঃসন্দেহে। আন্তর্জাতিক অবস্থা সম্পর্কেও এই কথা সত্যি। হ্যাঁ একটা কথা, আমি আশা করি আপনি এই বিষয়ে আমাদের দুজনেরই বন্ধু তেসার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন।'

ভীইয়ার সামান্য ভ্রূকুটি করল—তেসাকে সে শত্রু বলেই মনে করে। কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করে দেসের বলে চলল, 'আমার দৃঢ় ধারণা, আপনি শান্তি রক্ষা করতে সমর্থ হবেন। অবশ্য, হিটলার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে—কিন্তু যুদ্ধ ঠেকাবার জন্যে কিছু কিছু সুবিধা ছেড়ে দেওয়া ভাল।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভীইয়ার। তার ভয় ছিল, দেশের বিপদের অজুহাত তুলে তলোয়ার ভাঁজতে শুরু করবে দেসের। আর সেই দেসেরই কিনা শান্তিরক্ষার কথা বলছে। দেসেরের হাত দুটো জোরে চেপে ধরে ভীইয়ার বলল, 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন, আমার হাতে যতদিন শক্তি আছে ততদিন কোন হঠকারিতা হবে না। হাবসী বা চেকদের জন্যে ফরাসী চাষীরা প্রাণ দেবে তা আমি ঘটতে দেব না কখনো।'

দেসের চলে যাবার পর ভীইয়ার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল যেন কোন স্কুলের ছেলে শক্ত পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। অবশ্য দেসেরেরও যে নিজের স্বার্থ রক্ষা করাই উদ্দেশ্য তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সব কিছু যেন একসঙ্গে জড়িয়ে গেছে—দেসেরের যা স্বার্থ শ্রমিকদের স্বার্থও তাই। আন্তরিকভাবেই দেসের শান্তিবাদী। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে—সে কোন শ্রেণীর বা দলের নয়, সমস্ত জাতির প্রতিনিধি।

একটি আদেশপত্রের ওপর ভীইয়ারের সই নেবার জন্যে তার একজন সেক্রেটারী ঘরে ঢুকল। আদেশপত্রটি কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করবার জন্যে—লোকটি ব্রতৈলের সংগঠনে নেতৃস্থানীয় অংশ গ্রহণ করেছে। ভীইয়ার কাগজটা সরিয়ে রাখল।

'সবাইকে শত্রু করে লাভ কি?' তারপর একটু কৌতুকের ভঙ্গীতে বলল, 'চার কোটি লোককে শাসন করাটা যা তা ব্যাপার নয়, রীতিমত শিখতে হয়। অবশ্য মার্কসের সময়ের কথা আলাদা—তখন শেকল ছাড়া আর কিছু হারাবার ছিল না শ্রমিকদের, পাওনা ছিল গোটা পৃথিবীটাই। আর এখন আমরা শান্তি হারাব, শেকল ছাড়া আর কিছুই পাওনা হবে না।'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেসের কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। ভঙ্গীটা ঘৃণা ও ক্রোধের। এত সহজে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে! আর এই ভীইয়ারের মত লোকের ওপরেই পিয়েরের কী বিশ্বাস! শুধু পিয়েরের কেন, লক্ষ লক্ষ লোকের।

ঈশ্বর, কী নির্বোধ এই লোকগুলো! বোধ হয়, এই বিশ্বাসেই ওদের মুক্তি।

অর্থনীতিজ্ঞ পণ্ডিতদের একটা সম্মেলনে যাবার কথা ছিল দেসেরের কিন্তু হঠাৎ সে মত পরিবর্তন করল; ভীইয়ারের ভীরুতা দেখে তার গা ঘিন ঘিন করছে। রু দ্য রিভলির লম্বা পথ দিয়ে হাঁটতে শুরু করল সে। প্লাস দ্য লা বাস্তিলে পৌঁছে ঢুকল ছোট্ট একটা গলির ভেতর। সামনেই নাচঘর, একটুও ইতস্তত না করে ভেতরে গেল সে; নিজেকে সে ভুলে থাকতে চাইছে কিছুক্ষণের জন্যে...

ভেতরে ফক্‌স্‌-ট্রটের হালকা বাজনা। পুরনো সুরটা নিপুণ বাজিয়ের হাতে চমৎকার শোনাচ্ছে। কাগজের লণ্ঠন ও কাপড়ের মালা দিয়ে হলঘরটা মঞ্চের মত সজ্জিত। একদল নাবিক, শ্রমিক ও হোটেলের মেয়ে কর্মচারী প্রবলভাবে নাচছে।

একটু অগ্রসর হয়ে দেসের একটি মেয়ের হাত ধরল। মোটাসোটা মেয়েটি, মুখে অজস্র তিল, সস্তা পাউডারের গন্ধ গায়ে, নাচবার সময় পরম সুখে চোখ দুটো ঘুরতে থাকে অনবরত। নাচ শেষ হলে দেসের মেয়েটিকে ব্র্যাণ্ডি খাওয়াল।

'তুমি কি নাচতে ভালবাস?'

দেখা গেল মেয়েটি একটু বেশী কথা বলে, 'ভীষণ ভালবাসি! কিন্তু নাচবার সুযোগ পাই না বিশেষ। সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত আমাকে কাজ করতে হয়। তারপরেও বাড়ীতে করবার জন্যে কিছু কাজ সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। জানেন, এজন্যে আমি কত মাইনে পাই? মাসে পাঁচশো পঞ্চাশ ফ্রাঁ। এই মাইনেতে চলে কখনো? সবাই বলছে এই অবস্থা আর থাকবে না। দরজীরা স্পষ্ট বলে দিয়েছে, যদি মাইনে বাড়ানো না হয় তবে ধর্মঘট হবে। এখন পপুলার ফ্রণ্টের যুগ, পুরনো দিনের মত কেউ আর থাকতে চায় না। ঠিক বলিনি?'

পাইপটা ঠুকতে ঠুকতে দেসের তার অস্বাভাবিক বড় ভুরু দুটো কুঁচকে তাকিয়ে রইল। বলল:

'নিশ্চয়ই, সবই বদলে যাবে। যেমন ধরা যাক, এতদিন ধলারা কালোদের সঙ্গে নেচেছে—এবার ভীইয়ার আদেশ দেবে, কালোরা ধলাদের সঙ্গে নাচবে। আচ্ছা, বিদায় হে প্রিয় বান্ধবী! আমার বাড়ী ফিরবার সময় হয়েছে।'

১৬

শনিবার 'সীন' বিমান-কারখানায় ধর্মঘট শুরু হল। সারা সপ্তাহ ধরে শ্রমিকরা আপোষে মিটমাটের চেষ্টা করেছে। মাইনে বাড়ার দাবীতে আপত্তি নেই দেসেরের, কিন্তু অন্যান্য দাবী সে সোজাসুজি বাতিল করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে দুটো দাবী সম্পর্কে সে এতটুকু মাথা নোয়াতে রাজী নয়, তা হচ্ছে যৌথ মজুরি-নির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটি। এক কথায় সে বলে দিয়েছে, 'এ সম্পর্কে কোন আলোচনাই হবে না।'

দেসের জানে, মাঝে মাঝে ধর্মঘট অবশ্যম্ভাবী। এই ছোট ছোট যুদ্ধগুলোতে কখনো শ্রমিকদলের কখনো বা দেসেরের জয়লাভ হয়। কিন্তু প্রত্যেক-বারেই বিজিত দল প্রতিশোধের কথা চিন্তা করতে থাকে। সব সময়েই ধর্মঘটীদের দাবী শেষ পর্যন্ত একটা মূল কথায় এসে দাঁড়ায়—কাজের সময় কমানো আর মাইনে বাড়ানো। এ ব্যাপারটা অস্বাভাবিক মনে হয় না দেসেরের। সে নিজে হাজার রকম উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে কিন্তু শ্রমিকদের কাছে বেতনবৃদ্ধির একমাত্র পথ—ধর্মঘট। বাকী যা কিছু সবটাই নির্ভর করে বিশেষ অবস্থা ও অনমনীয় মনোভাবের ওপর। কারখানায় যদি কাজ বেশী থাকে আর বেকার দক্ষ শ্রমিক যদি পাওয়া যায় তবে দেসের আপোষে বিরোধ মিটিয়ে ফেলে। আর যখন কাজ কম ও দালাল প্রচুর, দেসের কিছুতেই নতি স্বীকার করে না; এক বা দু সপ্তাহ পরে ধর্মঘটীরা অনাহার সহ্য করতে না পেরে আত্মসমর্পণ করে কিংবা দেসের পুরনো লোকদের মাইনে চুকিয়ে দিয়ে নতুন লোক নেয়। এই চিরস্থায়ী দ্বন্দ্বকে জীবনেরই নিয়ম বলে মনে করে সে; প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি তার সহানুভূতিও নেই, বিদ্বেষও নেই।

নির্বাচনে পপুলার ফ্রন্ট জয়লাভ করেছে এবং এই জয়লাভে দেসেরেরও কিছুটা হাত আছে। র‍্যাডিকালদের কূটকৌশলের ওপর বিশ্বাস রেখেছিল দেসের। নতুন মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন তার পুরনো বন্ধু। ভীইয়ারের কথাবার্তায় তার মনের সমস্ত ভয় কেটে গেছে। ভীইয়ার অনেক দিনের ঝানু বক্তা, এবার সে বক্তৃতার আগুন ছুটোতে পারবে। আগুনে বক্তৃতাতে ভয় পায় না দেসের—ফুলঝুরির ফুলকিকে আগুনের শিখা মনে করাটা অর্থহীন। ধর্মঘটের আশঙ্কা তার মনেও ছিল—শ্রমিকরা যে

সুযোগ ছাড়বে না, তা জানত সে। সুতরাং সে প্রস্তুত হয়েই ছিল—দর কষাকষির কায়দা সে ভাল করেই জানে। কিন্তু মিশো যে সব দাবী পেশ করেছে তাতে রীতিমত চটে গেছে সে। সে তো আর সরকারী দানছত্র খুলে বসেনি, ব্যবসা করতে নেমেছে। ভীইয়ার যদি মনে করে হাওয়া খাবার জন্যে শ্রমিকদের সমুদ্রের ধারে যাওয়া দরকার, তাতে আপত্তির কি আছে। বেশ তো, ভাল কথা। সরকারী টাঁকশাল থেকে খরচটা দিলেই হয়ে যায়। কিন্তু যৌথ মজুরি-নির্ধারণ সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।

সে বলেছিল, 'না, তা হয় না, মঁশিয় মিশো! স্বাধীনতার নীতিতে আমি বিশ্বাস করি। এই কারখানায় আপনার থাকা বা না-থাকা আপনার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, আপনি যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। তেমনি, এই কারখানায় আপনাকে রাখা বা না-রাখা আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে, আমি যা ভাল মনে করব তাই করব।'

সেই শনিবার একটি লোকও কাজে হাত দিল না। আঠার হাজার লোক জড়ো হল ঢালাই ঘরের সামনের উঠোনে। লেগ্রে চিৎকার করে বলল, 'যাঁরা বিরুদ্ধে, হাত তুলুন।'

শ্রমিকদের ভেতর কয়েকজন ভীরু প্রকৃতির লোক ছিল। ধর্মঘটে মত ছিল না তাদের, অন্য শ্রমিকদের বোঝাতেও চেষ্টা করেছিল কথাটা। বাড়ীর লোকের তিরস্কারকে তারা ভয় করত, অনশন ও পরাজয়ের আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু এত লোকের সামনে নিজেদের ভীরুতাকে প্রকাশ করতে চাইল না তারা, বিষণ্ণভাবে চুপ করে রইল। একটি হাতও উঠল না।

সকলে গেট-এর দিকে এগিয়ে চলল। মিশোর গলা শোনা গেল হঠাৎ:

'কমরেড্‌স্, থামুন!... চলে যাবেন না!...'

একটা লরির ওপর দাঁড়িয়ে লাউড-স্পীকারে মুখ রেখে সে বলল, 'চলে যাবেন না!' প্রতিধ্বনির মত চারদিক থেকে বহু কণ্ঠের আওয়াজ উঠল, 'চলে যাবেন না!'

মিশো বলল, 'কমরেড্‌স্, যদি আমরা চলে যাই, ওরা দালাল এনে কাজ চালাবে। এখানে আমরা ঘাঁটি গেড়ে বসব, এখানে রাত কাটাব, এখানে থাকব—একদিন বা এক সপ্তাহ বা এক মাস, যতদিনই হোক জয়লাভ না করা পর্যন্ত আমরা নড়ব না!'

বিস্ময়সূচক মন্তব্য শোনা গেল চারদিকে—মিশো কি বলতে চাইছে ঠিক বুঝতে পারল না কেউ।

'আমরা তো ধর্মঘট করেছি!'

'এখানে থাকলে খাব কি?'

'আর পুলিশ এসে গুঁতিয়ে বার করে দেবে আমাদের!'

লাউড-স্পীকারে মুখ রেখে মিশো বলে চলল, 'খাবার ব্যবস্থা কমিটি করবে। সেজন্যে ইউনিয়ন থেকে আমরা টাকা নেব। ওরা যদি আমাদের বার করে দিতে চেষ্টা করে তবে তুমুল কাণ্ড হয়ে যাবে! চারদিকে পিকেট বসাতে হবে আমাদের। কোন দালালকে আমরা ঘেঁষতে দেব না। বড় বাবুদের কারখানার বাইরে যেতে দেব কিন্তু ঢুকতে দেব না। কমরেড্‌স্, এরকম ধর্মঘট এর আগে আর হয়নি সত্যি কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেব...'

মিশোর তরুণ বন্ধু, কারখানার টার্নার জিনো আপিসবাড়ীর ছাদে উঠে লালঝাণ্ডা উড়িয়ে দিল। 'আমাদের দুর্গ-পতাকা!' নীচের লোকদের দিকে তাকিয়ে বলল সে।

এইভাবে যে অভূতপূর্ব ধর্মঘট শুরু হল তা কাঁপিয়ে তুলল সমস্ত দেশকে।

সারাদিন দলে দলে লোক ভীড় করল জেটির ধারে কারখানার চারপাশের রাস্তায়। টিনের টুপি মাথায়, গ্যাস-মুখোস আঁটা তিন হাজার পুলিশ দাঁড়াল সার বেঁধে কারখানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। কিন্তু সরকারী মতিস্থিরতা না থাকায় তারা আক্রোশ মেটাল কারখানা প্রবেশেচ্ছুক মজুর-বৌ আর নিরীহ পথচারীদের ওপর। সন্ধ্যার সময়েও দেখা গেল দলে দলে স্ত্রীলোক ঢুকছে কারখানার ভেতর। সঙ্গে আনছে রুটি, মাংস, মাখন, ফল ও মদ। ফুটবল, দাবার ছক, বই আর গীটার বাজনাও এনেছে কেউ কেউ। কয়েকটা ডিম আর একটা বালিশ হাতে করে জিনোর মাও এসেছে। দেওয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল জিনো, নীচ থেকে মা চিৎকার করে বলল, 'কি যে সব পাগলামি ঢোকে মাথায়, পাজী বেহায়া কোথাকার! বাড়ী এসে ঘুমোবি আয়!' জিনো হাসল অপ্রস্তুতের মত। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে একমাত্র পিয়ের যোগ দিয়েছে ধর্মঘটীদের সঙ্গে। ওয়ার্ক্‌স্ ম্যানেজার বলেছিলেন, 'সাবধান, জানেন তো দলত্যাগীদের কেউ পছন্দ করে না।'

'আর এটাও জেনে রাখুন মঁশিয়, আমার বাবা মজুর ছিলেন।'

পিয়েরকে দলে পেয়ে খুশি হয়েছে জিনো, তার মনে একটা নিশ্চয়তা এসেছে যে ধর্মঘট জয়যুক্ত হবে। জিনোর বয়স উনিশ, স্বপ্ন দেখে ব্যারিকেডের, বুলেট আর ঝাণ্ডার। এই স্বপ্ন-প্রবণতা থেকে পিয়েরও মুক্ত নয়।

রাত্রিবেলা কারখানাটা মনে হল সামরিক শিবিরের মত, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে প্রহরী দাঁড়িয়েছে। জিনো আর পিয়ের ছিল বড় গেটের সামনে। পিয়েরের মনে হচ্ছে যেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, যে কোন মুহূর্তে শত্রুর আক্রমণ হতে পারে।

ফিস্‌ফিস্ করে জিনো বলল, 'ওরা যদি আক্রমণ করে? তোমার কাছে রিভলবার আছে তো?'

'আছে। কিন্তু রিভলবার ব্যবহার করা চলবে না। তার আগে মিশোকে জিগ্যেস করতে হবে।'

হঠাৎ একদিনে নেতা হয়ে গেল মিশো। এতদিন কারখানার কয়েকজন সঙ্গী আর কমিউনিস্টরা ছাড়া বিশেষ কেউ চিনত না মিশোকে, এখন সবার মুখে এক কথা, 'মিশোকে জিগ্যেস কর...মিশো এই হুকুম দিয়েছে ...মিশো এতে মত দেয়নি...'

আর, অক্লান্ত পরিশ্রম করল মিশো। রান্নাঘর বসাল, ব্যাণ্ড বাজনার দল তৈরী করল, সংযোগ স্থাপন করল জেলা কমিটির সঙ্গে, রিপোর্ট পাঠাল 'লুমানিতে'র জন্যে। সহজেই ভেঙে পড়ে এমনি লোকদের উৎসাহিত করে বলল, 'আমরা জিতবই! ঠিক তাই!' মেসিনঘরে গিয়ে সবাইকে সাবধান করে এল ধ্বংসকার্যের বিরুদ্ধে।

সন্ধ্যার সময় ব্যাণ্ডের সুরে 'ইণ্টারন্যাশনাল' বেজে উঠল। হাজার হাজার লোক গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। সেই ধ্বনি ভেসে চলল কারখানার সীমানা পার হয়ে, পুলিশ প্রহরীর মাথার ওপর দিয়ে, নদী ডিঙিয়ে, উত্তেজিত শহরতলীর অন্ধকার বাড়ীগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে। সেই দূরাগত গান শুনে বিছানায় এপাশ ওপাশ করল মজুর-বৌরা। কাল কি হবে? অনশন? রক্তপাত? সাফল্য? ধর্মঘটীরাও ঘুমোতে পারল না। গ্রীষ্ম-রাত্রির তারকা-খচিত আকাশের তলায় তারা স্বপ্ন দেখল জয়লাভের।

সংঘর্ষের আশঙ্কায় রাত্রিবেলা পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হল। রবিবার

কারখানায় ঢুকবার পথে আর কোন বাধা রইল না। কিন্তু তবুও কারখানা-টাকে অবরুদ্ধ দুর্গের মত মনে হতে লাগল। কে অবরোধ করেছে? দেসের? দালালদের প্রেতাত্মা? অনশনের দুঃস্বপ্ন? জয়ের দিন পর্যন্ত মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রতিজ্ঞা নিল সবাই।

সোমবার সন্ধ্যায় মিশো সান্ধ্য কাগজটা খুলেই চিৎকার করে উঠল, 'অন্যরাও যোগ দিয়েছে! প্রত্যেকে! ঠিক তাই! ..'

সে এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল যে ভাল করে কথা বলতে পারছিল না। 'লা ভোয়া নূভেল্' খবর দিচ্ছে যে, সীন কারখানার অস্বাভাবিক ধর্মঘট সমগ্র পারীতে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি বড় বড় কারখানায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কারখানার ভেতরে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। বিভাগীয় দোকানগুলোতে পর্যন্ত ধর্মঘট চলছে। রাত্রিবেলা দোকানগুলো উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকে—এমন কি দোকানের মেয়েরাও স্থানত্যাগ করেনি। একটি সরকারী আপিসের কম-মাইনের কর্মচারীরা ধর্মঘট ঘোষণা করে আপিসের ভেতরেই বসে আছে। এই চমকপ্রদ ধর্মঘটের বিবরণ লিখেছে জলিও নিজে তার নিজস্ব আবেগময়ী ভঙ্গীতে: 'পারীর সাধারণ মানুষ আশ্রয় নিয়েছে আভঁতিন্ পাহাড়ে।' বিবরণে বলা হয়েছে—পারীর শ্রমিক অঞ্চল জনশূন্য, স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া আর কাউকে রাস্তায় দেখা যায় না। বিবরণটা জলিও শেষ করেছে খানিকটা কবিত্ব করে—'দেখে মনে হয় যেন সেই যুদ্ধ-সময়ের দিনগুলো ফিরে এসেছে আবার। পুরুষরা চলে গেছে বাড়ী ছেড়ে বহু দূরে—যুদ্ধক্ষেত্রে...'

ধর্মঘটের খবর শুনে দিন দুয়েক চুপচাপ কাটিয়ে দিল দেসের। ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজকর্ম ফেলে রাখল, বাড়ীর টেলিফোন কেটে দিল, তারপর অভিদ্-এর বই নিয়ে বসে রইল ঘরের ভেতর। শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখবার জন্যে সে অপেক্ষা করছে। জোর করে কারখানা দখল করার কল্পনাও তার কাছে অসম্ভব—এত অসম্ভব যে এই ব্যাপারটার একটা দ্রুত পরিণতি হবে বলেই সে আশা করে। তার ধারণা, হয় শ্রমিকদের শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে এবং তারা বাড়ী ফিরবে নয়তো একটা বিদ্রোহ শুরু হয়ে যাবে। সোমবার দিন দেসেরকে জানান হল যে ধর্মঘট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও ছড়িয়ে পড়েছে। পরদিন সকালে সে পারী গেল। কারখানার গেটের সামনে তার গাড়ী যখন থামল তখন নটাও

বাজেনি।' গেটের সামনে প্রহরীর কাজে নিযুক্ত তরুণ শ্রমিকটি তার পথ রোধ করে দাঁড়াল :

'বাইরের লোককে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি বাইরের লোক নই। আমি এই কারখানার পরিচালনা পরিষদের সভাপতি। আমার নাম দেসের।'

শ্রমিকটি হাসল, 'হ্যাঁ, নামটা পরিচিত বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু দেখুন মঁশিয় দেসের, আপনাকে যদি আমরা ঢুকতে দিই, আপনি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না। কারখানার ভেতরই আপনাকে থাকতে হবে যতদিন পর্যন্ত না...'

'যতদিন পর্যন্ত না ?'

'যতদিন পর্যন্ত না মঁশিয় দেসের আমাদের পথ ছেড়ে দেন।'

দুজনেই হেসে উঠল। কিন্তু মনে মনে অত্যন্ত চটে উঠল দেসের। কী আবদার! ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে কী চমৎকার ধারণা! ধর্মঘটী শ্রমিক মহাশয়দের যদি বাড়ী যেতে না দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা মজাটা টের পান। কিন্তু বাইরে দেসের কোন রাগ বা অসন্তোষ প্রকাশ করল না, তেমনি প্রাণখোলা হেসে বলল :

'তোমাকে বেশ বুদ্ধিমান লোক বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু যাই হোক আমাকে ঢুকতে দিতেই হবে।'

শ্রমিকটি একজন কমরেডকে পাঠাল মিশোর কাছে নির্দেশ নেবার জন্যে। পাঁচ মিনিট পরে সে বলল :

'আপনি ভেতরে আসতে পারেন। যখন খুশি চলে যাবার অধিকারও আপনার রইল। কিন্তু মেশিনঘরের ভেতরে আপনি ঢুকতে পারবেন না—কোন গোলমাল যাতে না হয় সে জন্যেই এই ব্যবস্থা।'

শ্রমিকটির পিঠ চাপড়ে দিয়ে দেসের বলল, 'বাঃ, কাজকারবার কি ভাবে চালাতে হয়, তাও শিখে ফেলেছ দেখছি। চমৎকার!'

জনশূন্য পরিত্যক্ত আপিস-ঘরগুলো পার হয়ে গেল দেসের। অনেক দিনের পুরনো পত্রবাহক লোকটি অপরাধীর মত এল পেছন পেছন।

'এখানে কি কেউ নেই ?' বলল দেসের।

'ওরা সকলেই শনিবার চলে গেছেন। শুধু মঁশিয় ছ্যবোয়া এখনো আছেন। আর, মাফ করবেন হুজুর, তিনিও শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।'

'তিনি কি যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছেন ?'

'মাফ করবেন হুজুর, তিনি ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।'

দেসের হেসে উঠল—তাহলে পিয়েরও কারখানা দখল করবে বলে স্থির করেছে !

'মঁশিয় হ্যাবোয়াকে ডেকে আন' বলল সে।

পিয়েরকে বসতে বলে সিগারেট বাড়িয়ে দিল দেসের। তারপর বলল, 'তোমাকে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। এই কারখানাটা তোমরা কি একেবারেই দখল করে নিলে, না মাত্র কিছুদিনের জন্যে ? জানতে পারলে আমার সুবিধা হয় কারণ তাহলে আমি আমার সময়টা কাটাবার একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারি।'

পিয়ের বলল, 'কারখানা কেউ দখল করেনি। এটা হচ্ছে ধর্মঘট। আর আমার মতে ধর্মঘটীদের দাবী সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।'

'চমৎকার ! তাহলে তোমার মতে এটা হচ্ছে ধর্মঘট ? না বন্ধু, না। এর নাম জুলুম, হিংসা। মনে কোরো না, সম্পত্তি হারাবার ভয়ে আমি কাঁপছি। আমার ভয় ফ্রান্সের জন্যে। একবার যদি হিংসাত্মক কাজ শুরু হয়, তাহলে চলতেই থাকবে।'

'তুমি নিজেই বলেছ, অপরের সুখে তুমি বাদ সাধতে চাও না। কারখানার শ্রমিকেরা বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায় আরও ভালভাবে, আর একটু স্বাচ্ছন্দ্য ও নির্ভরতার ভেতর। এতে তুমি আপত্তি করবে কেন ?'

দেসেব বলল, 'আমি তোমায় আগেই বলেছি, সামান্য একটু অসাবধানতার ফলে আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। চারদিকে এখন প্রচণ্ড আলোড়ন, যে কোন মুহূর্তে দেশের স্বাভাবিক অবস্থার ওলটপালট হয়ে যেতে পারে।'

'কিন্তু তোমার ওপরেই তো সব কিছু নির্ভর করছে। শ্রমিকদের সঙ্গে আপোষের শর্তগুলো মেনে নিলেই তারা কারখানা ছেড়ে চলে যাবে।'

'তার মানেই আত্মসমর্পণ করা। ওটা আমার ব্যবসাও নয়, স্বভাবও নয়। বরং আমি অপেক্ষা করব। ইচ্ছা করলেই আমি পুলিশ ডাকতে পারি। নিজের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্যে সরকারী সাহায্যও নিতে পারি। কিন্তু দুটোর কোনটাই আমি করব না। কেন ? পপুলার ফ্রন্টকে আমি ভোট দিয়েছি—এই জন্যেই হয়ত। কিন্তু তোমরা কি করছ ? চারদিকে ধ্বংস ডেকে আনছ। দেশের সংস্কার করবার একটা সুযোগও ভীইয়ারকে তোমরা দিচ্ছ না।'

পিয়ের বলল, 'ঠিক তার উল্টো। ভীইয়ারকে আমরা সাহায্য করছি। এখন জনসাধারণের আন্দোলনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে ভীইয়ার। ভীইয়ার…'

ছবি আর আসবাবে পরিবেষ্টিত প্যাঁশ্নে চোখে সেই বৃদ্ধ লোকটিকে মনে পড়ল দেসেরের। একটু হেসে সে বলল, 'তাই কি তোমার বিশ্বাস? তা যদি হয় তো ভালই। তোমাদের সাফল্য কামনা করি। হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাল তো? বেশ, বেশ। এবার আমি কারখানার বাইরে যেতে পারি বোধ হয়? আচ্ছা, বিদায়!'

তার ও দেসেরের ভেতর যা কিছু কথাবার্তা হয়েছিল কমিটির কাছে খুলে বলল পিয়ের। তারপর মিশোকে বলল, 'আমি ভাবতেই পারিনি লোকটা এই রকম…।' কথাগুলো তার গলায় আটকে গেল।

মিশো হাসল।

'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও যে দেসের ঠিক দেসেরের মতই হবে, এটা তুমি কোনদিন ভাবনি?' বলল মিশো।

সন্ধ্যার সময় ঠিক হল, ধর্মঘটীদের আমোদপ্রমোদের জন্যে কিছু গানবাজনার বন্দোবস্ত করা হবে। 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এ টেলিফোন করে মিশো জানতে চাইল, এ বিষয়ে তারা সাহায্য করতে পারে কিনা। অভিনেতা জড়ো করবার চেষ্টা করল মারেশাল। কয়েকজন অভিনেতা জানালেন, তাঁরা ব্যস্ত—কিন্তু জিনেৎ এক কথায় রাজী হয়ে গেল যদিও অপারেশনের পর তখনো তার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি।

আপিস ঘরের সামনে ছোট বাগানটায় মঞ্চ তৈরী হল। বাতাসে জুঁই ফুলের গন্ধ। আলোগুলোর ওপরে চিনে লণ্ঠনের ঝাড়। অর্কেস্ট্রা বাজিয়েরা সুর বাঁধছে। স্থানীয় উৎসবের দিনে মফস্বল শহরের স্কোয়ারের মত মনে হল কারখানার উঠোনটাকে।

বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী হল। মারেশাল আবৃত্তি করল র‍্যাঁবোর মৃত সৈনিকের উদ্দেশ্যে লেখা শোকগাথা। কবিতার আশ্চর্য শব্দগুলো আচ্ছন্ন করল শ্রোতাদের, গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। তারপর একটি মেয়ে গান গাইল—রাভেলের প্রেমের গান। শ্রোতাদের অনুরোধে বারবার গানটা গাইল সে। ঢেউ-খেলানো লোহার পাত আর লালঝাণ্ডার পটভূমিকায় আঁকা হয়ে রইল তার মুখের হাসিটুকু। কারখানার চুল্লীতে কয়লা যোগান দেয় যে

শ্রমিকটি, সে গাইল মোরিস শেভালিএ-র একটা গান : 'পারী আজো সেই পারীই আছে'। সেই গানের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইল প্রত্যেকটি শ্রোতা। গাইল আর হাসল—না, নেই। পারী বদলে গেছে। তারপর জিনেতের পালা।

এত উৎফুল্ল আর কোনদিন হয়নি জিনেৎ। মাসের পর মাস কেটেছে মাইক্রোফোনের সামনে নীরস বিজ্ঞাপনের বুলি আউড়ে; এতদিনের দীর্ঘ মৌন ভঙ্গ করে আবার মুখর হয়ে ওঠবার বরলাভ হল বুঝি। দীপান্বিতা মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে তার আয়ত চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেঙে পড়বে বোধ হয়। 'নিষ্ফল বসন্ত' থেকে কিছুটা অংশ সে অভিনয় করল। অভিনয়ের শেষে প্রশংসা আর অভিনন্দনের ঝড় উঠল যেন। হাততালির শব্দ ছাপিয়ে শোনা গেল বহু কণ্ঠের চিৎকার। জিনেতের মনে হল, ফঁয়েৎ অভেজুঁয়ার জনসাধারণ জেগে উঠেছে, এগিয়ে চলেছে জয়যাত্রার পথে—সে আর এখন সামান্য অভিনেত্রী জিনেৎ নয়, বীরনেত্রী আন্দালুসিয়া ডাক দিচ্ছে জনসাধারণকে। হঠাৎ জিনেৎ পাদপ্রদীপের সামনে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এস, যাই!'

পিয়ের বলতে পারবে না, জিনেতের এই কথায় কেন বা কি জন্যে সে চিৎকার করে সাড়া দিল; সে শুধু জিনেতের দুই চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিয়েছে। জিনেৎ হাসল—সুখী আর ক্লান্ত হাসি। এগিয়ে এসে জিনেতের হাত ধরল পিয়ের।

'আপনি চমৎকার আবৃত্তি করেছেন' বলল সে, 'আপনি এসে কী ভালই না হয়েছে! দেখলেন তো, এঁরাই আপনাকে সত্যিকার বুঝতে পারে। এঁরা তো আর শৌখিন থিয়েটার-দর্শক নয়, জীবন্ত জনসাধারণ। লুসিয়ঁ এলে ভাল হত। লুসিয়ঁ এল না কেন, অন্য কাজে ব্যস্ত বুঝি?'

'জানি না। ওর সঙ্গে আমার আর দেখা হয় না। আমরা পৃথক হয়ে গেছি।'

অল্প কিছুক্ষণের জন্যে কেমন একটা বিষণ্ণতা বোধ করল জিনেৎ। অনেক কথা মনে পড়ল—নিজের নিঃসঙ্গ জীবন, হোটেলের অপরিষ্কার ঘর যেখানে সে সম্প্রতি উঠে এসেছে, রেডিওর নিস্তব্ধ স্টুডিও আর অভিশপ্ত বিজ্ঞাপন ঘোষণা। হঠাৎ গান শোনা গেল সমবেত কণ্ঠে, শ্রমিকরা গাইছে—'শহরতলীর তরুণ যোদ্ধা।' অরণ্যের সূর্যসন্ধানী শাখাপ্রশাখার মত বা বন্দরে মাস্তুলের মত

সহস্র সহস্র বজ্রমুষ্টি উদ্যত হয়ে উঠল আকাশের দিকে। জিনেৎও তার ছোট্ট হাতের মুঠি তুলল ওপরের দিকে—চারদিকের শব্দ আর তার নিজের চোখের জল তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল জিনেৎ, তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলল।

কারখানার আলো জ্বলল সারারাত ধরে। প্রহরীর ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করল মিশো।

১৭

জিনেৎ যে রাত্রে সীন কারখানায় অভিনয় করল, লুসিয়ঁ সে রাত্রে চোদ্দ হাজার ফ্রাঁ হারল তাসখেলায়। ভাগ্য সেদিন তার ওপর আগাগোড়া এত অপ্রসন্ন ছিল যে চারপাশের লোকেরা তাকিয়ে দেখেছিল তাকে। 'শিল্পীসংঘ'টা আসলে একটা নীচুস্তরের জুয়ার আড্ডা। সুদখোর, গুণ্ডা আর গণিকাদের ভীড় এখানে। জুয়াড়ীদের উত্তেজনা ও উচ্ছৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে তাদের সঙ্গে তারা অবাধ মেলামেশা করে। হাজার ফ্রাঁ-র শেষ নোটটা ভাঙাবার পর হঠাৎ লুসিয়ঁর দম আটকে এল, খোলা জানলাটার সামনে দাঁড়াল সে।

পেছনে কার যেন চাপা মন্তব্য শোনা গেল, 'নক্ষত্রের শোভা উপভোগ করা হচ্ছে নাকি?'

লুসিয়ঁ উত্তর দিল না। নীচে পারীর মুখর রাস্তা। একপাশের প্রস্রাবখানাটার মাথায় একটা সাইনবোর্ড জ্বলছে: "দেখন-হাসি গরু"—বাজারের সেরা পনির। হঠাৎ দমকা হাওয়ার সঙ্গে ঈথরের গন্ধ ভেসে এল, হাসপাতালের অপারেশনের ঘরের কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই সে দেখল বার্জারের নির্বোধ মুখটা তার দিকে তাকিয়ে আছে। বার্জারের উদ্দেশ্য বুঝতে একটুও দেরী হল না তার—ও এসেছে ধার শোধ দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে।

'নাঃ, শেষ পর্যন্ত তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে দেখছি।' ক্রুদ্ধস্বরে বলল বার্জার।

তখন লুসিয়ঁ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝতে পারল যে, এই মুহূর্তে তাকে চলে যেতে হবে—দেশ ছাড়তে হবে একেবারে। কিছুদিন থেকে দারুণ মানসিক কষ্ট ভোগ করছে সে—সমস্ত আশা চুরমার হয়ে গেলে মানুষের যেমন হয়। তার

উচ্চাশা গোপন ব্যাধির মত নিঃশেষ করেছে তাকে, অত্যন্ত তীব্রভাবে মৃত্যু সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে। জীবনপ্রবাহ স্তব্ধ, বস্তুজগৎ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নাসারন্ধ্রে ঈথরের গন্ধটা জমাট বেঁধে রয়েছে যেন। রাত্রিবেলা রাস্তায় কোন স্ত্রীলোককে দেখলে জিনেৎ বলে ভুল হয়, পেছন পেছন ছুটতে শুরু করে হঠাৎ। অন্ধকারে জিনেতের চোখ দুটো ভেসে ওঠে কোন কোন সময়, আর সে বোকার মত বারবার বলে, 'আমার দোষ নয়, আমার দোষ নয়।' এমনভাবে বলে যেন জিনেতের প্রেতাত্মা ভর্ৎসনা করছে তাকে। তার দৃঢ় ধারণা, জিনেৎ আঁদ্রের সঙ্গেই আছে—এই স্থূল-বুদ্ধি শিল্পীটাকে ঘৃণা করে সে। দেশ ছেড়ে চলে যাবার চিন্তাটা তার মনে বিদ্যুতের মত ঝিলিক দিয়ে উঠল, এবং এই পথই মুক্তির উপায় বলে মনে হল তার কাছে। এই একটিমাত্র চালেই নিজেকে সে মুক্ত করবে মৃত প্রেমের বন্ধন থেকে, 'মের্জো দ্য কুলতুর'-এর বিরক্তিকর জনতার সান্নিধ্য থেকে, পাওনাদারদের হাত থেকে।

কিন্তু বাইরে যেতে হলে টাকা দরকার, প্রচুর টাকা দরকার। আর একবার নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে স্থির করল সে। এবার আর তাসের চাল নয়, নির্ভর করবে বাবার দাক্ষিণ্যের ওপর। আগে থেকে মনে মনে ঠিক করে রাখল, কি ভাবে কথা বলে বাবার হৃদয় স্পর্শ করবে। কিন্তু কাজের সময় সে সমস্ত ভুলে গিয়ে মনের আসল ভাবটা প্রকাশ করে ফেলল।

'টাকাপয়সা আগলে বসে থাকাটা তো তোমার একটা স্বভাব, মাংসের হাড় নিয়ে কুকুর যেমন করে।' বলল সে।

তেসা একটিও কথা বলল না, ছোট ছোট পাখীর মত চোখে তাকিয়ে রইল লুসিয়ঁর দিকে।

লুসিয়ঁ বলল, 'আমি বাইরে চলে যেতে চাই। এখানে করবার মত কিছু নেই। হয়ত আমেরিকাতেই একটা কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারব। কিন্তু সেজন্যে টাকা দরকার। অন্তত পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ আমার চাই।'

তেসা হাই তুলল, 'চল মাক্‌সিম-এ যাওয়া যাক' হঠাৎ বলল সে।

মাক্‌সিম-এ ঢুকে তারা দেখল, ফুলের মত মেলা বসে গেছে মেয়েদের। সুন্দর সুন্দর মুখ, ঠাণ্ডা শরীর, চমৎকার সান্ধ্য পোষাক আর দামী প্রসাধনের গন্ধ। একটি মেয়েকে ভারী ভাল লাগল তেসার, অনুজ্জ্বল গায়ের রং, দো-আঁসলা মার্কিনী চেহারা, বড় বড় চোখের প্রকাণ্ড শাদা অংশ।

'খাসা মালটি, না?' চাপা গলায় বলল তেসা।

লুসিয়্ঁ ঘাড় নাড়ল। এই ইঙ্গিত বিনিময়ের পর পরস্পরের প্রতি পুরনো বন্ধুর মত সান্নিধ্য অনুভব করল দুজনে। শ্যাম্পেন আসবার পর এই সান্নিধ্য আরও বেড়ে গেল। তখন ছেলের অনুরোধটা মনে পড়ল তেসার, বলল, 'কি জন্যে তুমি বাইরে যেতে চাও? এখনই তো সময় তোমার পক্ষে। বিপ্লব শুরু হল বলে! এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'না, বিপ্লব হবে না। আর একটি মন্ত্রীত্ব-সংকটের ভেতরেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি ঘটবে। বিপ্লবের জন্যে যে জনসাধারণকে চাই, তাদের কোন অস্তিত্ব নেই। ফ্রান্সের লোককে চিনতে আর বাকী নেই আমার। কমিউনিস্টদের দলে ঢুকবার সময় অন্য একটা ধারণা আমার মাথায় ছিল।'

'তাই নাকি, এ্যাঁ! আমি ভেবেছিলাম, তুমি এখনো কমিউনিস্ট। বেশ, বেশ, লুসিয়্ঁ।'

'তোমার এত খুশি হবার কারণ কি? তোমাদের জগৎকে আমি কমিউনিস্টদের চেয়েও বেশী ঘৃণা করি। মনে কোরো না, তোমাদের সঙ্গে আমি আপোষ করব।'

সারাদিন তেসা বুকজ্বালায় ভুগেছে। এক গ্লাশ সোডা খেয়ে শান্ত স্বরে সে বলল, 'তোমার বয়স বত্রিশ হল, কিন্তু এখনো ছেলেমানুষের মত কথা বল তুমি। আঠার বছর বয়সে আমি ছিলাম এ্যানার্কিস্ট। এখন মনে হচ্ছে, তুমি যা হয়েছ তার চেয়ে এ্যানার্কিস্ট হওয়া ভাল।'

'অর্থাৎ তুমি আমার নামে অভিযোগ আনছ এই জন্যে যে...'

'তোমার সম্বন্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। আমার নির্বাচনের কথা শুনে তুমি বলেছিলে—কী নীচ কাজ! তবুও তুমি মনে কর—নিজের পরিবারকে অর্থাৎ তোমার মা, দেনিস আর তোমাকে ভরণপোষণ করা আমার কর্তব্য। বলতে পার কে তোমার এই উচ্ছৃঙ্খলতার খরচ যোগাচ্ছে?'

লুসিয়্ঁ হেসে উঠে বলল, 'তুমি।'

'আমাদের শাসনব্যবস্থাকে তুমি পছন্দ কর না? কেউ করে না। কিন্তু এই শাসনব্যবস্থার বদলে অন্য কী চাও তুমি? যাই চাও না কেন, সেটা আরো খারাপ হবে। কারাগারের রাজ-তোষকের চেয়ে ছেঁড়া পুরনো বিছানা ভাল। এদিকে তো বলছ "তোমাদের জগৎ"—কিন্তু তোমার যা-কিছু-সব তো এই জগতেই! প্রচার-পুস্তিকা লেখবার প্রতিভা তোমার আছে, কিন্তু সেটা তুমি কাজে লাগাচ্ছ আমাদের নিজেদের সমাজকে ভেতর থেকে আক্রমণ করবার

উদ্দেশ্যে। কমিউনিস্টরা আজ তোমাকে বাহবা দিতে পারে, কিন্তু জেনে রেখো ওদের সঙ্গে তোমার কোথাও এতটুকু মিল নেই। তুমি নিজেই এটা স্বীকার করেছ। তাই যদি হয়, তাহলে আমার মতে তোমার একটিমাত্র পথ খোলা আছে। কোন একটা কাজে লেগে পড়া উচিত তোমার।'

'কিন্তু আমার অবস্থাটা এমনিতেই যথেষ্ট অপ্রীতিকর।'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই। গোড়াতেই যারা বেশী মাতামাতি করে তাদেরই পছন্দ করি আমরা। যুদ্ধের সময়ে লাভাল ছিল কমিউনিস্ট—আমার সঙ্গে কথা বলত না তখন। তুমি বাইরে যেতে চাও? বেশ তো। কিন্তু আমার কাছে এখন টাকা নেই। দেসেরের কাছে যা পেয়েছিলাম, সবই নির্বাচনে খরচ হয়ে গেছে। আবার কবে হাতে টাকা আসবে বলতে পারছি না। তোমার কাছে খোলাখুলি বললাম সব কথা। কিন্তু একটা পথ আমি বাতলে দিতে পারি। রাজনৈতিক বিভাগে ছোটখাটো সরকারী চাকরি লেখকরা তো ভালবাসে। ক্লোদেল, জিরোদু, মর্ঁা—এঁদের কথা ভেবেই বলছি...তোমার জন্যে এই মুহূর্তে এই ধরনের একটা ব্যবস্থা করতে পারি আমি।'

'ওই ব্লুম আর ভীইয়ারের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্যে?'

'কেন নয়?...এজন্যে তোমার নিজের মতবাদ বিসর্জন দেবার দরকার নেই। নিজের খুশিমত লিখতেও পারবে তুমি। আর অর্থকষ্ট থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারবে।'

লুসিয়ঁ মুখচোখের এমন একটা বিকৃত ভাব করল যেন সে তেতো ওষুধ গিলেছে। জীবনের অন্যান্য ব্যাপারের মত এই প্রস্তাবটাও তার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। তার কি দোষ? সে তো বিপ্লবের সঙ্গেই থাকতে চেয়েছিল, কিন্তু সবাই তাকে ভুল বুঝল! জিনেৎও। মৃত্যুর সময় লাগ্রাঁজ বলেছিল, 'বড় ঠাণ্ডা লাগছে লুসিয়ঁ।' এই জগৎটাই ঠাণ্ডা, কী ভীষণ ঠাণ্ডা! বেঁচে থাকতে হলে সিনিক না হয়ে উপায় নেই। যাই হোক, বাবার কাছে টাকার জন্যে বারবার হাত পেতে নিজেকে ছোট করার চেয়ে কূটনীতিক হওয়া অনেক ভাল। সমাজে যদি সে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে, তবে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করবে, লুমানিতে কাগজের মোটাবুদ্ধি লোকটা পর্যন্ত। আর সুখ? সুখ বলে কিছু নেই। জিনেৎ রয়েছে আঁদ্রের সঙ্গে...

'বেশ। আমার আপত্তি নেই।' বিষণ্ণ গলায় বলল লুসিয়ঁ।

'আমি জানি, তোমার আপত্তি থাকবে না। আর যাই হোক, তুমি তো আমারই ছেলে। আজ কত কথাই না আমার মনে পড়ছে।'

তারপর রুমালটা দিয়ে ভিজে মুখ মুছে ফিসফিস করে তেসা বলল, 'ওই মার্কিনীটাকে আমাদের টেবিলে ডাকলে কেমন হয়?'

পরের দিনটা লুসিয়ঁ কাটিয়ে দিল ঘরের ভেতর। মাথাধরা ছাড়বার বড়ি গিলল আর অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেওয়াল-কাগজের দিকে। বেঁচে থাকতে চায় না সে।

সান্ধ্যভোজনের সময় তেসা তার স্ত্রীকে বলল, 'শুনছ গো, একটা সুখবর আছে। তোমার ছেলে সালামাঙ্কার সহকারী বৈদেশিক প্রতিনিধির পদ পেয়েছে। কি বল লুসিয়ঁ, নিজের চোখে বিপ্লব দেখতে চাও তো তুমি, বৈদেশিক দূতের গদিতে বসে ওকাজটা অনেক আরামে সারতে পারবে।...আর স্পেনের মেয়েরা...'

দেনিসের দিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে তেসা চুপ করে গেল।

'বড় তাড়াহুড়ো করছ তুমি।' ক্লান্তভাবে লুসিয়ঁ বলল।

'ভীইয়ারকে ফোন করেছিলাম। ও এখন আমার চেয়েও এক কাঠি ওপরে ওঠে। সবই আজগুবি ব্যাপার।'

পরদিন অপেরার সামনে আঁদ্রের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল লুসিয়ঁর। কোন কথা না বলে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার ইচ্ছা ছিল লুসিয়ঁর, কিন্তু আঁদ্রে তাকে থামাল।

আঁদ্রে বলল, 'কী কাণ্ডই না হচ্ছে! ধরতে গেলে সবাই আজ ধর্মঘটী। শেষ পর্যন্ত কি হবে বলতে পার? তুমি বোধ হয় জান।'

'আর তিন দিনের মধ্যেই আমি স্পেনে চলে যাচ্ছি।'

'সত্যি? হ্যাঁ, কাগজে পড়লাম, ওখানেও তো কি সব গোলমাল হচ্ছে যেন।'

নিজের কূটনীতিক পদের কথা লুসিয়ঁ বলল না। এই হতভাগাটার কাছে কেন সে বলতে যাবে? নিঃশব্দে একটা হাত আঁদ্রের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

'জিনেৎ কি তোমার সঙ্গে যাচ্ছে?' সলজ্জভাবে জিজ্ঞাসা করল আঁদ্রে।

চেষ্টা করেও লুসিয়ঁ তার বিস্ময় গোপন রাখতে পারল না। জিনেৎ আঁদ্রের সঙ্গে নেই! হঠাৎ কেমন খুশি হয়ে উঠল সে: তা বেশ, জিনেৎ কারও যেন না হয়! কিন্তু পর মুহূর্তেই কালো মেঘের মত বিষণ্ণতা নেমে এল তার মনে। জিনেতের সঙ্গে সেই সন্ধ্যাটা মনে পড়ল তার—সেই কম্বলের পুতুল, নিষ্প্রাণ

চোখ, সেই নিঃসঙ্গতা। সুখকে চঞ্চল পাখীর মত উড়ে যেতে দিয়েছে সে, বাজী-না-ধরা তাসের মত ব্যর্থ করেছে। অন্যমনস্কভাবে আঁদ্রের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় সে বলল, 'মাফ কর, আমায় এক্ষুনি যেতে হবে। বড় মাথা ধরেছে। জিনেতের কথা জিজ্ঞেস করছিলে, না? আমি জানি না, সত্যিই জানি না।'

১৮

ব্রতৈল দাঁড়িয়ে আছে তার পাঁচ বছরের ছেলের বিছানার পাশে। ছেলেটি চিৎকার করছে। অত্যধিক গরমে ব্রতৈলের চোখ মুখ লাল। চাপা স্বরে কাঁদছে ব্রতৈলের স্ত্রী।

ব্রতৈল বলল, 'এবার থামো তো। ঈশ্বরের কৃপায় ও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠবে।'

'তখনই বলেছিলাম, বৃষ্টির মধ্যে বাইবে নিয়ে যেও না ওকে। তার কিছুক্ষণ আগেই ও ছুটোছুটি করছিল, গায়ের ঘাম না শুকোতেই ওকে বৃষ্টির মধ্যে বার করে দিলে।'

'চুপ কর, বলছি। ছেলের শরীরকে মজবুত করতে হলে এসব দরকার।'

অন্ধকার হয়ে আসছে। স্বামীর চোখ দুটো আর দেখতে পাচ্ছে না মাদাম ব্রতৈল। লম্বা আর রোগা ছায়ামূর্তির মত ব্রতৈল দাঁড়িয়ে, তার ভাঙা গালের ওপর দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে।

ব্রতৈলের দেশ লোরেঁন্। গরীব ধর্মভীরু বংশে তার জন্ম। সীমান্ত থেকে তার জন্মস্থানের দূরত্ব মাত্র বার মাইল। ছোটবেলা থেকে সে শুনে আসছে বেলফোর্ট অবরোধের কাহিনী, জার্মান অফিসারদের নৃশংসতার গল্প, বহু প্রদেশ হাতছাড়া হয়ে যাবার ইতিহাস। প্রতিশোধ নেবার স্বপ্নকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আজ পর্যন্ত জীইয়ে রেখেছে সে। যুদ্ধের সময় দুবার সে আহত হয়েছিল। যে অগ্রগামী বাহিনী সর্বপ্রথমে মেৎস্ শহরে প্রবেশ করেছিল, তার ভেতর সে ছিল। সেই শহরে তার এক মাসী থাকতেন, ফরাসী পতাকা দেখেই ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবের দিক থেকে ব্রতৈলকে ফরাসী বলে মনে হয় না। ঠাট্টাতামাসা সহ্য করতে পারে না, আবেগ-প্রবণতা একেবারেই অপছন্দ, মদ খায় না কখনো। পরিষ্কার-পরিপাটি থাকাটা প্রায় বাতিকের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে,

কাঠখোট্টা প্রকৃতি, কেমন একটা হামবড়াই ভাব। পারীর সালোঁগুলোতে সবাই তাকে জার্মান বলে মনে করে। কিন্তু রাজনীতিতে ঢুকে নিজেকে খানিকটা খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে তাকে,—তেসার মত লোকদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে দহরম-মহরম করতে হয়। আইন পরিষদের সহকর্মীদের মনে মনে ঘৃণা করে সে। তার আসল বন্ধুত্ব সমর-বিভাগের লোকজনদের সঙ্গে, ছোটখাটো জমিদারদের সঙ্গে, ঈশ্বরবাদী ধর্মতাত্ত্বিকদের সঙ্গে। যুদ্ধের পর সেও বিশ্বাস করেছিল, 'ফ্রান্সের পুনর্জন্ম' হবে—তার দেশের লোক পোয়ঁকারে এই কথাই প্রচার করেছিল। কিন্তু বছরের পর বছর পার হয়ে গেল, কোন পরিবর্তনই হল না। ব্রিয়ঁা, এরিও, প্যাঁলেভ—কতগুলো তান্ত্রিক শাসন করল দেশকে। কিন্তু এখন সে মনে করে, আজকের তুলনায় সেই তান্ত্রিক-শাসিত ফ্রান্সও হারিয়ে যাওয়া স্বর্গরাজ্যের মত। ব্লুম, কৎ আর ভীইয়ার কোন্ পথে চালিত করবে ফ্রান্সকে? বছর দুই হল ব্রতৈল সিদ্ধান্ত করেছে যে, ভীষণ একটা ওলটপালট না হলে দেশের মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মুসোলিনীর 'রোম-অভিযান' ইতালীকে রক্ষা করেছে, হিটলার মুছে দিয়েছে মার্কস্‌বাদকে। গুপ্তবাহিনী সংগঠন করবার কাজে লেগে গেল ব্রতৈল। প্রত্যেকটি বাহিনীতে পঞ্চাশজন লোক—তাদের নাম 'মন্ত্রশিষ্য' আর তাদের নেতার নাম 'বর্মধারী'।

বহু বিচিত্র লোক ব্রতৈলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কল্পনাবিলাসী নির্বোধ, যশলিপ্সু, গোঁয়ার আর প্রতিশোধগ্রহনেচ্ছু ক্রুদ্ধ লোক—সবাই। ধনীরা মুরুব্বী পাকড়িয়েছে ব্রতৈলকে। দোকানদার আর কারিগররা মনে করছে, ব্রতৈল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে তাদের। ব্রতৈলের সাহায্য নিয়ে প্রতিষ্ঠাবান হবার স্বপ্ন দেখছে ছোট ছোট দালাল, কেরানী আর সাংবাদিকরা।

'মন্ত্রশিষ্য'-দের মধ্যে কে নেই? 'ভার্সাই' রেস্তোরঁার কর্মাধ্যক্ষ ব্রতৈলের দলে যোগ দিয়েছে কারণ লোকটা কর্তাভজা। জীবনটা তার কাছে পাত্র ও পানীয়, খদ্দের ও খয়ের-খাঁদের নিয়ে গড়া একটা পিরামিডের মত। ফ্লোরিও যৌনরোগ-বিশেষজ্ঞ; ইহুদীদের প্রতি দারুণ ঘৃণা তার—সে মনে করে যে ইহুদীরা নানা প্রলোভন দেখিয়ে তার রুগীদের ভাঙিয়ে নিয়ে তার জীবিকা নির্বাহের পথরোধ করছে। রথস্‌চাইল্‌ড্ আর ইহুদী ডাক্তারদের ফ্রান্স থেকে তাড়াবে—ব্রতৈলের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে সে তার দলে এসেছে। ময়দা-কলের মালিকের

ছেলে বঁবার চায় ফ্রান্সকে পূর্ব-মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং সেই ফাঁকে নিজের জন্যে একটা বিদেশী দূতের পদ বাগিয়ে নিতে। গুজিয়েম ব্যুরোর ভূতপূর্ব প্রতিনিধি দিনে তহবিল তছরুপ করবার অপরাধে বরখাস্ত হয়েছিল কিন্তু তার ধারণা, তান্ত্রিকদের হাতে সে অকারণ শাস্তি পেয়েছে; একান্তভাবে সে কামনা করে, আইন পরিষদ ভেঙে যাক আর এরিওর ফাঁসি হোক। বিরাট অশ্বপ্রজনন-কেন্দ্রের মালিক গ্রিমো, ঘোড়ার চাবুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কৃষ্ণাঙ্গী মেয়ে দেখলে পাগল হয়ে ওঠে, যান্ত্রিক অগ্রগতির ভীষণ বিরোধী। কিন্তু সে মনে করে যে, 'মন্ত্রশিষ্য' দলভুক্ত হওয়া আভিজাত্যের পরিচয়। চীনে-বাসনের দোকানের মালিক গোদের মনে সব সময়েই ভয় যে কমিউনিস্টরা তার ব্যবসাটা হস্তগত করে সঞ্চিত অর্থ ছিনিয়ে নেবে। লোকটি আকারে প্রকাণ্ড, রক্তিম গাল, চওড়া কাঁধ। প্রতিদিন সকালে সে ব্যায়াম করে—সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে সব সময়েই উৎসুক। ভূগর্ভ রেলপথের কর্মচারী অব্রি অত্যন্ত কুৎসিত-দর্শন আর ইঁদুরের মত ক্ষীণজীবী। প্রবাদ আছে, একবার একটি মেয়ে তাকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছিল! মানুষের ওপর প্রবল ঘৃণা লোকটার, একমাত্র ব্রতৈলকে দেখে সে খুশি হয় আর বলে, 'এই হচ্ছে একটি লোক যে আবার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবে......!'

'মন্ত্রশিষ্য'দের মধ্যে পুলিশের লোক বহু আছে এবং এই গুপ্ত বাহিনীটির কথা পুলিশের বড়কর্তার কাছে মোটেই গুপ্ত নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষ না দেখবার ভান করেন। নিজের গতিবিধিকে সন্দেহমুক্ত করবার জন্যে ব্রতৈল বহু খেলার ক্লাব খুলেছে আর মফস্বলের লোকদের জন্যে আড্ডার বৈঠক বসিয়েছে। এই কাজের জন্যে অর্থ দরকার। ধনী লোকদের কাছে সে একাধিকবার হাত পেতেছে কিন্তু সেখানে ধমক ছাড়া আর কিছু পায়নি। কথাবার্তায় প্রচারকার্য শব্দটা ব্যবহার না করে সোজাসুজি অস্ত্রশস্ত্রের দাবী তোলে সে এবং তার এই সাহসিকতায় আতঙ্কিত হয়ে ওঠে প্রত্যেকে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায় তার এতদিনের উচ্চাশা দ্রুত সফল হতে চলেছে। বিভিন্ন ট্রাস্ট-এর পরিচালকবর্গ এতদিন সমস্ত চিন্তা ব্যয় করেছিল মন্ত্রীসভার গঠনকার্যে, এবার তারা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে এই ধর্মঘট দেখে এবং ভরসা করতে শুরু করেছে ব্রতৈলের একরোখামির ওপর।

ছেলের বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রতৈল একবার ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, তারপর বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। তার গন্তব্যস্থান 'মেৎস্-বাসীদের সমিতি'

সেখানে জেনারেল পিকার্ তার সঙ্গে দেখা করবে। গ্রাঁদ বুলভারে আলো জ্বলছে দোকানের জানলায়, লাল ফিতে দিয়ে সাজানো ধর্মঘটীদের বিজ্ঞাপনগুলো ফুটে উঠেছে স্পষ্টভাবে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে 'ধর্মঘটীদের ছেলে-মেয়েদের জন্যে' বাক্স হাতে চাঁদা তুলছে মেয়েরা। ভ্রূকুটি করে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে কেউ কেউ, দু-একটা পয়সা ফেলে দিচ্ছে অনেকে। একটি মেয়ে ব্রতৈলের সামনে চাঁদার বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল, থামল ব্রতৈল, তারপর কর্কশ স্বরে জিজ্ঞাসা করল :

'ক্যাম্পে কাজ করবার শিক্ষাটাও তোমাদের দেওয়া হয় নাকি ?'

জেনারেল পিকার্ অপেক্ষা করছিলেন। রোগা ধরনের লোকটি, বয়স পঁয়ষট্টি, অশ্বারোহী বাহিনীর অফিসারের মত বাঁকা পা, বুকের ওপর সারি সারি পদক, মুখে অবজ্ঞার হাসি। সবার ওপরেই সে বিরক্ত—দালাদিএ, পার্লামেন্ট, ইংলণ্ডের রাজা, নিজের স্ত্রী, রঙ্গমঞ্চ, সংবাদপত্র, নির্বাচন—সব কিছুকে ঘৃণা করে সে। একমাত্র ব্রতৈল ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করে না, এবং তার ধারণা—ব্রতৈল ফ্রান্সকে ও ফ্রান্সের সেনাবাহিনীকে রক্ষা করতে পারবে।

'তারপর, খবর কি ?' কথা বলল ব্রতৈল।

'কতকগুলো বোকা জুটেছে। বোকা আর ভীতু। ওদের ভয় হয়েছে, ব্লুম এবার সমস্ত চাঁইদের বিদেয় করবে।'

'আর সৈনিকদের মনোভাব কি রকম ?'

'খারাপ। কমিউনিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে। খুব বেশী হলে এটুকু আমরা আশা করতে পারি যে সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ থাকবে। অবশ্য, ঔপনিবেশিক বাহিনীকে আমি ধরছি না। হ্যাঁ ভাল কথা, দুটি মরক্কো বাহিনীকে ভ্যাঁসেন-এ স্থানান্তরিত করতে পেরেছি আমি।'

'শুধু মূররা যথেষ্ট নয়। 'মন্ত্রশিষ্য'দের ওপরেই আমি নির্ভর করছি। দুটি মাত্র পথ আছে—হয় তোমরা আমাদের অস্ত্রশস্ত্র যোগাও, নয়তো ওদের কাছে যা পাওয়া যায় তাই আমরা নেব।'

'কাদের কাছে ?'

ব্রতৈল স্থির দৃষ্টিতে তাকাল।

'কাদের কাছে' পাওয়া যাবে সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা 'কি' পাওয়া যাবে,' কথাগুলো জেনারেলের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারল ব্রতৈল, 'ষাট হাজার

রাইফেল, চারশো মেশিনগান, এবং গোলাবারুদ, ড্যুসেলডফ দেবে। অবশ্য এজন্যে আমরা কোনরকম বাধ্যবাধকতা স্বীকার করব না, আমাদের যা কর্মনীতি—অর্থাৎ শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে।'

কথাগুলো কিছুক্ষণ ভাবল পিকার্, তারপর বলল :

'মন্দ নয়। অবশ্য এই ধরনের অভিযানে ব্যক্তিগতভাবে আমি 'অটোমেটিক' পছন্দ করি৭ যাই হোক, নিয়ে নাও। একটার জন্যে আর একটা আটকাবে না। আর অস্ত্রাগার থেকে কিছু কিছু অস্ত্র আমি নিজেও হাতিয়ে আনতে পারব...'

'স্থানীয়ভাবে কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। প্রথম কাজ এই সরকারকে অপদস্থ করা। ভীইয়ার চেষ্টা করছে কারখানা-দখল-করা ব্যাপারটার ওপর বৈধতার প্রলেপ দিতে। খানিকটা রক্তপাত ঘটিয়ে ওর বক্তৃতার জবাব দেওয়া চাই......'

বহুক্ষণ কথা বলল দুজনে। পাশের ঘরে মৃদু আলো জ্বলছে। ঘরের ভেতর 'বর্মধারী' গ্রি-নে অপেক্ষা করছে ব্রতৈলের জন্যে, বসে বসে হাই তুলছে আর হাতের নখ পরিষ্কার করছে উকো ঘষে ঘষে। এই গ্রি-নে লোকটাই একবার 'মেজোঁ ত্য কুলতুর'-এ তুমুল গোলমালের সৃষ্টি করেছিল। ব্রতৈলের ওপর অন্ধ বিশ্বাস লোকটির। ছোটবেলা কেটেছে অনাথ-আশ্রমে, বড় হয়ে মফস্বলের শহরে শহরে ঘুরেছে বিকলাঙ্গদের জন্যে সাজসরঞ্জাম বিক্রির ব্যবসায় সূত্রে। হাস্যকর রকমের ফুলবাবু লোকটি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় টাই বাছতে, তবুও ঠিক করতে পারে না তার জীর্ণ আর সযত্নে ইস্ত্রি করা পোষাকের সঙ্গে কোন্ টাইটা মানাবে; চেহারা কুৎসিত কিন্তু রূপসীর প্রেমের স্বপ্ন দেখে; গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কিন্তু স্পষ্ট বক্তব্য কিছু থাকে না। 'মন্ত্রশিষ্য'দের প্রথম বাহিনীর 'বর্মধারী' সে, ব্রতৈল তাকে সামরিক গোয়েন্দাগিরির কাজে লাগিয়েছে।

ব্রতৈল বলল, 'পরশুদিন 'মন্ত্রশিষ্য'রা সীন কারখানায় হানা দেবে। এমন ভাবে তারা যাবে যেন মনে হয় তারা বেকার, কাজের সন্ধানে ঘুরছে। সেখানে তোমার কাজ হবে অন্যের চোখ এড়িয়ে গেটের কাছাকাছি হাজির থাকা আর পিকেটারদের সঙ্গে একটা ঝগড়া বাধানো। এমনিতে না হয়, গায়ে পড়ে ঝগড়া করবে। তাতেও যদি না হয় তো গুলি চালাবে।

কাছাকাছি পুলিশ রাখবার বন্দোবস্ত আমি করব। সত্যিকারের সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলতে হবে, বুঝেছ? 'মন্ত্রশিষ্য'দের 'খৃষ্টীয় শ্রমিক ইউনিয়ন'-এর টিকেট দেওয়া হবে। কিন্তু কি ধরনের অভিযান হবে সেটা যেন তারা না জানতে পারে। এ কাজে তোমাকেই আমি নির্বাচিত করেছি কারণ তুমি নিঃসন্তান। '

'তাই হবে, কর্তা।'

হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে গ্রি-নে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু ব্রতৈল তাকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল। 'ধন্যবাদ' বলল ব্রতৈল।

রাত দুটের সময় ব্রতৈল বাড়ী ফিরে এল। হলঘরে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। 'ওর নিউমোনিয়া হয়েছে।' স্ত্রী বলল।

সকাল পর্যন্ত রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশে বসে রইল ব্রতৈল। তারপর সারাদিন কাজ করল। প্রথমে চেষ্টা করল দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে,— কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যদি ঘোষণা করা হয় যে কারখানায় নতুন লোক নেওয়া হবে, তবে আর কোন গোলমাল থাকে না। কিন্তু দেসের তার সঙ্গে দেখা করল না। দেসের সন্দেহ করেছিল, ব্রতৈলের দেখা করতে আসার পেছনে কোন একটা অভিসন্ধি আছে। কিন্তু পুলিশের বড়কর্তাকে হাত করল ব্রতৈল। ঠিক হল, কারখানার কাছে, জেটির ধারে ধারে পুলিশ প্রহরী দাঁড়াবে এবং কোন বিশৃঙ্খলা হলে হস্তক্ষেপ করবে। সন্ধ্যার সময় ব্রতৈল আর একবার কথা বলল গ্রি-নের সঙ্গে এবং পরের দিনের অভিযানের সমস্ত খুঁটিনাটি আলোচনা করল। তারপর আবার সে সারা রাত জেগে বসে রইল রুগ্ন ছেলের বিছানার পাশে। ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে, কিন্তু সে আশা ছাড়েনি, ভগবানে বিশ্বাস আছে তার। তার ঠোঁট দুটো নড়ছে, প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করছে সে।

গ্রীষ্মকালের সুন্দর সকাল। বাগানে পাখীর গান নাগরিক কোলাহলে ডুবে যায়নি এখনো। মাঝে মাঝে বাজারের সব্‌জী গাড়ী যাতায়াতের শব্দ। রুটিওয়ালীদের হাতে লম্বা লম্বা পাঁউরুটি, টাটকা রুটির গন্ধ বাতাসে। উঁচু উঁচু জানলাগুলোর ওপর উষ্ণ গোলাপী আলো এসে পড়েছে, মনে হয় আলোর উৎসটা ঘরের ভেতর। একে একে 'মন্ত্রশিষ্য'রা জড়ো হচ্ছে জাভেল ব্রীজের কাছে। গ্রি-নে নাম ডাকল, চারজন আসতে পারেনি। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছেচল্লিশজন লোক বিভিন্ন পথে কারখানার দিকে এগিয়ে চলল।

ধর্মঘটের আজ এগার দিন। সকালবেলাটা শান্তিতে কেটেছে। পুরনো প্রহরীর জায়গায় নতুন প্রহরী এল। রাত্রিটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে মিশো, এখন এক রাশ সাবানের ফেনা মেখে শব্দ করে মুখ ধুচ্ছে। বড় গেটটার কাছে দাঁড়িয়ে জিনো গান গাইছে, গানগুলো সেদিন কনসার্টের সময় শুনেছিল সে। পিয়েরও জেগেছে, একটুকরো রুটি চিবোবার কাজে সে ব্যস্ত। কেন যেন বারবার তার মনে পড়ছে ভেরলেন-এর সেই লাইনগুলো—'ভোরের ম্লান তারা'। কিন্তু সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। কয়েকজন বুড়ো মজুর বিষণ্ণভাবে ভাবছে, 'আজ এগার দিন! ধর্মঘট কবে শেষ হবে?' গুজব শোনা গেছে, সরকার নাকি জোর করে কারখানা থেকে ধর্মঘটীদের বার করে দেবে। গুজবটা শুনে মিশো হেসে বলেছে, 'বাজে কথা!'

'এসো হে জিনো এদিকে এসো। সেই মিসত্যাঙগেৎ কেমন করে সিঁড়ি দিয়ে নামে একবার দেখাও দিকি।'

সঙের মত মুখের একটা ভঙ্গী করল জিনো—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকেরা যুবতী সাজলে যেমন হয়। আঙুলের ডগা দিয়ে পাৎলুনটাকে তুলে ধরল স্কার্টের মত করে. তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে ঘুরে নামতে শুরু করল।

'কে?' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, গেটের সামনে একদল লোক দাঁড়িয়ে।

'গেট খোল...!'

'এই কারখানার কাজে আমাদের নেওয়া হয়েছে। বেরিয়ে যা শালারা!'

'কমিউনিস্ট জোচ্চোর!'

জিনোও কিছু কম গেল না, 'তবেরে শূয়রের বাচ্চা! হারামী! ফ্যাশিস্ট! ভাল চাস তো পালা, নইলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব তোদের।'

ইতিমধ্যে শতাধিক লোক একসঙ্গে চিৎকার করতে শুরু করেছে। কি যে তারা বলছে, কিছু বুঝবার উপায় নেই। বিশেষ করে গ্রী-নে অত্যন্ত রগচটা লোক, বারবার কুঁদে কুঁদে এগিয়ে আসছে সে এবং দ্রুত ভাষায় চিৎকার করছে। প্রবল উত্তেজনায় মুখটা বিকৃত, মৃগীরোগীর মত মনে হচ্ছে তাকে। বৃথাই মিশো নানা যুক্তি দিয়ে সহকর্মীদের ফেরাতে চেষ্টা করল, ফ্যাশিস্টদের ঔদ্ধত্যে সবাই উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

গত কয়েকদিন ধরে মিশো এই ধরনের আক্রমণ প্রত্যাশা করেছে। গেটের সামনে হোস্‌পাইপ লাগিয়ে অগ্নিনির্বাপক দল প্রস্তুত রেখেছিল সে। উদ্দেশ্য,

সংঘর্ষ হতে না দেওয়া। গ্রি-নেকে দেখে হাসি পেল তার, 'পঞ্চাশটা শয়তানের বাচ্চা! আমাদের আওয়াজে ওদের চিৎকার ডুবে যাবে।'...তারপর অন্য মজুররাও শান্তভাবে গ্রহণ করল ব্যাপারটা। 'মন্ত্রশিষ্য'দের সমস্ত ইঙ্গিতঙ্গি বৃথা হল, কারণ ধর্মঘটীদের পক্ষ থেকে মৃদু ভর্ৎসনা বা দু-একটা টিটকিরি ছাড়া আর কিছু প্রত্যুত্তর এল না। গ্রি-নের পেছনে লাগল জিনো:

'আর কমরেড, দেখ দেখ, ওই ব্যাটা মুরগীর ছানাটার কাণ্ড দেখ...'

বন্দুকের শব্দ হল একবার। মাটিতে পড়ে গেল জিনো। পিয়েরের হাত থেকে থাবা মেরে পিস্তলটা ফেলে দিল মিশো। চারদিকের গোলমাল ছাপিয়ে তার গলা শোনা গেল, 'খবরদার, কেউ গুলি চালিও না! হোস্‌পাইপ খুলে দাও!'

'মন্ত্রশিষ্য'দের ওপর তাক করে হোস্‌পাইপের মুখ খুলে দিল অগ্নিনির্বাপক দল। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল 'মন্ত্রশিষ্য'রা। রইল শুধু গ্রি-নে। তাকে দেখে মনে হল যেন তার কিছুই হয়নি। তারপর পুলিশ আসতেই গ্রি-নে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জিনোর ওপর ঝুঁকে পড়ল মিশো। জিনো হাসছে। কিন্তু রক্তে লাল হয়ে উঠেছে মাটি।

'জিনো!' এই হাসিখুশি ছেলেটির মৃত্যু এত অপ্রত্যাশিত যে মিশো চিৎকার করে উঠল, 'ওরা ওকে খুন করেছে!'

অন্য সবার মুখের দিকে এমনভাবে সে তাকাল যেন সে আশা করছে একসঙ্গে সবাই বলে উঠবে, 'না।' মাথার টুপি খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে সকলে; ঝাপসা দৃষ্টিতে মিশো দেখল, পিয়েরের মুখটা ব্যথায় নীল হয়ে উঠেছে।

নদীর জলে একটা ডুব দিয়ে ব্রীজের তলায় আত্মগোপন করল গ্রি-নে। শীতে আর আত্মগ্লানিতে কাঁপছিল সে। একজন পথচারী তাকে বলল:

'মতলবটা কি? চান হচ্ছে নাকি?'

তার দিকে তাকিয়ে থুথু ফেলল গ্রি-নে। রোদে বহুক্ষণ বসে রইল সে, ভিজে পোষাকে ফিরে যাবার কোন অর্থ হয় না। তারপর সে একটা নাপিতের দোকানে গেল। নাপিত তার দাড়ি কামাল, অ-ডি-কোলনের ছিটে দিল সারা শরীরে, ক্রীম মাখিয়ে দিল মাথার চুলে। কিন্তু বারবার অ-ডি-কোলন আর ক্রীম চাইতে লাগল গ্রি-নে। আসলে একটা বিস্মৃতির ভেতর নিজেকে সুস্থ করে তুলবার চেষ্টা করছে সে, কাঁচির শব্দটা মনে হচ্ছে যেন কোন সুরভী বাগানের ভেতর ঝিঁ-ঝিঁ পোকার কিচ্ কিচ্ ধ্বনি। ব্রতৈলের কাছে যখন সে গেল, তখন বেলা এগারটা। পড়বার ঘরে নিয়ে যাওয়া হল তাকে

ক্রুশের সামনে নতজানু হয়ে বসে আছে ব্রতৈল, তার ছেলে মারা গেছে। গ্রি-নেকে দেখে উঠে দাঁড়াল সে।

'কটা মরেছে ?'

'একটাকে আমি শেষ করেছি।'

'আর 'মন্ত্রশিষ্য'দের দলে ?'

'একজনও নয়। ওরা হোস্‌পাইপ ব্যবহার করেছিল।'

'একজনও নয় ? মুখ দেখাবার জন্যে পাঠানো হয়েছিল নাকি তোমাদের ? সব ভেস্তে গেল !'

কিছুই বুঝতে পারল না গ্রি-নে, কিছুক্ষণ বোকার মত হাঁ করে ব্রতৈলের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একজন 'বর্মধারী' হিসেবে আমার কর্তব্য 'মন্ত্রশিষ্য'দের প্রাণরক্ষা করা।'

'তুমি বর্মধারী নও, তুমি একটা আহাম্মক !'

ব্রতৈল আবার নতজানু হয়ে বসল। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল গ্রি-নে। হলঘরে বসে চাকরানীটা কাঁদছিল, গ্রি-নে বলল :

'তোমার কর্তাটি একজন মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে বুঝতে পারছি।'

১৯

জিনোর মৃত্যু-সংবাদ বড় বড় হরফে ছাপা হল পারীর সমস্ত কাগজে। বামপন্থীরা ব্রতৈলকে দোষী সাব্যস্ত করল এবং ফ্যাশিস্টবাদী গুপ্ত সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী তুলল। দক্ষিণপন্থী সংবাদপত্রগুলো বলল, ধর্মঘট তুলে নিতে চেয়েছিল বলে জিনোকে কমিউনিস্টরা খুন করেছে। 'লে মাতিন'-এ উচ্ছ্বাসভরা ভাষায় এক প্রবন্ধে লেখা হল : "কমিউনিস্টদের হাতে নিহত এই মাতৃগতপ্রাণ হতভাগ্য যুবক......"। একমাত্র 'লা ভোয়া নূভেল্' এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করল সমস্ত ব্যাপারটা। জলিও লিখল, 'হত্যাকারী যে-ই হউক হিংসাত্মক পথকে আমরা তীব্র ভাষায় নিন্দা করি। দলমত-নির্বিশেষে সকল ফ্রান্সবাসীর নিকট আমাদের আবেদন, দেশের শান্তি যেন অব্যাহত থাকে।' কথাগুলো বেশ চমৎকার আর নিরপেক্ষ শোনাল।

দু দিন পরে চেম্বারে জিনোর মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা হল। ব্রতৈল নিজেই

তুলল প্রশ্নটা। সকলেই আশা করছিল, এই নিয়ে তুমুল গোলমাল হবে। দর্শকদের গ্যালারী ভরে গেল। চেম্বারের অধিবেশন শুরু হবার আগে যে প্রচণ্ড হট্টগোল হল তা বর্ণনা করা যায় না। ডেপুটিরা পরস্পরকে গালাগালি দিল তীব্র ভাষায়। অন্যমনস্ক স্কুল মাস্টারের মত রুলের বাড়ি মারতে লাগল চেম্বারের স্পীকার এরিও। তারপর টেবিলের ওপর ছোট ঘণ্টাটা প্রবলভাবে বাজিয়ে চিৎকার করে বলল, 'থামুন, থামুন!'

কিছুক্ষণের জন্যে চেম্বার শান্ত হল। কিন্তু ব্রতৈল মঞ্চের ওপর উঠতেই বামপন্থীরা একযোগে চিৎকার করে বলল, 'খুনী! খুনী!'

ডেস্কের ওপর ঘুষি মেরে চিৎকার করতে লাগল ডেপুটিরা। বেয়ারারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল, যে কোন মুহূর্তে হাতাহাতি শুরু হয়ে যেতে পারে। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল এরিও।

হট্টগোল একটু থামলে ব্রতৈল বলল, 'আমাকে খুনী বলছে কে? এই নির্দোষ শ্রমিকটির হত্যাকারী রক্তপিশাচ কমিউনিস্টরা...'

প্রচণ্ড গোলমালে তার গলা ডুবে গেল। তবুও ব্রতৈল থামল না। বক্তৃতার বিশেষ কিছুই শোনা গেল না, শুধু মাঝে মাঝে একটা-দুটো কথা ভেসে এল, 'বেচারী মা'...'বিশৃঙ্খলতার রাজত্ব'...'ব্লুমের অসহায়তা'...'ভীইয়ারের স্বেচ্ছান্ধতা'...

সরকার পক্ষের আসনে বসে ভীইয়ার অন্যমনস্কভাবে কাগজের ওপর জাহাজের নকসা এঁকে চলেছে। ব্রতৈলের বক্তৃতা শুনে সে ভয় পায়নি—ব্রতৈলের বক্তৃতাটা পার্লামেণ্টারী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর একটা এলোমেলো আক্রমণ মাত্র। অন্য কিছু সে ভাবছে। এই ধর্মঘটের নিষ্পত্তি কি ভাবে হতে পারে? কয়েকজন র‍্যাডিকাল তো ইতিমধ্যেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্মঘটীরা অটল কিন্তু মালিকরা এতটুকু সুবিধা ছেড়ে দিতে রাজী নয়। দেসেরের মনে একটা কিছু...

প্রশংসা ও বিদ্রূপ দুই-ই একসঙ্গে ফেটে পড়ল। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে মঞ্চ থেকে নেমে এল ব্রতৈল।

সমাজতন্ত্রীরা আগে থেকেই বন্দোবস্ত করে রেখেছিল, কোন একজন র‍্যাডিকাল সভ্য সরকারের সমর্থনে বক্তৃতা দেবে: বেশ একটা কূটনীতিক চাল হবে। স্পীকার তেসাকে বক্তৃতা দিতে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থীদের দিক থেকে সমর্থনসূচক ধ্বনি উঠল। দক্ষিণপন্থীরা চুপ করে রইল। চাপা থমথমে

গলায় বক্তৃতা শুরু করল তেসা, একটি তরুণ প্রাণের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করল, দেশকে যারা গৃহযুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে—তীব্র ভাষায় নিন্দা করল তাদের, প্রশস্তি গাইল ভের্দ্যর রক্ষীবাহিনীর, উদ্ধৃতি দিল ভিকতর হুগো থেকে। কিছু বুঝতে না পেরে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল ডেপুটিরা। হঠাৎ তেসা ভীইয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল :

'দুঃখের সঙ্গে আমি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, কারখানা দখলের বিরুদ্ধে সরকারী নিশ্চেষ্টতার অর্থ হিংসানীতির পক্ষে সরকারী অনুমোদন। আমি এই কথা বলছি সামাজিক ন্যায়ের সমর্থক হিসেবে, পপুলার ফ্রন্টের ডেপুটি হিসেবে.. '

ব্যাপারটা এত অপ্রত্যাশিত যে কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। তারপর ব্রতৈল উঠে দাঁড়িয়ে ফুসফুসের সমস্ত শক্তি দিয়ে উল্লাস ধ্বনি করে উঠল, 'সাবাস!' হাততালি আর প্রশংসার ঝড়ে চেম্বার কেঁপে উঠল। এই উচ্ছ্বাসে সব চেয়ে বেশী উৎসাহ দেখাল দক্ষিণপন্থীরা এবং র‍্যাডিকালদের একটা অংশ। ডেপুটিদের সংযত করবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা করল এরিও। পরাজয়ের জ্বালা, পপুলার ফ্রন্টের প্রতি ঘৃণা, গত কয়েক সপ্তাহের আতঙ্ক, সব কিছুই যেন প্রকাশ পেল এই উচ্ছ্বাসে। ভীইয়ারের মুখ শুকিয়ে গেল : র‍্যাডিকালদের মধ্যে বেশ বড় একটা অংশ এই উচ্ছ্বাসে যোগ দিয়েছে। পপুলার ফ্রন্টের ভবিষ্যৎ কি হবে কে জানে? তেসা তার বক্তৃতায় সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করল। কিন্তু এই আস্থা-জ্ঞাপনটা যে তেতো বড়ির ওপর চিনির প্রলেপ দেবার চেষ্টা মাত্র, তা বুঝতে বাকি রইল না কারও।

তেসার পর বক্তৃতা দিল উত্তরাঞ্চলের একজন কমিউনিস্ট ডেপুটি। লোকটি ঢালাই-কারখানার শ্রমিক, মুখের ওপর বেগুনী রঙের শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

সে বলল, 'আমরা দাবী করছি, ফ্যাশিস্ট খুনেদের সমস্ত কার্যকলাপ এই মুহূর্তে বন্ধ করা হোক। ডেপুটি ব্রতৈলের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে...'

দক্ষিণপন্থীরা সোরগোল তুলল। ব্রতৈল হল ছেড়ে চলে গিয়েছিল, কিন্তু তার বন্ধুরা চিৎকার করতেই থাকল। সমাজতন্ত্রীরা নিশ্চল হয়ে বসে ছিল,

যেন চেম্বারের ঘরে যা কিছু ঘটছে তার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কমিউনিস্টদের ভাষা বড় বেশী রূঢ় মনে হল তাদের কাছে। অবশেষে এরিও লম্বা টুপিটা মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়াল,—অর্থাৎ অধিবেশন মুলতবী হল। ছুটির পর স্কুলের ছেলেরা যেমন কলরব করে বেরিয়ে আসে, তেমনি ভাবে সমস্ত ডেপুটি ছুটল বাইরের লবি আর বার-এর দিকে।

র‍্যাডিকাল ডেপুটিরা নিজেদের মধ্যে একটা কনফারেন্স করল। তেসার বক্তৃতা অনুমোদন করল কয়েকজন। কেউ কেউ বলল, 'দেশের ভেঙে-যাওয়া আশার কথা'—পপুলার ফ্রন্টে ভাঙনের আভাস: দক্ষিণপন্থীদের কারসাজি। তেসা বিনীতভাবে বলল, 'পপুলার ফ্রন্ট ও আমাদের পার্টিকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি।' দীর্ঘ আলোচনার পর র‍্যাডিকালরা স্থির করল, সমাজ-তন্ত্রীদের সঙ্গেই তারা থাকবে, তবে ধর্মঘটীদের কবল থেকে কারখানা মুক্ত করাটাও যে যুক্তিযুক্ত—তাও তারা উল্লেখ করল। সমাজতন্ত্রীরা বলল, পরে উত্তর দেবে। ভীইয়ারের ইচ্ছা, দেসেরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। এরিও যখন ঘোষণা করল যে, ব্রতৈলের প্রশ্নের ওপর আলোচনা সন্ধ্যার অধিবেশন পর্যন্ত মুলতুবী রেখে এখন গো-মড়ক নিবারণী বিলটি উপস্থিত করা হবে, তখন গ্যালারীর জনসাধারণ হতাশ হল রীতিমত। ব্রতৈল চিৎকার করে বলল, 'র‍্যাডিকালরা ঠাণ্ডা মেরে গেছে, মস্কোর নির্দেশের জন্যে অপেক্ষা করছে ভীইয়ার।'

একজন সমাজতন্ত্রী ঘুষি পাকিয়ে ছুটে এল ব্রতৈলের দিকে। ব্রতৈল তার গালে একটা চড় মারল। শুরু হয়ে গেল ধ্বস্তাধ্বস্তি। ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাওয়া একজন বেয়ারাকে মাড়িয়ে দিল ডেপুটিরা। এরিও সমানে ঘণ্টা বাজাতে লাগল। তারপর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বার-এ গিয়ে বসল ডেপুটিরা। মাত্র জন ত্রিশেক উপস্থিত রইল চেম্বারের অধিবেশনে এবং স্পীকারের একঘেয়ে বক্তৃতায় তারাও আর বিশেষ মনোযোগ দিল না। কেউ খবরের কাগজ খুলে বসল, নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করল কেউ কেউ।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ভীইয়ার দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে গেল। বেরোবার আগে বহুক্ষণ সে ইতস্তত করেছে,—বহুবার নিজের সঙ্গে তর্ক করেছে, এইভাবে দেখা করতে আসাটা তার আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর কি না। পপুলার ফ্রন্টের মন্ত্রী সে, আর সে-ই কিনা হীনতা স্বীকার করছে এমন একজন

পুঁজিপতির কাছে যার চালচলন সন্দেহজনক আর কিছুকাল আগেও যার সমর্থন ছিল ব্রতৈলের গুণ্ডা দলের ওপর! কিন্তু কি করা যাবে? পুকুরের জলে ঢেউয়ের মত ছড়িয়ে পড়ছে ধর্মঘট। গোটা ফ্রান্সই যেন ধর্মঘট করছে। পারীর সীমানা ছাড়িয়ে ধমঘট ছড়িয়ে পড়েছে মফস্বলের শহরে শহরে। বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, বন্দরের জাহাজ নিশ্চল। প্রতিদিন নতুন নতুন বিস্ময় সৃষ্টি হচ্ছে। থিয়েটার অধিকার করে বসছে অভিনেতারা, ক্যাশিয়ারের হাতে ক্যাশবাক্স্ বন্ধ, কবর খুঁড়তে অস্বীকার করছে খননকারীরা। কিন্তু মালিকরা মাথা নোয়ায়নি। কেউ কেউ বলছে, 'ভালই হয়েছে! চুলোয় যাক গে সব!' দেশের স্বাভাবিক জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। তবুও দেসের তো ভাল লোক, ধনতন্ত্রের যোগ্যতম প্রতিনিধি। ওর সঙ্গে একটা কিছু বোঝাপড়া না করলে চলবে না, ওর আসল চালবাজীটা বুঝতে হবে।

কথা আরম্ভ করে দেসের ভীইয়ারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর করল। ভীইয়ার বলল তার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত।

দেসের বলল, 'তা তো হবেই। এত বড় একটা ধর্মঘট চালানো...'

ভীইয়ার বলল, 'এই ধর্মঘটের দরুণ আপনি যতটা ভুগেছেন আমরাও ঠিক ততটাই ভুগছি। সেজন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি একটা খোলাখুলি আলোচনার জন্যে। বলুন তো, কি করা যায়?'

'আপনি হচ্ছেন মন্ত্রী আর আমি একজন সাধারণ লোক। আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

ভীইয়ারের একবার ইচ্ছা হল, উঠে চলে যায়। কিন্তু দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা এই বিরক্তিকে জয় করল।

'আপনার এই ঠাট্টা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' মৃদুস্বরে বলল সে।

'ঠাট্টা নয়,—আত্মরক্ষা। আপনি নিজেই বিচার করে দেখুন। যদি আমি বলি, ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক,—তাহলে আপনি মনে করতে পারেন, আমরা অর্থাৎ 'দুইশত পরিবার' আপনার ভূস্বর্গ রচনার কাজে বাধা দিচ্ছি। তার চেয়ে অপেক্ষা করা ভাল। হয়ত সত্যিই আপনারা যাদুকর। অবশ্য তা নাও হতে পারেন। তখন শ্রমিকরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে আপনারা কোন পরিবর্তন আনতে পারেননি। আর সত্যি কথা বলতে কি, কোন পরিবর্তন আনা সম্ভবও নয় আপনাদের পক্ষে। সুতরাং আমি কোন বিষয়ে জোরজবরদস্তি করতে চাই না।'

'কিন্তু আজ তেসা দাবী তুলেছে, কারখানা ধর্মঘটীদের দখল থেকে মুক্ত করা হোক।'

'তা জানি। আমাদের বন্ধু তেসার মনটি এখনো যাকে বলা হয় তরুণ। কিন্তু আমার মতে অপেক্ষা করাটাই ভাল। পুলিশ লাগানোর বিরুদ্ধে আমি নই, কিন্তু সময় বুঝে সব করতে হবে। আমার এই মার্কের ছবিটা কেমন লাগছে আপনার? অবশ্য আপনারটার মত তত ভাল নয়, কিন্তু এই সবুজ রংটা...'

কথাবার্তার গতিকে শিল্প আলোচনার দিকে ঘুরিয়ে দিল দেসের। ছবি নিয়ে আলোচনা করার মত মানসিক অবস্থা ভীইয়ারের ছিল না, সুতরাং সে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল।

কি করবে সে এখন? জটিল খেলোয়াড়ী চাল চেলেছে দেসের। আপাতত মনে হয় দেসেরের উদ্দেশ্য সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভাঙন সৃষ্টি করা। র‍্যাডিকালদের প্রায় অর্ধাংশ আজ তেসাকে সমর্থন করেছে। তাহলে সত্যিই কি কারখানা দখলমুক্ত করা উচিত? কিন্তু তা যদি করা হয় তবে শ্রমিকরা কমিউনিস্টদের দলে চলে যাবে। অর্থাৎ বিপ্লব। বিশ্রী একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেদিকেই যাওয়া যাক না কেন হার স্বীকার করতে হবে। বহুক্ষণ ধরে ভীইয়ার ভাবল। ক্লান্তির অতল থেকে একটি স্বর তাকে যেন বলছে, 'অপেক্ষা করেই দেখ না?' এই অপেক্ষা করার খেলা সে তো ছেলেবেলা থেকেই অন্তরঙ্গ-ভাবে জেনে এসেছে, তার সারা জীবনটাই তো কেটেছে অপেক্ষা করে করে। নির্বাচনে জয়লাভের জন্যে অপেক্ষা করেছে, প্রগতির জয়-যাত্রার জন্যে অপেক্ষা করেছে, বিশ্বশান্তির জন্যে অপেক্ষা করেছে। ব্যক্তিগত জীবনে তার অপেক্ষা সুখের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে, শান্তির জন্যে। দেসের অপেক্ষা করে ঠিক কাজই করছে। হ্যাঁ, অপেক্ষা না করে উপায় কি! একদিন সকলেরই সুবুদ্ধি ফিরে আসবে। তার আগে অবিবেচকের মত কোন কিছু না করাটাই আসল কথা।

সান্ধ্য অধিবেশন শুরু হবার আগে গোয়েন্দাবিভাগ থেকে একটা রিপোর্ট এল ভীইয়ারের কাছে। গুপ্তচরের খবরে প্রকাশ, ধর্মঘটীদের ভেতর ভাঙন দেখা দিয়েছে। অনেকেই চাইছে ধর্মঘট তুলে নিতে। 'সীন' কারখানায় আপোষ-কামীদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে ক্রমশ। আত্মসন্তুষ্টির হাসি ফুটে উঠল ভীইয়ারের মুখে, মনে মনে ভাবল, 'ধর্মঘট যাতে সম্পূর্ণ ভেঙে না পড়ে, সেদিকেও দৃষ্টি

রাখতে হবে। নইলে তার সুযোগ নেবে দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকালরা। আর দেসেরও মিটমাটের দিকে ঝুঁকছে। সুতরাং দু পক্ষের মধ্যে আপোষ অসম্ভব নয়। কালের গতি আমাদের পক্ষে...'

র‍্যাডিকালদের কিছুই লাভ হল না। অধিবেশনের সময় সরকার পক্ষ থেকে ভীইয়ার ভাসা-ভাসা জবাব দিল: শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা যেমন দরকার, তেমনি দরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা। বক্তৃতার উত্তরে দক্ষিণপন্থীদের প্রতিবাদ ও সমাজতন্ত্রীদের সমর্থন শোনা গেল, র‍্যাডিকালরা কথা বলল না। চেম্বারে নিজের আসন থেকে তেসা চিৎকার করে বলল, 'যদি কারখানা ধর্মঘটীদের দখল থেকে মুক্ত না হয়, তবে জনসাধারণের প্রতিবাদের বন্যা তোমাদের ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার হাততালি ও প্রশংসাধ্বনি ফেটে পড়ল। ম্লান হাসল ভীইয়ার—ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে সে, গভীর ক্লান্তি!

কিন্তু তেসা সেদিনের আসল নায়ক হয়ে দাঁড়াল। চারদিক থেকে সকলে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাকে, তুলনা করছে মিরাবো—লাফেৎ—গাম্‌বেতার সঙ্গে। নিজের বক্তৃতার সাফল্যে ঝলসে উঠেছে তেসা: নিজেকে মনে করেছে নির্ভীক যোদ্ধা, সত্যের উপাসক।

'স্রোতের বিরুদ্ধে আমি দাঁড়িয়েছি।' বলল তেসা।

বাড়ী ফিরে আসবার পর শরীরটা বড় দুর্বল মনে হল তেসার, কিন্তু তার মনে আনন্দ আর ধরছে না! অন্য দিনের মত আজও তার স্ত্রী গরম জলের বোতল নিয়ে শুয়ে আছে। লুসিয়ঁ বাড়ী নেই—বিদেশযাত্রার আগে ফূর্তি করে নিচ্ছে। কিন্তু এমন কাউকে তেসা চাইছে যার কাছে সে নিজের বিজয়গৌরবের কথা খুলে বলতে পারে। সুতরাং সে দেনিসের কাছে গেল।

আগাগোড়া বক্তৃতাটা সমস্ত অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে পুনারাবৃত্তি করল সে। 'এই জায়গায় সকলে পাগলের মত হাততালি দিয়েছে'—বক্তৃতার ভেতরে এই ধরনের জনান্তিক কথাগুলো বলবার সময় গলার স্বর বদলিয়ে ফেলছিল।

এত আত্মহারা হয়ে উঠেছিল তেসা যে দেনিসের দিকে একবারও তাকিয়ে দেখেনি। নিশ্চল মূর্তির মত দেনিস বসে আছে। গত কয়েকদিন শুধু বাবার কথাই চিন্তা করেছে দেনিস। গত শীতকালেও সে রাজনীতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না। তখন সে মনে করত, তার বাবার কাজটা বিরক্তিকর হলেও সম্মানজনক। কিন্তু এখন সে সমিতিতে যাতায়াত করছে, খবরের কাগজ

পড়ছে—সান্ধ্য ভোজনের টেবিলে বসে বাবার কথাবার্তা এখন অসহ্য মনে হয় তার কাছে। রাজনীতিক্ষেত্রে তার বাবা একজন দুর্নীতিপরায়ণ খেলোয়াড় ছাড়া কিছু নয়, নিজের সুবিধার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে তিনি প্রস্তুত, এটা যেন ক্রমশই ধরা পড়ছে দেনিসের কাছে।

পারীর রাস্তার উত্তেজনা স্পর্শ করেছে দেনিসকে। খবরের কাগজ পড়ে দেনিস জেনেছে যে মিশো 'সীন' কারখানার ধর্মঘটীদের নেতা। মিশোর প্রতি তার পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং ধর্মঘটকে সে মনে করছে ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম। তরুণ শ্রমিকটির হত্যা-কাহিনী শুনে মনে পড়েছে মিশোর কথা—একমাত্র রক্তের বিনিময়েই কথা ও কাজের সমন্বয় সম্ভব। নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেকেই বারবার প্রশ্ন করেছে সে। স্বভাবতই সে গম্ভীর প্রকৃতির, জোরে কথা বলতে বা জোরে হাত-পা নাড়তে লজ্জা পায়। কিন্তু সে এমন কিছু করতে চাচ্ছে যা তার সমস্ত অতীতকে একেবারে মুছে দেবে। এ বিষয়ে মিশোর উপদেশ নিতে পারলে ভাল হত, কিন্তু মিশো ব্যস্ত অন্য কাজে। আর এই অবস্থায় তার বাবা কিনা এসেছে তার কাছে আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে আর বাবার কাছে তাকে কিনা শুনতে হচ্ছে যে এই বদমাস গুণ্ডাগুলোর দোষেই যত কিছু অশান্তির সৃষ্টি। বাধা দিয়ে হঠাৎ সে বলে উঠল :

'থাক, যথেষ্ট হয়েছে!'

আশ্চর্য হয়ে তেসা মেয়ের দিকে তাকাল। ব্যাপারটা কি? হঠাৎ এমন কী ঘটল? দেনিসের দিকে তাকাল সে। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী দেনিস, কেমন একটা গাম্ভীর্য এসেছে তার সৌন্দর্যে, দুই চোখের ক্রুদ্ধ দৃষ্টি।

'কি হল তোমার?' বলল তেসা।

'এসব কথা শুনতে পারি না আমি। তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই না। তুমি যা বলছ, তোমার পক্ষে তা অযোগ্য বলে আমার মনে হয়। হয়ত আমিও ঠিক ওদেরই মত ভাবি, হয়ত এজন্যে আমাকে জীবনের ধারা বদলাতে হবে। কি জানি...কিন্তু এ কী কষ্ট!...' ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেল দেনিস।

মনে মনে চটে উঠল তেসা। তারপর স্ত্রীর ঘরে ঢুকে বলল, 'তোমার মেয়েটি ঠিক তোমার মতই হয়েছে। কতগুলি ধর্মের গোঁড়ামি ঢুকেছে ওর মনেও। স্বর্গ, নরক, কে জানে আরো কত কী!'

'আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে কি লাভ, পল?'

'আমি ঠাট্টা করছি না। তোমাদের সবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি

কারও মুখ চেয়ে কথা বলি না, আর এজন্যে যে কোন শাস্তি নিতে আমি প্রস্তুত।'

তারপর সে গেল পলেতের কাছে। সেখানে মুখ ভার করে বসে রইল আর ব্র্যাণ্ডি গিলতে লাগল ক্রমাগত। বৃথাই পলেৎ চেষ্টা করল তার মন ফিরিয়ে আনতে। পলেৎ যখন বলল, 'আমাকে একটি চুমু দাও তো, দুষ্টু খোকা!' তখনও তার চাঞ্চল্য দেখা গেল না। বিড়বিড় করে সে শুধু বলল, 'চুলোয় যাক গে সব!'

২০

জিনোর মা ক্ল্যর্মাস স্থিভালের মেজাজটা খিটখিটে কিন্তু মনটা বড় ভাল। তাঁর হাত দুটো বাতগ্রস্ত, শাদা চুল হলদে হয়ে উঠছে, জলজলে চোখ দেখে বোঝা যায় এককালে তিনি সুন্দরী ছিলেন। অতি কষ্টে তাঁর জীবিকানির্বাহ হয়—অবিবাহিত যুবকদের ঘর সাজানো, মেঝে পরিষ্কার করা, জামাকাপড় ইস্ত্রি ও রিপু করা ইত্যাদি নানা ধরনের কাজ করতে হয় তাঁকে। এক সময়ে তাঁকে এর চেয়েও কষ্টে দিন কাটাতে হয়েছিল। সন্ধির ঠিক আগে যখন স্বামীর মৃত্যু হয়, তাঁর কোলে দুটি ছোট ছোট শিশু। মাতামহর কাছে থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন আটতলার ছোট একটি ঘর—পাথরের মেঝে, ধোঁয়ায় কালো চুল্লী, প্রকাণ্ড একটা তক্তপোষ। অভাব অনটন লেগেই থাকত, এক বালতি কয়লা কিনবার সামর্থও ফুরিয়ে যেত সময়ে সময়ে, শীতে হিম হয়ে যেত শিশু দুটি; কিংবা হয়ত একটা পুরনো ছেঁড়া ট্রাউজার পরে কাটাতে হত জিনোকে, আনেৎ-এর জন্য খাতা কেনা আর হত না। কিন্তু তবুও ছেলেমেয়েকে নিজেদের পায়ে দাঁড় করাতে পেরেছিলেন তিনি। বিয়ের পর আনেৎ লিয়ঁতে চলে গেল, যে লোকটির সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল সে কোন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় জোড় দেবার কাজ করত। আর 'সীন' কারখানায় ঢুকবার সুযোগ পেয়ে গেল জিনো। এটা সত্যিই একটা সৌভাগ্য! এবং সে দিন যে তিনি এক বোতল লেবেল লাগানো মদ কিনে এনেছিলেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। জিনোর বয়সী কত যুবক তো পারীর শহরতলীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়, চাকরির দরখাস্ত নিয়ে কারখানা থেকে কারখানায় ছোটে। সব জায়গায় সেই একই নোটিশ—'লোক চাই না।' এমন কি শিক্ষানবিস

নেওয়া বন্ধ। তাঁর প্রতিবেশিনীদের মুখে সব সময়েই অনুযোগ, বড় বড় ছেলেরা সংসারের বোঝা। জিনো যে দিন প্রথম মাসের মাইনে নিয়ে ঘরে ফিরল, সেদিন নিজের চোখকে বিশ্বাস করে উঠতে পারেননি তিনি।

নিজের এই প্রাণবন্ত তরুণ ছেলেটির জন্যে যেমন তিনি গর্ব অনুভব করতেন, তেমনি আবার শঙ্কিতও হয়ে উঠতেন অমঙ্গল আশঙ্কায়। অপরের পেছনে লাগা, গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো—এ সব বিষয়ে তো জিনো ওস্তাদ, আর কতবার তো তিনি ওকে সাবধান করে দিয়েছেন যে এর জন্যে ওকে দুঃখ পেতে হবে। তাঁর কাছে ও তো এখনো শিশু এবং ওর দু-একটা অবুঝ আবদার তাঁকে সহ্য করতে হবে বৈকি। জিনোকে সভায় যাতায়াত শুরু করতে দেখেই তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মন তাঁকে বলেছিল, এপথে বিপদ আছে। বারবার ওকে তিনি বলেছিলেন এপথ ছেড়ে দিতে, ভয়ও দেখিয়েছিলেন, কিন্তু জিনো ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিয়েছে সব কথা। যে দিবসে জিনোকে তিনি দেখেছিলেন লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে মার্চ করে অগ্রসর হতে। যদিও তিনি গীর্জায় যাতায়াত করেন না কারণ তাঁর মতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি থাকেও ঈশ্বরকে পাবার কোন পথ নেই,—কিন্তু সেদিন লাল-ঝাণ্ডা-কাঁধে জিনোকে দেখে বুকের উপর ক্রুশ চিহ্ন এঁকেছিলেন তিনি। কেন জানি তাঁর ভয় হয়েছিল যে জিনো ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

তারপর ধর্মঘট শুরু হল। আর সে কী ধর্মঘট! অতীতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করত নিঃশব্দে, বাড়ীতে বসে থাকত আর অপেক্ষা করত। এখন ওরা অবস্থান ধর্মঘটের অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এজন্যে হয়ত গ্রেপ্তার হতে পারে ওরা। ক্ল্যাঁস চেষ্টা করেছিলেন ধমকে বুঝিয়ে জিনোকে বাড়ী ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু জিনো কান দেয়নি তাঁর কথায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি ডিম মাখন আর মাংস নিয়ে যেতেন। হাতে পয়সা নেই বলে অনুযোগ করেননি কোনদিন। নিজের জন্যে তিনি ভাবতেন না।

তারপর সেই ভয়ংকর খবর এল। সেই দিন থেকে বোবা হয়ে গেলেন তিনি। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন বা জিনোর সহকর্মীদের মধ্যে কেউ তাঁর মুখে একটি কথাও শুনতে পেল না। শবযাত্রার দিন নিঃশব্দে কাঁদতে কাঁদতে শবানুগামীদের আগে আগে গেলেন তিনি। তাঁকে অনুসরণ করল জিনোর মাসী আর তার ছেলেমেয়েরা, কয়েকজন প্রতিবেশী আর মিশোর নেতৃত্বে 'সীন' কারখানার একদল শ্রমিক-প্রতিনিধি।

স্থির হয়েছিল, জয়লাভ না করা পর্যন্ত শ্রমিকরা কারখানা ত্যাগ করবে না এবং এই কারণেই শবানুগামীদের সংখ্যা অল্পই ছিল। শহরতলীর গোরস্থানে, লৌহক্রুশ আর পুঁটি-মালা চিহ্নিত বহু কবরের ভীড়ে সমাধিস্থ করা হল জিনোকে। গ্রীষ্মকালের গুমোট সকাল, বাতাসে সুগন্ধী লতার গন্ধ, পাখীর গান! কোন বক্তৃতা হল না, জিনোর সহকর্মীরা একে একে নিঃশব্দে করমর্দন করল ক্ল্যমাঁসের সঙ্গে। শুধু মিশোর হাতে মালার লাল ফিতেটুকুর রক্তিমতায় একটা ভয়ংকর ইতিহাস লেখা হয়ে রইল।

কারখানায় ফিরে যাবার পথে সিলভাঁ নামে একজন টার্ণার উত্তেজিত স্বরে বলল, 'ওদের মুখে বড় বড় বক্তৃতা কিন্তু কাজের বেলা খুন করতেও বাধে না।'

পুলিশ ভীইয়ারকে মিথ্যা খবর দেয় নি। 'সীন' কারখানার অবস্থা সত্যিই ঘোরালো। দু সপ্তাহের ধর্মঘটে বহুলোকের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙে পড়েছে। শ্রমিক-বৌদের মুখে এখন শুধু অনুযোগ। কারখানায় আসবার সময় এখন আর খাবার আনে না তারা—হাতের পুঁজি ফুরিয়ে গেছে, দোকানদাররা ধার দেয় না। জিনোর মৃত্যু কয়েক ঘণ্টার জন্যে শ্রমিকদের আবার উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, খুনেদের ওপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল তারা, অনেক কষ্টে মিশো সবাইকে থামিয়েছে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই শ্রমিকদের মধ্যে আবার হতাশার ভাব এল, পরিবারপরিজন খেতে পাচ্ছে না, ধর্মঘট চলছে এত দীর্ঘ দিন ধরে —অথচ এ সবের পেছনে কোন কারণ নেই! কারখানার কর্তৃপক্ষের পেটোয়া লোকেরা নানা রকম গুজব ছড়াতে শুরু করল—কাজের অভাবে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকবে, পুলিশ থেকে চরমপত্র দেওয়া হয়েছে যে ধর্মঘটীরা যদি কারখানা ছেড়ে না যায় তবে পুলিশ গ্যাস ব্যবহার করতে বাধ্য হবে, ইত্যাদি।

ধর্মঘটীদের মধ্যে এই বিক্ষুব্ধ দলটি জড়ো হল সিলভাঁর আশেপাশে। সিলভাঁ উগ্ররকমের আবেগপ্রবণ, বিচারবিবেচনা করে কোন কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ধর্মঘটের শুরুতে সে প্রস্তাব করেছিল, কারখানার কর্তৃপক্ষের বদলে একটি কমিটি নির্বাচিত করে কারখানা চালু রাখা হোক। তার প্রস্তাবে হেসে উঠেছিল সবাই, আর রীতিমত চটে উঠে সে বলেছিল, 'তাহলে আমাদের আর কোন আশা নেই। দেসের অনায়াসে যতদিন খুশি অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু আমরা তা পারি না।' তার স্ত্রী যেদিন তাকে বলল যে হাতে আর একটি ফ্রাঁও অবশিষ্ট নেই, সেদিন সে জ্বলে উঠল একেবারে, মৃগীরোগীর মত নেচে কুঁদে কাঁদ-

কাঁদ গলায় বলল, 'যথেষ্ট হয়েছে! এইভাবে বোকার মত ধর্মঘট করে বসে থেকে কোন লাভ নেই।' প্রতিদিন অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তার কথা শুনতে লাগল সবাই। তারপর সে প্রস্তাব করল, শ্রমিকদের মতামত জানবার জন্যে গোপন ব্যালট নেওয়া হোক। তার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আঠার হাজার শ্রমিকের মধ্যে অন্তত দশ হাজার ধর্মঘট তুলে নেবার পক্ষে ভোট দেবে। প্রতিবাদে মিশো বলল, শ্রমিকদের আত্মসম্মানের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত সুতরাং প্রকাশ্যে ভোট নেওয়া হোক, কমরেডরা যে ভেঙে পড়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই তার। ধর্মঘটে পরাজয়ের দিন ঘনিয়ে আসছে।

কারখানার ভেতর যা কিছু ব্যাপার ঘটছিল, দেসেরের তা জানতে বাকী ছিল না। সে স্থির করল, ধর্মঘট ভাঙবার চেষ্টাটা একবার করে দেখবে। পিয়েরকে আর একবার ডেকে পাঠাল সে।

'এই যে অতি-উৎসাহী, কেমন আছ? কারখানার ভেতর আটকা থেকে শরীরের উন্নতি হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। চমৎকার দেখাচ্ছে তোমায়। হ্যাঁ শোন, ধর্মঘট কমিটির কাছে আমি কতগুলো প্রস্তাব পাঠাতে চাই। শুনেছি, তুমি ঐ কমিটির একজন সভ্য। মাইনে ও কাজের ঘণ্টা সম্পর্কে দাবী দুটো আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু যৌথ-মজুরিনির্ধারণ ও পুরো বেতনে ছুটির দাবী আমি কোন ক্রমেই মানতে রাজী নই। ওগুলো ভেলকিবাজীর ব্যাপার। ভীইয়ারের ওপর এখনো তোমাদের বিশ্বাস অটুট আছে তো? হ্যাঁ, ভীইয়ারের পক্ষে ভেলকির খেলা দেখানোটা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু আমার কথাটা স্পষ্ট করে জানিয়ে রাখছি, যদি ধর্মঘট তুলে না নেওয়া হয় তবে কারখানা বন্ধ করে দেব আমি।'

'আমার মনে হয় না, তোমার এই প্রস্তাব ধর্মঘটীরা মানবে।'

স্বভাবত পিয়ের আবেগপ্রবণ, অল্পতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটা যে বিরূপ মনোভাবেরই পরিচয়, সেটা আঁচ করে নিল দেসের।

দেসের বলল, 'রাগ করছ কেন? আমি তো একজন পুঁজিপতি। এই শব্দটাতেই তো আমার সমস্ত পরিচয়। শ্রমিকরা তাদের দিক থেকে ঠিকই করেছে। কিন্তু তুমি কি? রুই-কাতলা তুমি নও, কিন্তু ঘাই মারবার সখটা তোমার কিছুমাত্র কম নয়। প্রচুরই আছে বলতে হবে। কী সখ! যৌথ-মজুরিনির্ধারণে তোমার কি লাভ? নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারছ তুমি, কিন্তু আর সবাই একই ভাবে রয়েছে।'

'ওদের পথকে আমি বিশ্বাস করি।' পিয়ের বলল।

'না, কর না। হয়ত তুমি ওদের পছন্দ কর, কিন্তু ওদের পথে তোমার বিশ্বাস নেই। জনসাধারণকে তোমরা রক্তলোলুপ স্বেচ্ছাচারিতার পথে চালিত করছ। এর পরিণতি কী মর্মান্তিক, ভাবো তো!'

পিয়ের চলে গেল। জানলার বাইরে তাকাল দেসের। আকাশ পরিষ্কার নীল, লাল ঝাণ্ডা উড়ছে, আপিসঘরের সামনে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে একটি যুবক। পিয়েরের ওপর হিংসে হল দেসেরের। পিয়ের বোকা হতে পারে কিন্তু পিয়ের সুখী। একটা কিছুর ওপর সে বিশ্বাস রাখতে পেরেছে। সেটা যাই হোক না কেন, কি আসে যায়? নিজেকে অত্যন্ত একা বলে মনে হল দেসেরের। প্রতিটি দিন কর্মব্যস্ত, মহাশূন্যের মত ফাঁকা, ঘুম থেকে উঠে সেই একই রকমের এক একটি দিনের শুরু—কী ভয়ংকর!

মিশোর কাছে পিয়ের দেসেরের প্রস্তাব বলতেই সে বলল, 'কাল সকাল পর্যন্ত এ সম্পর্কে একটি কথাও কাউকে বলবে না। কাল আমরা সবাইকে এক সঙ্গে ডেকে ভোট নেব।'

পিয়ের নিজেও ভেবেছে, এ বিষয়ে খুব সাবধানে কাজ করা দরকার। প্রত্যেককে ডেকে সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে হবে। সব চেয়ে বড় কথা, দেসেরের এই প্রস্তাব সিলভ্যার কানে কোন রকমেই যেন না ওঠে। বহুক্ষণ তারা আলোচনা করল। হঠাৎ মিশো আলিঙ্গন করল পিয়েরকে। এই আলিঙ্গনের অর্থ যে কত গভীর, তা বুঝতে পারল পিয়ের। কিন্তু সে নিজে এত পরিশ্রান্ত যে একটি কথা বলবার শক্তিও তার ছিল না।

প্রথম প্রথম মিশো পিয়েরকে অবিশ্বাসের চোখে দেখত। রাগ হলে পিয়েরকে সে বলত ননীর পুতুল, কারণ পিয়েরের স্বভাবটা ছিল কোমল। আর সমাজতন্ত্রীদের প্রতি, বিশেষ করে ভীইয়ারের প্রতি পিয়েরের অনুরাগ কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারত না। অবশ্য ধর্মঘটের পর থেকে পিয়েরকে ভালভাবে জানতে পেরেছে সে। 'সীন' কারখানার একজন শ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার পিয়ের, আর সেই কিনা নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছে শ্রমিকদের সঙ্গে—এই একটি ঘটনাই তো তার বলিষ্ঠ স্বার্থত্যাগের প্রমাণ। প্রাত্যহিক জীবনে পিয়েরের প্রতি সকলেই আকৃষ্ট হয়। অস্বাভাবিক রকমের কল্পনাবিলাসী সে, প্রায় সব সময়েই কোন না কোন অসম্ভব কল্পনা মাথায় ঘুরছে। কিন্তু মিশো যদি বলে যে পরিকল্পনাটা কাজ করবে না—সে রাগ করে না বা

তর্ক করে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছু ভাবতে বসে। দক্ষিণ দেশের লোক সে, সব সময়েই হাসিখুশি, গভীরতম দুঃখের ভেতরেও মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পারে মার্শাইয়ের গান গেয়ে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী দেখিয়ে বা ভাঁড়ামী করে। মিশোর চেয়ে পিয়ের দু-বছরের বড়, তবুও মিশো পিয়েরকে স্নেহভরে 'শিশু' বলেই মনে করে।

মাঝে মাঝে তুমুল আলোচনা হয় দুজনের মধ্যে। পিয়েরের মতামত গত শতাব্দীর এবং দৃঢ়তার সঙ্গে এই মতামত যে সে আঁকড়িয়ে থাকে তার কারণ তার আবাল্য শিক্ষা কিংবা তার সংবেদনশীল ও বেপরোয়া মানসিক গঠন। জলের ঝাঁঝরি নিয়ে ফুলের চাষ করবার মত মানুষকে সে অনুশীলন করতে চায়। সে বিশ্বাস করে, জনসাধারণকে জয় করতে হলে তাদের উদ্দেশ্য-প্রণোদিত করতে হবে। ভীইয়ারের পেশাদারী কথাবার্তা সারগর্ভ বলে মনে হয় তার কাছে। মিশো যখন তাকে বিদ্রূপ করে ওঠে, সে হাসে বিপন্নভাবে—সখের খেলনা হাত থেকে কেড়ে নিলে শিশুদের যেমন অবস্থা হয়।

তারপর মিশো তাকে বলল, 'দেসেরের সঙ্গে তোমার যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে, কালকের সভায় খুলে বলতে হবে। সেটা তুমি ভালভাবেই করতে পারবে বলে মনে হয়। দেসেরের অবস্থা যে খুব ভাল নয়, তা আমি তোমার কথা শুনেই বুঝতে পেরেছি।'

পিয়ের বলল, 'আচ্ছা বেশ। কিন্তু মজার ব্যাপার কি জান, দেসেরের অবস্থা সব দিক থেকেই খারাপ। ওর লাখ লাখ টাকার সম্পত্তি ঠিকই আছে কিন্তু ওর জীবনটার দাম দু পয়সাও নয়। একবার আমার সঙ্গে ও বেড়াতে বেরিয়েছিল, সেই সময়েই ও এই কথা বলেছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, দিব্যি আছে ও।'

মিশো বলল, 'তুমি ঠিক বুদ্ধিজীবীদের মত কথা বল। কিন্তু আমি জানি, আমরা যদি হেরেও যাই, তবুও তুমি পিছিয়ে যাবে না, সঙ্গে এসে পাশাপাশি দাঁড়াবে। আর যদি আমরা জিতি তবে তোমার হয়ে আমিই সেদিন উত্তর দিয়ে আসব। কিন্তু আমাদের পথে তোমার বিশ্বাস যতটা না আছে, আমাদের প্রতি করুণা আছে তার দশগুণ। একটি মেয়েকে আমি জানি, মেয়েটি এখনো ছাত্রী। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, মেয়েটির কাছে শক্তির চেয়ে দুর্বলতা বড়। দূর ছাই, কি যে বলছি!...মেয়েটি নিজে কিন্তু শক্তিমতী। হ্যাঁ, শক্তিমতীই বলব। ঠিক তাই!'

অন্যমনস্কভাবে সলজ্জ হাসল মিশো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পিয়ের; তাহলে মিশোরও এই অভিজ্ঞতা আছে! কিন্তু মিশো ইতিমধ্যেই কারখানার চারদিকে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে প্রত্যেকের সঙ্গে, বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করাচ্ছে প্রত্যেককে।

দেসেরের প্রস্তাব সিলভ্যাঁর কাছে চাপা রইল না—কর্তৃপক্ষের গুপ্তচরেরা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রাখেনি। আর একটুও সময় নষ্ট করেনি সিলভ্যাঁ। 'আপোষ,'—কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে কারখানার ইয়ার্ডে ইয়ার্ডে। উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সবাই—দীর্ঘ দিনের কর্মহীনতা আর পরিবার পরিজনের বিচ্ছেদ এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছিল সবার কাছে। আপোষরফার ওপর একটা সই-এর অপেক্ষা শুধু, তারপরেই এইভাবে কুকুরের মত দিন কাটানো শেষ হবে! সিলভ্যাঁ বলে বেড়াল, 'ওরা এই কথাটা গোপন রাখতে চাইছে। কেন জান? রাজনীতি! আর এদিকে আমরা না খেয়ে মরে যাচ্ছি।'

সন্ধ্যার দিকে অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠল। পিয়ের চেষ্টা করল দেসেরের ধূর্ততা সম্পর্কে সকলকে সচেতন করে তুলতে, কিন্তু সিলভ্যাঁর অনুগামীরা তার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে তাচ্ছিল্য ভরে বলল, 'কি হে ইঞ্জিনিয়ার, কত টাকা জমিয়েছ ব্যাঙ্কে?' শোনা গেল, সেইদিন সন্ধ্যা দশটার সময় সিলভ্যাঁ একটা সভা ডেকেছে এবং ভোটের ফলাফল আপোষের শর্ত মেনে নেবার পক্ষে যাবে। মনমরা হয়ে পিয়ের ভাবল, আর কোন আশা নেই। শুধু পিয়েরই নয়; প্রবল চেষ্টায় মিশো নিজেকে শান্ত রেখে দু-একটা ঠাট্টা-তামাসা করল বটে কিন্তু মনে মনে সেও বুঝতে পেরেছে যে একটা আশ্চর্য কিছু না ঘটলে আর বাঁচবার পথ নেই। সমস্ত দিক বিবেচনা করে একটা কিছু করতেই হবে তাকে। সহকর্মীদের এবং হয়ত বা পারীর সমস্ত ধর্মঘটের ভবিষ্যৎ এখন তার ওপরেই নির্ভর করছে।

অন্ধকার ঘনিয়ে এলে পিয়েরকে মিশো বলল, 'শোন, এক ঘণ্টার জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি। কথাটা কাউকে বোলো না। শুনলে ওরা হয়ত বলবে যে আমি পালিয়ে গেছি।'

'কোথায় যাচ্ছ? কমিটির কাছে?'

মিশো উত্তর দিল না।

ধুলোয় নোংরা জানলাটার সামনে মৃত লতার মত নিশ্চলভাবে ক্র্যমাঁস বসে আছেন। মিশো ঘরে ঢুকে আস্তে আস্তে তাঁর হাতটা নিজের হাতের মুঠোয়

নিল, কিন্তু চেষ্টা করেও মিশো কথা বলতে পারল না। ক্ল্যমাঁসের কাছে সে এসেছে সাহায্য চাইবার জন্যে কিন্তু তাঁর শোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে উষ্ণ কুয়াশার মত। যা কিছু বলতে এসেছিল, ভুলে গেল সে। ভুলে গেল ধর্মঘটের কথা, সিলভ্যাঁর কথা, আপোষের কথা। তারই একজন কমরেডের মা-র চিন্তাটাই একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠল তখন। তারপর জিনোর বিষয়ে বলতে শুরু করল—মৃত্যুর কয়েক মিনিট আগেও জিনোর ঠাট্টা-তামাসা, জিনোর হাসিখুশি ভাব আর সাহস ও উৎসাহ। থেমে থেমে দ্রুত উদ্দীপ্ত গলায় কথা বলল সে। তার গলার স্বরে এত কাতরতা আর কোনদিন প্রকাশ পায়নি।

অন্ধকার হয়ে এল। তবুও ক্ল্যমাঁস আলো জাললেন না। অন্ধকার ঘরে জিনো আবার বেঁচে উঠেছে যেন। এইখানেই জিনো বড় হয়েছে, এই ঘরেই বসে বসে খেলা করেছে মেঝের ইঁট নিয়ে, মা-র সঙ্গে কত গল্প করেছে—নিজের কমরেডদের কথা, মিছিল ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী। ক্ল্যমাঁস মনে মনে অনুভব করেন, তাঁর পুত্রের ক্ষুদ্র কিন্তু ঘটনাবহুল জীবন ছাপ রেখে গেছে সব কিছুতে, এই ঘরের বাইরে কারখানার জীবনের মধ্যেও তাঁর পুত্রের জীবন প্রবাহিত। এই অনুভূতিটা অত্যন্ত তীব্র—এত তীব্র যে মিশো তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্বেও মৃত পুত্রের সঙ্গে এই লোকটির বন্ধন ও নিকটত্ব গভীরভাবে অনুভব করেন তিনি এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে মনে মনে ভাবেন, 'ওরা ওকেও খুন করবে! সব পারে ওরা!'

হঠাৎ মিশো চুপ করল, কারখানা, লেগ্রে আর পিয়েরের কথা মনে পড়েছে তার। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আপনার সাহায্য আমরা চাই।'

একবারও চিন্তা না করে ক্ল্যমাঁস বেরিয়ে এলেন মিশোর সঙ্গে সঙ্গে।

ধর্মঘটের প্রথম দিনের মত শ্রমিকরা কারখানার উঠোনে জড়ো হয়েছে। মিশোর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সিলভ্যাঁ ঘোষণা করল যে, কারখানার কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী মেনে নিয়েছে কিন্তু ধর্মঘট কমিটি চেষ্টা করছে কথাটা যেন চাপা থাকে। মিশো যখন এল তখন ভোট নেওয়া হচ্ছে আর চারদিক থেকে বহু লোক চিৎকার করে ঘোষণা করছে যে অধিকাংশ ভোট আপোষের পক্ষে। কথাটা সত্যি কিনা বলা শক্ত, কারণ হাতগুলো অনবরত ওঠানামা করছে। আবার যারা হাত তুলছে তাদের মধ্যে অনেকেরই ধারণা ছিল না কোন্ পক্ষে তারা ভোট দিচ্ছে। চারদিকে শুধু চিৎকার, গালাগালি, উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা!

একটা লরির ওপর দাঁড়িয়ে মিশো চিৎকার করে বলল, 'কমরেড্‌স্‌, একটু থামুন !'

বাধা দিয়ে সিলভ্যাঁ বলল, 'থাক, আর না বললেও চলবে। ভোট নেওয়া হয়ে গেছে।'

একটুও না দমে মিশো বলে চলল, 'এখানে আর সবার বলা এবং ভোট দেওয়া হয়ত শেষ হয়ে গেছে কিন্তু একজন এখনো কথা বলেনি। আমি জিনোর কথা বলছি। আপনারা কি তাকে ভুলে গেছেন ? জিনো এখানেই আছে। এইখানে —আমাদের সঙ্গে। জিনোর হয়ে জিনোর মা আজ কথা বলবেন।'

সভায় গভীর স্তব্ধতা নেমে এল। জিনোর মৃত্যু এখনো কেউ ভুলে যায় নি এবং মায়ের শোক দাগ কেটে বসল প্রত্যেকের মনে। বৃদ্ধা মহিলা একটা লরির ওপর উঠে দাঁড়ালেন। অশ্রু-লাঞ্ছিত রক্তাভ চোখ, গুচ্ছ গুচ্ছ শাদা চুল, একটিও কথা না বলে বজ্রমুষ্টি তুললেন তিনি—কমরেডদের সঙ্গে সভায় যাবার সময় জিনোও ঠিক এই রকম করত। কি যেন বলবার চেষ্টা করলেন ক্ল্যামাঁস, ঠোঁট দুটো নড়ে উঠল কিন্তু একটি শব্দও উচ্চারণ করতে পারলেন না। কিন্তু জনতার সামনে তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাতটা কেঁপে কেঁপে উঠল, উত্তরে বজ্রমুষ্টি তুলল প্রত্যেকে। মিশো যখন বলল, 'যাঁরা আপোষের পক্ষে হাত নামান', একটি হাতও নামল না। এমন কি সিলভ্যাঁও ধর্মঘটের পক্ষে ভোট দিল,—ক্ল্যামাঁস স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সিলভ্যাঁর দিকে।

তারপর ক্ল্যামাঁস বললেন, 'এখন থেকে জিনোর বদলে আমি এখানে থাকব।' স্নেহভরা দৃষ্টিতে মিশোর দিকে তাকালেন তিনি, 'গেটের কাছে যেও না তুমি। ওরা তোমাকে খুন করবে।'

ধর্মঘটের আজ পনের দিন। রাত্রিবেলা পিয়ের শিশুর মত মিশোর চারদিকে নাচতে নাচতে বলল, 'আমরা জিতেছি ! আমরা জিতেছি !'

তিন দিন পরে ভীইয়ারকে টেলিফোনে ডেকে দেসের বলল, 'আমি স্থির করেছি ধর্মঘটীদের দাবী মেনে নেব। কতগুলো জরুরী অর্ডার হাতে এসে পড়েছে। আর একটা কথা কি জানেন, যুদ্ধে জিততে হলে পিছু হটতে জানা দরকার। অবশ্য এসব কথা আপনাকে বলা অনাবশ্যক। পিছু হটবার কৌশলটা নেপোলিয়ঁর মত ভাল করেই জানেন আপনি।'

এই স্থূল বিদ্রূপটা আসলে দেসেরের নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার একটা চেষ্টা মাত্র। আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে বলে সে বিরক্ত, তার আত্মসম্মান আহত। পিয়ের

হয়ত এখন দাঁতে দাঁত ঘষছে। কিন্তু রোজ পাঁচ লক্ষ করে ক্ষতি কে দিতে চায়? শেয়ারের বাজারের মত রাজনীতিও একটা খেলা। আজ হয়ত শ্রমিকরা সমুদ্রতীরে যাচ্ছে, আবার কাল ওরা বন্দীশালাতেও আটক হতে পারে। সেই বিখ্যাত পেণ্ডুলাম ভেলকি খেলতে শুরু করেছে। বড় দ্রুত আবর্তিত হচ্ছে ওটা। যেমন হচ্ছে দেসেরের চিন্তাজগৎ—তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না; মদ, তামাক আর কফি খেতে বারণ করেছে ডাক্তার। কিন্তু ডাক্তারের কথা মেনে চলছে না সে, মনের এই অবস্থায় একটা কিছু উত্তেজনা দরকার—প্রেমের উত্তেজনা যদি না হয় তবে এমন একটা কিছুর যা প্রেমেরই মত।

ধর্মঘট শুরু হবার পর উনিশ দিনের দিন সন্ধ্যা সাতটায় আপোষের শর্তের ওপর সই করল দু পক্ষ। ধর্মঘটীদের মূল দাবীগুলোর সামান্য অদল বদল করা হল মাত্র। শ্রমিকপক্ষই যে জিতল তা বুঝতে বাকী রইল না কারও।

'সীন' কারখানায় যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তা ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র, 'সীন' কারখানায় জয়লাভের অর্থ সর্বত্র জয়লাভ। অন্যান্য মালিকদের আত্মসমর্পণের সংবাদ আসতে শুরু করল একদিনের মধ্যেই। জলিও কাব্য করে লিখল 'সন্ধি ঘোষিত হয়েছে। হে ফ্রান্সবাসীগণ, এবার কাজে ফিরে চল! ধর্মঘটের ক্ষতকে নিরাময় করতে হবে!'

সন্ধ্যা আটটার সময় 'সীন' কারখানার শ্রমিকরা লাইন বেঁধে দাঁড়াল এবং তিন সপ্তাহের স্বেচ্ছাবন্দীত্বের পর ব্যাণ্ড বাজিয়ে ঝাণ্ডা উড়িয়ে বেরিয়ে এল কারখানা ছেড়ে, সবার আগে ক্ল্যমাঁস ও মিশো। ধর্মঘটীদের পরিবার-পরিজন, কারখানা এলাকার অধিবাসী, বিভিন্ন ইউনিয়নের প্রতিনিধি—হাজার হাজার লোক অভিনন্দন জানাল বিজয়ীদের। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা ঘনায়মান, আকাশ এখনো উজ্জ্বল, একটা দুটো তারা দেখা দিয়েছে সবেমাত্র—সূর্যাস্তের সোনালী বিস্তৃতির ওপর তারাগুলোর নীলাভ ঝিলিক রহস্যময় মনে হচ্ছে। উৎসবমুখর জনতা ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায় আর কাফেগুলোতে। ফুল উপহার দিয়ে, বিয়ারের আমন্ত্রণ জানিয়ে জনসাধারণ স্বাগত জানাচ্ছে তাদের।

মিশো শ্রীমতি ক্ল্যমাঁসকে ধরে আছে। গত কয়েক দিনের ঘটনার পর এত ক্লান্ত হয়েছেন ক্ল্যমাঁস যে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার ক্ষমতাও আর তাঁর নেই। মিশোর ওপর নির্ভর করাটা তাঁর অভ্যাস হয়ে গেছে এবং তিনি নিজেও মা-র মত মিশোকে চোখে চোখে রাখছেন। কিন্তু এবার তাদের ছাড়াছাড়ি হবার সময় হয়ে এল। মিশো ব্যস্ত থাকবে ওর কাজ নিয়ে, জিনোর মত সভায়

ছুটোছুটি আর চিৎকার করবে যতদিন পর্যন্ত না ওকেও ওরা খুন করে। আর তাঁকে ফিরে যেতে হবে তাঁর শূন্য ঘরে, পাথরের মেঝের ওপর প্রকাণ্ড তক্তপোষ পাতা তাঁর সেই ঘর।

হঠাৎ ক্ল্যমাঁস বললেন, 'তুমি বিয়ে করছ না কেন? অন্তত একা থাকার চেয়ে বিয়ে করাটা ভাল। নইলে দেখো জীবনটা কী ভীষণ ফাঁকা ঠেকবে। তোমাকে যদি ওরা কোনদিন খুন করে তো তোমার জন্যে চোখের জল ফেলবার কেউ থাকবে না। এটা কি ভাল?'

সলজ্জ হাসল মিশো। আকাশের পটভূমিকায় আঁকা কালো কালো গাছ, 'সীন' কারখানার ওপর থমকে-থাকা আবছা নীল অস্পষ্টতা—একটা পরিচিত মুখের আভাস চমকে চমকে উঠছে তার মনে, দেনিস আসছে তার সঙ্গে দেখা করতে, হাসছে দেনিস আর অন্যমনস্কভাবে চেপে ধরেছে তার হাতটা।

২১

স্টুডিও ঘরটা অসহ্য রকমের গুমোট—মনে মনে নিজেকে এই কথা বুঝিয়ে, ছবি আঁকবার ইজ্‌লটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে, বেরিয়ে পড়ল আঁদ্রে। কিছুদিন হল সে কাজে মন বসাতে পারছে না। আগে, এই তিন মাস আগেও, স্কুলের বন্ধুবান্ধবের কাছে যখন সে বলত যে রাজনীতি সে বোঝে না, সেটা যে সে বাড়িয়ে বলত তা নয়। তারপর অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। স্টুডিওর আবহাওয়ায় কখন যে রাজনীতি মাথা গলিয়েছে তা সে জানতেও পারেনি। এখন প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ পড়াটা তার প্রথম কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় বার হলে লোকজনের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে সে। সকলের মুখেই এক কথা—ধর্মঘট, রাজনৈতিক দলাদলি, যুদ্ধ। যে আন্দোলনের ধাক্কা সারা শহরকে কাঁপিয়ে তুলেছে তা এক নতুন ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি করেছে আঁদ্রের মনে। জনসাধারণের সঙ্গে তার এত নিবিড় যোগ, চারিত্রিক গঠনে সে এত সুসংবদ্ধ যে সাধারণ মানুষের ঐক্যবদ্ধতার শক্তি ও আশার উত্তাপ তাকে স্পর্শ না করে পারে না। হ্যাঁ, তার পক্ষে এটাই আসল কথা! কিন্তু চিত্র জগতের স্টিল-লাইফ-এর ওপর কি সে আর মন বসাতে পারবে না?

সোভিয়েট ইউনিয়নে বৈজ্ঞানিক উপায়ে গমের চাষ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ কোন এক সময়ে পড়েছিল আঁদ্রে। চাষীর ঘরে তার জন্ম, মাটির সঙ্গে তার নাড়ীর টান, প্রবন্ধটি বিশেষভাবে কৌতূহলী করে তুলেছিল তাকে। রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়ে এই প্রবন্ধটার কথা ভাবতে ভাবতে সে সিদ্ধান্ত করল যে শিল্পের দুর্দিন উপস্থিত হয়েছে। এমন গাছও বহু আছে যেগুলো জন্মের আট বা নয় যুগ পরে প্রথম ফলবতী হয়। যে লোকটি বিচি পোতে সে ভাল করেই জানে যে গাছের প্রথম ফল তার ছেলে বা নাতির আগে কেউ ভোগ করতে পারবে না। কিন্তু ওদেশে একটি এক বছরের শিশু-চারার জীবনে কয়েকটি দিনের পরিবর্তন সমগ্র দেশের রূপ বদলে দিয়েছে। সুতরাং যুগধর্মটাই মূল প্রশ্ন। শিল্পীদের জীবনে সুদূরতা প্রয়োজন, তাঁদের জীবনটাই যেন স্থিতিশীল, কতকগুলি পূর্বস্বীকৃত রূপধর্ম ও নির্দিষ্ট রঙের সমারোহ থেকে একটা পরিণত পৃথিবীর ছবি আঁকেন তাঁরা, পতনের বা অভ্যুত্থানের যুগে কিছুই করবার নেই তাঁদের। মেজোঁ দ্য কুলতুর-এ লুসিয়ঁ বলেছিল; রুচিজ্ঞান না থাকলে বিপ্লবী হওয়া যায় না। বাজে কথা। এমন সময়ও ছিল যখন এই 'রুচিজ্ঞান' জিনিসটা 'নীল-রক্তের' মতই হয়ে উঠেছিল একটা দুঃসহ অভিশাপ—যার জন্যে ১৭৯৩ সালে প্রাণ দিতে হয়েছিল জনসাধারণকে। ইতিহাস স্বপ্রতিষ্ঠ যুগ-সমষ্টিতে, ব্যক্তিত্বে নয়। একটি যুগে যেমন রোব্‌স্‌-পিয়েরের মত নেতার আবির্ভাব, তেমনি আর একটি যুগে দ্যলাক্রোয়ার মত শিল্পীর। লুই-ফিলিপের কৃপণতার জন্যে যেমন দ্যলাক্রোয়া দায়ী নয়, ঠিক তেমনি রোব্‌স্‌পিয়ের দায়ী নন ডেভিডের জীবনী অবলম্বনে আঁকা ছবি-গুলির জন্যে। নাটকের দৃশ্য সংস্থাপনের মতই ঐতিহাসিক ঘটনাকেও সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে নিতে চায় লুসিয়ঁ। কিন্তু ইতিহাস-নাট্যে সে তো আর মঞ্চ পরিচালক নয়, মূক অভিনেতা মাত্র। যাই হোক, সময় থাকতে স্টিল-লাইফটা এঁকে ফেল্‌তেই হবে তাকে—এর পর স্টুডিও বা রঙের অস্তিত্ব নাও থাকতে পারে! ফিরে এসে আঁদ্রে জোর করে কাজে বসল, কিন্তু কোন ফল হল না, ঘণ্টাখানেক পরে হাতের তুলিটা আবার ছুঁড়ে ফেলে দিল সে।

আর একটু পরেই সন্ধ্যা হবে। এই সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে সে, রেডিও খুলে বসবার সময় হবে তখন। জিনেৎ এখনো 'পোস্ট প্যারিসিয়েন"-এ কাজ করছে। জিনেতের গভীর ও সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে

অপ্রীতিকর বিজ্ঞাপনগুলো এত বেমানান যে আঁদ্রের কাছে তা নিজের চিন্তার মতই দুঃসহ। লাফোর্গ-এর কবিতা আর পাস্তার জল-রঙে আঁকা ছবিগুলোর কথা মনে পড়ল আঁদ্রের—অর্থহীন, বিকারগ্রস্ত বিদ্রূপ!

নিজেকে প্রায়ই সে প্রশ্ন করেছে, 'জিনেৎ আমার কে?' 'প্রেম' শব্দটা একবারও তার মাথায় ঢোকেনি। মনে মনে ভেবেছে, জিনেৎকে কতটুকুই বা সে জানে, হয়ত তাদের মধ্যে কোথাও এতটুকু মিল নেই, সমস্ত ব্যাপারটাই হয়ত সামান্য একটু চিত্তচাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছু নয়। মানসিক প্রবণতার দিক থেকে আঁদ্রে ধীরসঞ্চারী ও স্থিতিশীল। সহজে সে কাউকে ভালবাসতে পাবে না, সে জন্যে অনেক ধৈর্য ও অনেক সতর্ক মনোযোগ ব্যয় হয়, কিন্তু একবার তার মনে ভালবাসার বিকাশ হলে তা দৃঢ়মূল হয়ে বসে।

লুসিয়ঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তার মনের ভাবটা হয়েছে অনেকটা জলে-ডোবা মানুষের মত। একটা নির্বোধ স্বীকারোক্তি করে ফেলার জন্যে মনে মনে সে অপরাধী বোধ করেছে। প্রকারান্তরে লুসিয়ঁ সে দিন তাকে বলেছে—'জিনেতের ব্যাপারে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?' ঠিকই বলেছে লুসিয়ঁ। এই চিত্তচাঞ্চল্য দূর করতেই হবে তাকে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসতেই সে রেডিওটাব কাছে ছুটে গেল।

কি করে সে কাজ করবে? ধর্মঘটী রাজমিস্ত্রীরা লাল ঝাণ্ডা উড়িয়েছে রাস্তার মোড়ে মোড়ে। বেতারে জিনেতের কণ্ঠস্বরে পর্যায়ক্রমে প্রেমালাপ ও পেটেণ্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন ঘোষণা। সময়টা জুলাই মাস, আবহাওয়া গুমোট। রাত্রিবেলা ঝড়বৃষ্টির পরেও বাতাস পরিষ্কার হয় না। অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করতে শুরু করেছে আঁদ্রে।

জুলাইয়ের গোড়াতেই পারীর সম্ভ্রান্ত অঞ্চল জনশূন্য হয়ে উঠেছে। এই সময়ে ট্রেনে ও রাস্তায় বেশ ভীড় হয়, এইজন্যে অন্যান্য বছরে বহু লোক ছুটি কাটাবাব জন্যে সমুদ্রতীরে বা নির্ঝরিণী উৎস-মুখে যাত্রার দিনটা মাসের শেষ পর্যন্ত স্থগিত রাখে। কিন্তু এবারে গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পারীর বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই রওনা হয়ে গেছে। দূব দূরান্তরে পাড়ি দিয়েছে তারা। বলে বেড়াচ্ছে—শ্রমিকদের এখন পুরো বেতনে ছুটি, ফ্রান্সের কেন্দ্রস্থল মজুরদের দখলে গেল বলে। কয়লা-যোগানদার বা রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসতে হবে কল্পনা করে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ীরা শিউরে উঠেছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ-গাল্পিকরা

নাকী সুর তুলল যে স্নানাগারগুলো 'দূষিত' হয়ে উঠেছে। ভাগ্যবানরা গেলেন সুইজারল্যাণ্ডে বা ইতালীতে। হোমরাচোমরাদের মধ্যে একজনও পারীতে থাকতে চাইল না, ১৪ই জুলাই যে বিরাট মিছিল বার হবে তা কল্পনা করেই আতঙ্কিত হয়ে উঠল তারা। এমন সময়ও ছিল যখন এই দিনটি সকলেই পালন করত কিন্তু এখন এই জাতীয় দিনটি পপুলার ফ্রণ্টের বিজয়োৎসবের উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্রতৈলের বন্ধুবান্ধবরা, যারা শহরেই থেকে গেছে, তারা নিজেদের বাড়ীর ওপর থেকে পতাকাগুলো তাড়াতাড়ি নামিয়ে ফেলল, যাতে তারাও জাতীয় উৎসবে যোগ দিয়েছে বলে কেউ না ভাবে।

আর শ্রমিক মহলে খুশির হল্লা শুরু হয়ে গেছে। যদিও পুরো বেতনে ছুটির দাবীটা জানাবার আগে অনেকবার ভাবতে হয়েছিল দেসেরকে কিন্তু দাবীটা স্বীকৃত হবার পর তাকে গ্রহণ করতে শ্রমিকদের একটুও সময় লাগেনি। দীর্ঘ আলোচনা শুরু হয়ে গেছে কে কোথায় যাবে তাই নিয়ে, কোথাকার দৃশ্য সবচেয়ে চমৎকার, কোন্ নদীতে সবচেয়ে বেশী মাছ। শ্রমিকাঞ্চলের কাফেতে বসে গল্প করবার সময় দেসের প্রায়ই বলে, 'কি সুন্দর দেশ! ওরা বিপ্লব চেয়েছিল আর যা ওরা পেতে চলেছে তা হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বঁড়শির টোপ ফেলবার প্রতিযোগিতা!' জুন মাসের বিক্ষুব্ধ দিনগুলোর পর গ্রাম্য প্রশান্তি নিয়ে জুলাই এসেছে। অবশ্য এ কথা সত্যি যে কমিউনিস্টদের মুখে এখনো মালিকের প্রতি-আক্রমণ ও ব্রতৈলের ষড়যন্ত্রের কথা শোনা যাচ্ছে কিন্তু কেউ বিশেষ কান দিচ্ছে না তাদের কথায়—মানচিত্র, রেল-গাইড, নতুন নতুন সাইকেল আর স্নানের পোষাক, ইত্যাদির ভেতর ডুবে গেছে সবাই। পুরো বেতনে ছুটির দিনগুলো বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুরু হবে আগস্ট মাসে তাই পারীর শ্রমিকরা ঠিক করল শহরে থেকেই ১৪ই জুলাই পালন করবে। কি ভাবে পালন করা হবে তা নিয়ে অবশ্য মতভেদ প্রচুর—কেউ ঠিক করেছে এই দিনে সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ হবে, কারও কারও মতে রাজনৈতিক মিছিল বার করাই এই দিনের সার্থকতা, আর অধিকাংশের কাছেই এই দিনের অর্থ রাস্তায় রাস্তায় নেচে-গেয়ে ঘুরে বেড়ানো।

১৩ই জুলাইয়ের সন্ধ্যা থেকেই পুরোদমে নাচ শুরু হয়ে গেল। সেদিন সারা পারীতে বোধ হয় এমন একজনও বাজিয়ে ছিল না যার কাজ জোটেনি। চারদিকে লোকে চিৎকার করছে, ঢাক বাজাচ্ছে, শিস দিচ্ছে, গা ঢেলে

দিয়েছে ফূর্তিতে। স্কোয়ারে স্কোয়ারে স্ট্যাণ্ড তৈরী হয়েছে অর্কেস্টা বাজিয়েদের জন্তে, তাম্রাভ মুখ আর কপালের ওপর ফুলে ফুলে ওঠা শিরাগুলো—ঢাক-বাজিয়েরা তৃষ্ণার্তভাবে বিয়ার গিলছে এক এক ঢোঁক। রাস্তায় রাস্তায় মিছিলের ওপর বিচিত্র রঙের চীনে লণ্ঠনের ঝাড়, কাফেগুলো জাঁকিয়ে বসেছে যত রকম সরঞ্জাম আছে সব নিয়ে ; ডাইনিং-টেবিল, কিচেন্-টেবিল. কার্ড-টেবিল—বাদ রাখেনি কিছুই। দিনটা গরম, গাঁয়ের লোকের মত কোট খুলে ফেলেছে প্রত্যেকে, সার্টের আস্তিন গুটিয়ে নাচ শুরু করেছে প্রবলভাবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মা-র কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে বা চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সরু সরু গলায়। ভেলকি-খেলা দেখাচ্ছে একদল যাদুকর, আগুন গিলে খাচ্ছে, মুরগীর ছানা বার করে আনছে তোবড়ানো টুপির ভেতর থেকে। বরফি-ফল, ফুল আর কাগজের পাখা বিক্রী করছে ফেরিওলা। চারদিকে ছোট ছোট চালাঘর—কোথাও বা জ্যোতিষিরা জমিয়ে বসেছে, কোথাও ভাঁটিখেলা, কোথাও বন্দুকের নিশানা তাক্ করবার ব্যবস্থা। ফোয়ারার মুখে পিঙপঙের বল লাফাচ্ছে, দূর থেকে সেই বল লক্ষ্য করে গুলি করছে ছেলেরা, ঘূর্ণমান মাটির পাইপ গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলছে। তার ওপর বহুরূপীরা বেরিয়েছে তাদের চিরাচরিত বিচিত্র রঙের ঘোড়া নিয়ে, বা যারা একটু আধুনিক, এরোপ্লেন নিয়ে।

পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন প্যারীর বহুধা রূপটি আজকের দিনের মত এত স্পষ্ট-ভাবে আর কোনদিন বোধ হয় ফুটে ওঠেনি। শত শত শহর নিয়ে প্যারীর গঠন—প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব রাস্তা, নিজস্ব সিনেমা, নিজস্ব নেতা এবং নিজস্ব গল্পগাথা। কেন্দ্রীয় পল্লীগুলোতে দিনের বেলা অসংখ্য আগন্তুক পথচারীর ভীড়, কিন্তু এখন সেখানে একটিও লোক নেই। শ্রমিকাঞ্চলের স্কোয়ারগুলোও জনশূন্য। এখানে সবার সঙ্গে সবাই পরিচিত এবং নাচগানটা সাধারণত পারিবারিক ব্যাপার হয়ে ওঠে।

সারাটা সন্ধ্যা আঁদ্রে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে। সাধারণ উৎসবের দিন-গুলিকে সে ভালবাসে ; কারণ একটা উচ্ছল স্বতঃস্ফূর্ত আমোদ আহ্লাদের সমারোহ থাকে এই সব বিশেষ দিনে। স্টলে স্টলে সাজানো শূয়োরছানার আকারের মিষ্টি কেকগুলো দেখতে ভাল লাগে তার, ভাল লাগে যখন দোকানদার এই খাবারগুলোর ওপরে চিনির প্রলেপ লাগিয়ে প্রণয়িনীর নাম লিখে দেয়। ভাল লাগে হার্মোনিয়ম ও বাঁশীর তীক্ষ্ণ সুর। কিন্তু এখন অত্যন্ত

নিঃসঙ্গ মনে করছে সে এবং এই বোধটা তীব্রতর হল বিশেষ করে প্লাস দ্য লা বাস্তিল-এ এসে। প্রাচীন সংগ্রাম-ক্ষেত্র প্লাস দ্য লা বাস্তিল—জুলাই মাসের সেই গুমোট সন্ধ্যায় বহু লোকের ভীড় সেখানে। লঘুচিত্তে নাচ শুরু করেছে সবাই, হাজার হাজার যুগলমূর্তি ঘুরে ঘুরে নাচছে। দূর থেকে সেই নাচের শব্দ ফুঁসে-ওঠা সমুদ্রগর্জনের মত মনে হল। সেখান থেকে আঁদ্রে ফিরে চলল সীন নদীর ধারে এবং তার প্রিয় জায়গা কঁত্র্-এসকার্প স্কোয়ারের দিকে হেঁটে চলল। এই স্কোয়ারটিতে আশেপাশের গরীব লোকেরা জড়ো হয়েছে আমোদ করবার জন্যে। নানারকম অদ্ভুত চিহ্ন চারপাশে, বাদাম গাছগুলো গাঢ় সবুজ। তখন মধ্যরাত্রি পার হয়েছে, বসে বসে আঁদ্রে গরম বিয়ারে চুমুক দিচ্ছিল, হঠাৎ সে জিনেৎকে দেখল। একদল অভিনেতার সঙ্গে জিনেৎ এসেছে। এত খুশি হল আঁদ্রে যে চিৎকার করে উঠল। তারপর কিছুক্ষণ চঞ্চলভাবে চেয়ারে বসে থেকে এবং নিজেই নিজেকে বোকা বলে গালাগালি দিতে দিতে সে জিনেতের কাছে গেল।

'নাচবে ?'

বিস্মিত চোখ তুলে জিনেৎ তাকাল। তারপর নিঃশব্দে নাচতে শুরু করল ওরা। এই আশ্চর্য যোগাযোগ এত অবাক করেছে ওদের যে দুজনেই চোখ বোঁচ করে টান হয়ে রইল। এই আবেগে কোন কলুষতা ছিল না। কেন জানি আঁদ্রে টেরও পেল না যে তার হাতটা জিনেতের দেহকে স্পর্শ করে রয়েছে, তার গায়ে জিনেতের নিশ্বাস লাগছে। স্কোয়ারটায় বেশ ভীড়, অনবরত অপরের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়া সত্ত্বেও ওদের মনে হচ্ছে যেন কোন্ দূর প্রান্তরে বা মরুভূমিতে পালিয়ে এসেছে ওরা।

আঁদ্রে প্রস্তাব করল, একসঙ্গে খানিকটা ঘুরে আসা যাক।

জিনেৎ বলল, 'আমার সঙ্গে অন্য লোক রয়েছে...আচ্ছা দাঁড়াও, ওদের আমি অপেক্ষা করতে বলে আসছি।'

একটা সরু ঝাপ্সা রাস্তায় ওরা ঢুকল। অন্ধকারে শিশুরা যেমন করে, তেমনিভাবে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগল দুজনে। 'সীন' কারখানায় সেই সন্ধ্যাটির কথা জিনেৎ বলতে শুরু করল।

সে বলল, 'এ সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু বুঝি না। খবরের কাগজ আমি পড়ি না বললেই চলে। কিন্তু আমি যা বলছি সব সত্যি। কিভাবে ওরা আমার কথা শুনল! আমি এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে বাড়ী ফিরে চিৎকার

করে কেঁদেছি। কেন কেঁদেছি বলতে পারব না। হয়ত এই কারণে যে সমস্ত ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লেগেছে।'

আঁদ্রে বলল, 'গত কয়েক সপ্তাহে আমি শুধু ঘুরে ঘুরে শুনেছি আর দেখেছি। এর পরিণতি কি আমি জানি না, কিন্তু অসাধারণ একটা কিছু হচ্ছে। ওদের কাছে সব কিছু সহজ এবং গভীর। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই। কিন্তু তুমি এবং আমি সাধারণত যে সব লোককে দেখি, তারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তারা রুচিবান হতে পারে, কিন্তু নিষ্ঠাবান নয়। অত্যন্ত সহজে তাদের উড়িয়ে দেওয়া যায়। এক রকম গাছ আছে যা ঠিক এই ধরনের। সেগুলো মাটি থেকে উপড়ে আসে এবং ভাসতে ভাসতে কোথায় যে চলে যায় কে জানে। সমস্তটাই অহেতুক, আকস্মিক...

বাধা দিয়ে জিনেৎ বিষণ্ণভাবে বলল, 'আঁদ্রে, এই হচ্ছি আমরা।'

উজ্জ্বল আলোক উদ্ভাসিত প্লাস স্ত ইতালীতে ওরা এল। হাসি, গান আর বাজীর শব্দ চারদিকে।

জিনেৎ বলল, 'জান আঁদ্রে, এই ভঙ্গুরত্ব দেখে আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে যাই।'

'কিসের ভঙ্গুরত্ব?'

'সব কিছুর। এ সম্পর্কে কোন দ্বিধা রাখবার চেষ্টা না করাই উচিত। কচি খুকিটি সেজে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। এমন কোন কথা নেই...'

কথাগুলো আঁদ্রেকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। সেও ঠিক এই কথাই চিন্তা করেছে।

'বলতে পার কেন আমাদের দুজনের চিন্তা ঠিক একই রকম?' বলল সে।

'এক হিসেবে এটা যে আমাদের শিল্পবোধের ফল তা আমি সাহস করে বলতে পারি। কারখানায় যতক্ষণ ছিলাম, এই বোধটুকু আমার হয়েছিল। মনে মনে ভেবেছিলাম—ওরা মনে করতেও পারে যে, আমরা ওদেরই দিকে, হয়ত আমাদেরকে ভালও লাগবে ওদের, এবং আমাদের সর্বনাশও করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু এমন একটা সময় নিশ্চয়ই আসবে যখন আমরা পেছনে পড়ে থাকব। কেন? আমি বলতে পারব না। তুমি কি লক্ষ্য করে দেখেছ "শিল্প" শব্দটা লোকে কি ভাবে উচ্চারণ করে? কোন কোন সময় প্রার্থনার বাণীর মত, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই কলেরা, প্লেগ বা কোন একটা রোগের নামের মত।

এই রোগের প্রতিষেধক হিসেবে একটা টিকের ব্যবস্থাও যে কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে যাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আচ্ছা একটু নাগরদোলায় চড়লে কেমন হয়, আঁদ্রে?'

কিম্ভূতকিমাকার জন্তুগুলো—কোনটা সবুজ, কোনটা কমলা, কোনটা দেখতে ড্রাগনের মত, কোনটা পক্ষিরাজ বা অর্ধ-মানুষ অর্ধ-ঘোড়া—অনবরত ওঠানামা করছে আর ঘুরছে। প্রকাণ্ড অর্গানটাব গর্জন—আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি কোনদিন জানতে পারবে না।...একটা নীল চক্‌চকে হাতীর ওপর উঠে বসল জিনেৎ ও আঁদ্রে। বাতাস বইতে শুরু করেছে হঠাৎ, আড়ষ্ট আবহাওয়াটা কেটে গেল।

গলা জড়াজড়ি করে নেমে এল দুজনে। কেউ কোন কথা বলতে পারল না। ঠিক এই রকম মুহূর্তে ভয় হয় কথা বলতে, ভয় হয় এমন কি পাশ ফিরে তাকাতে বা হাত নাড়তে—পাছে মুহূর্তের সুখটুকু ছিটকে বেরিয়ে যায়।

প্রথমে জিনেৎই সচেতন হয়ে উঠল। কেমন একটা ভয় পেয়ে বসল তাকে—যদি সে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে না যায় তবে তাকে দুঃখ পেতে হবে! তার মনের এই ভীতিবোধ কোন ক্ষণস্থায়ী আবেগপ্রসূত নয়, এমন একটা কিছু যা জোরালো ও সর্বগ্রাসী। ওদেব দুজনের মিলন কখনো সম্ভব নয়। একই ধরনের অশান্তিতে ওরা ভুগছে; একই জাতের মানুষ ওরা...কি বলেছিল আঁদ্রে? হ্যাঁ, এক ধবনেব গাছ আছে যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে ভেসে বেড়ায়। আঁদ্রের সঙ্গে? না, না, তা তো ব্যাভিচার!

জিনেৎ বলল, 'আঁদ্রে, এবার আমাকে যেতে হবে। ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

স্কোয়ারের যে দিকটা অন্ধকার সেখানে একটা বাদামগাছ, গাছের ডালে বিক্ষিপ্ত একটা লণ্ঠন, পাতাব ফাঁকে ফাঁকে সেই আলোর রেখা—তারই তলায় দাঁড়িয়ে জিনেৎ সস্নেহে চুম্বন করল আঁদ্রেকে। জিনেতের মুখচোখে কেমন একটা বৈরাগ্যের ভাব ফুটে উঠেছিল। আঁদ্রেকে পুরুষ হিসেবে দেখেছে বলে নয়, এই চুম্বন জিনেতের একটা নিজস্ব দান। দুই ভীরু হাতে জিনেৎকে ধরবার চেষ্টা করল আঁদ্রে, কিন্তু জিনেৎ সরে গেল, 'না, না,...'

কেন নয়, সে কথা আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল না। নিঃশব্দে দুজনে প্লাস কঁত্‌র এস্‌কার্প-এ ফিরে এল, নিঃশব্দে বিদায় নিল পরস্পরের কাছে।

অন্যান্য অভিনেতারা জিনেতের এই গোপন অনুরাগীর প্রসঙ্গ তুলে তাকে নিয়ে

নানারকম ঠাট্টাতামাসা করল। জিনেৎ জবাব দিল না। বড় তৃষ্ণার্ত সে, খানিকটা টক মদ খেয়ে ফেলল জলের মত। মদ্যপানের ফলে তার শরীর আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠল, কপালের দু পাশে রগ দুটো লাফাতে লাগল ভীষণভাবে। অর্গানটা সমানে সেই হতাশ প্রেমের কাহিনী বলে চলেছে। জিনেতের মনে অস্পষ্টভাবে একটা চিন্তা এল, এইভাবে প্রেম নিবেদন এক হাতীরাই করতে পারে বোধ হয়। সেই নীল হাতী···কি করেছিল সে? চিৎকার করে একসঙ্গে অনেকগুলো কথা এখন বলতে পারলে যেন ভাল হয়।

সে বলল, 'কি মজার ব্যাপার! মেয়েটিকে ওরা সারা জীবন লুকিয়ে রাখল। মেট্রোতে। না, তার চেয়েও গভীর—খনির ভেতরে। আরো গভীর—নরকে। তারপর ওরা ওকে বাইরের পৃথিবীতে বার করে এনে বলল—ছুটে বেড়াও, হাসো, নিশ্বাস নাও! কিন্তু ও বলল—না। কেন? কারণ, ও ছুটতে পারবে না, হাসতে পারবে না, নিশ্বাস নিতে পারবে না। না, না।'

'কি ছাইভস্ম বকছ? কে বলেছে এসব কথা?'

'পাঠ্যপুস্তকের দেবী। আমার পরিচিত একজন লোক দেবীকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। তোমার ভয় নেই, মারেশাল। সেই লোকটি তুমি নও। অভিনেতাদের মধ্যে কেউ নয়। লোকটি একটি ভাটিখানার মালিক। কিংবা হয়ত আমি নিজেই সেই লোকটি। সে যাই হোক না কেন, কিছু আসে যায় না।'

'নিজেকে তুমি সংকুচিত করছ জিনেৎ। তোমার স্বভাবই এই!'

'জানি না। আমি এখন কথা বলতে চাইছি, কিন্তু বলতে পারছি না। আচ্ছা মারেশাল, বলতো তুমি কোনদিন সুখকে কল্পনা করেছ?'

'না, একবারও না। কেউ তা পারে না।'

'ভুল। তুমি ভুল বলছ, মারেশাল। আমি তো সব সময়ে এই চিন্তাই করি। অন্য সবার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, দেখ, সুখকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কত যত্ন করে ওরা—কাঁচের ঢাকনা দেয়, মাখনের মত কলাপাতায় মুড়ে রাখে। আর নাচে, অবিরাম নাচে। আজও নাচছে। সেই লাইনটা মনে আছে তো—লিসবন মুছে গেছে, কিন্তু প্যারীর নাচ শেষ হয়নি। সে সময়ে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল। হ্যাঁ, এখন আর একটা ভূমিকম্প হওয়াও আশ্চর্য নয়। কিংবা হয়ত নতুন একটা আগ্নেয় পর্বত লাভাবর্ষণ করবে। মড়কও দেখা দিতে পারে, বোমা পড়তে পারে আকাশ থেকে। কি হবে জানি না...কিন্তু এই সুখ কী ভঙ্গুর! সাবধান মারেশাল, নিশ্বাস বন্ধ করে রাখ!'

কথা বলতে বলতে দুই গাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে। ভোর হতে আর বিশেষ দেরী নেই। বাড়ী ফিরে চলেছে সবাই। জিনেতের ঠিক পাশেই কে যেন বারবার বলছে :

'ভয় কি, ডার্লিং, কাল আবার আমরা নাচব।'

দিনের আলোয় ভূতের মত দেখাচ্ছে লোকগুলোকে। স্কোয়ার জনশূন্য। এখানে ওখানে আবর্জনার মত ছড়িয়ে আছে মাড়িয়ে-যাওয়া ফুল, গোলাপফুলের পাপড়ি, সিগারেটের টুকরো, বোতলের ছিপি আর পট্‌কা।

আঁদ্রে যখন স্টুডিওতে ফিরে এল, সূর্য তখন সমুদ্রের মত প্রসারিত ছাদগুলোর ওপরে উঠে এসেছে। ঝলসে উঠছে, কেঁপে কেঁপে উঠছে চারদিক। জানলার পাশে আঁদ্রে বসল। ধীরে ধীরে একটা বিষণ্ণতা নেমে আসছে তার মনের ওপর। কোন কিছু ভুলতে পারছে না সে; অনেক দূরে একটা অন্ধকার মাতাল রাত্রির পটভূমিকায় কৃত্রিম পত্র-বেষ্টিত চীনে লণ্ঠনের ঝাড় সামনের ওই সূর্যের মত এখনো দ্যুতিমান। দ্রুত পাক খাচ্ছে বহুরূপী। হ্যাঁ, সব কিছুই তো এই রকমই আবর্তনশীল—একে দেখা বা বোঝা অসম্ভব। ঝড় ও অরণ্যের সময়ের হিসেব এক নয় নিশ্চয়ই।

সেজানের যে কথাগুলো বহুবার আঁদ্রে মনে মনে ভেবেছে, তা আবার মনে পড়ল তার—'প্রকৃতিকে দীর্ঘকাল পর্যবেক্ষণ করতে পারলেই তবে সত্যিকার দেখা হয়, আকস্মিকতার প্রভাব বা ভুল-দেখার সম্ভাবনা থাকে না। তারপর চিন্তা থেকে চেতনা আসে।' নিভৃত আই-তে কত সুন্দর তাঁর জীবন! সেই সময়টাই ছিল অন্য রকম। কিন্তু জিনেৎ বলেছে, 'না, না।' কী না? কামনা? আশা? পরিচিতি?

ইতিমধ্যেই সূর্য আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে। চোখ ধাঁধানো আলোর নীচে শহরটা নিঝুম, ঘুমন্ত; আর সেই আলো চারদিকের সমস্ত রং শুষে নিচ্ছে। অন্ধের মত আঁদ্রে তাকিয়ে রইল পৃথিবীর দিকে; এই পৃথিবী আজও তার কাছে দুর্বোধ্য। জুলাই মাসের সোনালী রৌদ্রে স্নাত হয়ে বসে থাকতে থাকতে এক সময়ে সে ঘুমে ঢলে পড়ল।

২২

জেনারেল পিকার্ যখন তার হালকা যুদ্ধ ঘোড়াটার ওপর চেপে বসেন, ভারী সুন্দর দেখায় তাকে। মরক্কো জঙ্গী-বাহিনীর পুরোভাগে তাকে দেখে মনে হয় যেন কোন প্রাচীন সামরিক চিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতি বছর ১৪ই জুলাই তারিখে সামরিক কুচকাওয়াজ হয়। যারা ভীড় করে দেখতে আসে, তাদের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। সামরিক সাজ-পোষাক দেখার জন্যে কিছু কিছু বেশভূষাপ্রিয় লোকও আসে, আর আসে দলে দলে ছেলে-মেয়ে। কিন্তু এ বছর কুচকাওয়াজ দেখবার জন্যে অন্য ধরনের দর্শকও এসেছে। সাঁজ-এলিজের নিয়মিত আগন্তুকরা চলে গেছে সমুদ্রতীরে বা নির্ঝরিণী উৎস-মুখে, পারীর সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে এখন শহরতলীর লোকদের ভীড়। পথে ঘাটে যাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে তারা সকলেই মজুর। শুধু দু-একটা রাস্তার কোণে ব্রতৈলের অনুগামী কয়েকজন উদ্ধত যুবক দাঁড়িয়েছে, পরনে ফিটফাট পোষাক মাথায় 'বেরে' টুপি। মাঝে মাঝে তারা চিৎকার করে বলছে, 'সামরিক বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক।' শ্রমিকরা জবাব দিচ্ছে, 'রিপাব্লিক-বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!' যদিও রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রায় সত্তর বছর হতে চলেছে, তবুও এই চিৎকারের ভেতর কোথায় যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ছিল এবং ফলে প্রায়ই সংঘর্ষ বাধছে।

কিছুদিন হল সংবাদপত্রে যুদ্ধের আশঙ্কার কথা ফলাও করে ছাপা হচ্ছে, সেই সঙ্গে রাইন ও আল্পস্-এর অপর দিকে নানা অমঙ্গলসূচক কার্যকলাপ সংগঠিত হবার বিবরণ। অনেক আশা নিয়ে জনসাধারণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল— শিরস্ত্রাণ আঁটা সৈনিক, গোলন্দাজ বাহিনী, প্রফুল্ল দর্শন বৈমানিক। লোরেন্ আর শাঁবর-এর সুরে সামরিক সংগীত ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে অবিশ্রান্তভাবে, বড় রাস্তার ধারে ধারে দৃঢ় পদক্ষেপে ঋজু ভঙ্গীতে মার্চ করে চলেছে শ্রেণীবদ্ধ বাহিনী। কিন্তু যে দৃশ্যটি জনতার হৃদয় জয় করল তা হচ্ছে সেনাবাহিনীর গঠন—বহু বিভিন্ন দৈর্ঘের মানুষ একসঙ্গে জড়ো হয়েছে, ক্ষুদ্রাকার বামনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলেছে বিরাটাকার দৈত্য। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা নেই, যেন কোন দূর অভিযানের পথে পা বাড়িয়েছে সকলে। দর্শকরা বুঝতে পারল, ওরা তাদেরই আপনার লোক।

'বেরে' মাথায় যে যুবকের দল দাঁড়িয়েছিল তারা প্রবল উৎসাহে অভিনন্দন

জানাল পিকার্কে, দেখাদেখি জনতাও যোগ দিল তাদের সঙ্গে। সেনাপতি হিসেবে পিকারের অতীত জীবন অত্যন্ত গৌরবময়। দু-বার সে যুদ্ধে আহত হয়েছে এবং একজন বীর যোদ্ধার গুণাবলী তার ভেতর পূর্ণমাত্রায় বিগুমান। কিন্তু আজ পিকারের মুখে একটা অবজ্ঞার হাসি এবং এই হাসির ভেতর তার মনের ভাবটা সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। কুচকাওয়াজ দেখবার জন্তে এবার যে অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়েছে, তা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছে পিকার্। এই ছোটলোকগুলোর ওপর তার মরক্কো বাহিনীকে লেলিয়ে দিতে পারলে কি খুশিই না হয় সে! ঘাড় টান করে সোজা সামনের দিকে সে তাকিয়ে রইল—যেন তাকে দু পাশের এই অপ্রীতিকর দৃশ্য না দেখতে হয়। চোখের সামনে ফুটে উঠল আর্ক ছ ত্রিওঁফ, অতীতের বড় গৌরবময় স্মৃতি বহন করে আজও যা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু আজকের এই পরিবেশের সঙ্গে স্মৃতি-স্তম্ভটার কোন সামঞ্জস্য নেই—কতগুলো ওঁছালোক আজ কর্তৃত্ব করছে শহরের ওপর, লাল ঝাণ্ডা উড়ছে চারপাশে আর তার মত যোদ্ধা ও সেনাপতিকে কিনা আদেশ নিতে হচ্ছে একদল ভুঁইফোড় আর রাজমিস্ত্রীর কাছ থেকে।

একদল শ্রমিক দাঁড়িয়েছিল আর্ক ছ ত্রিওঁফের সামনে। কাছাকাছি পিকার্ পৌঁছতেই মিশো চিৎকার করে উঠল,'রিপাব লিক বাহিনী—' সঙ্গে সঙ্গে ব্রতৈলের অনুগামী যুবকরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের ওপর। পুলিশের তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্ বেজে উঠল। কান খাড়া করে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পিকারের ঘোড়াটা। কিন্তু সেদিকে একবার ফিরেও তাকাল না পিকার্, শুধু তার নাসিকা আর একটু কুঞ্চিত হয়ে উঠল এবং মনে মনে আর একবার সে বলল—ছোটলোক!

গত দু বছর ধরে সাঁজ-এলিজে ফ্যাশিস্টদের পবিত্র অধিকার রক্ষিত হয়েছে। বামপন্থী সংবাদপত্র বিক্রেতা, পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক শ্রমিক, ইহুদি ইত্যাদি লোকদের ওপর প্রতিদিন মারধোর করবার জায়গা এটা। কাফের বারান্দায় যে সব শৌখিন লোক দাঁড়িয়ে থাকে, তারা রোজ এই 'নানান তকমা-আঁটা যুবকদের' কার্যকলাপ দেখে এবং এই দৃশ্যে তারা অত্যন্ত অভ্যস্ত।

কিন্তু আজকের কথা আলাদা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আজ অনেক নতুন লোক এসেছে এখানে। আর্ক ছ ত্রিওঁফের সামনে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। ফ্যাশিস্টরা সজ্জিত হয়ে এসেছিল—রবারের ডাণ্ডা, ভারী মাথাওলা চাবুক আর ছুরি ছিল তাদের কাছে। রক্তাক্ত দেহে একজন শ্রমিক ধরাশায়ী হল। মিশোর চারপাশে একটা ব্যূহ সৃষ্টি হয়েছিল, মিশো চেষ্টা করছিল সেই ব্যূহ ভেদ করে

বেরিয়ে আসতে। হঠাৎ তীব্র একটা ব্যথা সে অনুভব করল—যেন কেউ তার পিঠের ওপর চাবুক বসিয়েছে। এক হাতে একটা দরজার হাতল চেপে ধরে আক্রমণকারীদের ওপর সমানে ঘুষি চালাতে লাগল সে। প্রচণ্ড উৎসাহে পুলিশের দল ফ্যাশিস্টদের আড়াল করে দাঁড়াল। ব্রুম বা ভাইরারের চিন্তা একবারও তাদের মনে এল না—নিতান্ত অভ্যাসবশেই তারা বেছে বেছে এমন সব লোকদের ওপর লাঠি চালাতে লাগল যাদের সাজপোষাক ভাল ছিল না, এবং সাঁজ-এলিজের লোকজনদের রক্ষা করল সম্পূর্ণভাবে। মিশোর কমরেডরা ছুটে এল তাকে উদ্ধার করবার জন্যে। ফ্যাশিস্ট দলের একজন চেষ্টা করল মিশোকে ঘুষি মেরে ফেলে দিতে কিন্তু মিশো তাকে হটিয়ে দিল।

মার্চ করে যাবার সময় সৈনিকরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল এই হুটোপাটি।

গায়ের কোটটার দিকে তাকিয়ে মিশো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, ছুরির ফলা লেগে চিরে গেছে কোটটা। সেই ব্যথাটা এখন আর নেই কিন্তু তার পিঠের খানিকটা জায়গা পুড়ে যাওয়ার মত লাল টকটকে হয়ে রয়েছে। কমরেডরা তাকে একটা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল। 'হারামজাদারা আমার সব চেয়ে ভাল কোটটাই নষ্ট করেছে!' কথাটা বারবার বলে সবাইকে হাসিয়ে তুলল সে।

কুচকাওয়াজ শেষ হবার পর দ্রুত লাঞ্চ খেয়ে নিল পিকার্। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অসামরিক বেশে সে রওনা হল শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলের দিকে। প্রতিটি গ্রামে তার গাড়ী থামাতে হল কারণ রাস্তা বন্ধ করে যুবকের দল নাচ শুরু করে দিয়েছে। চারদিকের এই হৈ-হল্লায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল তার। চোখ বুজে রইল সে,—এই হারমোনিয়ম আর বাঁশী স্তব্ধ করবার জন্যে যে কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত আছে!

ফের্তের কাছে ছোট্ট একটা ঘরে ব্রতৈল তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। জায়গাটা এত সুন্দর আর নির্জন যে প্রণয়-কাব্যের কথা মনে পড়ে, এটা যে ষড়যন্ত্রকারীদের মিলন স্থান তা ভাবাও যায় না। মার্ন নদীর খাড়াই পাড়ের ওপর তৈরী ঘরটা, বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় একদিকে নদী আর বুনো ঘাস-ঢাকা দ্বীপ, অন্যদিকে প্রান্তরের পটভূমিকায় উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের ভেতর মুখ গুঁজে অলস ভঙ্গীতে দাঁড়ানো গরুগুলো বিচিত্র বর্ণের ফুটকির মত। বারান্দার গায়ে পাক খেয়ে খেয়ে লতানো গাছের ঝাড় উঠেছে, বাতাসে লতা-ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

স্বাভাবিক কর্কশ ও নিরানন্দ গলায় একটা ধাতব আওয়াজ তুলে ব্রতৈল গত কয়েক দিনের ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেল।

সে বলল, 'তেসা বেশ খানিকটা শক্তি সঞ্চয় করেছে, কিন্তু এই বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পার্লামেন্টে হওয়া সম্ভব বলে আমি মনে করি না। স্প্যানিয়ার্ডরা শিগ্‌গিরই একটা কিছু করবে। যদি তারা পপুলার ফ্রন্টকে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়, তবে আমরাও ওই পথে চলব—আগামী শরৎকালের মধ্যেই।'

সাঁজ-এলিজের জনতার দৃশ্যটা পিকারের মনে ভেসে উঠল।

সে বলল, 'এ বিষ সহজে ছাড়বার নয়। অনেক কিছুই ধ্বংস করতে হবে। সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কি রকম ব্যবহার পাওয়া যাবে তা বলা শক্ত। আর সাধারণ সৈনিকরা না থাকলে শুধু অফিসাররা আর কি করতে পারে? অবাস্তব কল্পনা। কি হবে জানি না। তুমি কিসের ওপর ভরসা করে আছ?'

ব্রতৈল বলল, 'একথা আলোচনা করবার সময় এখনো আসেনি। ড্যুসেলডর্ফের কাছ থেকে যা অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে, ধরতে গেলে তা অবশ্য কিছুই নয়। কিন্তু তোমার ওই কর্নেল যা দিয়েছে তার তুলনায় যথেষ্টই বলতে হবে। আর একটা কাজ যদি করতে পার তো ভাল হয়। সাধারণ সৈন্য সমাবেশের কি পরিকল্পনা আছে, তা জানতে হবে। বুঝতে পারছ বোধ হয় যে এই নির্বোধগুলোর ওপর ভরসা করে কোন লাভ নেই। আমি চাই না যে আমরা প্রস্তুত হবার আগেই অতর্কিতভাবে যুদ্ধ শুরু হোক...'

পিকার অন্য দিকে তাকিয়ে রইল। ব্রতৈলের প্রতি সে একাগ্রভাবে অনুরক্ত, কিন্তু আজ এই প্রথম ব্রতৈলের কথায় তার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে: এই অনুরোধ রক্ষা করা কি উচিত? পুরুষানুক্রমে সামরিক কাজে নিযুক্ত—এমন একটি বংশে পিকারের জন্ম। সেনাবাহিনী সংক্রান্ত সমস্ত কিছুকে অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করে সে। অনেক যুদ্ধের স্মৃতি, অনেক পরিবেশের ঐতিহ্য, জেনা থেকে শুরু করে ভের্দ্যঁ পর্যন্ত অনেক প্রখ্যাত নাম জড়িয়ে আছে এই মনোভাবের সঙ্গে। সাধারণত সে স্থির-মস্তিষ্ক, কিন্তু আজ সে ছেলেমানুষের মত উত্তেজিতভাবে কথা বলতে লাগল।

'আমি ভেবেছিলাম, যুদ্ধ শুরু হলে আমরা সমস্ত মতভেদ ভুলে এক হয়ে দাঁড়াব।'

কিছুক্ষণ বারান্দায় পায়চারি করল ব্রতৈল, তারপর এসে দাঁড়াল পিকারের একবারে সামনাসামনি।

বলল, 'আমিও তাই ভেবেছিলাম। আমার দেশপ্রেমকে তুমি সন্দেহের চোখে দেখছ না আশা করি। আমরা দুজনে একসঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে দিন কাটিয়েছি, দুজনের শ্রেষ্ঠ বন্ধুদের হারিয়েছি সেখানে। কিন্তু আমায় বিশ্বাস কর, আজ আর জাতির প্রশ্ন উঠছে না—ক্ষমতার আসনে বিশেষ একটা দল জুটেছে। এর বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াব, এমন কি সেজন্যে যদি আমাকে জার্মানদের সঙ্গে হাত মেলাতে হয়—তবুও। ভগবান করুন তা যেন না হয়। কথাগুলো মুখে বলাটাই শক্ত, কাজে পরিণত করা তো আরো শক্ত। সেজন্যে দরকার চরিত্রের দৃঢ়তা ও অতিমানবিক ইচ্ছা-শক্তি। কিন্তু যাই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই—এরা যদি জয়লাভ করে, তবে ফ্রান্স জয়যুক্ত হবে না, জয়যুক্ত হবে বিপ্লব।'

পিকার্ বলল, 'কিন্তু সেনাবাহিনী? সেনাবাহিনীর কি হবে?'

'সেনাবাহিনীর সাহায্যেই ফ্রান্সের পুনর্জন্ম সম্ভব। তা যদি না হয়? তা না হলে এবারের মত ফ্রান্সের পালা ফুরলো। আগামী একশো বছর...'

দূরের বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে তাকিয়ে পিকার্ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি যেন সে ভাবছে; কিন্তু একটা অসহ্যরকমের উজ্জ্বল আলো ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পেল না। কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে সে: এক একবার ইচ্ছা হচ্ছে চিৎকার করে ওঠে, কাঁচের পাত্রগুলো ভেঙে ফেলে টুকরো টুকরো করে, চলে যায় এখান থেকে। কিন্তু লতাফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়েছে চারদিকে, বাতাসে মৌমাছির গুঞ্জন। পিকারের আবার মনে পড়ল সাঁজ-এলিজের সেই জনতার দৃশ্য। ছোটলোক! না, এটা ফ্রান্সের আসল রূপ নয়! ব্রতৈল ঠিক কথাই বলেছে। এর চেয়ে হিটলার ভাল। অবশেষে পিকার্ কথা বলল, গলায় স্বর কেমন চাপা ও নিষ্প্রাণ, নিজের গলার স্বর নিজের কাছেই অচেনা ঠেকছে।

সে বলল, 'তোমার কথা যদি সত্যি হয় তবে একথা মানতেই হবে যে ভয়ংকর একটা দুঃখকে তুমি গ্রহণ করেছ। আর যদি ভুল হয়ে থাকে... না, একথা আমি ভাবতে চাই না! আদেশ পালন করতে আমি অভ্যস্ত। এখন আমি সর্বস্ব ত্যাগ করছি—শুধু জীবন নয়, সম্মান...'

শহরে ফিরবার পথে ব্রতৈলের সঙ্গ পিকার্ প্রত্যাখ্যান করল। কিছুক্ষণ একা

থাকতে চাইছিল সে। গাড়ীতে বসে আবার সে চোখ বুজল, একটা উৎকণ্ঠিত বিহ্বলতা আচ্ছন্ন করল তাকে, চারদিকে তেমনি উদ্দাম আনন্দোচ্ছ্বাস, বহুরূপীদের বাঁশী আর্তনাদ করছে তেমনি বিরক্তিকরভাবে। প্যারীর উপকণ্ঠে এসে তার গাড়ী আটকে গেল, সামনের পথ বন্ধ—প্লাস দ্য লা বাস্তিল থেকে মিছিল ফিরে আসছে। একটা কাফের বারান্দায় একদল সৈনিককে দেখে শ্রমিকরা চিৎকার করে উঠল, 'রিপাব্লিক-বাহিনী দীর্ঘজীবী হোক!' চোখের ওপর দু হাত চেপে ধরে ভ্রূকুটি করল পিকার, তারপর গাড়ীচালককে বলল, 'অন্য কোন পথে যাবার চেষ্টা কর,—অন্য যে কোন পথ, যেদিকে তোমার খুশি, কিন্তু যত তাড়াতাড়ি পারো আমাকে নিয়ে চল, সময় নেই আমার...'

২৩

মিছিল এগিয়ে চলল সারা দিন ধরে। দশ লক্ষেরও ওপর লোক যোগ দিয়েছে মিছিলে। এর যেন শেষ নেই, চলেছে তো চলেছেই—প্লাস দ্য লা বাস্তিল, প্লাস দ্য লা রিপাব্লিক, প্লাস দ্য লা নাসিয়ঁর ভেতর দিয়ে, সরু সরু রাস্তা ঘুরে, চওড়া বুলভারের ওপর দিয়ে। এক একবার মনে হচ্ছে, মিছিল বুঝি এবার শেষ হল, কিন্তু পর মুহূর্তেই নতুন নতুন দল বেরিয়ে আসছে চোখের সামনে।

এ বছরের মিছিল কিছুটা অন্য ধরনের, এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বিজয়ী শ্রমিকদের সাধারণ সহৃদয়তার জন্যে। গত বছরেও এই একই দিনে এবং এই একই রাস্তায় মিছিল বেরিয়েছিল, কিন্তু তার রূপটা ছিল সংগ্রামের—আর আজকের মিছিল দেখে মনে হয় যেন একটা মেলা বসেছে। ভবিষ্যৎ সংগ্রামের কথা ভাবছে খুব কম লোকেই। সবাইকে আচ্ছন্ন করেছে একটা ক্ষমতাবোধ : 'আট লক্ষ লোক মিছিলের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছে! দশ লক্ষ! পনের লক্ষ!...'

শহরের অর্ধেক জায়গায় পুলিশ নেই। পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়েছে সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করছে শ্রমিকরা নিজেরাই। মারামারি নেই, ঝগড়া নেই, গালাগালি নেই—ছুটির দিনের মত প্যারী মেতে উঠেছে গানে আর নির্দোষ ঠাট্টা তামাসায়।

ফ্রান্সের চারদিক থেকে প্রতিনিধিরা এসেছে। পিকার্ডির খনি-মজুররা এসেছে ধুলো আর কয়লা মাখা পোষাক পরে, সেফটি-ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে। লম্বা বাঁশের মাথায় কাগজের তৈরী আঙুর ফল ঝুলিয়ে মার্চ করছে দক্ষিণাঞ্চলের আঙুর-ক্ষেতের মজুররা। আলসাসের মেয়েরা তাদের চিরাচরিত পোষাক পরে জাতীয় সংগীত গাইছে। ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে ব্রেতঁরা—জটিল বহুস্বময় ব্যাগপাইপ। স্যাভয়-এর পার্বত্য-অধিবাসীরা নাচ শুরু করে দিয়েছে রাস্তায়।

ভূতপূর্ব সামরিক কর্মচারীরাও যোগ দিয়েছে মিছিলে। যাদের পা নেই—তাদের ঠেলে নেওয়া হচ্ছে ছোট ছোট গাড়ীতে, অন্ধদের হাত ধরেছে গাইডরা। যুদ্ধে বিকলাঙ্গ লক্ষ লক্ষ লোক অনেক আশা নিয়ে বারবার চিৎকার করছে, 'যুদ্ধ নিপাত যাক!'

মিছিলের আগে আগে চলেছে বিশ-ত্রিশ জন ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধ—ওরা প্রত্যেকেই পাকা লোক, প্রত্যেকেই গত পারী-কমিউনে অংশ গ্রহণ করেছিল। কোন এক সময়ে—যখন বয়সে ওরা তরুণ—মঁমার্ত্র ও বেলভিল-এর রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড খাড়া করেছিল ওরা। আজ ওরা তাকিয়ে আছে পৌত্র প্রপৌত্রদের বিজয় অভিযানের দিকে, স্মিত হাসি ফুটে উঠেছে কুঞ্চিত বিবর্ণ ঠোঁটের ওপর।

গর্বিত ভঙ্গীতে নতুন রেশমী ঝাণ্ডা তুলে ধরে ইয়ং কমিউনিস্টরা চলেছে—হালকা বাতাসে ঝাণ্ডা উড়ছে, সংগ্রাম-প্রতীকের মত। অল্প কিছুকাল আগে মৃত ম্যাক্সিম্ গোর্কীর কয়েকটি ছবি রয়েছে ওদের সঙ্গে। কল্পীয় স্বকীয়তায় উজ্জ্বল গোর্কীর মুখখানি ভেসে রয়েছে মিছিলের লক্ষ মানুষের মাথার ওপর।

দলের পর দল এগিয়ে চলেছে—ধাতু-শ্রমিকদের পর চামড়া-কলের মজুর, তারপর লেখক, ছাত্র, রেগুলেসন ক্যাপ মাথায় গ্যাস কোম্পানীর কর্মচারী, অভিনেতা, দমকল-কর্মচারী, হাসপাতালের নার্স, তারপর আরও ধাতু-শ্রমিক ও চামড়া-কলের মজুর।

পারী হয়ে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা ভেলার মত, জাহাজ ডুবির পর বিভিন্ন দেশের লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। যে সব আশ্রয়প্রার্থী চারদিক থেকে এসে রাজধানীতে বসবাস করছে, তারাও আজ যোগ দিয়েছে ফরাসীদের সঙ্গে। খানিক পরে পরেই বিদেশী লোকের গলা শোনা যাচ্ছে নানাদিক থেকে, আর সেই সব বিদেশী শব্দ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে ঝাণ্ডা আর পতাকার পটভূমিকায়। নেপ্‌ল্‌স্ ও সিসিলির রাজমিস্ত্রী, অসতুরিয়ার বীর, অস্ট্রিয়ার দর্জি ও ময়রা,

পোলাণ্ড ও রুমানিয়ার কোণঠাসা এলাকার ইহুদী—পালিশওলা, মুচি, সাইনবোর্ড-লেখক, সাংহাইয়ের ছাত্র, আনামদেশীয়, আরব, নিগ্রো—সবাই যোগ দিয়েছে মিছিলে আর 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইছে এক সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

টুপি-কারখানার মজুররা প্রকাণ্ড একটা ক্যাপ এনেছে—সেই রকমের ক্যাপ যা ফরাসী শ্রমিকদের চিরাচরিত মস্তকাবরণ। ক্যাপটার তলায় লেখা—'হে সর্বহারা, এ তোমার রাজমুকুট!'

লোহা-মজুরদের হাতে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল—পিংক্, প্যান্সি, নানা জাতের। তাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে হাস্যমুখী তরুণী ফুলওয়ালীরা, রূপোর তৈরী প্রকাণ্ড একটা হাতুড়ি তাদের হাতে।

প্লাস দ্য লা বাস্তিল থেকে পোর্ং দ্য ভ্যাঁসেন্ পর্যন্ত আগাগোড়া রাস্তাটার দু ধারে ধূসর নোংরা বাড়ীগুলো লাল হয়ে উঠেছে। জানলায় জানলায় লাল পর্দা, লাল কার্পেট, লাল কাপড়, ব্যালকনিতে ব্যালকনিতে লাল পোষাক পরিহিত স্ত্রীলোক আর রাস্তার ওপর জড়ো করা হয়েছে যত রাজ্যের লাল ফুল। পপি, পিংক্, তিউলিপ—বোধ হয় ফ্রান্সের যেখানে যত লাল ফুল আছে, সমস্ত উজাড় করে আনা হয়েছে সেদিন।

ছোট ছোট ডানপিটে ছেলেরা গাছের ডালে উঠেছে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়ুই পাখীর মত। আজ ওদের প্রচণ্ড ফূর্তির দিন। কিছুক্ষণ আগে ওরা বিশ্বাসঘাতক এরিওর কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। মুসোলিনির ফাঁপাফুলো মূর্তিটা ঝুলছে ফাঁসি কাঠে, তার পাশেই কম্বলের তৈরী নকল-হিটলার। রণ-পার ওপর দাঁড়ানো কিম্ভূতকিমাকার লম্বাটে মূর্তিটা ক্রুঁয়ার।

'সীন' কারখানার শ্রমিকরা চারদিক থেকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হচ্ছে। বাস্তিল কারাগারের একটা মডেল রয়েছে ওদের সঙ্গে, মডেলটার ওপর লেখা—'ভুলবেন না যে একদিন আমরা বাস্তিল কারাগার অধিকার করেছিলাম! ভুলবেন না যে আজ আবার নতুনভাবে বাস্তিল অধিকারের দায়িত্ব এসেছে!' দলটির আগে আগে চলেছে ব্লিশো, লেগ্রে আর পিয়ের।

প্লাটফর্মের ওপর বহু লোক দাঁড়িয়ে; মন্ত্রীরা আছে, আছে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, লেখক, শ্রমিক, কমিউনিস্ট ও র‍্যাডিকাল। ব্লুমের মুখে বিষণ্ণ হাসি। দালাদিএ গম্ভীর—কতগুলো একগুঁয়ে রেখা ফুটে উঠেছে মুখের চারপাশে, মুষ্টি-করা হাতটা ওপরের দিকে তোলা। ভীইয়ার আপন মনে বলে চলেছে—'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ...'

'সীন' কারখানার দলটি যখন প্লাটফর্মের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, কে যেন পিয়েরকে ডেকে বলল, 'ছ্যাবোয়া, ভীইয়ার তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছে।'

সমাজতন্ত্রী দলের সভ্য, সাম্প্রতিক ধর্মঘটে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, এই প্রতিভাশালী তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের কথা ভীইয়ার শুনেছে এবং সরকারী কাজকর্মের ভেতরেও পার্টির প্রতি দায়িত্ব সে ভুলে যায়নি। বন্ধুত্বপূর্ণভাবে পিয়েরের হাতটা ঝাঁকিয়ে সে বলল:

'সাবাস! কমিউনিস্টরা বলে আমরা বিপ্লবী চেতনা হারিয়ে ফেলেছি। এই অভিযোগের বিরুদ্ধে সব চেয়ে ভাল উত্তর তুমি।'

'ধন্যবাদ।' পিয়ের এত বেশী লজ্জা পেয়েছিল যে এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারল না।

ভীইয়ার বলল, 'তোমার বাবাকে আমি চিনতাম মনে হচ্ছে। তোমার দেশ পেরপিঞাঁ—নয় কি?'

যৌবনের কোন ঘটনাকে ভীইয়ার ভোলেনি। গতকাল যে ডেপুটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে আজ হয়ত তার কথা আর মনে থাকে না কিন্তু এখনো সে স্পষ্ট মনে করতে পারে তার বাল্য-বন্ধুদের কথা, শহরে শহরে বক্তৃতা দেওয়া, অনেকদিন আগেকার নানা সম্মেলন।

'তোমার বাবা এবং আমি একবার একটা মিছিল বার করে ফেরেরো নামে একজন স্প্যানিয়ার্ডের মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। তোমার কাছে এখন এই ফেরেরো নামটার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কিন্তু সে সময় সমস্ত দেশ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। আমাদের দেশের জনসাধারণ সত্যিই আশ্চর্য! আন্তর্জাতিক ঐক্যবদ্ধতার মনোভাব! সংবেদনশীলতা!... আচ্ছা, আবার দেখা হবে, তোমার সাফল্য কামনা করি!'

পুরনো দিনের কথা মনে পড়তেই ভীইয়ার বিচলিত হয়ে উঠেছে। তার মনে হচ্ছে যেন এই ইঞ্জিনিয়ারের মতই সেও এখনো তরুণ ও দুর্নিবার। মিছিলটাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছে সে এখন। শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে সেও যেন পা ফেলে এগিয়ে চলেছে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। স্কাউটদের দিকে তাকিয়ে উৎসাহের সঙ্গে সে টুপি নাড়তে লাগল।

ভীইয়ারকে যে আবার বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনল সে হচ্ছে র‍্যাডিকাল ডেপুটি পিরু। পিরু যে কেন এই মিছিলে এসেছে কেউ বলতে পারবে না। সকলে বেশ ভালভাবেই জানে যে পপুলার ফ্রণ্টকে সে ঘৃণা করে। হয়ত সে এসেছে

হিসেব নেবার জন্যে কোন্ মন্ত্রী কতটা জনপ্রিয়। নির্বাক মূর্তির মত সে দাঁড়িয়ে, সমবেত সংগীতে যোগ দিচ্ছে না বা অভিনন্দনের উত্তরে কোন কথা বলছে না। পিরেনিজোরিয়ঁতাল অঞ্চল থেকে সে নির্বাচিত, ওখান থেকে রওনা হয়ে এইমাত্র সে পারী পৌঁচেছে। ভীইয়ারকে পাশে দেখতে পেয়ে সে কাজের কথা পাড়ল।

'প্রিফেক্টের কাছে আমি শুনেছি, কোন কোন অঞ্চলে ওরা এতদূর অগ্রসর হয়েছে যে জোর করে জমি দখল করতেও বাধেনি। স্প্যানিয়ার্ডদের দেখাদেখি ওরা এই সব করছে। এবং সব জায়গাতেই দলের চাঁই হচ্ছে এই সব বিদেশী মাল। আমাদের ওখানে বহু ক্যাটালোনিয়ান শ্রমিক আছে। আগে ওদের শেখানো হত যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করবার কোন অধিকার বিদেশীদের নেই। কিন্তু কমিউনিস্টরা যে দিন থেকে এই লোকগুলোকে সংগঠিত করতে শুরু করেছে সে দিন থেকে দিন ঘুরে গেছে। অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক...'

ভীইয়ার জানে যে পিরু তেসার বন্ধু এবং এই জন্যেই পিরুকে রীতিমত সম্মান করে চলে সে।

সে বলল, 'আমি আজই দরময়েব সঙ্গে কথা বলব। রাজনৈতিক আন্দোলনে বিদেশীদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে, এ কথা না বললেও চলে। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে প্রচলিত নীতি থেকে আমরা কিছুতেই বিচ্যুত হব না। আমাদের ওপর একটু বিশ্বাস রাখুন, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে...'

ধন্যবাদ জানিয়ে পিরু চলে গেল। একজন কমিউনিস্টকে চুপি চুপি ভীইয়ার বলল, 'এই তেসার দলকে যদি না থামাতে পার তো আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না।'

ভীইয়ার মনে করে যে এইভাবে কথা বলতে পারাটাই খাঁটি রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় এবং এইভাবে চাল দিতে পারলেই তার জয়ের পথ সুনিশ্চিত।

ছোট শহর লাঁ-র প্রতিনিধিরা এই সময় প্ল্যাটফর্মের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। প্রতি-নিধিদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ, পরনে ভেলভেটের জ্যাকেট, নীচের ঠোঁটে একটা সিগারেটের টুকরো লেগে রয়েছে। রবিবারের পোষাকে চারজন তরুণ শ্রমিক আছে এই দলে। তাদের সঙ্গে যে পতাকা রয়েছে তার গায়ে লেখা—'লাঁ-র অধিবাসীরা ফ্যাশিস্টদের জয় হতে দেবে না।' ভীইয়ার ভাবল, হয়ত লাঁ-তে সবশুদ্ধ তিনশো শ্রমিক আছে, তার বেশী নয়...' তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'ছেলেমানুষ!'

উত্তেজিত ও উৎফুল্ল পিয়ের ছুটে এসে নিজের লাইনে দাঁড়াল। ভীইয়ায়ের সঙ্গে তার কথাবার্তার কথা কাউকে বলল না সে, তার ভয় ছিল যে মিশোর বিদ্রূপে সমস্ত মাধুর্য নষ্ট হয়ে যাবে।

সকালবেলার সংঘর্ষ, নিজের কোটের দফারফা—এসব কথা মিশো বহুক্ষণ আগেই ভুলে গেছে। তার পিঠটা জ্বালা করছিল কিন্তু তবুও তার আনন্দ কমেনি। মিছিল আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে। শহরতলীর তোরণের কাছাকাছি আসবার পরেই হঠাৎ সে চুপ করে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠতে শুরু করেছে একে একে—সাংকেতিক চিহ্ন, পেট্রলের পাম্প, দোকানের সাইনবোর্ড, সবুজ, হলদে, লাল—যেন শহরের বাইরে প্রকাণ্ড একটা ফুলের বাগান।

'ব্যাপার কি, মিশো? উৎসাহ ফুরিয়ে গেছে?'

'না। গরম লাগছে!'

জামার আস্তিন দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে হঠাৎ সে বলল, 'আমি এখন ব্লাঁকার জীবনী পড়ছি। জান, বইটা পড়ে আমার হিংসে হচ্ছে। একটা চমৎকার জীবন, আর সব চেয়ে বড় কথা, সে জীবনে কোন জটিলতা নেই। কয়েকটি দিনের ব্যারিকেড, তারপর সারা জীবন কারাবাস। এমন কি তারাভরা আকাশের কথাও সে লিখে গেছে। সেকালে মরতে পারাটাই একমাত্র কাজ ছিল। কিন্তু এখন তোমাকে বাঁচতে হবে—যাই ঘটুক না কেন। কাজটা অনেক বেশী শক্ত, কিন্তু না করে উপায় নেই।'

অবাক হয়ে মিশোর কথা শুনল পিয়ের। হঠাৎ পিয়ের বুঝতে পারল—মিশোর চিন্তাধারা জটিল হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের মূল নীতিগুলো একটা আবেগপ্রবণ প্রকৃতি ও গভীর দুঃখবোধকে লুকিয়ে রেখেছে—যেমন রাখে পশুর গায়ের লোম বা মাটির ওপরকার ঘাস। এবং পশুর লোমের মত বা ঝড়বিক্ষুব্ধ ঘাসের মত তার জীবনের এদিকটাও মুখ্য ও সংবেদনশীল।

পিয়ের বলল, 'তুমি অনেক ওপরে উঠে গেছ, মিশো। তোমাকে আমি একজন কমরেড ছাড়া কিছু ভাবতাম না। কিন্তু এখন...এখন তুমি নেতৃত্বও করতে পার।'

ছেলেমানুষের মত একটা মুখভঙ্গী করল মিশো, তারপর শিস দিয়ে উঠল সুকণ্ঠী পাখীর মত। চমৎকার শিস দিতে পারে মিশো।

পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল মিছিল আর একটা অবিচ্ছিন্ন গুঞ্জনের মত শোনা যেতে লাগল, 'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ...'

২৪

পরদিন সকালে এক মাসের ছুটি নিয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল। পিয়েরের কাছে ছুটির দিনগুলোর বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে—নীল আর সোনালী ভ্রমণ বিজ্ঞাপনের মত।

এক সপ্তাহ আগে আনে চলে গেছে। কঁপারনোর কাছে পাহাড়ে জমির ওপর একটা জেলেকুটির ভাড়া নিয়েছে সে। বাড়ীটা দেখতে একটা ছোট শাদা বাক্সের মত। সেখান থেকে নীচের দিকে তাকালে দেখা যায় স্ত্রীলোকেরা বসে বসে নীল জাল সারাচ্ছে আর লাল রঙের পালগুলো ফুলে ফুলে উঠেছে বাতাসে। একদিকে ফাঁকা সমুদ্র, জোরে বাতাস বইছে সব সময়ে, উঁচু উঁচু ঢেউ উঠছে আর অবিশ্রান্ত গর্জন করছে আটলাণ্টিক।

ঘরটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পিয়ের। চুনকাম করা ঝকঝকে ঘর, দেওয়ালে অনেকগুলো তৈল-চিত্র। মাছের গন্ধ সর্বত্র—বিছানার চাদর, পরদা, এমন কি দেওয়ালে পর্যন্ত।

পারীর খবরে বোঝাই হয়ে সে এখানে হাজির হয়েছে। ভীইয়ারের সঙ্গে তার যা কথাবার্তা হয়েছিল, তা গর্বের সঙ্গে বলল আনের কাছে, মিছিলের বর্ণনা দিল বিস্তৃতভাবে এবং ফ্যাশিস্টদের ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করল। কিন্তু আনে কোন রকম উচ্চবাচ্য করল না দেখে চটে উঠল সে সে কি কোনদিন ওকে তার উদ্দেশ্যের যাথার্থ্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারবে না? এই কথাই সে ভাবতে লাগল মনে মনে।

সে বলল, 'এই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যা জীবনকে সার্থক করে তুলতে পারে। একথা কি তুমি বোঝো না?'

'না। আর বুঝতেও চাই না। এটা একটা খেলা এবং খুবই খারাপ খেলা। সমস্ত ব্যাপারটার ভণ্ডামি আমি অনুভব করতে পারি। হাতের জিনিস কে ছেড়ে দেয়? ভীইয়ার?......অন্য সবার মতই ও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। এটা কি তুমি দেখতে পাও না যে সব মানুষই শেষ পর্যন্ত সেই এক রকমই থেকে যাচ্ছে?'

'আমরা ওদের নতুনভাবে শিক্ষিত করে তুলব।'

'না, তা সম্ভব নয়। তোমরা যা করছ তা সম্পূর্ণ অন্য কিছু: তোমরা ওদের নতুনভাবে চিত্রিত করছ। ও কাজটা সহজ, কিন্তু বলো তো কী বিশ্রী একঘেয়ে কাজ! শুধু একঘেয়ে নয়, অসাধুও বটে!'

পিয়ের এসে পৌঁছবার প্রথম দিনেই এইভাবে ওরা তর্ক করল। তারপর পিয়ের নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিল ছুটি উপভোগ করবার কাজে। তিন দিন সে কিছু করল না বা কিছু ভাবল না, প্রাণভরে স্নান করল আর শুয়ে রইল বালির ওপর, পাহাড় বেয়ে বেয়ে চূড়ায় উঠল আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে রইল তীরের ওপর আছড়ে পড়া ক্রমবর্ধমান ঢেউয়ের দিকে। ভূমধ্য সাগর অঞ্চলে সে অনেকবার গিয়েছে এবং সেখানকার মৃদু অলস সৌন্দর্যের সঙ্গে সে পরিচিত। কিন্তু আট-লান্টিক মুগ্ধ করল তাকে। প্রথম প্রথম মনে হল, চারদিকে অসহ্য রকমের চাঞ্চল্য, যেন আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় প্রকৃতি প্রহর গুণছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে বুঝতে শুরু করল যে এই মৃত্যুহীন উন্মত্ততা তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। এখানে বাতাসের এত শক্তি যে দরজা খোলা অসম্ভব, মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাতাস, নীচু নীচু শক্ত গাছগুলোকে দুমড়ে ফেলে—এই বাতাস ভাল লাগছে তার।

তিন দিন কাটল এইভাবে। রৌদ্রদগ্ধ হল পিয়েরের মুখ, পরিশ্রুত হল তার সমগ্র সত্তা। এমন শত শত জিনিস—পারীতে থাকবার সময় যা জরুরী বলে মনে হত—এখন শুধু অবজ্ঞার হাসি উদ্রেক করছে। অন্যদিকে, আপনা থেকেই উদ্ঘাটিত হচ্ছে নতুন নতুন জগৎ: সার্ডিন মাছের অদ্ভুত জীবন এবং স্ব-নির্ধারিত ও স্ব-নিয়ন্ত্রিত সমুদ্র পথে যাতায়াত, সামুদ্রিক লতার গন্ধ, রাত্রির আকাশে গুচ্ছ গুচ্ছ তারা।

খবরের কাগজ এত দেরীতে আসত যে পুরনো হয়ে যেত সমস্ত সংবাদ। একটা পোর্টেব্‌ল্ রেডিও সঙ্গে এনেছিল পিয়ের, একদিন সে রেডিওটা খুলে দিল সংবাদ শুনবার জন্যে। স্টক এক্স্‌চেঞ্জের দর, চীনা জাপানী ঘটনা, কোন ব্যবসায়ী ভোজ সভায় তেসার বক্তৃতা—এই পর্যন্ত শোনার পর বিরক্ত হয়ে পিয়ের বাইরে চলে গেল কাঁকড়া ধরতে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনে। এবার সে পরিপূর্ণভাবে সুখী হবে। পারীতে থাকবার সময় পিয়ের সম্পর্কে তার মনে একটা অস্বস্তি ছিল এবং ঘটনার প্রতি পিয়েরের আগ্রহ দেখে তার মনে একটা হিংসার ভাব জাগত। জন্মের দিন থেকেই যে কঠোর জীবনযাত্রায় সে অভ্যস্ত, তা এত গভীরভাবে বেলভিলের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে ঘটনার প্রতি আগ্রহশীল হওয়ার দিকে ঝোঁক থাকা তার পক্ষেও অস্বাভাবিক ছিল না—কিন্তু ভাসাভাসা

তত্ত্বমূলক কথাবার্তা, রাজনৈতিক দলাদলি এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতির বক্তৃতা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না সে; এই সমস্ত কিছুকে রাজনীতি নাম দিয়ে এক কথায় বাতিল করে দেয়। একটিমাত্র বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে এবং তা হচ্ছে কোন ব্যক্তি বিশেষের ভাগ্য। এই জন্যেই গত ধর্মঘট সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না কিন্তু পিয়েরের কাছে ক্ল্যমাঁসের কথা শুনে সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল যেন পিয়ের তার চোখের জল না দেখতে পায়। পপুলার ফ্রণ্ট সম্পর্কে পিয়েরের উদ্দীপনা তার কাছে মনে হয় যেন একই বিন্দুর চারপাশে বারবার পরিক্রমণ, এক ধরনের ঘূর্ণাবর্ত। মনে মনে সে বলে, ঠিক এই জন্যেই মানুষ প্রাণ দেয় না! অবশ্য এই মনোভাবের পেছনে তার অবচেতন মনের আত্মাভিমানও কিছুটা আছে। জীবনে এই প্রথম সে নির্ভরতা ও শান্তির আস্বাদ পাচ্ছে এবং তার মনে সব সময়েই এই ভয় রয়েছে যে হঠাৎ এর পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। অন্তঃসত্ত্বা হবার পর যখন দুটি জীবনের দায়িত্ব এসেছে তার ওপর—এই মনোভাব আরো বাস্তব ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। আর আজ পিয়ের রেডিও না শুনে উঠে গেল—এই ঘটনাটা মুক্তির পূর্বাভাস বলে মনে হল তার কাছে।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় ঝড় উঠল একবারে হঠাৎ। পিয়ের ও আনে বসে ছিল সমুদ্রের ধারে বালির ওপর, হঠাৎ বাতাসের ধাক্কায় একরাশ বালি ঘুরতে ঘুরতে ওপরে উঠে গেল। চোখ বোঁচ করে রইল আনে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চারদিকে তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল। প্রচণ্ড ঢেউয়ে নৌকোগুলো আছড়ে পড়ল তীরের ওপর, তীক্ষ্ণ আর্তনাদ তুলে বাতাস ছুটল কানের পাশ দিয়ে। পিয়ের ও আনে বাড়ী ফিরে এল কোনরকমে।

জানলার পাশে আনে বসল সেলাই নিয়ে। অন্ধকার হয়ে আসছে, তবুও ওরা আলো জ্বালল না। প্রচণ্ড আক্রোশে ফুলে ফুলে ওঠা গাঢ় বেগুনী সমুদ্র অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। এই রুদ্রতাণ্ডবের মাঝখানে ওদের অস্বস্তি লোপ পেয়েছে যেন, অত্যন্ত তীব্রভাবে ওরা অনুভব করছে প্রেমের উত্তাপ ও সজীবতা।

অলস ভঙ্গীতে বেতার যন্ত্রটার সুইচ ঘুরিয়ে দিল পিয়ের। সবুজ আলোটা জ্বলে উঠল এবং মর্সের তীক্ষ্ণ, কর্কশ, পরিচিত শব্দটা মিশে গেল সমুদ্র-গর্জনের সঙ্গে।

একটি ইংরেজী ঘোষণা : 'সাধারণভাবে বলা চলে স্টক একসচেঞ্জের দর ওপরের দিকে উঠছে। আজ 'রয়েল ডাচ' আরো দু পয়েন্ট বেশী...'

নৃত্য-বাদ্য।

একটি জার্মান গান : 'প্রিয়তমা হে সুন্দরী..'

'পারী ইল্ দ্য ফ্রাঁস বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি। এবার মোরিস শেভালিএ গান গাইবেন—পারী আজো সেই পারীই আছে...'

'ল্যুক্স্ ভ্যাকুয়াম-ক্লিনার কিনুন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে 'ল্যুক্স্' কোম্পানী আজ বেতার-শ্রোতাদের কাছে একটি নাটক উপস্থিত করছেন—একটি অদৃশ্য ধূলিকণা।'

ইতালী। ফ্যাশিস্ট পার্টির সেক্রেটারীর বক্তৃতা : 'তরুণ সৈনিকদের আমরা এমন-ভাবে শিক্ষিত করছি যেন তারা প্রকৃতই সাহসী হয়'...আবার নৃত্য-বাদ্য।

সাইকেল প্রতিযোগিতা : 'পো কারকাসন্ মাঠে বেলজিয়ান গ্রেনেট যে দুরন্ত অতিক্রম...'

'সময়-সংকেত শুনুন! ঠিক চতুর্থ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনউইচ সময়ের সন্ধ্যা সাতটা হবে। আজকের সংবাদ...'

'দুই হাজার নিহত...'

সেলাই করতে করতে আনে থেমে গেল। বেতার যন্ত্রটাকে প্রাণপণে দুই হাতে চেপে ধরল পিয়ের।

কিন্তু ঘোষণাকারী শান্তভাবে বলে চলেছে : 'বার্সেলোনায় কলম্বাস হোটেলের ওপর কামানের গোলা ছোঁড়া হয়েছে। মাদ্রিদে সরকারপক্ষীয় বাহিনী শ্রমিকদের সহযোগিতায় বিদ্রোহীদের লা মনতানা ব্যারাক থেকে বিতাড়িত করেছে। বেলভিল-এর শ্রমিক অঞ্চল ত্রিয়ানা অধিকার করবার জন্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। জেনারেল আরান্দা অভিএদো অধিকার করেছেন। বার্গোস-এ ব্যাপকভাবে হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে..'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল পিয়ের। বাইরে প্রচণ্ড ঝড় গ্রাস করেছে পৃথিবীকে, লাইট হাউসের আলো কাঁপছে উঁচু উঁচু ঢেউয়ের মাথায়, সেনাবাহিনীর মত ঢেউয়ের পর ঢেউ ফেটে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে, অনেক নীচে দপ্ দপ্ করছে লাল লাল আলো, প্রচণ্ড শক্তিশালী সাইরেনের মত গর্জন করছে সমুদ্র। ঘরে ফিরে এল পিয়ের, জলের ছাঁট লেগে মুখটা ভিজে গেছে। আনে দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে, শান্ত স্বরে বলল :

'আমি ট্রেনের সময় দেখে রেখেছি, সকাল ছটায় একটা ট্রেন আছে, সন্ধ্যার সময় পারী পৌছবে।'

অন্ধকারে আনে পিয়েরকে চুম্বন করল তারপর দুজনে চুপ করে বসে রইল ভোর পর্যন্ত! বাইরে সমস্ত রাত ঝড়ের মাতামাতি চলল সমানভাবে, থামবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

২৫

হলের ভেতর ঢুকতে না পেরে হাজার হাজার লোক বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পিরেনিজ-এর অপর দিকে গুলির আওয়াজে জেগে উঠেছে পারী, উত্তেজিত জনতা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে যাতায়াতের পথে, আঁকড়ে ধরেছে গ্যালারি, ওপরে উঠেছে প্ল্যাটফর্মের পা বেয়ে। বাস্কাইয়োজ-এর গুলি চালনার কথা বলবার সময় কেঁপে উঠল কার্ন্যা-র গলা। 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান ভেসে এল বাইরে রাস্তা থেকে—কখনো গম্ভীর শপথ উচ্চারণের মত, কখনো দ্রুত ও উত্তেজিত।

একজন বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের ওপর। শুকনো মুখ, পরিষ্কার দাড়িগোঁফ কামানো, কপালে গভীর বলি-রেখা যা স্প্যানিশ মুখগুলোতে সাধারণত একটা বিষণ্ণতার ছাপ এনে দেয়। লোকটির নাম মুনে, কর্মজীবনে শিক্ষক, মাদ্রিদ ইউনিয়নগুলোর নেতা। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তৃতা এবার শুরু হবে! কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মুনে, ব্যথায় অর্ধ-উন্মুক্ত মুখ। প্ল্যাটফর্মের ওপর থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বলল:

'ওরা ওর ছেলেকে খুন করেছে......'

তখন স্প্যানিয়ার্ডটি চিৎকার করে উঠল:

'অস্ত্র চাই।'

সমস্ত হল প্রতিধ্বনি তুলল, 'অস্ত্র চাই!' রাস্তা থেকে উত্তর ভেসে এল, 'অস্ত্র চাই! অস্ত্র চাই!'

তারপর বক্তৃতা দিলেন একজন অধ্যাপক। একজন র‍্যাডিকাল হিসেবে তিনি পরিচিত, প্রকৃতিটা খামখেয়ালী, আজীবন প্রবল সমর্থন জানিয়েছেন ওড-এর মদ্য-উৎপাদকদের প্রস্তুত মদের নাম 'শ্যাম্পেন' রাখবার সংগ্রামকে, ড্রেফুসকে, ইংরেজ ভোটাধিকার আন্দোলনকারীদের এবং আবিসিনিয়ার রাজাকে।

বক্তৃতায় তিনি 'নির্ভীক নিঃশঙ্ক যোদ্ধা'র কথা বলে স্প্যানিয়ার্ডদের প্রতি 'নৈতিক সমর্থন' জানালেন।

সর্বশেষে উঠল মিশো, বলল, 'ফ্রাঙ্কোকে মুসোলিনি যে সব ইতালীয়ান বোমারু বিমান পাঠাচ্ছে, তার একটা ফ্রান্সের জমিতে নেমেছে। আমরা জানতে পেরেছি যে ইতালীয়ান সপ্তপঞ্চাশত্তম ও অষ্টপঞ্চাশত্তম এবং হিটলারের 'ঙাংকার' বিমান-বাহিনী বিদ্রোহীদের সাহায্যে প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের কমরেডদের টোটা-বন্দুক ছাড়া কিছু নেই। পপুলার ফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা দাবী তুলব—স্পেনের জন্যে বিমান!'

হলের ভেতর আবার মিলিত ধ্বনি উঠল, 'স্পেনের জন্যে বিমান!' 'স্পেনের জন্যে বিমান!'—কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ল ভাগ্রাম বুলভারে, প্লাস দ্য লে-তোয়াল-এ, পথে-ঘাটে-মাঠে। সেই বিরাট জনতা-সমুদ্র এক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হতেই কে যেন সরু কর্কশ গলায় আবার শুরু করল, 'স্পেনের জন্যে......' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাগরিক কোলাহলকে ডুবিয়ে দিয়ে শহরের কেন্দ্রস্থলে আর একবার ফেটে পড়ল কথাগুলো লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত সেই শব্দ আঘাত করল মেট্রোর সুড়ঙ্গ ও বাড়ীর দেওয়ালে, জাগিয়ে তুলল ঘুমন্ত শহরতলীকে।

সভার শেষে মিশো পিয়েরকে একপাশে ডেকে নিয়ে বলল:

'বিশেষ করে বিমান সংগ্রহের চেষ্টায় মুনে এখানে এসেছে। একজন বিশেষজ্ঞ হিসেবে এবিষয়ে তোমার যথেষ্ট সাহায্য করতে পারা উচিত।'

মুনে পারীতে এসেছে কুড়িটা বোমারু বিমান কিনবার জন্যে। তিনটে দিন সে কাটিয়েছে সরকারী আপিসে আপিসে ঘুরে। সব জায়গাতেই তার প্রতি ব্যবহার সহৃদয় কিন্তু সবার মুখেই এক কথা—'বিষয়টি বিবেচনা করে দেখা হবে।' শিল্পপতি ম্যিয়েজারের সঙ্গে দেখা করেছে সে! ম্যিয়েজার তার বক্তব্য শুনেছে মন দিয়ে, তারপর তার সামনে সিগারেটের প্যাকেট খুলে ধরে মৃদু হেসে অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেছে, 'যত তাড়াতাড়ি ফ্রাঙ্কো জিতবে ততই মঙ্গল।'

মিশো বলল, 'দেসেরের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখ। ব্যবসায়ের দিক থেকে প্রস্তাবটা লাভজনক, হয়ত সে রাজী হতে পারে।'

পিয়েরের সঙ্গে বাইরে আসবার সময় মুনে তার কাছে স্পেনের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

'শুধু রিভলবার, টোটা-বন্দুক আর ছোরা নিয়ে আমরা যুদ্ধ করছি। একটা অসম্ভব ছেলেমানুষি এবং রীতিমত ভয়ংকর ব্যাপার! চাষীদের হাতে অস্ত্র

বলতে আছে মান্ধাতা আমলের ছোট ছোট কামান। দু-এক সপ্তাহের মধ্যেই হয়ত সব শেষ হয়ে যাবে—ওরা চারদিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। 'সাভোয়া' আর 'জাংকার' প্রচুর পেয়েছে ওরা, আর আমাদের সম্বল হচ্ছে মাত্র দশটা যাতায়াতী বিমান। বোমা ফেলবার জন্যে বিমানগুলোর তলায় ফুটো করে নিতে হয়েছে। ফেলে-দেওয়া ছেঁড়া জুতোও ওর চেয়ে বেশী দরকার! ওগুলোকে মাটিতে ফেলতে হলে গুলির দরকার নেই, ইঁট ছোঁড়াই যথেষ্ট। এখানে এসে আমি সবাইকে বলেছি—যদি আমরা হারি তাহলে তোমাদেরও রক্ষা নেই, কিন্তু কেউ আমার কথা বোঝেনি।'

চারদিকে তখনো বহু কণ্ঠের চিৎকার উঠেছে—'স্পেনের জন্যে বিমান!'

মুনে হাসল, 'এদের হাতে যদি থাকত তবে বিমান পেতে কোন অসুবিধা হত না।'

পরদিন সকালে পিয়ের গেল দেসেরের সঙ্গে দেখা করতে। দেসের তার সঙ্গে দেখা করতে দেরী করল না। সোজাসুজি কথা আরম্ভ করল পিয়ের।

বলল, 'যখন ধর্মঘট চলছিল, আমরা দুজনে বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলাম। কিন্তু আজ আমি যে জন্যে এসেছি সেটা কারখানা সংক্রান্ত কিছু নয়। স্পেনের সরকারী কর্তৃত্ব তো আর কমিউনিস্টরা করছে না, করছে জিরল বা আজানার মত তোমারই সহ-মতাবলম্বী লোকেরা। বোমারু বিমান ওদের দরকার। তোমার কাছে ওরা কুড়িটা 'এ ৬৮' বিমান নগদ দামে কিনতে চায়।'

দেসের হাসল, 'নগদ দাম' ব্যাপারটা খুবই ভাল। তোমার ধারণা বোধ হয় এই যে, দেসেরকে টাকার লোভ দেখিয়ে হাত করা যায়।' হ্যাঁ ভাল কথা, মিয়েজারের কাছে শুনলাম, স্প্যানিয়ার্ডরা কাল ওর কাছে গিয়েছিল। ও বেশ গর্বের সঙ্গে আমাকে বলল—'আমি ওদের সোজা পথ দেখিয়ে দিলাম। নিজের শ্রেণীর প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করি না।' এ কথা শুনে তুমি প্রতিবাদ করবে না নিশ্চয়ই—কারণ ওর যুক্তিটা তোমাদের মতই মার্কস্‌বাদী।'

'আমি মিয়েজার-এর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি। মিয়েজার তো ফ্যাশিস্ট। কিন্তু তুমি...'

'আমি সর্বপ্রথমে ফরাসী, তারপর অন্য কিছু। স্পেনের চেয়েও শান্তি রক্ষার কাজটা আমার কাছে বেশী মূল্যবান।'

'প্রতিবেশী সরকারের কাছে তুমি যদি বিমান বিক্রী কর তো কে বাধা দিতে পারে?'

'বোকার মত কথা বোলো না! যদি আমি ওদের কাছে কুড়িটা 'এ ৬৮' বিক্রী করি, ইতালীয়ানরা এক সপ্তাহের মধ্যে আরো চল্লিশটা 'সাভোয়া' পাঠাবে। এইভাবে ব্যাপারটা বহুদূর পর্যন্ত গড়াবে .....অবশ্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোর চেয়ে আজানাকে আমি বেশী পছন্দ করি। স্প্যানিয়ার্ডদের সাহায্যের জন্যে আমি তোমাকে এক লক্ষ ফ্রাঁ দেব; শুধু একটা শর্ত থাকবে, এই টাকা যে আমার কাছ থেকে তুমি পেয়েছ তা প্রকাশ করতে পারবে না। কিন্তু কোন বিমান আমি বিক্রী করব না। ফ্রান্সের শান্তি ভঙ্গ হতে পারে এমন কোন ঝুঁকি আমি নিতে প্রস্তুত নই। কথায় বলে, অপরের গায়ের কামিজের চেয়ে নিজের গায়ের চামড়ার কদর বেশী।'

'তাহলে ওদের এই পরাজয় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া আমাদের আর কিছু করবার নেই? এর চেয়ে নীচতা আর কি হতে পারে! মিয়েজারকে আমি বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি!...সেদিন রাত্রে যে সব কথা বলেছিলে মনে আছে? মুনেকে আমি কি করে বলি যে তুমি বিমান বিক্রী করতে রাজী হওনি?'

কথা বলতে বলতে দু হাতে ঘুষি পাকিয়ে পিয়েব ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করতে লাগল। ক্লান্ত বিদ্রূপাত্মক দৃষ্টিতে দেসের তাকিয়ে রইল তার দিকে—মনে মনে পিয়েরকে পছন্দ করে সে। পিয়ের প্রায় চলে যাচ্ছিল এমন সময় দেসের তাকে আবার থামিয়ে বলল:

'শোন, এগারটা 'এ ৬৮' আর্জেনটাইনের অর্ডার আছে। মন্নু নামে একজন লোকের সেগুলো নেবার কথা। ওর কাছ থেকে বিমানগুলো কিনে নাও, ও নিশ্চয়ই রাজী হবে। দেখতেই পাচ্ছ, এই কেনাবেচার ফলে আমি নিজে এক পয়সাও পাচ্ছি না। যদি তুমি মনে কর যে স্প্যানিয়ার্ডরা এতে রক্ষা পাবে, বেশ তো ভালই। আমি কথা দিচ্ছি যে মন্নু রাজী হবে। আর এই রকম যোগাযোগের ফলে মাল নেবার সময় বিশেষ কিছু গোলমাল হবে না। একথা কেন বলছি জান,—আমার দৃঢ় ধারণা ব্লুম যদি জানতে পারে, একটি বিমানও বাইরে নিয়ে যেতে দেবে না।'

'অসম্ভব! তাই যদি হয় তো আমি ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করবো।'

'ঠিক এই মুহূর্তে ভীইয়ারের পেছনে ছোটাছুটি করাটা আমি পছন্দ করি না। তোমাদের মত কল্পনাবিলাসীদের নিয়ে যে কি হবে! এই নাও মন্নুর লাইসেন্স। এখন তুমি খুশি তো?'

অন্যমনস্কভাবে দেসেরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভীইয়ার তৎক্ষণাৎ ছুটল মন্নুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

পাশপোর্ট অনুসারে মনু রুমানিয়ান বংশজাত এবং হনডুরাসের অধিবাসী। বহুকাল থেকে সে পারীতে বসবাস করছে এবং নিজেকে সে ফরাসী বলেই মনে করে। নানা ধরনের সন্দেহজনক আদান প্রদানে সে লিপ্ত এবং এখন তার লাল হয়ে ফেটে পড়বার মত অবস্থা। যেখানে যত দালাল, এজেন্ট আর জুয়াড়ী আছে, তাদের সকলের কাছেই স্পেনের ব্যাপারটা একটা মস্ত বড় দাঁও মারবার সুযোগ। মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা থেকে প্রতিদিন দলের পর দল প্রতিনিধি আসছে নগদ দামে যুদ্ধোপকরণ কিনবার উদ্দেশ্যে। এই সব দলে আছে বিভিন্ন মন্ত্রীদপ্তর ও ট্রেড ইউনিয়নের মুখপাত্র, সামরিক ব্যক্তি ও সাংবাদিক—রিপাব্‌লিকান, কমিউনিস্ট, এ্যানার্কিস্ট। এই সব প্রতিনিধি-দলের মধ্যে প্রায়ই কোন যোগাযোগ বা পরিচয় থাকে না, এবং মাঝে মাঝে এমন হয় যে বিভিন্ন দল বিভিন্ন সময়ে একই লোকের কাছে দরবার করতে ছোটে। তার ফল হয় এই যে প্রত্যেকেই এদের কাছ থেকে শেষ কপর্দক পর্যন্ত নিঃশেষ করে নেয়। বার্জোসের মুখপাত্ররাও চুপ করে নেই—তারাও অস্ত্রের সন্ধানে ঘুরছে। দিনের পর দিন দালালরা দর বাড়িয়ে চলল।

'এ ৬৮'-এর ব্যাপারটা শুনে তিনগুণ দর হাঁকল মনু, বলল, 'এর ফলে বুয়েনস এয়ারেস-এ একটা কিছু অপ্রিয় ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া আমার সঙ্গে কেনাবেচা করবার সুবিধা এই যে মাল নেবার সময়ে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ আমার কাছে লাইসেন্স আছে।'

'আরে না, না। লাইসেন্স আমি নিজেই নিয়ে এসেছি।'

মনু ভেবে দেখল—যার সঙ্গে সে কথা বলছে সে স্প্যানিয়ার্ড নয় যে বড় বড় চাল মারা চলবে, লোকটি একজন বিশেষজ্ঞ, 'সীন' কারখানার ইঞ্জিনিয়ার এবং দেসেরের বন্ধু, এর মত লোক তার সাহায্য না নিয়েই বিমান সংগ্রহ করতে পারে। হ্যাঁ, হয়ত পারে, কিন্তু তবুও তো তার কাছেই আসতে হয়েছে। এই সব ভেবে মনু বলল যে আগামীকাল সে পিয়েরকে ঠিক দর বলবে।

'আগামী কাল' শুনে মুনে বিষণ্ণভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। প্রায় এক সপ্তাহ পার হতে চলেছে!...তার একটা ধারণা হয়েছে যে মাদ্রিদ এবং রিপাব্‌লিকের ভাগ্য নির্ভর করছে এই বিমান পাওয়া না পাওয়ার ওপর। প্রতিদিন একই সংবাদপত্র একাধিকবার কিনে পড়ে সে, রেডিওর সংবাদ শোনে সব সময়ে এবং পিয়েরের সঙ্গে দেখা হলেই উত্তেজিতভাবে বলে:

'আল্‌টো দ্য লিয়ঁ......দুটো সাঁজোয়া গাড়ী......ইরানে ওরা মার খেয়ে পালিয়ে

আছে......সব চেয়ে বড় বিপদ এসত্রামাত্বরা ; মেদিনার দিকে ওরা অগ্রসর হচ্ছে। কিন্তু মেদিনা......মেদিনা......'

সে বুঝতে পারত না, এই অবস্থার মধ্যেও আশেপাশের লোকেরা কি করে ঠাট্টা-তামাসা, খাওয়া দাওয়া করে, ফুরফুর করে ঘুরে বেড়ায়, সিনেমা থিয়েটারে যায়। এই নির্লিপ্ততা দেখে পারীর ওপর চটে উঠেছিল সে এবং পিয়ের না থাকলে ফরাসীদের সে ঘৃণা না করে পারত না। কিন্তু পিয়েরের অবস্থাও তার মতই—তার মতই সে সান্ধ্য কাগজের সংস্করণ থেকে সংস্করণে দিন কাটাচ্ছে।

তৃতীয় দিনের দিন মস্থুর খুব নরম হল এবং মূল দরের ওপর শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়িয়ে বিমানগুলো বিক্রী করতে রাজী হল। বোমারু বিমানগুলো ছিল তুলুজের কাছাকাছি একটা বিমান ঘাটিতে। বিমান ক্রয়ের সংবাদটা মুনে মাদ্রিদে পাঠাল সাংকেতিক ভাষায়। সেই দিন সন্ধ্যায় সে পিয়েরের সঙ্গে তুলুজ রওনা হবার ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বিদেশী দূতের মারফৎ একটা তার এসে উপস্থিত: বোমারু বিমানের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। অন্তত আরো কুড়িটা বোমারু বিমান এবং ত্রিশটা 'দওয়াতিন' ধরনের ফাইটার চাই। ফরাসী সরকারের সাহায্য না নিয়ে এত প্রচুর সংখ্যক বিমান সংগ্রহ অসম্ভব—বিমান কারখানাগুলোর মালিক হয় দেসের কিংবা ফ্যাশিস্টরা। পিয়েরের ইচ্ছা ছিল, ভীইয়ারের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে পারীতে থেকে যায় কিন্তু মুনের দুর্ভাবনা ও ভয় হয়েছিল যে এই এগারটা 'এ ৬৮'ও বুঝি হাত ছাড়া হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, পিয়ের তুলুজ রওনা হবে আর মুনে একাই দেখা করবে ভীইয়ারের সঙ্গে।

মুনে বলল, 'আমি ওকে চিনি। আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে।'

স্টেশনে এসে পিয়ের আনেকে একটা পোস্টকার্ডে চিঠি লিখল, 'এক সপ্তাহের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।' যাত্রীতে ঠাসা একটা ট্রেনে উঠে বসল সে। আগস্ট মাসের গুমোট আবহাওয়া, যারা এতদিন পারীতে ছিল এবার তারাও চলেছে সমুদ্র বা পর্বতের দিকে। আশেপাশে যা কিছু কথাবার্তা হচ্ছে সবই স্নান, ভ্রমণ আর বেড়ানো সম্পর্কে, সেখানে নিজেকে বিদেশী বলে মনে হল পিয়েরের। খবরের কাগজটা খুলে পড়বার আগে মুনের মত সেও বারবার নিজের মনে বলতে লাগল, 'মেদিনা, মেদিনা'। একবার যদি সে তুলুজে পৌছতে পারে! খুব তাড়াতাড়ি তুলুজে পৌছে যাক, এ ছাড়া এখন

আর কিছু চায় না সে। তার ইচ্ছা হচ্ছে, ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পেছন থেকে জোরে ধাক্কা দেয় ট্রেনটাকে; আর এই স্টেশনগুলো অসহ্য। হঠাৎ ভীইয়ারের সহৃদয় ও আন্তরিক মুখের ছবিটা ভেসে উঠল পিয়েরের মনে, মনে পড়ল ঐক্যবদ্ধতা সম্বন্ধে ভীইয়ার কি বলেছিল। ট্রেনের কামরায় ধোঁয়া আর ভীড়, পিরেনিজ পর্বতশিখরে বিলাস ভ্রমণ ও স্নানের গল্প—তার মধ্যেই ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে পিয়েরের মনে একটা অস্পষ্ট চিন্তা এল, 'ভীইয়ারের কাছে সব পাওয়া যাবে। ভীইয়ার কখনো স্প্যানিয়ার্ডদের ত্যাগ করবে না।' ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

২৬

ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করতে এসে দূর অতীতের বহু স্মৃতি জেগে উঠল মুনের মনে। মনে পড়ল বাল্ কংগ্রেসের কথা, গির্জায় বুড়ো বেবেলের বক্তৃতা, মেয়ে-ভর্তি গাড়ী, অনেক রূপক, অনেক প্রতিজ্ঞা, অনেক অশ্রু। সেই সময়ে তখন সবেমাত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে—বার্ন-এ তার সঙ্গে ভীইয়ারের দেখা হয়েছিল। তারা দুজনে চেষ্টা করেছিল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে জোড়া-তালি লাগাতে, যেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক একটা চীনেমাটির বাসন। যুদ্ধের দায়িত্ব, ক্ষতিপূরণ এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির ওপর তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়েছিল সেখানে। তারপর ষোল বছর পার হয়েছে...ষোল বছর আগে ভীইয়ারের চুল ছিল কালো, গলার স্বর ছিল উদাত্ত। বুড়ো হয়ে গেছে ভীইয়ার। মুনেও হয়েছে...

ভীইয়ারের মনেও অনেক স্মৃতি জেগে উঠেছে। একটা অর্ধ-বিস্মৃতির ভেতর থেকে যৌবনের অনেক রূপরেখা ফুটে উঠেছে দুই পুরানো বন্ধুর মনে: প্লেখানভ, জোরে, ইগ্লেজিয়া। ভীইয়ার বলল, 'একটা বিশেষ বয়স পার হবার পর সমাধিক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোনদিকে যাবার পথ আর থাকে না। যেদিকেই তুমি তাকিয়ে থাক না কেন, কিছুই আসে যায় না, সমাধি থাকবেই।'

'সমাধি'—কথাটা জাগিয়ে তুলল তাকে, মনে পড়ল মুনে কেন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এই জন্যে সকাল থেকেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে সে। সরকারী বা পার্টি মুখপাত্র হিসেবে তার পক্ষে মুনের সঙ্গে দেখা করা সম্ভব

নয়। কিন্তু মুনে যে তার পুরনো বন্ধু—একথাও ভোলা অসম্ভব। আর একথাও বা সে ভোলে কি করে যে অনেক বিপদে পড়েই মুনে তার কাছে এসেছে ?

'তোমার দুঃখের কথা আমি শুনেছি।' বলল ভীইয়ার।

মুনে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। নিজের দুঃখের কথা সে কারও কাছে বলেনি। কিন্তু বিনিদ্র রাত্রিতে একটা হাসি-হাসি মুখের কথা কিছুতেই সে ভুলতে পারে না, তার ছেলে পেপ্‌কে স্পষ্ট দেখতে পায় সে। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক দুপুরবেলা। শাদা দেওয়াল, শাদা ধুলো। গরমে আর ক্লান্তিতে মুমূর্ষুর মত কেঁপে কেঁপে উঠছে মানুষ। চিলকোঠার ঘরে পেপ্‌কে দেখতে পেল ওরা, সেখান থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এল ওকে, তারপর গুলি করে মারল।

মুনের মনে হল যেন ভীইয়ার তার শরীরের চামড়া ছিঁড়ে অন্তস্থলকে উদ্‌ঘাটিত করেছে। একথা মনে হতেই দুঃখের অনুভূতিটা তীব্রতর হয়ে উঠল। চুপ করে রইল সে। ভীইয়ারই আবার কথা বলল :

'তোমার দুঃখ আমি বুঝতে পারি, বন্ধু। তিন বছর আগে আমি স্ত্রীকে হারিয়েছি। প্রিয়জনকে হারিয়ে বেঁচে থাকার মত দুঃখ আর নেই! 'অসহ্য। মাঝে মাঝে মনে হয়, বেঁচে থেকে লাভ কি?...'

মুনে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না যে ভীইয়ারের কথায় এমন কি আছে যে সে ক্রমশ বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছে; হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, ঘরের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত পায়চারি করে নিল একবার তারপর হঠাৎ এমনভাবে চেঁচিয়ে কথা বলতে শুরু করল যেন সে সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে।

'আমি এসেছি বিমানের সন্ধানে। আমাদের অবস্থা তুমি জান। যদি তোমরা সাহায্য না কর তবে আর আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না। পপুলার ফ্রণ্ট হচ্ছে সমাজতন্ত্রের শেষ সোপান। এও কি সম্ভব যে তোমরা আমাদের প্রতি সব দিক দিয়েই বিশ্বাসঘাতকতা করবে? একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে আর একজন সমাজতন্ত্রীকে আমি এই প্রশ্ন করছি। অতীত দিনের সবটুকুই তো এখনো একেবারে মুছে যায়নি! হ্যাঁ, সত্যি কথা, আমার ছেলেকে ওরা খুন করেছে। এ বিষয়ে কোন কথা আমি বলতে চাই না। কিন্তু খুন তো ওদের হাতে লেগেই আছে। কর্‌দোভায় গুলি চালনার কথা আজ আমি শুনলাম। ওরা মানুষ নয়—পিশাচ, উন্মাদ! অসভ্য বর্বর মুরদেরও ছাড়িয়ে

গেছে ওরা, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছে সব কিছু। কমরেড ভীইয়ার!...'

ভীইয়ার বলল, 'কিন্তু আমরা তো সর্বান্তকরণে তোমাদের সঙ্গেই আছি। নিজের কথা বলতে পারি, এই বিদ্রোহ শুরু হবার পর একটি রাত্রের জন্যেও আমি ঘুমোতে পারিনি। তোমাদের দুঃখকে আমি নিজের দুঃখ বলেই মনে করি। কিন্তু একথাও তোমাকে বুঝতে হবে যে এই দেশের জীবন রক্ষার দায়িত্ব আমাদের ওপর। ফ্রান্স চায় শান্তি। এর চেয়ে ট্র্যাজেডি আর কি হতে পারে! আর সত্যিই তো, অন্য একটা দেশের রাজনীতিতে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে—তা নিয়ে ফ্রান্সের একজন সাধারণ লোক মাথা ঘামাতে যাবে কেন?'

মুনে বলল, 'আমরা তো লোকজন চাইছি না, আমরা চাইছি বিমান। আগেকার চুক্তি অনুসারে তোমরা অনায়াসে আমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ বিক্রী করতে পার...'

'এই যুদ্ধটা যদি তৃতীয় কোন শক্তির বিরুদ্ধে হত তবে তো কোন প্রশ্নই উঠত না। কিন্তু এটা আসলে গৃহযুদ্ধ।' বলল ভীইয়ার।

'একটা আইনসম্মত সরকারকে বিদ্রোহীদের হাত থেকে রক্ষা করবার অধিকারও কি তোমাদের নেই?'

'ঠিক তা নয়। কথা হচ্ছে, আন্তর্জাতিক অবস্থাটাই জটিল। ফ্রাঙ্কোর পেছনে হিটলার আর মুসোলিনি রয়েছে। যদি আমরা তোমাকে বিমান দিই, তবে একটা মহাযুদ্ধ লেগে যেতে পারে।'

'তাহলে আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পথটাই তোমরা বেছে নেবে?'

'এভাবে ঘুরিয়ে বলে লাভ কি? তুমি নিজেই বুঝতে পারছ, আমরা চাই যে রিপাব্‌লিক জিতুক। কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। তোমার কাছে আমরা বিমান বিক্রী করতে পারব না। আচ্ছা সোজাসুজি শিল্পপতিদের কাছে গেলেই তো পারো? আমার দিক থেকে কোন বাধা আসবে না। শুধু একটু সাবধানে কাজ করলেই চলবে। আমরা ঘোষণা করবো যে আমরা তোমাদের কোন কিছু সাহায্য দেব না আর ওদিকে তোমরা মাল কিনবে আর চালান দেবে। আমরা দেখেও না দেখবার ভান করবো।'

'হয় তুমি আসল অবস্থাটা জান না কিংবা জানতে চাও না। এক সপ্তাহ হল আমি এসেছি। ফল কি হয়েছে? এগারটা 'এ ৬৮' তাও কি কম হাঙ্গামা! ভাগ্যিস হ্যবোয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমাদের এই কমরেডটি...'

'কে? ইঞ্জিনিয়ার? তাহলেই দেখ! তবুও তুমি আমাদের গালাগালি দাও। ওকে আমি চিনি, একজন চমৎকার কমরেড! বোমারু বিমান হিসাবে 'এ ৩৮' দারুণ ভাল। আরো বিমান পেতে বাধা কি?'

'না, ওরা আমাদের কাছে একটিও বিমান বিক্রী করবে না। আমরা যা-ই দাম দিই না কেন।'

'কিন্তু আমরা কি করতে পারি? ধরতে গেলে, বিমান বিক্রী করা বা না-করা ওদের মর্জি।'

'কিন্তু তোমরা আমাদের সামরিক বিমান তো দিতে পার।'

'আমাদের নিজেদের বিমানবাহিনী দুর্বল করে? না, কমরেড, না, অসম্ভব! র‍্যাডিকাল্‌রা কি বলবে কে জানে? ডজনখানেক বিমানের জন্যেই হয়ত মন্ত্রীসভার পতন হবে। তা যদি হয় তো তোমাদের পক্ষে সেটা আরো খারাপ। আমার কথাটা আর একবার বলছি—তোমরা যত খুশি মাল চালান দিতে পারো, আমরা চোখ বুজে থাকব। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে সাহায্য, এ্যাম্বুলেন্‌স্ কোর গঠন বা এই ধরনের অন্য কিছু করতে পারি এবং শিশুদের জন্যে রুটি ও জমানো দুধ পাঠাতে পারি। কিন্তু যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়া? না!'

'না'—কথাটা পর পর কয়েকবার উচ্চারণ করবার পর শান্ত হল ভীইয়ার, তারপর রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে ঘণ্টা টিপল।

'কি খাবে বল। চা? লেমনেড?'

মুনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল:

'মেদিনা অধিকৃত হবার অর্থ কি তুমি বোঝো? এখন ওরা কোলা-র বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছে। আমি কূটনীতিজ্ঞ নই। তাছাড়া, আমার বয়সটাও চৌষট্টি হয়েছে...আচ্ছা, কমরেড ভীইয়ার, আমার পক্ষে এখন যাওয়াই ভাল। আমার একটা ভয় ছিল যে তোমার কাছে হয়ত আমি সব কথা বলে ফেলব, কিন্তু সে ক্ষমতা নিয়ে আমি আসিনি.. শুধু বিমান সংগ্রহ করবার জন্যেই ওরা আমাকে পাঠিয়েছে।'

মুনে চলে গেল। ভীইয়ারের নীচের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল চাপা অসন্তোষে। এই কথাবার্তা তার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হয়েছে—যতটা সে আশা করেছিল তার চেয়েও বেশী। কিন্তু স্পেনের আশা ভরসা যে চুকেই গেছে, একথা এখন শিশুও বুঝতে পারে। খান কুড়ি বিমানের সাহায্য পেলেও কিছু পরিবর্তন হত না। ফ্রান্সে পপুলার ফ্রন্টকে রক্ষা করতে হবে। এই

সময়ে একটু অসতর্ক হলেই সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তখন ফ্রান্সেও ফ্রাঙ্কোর অনুগামী জুটবে। তা যদি হয় তো কে থাকবে ত্রাণ করবার জন্যে ?- লাঁ-র তিনশো শ্রমিক ? পাগলামি ! ওরা আমাদের অতল গহ্বরের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। কমিউনিস্টরা নয়, আমাদের নিজেদেরই দলের লোক ! অবশ্য মুনেকে বোঝা যায়—নিজের ছেলেকে হারানো তো আর ঠাট্টার ব্যাপার নয়। কিন্তু এমনি অবস্থা তো আরো অনেকের।

'বিমান !' তাহলে সে, ভীইয়ার, আর পার পাবে না। কিন্তু তার দোষ কি ? সত্যি, দেশ শাসন করতে হলে ওসব নীতি বজায় রাখা অসম্ভব। পিঠের ওপর এত বড় বোঝা থাকলে কাদায় পা ডুববেই। কিন্তু এ বোঝা না নিলেই পারত সে। একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন এর চেয়ে অনেক ভাল—শুধু ভোট দেওয়া আর মিছিলে পা মিলিয়ে চলা, তারপর 'কুঞ্জবনে পাখীর গান' শুনলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু কাউকে না কাউকে দেশশাসনও করতে হবে তো। এমন বহু কাজ আছে যা নাকি বিরক্তিকর ও অপ্রিয়—যেমন, মেথরের কাজ, কশাইয়ের কাজ, জেলখানার প্রহরীর কাজ। নিজের ওপরেই নিজের কেমন একটা করুণা হল ভীইয়ারের, চুপ করে বসে রইল পিঠটা ঠেকিয়ে, একটা যন্ত্রণাসূচক ভঙ্গীতে। এমন সময় ঘরে ঢুকল তার সেক্রেটারী।

'তেসা টেলিফোন ধরে রয়েছেন। তিনি বলছেন যে আপনার সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত জরুরী দরকার আছে।'

তেসা বলল যে সে এক্ষুনি ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করতে চায়। কোন আপত্তি তেসা শুনল না। অভিশপ্ত দিনটা এগিয়ে চলল।

ঘরে ঢুকে স্বাভাবিক অন্তরঙ্গতার সঙ্গে ভীইয়ারকে আলিঙ্গন করল তেসা, তারপর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে নাকী কান্নার সুরে বলতে শুরু করল :

'সাবধান ! স্পেন হচ্ছে ভীমরুলের চাক। এই স্পেনেই নেপোলিয়ঁর কি হাল হয়েছিল ভোলেননি নিশ্চয়ই। আর সেই সত্তর-শতকের কথা মনে আছে ? 'স্পেনের ঘটনা পরম্পরা'।'

'আপনার কথার কোন অর্থ আমি বুঝতে পারছি না...'

'বুঝতে পারছেন না ? তাহলে শুনুন, আপনি ভুল করছেন। যদি আপনি

কমিউনিস্টদের বিমান দিতে রাজী হন, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য। হিটলার এক পাও সরে দাঁড়াবে না, মুসোলিনির কথা না হয় ছেড়েই দিলাম।'

'প্রথমত, আজানা বা জিরলকে কমিউনিস্ট বলবার কোন অর্থ আছে কি? কি হিসেবে ওরা আপনার চেয়ে বেশী কমিউনিস্ট?'

তেসা বলল, 'আজানার প্রশ্নটা এখানে বড় নয়। কামান ছুঁড়ছে কারা? মজুররা। আমি ওদের যা-ই বলি না কেন, তাতে কি আসে যায়? সমস্ত ইউরোপের কাছে ওরা 'কমিউনিস্ট'। আমার কথাটা আবার বলছি—স্পেনের ব্যাপারটায় যুদ্ধের বীজ রয়েছে।'

'তাহলে সিদ্ধান্তটা কি এই দাঁড়ায় না যে একটি আইনসম্মত সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়-সম্পর্ক বজায় রাখবার অধিকারও আমাদের নেই?' ভীইয়ার বুঝতে পারল না যে মুনের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করছে সে।

তেসা বলল, 'ওসব সূক্ষ্ম বিচার না তোলাই ভাল। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন, আপনার বিশেষ একটা রাজনৈতিক সহানুভূতির জন্যে দেশের লোক কেন প্রাণ দেবে? তা যদি দিতে হয় তো আপনি চমৎকার দেশ-শাসক! রোম আর বার্লিনকে পৃথক করাই আমাদের কাজ, কিন্তু আপনি ওদের আরো জোড়া লাগিয়ে দিচ্ছেন।'

'যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে স্পেনের ব্যাপারে ওরা হাত মিলিয়ে কাজ করছে তখন ওদের পৃথক করা কি করে সম্ভব?'

'এই সব ব্যাপার দেখেও না দেখার ভান করতে হবে। মুসোলিনিকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে এগিয়ে যেতে পারলেই ইতালীর লাতিন প্রকৃতিটা আবার জেগে উঠবে। আজকের দিনে ফ্রান্সের পক্ষে প্রয়োজন কূটনীতিজ্ঞতা, দলীয় একগুঁয়েমি নয়। স্পেনের ব্যাপার সম্পর্কে দু দিক থেকেই সাবধান হওয়া দরকার আমাদের। আলবার ডিউক লণ্ডনে চুপ করে বসে নেই। আলফানসো না ফ্রাঙ্কো—ওসব খুঁটিনাটির কথা। মোটা কথাটা এই, বার্সেলোনার এ্যানার্কিস্টদের চেয়ে জেনারেলকেই ওরা বেশী পছন্দ করে। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের আর কোন সঙ্গী থাকবে না। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করি বলেই আমি এসব কথা বলছি...'

'তাই নাকি! তা তো আমি জানতাম না!' বলল ভীইয়ার, 'ধর্মঘটের সময়ে আপনার বক্তৃতা...'

'তখন আমি মন্ত্রীসভাকে বাঁচিয়েছি! অবশ্য আপনার কার্যপদ্ধতির যথেষ্ট

সমালোচনা করেছিলাম, কিন্তু তা না করে উপায় ছিল না। কি রকম ক্ষেপে উঠেছিল সবাই মনে আছে? মন্ত্রীসভার প্রতি আমি তো আস্থাজ্ঞাপন করেছিলাম। র‍্যাডিকালদের দলে সে সময়ে তীব্র মতভেদ হয়েছিল। মালভী, মারসাঁদ, মেইয়ের—প্রত্যেকে একবাক্যে বলেছিল, মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই। যাক্, এসব পুরনো কথা। কিন্তু এখন অবস্থা আরো বেশী বিপজ্জনক। মালভী ক্ষেপে লাল হয়ে উঠেছে; জানেন তো ও স্পেনের ধনীদের মস্ত বড় বন্ধু। আপনাকে বলে রাখছি শুনুন, জেনারেল ফ্রাঙ্কোর চেয়ে আজানাকে আমিও বেশী পছন্দ করি। আমি একজন খাঁটি রিপাব্লিকান, গণতন্ত্রের ভক্ত। কিন্তু আমার কথা কে শুনছে? আর সত্যি কথা বলতে কি, এ নিয়ে আপনাকেও কেউ মাথা ঘামাতে বলেনি। যেটুকু আমরা করব বলে সবাই আশা করে তা হচ্ছে চুপ করে বসে থাকা, এ ব্যাপারে মাথা না গলানো।'

'কিন্তু সবাই তো মাথা গলাচ্ছে।'

'সেক্ষেত্রে আমার বক্তব্য—একটা ষাড়ের পক্ষে যে কাজ শোভা পায়, দেবরাজের পক্ষে তা হয়ত অশোভন। ইতালীয়ানরা তো তাল ঠুকছে, জার্মানদেরও সেই অবস্থা। যুদ্ধ যদি আমরা না চাই তবে একটিমাত্র কাজই আমরা করতে পারি, তা হচ্ছে চুপ করে থাকা। মাদ্রিদে যদি আপনি একশোটা বিমানও পাঠান, কিছুই আসে যাবে না। ফ্রাঙ্কোকে ওরা পাঁচশোটা বিমান পাঠাবে। আগুন নিয়ে খেলা করাটা বোকামি ছাড়া কিছু নয়।'

'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ীরা যদি বিমান বিক্রী করে তবে আমরা বাধা দেব কেন?'

'আবার সেই সূক্ষ্ম বিচার? শুনুন, এটা একটা পার্লমেণ্টারি দলাদলির ব্যাপার মোটেও নয়। খুব সাবধান, রক্তারক্তি শুরু হতে পারে! আমি এতটুকু বাড়িয়ে বা বানিয়ে কথা বলছি না। এতটুকুও নয়। কিছুই ওদের আটকাতে পারবে না। মিথ্যে চালাকি করে কি লাভ? আপনি যদি একটিমাত্র বিমান পাঠান, তাহলেই যুদ্ধ লেগে যাবে। আমি জানি যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে আপনার একটা খাঁটি ঘৃণা আছে। তা জানি বলেই আপনার সঙ্গে আমি দেখা করতে এসেছি। আপনাকে যা বললাম, সব আমার মনের কথা। শুধু আমার নয়, ফরাসী মায়েদের কথা, ফ্রান্সের কথা!'

'শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে আমি অবশ্যই আপ্রাণ চেষ্টা করব।' বলল ভীইয়ার।

'তা আমি জানি। কিন্তু আপনার শত্রুরা উঠে-পড়ে লেগেছে। র‍্যাডিকালদের দলে তো ভীষণ সোরগোল—মালভী সমানে চিৎকার করছে যে আপনি নাকি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী। সবাই বিশ্বাস করছে ওর কথা। দক্ষিণপন্থীদের কথা আমি উল্লেখও করছি না। ব্রতৈলটা তো একটা নির্বোধ আর পাগল। আমরা স্প্যানিয়ার্ড নই, একটি অত্যন্ত সভ্য জাতি। স্পেনের যা অবস্থা তা আমাদের কাছে অসম্ভব বলে মনে হয়। কিন্তু ব্রতৈল লোকটার রীতিমত প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। কাল ও বলছিল, আপনাকে নাকি ও যুদ্ধ-প্রচার অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। ওদের এই সব চাল যে আপনি ব্যর্থ করবেন, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। তাই আমি বলি—'ভীইয়ারের উপস্থিতিটাই এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার পক্ষে সব চেয়ে বড় নিশ্চয়তা।' এ বিষয়ে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আপনি শুধু মুখে একবার স্পষ্টভাবে 'হ্যাঁ' বলুন।'

হাতের একটা ভঙ্গী করে তেসা গিয়ে দাঁড়াল ঘরের অন্য দিকের কোণটিতে এবং শপথবাণী-উচ্চারণের মত আবার বলে গেল ভীইয়ারের বিরুদ্ধে তার যা কিছু বলবার আছে। তারপর সে আবার সরে এল ভীইয়ারের কাছাকাছি, কথা বলবার সময় তার মুখ থেকে অজস্র থুথু ছিটতে লাগল ভীইয়ারের গায়ে। ভীইয়ার তার স্থৈর্য বজায় রাখল, এমন কি হাসলও একবার। মনে হল, মুনের আত্মা ঘরের ভেতর উপস্থিত রয়েছে। ঠিক যেখানে দাঁড়িয়ে তেসা এখন ভাঁড়ামি করছে, এক ঘণ্টা আগে মুনে দাঁড়িয়েছিল সেখানে, একটা বিরাট ভাগ্যবিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মাথা নোয়ায়নি সে। আর ভীইয়ার—যে তার পুরনো কমরেডের সঙ্গে কথা বলেছে হৃদয়হীন কূটনীতিকের মত—সে-ই কিনা এখন চেষ্টা করছে তেসার ভীতিপ্রদর্শনের সামনে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখতে। এমন কি কৌশলের আশ্রয় নিতেও ভুলে গেছে সে। তেসা যখন স্পষ্ট একটা উত্তর দাবী করল তার কাছ থেকে, সে শুধু বলল, 'আমি আমার কর্তব্য সম্পাদন করব।' এর বেশী একটি কথাও তেসা তার মুখ থেকে বার করতে পারল না।

তেসা চলে যাবার পর ভীইয়ার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল সোফাটার ওপর এবং উদ্বিগ্ন-ভাবে ভাবতে শুরু করল, 'এখন কি করা উচিত?' ভীষণ মাথা ধরেছে তার, গা ঘিন-ঘিন করছে—তার চিন্তার পক্ষে এ দুটো বাধা হয়ে দাঁড়াল। তেসা লোকটা সত্যিই অসহ্য। কি ভীষণ চিৎকার করে আর কি বিশ্রী থুথু ছেটায়।

ওকে মেয়েরা ভালবাসে কি করে...হ্যাঁ ঠিক, ওকে নিশ্চয়ই কেউ পাঠিয়েছে। দক্ষিণপন্থী র‍্যাডিকালরা। কিংবা হয়ত ব্রতৈল। বৈদেশিক দূতাবাসের ইতালিয়ানরাও হতে পারে। বড় জটিল খেলা!...সত্যিই ওরা তাল ঠুকছে। তার মানেই কি যুদ্ধ? লোকেরা বলবে কি? গত চল্লিশ বছর ধরে সে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে আর এখন কিনা সে-ই লক্ষ লক্ষ লোককে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। স্পেনে তো ইতিমধ্যেই মরতে শুরু করেছে...

গলিত মৃতদেহ, পঙ্গু শরীর আর ভাঙা বাড়ীর একটা দৃশ্য চোখ না খুলেই স্পষ্ট দেখতে পেল সে। এখন কি করা উচিত? তেসা বলেছে, 'একটি বিমানও নয়!' হ্যাঁ, র‍্যাডিকালরা হয়ত মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করবে। একথা মনে হবার পর স্বাভাবিকভাবেই ভীইয়ার ডুবে গেল রাজনৈতিক অঙ্কের যোগবিয়োগে—স্পেনের ব্যাপারে সরকার পক্ষে কত ভোট হতে পারে তাই হিসেব করতে লাগল মনে মনে। অল্প কয়েকটাই ভোট পাওয়া যাবে! তখন র‍্যাডিকালরা আপোষ করবে দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে—তেসা থেকে শুরু করে ব্রতৈল পর্যন্ত বিরাট একটা দল। সেখানেই শেষের শুরু—যে ব্রতৈল একনায়কত্বের স্বপ্ন দেখে, তার কাছে তো সেই রকমের মন্ত্রীসভা কিছুই নয়। ৬ই ফেব্রুয়ারীর চেয়ে তা অনেক বেশী বিপজ্জনক। দোকানদার আর জোতদাররা তো গত ধর্মঘটের সময়েই আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে, তারা সকলেই যোগ দেবে ব্রতৈলের সঙ্গে। সমাজতন্ত্রী দলের অস্তিত্ব আর থাকবে না। সর্বোচ্চ আদালত। ফাঁসিকাঠে দাঁড় করানো হবে ভীইয়ারকে: 'আসামী যুদ্ধ-প্রচার অপরাধে দোষী।' সমস্ত তথ্য জানবার জন্যে একটা বিমান গুলি করে মাটিতে ফেলাই যথেষ্ট। সরকারী কৌঁসুলি বলবে, 'ভীইয়ারের সহযোগিতায় 'এ ৬৮'...না, এ নিয়ে ছেলেখেলা নয়!

সন্ধ্যা দশটা পর্যন্ত এইভাবে ভীইয়ার অনেক কিছু আবোলতাবোল ভাবল। কি করবে কিছুই স্থির করতে পারল না সে। অবশেষে অসহ্য মাথাধরা ও ক্লান্তি নিয়ে উঠে বসে গোয়েন্দা-পুলিশের বড়কর্তাকে ডেকে পাঠাল।

'শুনলাম পিয়ের দ্যুবোয়া নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার এগারোটা 'এ ৬৮' বোমারু বিমান বার্সেলোনায় নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। বিমানগুলোকে আটকাতেই হবে। এ কাজ সম্ভব বলে আপনি মনে করেন?'

'খুবই সহজ। বিমানগুলো আছে হয় এখানকার 'সীন' বিমান ঘাঁটিতে, নয়তো তুলুজে। আচ্ছা এ ব্যাপারটা আমি এক্ষুনি দেখছি।'

পুলিশের বড়কর্তা চলে যাবার পর ভীইয়ার আবার শুয়ে পড়ল সোফার ওপর। মাথাধরা সারাবার জন্তে পাউডার খেল দুটো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওষুধের ক্রিয়ায় নিঝুম হয়ে গেল শরীরটা, একটা হাত নাড়বার ক্ষমতাও আর রইল না, ঠাণ্ডা হয়ে গেল পা দুটো। যা হোক একটা কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সে। তার পক্ষে এখনকার মত যতদূর করা সম্ভব সে করেছে, এবার অপেক্ষা করতে হবে। তবুও একটা কথা ঘুরে ঘুরে বারবার মনে হতে লাগল—'বিশ্বাসঘাতকতা!' মনে মনে সে বলল, 'বাজে কথা! কারও প্রতি আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি না। স্পেনের আশা ভরসা তো চুকেই গেছে, কিছু করা না-করার ওপর আর তা নির্ভর করছে না। দুশো বিমানের বিরুদ্ধে এগারোটা!...শিশু, শিশু! লা-র মজুরদের মত। এই পথে আমি বাঁচিয়ে রাখব পপুলার ফ্রন্টকে। আমাদের পার্টিকে। আর দেশের শান্তিকে। আমি আমার কর্তব্য করেছি। আর কিছু করবার নেই।' শিশু ভয় পেলে মা যেমন সান্ত্বনা দেয়, তেমনিভাবে সে সান্ত্বনা দিল নিজেকে। তবুও সেই অন্ধকার পরিবেশের ভেতর থেকে—আলো নিবিয়ে দিয়েছিল সে—একটা কালো পিচ্ছিল মাছের মত সেই রূঢ় শব্দটা বারবার ভেসে ভেসে আসতে লাগল।

হঠাৎ তার মনে পড়ল সীমান্ত অঞ্চলের ছোট শহর সারবেরের কথা। বহুবার সে গেছে সেখানে—পিয়েরের বাবাও একবার তার সঙ্গে ছিল। মনে পড়ল সেই পিরেনিজ পাহাড়ের তলায় পাটলবর্ণের বাড়ী, জেলেদের ডিঙি, আঙুরক্ষেত, কলরব-মুখর রেলস্টেশন। আঙুরের মত মিষ্টি মদ। সারবেরের লোকেরা এবার তাকে আশীর্বাদ করবে। যুদ্ধ ওদের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল—একটা নীচু পাহাড় বা একটা ছোট সুরঙ্গের ব্যবধান মাত্র। সীমান্ত পার হয়েই চোখে পড়বে ভাঙা ভাঙা বাড়ী আর অশ্রুমুখী স্ত্রীলোক। কিন্তু সারবেরের মায়েরা বলবে, 'ভীইয়ার শান্তিরক্ষা করেছে। ভীইয়ার আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঁচিয়েছে। ভীইয়ার...' নিজের নামটা বারবার উচ্চারণ করতে করতে এক সময়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

২৭

'অসম্ভব!' বিস্ময়ের সুরে পিয়ের বলল, 'আমি ভীইয়ারকে টেলিফোন করব।'

প্রবল বৃষ্টির ভেতর দুজনে দাঁড়িয়েছিল। পাশেই একটা আলো জ্বলছে। বর্ষণের যেন আর বিরাম নেই, অবিশ্রান্ত জলপ্লাবনে ডুবিয়ে দেবে যেন পৃথিবীকে। পায়ের নীচে জল দাঁড়িয়ে গেছে, জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে পুলিশ সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের জামার কলার থেকে।

'পারী থেকে আদেশ এসেছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়েই যে আদেশ দেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই...'

আর মাদ্রিদে অপেক্ষা করছে ওরা! আজকের বেতার-সংবাদে প্রকাশ, ফ্যাশিস্টরা এগিয়ে চলেছে ক্রমশ। পারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবার জন্যে বহুক্ষণ পিয়ের অপেক্ষা করল টেলিফোনের কাছে। একটা কেঁদো বেড়াল ঘুমোচ্ছে ডেস্‌কের ওপর, বৃষ্টি পড়ছে সমানে। অবশেষে ভীইয়ারের সেক্রেটারীকে টেলিফোনে পাওয়া গেল। অত্যন্ত বিনীত ও উদাসীন গলায় সেক্রেটারী বলল, 'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে এই সংবাদ আমি জানাব...মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় এখন ব্যস্ত আছেন···আমার মনে হয় না মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় পুলিশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন···' এইভাবে কথা বলে কোন লাভ নেই বুঝতে পেরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল পিয়ের, অস্পষ্টভাবে তার মনে হল, 'সেক্রেটারীও একজন সমাজতন্ত্রী!' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'পরের ট্রেনেই আমি পারী রওনা হচ্ছি।'

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট কোন কথা বলল না। স্টেশনের কাছে একটা ছোট কাফেতে ঢুকল পিয়ের। বাইরে থেকে যারা আসছে তারা প্রথমেই পরনের জামাকাপড় ঝেড়ে নিচ্ছে। কাফের ভেতরে সেই বিশেষ ধরনের আরামজনক স্বচ্ছন্দতা যা বৃষ্টিবাদলার দিনে যে কোন আশ্রয়ের ভেতর খুঁজে পাওয়া যায়।

নিজের চিন্তায় পিয়ের এত ডুবে ছিল যে হোটেলের মালিক যখন তার কাছ থেকে খাবারের অর্ডার নিতে এল, সে কিছুই বুঝতে পারল না প্রথমে। তার সমস্ত চিন্তা জুড়ে ছিল মাদ্রিদ। চোখের সামনে একটা ছবি ফুটে উঠেছিল—মানচিত্রের

ওপর আঁকা একটা বৃত্তের দিকে চারটে তীর ছুটে আসছে। মুনে ইতিমধ্যেই খবর পাঠিয়েছে যে এগারটা 'এ ৬৮' আগামীকাল বার্সেলোনায় পৌঁছবে। খবর পেয়ে সেখানকার লোকেরা অপেক্ষা করছে আশায় আশায়। আর এই সময়েই কিনা যত কিছু গণ্ডগোল! এই কাণ্ডটা করল কে? ভীইয়ার? সন্দেহটা একবার উঁকি দিতেই সে চমকে উঠল; নিজের নীচ মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে নিজেই চটে উঠল নিজের ওপর। ভীইয়ারের ওপর সন্দেহ! এক গ্লাশ কোনিয়াক মদ খেয়ে সিগারেটের পর সিগারেট টানতে লাগল সে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করল পাশের টেবিলের কথাবার্তা শুনতে—কে একজন ম্যারি পাশের বাড়ীর খরগোসগুলোকে বিষ খাইয়েছে, তারই গল্প হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে মনে পড়ল আনের চোখ দুটোর কথা, একরাশ জলের তলাকার সেই অস্পষ্ট আলোটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কিন্তু কোন ফল হল না, ভীইয়ারের চিন্তাটাই বারবার ফিরে ফিরে আসতে লাগল। কোন একটা শক্ত অসুখের প্রাথমিক লক্ষণের মত এই চিন্তাটাও তার কাছে যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃসহ। অনেক কথা মনে পড়ল তার—ভীইয়ার সম্পর্কে মিশোর কটূক্তি, সমাজতন্ত্রীরা মুনেকে কিভাবে গ্রহণ করেছে সেই সম্পর্কে মুনের মুখে শোনা গল্প। না, সমস্ত ব্যাপারটাই অভিসন্ধিমূলক। কিংবা সত্যিই তার কোন অসুখ হয়েছে? কাফের ভেতরকার বাতাস উষ্ণ ও স্যাঁতসেঁতে, তবুও শীতে কাঁপছে সে। ট্রেনের এখনো দু ঘণ্টা দেরী। বসে বসে ঘুমোবার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন সে চেষ্টা করল স্থানীয় সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে খচ্চর ও গরু বিক্রীর ঘোষণায় মন বসাতে। বিচ্ছিন্নভাবে কতগুলো কবিতার ছাড়া ছাড়া লাইন হঠাৎ মনে পড়ল তার। তারপরেই আবার ভীইয়ারের মুখটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল—লাল ঝাণ্ডার তলায় প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে হাসছে ভীইয়ার। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি? এমনও হতে পারে ভীইয়ারের সেক্রেটারীর কথায় কিছুই যায় আসে না, সুযোগ পেয়ে একটু ফালতু মুরুব্বিয়ানা দেখিয়েছে লোকটা। কিন্তু পুলিশ বাধা দিচ্ছে। এই পুলিশগুলোকে সাফ করছে না কেন ভীইয়ার? ওগুলো তো ফ্যাশিস্ট, যেন পুলিশ হবার পক্ষে ফ্যাশিস্ট হওয়টাই বড় গুণ। পুলিশ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট স্পেন সরকারকে বলেছে 'কমিউনিস্ট' আর অবজ্ঞার হাসি হেসেছে। ও লোকটা বোধ হয় ব্রতৈলের গুণ্ডাদলের একজন! ওর দিন যে ফুরিয়ে এসেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মিথ্যে একটা দিন নষ্ট হল। ওদিকে স্পেনের লোকেরা তাকিয়ে আছে আশায় আশায়...অসহ্য!

কাফের ভেতরটা শান্ত হয়ে এসেছে। কিছু কিছু লোক চলে গেছে, বাকী যারা এখনো বসে বসে ঝিমোচ্ছে তারা সবাই রাত্রির ট্রেনের যাত্রী। দোকানের মালিক গোলগাল ফুলোফুলো চেহারার স্ত্রীলোকটিও ঢুলছে, কোলের ওপর এক বাণ্ডিল সবুজ উল। এক কোণে, লাল মদের ভেতর রুটি ডুবোতে ডুবোতে একটি মজুর কি যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তার সঙ্গীকে। কান পেতে শুনল পিয়ের—

'স্পেনের ব্যাপারটাই এখন আসল। আমি তো যাচ্ছি। দেখে নিও যাব কিনা। এখন আমরা যদি ওদের যতদূর সম্ভব সাহায্য না করি তবে আমরাও খতম হয়ে যাব।'

প্রবল চেষ্টায় পিয়ের নিজেকে সংযত করল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল ছুটে গিয়ে লোকটার হাত জড়িয়ে ধরে আর চিৎকার করে বলে, 'ঠিক কথা!' সে শুধু হাসল। সেই হাসির অর্থ বুঝতে পারল মজুরটি এবং উত্তরে চোখ টিপল অর্থসূচকভাবে।

পারীতে পৌঁছেই পিয়ের ছুটল মন্ত্রীদপ্তরের দিকে। গিয়ে শুনল মন্ত্রীমশাই ব্যস্ত আছেন। দু ঘণ্টা পিয়ের বসে রইল। আরো বহু দর্শনপ্রার্থী এসেছে, প্রায় সকলেই সমাজতন্ত্রী, উদ্দেশ্যও এক—ভীইয়ারকে ধরাধরি করে 'লিজিয়ন অব অনার' বা এই ধরনের কোন একটা সম্মান-পদক বাগিয়ে নেওয়া। খিটখিটে মেজাজের বেঁটে মত একটি স্ত্রীলোক উত্তেজিত স্বরে একই কথা বারবার বলে চলেছে, 'আমি ওকে অনেকদিন থেকে চিনি। ও যখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াত সেই সময় থেকে। ও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করবে।' স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ভীইয়ার দেখা করল, অন্যান্য দর্শনপ্রার্থীদেরও ডেকে পাঠাল একে একে। কিন্তু পিয়ের বসেই রইল সেই থেকে। অনেকক্ষণ পরে পিয়ের শুনল, 'মন্ত্রীমশাই লাঞ্চ খেতে গেছেন। তিনটের সময় ফিরবেন।'

তিনটে পর্যন্ত পিয়ের বসে রইল বুলভারের একটা বেঞ্চে। চারপাশের স্বাভাবিক জীবন স্রোত তেমনিভাবেই প্রবহমান। দরজীরা লাঞ্চে বসেছে এক তাল রুটি ও এক টুকরো চকোলেট নিয়ে। একটা দোকানের বাইরে কতগুলো সিল্কের বাণ্ডিল নিয়ে কয়েকজন মহিলা ব্যস্ত। ট্যাক্সি ড্রাইভাররা গালাগালি দিচ্ছে পরস্পরকে। চড়ুই পাখীকে খাবার খাওয়াচ্ছে বুড়োরা। বোকা বোকা চেহারার একদল ইংরেজ দর্শককে নিয়ে গাইড্রা দৃশ্য-পরিদর্শনে বেরিয়েছে। দালালদের মুখে শেয়ার-বাজারের সর্বশেষ দর। মাদ্রিদের জন্যে কেউ কোথাও এতটুকু উদ্বিগ্ন

নয়। কিন্তু পিয়েরের উৎকণ্ঠিত মনে সেই এক চিন্তা—ভালাভেরা কি ওয়া অধিকার করতে পারবে?...ঘড়ির কাঁটা আর নড়ছে না যেন। পিয়েরের মনে হল, বসে বসেই সে সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তিনটে বাজেনি এখনো।

লাঞ্চের পর ভীইয়ার মন্ত্রীদপ্তরে ফিরে এল। আগের মতই পিয়ের বসে রইল ওয়েটিং-রুমে। এবেলা সে একা; দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হয়ে গেছে। অবশেষে একজন সেক্রেটারী এল তার কাছে।

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় একটা অত্যন্ত জরুরী কাজে ব্যস্ত। সুতরাং তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না বলে ক্ষমা চাইছেন। আমাকে তিনি পাঠিয়েছেন আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে কথাবার্তা বলতে।'

পুলিশ-সুপারের যথেচ্ছাচারের কথা পিয়ের বলতে শুরু করেছে এমন সময় সেক্রেটারী তার কথায় বাধা দিয়ে বলল:

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় সমস্ত ব্যাপারটাই সম্পূর্ণভাবে অবগত আছেন। আমরা দুজনেই সমাজতন্ত্রী সুতরাং খোলাখুলি কথা বলতে কোন বাধা নেই...অবস্থা অত্যন্ত ঘোরালো। যাহোক একটা পথ আমাদের বেছে নিতে হবে। যদি আমরা স্প্যানিয়ার্ডদের সাহায্য করতে চাই তবে হয়ত সব কিছুই হারাতে হবে। যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে এবং দেশের ভেতর ফ্যাশিজ্‌ম্ জয়লাভ করবে।'

'কিন্তু ফ্রাঙ্কো তো মাদ্রিদে। এখানে তো ব্রতৈল!'

'এই মত যথার্থ বলে আমার মনে হয় না। স্পেন হচ্ছে একটা পশ্চাদগামী আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ, ইউরোপের সীমারেখা। কোন্‌টার গুরুত্ব বেশী? কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট, শূন্যমূল স্প্যানিশ রিপাব্‌লিককে রক্ষা করা, না একটা অগ্রগামী দেশের সমাজতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখা—তার ওপর বিশেষ করে সেই দেশটি যদি আমাদের নিজেদেরই দেশ হয়? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় স্থির করেছেন যে এই বিষয়ে কঠোর নিরপেক্ষতার নীতি মেনে চলবেন।'

একথা শুনে পিয়ের আর নিজেকে সামলিয়ে রাখতে পারল না। গত কয়েক সপ্তাহের উৎকণ্ঠা—ব্রেউঁ গ্রামের ঝড় থেকে শুরু করে বুলভারের বেঞ্চ পর্যন্ত, জনসাধারণের উদাসীন হাসি, ভীইয়ারের ওপর অচঞ্চল বিশ্বাস আর বিনিদ্র রাত্রি যাপন, মাদ্রিদ সম্পর্কে উদ্বেগ—সমস্ত কিছু একটা ছোট চিৎকারের ভেতর ফুটে উঠল।

'মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়? মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় না বিশ্বাসঘাতক জুডাস!'

কথাটা এত অপ্রত্যাশিত যে সেক্রেটারী বলল, 'মাফ করবেন। আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

ততক্ষণে পিয়ের বেগুনী কার্পেট মোড়া সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে। চারপাশ থেকে মোসাহেবের দল বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে, তারা যেন বলতে চাইছে, 'ও, পেয়ারের চাকরিটা হল না বুঝি!'

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে পিয়ের রাস্তায় রাস্তায় ছুটোছুটি করল, কিন্তু কোন ফল হল না। মানসিক যন্ত্রণাটা এত বেশী তীব্র যে কোন কিছুতেই তা প্রশমিত হবার নয়। যাঁকে সে আদর্শস্থানীয় মনে করত, তাঁর এই অধঃপতন কেন—একথা আর সে ভাবতে চেষ্টা করল না। শুধু সে বুঝতে পারল যে একটা নিষ্ফলতার আতঙ্ক ও শ্বাসরোধী শূন্যতা তাকে অধিকার করেছে। ঠিক কথাই বলে আনে, আর যা কিছু সে এতকাল জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, তা কি শুধু ভ্রান্তি, নির্বোধদের জন্যে পাতা কৌশলী জাল মাত্র, প্রতারণার পারস্পরিক সুবিধা-লাভ-সংঘ? একটা মিথ্যে অস্পষ্টতার পেছনে ঘুরে ঘুরেই তার জীবন কাটল। এক ঘণ্টা আগেও মানুষের শুভবুদ্ধি ও বন্ধুত্ব-প্রেরণার ওপরে বিশ্বাস অটুট ছিল তার, যে আদর্শকে সে জীবন দিয়ে গ্রহণ করেছিল তা এখনো মিথ্যে হয়ে যায়নি তার কাছে। এখন সে মুনের সামনে দাঁড়াবে কি করে? তালাভেরা...

স্পেনের কথা মনে পড়তেই তার বুদ্ধির স্থিরতা ফিরে এল। না, এখনো অনেক কিছু করবার আছে, সামান্য এক ঘণ্টার মধ্যেই সব বদলে যায়নি। মাদ্রিদের লোকেরা এখনো যুদ্ধ করছে। 'এ ৬৮' না থাকুক, টোটা-বন্দুক আছে তাদের। পিয়েরও যাবে সেখানে, সেখানেই প্রাণ দেবে সে। মৃত্যুর চিন্তাটা তার কাছে মুক্তির পথ বলে মনে হল।

একটা চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ল সে—এক্ষুনি সে মিশোর কাছে যাবে! মিশোই তাকে বলতে পারবে কি ভাবে মাদ্রিদ যাওয়া যায়।

সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে মিশোর এক মুহূর্তও দেরী হল না।

'যেতে দিল না বুঝি?'

'না। একটিও না। এ কাজ কে করল জান? ভীইয়ার। ভীইয়ার, বুঝেছ, ভীইয়ার। আমি পাগল হয়ে যাব বোধ হয়। হ্যাঁ, শোন। আমি মাদ্রিদে যেতে চাই—এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করতে হবে। ওর নামও আমি আর মুখে আনতে চাই না। কি লাভ?'

মিশো বুঝতে পারল পিয়েরের দুঃখ কত গভীর; নিঃশব্দে পিয়েরের হাতটা চেপে ধরল সে। একটা খোলা জানলার পাশে দুজনে দাঁড়িয়ে, বাইরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাঙ-ব্যাঙ খেলা করছে।

একটা দীর্ঘ নিস্তব্ধতার পর মিশো বলল, 'মুনেকে একজন কথা দিয়েছে তিনটে 'পতেজ' বিমান বিক্রী করবে। এ সম্পর্কে মুনে কিছুই জানে না। আমাদের মধ্যে একমাত্র তুমিই এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পারি। আমরা চেষ্টা করছি একটা স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন করতে। হয়ত আমি নিজেও যেতে পারি। কিন্তু তোমার যাওয়া চলতেই পারে না। এখানে তুমি না থাকলে সমস্ত গণ্ডগোল হয়ে যাবে...'

পিয়ের প্রতিবাদ করল না। বেশ। কালই সে বিমান-ঘাঁটিতে যাবে। বেশ, এখানেই থাকবে সে। মুক্তি পাবার শেষ ছিদ্রটুকুও এবার বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে এসে পিয়ের উদ্‌ভ্রান্তের মত চারদিকে তাকাতে লাগল। কোথায় সে যাবে? শেষকালে সে নিজেও বুঝতে পারল না সমস্ত পারী পার হয়ে কেনই বা সে আঁদ্রের কাছে হাজির হল আর কেনই বা রু শেরস্-মিদির এই অপরিচ্ছন্ন অস্বস্তিকর স্টুডিওটার কথা এই সময়ে তার মনে পড়ল।

গতবার দেখা হবার পর ছ-মাস পার হয়েছে। পিয়েরের কাছে এই ছ-মাস একটা যুগ। ছ-মাস আগেও সে কত অনভিজ্ঞ ছিল...

'কেমন আছ, আঁদ্রে?'

কি বলতে পারে আঁদ্রে? সে কি বলবে এই ভয়ংকর গ্রীষ্মের ঘটনাবলী তাকে কি ভাবে বিচলিত করেছে আর কি ভাবে জিনৎকে পেয়েও হারিয়েছে সে?

'একটা স্টিল-লাইফ আঁকতে শুরু করেছি, কিন্তু কিছুতেই শেষ করতে পারছি না।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে পিয়ের তার দিকে তাকিয়ে রইল:

'তুমি এখনো ঠিক সেই রকমটিই আছ আঁদ্রে। মনে আছে তোমাকে সেবার টানতে টানতে মেজোঁ দ্য কুলতুরে নিয়ে গিয়েছিলাম?'

আঁদ্রে শিস দিয়ে উঠল। 'তুমি কি জান যে লুসিয়ঁ স্পেনে গেছে?' বলল সে।

'হ্যাঁ, এ খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। বৈদেশিক বিভাগে একটা চাকরি নিয়ে ও গেছে।'

'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম ও গেছে যুদ্ধ করতে...'

পিয়ের হাসল। ও এখনো শিশু, মনে মনে ভাবল পিয়ের, এক সময় পিয়েরও

ঠিক এই রকমই ছিল! আঁদ্রের কাছে ভীইয়ারের কথা বলতে শুরু করল পিয়ের। স্বভাবতই পিয়েরের অনুভূতিগুলো অত্যন্ত প্রবল। মনে হল সে চাইছে যে দেওয়ালের ক্যানভ্যাসগুলো পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতকের কথা উচ্চ স্বরে ঘোষণা করুক। কিন্তু আঁদ্রে চুপ করে রইল।

'কি মনে হয়? বুঝতে পারছ কিছু?' উত্তেজনার বশে জিজ্ঞাসা করল পিয়ের।

'আমার মনে হয় এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক কিছু নেই।'

'কি? এই প্রতারণার ভেতর অস্বাভাবিক কিছু নেই? আমি শুনেছি, কোন একজন স্প্যানিয়ার্ডকে রক্ষা করবার জন্যে এই লোকটি এক সময়ে আমার বাবার সঙ্গে কাজ করেছিল! আর এখন কিনা ও-ই আবার স্প্যানিয়ার্ডদের শত্রুর হাতে তুলে দিচ্ছে। এর ভেতর অস্বাভাবিক কিছু নেই? এই বিশ্বাসঘাতকতা স্বাভাবিক?'

'গোয়ার পোর্ট্রেটগুলো মনে করে দেখ...'

জ্ঞানশূন্য হয়ে পিয়ের চিৎকার করে উঠল:

'চুলোয় যাক তোমার আর্ট! তুমি কি মানুষ? তুমি শুধু মজা উপভোগ করতেই জান। এত দুঃখ, কষ্ট, রক্তপাত—কিছুই যায় আসে না তোমার। গোবরে পোকার মত জীবন!' কথাটা বলে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পিয়ের। যেতে যেতে সিঁড়ির কাছ থেকে চিৎকার করে শুধু বলল, 'আমি দুঃখিত। অন্য এক সময়ে আবার আসব।'

এবং পিয়ের চলে না যাওয়া পর্যন্ত একবারও আঁদ্রের মনে হল না যে পিয়ের তাকে অন্যায়ভাবে আঘাত করছে। যখন মনে হল, পিয়ের চলে গেছে। বাইরে এসে সিঁড়ির কাছে সে দাঁড়াল কিন্তু পিয়েরকে দেখতে পেল না কোথাও। দুঃখিত মনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে আর পাইপ টানতে লাগল ঘন ঘন। পিয়ের কেন তাকে অপমান করল? সে তো শুধু বলেছিল যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নয়। ভীইয়ারের মত লোকের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখবার ক্ষমতা আছে অর। কিন্তু লুসিয়ঁ? একটা খঞ্জন পাখী! ওর চেয়ে কুকুরের সঙ্গে থাকা ভাল! হ্যাঁ, কুকুরগুলোও নিজেদের মধ্যে মারামারি কামড়া-কামড়ি করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা করবার সময় মুখে বড় বড় কথা বলে না এবং বলে না বলেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত! কিন্তু পিয়ের তাকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে—সে তো বিশ্বাসঘাতকতা সমর্থন করে না।

পিয়েরের দিন চলাই ভার হয়ে উঠল। কারখানার কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারল না সে। কি লাভ মন বসিয়ে যখন সে ভাল করেই জানে যে ইঞ্জিনগুলো হয় ফ্রাঙ্কো নয়তো ব্রতৈলের কাছে যাবে? সেই 'পতেজ' বিমান তিনটে সে সাফল্যের সঙ্গে পাঠাতে পেরেছে, এক মাস পরে দুটো ফাইটার বিমানও পাঠিয়েছে—কিন্তু এ আর কতটুকু? সমুদ্রের ভেতর এক ফোঁটা জল মাত্র। মাদ্রিদ থেকে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম আসছে। ফরাসী পুলিশ একদিনের জন্যেও বিমানগুলোর ওপর থেকে সতর্ক দৃষ্টি তুলে নেয়নি। আর সংবাদপত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে ভীইয়ারের ছবি ছাপা হচ্ছে চমৎকারভাবে। 'নিরপক্ষতা'র ওপর এমনভাবে বক্তৃতা দিচ্ছে ভীইয়ার যেন ওটা একটা মস্ত বড় সাহসিক কাজ: 'আমরা শান্তি রক্ষা করেছি!' স্পেনের শিশুদের ভেতর দুধ বিলি করবার জন্যে পাঁচ হাজার ফ্রাঁ সে দান করেছে—এই শর্তে যে 'সকল শিশুর কাছেই' এই দুধের ভাণ্ডার উন্মুক্ত থাকবে।

সেদিন পিয়ের আনেকে বলল, 'ছোট ছেলেমেয়েদের আমি যতই ভালবাসি না কেন, ভীইয়ারের যদি কোন ছেলেমেয়ে থাকত তো তার গলা টিপে আমি মেরে ফেলতাম ......'

দিনের পর দিন জার্মান বোমায় মাদ্রিদের ঘরবাড়ী চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল। বোমাবিধ্বস্ত মাদ্রিদের বিকলাঙ্গ ছেলেমেয়েদের ফটো প্রাচীরপত্রের আকারে আঁটা হল পারীর দেওয়ালে দেওয়ালে। আনে বলল যে ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখাও একটা শাস্তি। পিয়ের কোন কথা বলল না—বহুদিন থেকেই সে এই শাস্তি ভোগ করছে। তলেদো অধিকার করে ফ্রাঙ্কো এগিয়ে চলল মাদ্রিদের দিকে। কতকগুলো কাগজ ফ্যাশিস্টদের প্রশস্তি গাইল—আলকাজারকে তারা রক্ষা করেছে। অন্য কাগজগুলোতে খবর বার হল যে মুর দস্যুরা তলেদোর আহতদের পর্যন্ত খুন করেছে। জলিও লিখল, 'ফরাসীদেশের প্রাচীন ঐতিহ্য আমাদের এই দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচাবে।' ব্রতৈলের মহিলা-বন্ধুরা মাদ্রিদ-পতনের দিন উৎসবের আয়োজন করে রাখল। কিন্তু স্পেনের জনসাধারণ হার স্বীকার করল না কিছুতেই।

পিয়েরের কাছে ভীইয়ারের এই বিশ্বাসঘাতকতার ভেতর কোন ফাঁক নেই। এই বিশ্বাসঘাতকতা তার নিজের, আনের, সমগ্র ফ্রান্সের। একটা দুর্গন্ধের মত এবং একটা বিশ্রী আস্বাদের মত এই বিশ্বাসঘাতকতা লেগে রয়েছে তার মুখে যা সে কিছুতেই দূর করতে পারছে না। পারীকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে

সে, কারণ পারী তার স্বাভাবিক জীবনের কোথাও এতটুকু বিচ্যুতি ঘটতে দেয়নি: কাফেগুলোতে সকালসন্ধ্যায় তেমনি লোকের ভীড়, তেমনি রাজনৈতিক বিতণ্ডা, তেমনি তাস খেলা—ব্রিজ বা পোকার—উলঙ্গ অভিনেত্রীদের তেমনি নাচগান। সাইরেনের আর্তনাদ নেই, বোমাবর্ষণ নেই, এক ফোঁটা কৃপণ অশ্রুপাতও নেই—কিছুই নেই।

স্কুল খুলবার সময় হল। পারীর রাস্তায় রাস্তায় নতুন বইখাতা হাতে ছেলে মেয়েদের ছুটোছুটি ও কলরব—পিয়ের জানে ওদের এই নিশ্চিন্ত উল্লাসের কি মূল্য দিতে হচ্ছে: মাদ্রিদের উপকণ্ঠে যুদ্ধ করছে ওরা। বাদাম গাছগুলোর শেষ রক্তিমতায় লাল হয়ে উঠেছে পারীর বুলভার। এই সময়টায় সকলে বন্দুক হাতে পাখী শিকারে বার হয়। তেসা গেছে মারকিস্ দ্য শাক্রঁর পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়ে; সেখানে গিয়ে সে একটা ছোট পাখী শিকার করে তারপর একটি তরুণী পরিচারিকাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। চেম্বারের লবিতে এই গল্প মুখে মুখে ফিরছে। কিন্তু ভীইয়ার এই সব রক্তারক্তি খেলা ভালবাসে না; রক্তপাতের দৃশ্য একেবারেই সহ্য করতে পারে না সে। সে শান্তিবাদী। ক্রুদ্ধ হয়ে পিয়ের বলল, 'মাংস খায় কেন, নিরামিষাশী হলেই পারে ও?'

ভেঙে পড়েনি শুধু মিশো। প্রথম স্বেচ্ছাবাহিনীর সঙ্গে দু-একদিনের মধ্যেই সে স্পেনে যাচ্ছে। প্রশংসা ও হিংসার দৃষ্টিতে পিয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল মিশোকে। এই হচ্ছে একটা লোক! কি বলেছিল ও?...জয়ের পথ দুর্গম... হ্যাঁ, কথাটার অর্থ পিয়েরও এবার বুঝতে শুরু করেছে বোধ হয়। এক সময়ে বলা হত, জয়ের দেবী পক্ষ-সমন্বিতা। কিন্তু দেবীর পা দুটো ভারী ও ক্ষতবিক্ষত, ধুলো ও রক্তে কলঙ্কিত।

২৮

কূটনীতিকের চাকরি ভাল লাগছিল না লুসিয়ঁর। আপিসের কাজকর্ম করতে অবশ্য বেশী সময় লাগত না কিন্তু বাকী সময়টুকু কিভাবে কাটাবে তাই নিয়েই তার দুর্ভাবনা। নিরুৎসুক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকত রেনেশাঁ অট্টালিকার জাঁকজমকের দিকে, ছাত্র ও খচ্চরের পালের দিকে। পারীর কাফেগুলোর সেই উদ্দেশ্যহীন আলাপ-আলোচনা, সেই গল্পগুজব ও নাটকীয়তা—এছাড়া

সে থাকতে পারে না। নিজের বিছানা বা সিগারেট-পাইপের মত এই পরিবেশের সঙ্গেও সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাই লুসিয় এই ডাল-মাইনের চাকরিও প্রায় ছাড়তে বসেছিল, এমন সময় স্পেনের ঘটনা তাকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে বসল। রাস্তার ধারে সাইনবোর্ডের লেখাগুলো যেমন হেড লাইটের আলোয় ঝলসে ওঠে তেমনি এই লোকটিরও মনে হল যে সত্যকে এবার সে খুঁজে পেয়েছে।

স্পেনের বিদ্রোহ সেখানে যে বহিঃগত পরিবর্তন এনেছে, প্রধানত তাই নিয়েই লুসিয়ঁর উদ্দীপনা। মাঝে মাঝে তার মনে হয় যেন সে কোন একটা প্রাচীন বিখ্যাত নাটককে মঞ্চস্থ করতে সহায়তা করছে। সৌম্যদর্শন লম্বাটে মুখ একদল লোক পুড়িয়ে মারছে অবিশ্বাসীদের। ক্রুশ ঘোরাতে ঘোরাতে কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করছে প্রণয়িনীর জন্যে। খোঁড়া—স্পেনে যাদের সংখ্যা অসংখ্য, কুঁজো, অন্ধ আর দানবরা সর্বত্র বেরিয়ে আসছে কুটির ছেড়ে। ওড়না গায়ে মেয়েরা আলিঙ্গন করছে গোলন্দাজ সৈন্যদের। একাকার হয়ে গেছে হাতবোমা আর চুলের ফিতে। এই দৃশ্য লুসিয়ঁর কাছে অভূতপূর্ব—এর নাটকীয় বৈচিত্র্য, রুচিহীনতা আর প্রখর দীপ্তি অভিভূত করেছে তাকে।

একজন ফ্যালাঞ্জিস্ট নেতার সঙ্গে লুসিয়ঁর পরিচয় হয়েছিল। লোকটি সেনা-বাহিনীর মেজর, নাম জোসে গুয়ারনেজ। রসকসহীন শুকনো চেহারা, ভয়ংকর একগুঁয়ে প্রকৃতি। দিনের বেলা মানুষ মারে আর রাত্রিবেলা ধর্মপ্রচার করে। লুসিয় দেখে আশ্চর্য হল যে এই স্প্যানিশ অফিসারটির কথাবার্তা তার নিজের মনের গোপন চিন্তার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। যে বিষয়ে জোসে কথা বলে তা হচ্ছে সামাজিক পদের পবিত্রতা, যুক্তির পক্ষে জনতার অনুগামিতা এবং মেধা ও কর্মক্ষমতা। অনেক কথা লুসিয়ঁর মনে পড়ে—পারীতে তার অবজ্ঞাত জীবন, লুমানিতের সেই নির্বোধ লোকটা, পিয়েরের এবং জগতে যত পিয়ের আছে সকলের মাধ্যমিকতা, নির্বাচনের যোগবিয়োগ, এবং তার নিজের শ্রেষ্ঠত্ব যা অন্য কারও কাছে স্বীকৃতি পায় না। আগুন হাতে নিয়ে ফ্যালাঞ্জিস্টরা স্বীকৃতি আদায় করেছে। জোসে যে সব পুস্তিকা লেখে তার জন্যে কোন দরজী বা খনি-মজুরের মতামতের অপেক্ষা রাখে না। লুসিয় চিরকাল বলে এসেছে যে পুরনো পৃথিবীকে বদলাতে হলে দরকার কয়েকজন দুঃসাহসিক লোক আর একটা ষড়যন্ত্র। কমিউনিস্টরা হেসেছে এই কথা শুনে। ওদের মতে, জনসাধারণকে শিক্ষিত করে গণ-আন্দোলনের ভেতর জাগিয়ে তুলতে

হবে। এখনো ওরা সেই অতীত যুগেই বাস করছে : মার্ক্স্, কমিউন, গণতন্ত্র, প্রগতি—যত সব বাজে কথা! এটুকু কি ওরা দেখতে পায় না যে মার্ক্স্‌বাদের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে 'অধিকার ঘোষণা', এনসাইক্লোপিডিস্টরা, বিজ্ঞানে বিশ্বাস, প্রত্যক্ষ মানবিক নীতি সম্পর্কে একটা আতঙ্কসঞ্চারী ধারণা? সমাজ তো আর এই বাড়ীটার মত একটা চতুষ্কোণ দালান নয়, সমাজ একটা পিরামিড! ফ্যাশিজম নতুন একটা জাগতিক মান সৃষ্টি করবে : বই নয়—শরীরচর্চা ও খেলাধূলা সম্পর্কে উৎসাহ, পার্লামেণ্টারি রিপোর্ট আর আলোচনা নয়—সরকারী আপিস আদালতের সশস্ত্র অধিকার, নির্বাচন নয়—টমিগান।

এই স্প্যানিয়ার্ডটির কথাবার্তায় আরো একটা কিছু আছে যা লুসিয়ঁকে প্রেরণা দিয়েছে। সেটা হচ্ছে মৃত্যুকে ধর্মমতের মত গ্রহণ করা। আঁরির মৃত্যুর পর থেকে লুসিয়ঁ খুব ভাল করেই জানে অস্তিত্বহীনতার গুরুত্ব কতখানি এবং তরুণ ও তাজা মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া কত গভীর। এই বিষয়ে সে একটা উপন্যাস লিখেছে। কমিউনিজম্ সম্পর্কে তার উৎসাহটা একটা অসতর্ক মুহূর্তের পদস্খলন মাত্র। অপরের আনন্দোচ্ছ্বাস, ছেলেমানুষি হট্টগোল ও যৌবন সম্পর্কে খোসামুদে মনোভাব তার ভেতরেও মুহূর্তের জন্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু হোসের কাছে, এবং লুসিয়ঁর কাছেও, মৃত্যুর একটা পরম ও অপরিবর্তনীয় মূল্য আছে। আকস্মিকতামুখী—সুতরাং সন্দিগ্ধ জীবনকে তা পরিশুদ্ধ করে তোলে।

এই নতুন উদ্দীপনা পেয়ে বসল লুসিয়ঁকে, এবং মেজর যখন বলল যে ব্রতৈলের সঙ্গে ফ্যালাঞ্জিস্টদের সম্পর্ক স্থাপন করবার জন্যে লুসিয়ঁর উচিত পারী যাওয়া, তখন এক কথায় রাজী হয়ে গেল সে।

পারীতে বা দূতাবাসে একটি কথাও সে জিজ্ঞেস করল না। নিজের চাকরি সম্পর্কে কোন কথা ভাবতে চায় না সে, ভাবলে নিজেকে ছোট করা হয়। জাকার পথে সে পারীর দিকে রওনা হল। গাড়ী এগিয়ে চলল আঁকাবাঁকা পথ ঘুরে, রৌদ্রদগ্ধ লালচে-বাদামী পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। জনপ্রাণীশূন্য ধু ধু মাঠ! এই পরিবেশটা তার মানসিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে একেবারে; মৃত্যুকে মনে হচ্ছে আপন বোনের মত—লালচে-বাদামী ও প্রজ্বলিত।

স্পেনের মাতমাথানো আবহাওয়া পার হয়ে ফ্রান্সের ক্ষেতখামার, তার শান্ত জীবনযাত্রা, বেতনসহ ছুটি ও মজুরি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাকে মনে হল

কত তুচ্ছ! চারদিকে প্রাচুর্য এসেছে এবং প্রথম দিনেই তার কানে এল বহুবার পুনরাবৃত্তি করা সেই পুরনো কথাটা, 'সব কিছু স্থিতি লাভ করছে।'

বুকে জড়িয়ে ধরে লুসিয়ঁকে তার বাবা অভ্যর্থনা করল। লুসিয়ঁ এখন আর সেই অমিতব্যয়ী পুত্র নয়, একজন কূটনীতিক (লুসিয়ঁ কেন ফিরে এসেছে তা তার বাবাকে বলা বিবেচনার কাজ বলে মনে করেনি)। ছেলের কাছে তেসা স্পেনের অবস্থা একবারও জানতে চাইল না। অনেক আগে থেকেই সে সিদ্ধান্ত করে রেখেছে যে ফ্রাঙ্কোর জয় সুনিশ্চিত; অন্য যা কিছু খবর আছে তা জানবার জন্যে তার কিছুমাত্র কৌতূহল নেই। এসব কথায় না গিয়ে সে লুসিয়ঁর কাছে নিজের পরিকল্পনার কথা বলতে শুরু করল। বৈদেশিক কার্য-পরিচালনা কমিশনের সভাপতি নিয়োজিত হয়েছে সে এবং বৈদেশিক বিভাগের গোপন কাগজপত্র মন দিয়ে পড়তে শুরু করেছে,—উপযুক্ত মুহূর্তে সে একটা বজ্রনির্ঘোষী বক্তৃতা ছেড়ে মন্ত্রীসভার পতন ঘটাবে। লুসিয়ঁ হাই তুলল—আবার সেই পার্লামেন্টারি ঘোট পাকানো!

কি রকম লোকের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হয় তা ব্রতৈল খুব ভাল করেই জানে। গ্রি-নে ধরনের 'মন্ত্রশিষ্য'দের প্রতি তার ব্যবহার অত্যন্ত কঠোর, কিন্তু ডেপুটিদের মুগ্ধ করতে, এমন কি তোষামোদ করতে সে রীতিমত ওস্তাদ। লুসিয়ঁর সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করল যেন তারা দুজনে একই দরের লোক। লুসিয়ঁ মন খুলে কথা বলল,—এতদিন পর তাকে যথোচিত মূল্যদান করা হয়েছে। দুজনের মধ্যে প্রথমে কথা উঠল প্রচারকার্য চালানো সম্পর্কে। ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহকে উদাহরণ স্বরূপ তুলে ধরতে হবে। আর ব্রতৈল কিছু অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছে, আলকাজারের রক্ষাকর্তা কর্ণেল মসকার্দোকে একটা স্বর্ণ-তরবারি উপহার দেবার ইচ্ছা তার। তারপর ব্রতৈল কথা তুলল, কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে: জাহাজবন্দী অস্ত্র পাঠানো, বুর্গসের জন্যে বৈমানিক সংগ্রহ, যোগাযোগ রক্ষা করার কাজ—যেমন, বার্সেলোনার গুপ্তচরবিভাগের রসদ পারীর ভেতর দিয়ে চালান দেওয়া।

'আপনি কবে ফিরে যাবেন?' বলল ব্রতৈল।

'জানি না।'

ব্রতৈল তার শুকনো অস্থিসার হাতটা লুসিয়ঁর হাতের ওপর রেখে বলল:

'আপনার চেয়ে আমি বয়সে বড়। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের মাপটাই জীবনের মাপ

নয়। খাঁটি ঘৃণা যে কি জিনিস তা আপনি জানেন। স্পেনে ফিরে যাবেন কেন? যা কিছু আসল ব্যাপার, তা এখানেই ঘটবে।'

'ষড়যন্ত্র?'

'হ্যাঁ।'

'মন্ত্রশিষ্য' বাহিনীর কথা ব্রতৈল খুলে বলল লুসিয়ঁর কাছে।

'এই ব্যাপারে আপনি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারেন। আপনার বাবা—'

'আমার বাবার সঙ্গে আমার কিছুমাত্র মিল নেই!'

'বুঝেছি। কিন্তু আপনার বাবা পার্লামেণ্টারি কমিশনের সভাপতি। ওরা আমার কাছে অনেক কিছুই গোপন রাখছে। কিন্তু আপনি যদি থাকেন তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না, সুযোগ না আসা পর্যন্ত আমরা ভালভাবেই কাজ চালাতে পারব। অবশ্য, ব্যাপারটা মাদ্রিদের যুদ্ধের মত অতটা রোমাঞ্চকর নয়। কিন্তু যে সময়ে যা…'

লুসিয়ঁ মাথা নাড়ল। বিদায় নেবার আগে সে ব্রতৈলকে বলল:

'জানেন কেন আমি সমস্ত কাজের জন্যে প্রস্তুত—এমন কি এই কাজের জন্যেও? প্রতিটি যুগের একটা নির্দিষ্ট পরিণতি আছে। আপনি একে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদও বলতে পারেন। মৃত্যুকে আমরা গ্রহণ করেছি জীবকোষের ধ্বংস হিসেবে নয়, বস্তুর অনির্দিষ্ট আবর্তন হিসেবে নয়, লোকান্তরের পথ হিসেবে নয়—ব্যক্তিবিশেষের উচ্চতর সৃজনীশক্তি হিসেবে।'

এই সুন্দর যুবকটির মুখের দিকে আর তার বাদামী চুলের দিকে তাকিয়ে দেখল ব্রতৈল।

'হয়ত আপনার কথা ঠিক,' শোকার্ত গলায় বলল সে, 'কিন্তু ব্যক্তির অবিনশ্বরতার ওপর আমি বিশ্বাস হারাতে পারি না। আমার পুত্রের মৃত্যু…'

বাবার সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া বাঁধিয়ে বসেছিল লুসিয়ঁ। তেসা যখন জানতে পারল যে তার ছেলে বৈদেশিক বিভাগের চাকরি অবহেলা করেছে, তখন সে লাফালাফি দাপাদাপি শুরু করে দিল। বাবার কাছে লুসিয়ঁর নিজের পক্ষে কোন যুক্তি খুলে বলবার ক্ষমতা ছিল না, তার ওপর আবার কয়েক হাজার ফ্রাঁ চাইতে হল বাধ্য হয়ে।

আস্তে আস্তে লুসিয়ঁর মনে স্পেনের স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে এল। যে ষড়যন্ত্রের

কথা বলা হয়েছিল তা তার কাছে একটা খেলা ছাড়া কিছু মনে হল না। কোন প্ল্যান নেই, কোন নির্দিষ্ট তারিখ নেই, জিজ্ঞাসা করলে ব্রতৈল শুধু বলে, 'আরও অপেক্ষা করতে হবে।' জোসের সাঙ্গপাঙ্গরা ইতিমধ্যেই মাদ্রিদের দিকে এগিয়ে এসেছে। আর বাবার আপিসের বিভিন্ন দলিলপত্র মন দিয়ে পড়ছে লুসিয়ঁ ও রিপোর্ট দিচ্ছে ব্রতৈলের কাছে। কিন্তু এ-কাজে খুব বেশী সময় লাগে না—অবসর সময়টা বাবার আপিসের বারান্দায়, ব্রতৈলের ওয়েটিং-রুমে আর সান্ধ্য রাস্তায় ক্লান্তিতে ভরে উঠেছে।

সময় কাটাবার জন্যে লুসিয়ঁ কোন আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছে না, নেচে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে, অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প জমিয়ে বসছে যখন তখন, ফ্লার্ট করছে সোসাইটি মেয়েদের সঙ্গে। মতিনী নামে একজন বিরাট শিল্পপতির মেয়ে লুসিয়ঁর প্রেমে পড়ে গেল। গোলগাল মেয়েটি, কথায় কথায় খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। যোসেফিনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছে লুসিয়ঁর রোমান্টিক চেহারা, তার মুখে স্পেনদেশের নানা আজগুবী গল্প, আর তার একটা স্বভাব—কারও সঙ্গে বিনীত আলাপ আলোচনার ভেতর হঠাৎ সে চুপ করে যায়, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কোন একটা বিশেষ দিকে, হাসে অস্পষ্টভাবে। লুসিয়ঁর এই প্রেমকাহিনী শুনে তেসা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বৈদেশিক পদের পরিবর্তে ধনী স্ত্রী গ্রহণ করাটাই যদি লুসিয়ঁ ভাল মনে করে থাকে, তবে ওকে বোকা বলা চলে না নিশ্চয়ই!

যোসেফিন আশা করছে, এবার লুসিয়ঁ তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব তুলবে। এই আশায় সে মাঝে মাঝে নিভৃত চা-ঘরে বা বোয়া দ্য বুলোঞ-এ মিলিত হচ্ছে লুসিয়ঁর সঙ্গে। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে সে লুসিয়ঁর একটা হাত চেপে ধরল। শরতের উজ্জ্বল দিন। বোয়ার লাল ও তাম্রাভ এ্যাভিনুতে বেড়াতে বেরিয়েছে ওরা। দূরে ঘোড়ার পিঠে বসে শপ্ শপ্ করে চাবুকের শব্দ করছে একটি মেয়ে। লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে যোসেফিন, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্য দিকে। সতর্কভাবে লুসিয়ঁ নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল:

'খোলাখুলি কথা বলা যাক। তোমাকে আমার ভাল লাগে। তাছাড়া তুমি ধনী। এই কালই টাকার জন্যে আমার ঘড়ি বাঁধা দিতে হয়েছে...তবুও তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারিনি। তোমার বয়স তেইশ। সব সময়েই তুমি হাসছ। আর আমি? আমি আমার বন্ধু জোসের মত, মৃত্যুকে আমি বঁধুরূপে গ্রহণ করেছি।'

২৯

লুসিয় যোসেফিনের সঙ্গে আর দেখা করতে যায় না—একথা শুনে তেসার সমস্ত আশা একদিনে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। না, ওই হতভাগাটাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না! কিন্তু আরো বড় একটা আঘাত অপেক্ষা করছিল তেসার জন্যে। রোমের বৈদেশিক দূতাবাসের একটা রিপোর্ট হাতে নিয়ে বসে বসে সে ঢুলছিল, এমন সময় ঘরে ঢুকল দেনিস। তেসা খুশি হল; গত কয়েক মাস নিজের মেয়ের বিশেষ কোন খোঁজখবর সে পায়নি, আমালির কাছে শুনেছে দেনিসের শরীরটা ভাল নয়, কেমন মনমরা হয়ে থাকে সব সময়ে। তেসা মনে করেছিল, সেই দিন সন্ধ্যা থেকেই—যেদিন তেসা দেনিসের কাছে পার্লামেণ্টে নিজের সাফল্য সম্পর্কে বলেছিল—দেনিস তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। দূর ছাই, রাজনীতি! এর জন্যে তার সমস্ত গ্রীষ্মটা নষ্ট হয়েছে। আমালি এবার সমুদ্র-স্নানে যায়নি কারণ 'ছোটলোকদের' সঙ্গে কোন সম্পর্কে রাখতে সে রাজী নয়। লুসিয় ফিরে এসেছে স্পেন থেকে। আর দেনিস—হয়ত সত্যিই ওর শরীর খারাপ, কি রকম ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে ওকে, কালো দাগ পড়েছে চোখের নীচে। তেসার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে দেনিস কেমন আছে, কিন্তু সেই সুযোগ সে পেল না।

দেনিস বলল, 'আমি চললাম। এবার থেকে আমি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করব।'

এত অসন্তুষ্ট হল তেসা যে কান্নার মত একটা চিৎকার করে উঠল।

'চুলোয় যা। ছোকরা বন্ধু জুটেছে বুঝি?'

'না, একা।'

অবাক হয়ে তেসা মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। না, ওর যে সত্যিই অসুখ হয়েছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একথা মনে হতেই তার সুরটা নরম হল এবং মনের ভাবটা দু-একটা খোঁচার ভেতর যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা করল।

'আমাকে দয়া করে বলবে কি, কেন তুমি যাচ্ছ?'

'আমি ভেবেছিলাম যে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে—বিশেষ করে সেই দিনের কথাবার্তার পর। এ ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই। তোমার খরচে আমি আর থাকতে চাই না।'

তেসা আর সহ্য করতে পারল না। 'তাহলে যাওয়াটাই ঠিক। তোর দাদার মত বদমাস আর পাজী কোন বাবুর সন্ধান পেয়েছিস বুঝি?'

'আমি জানতাম যে তোমাকে বোঝানো যাবে না। হয়ত এইটাই তোমার যুক্তি। লুসিয় সব দিক থেকেই দোষী, কারণ সে ইচ্ছা করলেই অন্য ভাবে জীবন কাটাতে পারত। কিন্তু তুমি যা করছ, তার মধ্যে একটুও অস্বাভাবিকতা নেই—এ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। ঘুষ নিতেও যেমন তোমার বাধে না, তেমনি বাধে না নীচ প্রকৃতির লোককে আড়াল করতে, স্প্যানিয়ার্ডদের বিপদে ফেলতে। এখন যে তুমি আমাকে অপমান করলে তাও তোমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমার মনে হয় এর পর আর কোন কথা না বলাই আমাদের দুজনের পক্ষে ভাল।'

'দাঁড়া! যাচ্ছিস কোথায়?'

'আমার নিজের জায়গা আছে। আমি একটা ঘর ভাড়া করেছি।'

'টাকা দিয়েছে কে? নিশ্চয়ই তোর মা—অর্থাৎ সেই আমারই টাকা?'

'না। আমি একটা আপিসে চাকরি নিয়েছি।'

'ওই মহামূল্য চাকরিটির মাইনে কত জানতে পারি কি?'

'মাসে আটশো ফ্রাঁ।'

জোর করে তেসা মুখের ওপর হাসি ফুটিয়ে তুলল:

'বাঃ, চমৎকার মাইনে। তোকে লেখাপড়া শেখানো সার্থক হয়েছে দেখছি! দাঁড়া!'

কেমন পাগলের মত ছুটে এসে তেসা মেয়ের হাত চেপে ধরল। এবার রাগের বদলে করুণা জাগল তার মনে। বেচারা! এটা স্নায়ুর অসুখ ছাড়া কিছু নয়। অনেক আগেই মেয়েটার বিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। বহুদিন থেকেই তো আমালিকে সে বলছে···

'পাগলামি করিস না দেনিস। এখন তোর বিশ্রাম আর চিকিৎসা দরকার। এটা তোর স্নায়ুর অসুখ। সাধারণও হতে পারে, শক্তও হতে পারে। ছোট বেলায় আমারও একবার এই অসুখ হয়েছিল। দাঁড়া!'

কিন্তু দেনিস চলে গেল। পেছন পেছন এসে হলঘরের ভেতর তেসা আবার নাগাল ধরল দেনিসের এবং এক তাড়া নোট গুঁজে দিল মেয়ের হাতে:

'তোর গোয়ারতমিই যদি বজায় থাকবে তো এগুলো নিয়ে যা!...আমার ওপর দয়া করে নিয়ে যা! আমার কথাটা একবার মন কর!...'

নোটগুলো না দিয়েই দেনিস চলে গেল। ফিরে এসে তেসা শুয়ে পড়ল একটা সোফার ওপর, তারপর কাঁদতে শুরু করল হঠাৎ। নিজের কান্না দেখে নিজেই সে অবাক হল আর মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করল এর আগে আর কোনদিন কোন কারণে তার চোখে জল এসেছে কি না? কি একগুঁয়ে মেয়ে! নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনছে। মাসে আটশো ফ্রাঁ দিয়ে কি করে চলবে! এই অবস্থা একটা মাসও ও সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ; এক জোড়া মোজার জন্তেই হয়ত কারও কাছে ওকে যেতে হবে, তখন আর সর্বনাশের বাকি থাকবে কি! এ সবই হতচ্ছাড়া রাজনীতির জন্তে! এই হতভাগা কাজে না নামলেই পারত সে।

বাড়ীর ভেতরকার অপ্রীতিকর আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে এসেই দেনিস স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। অসামাজিক, 'ইঁদুরমুখী' বলে তার একটা দুর্নাম আছে, কিন্তু কোনদিন সে মুখ ভার করে থাকেনি। আর এখন যে সম্মানজনক দারিদ্র্যকে সে স্বেচ্ছায় মাথা পেতে নিল, সেজন্তেও তার মনে এতটুকু দুর্ভাবনা নেই। খুঁত-খুঁতে হিসাব-রক্ষকটি ঠাট্টা করে নাম দিয়েছে 'ক্ষুদে পাখী।' অন্ধকার আপিস ঘরটায় সারাদিন আলো জ্বালিয়ে রাখতে হয়, লণ্ডন থেকে চালানী পাথুরে কয়লার ওপর সারাদিন চিঠিপত্র লিখতে হয় দেনিসকে। কিন্তু তবুও দেনিস হাসে। শুধু আপিসে নয়, ঘরেও। একটা হোটেলের ছাদের ওপর চিল-কোঠার ঘরটা সে ভাড়া নিয়েছে। অন্ধকার ঘুরনো সিড়িটা স্যাঁতসেঁতে, সস্তা পাউডারের গন্ধ। ছোট্ট ঘরটায় বিছানা পাতবারও জায়গা নেই, দেওয়াল কাগজগুলো নোংরা। তবুও এই ছোট ঘরটাই ভাল লাগছে দেনিসের। দেওয়ালের আরশিটায় বোধ হয় এই সর্বপ্রথম একটা উৎফুল্ল মুখের ছবি ফুটে উঠল।

অনেক দিন লেগেছে তার এই সিদ্ধান্তে পৌছতে। বসন্তের প্রথম দিককার যে সন্ধ্যাগুলোতে তার সঙ্গে মিশোর প্রথম সাক্ষাৎ, তখন থেকেই তার এই সচেতনতার শুরু। আর এখন শারদ বৃষ্টি সারারাত ধরে ছোট্ট জানলাটার গায়ে সশব্দে ফেটে পড়ছে। ঘটনাবহুল গ্রীষ্ম ঋতু কেটেছে চোখের ওপর দিয়ে, মিশোর সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বহুবার, নিঃসঙ্গ সময়টুকু পার হয়েছে দীর্ঘ চিন্তার জাল বুনে—তারপর দেনিস আবিষ্কার করতে পেরেছে নিজেকে। তার এই সিদ্ধান্ত যে অপরিবর্তনীয় তা বোঝা যায় তার উপভোগ-সূচক ভ্রূকুটিতে ও মুখের হাসিতে। অনেক দিন পর মিশোর সঙ্গে আবার যখন দেখা হল, সে শুধু বলল:

'এবার কাজ...স্পেনের জন্যে আমি কিছু করতে চাই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমি সময় দিতে পারি।'

বুলভার সেবাস্তোপোল-এর ওপর দিয়ে ওরা হাঁটছে। রাস্তায় ঘন কুয়াশা—পারীর প্রথম শারদ কুয়াশা। হলদে মেঘের ঢেউয়ের ওপর রাস্তার আলোগুলো যেন ভাসছে। স্পষ্টভাবে কিছু চেনা যাচ্ছে না, পথচারীরা ধাক্কা খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। বাদামভাজা, প্রসাধন আর তামাকের ধোঁয়ার গন্ধ জড়িয়ে আছে ভিজে কুয়াশার আবর্তনের ভেতর। 'ফ্রেগাৎ' 'লিপ্‌পে' 'ফ্লাওয়ার্স'—সাইনবোর্ডের লাল অক্ষরগুলো কুয়াশার মালার ভেতর এক একবার ভেসে উঠছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

'তোমাকে টেলিফোন করব ভাবছিলাম,' বলল মিশো।

'টেলিফোনে আমাকে আর পাওয়া যাবে না। আমি বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছি।'

মিশো সবই বুঝতে পারল, দেনিসের হাতের ওপর মৃদু চাপ দিল সে। হাসছে দেনিস, সাইনবোর্ডের অক্ষরের মত ওর উৎফুল্ল চোখ দুটো জ্বলে উঠেছে কুয়াশার ভেতর।

কমিটি আপিসে ওরা পৌঁছল। প্রত্যেকের মুখে একটিমাত্র শব্দ—'মাদ্রিদ'। তরুণ যুবক—যারা যুদ্ধে যাবার জন্যে উদ্‌গ্রীব, বুকে শিশু স্ত্রীলোক যারা তাদের যৎসামান্য সঞ্চিত অর্থ নিয়ে এসেছে মাদ্রিদের মা-দের জন্যে, শ্রমিক, শিল্পী, পরিচারক, ছাত্র, বিদেশী—প্রত্যেকে বারবার উচ্চারণ করছে এই একটি শব্দ। পারীর লাঞ্ছিত জীবন্ত চেতনাকে খুঁজে পাওয়া যাবে এখানে। ভীষণ ভীড় ঘর দুটোতে, দেওয়ালে মাদ্রিদের মানচিত্র আর কাগজের তৈরী স্প্যানিশ রিপাব্‌লিকের পতাকা। ওরা মাদ্রিদের দিকে এগিয়ে আসছে—কথাগুলো উচ্চারিত হবার সময় রীতিমত উৎকণ্ঠা ফুটে উঠছে। ওরা ওদের হটিয়ে দেবে—কথাগুলো সবাই বলছে নিজেদের প্রবোধ দেবার জন্যে। অর্থ, সময়, জীবন—স্পেনের জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত সবাই।

ঠিক হল, রোজ সন্ধ্যায় দেনিস এখানে আসবে। অত্যন্ত সহজভাবে দেনিস সবাইকে 'কমরেড' বলে ডাকছে, যেন এইভাবে কথা বলতেই সে সারাজীবন অভ্যস্ত—দেখে হাসল মিশো।

কুয়াশার ভেতর মিশো দেনিসকে বাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। রাস্তায় বাদামভাজা কিনল মিশো। দেনিস তার জমে-যাওয়া আঙুলগুলো গরম করে

নিল সেই বাদমভাজায়, তারপর মিশোকে বলল তার নতুন জীবনের কথা।

'হিসেব-রক্ষক লোকটা ভীষণ খিটখিটে। তার মুখের যেন আর বিরাম নেই। এই দেখ! তোমার জন্যে আবার এই জায়গাটা নতুন করে লিখতে হবে!' —কথাগুলো সব সময়েই বলছে সে আমাকে। আর ম্যানেজারটা তো একটা ফ্যাশিস্ট এবং অত্যন্ত ভয়ানক লোক। ও বলে মাদ্রিদ এতদিনে অধিকৃত হয়ে গেছে। আমাকে ও সিনেমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে যে আমার মাইনে বাড়ানো বা চাকরি নেওয়া ওর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। আমি ওকে বলেছি, 'আমার একজন প্রণয়ী আছে। সে লোকটা হিংসুটে আর তার বন্দুকের লক্ষ্য কখনো ব্যর্থ হয় না।' শুনে ও আর আমাকে ঘাঁটাতে সাহস করেনি।'

দুজনে হাসল। দুজনেই হঠাৎ খুশি হয়ে উঠেছে। ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলেছে লোকে, আর সুখের সন্ধান পেল ওরা।

কিছুক্ষণ পর মিশো বলল, 'পরশুদিন আমি চলে যাচ্ছি।'

'তুমি কি স্পেনে যাচ্ছ?'

মিশো ঘাড় নাড়ল।

'মিশো, তুমি ফিরে আসবে তো?'

মিশো চুপ করে রইল।

'আমি জানি তুমি ফিরে আসবে।'

মিশো উত্তর দিল না। হঠাৎ বিষণ্ণ বোধ করছে সে। এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটল কি করে? দুজনের সাক্ষাৎ হবার পর অনেক কথা হয়েছে কিন্তু আরো কিছু একটা আছে যা এখনো বলা হয়নি। আর তাকে কিনা চলে যেতে হচ্ছে...

'মিশো, আমি চাই যে তুমি ফিরে এসো।'

মিশো আবার তার উৎফুল্লভাব ফিরিয়ে আনল।

'নিশ্চয়ই আসব,' বলল সে, 'আমরা জিতব আর তারপর আমি ফিরে আসব। আর তারপর...'

কথা বলতে বলতে ওরা হোটেলে পৌঁছে গিয়েছিল। হোটেলের অস্পষ্ট আলো প্রায় দেখা যায় না বললেই চলে। আর একটু হলেই ওরা হোটেল ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল আর কি। অন্যান্য দিনের মতই সাধারণভাবে ওরা বিদায় নিল পরস্পরের কাছে। কিন্তু দেনিস হঠাৎ পিছনে ফিরে তাকাল তারপর ছুটে এল মিশোর কাছে এবং অত্যন্ত বেমানানভাবে চুম্বন করল মিশোর গালে। বিস্ময়ের

ঘোর কাটবার পর মিশো দেখল দেনিস চলে গেছে। বহুক্ষণ সে দাঁড়িয়ে রইল একা একা আর হাসল নিজের মনে। ঝলসে-ওঠা কুয়াশার মালা এগিয়ে চলল ভাসতে ভাসতে।

৩০

যে দিন সন্ধ্যায় 'সীন' কারখানার শ্রমিকরা তাদের কমরেডদের স্পেনযাত্রা উপলক্ষে উৎসব-মত্ত, সেদিন লণ্ডনের নিরপেক্ষতা কমিটির উদ্দেশ্যে সোভিয়েট প্রতিনিধির একটা বিবৃতি বার হল খবরের কাগজগুলোতে। সেই সংক্ষিপ্ত তারের ভাষা জাগিয়ে তুলল পারীর শ্রমিকদের। রাস্তায়, মেট্রোতে, কাফের ভেতর সবাই বলাবলি করছে, 'এখন আর স্প্যানিয়ার্ডরা একা নয়!'

মিশোর মনে হল যেন তার নিজের জন্মোৎসব করছে। স্পেনযাত্রার আনন্দের সঙ্গে আর একটি আনন্দের যোগস্থাপন হল—যে আদর্শের জন্যে তার জীবন উৎসর্গীকৃত, তার জয়লাভ। বক্তৃতা শুরু করবার সময় উত্তেজিত হয়ে উঠল সে:

'এতদিনের স্বপ্ন সত্য হতে চলেছে! বাব্যোফ-এর স্বপ্ন কি ছিল? স্যাঁ আঁতোয়ান-এর 'বস্ত্রহীনদের' প্রেরণা দিয়েছিল কে? মৃত্যুদণ্ড হবার আগে বিচারপতিকে সে বলেছিল, 'আমাদের এই বিপ্লব আর একটি মহত্তর ও সুন্দরতর বিপ্লবের পূর্বগামী মাত্র!' ১৮৪৮ সালে নীল কোর্তা গায়ে শ্রমিকেরা প্রহরীদের গুলিবর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলেছিল—কাজ অথবা মৃত্যু! তাদের কাছে সাম্যবাদ ছিল একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন, তাক-লাগানো খাবার, রূপকথার কারখানা। মৃত্যুর সময় বাপ ছেলেকে বলছে—সমাজ-বিপ্লবের যুগ আগত! কুসংস্কারের বশে তারা এর নাম উচ্চারণ করেনি কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ঠিক আজকের মাদ্রিদের মতই পারীর দুর্গকে রক্ষা করতে হয়েছিল সেদিন। দেশের হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ সন্তানকে গুলি করে মেরেছিল ভার্সাইয়ের শাসনকর্তারা আর ভার্সাইয়ের জেলখানার বন্দীরা বুলেটের সামনে বুক পেতে চিৎকার করে বলেছিল—'সে দিন আসবেই!' চিরকালের স্বপ্ন এটা। এজন্যে প্রাণ দিয়েছে ফারমি-এর ধর্মঘটীরা। জোরের জীবনপাত এজন্যেই। এই স্বপ্নই দেখেছে সৈনিকেরা ভের্দ্যাঁর কামান-শ্রেণীর পেছনে, পেরপিঞাঁ-র ট্রেঞ্চে। আজ এটা আর স্বপ্ন নয়—একটা

জীবন্ত বাস্তব, একটা দেশ, একটা বৃহৎ রাষ্ট্র। কোন কিছু একে আড়াল করতে পারবে না বা নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না। আমরা যুদ্ধ করতে যাচ্ছি এমন কিছুর জন্যে নয় যা ভবিষ্যতে হবে, এমন কিছুর জন্যে যার অস্তিত্ব বর্তমান।'

ব্লুম আর ভীইয়ারের আদেশে সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবুও শত শত স্বেচ্ছাসৈনিক পিরেনিজ অতিক্রম করছে প্রতিদিন। কেউ যাচ্ছে ট্রেনে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে বা সাংবাদিক হিসেবে, কেউ পায়ে হেঁটে পাহাড় ডিঙিয়ে।

মিশো আর তার আটজন সঙ্গীর জন্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করা হয়েছিল। 'লা ভোয়া নূভেল্'-এর বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে মিশো যাচ্ছে; এই সম্পর্কে দরকারী কাগজপত্র পিয়ের নিয়ে এসেছে তার জন্যে। চুরানব্বইজন স্বেচ্ছাসৈনিকের একটা দল যাচ্ছে পেরপিঞাঁর দিকে, সেখান থেকে তাদের কাতালোনিয়ায় পাঠানো হবে।

সন্ধ্যা আটটার সময় ট্রেনটা ছাড়বে। স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায় জানাবার জন্যে বেশ বড় একটা জনতা জড়ো হয়েছে কী দরসে স্টেশনে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার কাছে কিছু কিছু লোক দাঁড়িয়ে; বিবাহিত তরুণ-তরুণীরা হাসছে, প্রচ্ছদপটে উলঙ্গ স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা একটি পত্রিকা কিনল একজন বৃদ্ধ, জানলায় মুখ বাড়িয়ে একজন মহিলা একগোছা ফুল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন সচকিতভাবে। স্যুটকেশ সাজিয়ে রাখছে কুলিরা—স্যুটকেশের গায়ে বিভিন্ন হোটেলের বিচিত্র লেবেল সাঁটা। যাত্রীদের মধ্যে আছে ব্যবসায়ী, পারীর মহিলা—যাঁরা শরতের কুয়াশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দক্ষিণাঞ্চলে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন, আর আলজিয়ার্সগামী সরকারী কর্মচারী। দু-একজন স্পেনের ঘটনার উল্লেখ করে বলল, 'আজ কিংবা কালকের মধ্যেই মাদ্রিদ অধিকৃত হবে। আর তার পরেই সব ঠাণ্ডা...'

কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলো ঘিরে যে জনতা দাঁড়িয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। ধোঁয়া আর ভীড়ের ভেতর রক্তবর্ণ গোলাপফুলকে মনে হচ্ছে ছোট ছোট পতাকা। স্বেচ্ছাসৈনিকদের বিদায় জানাতে এসেছে তাদের বন্ধু, কমরেড, মা ও স্ত্রী। চাপা স্বরে উচ্চারিত প্রেম ও অনুরাগের নানা শব্দের সঙ্গে মিশে গেছে একটা আনন্দ-গুঞ্জন—'এবার মাদ্রিদ কিছুতেই হাতছাড়া হবে না!' আর মিশেছে নানাদিকের চিৎকার ও গান। দেনিস ভীড়ের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু গার্ড যখন চিৎকার করে বলল, 'আপনারা নিজেদের আসনে গিয়ে বসুন',

তখন সে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এসে হাত ধরল মিশোর এবং শান্তভাবে বলল, 'আমি অপেক্ষা করব।'

হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠল। বজ্রমুষ্টি উঠল প্ল্যাটফর্মের ওপর, বজ্রমুষ্টি বেরিয়ে এল চারখানা তৃতীয় শ্রেণীর কামরার জানলা থেকে। প্রথম শ্রেণীর কামরা থেকে একজন স্ত্রীলোক মন্তব্য করলেন, 'কী বিশ্রী ব্যাপার!' রুমাল নাড়তে লাগল দেনিস, কুয়াশার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে ঝুঁকে-পড়া মিশোর দিকে। 'ঠিক তাই!' চিৎকার করে বলল মিশো। একজন স্বেচ্ছাসৈনিকের বৃদ্ধা মা কাঁদছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, লাল আলো জ্বলে উঠেছে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, নতুন যুদ্ধের গান ফিরে আসছে কুয়াশায় ভাসতে ভাসতে।

গত কয়েকদিনের উত্তেজনায় এত ক্লান্ত হয়েছিল মিশো যে ট্রেন ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমের ভেতরেও সে শুনতে লাগল চাকার আওয়াজ, সঙ্গীদের কথাবার্তা, স্টেশনগুলোর নাম। নারবন্‌-এর কাছাকাছি এসে ভোরবেলা ঘুম ভাঙল তার। ধূসর হ্রদের পাশ দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। লোকজনের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ধারে ধারে নলখাগড়ার বন, শান্ত জলের ওপর পাখী উড়ছে নীচু হয়ে। দূরে, সূর্যের গোলাপী আলোয় আগুন ধরে গেছে জলে। এই মুহূর্তগুলোতে মিশোর মন জুড়ে বসল দেনিস, মনে পড়ল দেনিসের উষ্ণ হাত আর তার শেষ কথাগুলো। বিষণ্ণ বোধ করল না সে, গম্ভীর প্রশান্তিতে মন ভরে উঠল।

তারপর এল সমুদ্র। কী গভীর শান্তি। আঙুরের ক্ষেত, দক্ষিণাঞ্চলীয় সূর্য, জেলেদের হালকা জাল—যেন আনন্দের জন্যেই চারপাশের সব কিছুর সৃষ্টি। কিন্তু একটু পরেই—সামনের ওই পাহাড়গুলো পার হলেই—দেখা যাবে যুদ্ধ চলছে। কামরার সকলে জেগে উঠল, উদগ্রীব দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ের রং বদলাচ্ছে—কখনো বেগুনী, কখনো লাল। ওপাশে ওদের যাত্রা শেষ।

স্পেনের সীমান্তরক্ষীরা ট্রেনের যাত্রীদের দিকে তাকিয়ে বজ্রমুষ্টি তুলল—স্বেচ্ছাসৈনিকরা ছাড়া ট্রেনে এখন আর বিশেষ কোন যাত্রী নেই বললেই চলে। তারপরেই ভাঙা ঘরবাড়ী। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা শিস দিচ্ছে—'রিয়েগো মার্চ'-এর বিষণ্ণ অসতর্ক সুর।

ছ-মাস পরে দেখা গেল, পারী কমিউন ব্যাটালিয়নের লেফ্‌টেনান্ট মিশো একশোজন ফরাসীর সাহায্যে মাদ্রিদের কাছে একটি ক্ষুদ্র অর্ধ-ভগ্ন গ্রাম রক্ষা করছে। ভোর হবার এক ঘণ্টা আগে ওরা এই গ্রামে পৌঁচেছিল। চারপাশে ক্যাস্টোলিয়ান পর্বতমালার উঁচু নীচু চূড়াগুলো থম্‌কে-থাকা সমুদ্রের মত। এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে কতটুকুই বা ওদের মিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ওরা—উৎফুল্ল জীবন্ত মুখ, ঠাট্টাতামাসা লেগেই আছে, স্রোতের মত কথা বলা স্বভাব। এই নিষ্ঠুর ও সুন্দর দেশের সঙ্গে বা এখানকার সম্ভ্রান্ত, কঠোর ও আবেগপ্রবণ অধিবাসীদের সঙ্গে ওরা মিশে যেতে পারেনি। ছলচাতুরি ও ছেলেমানুষিতেভরা পারীর ছেলেমেয়েরা নিজেদের বিদেশী মনে করছে এই দেশে। কিন্তু একই উদ্দেশ্যের প্রতি বিশ্বাস ও স্প্যানিয়ার্ডদের অন্তরঙ্গতা আছে বলেই প্রবাসের দুঃখটা ওরা বিশেষ টের পায়নি।

কিছুক্ষণ গোলাগুলি ছুঁড়বার পর সকাল সাতটার সময় ফ্যাশিস্টরা এগিয়ে আসতে শুরু করল। চারজন মেশিনগানধারী সৈনিক নিহত হল ফ্যাশিস্টদের গোলায়। মিশো এবং তার সঙ্গীরা ছিল একটা পাহাড়ের ওপর কতগুলো দ্রুত-খুঁড়ে-নেওয়া ট্রেঞ্চে। সেখান থেকে ওরা দেখল, একটা খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে ফ্যাশিস্টরা গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। মেসিনগানের গুলি ছুঁড়ে ফিরিয়ে দেওয়া হল শত্রুদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় আর একটি দল মাথা তুলল সেই জায়গায়। মিশো আদেশ দিল, 'হাত বোমা ছোঁড়ো!'

এই ব্যাপারটা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না কিন্তু মিশোর কাছে মনে হল যেন একটা দিন কেটে গেছে। ফ্যাশিস্টদের আক্রমণ প্রতিহত করল ওরা। মিশোর কমরেড তালা-কারিগর জঁতোই মারা গেল দুপুরবেলা। মরবার আগে অধীর উৎকণ্ঠায় বারবার সে বলেছিল, 'বোলো—', কিন্তু মিশো তার কোন কথা বুঝতে পারেনি।

সন্ধ্যার সময় একটা স্প্যানিশ ব্যাটালিয়ন এসে ওদের ছেড়ে দিল। একশো-জনের মধ্যে এখন মাত্র বিয়াল্লিশজন বেঁচে আছে, সতেরজনকে পাঠানো হয়েছে হাসপাতালে।

তারপর ওরা আগুন জ্বালিয়ে হাত পা সেঁকল ও ঝোল রান্না করল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কে যেন—ঝোলের ভেতর দেবার মত কিছুই ছিল না! সাধারণত এই রকম বিশ্রামের সময় ওরা হাসিঠাট্টা করে, গান গায়। কিন্তু আজ, একটা সামরিক সাফল্য সত্ত্বেও, সবাই কেমন বিষণ্ণ। পাহাড়ের ওপর পাথর ও কাঁটা-

ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে অনেকজন বন্ধুকে আজ রেখে আসতে হয়েছে ওদের। আর আজকের সন্ধ্যাটাও ঠাণ্ডা—কনকনে হাওয়া বইছে। পোষাক বলতে কারও বিশেষ কিছু নেই—শীতে কুঁজো হয়ে গেছে সবাই। কে একজন অবিশ্রান্ত গালি গালাজ দিতে শুরু করেছে—স্পষ্টই বোঝা যায় এই করে ও আরাম পাচ্ছে খানিকটা। কাউকে বাদ দিচ্ছে না ও; ঝোল, বাতাস, ফ্যাশিস্ট, যুদ্ধ—সব কিছুব শাপান্ত করে ছাড়ছে।

গ্রামটা জনশূন্য, অধিবাসীরা পালিয়েছে। শুধু দুটো কি তিনটে ছোট ছোট ঘরের ভেতরে অস্পষ্ট আলোর রেখা দেখা যায়। অন্ধকারের ভেতর থেকে একটা বুড়ী ভূতের মত এগিয়ে এল আগুনের দিকে। সাধারণ চাষীঘরের মেয়ে, পরনে কালো পোষাক, মাথায় কালো রুমাল। স্ত্রীলোকটি মিশোকে যেন কি বলল, কিন্তু মিশো তা বুঝতে পারল না—অনেক কষ্টে সে একটা কি দুটো স্প্যানিশ শব্দ শিখেছে। স্ত্রীলোকটি চলে গেল এবং একটা রান্না করা শুয়োরের ঠ্যাঙ নিয়ে ফিরে এল আবার। মাংসটার দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলতে লাগল বারবার: 'খাও।' জিনোর মা-র কথা মনে পড়ল মিশোর, এই স্ত্রীলোকটিও ক্র্যামাসের মত। ওর দীর্ঘনিশ্বাস শুনতে পাচ্ছে মিশো। মনে মনে ও নিশ্চয়ই এখন বলছে, 'ওরা তোমাকেও খুন করবে।' এই পৃথিবীটা কত ছোট আর আর কত কম সময়ে একে বোঝা যায়!

পাশের কমরেডটিকে মিশো বলল, 'ওরা আমাদের বলে, তোমরা আমাদের জন্যে যুদ্ধ করছ। না, তা নয়, আমরা যুদ্ধ করছি পারীর জন্যে, ফ্রান্সের জন্যে। পারীর জন্যেই জঁতোই আজ প্রাণ দিল। ওর বাড়ীতে আমি একবার গিয়েছিলাম। মনক্রজ-এ ও থাকত। ছোট্ট একটা স্কোয়ার আর নীচে একটা কাফে...'

কমরেডটি ধরা গলায় গান গাইতে শুরু করল, 'পারী, হে আমার পারী!'

৩১

পারীর স্বাভাবিক জীবনে কোন পরিবর্তন এল না—তেমনি প্রথম অভিনয়-রজনী, চেম্বারের শারদীয় অধিবেশন, তেমনি নতুন নতুন ফ্যাশন, অবশ্যম্ভাবী ব্যাঙ্ক পতন, ধনী মার্কিনী মহিলার চাঞ্চল্যকর নিখোঁজ, তেমনি গোটাকয়েক প্রেম ও গোটাকয়েক আত্মহত্যা। তেসা এখনো আশা করছে যে ব্লুমকে হটিয়ে দেবে, কিন্তু লবীমহলের ধারণা—সরকারপক্ষের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে, নিরপেক্ষতার নীতিতে

র‍্যাডিকালরা সন্তুষ্ট। লাল ঝাণ্ডা বা তেরেঙ্গা ঝাণ্ডা—দুটোর কোনটাকেই আর দেখা যায় না। দেসেরেরই জয় হল—জনসাধারণের শুভবুদ্ধির ওপর আস্থাস্থাপন করে ঠিক কাজই করেছে সে। অন্য অন্য দেশে যখন মারামারি, কাটাকাটি, পরস্পরের বিরুদ্ধে তাল ঠোকা, যুদ্ধাস্ত্রের স্তূপাকার, দুর্গ ও বন্দীশালা নির্মাণ, নেতা ও সেনাপতিদের সম্বর্ধনা—তখন পারী আগের মতই মোরিস শেভালিএ-র গানের প্রশংসায় মুখর, হাজার বার গাইবার পরেও মোরিস শেভালিএ তেমনি অকুণ্ঠ গলায় আবার গাইছে—'পারী আজো সেই পারীই আছে...'

তবুও, এই শান্ত জীবনের আবরণের ভেতর সংগ্রাম চলছে এখনো, চাপা আবেগ ফুঁসে ফুঁসে উঠছে ঘূর্ণির মত। পারিবারিক জীবনে ভাঙন এসেছে, তেসার মত আরো অনেকেরই দিন কাটে পারিবারিক অশান্তির ভেতর। মাঝে মাঝে কাফে রেস্তোরাঁয় তর্ক বিতর্কের পরিসমাপ্তিতে বন্দুকের গুলি ছোটে, বন্ধুবিচ্ছেদ তো প্রায় রোজই ঘটছে। কতগুলো বিদেশী ভৌগলিক শব্দ আর অনন্ত ব্যবধানে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশের যুদ্ধ নির্ধারিত করছে সব কিছু। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেছে পারী। একদল—ধর্মঘটের ওপর যাদের প্রচণ্ড আক্রোশ আর সম্পত্তি হারাবার ভয়ে মিছিল দেখলেই যাবা জানলা বন্ধ করে বসে থাকে—তারা উৎসাহিত হয়ে ছোট ছোট লাল আর হলদে পতাকা আঁটতে শুরু করেছে মানচিত্রের ওপর। আর শ্রমিকাঞ্চলের অধিবাসীরা সেই একই মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'মাদ্রিদ প্রতিরোধ করবে!'

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে ব্রতৈলের সংবাদপত্রগুলোকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হল যে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনী মাদ্রিদের দ্বারদেশে গতিরুদ্ধ হয়েছে। পারীর শহরতলীর শ্রমিকাঞ্চলে বারবার শোনা যেতে লাগল মান্থানারেথ-তীরের সেই আশ্চর্য শব্দগুলো—'ওরা কিছুতেই পার পাবে না!'

মাদ্রিদের শ্রমিকদের নানা বীরত্বের কাহিনী মুখে মুখে ফিরছে। আন্তর্জাতিক বাহিনীর কার্যকলাপের বিবরণ লোকে এমনভাবে দিচ্ছে যেন তা রলাঁর বীর-কাহিনী। ধাতু-শ্রমিকরা বা সুতা-শ্রমিকরা এই বিবরণের শেষে একাধিকবার সগর্বে যোগ করেছে, 'আমাদের লোকেরাও ওখানে আছে! স্থিভাল...জ্যাক্ ...আঁরি...'

সকালবেলার কাগজ পড়ে ভীইয়ার হাসল। মাদ্রিদ এখনো প্রতিরোধ করছে। টক আঙুর! মন্ত্রী হবার পর থেকে সে আর আদর্শের জন্যে যুদ্ধ বা শ্রেণী-সংগ্রাম বা বিশ্ব-জীবনের কথা ভাবে না। এখন তার কাছে রাজনীতির অর্থই অন্য

রকম। তা হচ্ছে এই দল বা ওই দলকে সুবিধা ছেড়ে দেওয়া, সরকারী সংখ্যা গরিষ্ঠতা, নিয়োগ, বদলী, পুরস্কার সম্পর্কে প্রতি দিনের—সময়ে সময়ে প্রতি ঘন্টার হিসেব। পৃথিবীটা সংকীর্ণ হয়ে গেছে—মূল্যবান ও ভঙ্গুর প্রাচীন-সংগ্রহে ঠাসা একটা ঘরের মত। চলবার-ফিরবার বা হাত-পা নাড়বার জায়গা নেই। আর সে যে এখন নিজেই নিজেকে বলল যে মাদ্রিদ এখনো প্রতিরোধ করছে, তার ফলে এই স্বল্পপরিসর ঘরের বাঁধা থেকে বেরিয়ে এসে অন্তত এক মুহূর্তের জন্যেও প্রাণভরে আনন্দের নিশ্বাস নিতে পারল সে। আর যাই হোক, সত্যিই চমৎকার লোক ওরা। এমন কি নিজের মনে মনে সে বলল, 'আমাদের লোকও তো আছে ওখানে! সমাজতন্ত্রী শ্রমিক আছে ওদের মধ্যে।'

নিজের সেক্রেটারীকে সে বলল, 'খবর দেখেছ? বিজয়োৎসবটা ব্রতৈল বড় তাড়াতাড়ি করে ফেলেছে। শ্রমিকরা তো আর ওর 'মন্ত্রশিষ্য' দলের মত নয় যে একটা কিছু হলেই খরগোসের মত পালাবে।'

একটু পরেই ভীইয়ার তার প্রাত্যহিক বিরক্তিকর দায়িত্ব সম্পাদনের ভেতর ডুবে গেল। প্রথমে দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ। এই সময়ে বাধ্য হয়ে তাকে বাকচাতুর্যের আশ্রয় নিতে হয়, প্রত্যাখ্যান করতে হয় মধুর হাসি হেসে, প্রতিজ্ঞা করতে হয় অসম্ভব রকমের। আজকের দর্শনপ্রার্থীদের একজন হচ্ছে সেই পিরু যে জুলাই-মিছিলের দিন তাকে ত্যক্ত-বিরক্ত করে ছেড়েছিল। এবারেও ব্যতিক্রম হল না, নানা নালিশ-অনুযোগে বোঝাই হয়ে পিরু এসেছে :

'প্রতিদিন দলে দলে লোক গোপনে সীমান্ত অতিক্রম করছে। আমরা ফ্রাঙ্কোকে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করে তুলছি। আজ হোক, কাল হোক—একদিন সমগ্র স্পেনের কর্তৃত্ব করবে ফ্রাঙ্কো। আমার নির্বাচকমণ্ডলী স্পেনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখার বিশেষভাবে পক্ষপাতী—তা যে দলই দেশ শাসন করুক না কেন।'

শান্ত হাসি হেসে ভীইয়ার বলল, 'প্রিয় বন্ধু, কে যে জিতবে তা এখনো বলা যায় না। আজকের শেষ-সংবাদ আপনি পড়েছেন নিশ্চয়ই? যাই হোক, আমি কোন আপত্তি করছি না...আমরা কথা দিয়েছি একজন স্বেচ্ছাসেবককেও স্পেনে যেতে দেব না। আর এই কথা আমরা নিশ্চয়ই রক্ষা করব।'

পিরু চলে যাবার পর ভীইয়ার তার সেক্রেটারীকে বলল, 'পিরেনি-জোরিয়াঁতাল-এর প্রিফেক্ট্‌কে সীমান্ত-রক্ষীর সংখ্যা বৃদ্ধি করবার নির্দেশ দেওয়া দরকার।'

সৌভাগ্যবশত আজ কোন সরকারী আমন্ত্রণ ছিল না। দিনের পর দিন জাঁকজমকের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার ফলে ভীইয়ারের পাকস্থলী ভারী হয়ে উঠেছিল, আজ শুধু একটা আধ-সেদ্ধ ডিম ও কিছু সব্‌জি ছাড়া আর কিছু খেতে হল না বলে সে খুশি হল। আজকের বিকেলটাও আনন্দে কাটবে—পার্লামেন্টের অধিবেশনে নয়, খাঁটি সৌন্দর্যরসে ডুবে গিয়ে। অনেকদিন থেকে তার ইচ্ছা তরুণ শিল্পী আঁদ্রে কর্নোর ছবিগুলো একবার দেখবে। গতবার সালোর প্রদর্শনীতে এই শিল্পীর আঁকা আশ্চর্য একটা ল্যাণ্ডস্কেপ ছিল: একটা ঝাঁকড়া বাদাম গাছ, বাঁ দিকে একটা নাগরদোলা, ডানদিকে ক্ষুদ্র একটি মূর্তি। ওর অন্য ছবিগুলো যে ভাল হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কর্নো ইতিমধ্যেই রীতিমত আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে...ওই ল্যাণ্ডস্কেপটা ভীইয়ার কিনবে। সে তো আর কৃপণ নয়। তা বলে দু হাতে পয়সা ওড়াতেও সে ভালবাসে না। সন্তুষ্ট হয়ে সে ভাবল, 'সালোঁতে ছবিটার দাম ছিল তিন হাজার। তার মানে দু হাজারে পাওয়া যাবে।'

ভীইয়ার আসবে খবর পেয়ে আঁদ্রের মনে পড়ে গেল ভীইয়ার সম্পর্কে পিয়ের কি বলেছিল। মনে পড়তেই চোখ ঘোঁচ করল। চুলোয় যাক! কিন্তু স্টুডিও ঘরটা একটু গোছগাছ করলে কেমন হয়? না, দরকার নেই, এমন কিছু ব্যাপার নয়।'

উৎসুক দৃষ্টিতে ক্যানভাসগুলোর দিকে তাকিয়ে ভীইয়ার মন্তব্য করল, 'কী সূক্ষ্ম রঙের কাজ! চেয়ারের তলাকার বাতাসটাও যেন অনুভব করা যায়। কিন্তু ফুলের গাছগুলোর রঙ একটু যেন চড়া হয়ে গেছে। ল্যাণ্ডস্কেপটা দেখে উৎত্রিল্লোর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলোর কথা মনে পড়ে।' আঁদ্রে একটি কথাও শুনছিল না। প্রথমে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিল ভীইয়ারকে আর ভাবছিল, 'না, ছবি আঁকার মত কিছু নেই চেহারায়। মুখটা অস্পষ্ট, মুখ তো নয়—একতাল থলথলে মাংস।' তারপর পাইপ ধরিয়ে ভীইয়ারের কথামত একটির পর একটি ছবি তুলে ধরছে, আর ধুলো ঝাড়ছে নিজের পোষাক থেকে। ভীইয়ার যে ছবি কিনবে সন্দেহ নেই কিন্তু এই সম্ভাবনার কথা ভেবেও আঁদ্রের কোন ভাবান্তর হল না। টাকাকড়ি সম্পর্কে সে নির্বিকার। টাকা থাকলে খরচ করে, না থাকলে ভোজ না খেয়ে শুধু রুটি-মাংস খায়। এক সময়ে নিজের ছবি সম্পর্কে তার একটা ব্যগ্র ঔৎসুক্য ছিল এবং কার হাতে ছবিগুলো পড়বে তা নিয়ে ভাবনার অন্ত ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রায় সব ক্ষেত্রেই ব্যবসায়ীরাই ছবিগুলো কিনে নেয় সুতরাং আঁদ্রের একটা ধারণা হয়েছে যে স্টুডিওর বাইরে

গেলেই ছবিগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। ভীইয়ার বলল, 'সালোঁর প্রদর্শনীতে আপনি যে ল্যাণ্ডস্কেপটা পাঠিয়েছিলেন সেটা আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেই যে একটা গাছ .....'

নিঃশব্দে আঁদ্রে আর একটা ছবি রাখল ইজেল-এর ওপর। এই ছবিটা তার অত্যন্ত প্রিয়। জিনেতের সঙ্গে যে রাত্রিতে দেখা হয়েছিল, তার পরে প্লাস দ্য ইতালী-তে গিয়ে এই ছবিটা সে এঁকেছে। দিনটা বিষণ্ণ। কোণের মেয়েটি প্রতীক্ষা করছে যেন কার জন্যে। বিশ্রাম করছে নাগরদোলার ঘোড়াগুলো।

'এই ল্যাণ্ডস্কেপটা আমি কিনতে চাই।' বলল ভীইয়ার।

আঁদ্রের মুখ কালো হয়ে গেল। টেবিলের পায়ায় পাইপটা কয়েকবার ঠুকে ছবির ক্যানভাসটা দেওয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখল সে।

ভীইয়ার আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ছবিটা কি বিক্রী হয়ে গেছে?'

একবারও না ভেবে, শব্দ ব্যবহারে এতটুকু বাছবিচার না করে ছেলেমানুষের মত ক্রুদ্ধ গলায় আঁদ্রে উত্তর দিল, 'আমি চাই না যে এই ছবিটা আপনার বাড়ীর দেওয়ালে টাঙানো হোক। আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন না? সব কিছুর একটা সীমা আছে। ছবিটার দিকে আপনার তাকিয়ে থাকাটাও আমি সহ্য করতে প্রস্তুত নই।'

চটে গেলে ভীইয়ারের সমস্ত মুখটা কাঁপতে থাকে। চোখের প্যাশনে, গোঁফের প্রান্তভাগ, নীচের ঠোঁট, চিবুক—সবশুদ্ধ। বিনীতভাবে সে বলল, 'যেমন আপনার খুশি,' তারপর ছবি দেখাবার জন্যে আঁদ্রেকে ধন্যবাদ জানিয়ে মহা সমারোহে স্টুডিও ছেড়ে চলে গেল। তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে, তারপর মন্তব্য করল, 'ধাপ্পাবাজ!' তবুও এই সাক্ষিগোপালের ওপর পিয়েরের কী বিশ্বাসই না ছিল। কতদূর পর্যন্ত যাওয়া উচিত তার একটা সীমা নেই কি? আর পিয়েরের মত সৎ লোকও তো আছে। হাতের একটা অসহিষ্ণু ভঙ্গী করে আঁদ্রে আবার কাজ নিয়ে বসল—ভীইয়ার আসবে শুনে হাতের কাজ ফেলে সে উঠে এসেছিল। কিন্তু চেষ্টা করেও কাজে মন বসাতে পারল না সে, তবুও কাজ ছেড়ে কিছুতেই উঠল না—তার ভয় ছিল যে একবার উঠলেই নিজের মনের ক্রুদ্ধ ও ক্লান্ত চিন্তাগুলোর হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাবে না সে।

অন্ধকার হয়ে এল তবুও সে আলো জ্বালল না। চুপ করে শুয়ে রইল

দ্বিতীয় খণ্ড

১

প্রতি মঙ্গলবার মতিনিদের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের আসর বসে। বিরাট লাইব্রেরী ঘরে বসে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ার ফাঁকে কফির কাপে আর মার্তিনিকের টাট্‌কা মদের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে ত্রতৈলের বন্ধুরা সাম্প্রতিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, আর ওদিকে ড্রয়িংরুমে বসে মহিলারা চা খেতে খেতে গল্পগুজব জমান। মতিনির মেয়ে যোসেফিন্ পুরুষদের ড্রয়িংরুমে আসার অপেক্ষায় অধীর হয়ে উঠত ; লুসিয়ঁর ওপর তার টানটা এখনো আছে, লুসিয়ঁও ওদের বাড়ীতে প্রতি মঙ্গলবারে নিয়মিত আসে।

পপুলার ফ্রণ্ট জয়লাভ করার পর প্রায় দু বছর কেটে গেছে। সব কিছুই যেন বেশ খানিকটা বদলে গেছে—কথাটা দেসের প্রায়ই বলত। ভীইয়ার দেমাক করত, 'শাসন-করার কায়দাটা জেনেছি, আমি আর কারও নজরে পড়ি না।' ব্যবসা ভাল চলছে। কারখানাগুলো মাল-সরবরাহের অজস্র অর্ডার পেয়ে দিশেহারা হয়ে উঠেছে, দোকানগুলো যেন খরিদ্দারদের চাহিদা মিটিয়ে উঠতেই পারছে না। 'ভাড়া দেওয়া যাইবে' লেখা বিজ্ঞাপনগুলো অদৃশ্য হয়েছে, বাড়ী বা জায়গা আর খালি পড়ে নেই। সংকটের অবসান হয়েছে—এই মত প্রকাশ করে অর্থনীতিবিদরা প্রবন্ধ লিখছেন আর ভবিষ্যদ্বাণী করছেন, দেশের অবস্থা আপাতত অনেক দিনের মত স্বচ্ছল।

কিন্তু এই আপাত-স্বচ্ছলতার আড়ালে একটা সাধারণ অসন্তোষ চাপা ছিল। সেই জুন মাসের হরতালের হিড়িক বুর্জোয়ারা ভোলেনি ; তাদের মনে পপুলার ফ্রন্টের আতঙ্কটা থেকেই গেছে। সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ আর ছুটির দিনে পুরো মাইনে, এই দুটো দাবীর ওপরেই ওরা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছিল। এই ধারণাটা যে শুধু মতিনির বন্ধুবান্ধবদেরই তা নয় ; মধ্যবিত্তরাও খবরের কাগজে প্রবন্ধ পড়ে এই রকম ভাবে। সাবানের দাম চার পয়সা বেড়ে গেছে—খদ্দেরদের সে কথা বলবার সময় দোকানদার টিপ্পনি কাটে, 'কি আর উপায় করি, বলুন ! মজুর-মহোদয়রা আজকাল সব স্নানাগারে যেতে শুরু করেছেন।' আয়করের ফর্ম ভর্তি করে দেবার সময় জোতদার বিড় বিড় করত, 'যত সব পরগাছা !' তার কাছে এই 'পরগাছা' বলতে বোঝায় গাঁয়ের ইস্কুলের মাস্টার, ডাকঘরের দুজন কর্মচারী, আর পাশের শহরের মজুররা। মজুরদের মধ্যেও অসন্তোষ। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে চলেছে রোজ,

বছর দুয়েক আগে তাদের যে মজুরি বেড়েছিল ইদানীং আর তাতে চলে না, হরতাল শুরু হয়েছে এখানে ওখানে। মালিকরা দাবী মানতে নারাজ। ভীইয়ার আপোষরফার আবেদন জানিয়েছে। খোলাখুলি সামরিক সংগঠনের ব্যবস্থা করতে ফ্যাশিস্টরা ব্যস্ত। শ্রমিকরা প্রশ্ন তুলেছে, 'আমাদের দেখবে কে? পুলিশ নয় নিশ্চয়ই, তারা তো সুযোগ পেলেই আমাদের পিষে মারবে।' স্পেনের লড়াই এখনো চলছে বটে, কিন্তু ফ্যাশিস্টরা ক্রমশই জিতছে—মাদ্রিদের সঙ্গে কাতালোনিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে ওরা। ক্রুদ্ধভাবে শ্রমিকরা বলাবলি করছে, 'স্পেনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে।' বিশ্বাসঘাতকতার ঘুণ ধরেছে জনসাধারণের মনে। সংবাদপত্রে আসন্ন যুদ্ধের বিপদের কথা লেখালেখি চলছে। ভিয়েনার পথে জার্মান-বাহিনী টহল দিয়ে গেছে। হিটলারের পরবর্তী অভিযান সম্বন্ধে সবাই জল্পনা-কল্পনা করছে, কাফেতে বসে গলা ভেঙে ফেলেছে তর্ক করে, আর তারপর ঘুমুতে যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে। ১৯৩৮-এর অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই বসন্তে পারী নিশ্চিন্ত আর বিভ্রান্ত, পরিতৃপ্ত আর অসন্তুষ্ট।

ইতিমধ্যে ব্রতৈল নানা কাজে উঠে পড়ে লেগেছে। মতিনির ওখানে যে সব বন্ধুদের সঙ্গে তার দেখা শোনা হয়, তারা তার এই বহুমুখী ক্রিয়াকলাপের কথা কিছুই জানে না। তার মতে যা কিছু খারাপ তারই মূলে রয়েছে—যাকে সে বলত মজুর শ্রেণীর প্রতি 'তোষণনীতি'—এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সে পুরো একটি বছর ধরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ার কাজে লাগিয়েছে নিজেকে। সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোর ভার সে দিত গ্রি-নেকে। সামরিক বিভাগের ছ-টি উড়োজাহাজে গ্রি-নেই আগুন লাগিয়েছিল, আর একটা রেলের সুড়ঙ্গ-পথে টাইম-বোমা রেখে এসেছিল। ধনিক সম্প্রদায়কে ভয় দেখাবার জন্যে ব্রতৈল 'মালিক-সমিতি'র বাড়ীটা উড়িয়ে দেবার ভার দিয়েছিল গ্রি-নের ওপর। বোমা-বিস্ফোরণে বাড়ীটার সামনেটা ধ্বসে পড়ে, আর একটা দারোয়ান মারা যায়।

এই সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তোলার জন্যে দক্ষিণপন্থীদের কাগজগুলো কমিউনিস্টদের দোষ দিল। কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে ভীইয়ার সাংবাদিককে বলল, 'এই সব গোলমাল সৃষ্টির ধরনটা এখনো ঠিকমত নির্দিষ্ট করা যায়নি।' পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে যারা, তারা কড়া ব্যবস্থার দাবী জানাল। তাদের শান্ত করবার জন্যে ভীইয়ারকে এক 'ষড়যন্ত্র আবিষ্কার' করতে হল। অবশ্য, এ ব্যাপারে

ব্রতৈল আর 'মন্ত্রশিষ্য'দের অস্ত্রশস্ত্রের গোপনীয় গুদামটা যাতে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সে দৃষ্টি রাখল; কিন্তু পুলিশ এখান-ওখান থেকে গোটাকতক মেশিনগান খুঁজে বের করায় জন পঞ্চাশেক 'মন্ত্রশিষ্য'ও গ্রেপ্তার হল। ভীইয়ার শেষ পর্যন্ত বলল যে ওই ষড়যন্ত্রটা একটা নিতান্ত ছেলেমানুষি ব্যাপার। ভীইয়ারের ইঙ্গিতে খবরের কাগজগুলো চক্রান্তকারীদের নাম দিল 'কাগুলার'—অসামাজিক হা-ঘরেদের দল, যারা মধ্যযুগীয় মুখোস আর ঠুলী পরে। চেম্বারের অধিবেশনে ব্রতৈল অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ঘোষণা করল যে গভর্নমেন্ট খাঁটি দেশভক্তদের ওপর নিষ্ঠুর দমননীতি চালাচ্ছে; ফলে যারা গেপ্তার হয়েছিল তারা সবাই মুক্তি পেয়ে গেল।

এবারে ব্রতৈল তার কলাকৌশল বদলে ফেলতে মনস্থ করল। বোমা-টোমা ছেড়ে সে এবার ঢুকল পার্লামেন্টের কূটচক্রান্তে—আন্তর্জাতিক জটিলতা তাকে সাহায্য করবে সরকার পক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভাঙন ধরাতে, এই আশায়। পারীর দেওয়ালগুলো আবেদনে ছেয়ে গেল: 'পপুলার ফ্রন্ট ফ্রান্সকে যুদ্ধের পথে টেনে নিয়ে চলেছে।' ব্রতৈলের বন্ধুরা চলে গেল গ্রামে গ্রামে 'শান্তির আদর্শ রক্ষায়' চাষীদের প্ররোচিত করবার জন্যে। সাধারণ নিয়ম-মাফিক মন্ত্রীত্ব-সংকট তো লেগেই ছিল। র‍্যাডিকালরা সমাজতন্ত্রীদের সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে: ব্লুমটা ভারী হুশিয়ার—মুনাফার ওপর কর বসিয়ে লোকটা বেশ কিছু কামিয়ে নিতে চায়! সে রকম হলে, তেসাই হয়ত অগ্রণী হবে সবচেয়ে। সুতরাং ব্রতৈল গিয়ে দেখা করল সেই বৃদ্ধ আইনজীবীর সঙ্গে, তার বক্তৃতার প্রশংসা করল, আপ্যায়িত করল কচি হাঁসের কাবাব আর পাখীর ঝোল খাইয়ে। তেসা খাবারগুলোর প্রশংসা করল, কিন্তু মনে মনে হুঁশিয়ার ছিল সে, এমন কি, ভীইয়ারের সঙ্গে তার বন্ধুত্বের ওপর জোর দিয়ে বলল যে, সমাজতন্ত্রীরা এবার সাচ্চা ফরাসী হয়ে উঠেছে। বোধহয় সে বুঝেছে যে, নিজের জয়লাভটা আসন্ন, তাই সমাজতন্ত্রীদের ভোট পাওয়া সম্বন্ধেও নিশ্চিত হতে চায়; কিংবা হয়ত সে বামপন্থী র‍্যাডিক্যালদের খুশি করতে চায়—বিশেষ করে ওই অতি-উগ্র ডেপুটি ফুজে-কে—যে ব্রতৈলকে খোলাখুলিই হিটলার-পন্থী বলে থাকে।

বোমা ফাটিয়ে বাড়ী উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে মন্ত্রীত্বের অবসান ঘটানো অবশ্য অনেক শক্ত কাজ। কোন্ কোন্ নতুন শক্তির সাহায্য সে পেতে পারে তার একটা তালিকা ব্রতৈল করে ফেলল। গ্রি-নে আর তার 'বর্মধারী'র দল ইদানীং বেকার হয়ে পড়েছে। ব্রতৈল বন্ধুত্ব পাতালো দুকান আর গ্রঁদেল্-এর সঙ্গে—

এই ডেপুটি-যুগলের খানিকটা নাম ডাক আছে, মতিনিদের বাড়ীতে যাতায়াতও আছে। দুজন কিন্তু উল্‌টো স্বভাবের লোক। দুকান হল মফস্বল অঞ্চলের কোন প্রাক্তন সৈনিকের ছেলে। শৈশব কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে। কিন্তু সমাজতন্ত্রী আন্দোলন থেকে সে নিজেকে দূরে রেখেছে। বীর-প্রসবিনী,সৌন্দর্যপ্রিয় ফ্রান্সই তার আদর্শ; জোয়ান-অফ-আর্কের বীরত্ব-গাথা, রীম্‌স্‌ আর শাৎ'র ধর্মমন্দিরের স্রষ্টা যারা সেই সব অজ্ঞাত ভাস্করদের শিল্প-কীর্তি, আর সমগ্রভাবে জাতি-সম্বন্ধে গৌরববোধ তার কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করে। গত যুদ্ধে বৈমানিক হিসেবে কাজ করে সে ভীষণভাবে আহত হয় আর দু বার পদক পায়। তারপরে সে রাজনীতিতে ঢুকেছে, আর প্রচার করেছে—যাকে সে বলে—'সামগ্রিক জাতীয়তাবাদ।' আল্‌প্‌স্‌ অঞ্চলের কোন একটি নির্বাচন-কেন্দ্র থেকে সে পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি হয়ে এসেছে। চেম্বারে একেবারে ডান দিককার চেয়ারে সে বসে আর মাঝে মাঝে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত রকমের বিবৃতি দিয়ে দক্ষিণ-পন্থীদের অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলে। যেমন একটা বক্তৃতায় সে বলে বসল, 'যদি আমাদের আর একটা নতুন কমিউন-এর বিভীষিকার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে তিএর-এর দুমুখো নীতি গ্রহণ করার চেয়ে প্রতিরোধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়াই আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।' প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স দুকানের—রাশভারী স্বভাব, কুৎসিত চেহারা, আর তোতলা কথা। উত্তেজিত হয়ে উঠলে এত দ্রুত কথা বলে যে তার আত্মীয়দের পক্ষেও বক্তব্যটা বোঝা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অবশ্য চেম্বারে বক্তৃতা দেয় সে কচিৎ কখনো, তবু তার প্রতিপত্তি আছে খুব। ব্যক্তিগত সম্ভ্রমবোধ আর বিদ্যাবত্তার জন্যে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করে সে—ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ বিমান-বিজ্ঞানীদের মধ্যে দুকান অন্যতম এবং বিমান-বাহিনী কমিশনের কাজকর্ম সেই পরিচালনা করে। পপুলার ফ্রণ্ট ফ্রান্সকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে—এই বিশ্বাস থেকে সে ব্রতৈলের সঙ্গে যোগ দিল। তার সঙ্গে মানিয়ে চলাটা হল ব্রতৈলের চেষ্টা, জার্মানীর সঙ্গে সহযোগিতার কথা একটাও সে তার সামনে উচ্চারণ করল না।

দুকান পার্লামেণ্ট আর সামরিক মহলে সুপরিচিত, কিন্তু গ্রঁদেলকে জানে গোটা দেশের লোক। তরুণ, সুদর্শন গ্রঁদেল, রোমান নাক আর স্বপ্নাতুর নীল চোখ, স্যঁা-জুস্ত্‌-এর প্রতিকৃতির মত দেখতে। খুব ভাল বক্তা সে—প্রতিপক্ষের লোকরাও মুগ্ধ হয়ে তাঁর বক্তৃতা শোনে, যেন বুলবুল পাখীর গান

শুনছে। গ্রঁদেল ছিল—যাকে বলে, 'শিশু-বিস্ময়'—অল্প বয়সেই চমৎকার বেহালা বাজাতে পারত। যুদ্ধ বিরতির পরে তার বাবা ফাট্‌কা বাজারের দালালী করে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করেন, কিন্তু অল্প কিছুকাল পরেই ভদ্রলোক ফতুর হয়ে যান; ফলে গ্রঁদেলকে বেরুতে হয় জীবিকার সন্ধানে। 'দারিদ্র্যের অধ্যাত্মতত্ত্ব,' 'মহাব্যোম বার্তা' ইত্যাদির ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ আর গোটাকতক সমাজতাত্ত্বিক রূপক-নাট্য লিখেছিল সে। কয়েক বছর বাদে সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কয়েকটি সভায় বক্তৃতা করে সে খুব সাফল্য অর্জন করে। তারপরে চেম্বারে নির্বাচিত হয়ে হঠাৎ ঘোষণা করল যে, ব্লুম আর ভীইয়ারের আন্তর্জাতিকতায় সে বীতশ্রদ্ধ এবং একজন খাঁটি ফরাসী হিসেবে আর ফ্রান্সের শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে মার্কসের চেয়ে প্রুধোঁর ওপরেই তার ভরসা; অন্য লোকের নির্দেশে চলতে সে রাজী নয়। সঙ্গে সঙ্গে গ্রঁদেলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চতুর্দিকে। র‍্যাডিক্যাল, রিপাবলিকান, সমাজতন্ত্রী, আর গণতন্ত্রী দলের লোকরা তাকে পাবার চেষ্টায় ঘুরতে থাকল। গ্রঁদেল নিজেকে 'নির্দলীয় সমাজতন্ত্রী' বলে ঘোষণা করল, কিন্তু চেম্বারে ভোট গ্রহণের সময় সে সর্বদা দক্ষিণপন্থী বিরোধী-দলের পক্ষ নিত—সুতরাং ব্রতৈলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল তার। গ্রঁদেলের শত্রুও ছিল কিছু কিছু। উদীয়মান তরুণ ডেপুটি হিসেবে তার খ্যাতি ক্ষুন্ন হতে পারে—এমন কিছু আলোচনা পার্লামেন্টের লবী মহলে উঠলেই উৎসুক শ্রোতার দল জুটে যেত। জার্মান দূতাবাসের জনৈক পদস্থ ব্যক্তির কাছে সে আজকাল একটু বেশী যাতায়াত করছে—এরকম একটা কথা বলাবলি হচ্ছে। এমন কি, শোনা যাচ্ছে যে র‍্যাডিক্যাল ক্লুজে নাকি গ্রঁদেলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগের প্রমাণ হিসেবে কতকগুলো দলিলপত্রও জোগাড় করেছে। এই সমস্ত কানাঘুষোর উত্তরে গ্রঁদেল কেবল তার পাতলা ভ্রূযুগল উচ্চকিত করল। 'ওটা অত্যন্ত পুরনো কৌশল' বলল সে, 'প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে কালি ছিটাও, আর গণ্ডগোল পাকিয়ে তোল! সময় এলে আমিই প্রমাণ করে ছাড়ব—ওই ক্লুজে লোকটা মস্কোর দালাল।'

বছর তিনেক আগে গ্রঁদেল একটি সুন্দরী দো-আঁসলা মেয়েকে বিয়ে করেছে। নাম মারি, কিন্তু সবাই তাকে ডাকে 'মুশ' বলে। গ্রঁদেল সর্বত্র তাকে সঙ্গে নিয়ে যায়—লোকে ওদের উল্লেখ করে 'মানিকজোড়' বলে।

গ্রঁদেলের সঙ্গে মন্তিনিদের বাড়ীতেও মুশ যায়—কিন্তু সাধারণ আলাপ

আলোচনায় সে যোগ না দিয়ে পুরনো ছবির অ্যালবামে চোখ বুলোয়। যোসেফিন ওকে মনে মনে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখে; মুশ্ মাঝে মাঝে লাইব্রেরীর দরজাটার দিকে তাকায় আর লুসিয়ঁর সঙ্গে চোখা-চোখি হলেই তার মুখের ভাবটা বদলে যায়।

ব্রতৈলের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মতিনি অর্থসাহায্য করছে। ডালকুত্তার মত মুখ, ভয়ানক রাশভারী কড়া মেজাজ তার। কবে যে সে তার বাবার বাড়ী ছেড়ে যেতে পারবে সেই আশায় যোসেফিন দিন গুনছে; পল মরাঁ-র কোন বই নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে, কিংবা তার মেয়ে বড় বেশী লিপ্‌স্টিক্ ব্যবহার করে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মতিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বক্তৃতা ঝেড়ে যোসেফিনকে উত্যক্ত করে। মোটা বুদ্ধি, গোঁয়ার স্বভাব এই মতিনির। মজুরদের ব্রতৈল সায়েস্তা করে দিতে পারবে বলে তার বিশ্বাস। গত বছরের লাভের অঙ্কে তার অভিযোগেব কোন কারণ ঘটেনি, কিন্তু তার আত্মাভিমানে ঘা লেগেছে: 'চল্লিশ ঘণ্টা হপ্তা, বটে! ছোটলোক আর বলে কাকে! আমি কত ঘণ্টা কাজ করি তার হিসেব আছে? তার পর তো আমাকে কতরকম ঝুঁকি নিতে হয়, লোকসান হলে সে তো আমাকেই সইতে হয়। ওদের তো মজুরি পেলেই চুকে গেল। যত সব পরগাছা!' দেসেরের মত মতিনি মজুরশ্রেণীকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখে না, তার কাছে মজুররা হচ্ছে ভয়ংকর সর্বভুক পঙ্গপাল। ওদের লোভ আর নিষ্ক্রিয়তা সম্বন্ধে তার অভিযোগের বিরাম নেই।

আজকের এই বিশেষ সান্ধ্য-সম্মেলনে মতিনি আর কাউকে মুখ খোলবার অবকাশ দেয়নি, অনর্গল বকে চলেছে শ্রমিকদের অত্যাচারের কথা—মজুরবা যে আলাদা হাত-মুখ ধোবার বন্দোবস্ত দাবী করেছে, সে কথাটা এই নিয়ে একশো-বার বলল সে।

'এর পরে ওরা স্নানঘরের দাবী তুলবে, দেখে নিও। ভাবো একবার—জার্মানরা যেখানে দৈনিক চব্বিশ ঘণ্টা খাটছে, আমাদের মজুররা কিনা তখন বেড়াতে যেতে চায় সমুদ্রের ধারে!'

ভীষণ রাগে এক ঝলক কেশে নিল সে। বাক্যস্রোতে এই বিরামের সুযোগ-টুকু নিল ব্রতৈল, সে এসেছে পার্লামেণ্টের আসন্ন সংগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা করতে, হাত-মুখ ধোবার বন্দোবস্ত নিয়ে মাথা ঘামাতে নয়। পার্লামেণ্টে তুকানের সমর্থন পাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যে, মতিনির উল্লেখ-প্রসঙ্গে

ব্রতৈল নাৎসী-বিভীষিকার ওপরে তার যুক্তিটা দাঁড় করাল, 'মে মাসে জার্মানরা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর চাপ দিতে থাকবে বলে মনে হয়। তার আগেই আমাদের একটা সত্যিকারের জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা চাই-ই। ব্যক্তিগত-ভাবে, তেসা হলে আমার কোন আপত্তি নেই, অবশ্য যদি সে কমিউনিস্টদের ভোট অস্বীকার করে তবেই।'

লুসিয় ভ্রূকুটি করল। অনেকদিন থেকেই তার সন্দেহ হয়েছে, ব্রতৈল আজকাল ষড়যন্ত্র ছেড়ে পার্লামেন্টের কূটনীতিতে নেমেছে; সে যাই হোক, দেশের ত্রাণকর্তা হিসেবে তার বাবাকে দাঁড় করানো হবে বলে সে আশা করেনি। শুকিয়ে আসা বাগানে বেড়া দিয়ে লাভ কি! হাই চেপে ভাবল লুসিয়ঁ। মুশের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করতে ইচ্ছে হয়েছে তার।

গ্রঁদেল ব্রতৈলকে সমর্থন করল, 'তেসা অবশ্য অনেক কম শয়তান। তবে ঐ ফুজের দল থেকে ওকে সরিয়ে নিতে হবে। কাল শুনলাম, ফুজে ওই জাল দলিলগুলো তেসাকে হাতিয়ে দিয়েছে। আমি তখুনি তেসার সঙ্গে দেখা করে ওকে শুধোলাম, 'আমার বিরুদ্ধে ওদের অভিযোগটা কি দয়া করে বলো।' ভারী মিষ্টি ব্যবহার দেখাল তেসা, কিন্তু কোন কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকার করল। ওদের ফন্দিটা স্পষ্ট, বৈদেশিক-বিভাগে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলতে চায়। দেশের মনোযোগ বিষয়ান্তরে নিযুক্ত করার এ একটা চমৎকার উপায়। ব্লুমকে বাঁচাবার জন্যে ওরা অতি দ্রুত এই সোরগোলটা সৃষ্টি করবে।'

বিরক্ত হল দুকান, 'ফুজেটা এত ছোটলোক হবে বলে ভাবিনি, ভাল লোক বলেই ওর সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়েছিল। ভের্দ্যঁ-তে লড়াই করেছিল সে। আর এখন কিনা লোকটা একজন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছন থেকে ছোরা মারতে চায়! ওদের স্বরূপ তোমায় কিন্তু প্রকাশ করে দিতেই হবে, গ্রঁদেল। বক্তা হিসেবে তোমার প্রতিভা......'

'কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, এই বা আফসোস্। মুশ্‌কিল হল গিয়ে, ওই জালিয়াতির বিষয়বস্তুটা জানতে না পারলে ঠিকমত তৈরী হয়ে নিতে পারছি না।'

ব্রতৈল ব্যাখ্যা করল, 'তেসার কাছে আমিও ব্যাপারটা জানবার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু ও কেটে পড়ল; দু নৌকায় পা রাখছে ও। কিন্তু তেসা আমার পুরনো বন্ধু, এবং নির্বাচনে জয়লাভের ব্যাপারে আমার কাছে সে ঋণী। তা ছাড়া

এই সব গুজবে তার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস নেই, কিন্তু ওর কাছে আর কি আশা করা যায়? দলের বিধি-নিয়মে বাঁধা পড়েছে লোকটা,—তান্ত্রিকদের আর এরিও-র ক্রোধ জাগাতে ভয় থাচ্ছে।'

অস্পষ্টভাবে হাসল লুসিয়ঁ, তারপর হঠাৎ বলল, 'আমার বাবা খাঁটি মানুষ, কিন্তু ওঁর বুদ্ধিটা মোটা।'

ভোটের হিসেব-নিকেশে লেগে গেল ডেপুটিরা। র‍্যাডিক্যালদের মধ্যে প্রায় সত্তরজন ব্লুমের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। সরকার পক্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠতায় ভাঙন ধরেছে—কিন্তু এই ভাঙনটা চলছে খুব ধীরে। এদিকে আর অপেক্ষা করার সময় নেই, এক মাসের মধ্যেই জার্মানরা কাজ শুরু করে দেবে।

'সেনেটররাই বাঁচিয়ে দেবে শেষ পর্যন্ত। ব্লুমকে এক হাত নেবে বলে কাইও কথা দিয়েছে।'

তুকান বিড়বিড় করল, 'কাইওটা একটা খেঁকশেয়াল, আগে থেকেই হার স্বীকার করে বসে আছে ও।'

ভবিষ্যৎ সরকারের কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হল। প্রথম শর্ত: তেসাকে কমিউনিস্টদের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে। সুদেতেন-সমস্যার ব্যাপারে একটা সুদৃঢ় নীতি অনুসরণ করা চাই, কিন্তু একেবারে অনমনীয় হলেও আবার চলবে না, এমন সব সালিশী মানতে হবে যাতে দু পক্ষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সরকারকে অবিলম্বে স্বীকার করে নিতে হবে। লাভালকে রোমে পাঠাতে হবে, মুসোলিনির সঙ্গে তাড়াতাড়ি একটা বোঝাপড়া করে নেওয়া খুব জরুরী দরকার। সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ, বিমান-যন্ত্র শিল্পে আমানত-খাটানো চালু করা—এই দুটোর ওপর তুকান জোর দিল; আর চাই সত্তর-ঘণ্টা সপ্তাহ।

মতিনিকে খুশি করবার জন্যে ব্রতৈল যোগ করে দিল, 'মজুররা যদি কারখানা দখল করে, তাহলে সশস্ত্র ফৌজ বহাল করতে হবে।'

কিন্তু এই বিষয়টার ওপর মতিনি ভিন্নমত হল, 'না। গ্যাস ছাড়তে হবে। স্রেফ্ গ্যাস, আর কিছু না! ধোঁয়া ছেড়ে তাড়াও ওদের ইঁদুরের মত! হ্যাঁ, জাহাজ-তৈরীর কারবারটাও বাড়ানো চাই—ওটা ধরো হিসেবের মধ্যে। আর চাই সন্ত্রাসবাদী কাজের জন্যে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। 'সমিতি'র বাড়ীতে বোমা ফেলেছিল যে শয়তানটা, সে এখনো ধরা পড়েনি। গিলোটিনের ব্যবস্থাই ওর পক্ষে সবচেয়ে প্রশস্ত!'

মতিনির ভারী মুখখানার দিকে ব্রতৈল তাকাল : বোকাটা যে কি বলে ফেলবে কে জানে! জরুরী কাজ আছে বলে ব্রতৈল উঠে চলে গেল।

অন্যেরা গিয়ে বসল ড্রয়িংরুমে, লুসিয়ঁর দিকে তাকাল যোসেফিন, লুসিয়ঁ কিন্তু যোসেফিনকে দেখতেই পেল না। মুশের পাশে বসে সে জিরোদু-র নতুন নাটক 'ট্রয়ের লড়াই হবে না' সম্বন্ধে গাল-গল্প জুড়ে দিল, 'নামটা খুব ভাল, ভয় ঘুচোবার জন্যে লোকে দেখতে যাচ্ছে।'

মুশ ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'বৃহস্পতিবারে। ও থাকবে না। আমি নিজেই তোমাকে ঢুকিয়ে নেব।'

দুকান সোৎসাহে গ্রঁদেলের কাছে প্রমাণ করছিল যে সক্রিয় একটা নীতি গ্রহণের এই সময় : 'ইতালীর সপক্ষেই হোক বা বিপক্ষেই হোক, ও একই কথা। সুদেতেনদের সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা নেই, কিন্তু চেক্ ম্যাজিনো লাইন......'

'বটেই তো। কিন্তু ভুললে চলবে না যে সুদেতেনরা জার্মান। আর, হিটলার ঘোষণা করেছে—পশ্চিমে তার আর কোন দাবী নেই......'

উত্তেজিত হয়ে উঠল দুকান। চিৎকার করে কি একটা বলল, কিন্তু কি যে বলল বুঝে ওঠা অসম্ভব; মুখের মধ্যে রবার চিবুচ্ছে বলে মনে হল।

গ্রঁদেল হেসে বলল, 'ঠিক কথা।'

হলঘরটায় এসে যোসেফিন লুসিয়ঁকে ধরল। ওর দিকে না তাকিয়েই সে তাড়াতাড়ি বলে গেল, 'লুসিয়ঁ, তোমার যদি কিছু হয়, তাহলে ভুলো না—আমি তোমার জন্যে সব কিছু করতে সর্বদাই প্রস্তুত।'

কথাটা লুসিয়ঁর হৃদয় স্পর্শ করল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে, 'ধন্যবাদ। এখানে বাইরে বড় শীত, তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।' চোখে জল এসে গেল যোসেফিনের, 'ঘৃণা করি, তোমাকে ঘৃণা করি আমি!' বাইরে ঠাণ্ডা পূব-বাতাস বইছে। কোটের কলার তুলে দিল লুসিয়ঁ। ব্রতৈল, যোসেফিনের নির্বোধ কোমলতা, আর মুশ—এ সব তার কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর!

'পাড়া-সমিতি' গুলির কোন একটাতে এসে ব্রতৈল অব্রি-কে খুঁজে বের করল। ভূগর্ভ-রেলপথের টিকিট-বাবু এই অব্রি, চেহারাতেই বিতৃষ্ণা জাগায়, অন্যের ক্ষতি সাধনে অতি-তৎপর, কোন সাংসারিক বন্ধন নেই তার। 'শোন, অব্রি' ব্রতৈল বলল, 'একজন বেইমানকে সরিয়ে দিতে হবে আমাদের।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অব্রি। বহুদিন ধরে সে তার কৃতিত্ব দেখাবার একটা

সুযোগের অপেক্ষায় আছে। একবার কেবল তাকে একটা কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল—অতি নোংরা একটা কাজ—এভিন্যু ভাগ্রাম-এ একটি মেয়ে 'লুমানিতে' বিক্রি করছিল, তাকে গিয়ে মেরে এসেছিল অব্রি।

'আপনার হুকুমের অপেক্ষায় আছি, কর্তা।'

'ওই 'বর্মধারী' গ্রি-নেকে খতম করে দিয়ে আসতে হবে তোমায়। একটুও যেন জানাজানি না হয়। তারপরে এই জিনিসটা ওর কাছাকাছি রেখে আসবে...' পকেট-বইটা খুলে ব্রতৈল একটা কমিউনিস্ট পার্টি-সঙ্ঘের কার্ড বের করে দিল।

'তাই হবে, কর্তা'—গদ্‌গদ্ স্বরে বলল অব্রি।

বাড়ী ফিরে ব্রতৈল তার চিঠিপত্র খুলল না, স্ত্রীর প্রশ্নেরও কোন জবাব দিল না। অতি অস্ফুট ওষ্ঠ-বিক্ষেপে প্রার্থনা উচ্চারণ করল। গ্রি-নের জন্যে সে দুঃখিত, কিন্তু আর কিই বা করা যেত? শাদা পাতায় নতুন অধ্যায় লেখা শুরু হবে—গ্রি-নের মত লোক দু-একবার মদ টেনেই সব ঘুলিয়ে দিতে পারে...অবশ্য খাঁটি মানুষ এই গ্রি-নে, কিন্তু মূর্খ। 'বর্মধারী আমি' বলে বড়াই করে। এহেন লোকের জন্যে স্বর্গবাস অবধারিত। কিন্তু তার—ব্রতৈলের—ভবিষ্যতে কি আছে? বড় বেশী ঝুঁকি নিয়েছে সে নিজের হাতে; অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হবে তাকে। পরলোকগামী আত্মার শান্তির জন্যে আর একবার প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করে সে স্ত্রীকে ডাকল:

'গ্রি-নে বলে কাউকে কোনদিন আমি চিনি না, বুঝেছ?'

কোমরে জড়ানো তোয়ালেটায় হাত মুছল মাদাম ব্রতৈল—স্বামীর প্রিয় একটা খাবার তৈরী করছিল সে—ব্রতৈলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল 'পিশাচ!'

চুপ করে রইল ব্রতৈল।

২

ভেরসুই স্টেশন থেকে কাদা-ভরা রাস্তাটা বেয়ে গ্রি-নে চলেছে পুরনো বাগান বাড়ীটার দিকে। অনেকদিন ধরে একটানা বিশ্রী আবহাওয়ার পর এই প্রথম উজ্জ্বল একটা দিন এসেছে। 'শিগ্‌গিরই ইস্টার আসছে'—ভাবল গ্রি-নে। একটা ফাঁকা জায়গায় এসে গরম লাগায় ওভারকোটের বোতামগুলো খুলল সে।

বড় বড় গাছগুলোর নীচে 'লিলি-অফ্-দি-ভ্যালী'র সরু সরু পাতাগুলো যেন সবুজ আলোয় জ্বলছে। আর মাস খানেকের মধ্যেই পারীর লোকরা এখানে আসবে বনভোজন করতে। দৈনন্দিন জীবনের শান্তিপূর্ণ মুহূর্তগুলি গ্রি-নেকে বিরক্ত করে। ব্যাপারটা না বুঝলেও, সে মনে মনে অন্যের ভাবনামুক্ত জীবনকে হিংসা করে। কিন্তু আজকের এই উজ্জ্বল রোদ আর বনে বনে বসন্তের স্পর্শ তার মনটাকে প্রসন্ন করে তুলল, আর কয়েকদিন বাদে যে প্রণয়ীযুগল এখানে আসবে 'লিলি-অফ্-দি-ভ্যালী' তুলতে, তাদের কথা ভাবল গ্রি-নে।
ব্রতৈল এবার তাকে কোথায় পাঠাবে—স্পেনের ফ্রণ্টে? ব্রিটানিতে? ছেলে বেলা থেকেই গ্রি-নে ফ্রান্সময় ঘুরে বেড়িয়েছে—ধোঁয়াটে রেলগাড়ীর গুমোট গরমে, জংশন স্টেশনের কনকনে ঠাণ্ডায়, তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলে। সাধারণ টেবিলে বসে টহলদার ব্যবসায়ীদের বহুবার-বলা গালগল্প শুনতে শুনতে খাওয়া, ওলিওগ্রাফ-ছবি টাঙানো নোংরা দেয়ালওলা ঠাণ্ডা ঘরে তেলচিটে বিছানায় শোয়া—এ-সবে গ্রি-নে অভ্যস্ত। ঘুরে বেড়ানোটা তার খুব ভাল লাগে না, কিন্তু সংসার-প্রতিষ্ঠ জীবনে নিজেকে কল্পনা করতে পারে না সে। ব্রতৈলের দেওয়া বিপজ্জনক কাজগুলো পালন করার ব্যাপারে তার ভূতপূর্ব পেশা তাকে সাহায্য করেছে। সপ্তাহখানেকের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেও তার বাড়ীওয়ালী মোটেই আশ্চর্য হয় না। এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত গোটা ফ্রান্স গ্রি-নের জানা। আড্ডা দেবার মত জায়গা, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল, আর স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে সর্বত্র। গত চারমাস ধরে সে বসে আছে। অব্রির চিঠিখানা পেয়ে সে অতি-উল্লসিতও হয়নি, মন-ভারও করেনি। যেমন তেমন করে কয়েকটি জিনিস স্যুটকেশে ভরে নিয়েছে, ওপরে রেখেছে এক বোতল ব্র্যাণ্ডি, পকেটে ঢুকিয়ে নিয়েছে রিভলভারটা; হোটেলওয়ালীকে বলেছে, 'একবার আনেসি-তে যাচ্ছি যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে!' তারপর মনে মনে ভাবছে 'যন্ত্রপাতিই হোক আর বোমাই হোক, কিই বা এসে যায়?' দু বছর আগে যেটা তার কাছে উত্তেজনা আর রঙীন কল্পনায় ভরা জুয়ো-খেলা বলে মনে হত, এখন সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঁধাধরা কাজ; যোগ্যতার সঙ্গে সে তার কর্তব্য পালন করে, কিন্তু সে উৎসাহ আর নেই।
এপ্রিলের জ্বলন্ত রোদে ভরা দুপুর আর পাখীদের উল্লাসভরা ডাকাডাকি কোমল করে তুলছে গ্রি-নের মন—'মন্ত্রশিষ্য'দের কথা ভুলে সে ভাবছে আনেসি-র হোটেলওয়ালার মেয়ে কোঁকড়া-চুল লুলুর কথা। যা-হোক একটা নাম করে

দেবার জন্যেই যে সে তার বাড়ীওয়ালীকে আনেসিতে যাবার কথা বলেছে, তা নয়; দিবাস্বপ্নের ঘোরে ওই নামটা বেরিয়ে গেছে তার মুখ থেকে। সব কিছু ছেড়েছুড়ে দিয়ে, লুলুকে বিয়ে করে, একটা কাফে কিংবা ছোট্ট হোটেল খুলে বসতে পারলে কী সুন্দর হত! কিন্তু এ সবই স্বপ্ন! পয়সা জমানো গ্রি-নের ধাতে নেই, ব্রতৈলের কাছ থেকে যা পায় তা নতুন পোষাক বানাতে আর লুলুকে উপহার কিনে দিতেই খরচ হয়ে যায়।

অব্রি গ্রি-নের অপেক্ষায় ছিল। আধ-ভাঙা বাগানবাড়ীটা অ্যালডার গাছে ঘেরা, শাদা দেওয়ালগুলোর গায়ে প্রণয়ীরা নাম আর তারিখ লিখে রেখে গেছে। ছোট পাথরের আসনটার ওপর বসল অব্রি, তারপর পাশ ফিরল রোদের দিকে। বসন্তের মিষ্টি ছোঁয়াচ তার মনেও লেগেছে। সাবান আর এসিডের একঘেয়ে গন্ধে ভরা সুড়ঙ্গ-পথে মাসের পর মাস কাটাবার পর এখানে এই গাছের সবুজ ছায়ার নীচে ছোট্ট নদীটির ধারে বসে নন্দনকাননের আস্বাদ পাচ্ছে অব্রি, ভুলে গেছে অপেক্ষা করার কারণটা। ফিটফাট পোষাক পরা সদ্য দাড়ি কামানো গ্রি-নেকে দেখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল সে—রূপকথাটি ফুরলো।

করমর্দন করে অব্রি বলল, 'বোস। 'বর্মধারী' দেলমাস্ আসছে। ওর কাছেই সব নির্দেশ পাওয়া যাবে।'

একটা খবরের কাগজ বিছিয়ে নিল গ্রি-নে: নতুন-পোষাকটা সে ময়লা করতে চায় না।

'স্যাঁতসেঁতে ভাবটা নেই, জোর রোদ্দুর উঠেছে,' বলল অব্রি, 'তবু সাবধান থাকা ভাল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে লাভ নেই।'

ছোট্ট নদীটির রূপোলি ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে রইল ওরা নীরবে, আর ধীরে ধীরে মধুর একটা তন্দ্রার ভাব আচ্ছন্ন করল ওদের।

'কর্তা আসছেন না?' গ্রি-নে জিজ্ঞেস করল।

'না। শরীরটা ভাল নেই ওঁর। তবু চালিয়ে দিচ্ছেন কোন রকমে, এই আর কি।'

'ওঁর বয়স কত বলে মনে হয়?'

'ষাটের বেশী।'

'ছেলেটা মারা যাবার পর বড্ড বুড়িয়ে গেছেন উনি। দু বছর আগেকার কথা—

বেশ মনে আছে আমার—হরতাল চলছিল একটা; ওঁর স্ত্রী কাঁদছিলেন। তারপর আমি যখন পৌছলাম তখন প্রার্থনা করছিলেন উনি...'

'হুঁ, সে এক দুর্দিন গেছে!...তারপর, তোমার খবর কি? বিয়ে করেছ তুমি?'

'না। তুমি?'

মুহূর্তের জন্তে অব্রির কুৎসিত মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সলজ্জ হাসিতে, 'এখনো করিনি,' বলল সে।

'তাহলে বিয়ে করার কথাটা ভাবছ, বলো? তা বেশ। আমি শিগ্‌গিরই বিয়ে করছি। আনেসিতে একটা খাসা মেয়ে পেয়েছি—চমৎকার মেয়ে। বাপ উকীল, কিছু সম্পত্তিও আছে। ওখানেই গিয়ে মনের মত সংসার পাততে চাই। হোটেল কিনব একটা। ইংরেজরা এসে থাকবে, পয়সা আছে ওদের। কিছু নগদ টাকাও জমিয়েছি ইতিমধ্যে। মন-মাতানো মেয়ে, চমৎকার গান গায়, চমৎকার গলা।'

লুলু জীবনেও গান গায়নি; কিন্তু একবার মিথ্যে কথা বলতে শুরু করলে গ্রি-নের পক্ষে থামা শক্ত। বোধহয় সে কেবল চাল দেবার জন্তেই বলছে না, নিজের স্বপ্ন-কাহিনীই বলে চলেছে সে। চারপাশের বন জুড়ে পাখীদের ডাকাডাকি উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

সঙ্গীর সৌখিন হালকা বাদামী রঙের জুতো-জোড়ার দিকে তাকিয়ে অব্রি একটু যেন দুঃখের সঙ্গে ভাবল, 'এহেন লোকের পক্ষে বিয়ে করা সহজ। কিন্তু আমাকে বিয়ে করবে কে? কোন বুড়ী পেত্নী হয়ত...'

গ্রি-নে বলল, 'কই, দেলমাস্ না কি যেন নাম বললে, কি হল তার? পথ হারিয়ে ফেলল নিশ্চয়।'

'এসে যাবে' বলল অব্রি।

অব্রি যে কারও জন্তে অপেক্ষা করছে, তা নয়। সব ভেবে রেখেছে সে আগে থেকে, কিন্তু যে জন্তেই হোক, ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে সে। মদের বোতলটা বের করল গ্রি-নে আর অব্রি বের করল খানিকটা রুটি আর মাংস—সারাদিনের খাটুনির কথা ভেবে এটা অব্রি আগে থেকেই সঙ্গে এনেছিল। রবারের মত নরম মাংসটা গ্রি-নে বেশ আরাম করে খেল, এতখানি হেঁটে এসে বেশ খিদে পেয়ে গেছে তার। গ্রি-নের বোতলটা থেকে এক ঢোঁক খেয়ে অব্রি তার শুভকামনা করল।

ব্র্যাণ্ডির প্রভাবে আরও মোলায়েম হয়ে পড়ল গ্রি-নে। ঘুম পাওয়ায় হাই তুলল সে। নদীর জলের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নাতুরের মত বলল, 'মাছ ধরতে খুব ভাল লাগে আমার। আনেসির ট্রাউট্ মাছগুলো ঠিক এতো বড়—এই দেখো ?—' তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

টুপিটা খুলে পড়ল এক পাশে, ঠোঁট দুটো আধ-বোজা। মাংসপেশীর আকস্মিক সংকোচে কুঁচকে-থাকা তার বিবর্ণ মুখখানা দেখাল শান্ত, রোদ লেগে গোলাপী হয়ে উঠল মুখটা ; এমন কি, একটা ছেলেমানুষি ভাব ফুটে উঠল গ্রি-নের মুখে। অব্রি তবু দেরী করতে লাগল। আর সে নিজের একাকীত্বের কথা ভাবছে না, দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেছে, নিজেই নিজেকে বলে চলেছে, 'এইবার !' তীব্র একটা বিরক্তি পেয়ে বসল, আর আগেকার আরামের ভাবটা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন করল তাকে। হিংস্র একটা ভ্রূকুটি করল সে। এই শালা ব্র্যাণ্ডিটা ! আর ওই পড়ে ঘুমুচ্ছে শুয়োরের বাচ্চাটা ! হোটেল খুলতে চায় ! বড় সুখ ! 'ভিক্টোরিয়া' কিংবা 'শান্তি-কুটীর', কেমন ? কিংবা হয়ত লোকটা সত্যিই বিশ্বাসঘাতক নয়। হয়ত সংসার পাততে চেয়েছিল ও। এসব কাজের চেয়ে মাছ-ধরাটা নিশ্চয়ই ঢের সুখের। সেটা বোঝা যায়। কিন্তু অব্রির জীবনে কোন সুখ শান্তি নেই কেন ? এই লোকটার চেয়ে সে কম কিসে ? কেন এই মারধোর আর খুন-জখম ?—বেজন্মাগুলো ! এই প্রচণ্ড গালটা যার উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়ে থাক, অব্রির মন এতেই শক্ত হয়ে উঠল। নিদারুণ বিদ্বেষে যেন জ্বালা করে উঠল গলাটা। তারপরে সে বের করল তার ছোরাখানা।

দু মিনিট বাদে—বর্মধারী গ্রি-নে মারা গেছে বলে নিশ্চিত হবার পর—ব্রতৈলের দেওয়া কার্ডখানা অব্রি পাথরটার পাশে সেঁধিয়ে দিল। কার্ডটা জাক দেলমাস্-এর নামে। ওভারকোট, প্যাণ্ট আর হাত দুটো ভাল করে পরীক্ষা করার পর তাড়াতাড়ি হেঁটে চলল অব্রি। বসন্ত দিনের সমস্ত উৎসাহ তার উবে গেছে। রয়েছে খালি বিরক্তির ভাবটা। মাংসের কথা মনে পড়তে গা ঘুলিয়ে উঠল তার—'রবারের মত !' থুতু ফেলতে ইচ্ছে হল, কিন্তু মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে।

অন্ধকার হয়ে আসছে। বড় রাস্তায় বাসে চড়বার জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো মেয়ে—অব্রিকে দেখে হেসে উঠল ওরা। একজন বলল, 'বড় আরামেই হেঁটে এসেছে বলে মনে হচ্ছে !'

জ্বলন্ত চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে অব্রি বিড় বিড় করল, 'হারামজাদী !'

সন্ধ্যার পর 'আহত সৈনিকদের সংঘে' এসে ব্রতৈলের কাছে রিপোর্ট করল সে।

'হয়ে গেছে'—বলল অব্রি।

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্রতৈল তাকে নিজের পাশে সোফাটায় বসাল। তারপর বলল, 'এই কাজের ভেতর দিয়ে তুমি সংগ্রামে দীক্ষিত হলে।'

'লোকটা কি সত্যিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল?'

দাঁড়িয়ে উঠল ব্রতৈল।

'হ্যাঁ,' বলল সে, 'তুমি যেতে পারো এবার।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় অব্রির দিকে তাকিয়ে ব্রতৈল অস্পষ্টভাবে ভাবল, 'এ লোকটাকেও সরাতে হবে।'

পরদিন সকালে সমস্ত কাগজে গ্রি-নের ছবি বেরুল। খবরে বলা হল : দক্ষিণপন্থী হিসেবে লোকটা পরিচত ছিল এবং ৬ই ফেব্রুয়ারীর বিক্ষোভে যোগদান করেছিল; এক পয়সাও সে রেখে যায়নি, গরীব লোক সে; আর্থিক লাভের উদ্দেশে তাকে খুন করা হয়নি নিশ্চয়ই; কমিউনিস্টরা অবশ্য ঘোষণা করেছে যে জাক দেলমাস্ বলে কাউকে তারা জানে না, তবে এটা প্রত্যক্ষ যে, 'ক্যাথলিক টহলদার-ব্যবসায়ী সমিতি'র একজন প্রভাবশালী সভ্য ও রাজনৈতিক বিরোধীকে ওরাই সাবাড় করেছে।

অব্রি খবরের কাগজ পড়ে না। ভেরমুই-বনের রহস্যময় ঘটনার কথা জনপ্রাণীর কাছেও সে উল্লেখ করেনি। অভ্যাস মত নিজের দৈনন্দিন টিকেট পাঞ্চ্ করার কাজ করে গেল, আর অসুস্থ লোকের মত বারে বারে হাই তুলল। কাজের শেষে একটা অচেনা কাফেতে গিয়ে চাইল কড়া মদ, উগ্র মদের নেশাটা মাথায় চড়ল। আরেক গেলাশ; আরো এক গেলাশ...

টুপি-মাথায় কয়েকটা লোক খাচ্ছিল পাশের টেবিলে। ওদের কথাবার্তা শুনতে চায়নি অব্রি, কিন্তু গ্রি-নের নামটা বারবার উচ্চারিত হতে শুনে মেজাজ চড়ে গেল তার। গ্রি-নের অস্তিত্ব আর নেই, অব্রিও শুনতে চায় না তার কথা। নির্বোধরা থামবে না মনে হচ্ছে।

'হুঁ, একটা কুত্তা কমলো, আর কি!...'

'কিন্তু ওরকম লোক যখন ফ্যাশিস্টদের দিকে যায়, তখন বুঝতে হবে ওরা টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিল ওকে...'

অব্রি উঠে গেল ওদের কাছে, কর্কশ গলায় বলল, 'মিথ্যে কথা! গ্রি-নেই হোটেল

কিনতে চেয়েছিল, ওকে খুন করেছে কমিউনিস্টরা, তোদের মত খুনে মেকী-গণতান্ত্রিকরা। বুঝেছিস, বেজন্মারা?'

একজন দাঁড়িয়ে উঠে মারল অব্রির মুখে। কাঁচের ঝন্‌ঝনানির মধ্যে অব্রি গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কাফেটা চট্‌ করে ফাঁকা হয়ে গেল। বুড়ো ওয়েটারটা অনেকক্ষণ ধরে ভারী ভারী থালা, চামচে আর চারদিকে ছড়িয়ে-পড়া তাসগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে তুলল।

৩

আগের দিন তেসার ষষ্টিতম জন্মদিনের উৎসব হয়ে গেছে। অজস্র চিঠি আর টেলিগ্রাম এসেছে—সবগুলোয় '৬০' অঙ্কটা লেখা। ছোকরা উকীলরা ষাটটা মোমবাতি-ওয়ালা বিরাট একটা কেক উপহার দিয়েছে তাকে। সন্ধ্যা-বেলায় জ্বলন্ত মোমবাতিগুলোর অস্থির নীল শিখার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল তেসা। মনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলবার চেষ্টা করছে সে, জোর করে ভাববার চেষ্টা করছে পার হয়ে আসা সুদীর্ঘ পথ আর আসন্ন সমাপ্তির কথা; কিন্তু এসব চিন্তা তার কাছে অবাস্তব হয়ে উঠেছে। আসলে, সে এত তারুণ্য আর কখনো অনুভব করেনি। ষাটের অঙ্কটাকে সে দেখছে সুন্দর একটি লিপিচিহ্ন হিসেবে। এই তো সবে জীবন শুরু হল তার। তেসা অবশ্য বিখ্যাত আইনজীবী, কিন্তু আগামী কাল থেকে সে হয়ে উঠবে দেশের অন্যতম নেতা। তার নাম 'লতাঁ' কাগজের পঞ্চম কলমের আদালত-সংবাদ থেকে একেবারে প্রথম কলমে স্থান-পরিবর্তন করবে, চরম-পন্থার দিন কেটে গেছে, দেশ চায় শান্তি। পপুলার ফ্রন্টের বজ্রমুষ্টি কিংবা ব্রতৈলের রোমান সেলাম ক্লান্ত করে তুলেছে সবাইকে। লোকে চায় বন্ধুত্বমূলক করমর্দন, বড় আশায় চেয়ে রয়েছে তারা এই হাসিখুশি, ভোজনপ্রিয়, বাকপটু কিন্তু অতি সাবধানী সাংসারিক মানুষ তেসার দিকে।

হ্যাঁ, বড় সুন্দর এই দিনটা, যদিও পারিবারিক দুশ্চিন্তাও আছে নানারকম। বড় বড় সব ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়েও কোন ফল হয়নি; ভিশেল-এ গিয়ে মাদাম তেসা কিছুদিন চিকিৎসাধীন থেকে এসেছে, কোন ফল হয়নি; ব্যারাম তার বেড়েই চলেছে, আজকাল আরও ঘন ঘন তার যন্ত্রণা দেখা দেয়। গতকাল উত্তেজনার ফলে মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিল আমালি, আর আজকের এই সন্ধ্যায়

জলন্ত মোমবাতির দিকে তাকিয়ে তেসা যখন গোটা ফ্রান্সের হয়ে উল্লাস অনুভব করছে, তখন ওষুধের গন্ধে ভরা নিজের অন্ধকার ঘরে শুয়ে আমালি অতিকষ্টে যন্ত্রণার কাতরানি চাপবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু স্ত্রীর অসুখ ছাড়াও অন্যান্য দুর্ভাবনা আছে তেসার: লুসিয়ঁটাকে শোধরান গেল না। আমালি এখনো তাকে খোকা বলে ডাকে, যদিও এই 'খোকা'টির বয়স হল ঠিক চৌত্রিশ। রাজনীতিক জীবনে ঢোকার কোন আশা আর ওর নেই। অকর্মা হতভাগাটা আজকাল এক অদ্ভুত রোজগারের উপায় ধরেছে: লুসিয়ঁ ইদানীং জোলিওর কাগজে ঘোড়দৌড়ের সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করে। শোনা যাচ্ছে, ও নাকি জকিদের কাছ থেকে যে সব খবর যোগাড় করে সেগুলো গোঁজামিল দিয়ে ছাপিয়ে লোক ঠকায় আর আসল খবরগুলোর ওপর বাজী জিতে জোলিওর সঙ্গে টাকাটা ভাগাভাগি করে নেয়। মন্ত্রীর ছেলের পক্ষে এই পেশাটা অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়। ছেলের সঙ্গে বকাবকি করে স্বাস্থ্য খারাপ করার ভয়ে তেসা ওর সঙ্গে কথা বলে না; খাবার টেবিলে দুজনে নিঃশব্দে বসে থাকে। লুসিয়ঁ মুখ খুললেই তেসা কোন একটা কেলেঙ্কারীর আশঙ্কায় অস্থির হয়ে ওঠে।

তেসার আরও বড় দুঃখের কারণ দেনিস। এখন তেসা বুঝেছে, স্নেহের ব্যাপারে যুক্তির কোন দাম নেই। লুসিয়ঁর কথা ভেবে তেসা নিজের জন্যেই ভয় পায়: ও হয়ত তার মুখে চুনকালি দেবে।

লুসিয়ঁ মরে গেলে সে কাঁদবে, কিন্তু স্বস্তিও পাবে। দেনিসের বেলা তা নয়। দেনিস যে তার বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, 'নোম' কারখানায় বাক্স-প্যাকিংএর কাজ নিয়ে বাপের অপমান করেছে, আর গোয়েন্দা-পুলিশের বড়কর্তার থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী কি একটা কমিউনিস্ট সমিতির সভ্য হয়েছে,—এগুলো তেসার কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। দেনিসের শরীরের জন্যে সে উদ্বিগ্ন: বড় কষ্টের মধ্যে দিন কাটছে ওর, বেশী খাটতে পারে না মেয়েটা; নিরর্থক ওই মিছিলগুলোতে যোগ দিয়ে হয়ত মারাই পড়বে কোনদিন। তেসা দেনিসের যেটুকু খবর পায় তা পুলিশ কিংবা কোন পেশাদার গোয়েন্দা মারফৎ। ওকে চিঠি লেখবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি; তেসার সঙ্গে ও কোন সম্বন্ধ রাখতে চায় না। ভাবতে ভাবতে প্রায় জল এসে গেল তার চোখে। ষাটটা মোমবাতির দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ল, ছোট্ট দেনিস গোলাপী কাগজে ছন্দোবদ্ধ অভিনন্দন

পাঠাত তার জন্মদিনে। গভীর দুঃখে সে প্রায় ভেঙে পড়বে—এমন সময় এক টেলিগ্রাম এল সেনেটের সভাপতির কাছ থেকে। হাসল তেসা : খাঁটি এবং বিচক্ষণ যে ফ্রান্স, সেই ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা সে। ধারালো নাকটায় ছোট ছোট ঘামের বিন্দু জমে উঠল—উত্তেজনার মুহূর্তে তেসার এরকম হয়। দেনিসের কথা ভুলে সে ক্যাবিনেটের ঘোষণার কথা ভাবল।

পরদিন সকালে এক অতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল। প্রাগ থেকে পাঠানো ফরাসী রাজদূতের রিপোর্টটা পড়তে বসে সে আবিষ্কার করল যে ফুজের দেওয়া সেই প্রমাণ-পত্রখানা অদৃশ্য হয়েছে। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে বিরক্তিকর। কারও স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করাটা তেসা পছন্দ করে না। রাজনীতি হচ্ছে এক অতি সূক্ষ্ম ব্যাপার; উচ্চকিত বক্তৃতা করা এর একটা অংশ মাত্র। আর আছে লবির কোণে দাঁড়িয়ে ফিস্‌ফিসানি, দ্বিপ্রাহরিক আহারে মাখন আর নাসপাতি খেতে খেতে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা, কথার ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম অর্থ-সন্ধান আর ইঙ্গিত; 'স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের' কোন স্থান এই খেলায় নেই, স্টাভিস্কি-ঘটনাটা নিয়ে ব্রতৈলের দল কী বিশ্রী কেলেঙ্কারীটাই বাধিয়ে তুলেছিল! এমন কি, তেসাকে ওরা জড়াতে চেয়েছিল! কমিউনিস্টদের ভোট না পেলে ফুজে নির্বাচিত হতে পারত না; অবশ্য সে পপুলার ফ্রন্টের সমর্থক। ফুজে না বললেও তেসার জানতে বাকী নেই যে গ্রঁদেলটা একটা ফোতো নেতা, ওর সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার ছিল। কি বক্তৃতাই দেয় লোকটা। এমন মন-মজানো বক্তৃতা দিতে পারতেন শুধু আরিস্তিদ্ ব্রিয়ঁা। কিন্তু এর সঙ্গে এই চাঞ্চল্যকর স্বরূপ-উদ্‌ঘাটনের সম্বন্ধটা কি? গত হেমন্তের সময়েই গ্রঁদেলের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর-বিভাগের যোগাযোগের কথাটা তাকে ফুজে বলেছিল। তেসা থামিয়ে দিয়েছিল ফুজেকে : ছোকরা ডেপুটিটা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে বলে সে বিশ্বাস করে না। আসলে এই 'ষড়যন্ত্র' কথাটাই তার কাছে যেন কোন ভিন জগতের ভাষার মত শোনায়। বুড়ো মেজর কিংবা লুসিয়ঁর মত অকর্মা জুয়োখেলায় সর্বস্বান্ত বেপরোয়া লোকরাই কেবল বৈদেশিক গুপ্তচর বিভাগের সঙ্গে লিপ্ত হতে পারে। ফড়ে-দালালদের সঙ্গে বে-আইনী লেন-দেন, জোচ্চোরদের বাঁচাবার চেষ্টা—এসব এক-আধটা এমন কিছু নয়, তেসা বোঝে; কোন লিমিটেড কোম্পানীতে সম্পূর্ণ আইনসম্মত ভাবে যোগ দেওয়া আর স্টাভিস্কি বা উস্‌ট্রিক সংক্রান্ত ঘটনায় অংশ নেবার মধ্যে পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু ষড়যন্ত্র......তেসার মনে পড়ল ভিক্‌টর হুগোর

কবিতা, শয়তানের দ্বীপ, বিবর্ণ ছোকরা-ডেপুটির মাথার ওপর ঝুলন্ত খাঁড়া। না, গ্রঁদেল এরকম কোন কাজ করতে পারে না!

মাত্র তিন দিন আগে তেসাকে ওই অভিশপ্ত কাগজখানা দিয়েছিল করিৎকর্মা ফুজে, চিঠিখানা পড়ার পর বৈদেশিক বিভাগের দলিলগুলোর সঙ্গে সেটাকে রেখে দিয়েছিল একটা ফাইলে। কিসিঙ্গেন্ আর বাডেন-বাডেনের রাসায়নিক পণ্যগুলোর ওপর খাটানোর জন্যে দু হাজার ফ্রাঁর উল্লেখ ছিল তাতে। তেসা বিরক্ত হয়েছিল পড়ে। বেশ তো, জার্মান রাসায়নিক জিনিসের ব্যবসায়ে গ্রঁদেল কিছু পয়সা কামাতে চায়—এটা তো আর ষড়যন্ত্র নয়? ফুজে অবশ্য বলেছে যে আত্মপক্ষ-সমর্থনে কোন প্রমাণ গ্রঁদেল দাখিল করতে পারবে না; কিন্তু তেসা ডেপুটিদের ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, এই কথাই সে বলেছিল ফুজেকে। কিন্তু 'বৈদেশিক বিভাগের সভ্যদের চিঠিটার কথা জানানো চাই' বলে ফুজে পীড়াপীড়ি করছে। এসব এত বাজে ব্যাপার—বিশেষত এখন, যখন দক্ষিণপন্থীদের সাহায্যে ব্লুমকেও সরাতে হবে, আবার সেই সঙ্গেই বামপন্থীদের সমর্থনও পাওয়া চাই। তেসা ফুজের দাবী অস্বীকার করতে পারে না, কারণ তাহলে বামপন্থী র‍্যাডিক্যাল-দের গোটা দলটাই নতুন গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যাবে। আবার ওদিকে ওই চিঠিটার কথা বৈদেশিক বিভাগকে জানিয়ে দিলে ব্রতৈল যাবে ক্ষেপে; দক্ষিণপন্থীরা যাবে র‍্যাডিক্যালদের দিকে, র‍্যাডিক্যালরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্লুমকে বাঁচাতে চাইবে। এই সমস্ত ভেবে দেখার পর তেসা ব্যাপারটা দু-এক সপ্তাহের জন্যে মুলতুবী রাখবে বলে ঠিক করল; দু-এক দিনের মধ্যেই মন্ত্রীত্ব-সংকটের একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু চিঠিটা চুরি করতে পারে কে? এরকম কোন ঘটনা তার জীবনে এই প্রথম ঘটল। তার টেবিলের ওপরেই ছিল ফাইলটা। বেশ মনে আছে, গতকাল উঠে যাবার আগে সে ড্রয়ারটায় তালা লাগিয়ে গেছে—কাগজগুলো সব যথাস্থানেই ছিল। আমালিকে জিজ্ঞেস করলে সে হয়ত বলবে, চুরি করেছেন স্বয়ং বীলজেবাব।

চেম্বারে এসে তেসা চুরির কথাটা একদম ভুলে গেল। আলোচ্য বিলটা—দুটো নতুন পশু-চিকিৎসা-বিদ্যালয় খোলা নিয়ে। স্থানীয় নির্বাচনকেন্দ্রের ডেপুটিরাই শুধু উপস্থিত ছিল। অন্যেরা লবিতে কিংবা ধূমপানের ঘরে ভীড় জমিয়েছে। সবাই কথা বলছে আসন্ন সংকট নিয়ে; তেসার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তারা যে রকম উদ্বিগ্নতার সঙ্গে প্রশ্ন করছে, তার থেকেই বোঝা যায়—ব্লুমের দিন ফুরিয়ে এসেছে।

ভীইয়ার এসে ষষ্টিতম জন্মদিনের অভিনন্দন জানাল তেসাকে; তারপর বিষণ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার ষাট বছর বয়সে স্বপ্নেও ভাবিনি যে মন্ত্রীত্বের দায়িত্ব নেব। আপনি বেশ কম বয়সেই শুরু করলেন। এই নিয়ম।'

'ষাট বছরের আইবুড়ো মেয়ে!' থিক্ থিক্ করে হাসল তেসা, 'তা মন্দ নয়, কি বলেন? হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনি কি ওই ইয়ের সম্বন্ধে কিছু শুনেছেন... ?'

ভীইয়ার লজ্জা পেয়ে সরে গেল ওখান থেকে। হঠাৎ তামাকের ধোঁয়ার আড়ালে ফুজে এসে হাজির হল। তেসা তাকাল ওর চশমা আর ছোট দাড়ির দিকে—সব বিষয়ে লোকটার প্রাচীন র‍্যাডিক্যালদের মত হবার চেষ্টা—আর সঙ্গে সঙ্গে তেসার মনে পড়ল হারিয়ে যাওয়া সেই প্রমাণ-পত্রটার কথা।

'গ্রঁদেলের ব্যাপারটা বৈদেশিক বিভাগকে কখন জানাবে বলে ঠিক করেছ?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল সে।

হাত দুটো নাড়ল তেসা, 'ব্যাপারটা বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা চাই, তাই না? এরিওর সঙ্গে একবার আমি আলোচনা করব। এখন তো দ্বিগুণ সাবধান হওয়া দরকার, নইলে মধ্যবর্তী দলগুলো সব বিরুদ্ধে যাবে আমাদের।'

ফুজেকে থামানো অসম্ভব, 'দক্ষিণপন্থীরা ঘৃণা করে আমাদের কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে আমাদের শত্রু নেই কেউ। তাছাড়া, এটা কোন দলের ব্যাপার নয়। দেশের স্বার্থ এর সঙ্গে জড়িত। বুঝলে? দেশ! ব্রতৈল যদি খাঁটি লোক হয়, তাহলে সেই সবার আগে গ্রঁদেলকে তাড়িয়ে ছাড়বে। গ্রঁদেল একদম জার্মানীর গুপ্তচর। আজকের 'পারী-মিদি' পড়েছ? বার্লিন থেকে তো বলা হচ্ছে, স্ট্রাসবুর্গের ওপর আগে চাপ দিলে তবেই হয়ত 'বেচারা সুদেতেন জার্মানদের ওপর এই অত্যাচার' বন্ধ হতে পারে। এ সময়ে পঞ্চমবাহিনীর কোন প্রতিনিধিকে আমি সইতে রাজি নই...'

তেসা বলল, 'এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? এটা তো আর স্পেন নয়? তর্কটা এখানে খুনোখুনিতে দাঁড়ায় না। মাথা ঠাণ্ডা করো। আমার বয়স বেশী, অভিজ্ঞতাও বেশী। সময় হলে আমিই দলিলটা হাজির করব। আচ্ছা, তাহলে আসি এখন। দালাদিএর সঙ্গে একটু কথা আছে...'

জালিয়ে মারলে এই ফুজেটা,—তেসা তাড়াতাড়ি সরে পড়ল, কিন্তু হারিয়ে যাওয়া দলিলের চিন্তাটা তার মনে থেকে গেল না। অবশ্য ব্যাপারটা সামলানো যাবে; ফুজেকে বলে দেওয়া যাবে যে দলিলগুলো সে পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছে বিশেষজ্ঞদের কাছে, তারপর সব দোষ

চাপিয়ে দেওয়া যাবে ওই বিশেষজ্ঞদের আর দ্যজিয়েম্ ব্যুরোর ওপর ; ওখানে তেসার বন্ধুবান্ধব আছে, তারা তেসাকে বাঁচাবে। ফুজেকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে অস্বীকারও সে করতে পারে কিংবা চিঠিটা জাল বলে ঘোষণা করতে পারে ; পরে পার্টি সভায় আস্থা প্রস্তাব পেশের প্রশ্নও তুলতে পারে সে। ব্যাপারটা সামান্য। গ্র্যঁদেল যদি জার্মানদের পক্ষে একটু আধটু ব্যবসা করে তো কি যায় আসে ? ওসব গোঁড়ামি যথেষ্ট হয়েছে এবার মনোযোগের সঙ্গে রাজনীতির কাজে নামতে হবে।

কিন্তু কিছুতেই ওই কাগজখানার কথা তেসা ভুলতে পারছে না। ওটার রহস্যময় অন্তর্ধানের কোন কারণ সে আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। ভীইয়ারের কোন লোক কি তার ওপর নজর রাখছে ? কিংবা দেনিসের কোন বন্ধু ? এটা হলে আরও খারাপ। কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে তেসার ধারণা—অতি বজ্জাত গুণ্ডা ওরা, খামকা পিছু লেগে থাকে। হয়ত কোন ফাঁদে ফেলে ওরা তাকে মস্কো নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। ...কমিউনিস্টদেরই কাজ নাকি এটা ?

বাড়ী ফিরে স্থির মস্তিষ্কে সে কাজে বসবার চেষ্টা করল। আবার সে ফাইলখানার ভেতরে ভাল করে খুঁজল : আর একবার যদি ভোজবাজীটা ঘটে যায়, যদি হঠাৎ মিলে যায় কাগজটা। কিন্তু কোন চিহ্ন নেই সেটার। প্রাগের রাজদূতের সেই রিপোর্টটা পড়া আরম্ভ করলে সে। সুদেতেন জার্মানদের সম্বন্ধে হিটলারের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসা সম্ভব—একথা সে বহুদিন আগে ভেবে রেখেছে। বন্ধুদের সে বলেছে, 'হ্যাঁ, কার্লস্বাদের খনিজ সম্পদ যথেষ্ট, তবে আমাকে ভাবায় ভিসির ভাগ্যটা।'

শোবার ঘর থেকে একটা গোঙানি শোনা গেল। কাজ থেকে উঠে পড়ে তেসা গেল তার স্ত্রীর কাছে।

মৃদুস্বরে বলল আমালি, 'মাপ কোরো, কী সংঘাতিক হয়ে উঠেছে আমার পক্ষে ! শিগ্‌গিরই মরে যাব আমি। লুসিয়ঁর কি হবে ?'

স্ত্রীর ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখখানার দিকে তাকাল তেসা ; সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, 'ভাল হয়ে যাবে তুমি, নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। ডাক্তাররা সবাই বলেছে। শিগ্‌গিরই আমরা দুজনে একবার ভিতেলে যাব। নিশ্চয় যাব।'

আমালি নিজের কথা ভাবছে না, ভাবছে তার একমাত্র স্নেহের ধন বাদামী-চুল, ঘর-ভোলা ছেলেটার কথা। ফিস্‌ফিসিয়ে আবার বলল সে, 'লুসিয়ঁর কি হবে, বলো ?'

'ঠিক ব্যবস্থা করে নেবে ও। কচি খোকা তো নয়; কোন চিন্তা নেই তোমার।'

কাজের ঘরে যখন সে ঢুকছে, ঠিক সেই সময় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে লুসিয়ঁ। দরজার ওপর ঠোকাঠুকি হল তাদের। তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে উঠল তেসার কাছে: প্রমাণ-পত্রটা লুসিয়ঁ চুরি করেছে! তার লেখাপড়ার ঘরে লুসিয়ঁকে সে যে এই প্রথম ঢুকতে দেখল তা নয়, লুসিয়ঁ প্রত্যেকবারই বিব্রতভাবে কৈফিয়ৎ দিয়েছে যে দেশলাইটা কিংবা সান্ধ্য-কাগজটা নিতে এসেছিল সে। এখন সব স্পষ্ট বোঝা গেল। হ্যাঁ, লুসিয়ঁর মত ছেলে সব পারে।

তাড়াতাড়ি বারান্দাটা পার হয়ে লুসিয়ঁর ঘরে এল তেসা। টেবিলের ওপর কয়েকটি ঘোড়ার ছবি, মহিলার হাতের লম্বা দস্তানা একটি, আর একটা পিস্তল। সোফাটার ওপরে বসে তেসা কপালের ঘাম মুছল হাতের তেলো দিয়ে; তারপর মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল:

"লুসিয়ঁ, গ্রঁদেল-সংক্রান্ত চিঠিটা তুমিই নিয়েছ?'

মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল লুসিয়ঁ।

তারপর তেসা আত্মহারা হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'জার্মানদের হয়ে কাজ করছিস তুই?'

হাত তুলে ছুটে গেল লুসিয়ঁ তেসার দিকে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'বদ্‌মায়েস!'

'বেরিয়ে যা!' চিৎকার করে উঠল তেসা।

তারপর তেসা ফিরে গেল নিজের পড়ার ঘরে, লুসিয়ঁকে তার মায়ের কাছে বিদায় নিতে শুনল, কাঁদছে আমালি। এই তো চুকে গেল সব! সরকারী মন্ত্রীর পদের আর কি মূল্য এখন তেসার কাছে? মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেছে, ছেলেকে সে নিজেই তাড়িয়ে দিল বাড়ী থেকে। তার ছেলে—গুপ্তচর! নিজের ওপর করুণা জাগল তেসার, নাক ঝাড়তে লাগল সে বহুক্ষণ ধরে, আমালির কান্নার শব্দ ভেসে আসছে তার শোবার ঘর থেকে। স্ত্রীর কাছে গিয়ে বিছানার ওপর বসল সে।

'গিন্নী'—তেসা যখন অত্যন্ত বিচলিত হয়, তখন স্ত্রীকে সে এইভাবে সম্বোধন করে—'সবাই একে একে ছেড়ে গেল আমাদের, পড়ে রইলাম শুধু আমরা দুজন।'

'কেন ওকে তাড়িয়ে দিলে ? বড্ড অভিমানী ও। আর ওকে কিছুতেই ফিরিয়ে আনা যাবে না।'

'ফিরে আসতেও দেব না। ও কি করে জানো ? গুপ্তচর হয়েছে ও! জার্মানদের সাহায্য করছে।'

'আমি তো বরাবরই বলেছি, রাজনীতি অতি নোংরা জিনিস। তোমার কাছ থেকেই তো শিখেছে লুসিয়ঁ। তুমিই তো গলা ফাটিয়ে বলেছ, জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব, আর হিটলার তোরের চেয়ে ভাল লোক।'

বোকা অজ্ঞ মেয়েমানুষ বলেই স্ত্রীকে চিরদিন ভেবে এসেছে তেসা, আমালিকে একথা বলতে শুনে রীতিমত আশ্চর্য হল সে।

'আহা, তুমি থামো দেখি,' বলল তেসা, 'ওসব কথা শুনতে চাইনে। লুসিয়ঁ রাজনীতিক নয়, গুপ্তচর। তফাৎটা বোঝো না তুমি ?'

লুসিয়ঁর ব্যাপারটা ঘটার আগে থেকেই তেসা যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে ছিল ; জোরে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সে ফিরে এল পড়ার ঘরে আর অনেকক্ষণ ধরে পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করল, 'গুপ্তচর ! ভাড়াটে গুণ্ডা ! অকর্মা !' ক্লান্ত হয়ে চেয়ারে বসল শেষে : ব্যাপারটা আগাগোড়া ভেবে দেখতে হবে ; প্রমাণ-পত্র ইত্যাদি চুরি করাটা যদি লুসিয়ঁর স্বভাব হয়ে থাকে, তবে ঘটনাটা গুরুতর ; গ্রঁদেল তাহলে সত্যিই এ ব্যাপারে জড়িত ; কিন্তু কাগজটা অদৃশ্য হওয়ায় এখন আর কোন প্রমাণ নেই। চুরির ব্যাপারটা পুলিশে জানাবে নাকি ? কিন্তু তার মানে লুসিয়ঁকে জেলে পাঠানো। এ আঘাত আমালি সইতে পারবে না। আর, তেসারই বা তাতে লাভ হবে কি ? ফ্রান্সের ত্রাণকর্তার ছেলে কিনা গুপ্তচর ? না, চুরির কথা কাউকে বলা চলবে না। ফুজেকে বলতে হবে, চিঠিটা জাল। কিন্তু গ্রঁদেলের কি হবে ? ডেপুটিদের চেম্বারে গুপ্তচর—ব্যাপারটা একেবারেই অশ্রুতপূর্ব ! কিন্তু প্রমাণ নেই কোন। ফুজের বিবরণ যদি সে দাখিল করে, তাহলে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে শত্রুবৃদ্ধিই হবে তার, তাছাড়া ভাল করে ভেবে দেখলে, গ্রঁদেল যদি জার্মানীর চর হয়ই, ফ্রান্সের কি ক্ষতি সে করতে পারে ? সমর-পরিষদের সভ্য ও নয়। জার্মানদের হয়ত হাজারখানেক গুপ্তচর আছে, আর একটাতে কি আসে যায় ?...মোটের ওপর এটা হল গিয়ে দ্যজিয়েম ব্যুরোর লোকদের ব্যাপার, তার মাথা ঘামাবার দরকার কি ? সব দিক ভাল করে বিবেচনার পর তেসা ব্যাপারটা চেপে যাবে

বলে ঠিক করল : লুসিয়ঁটা চলে গিয়ে ভালই হয়েছে, হাড়-বজ্জাতটাকে আর শোধরাবার কোন উপায় নেই।

আর একবার সে আমালির কাছে গেল, 'লুসিয়ঁর ওই গুপ্তচরবৃত্তির কথাটা কাউকে বোলো না। কথাটা একেবারে বাজে, রাগের ঝোঁকেই বলেছি ওটা। আবার একটা সাংঘাতিক বিলের পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্যে ও আমাকে বলতে এসেছিল। তা ছাড়া ও আমাকে অপমানও করেছে। তুমি ওকে টাকা পাঠাতে পারো, কিন্তু এখানে যেন আর কখনো না আসে। আচ্ছা, তুমি এখন ঘুমোও,কেমন ?'

পড়ার ঘরে ফিরে আলোটা নিবিয়ে দিয়ে সোফার ওপর খোলাচোখে শুয়ে রইল তেসা। নিজের অকৃতার্থ জীবনটার কথা ভাবছে সে। প্রতিবারের মত এবারও দেনিসের কথা মনে পড়ল তার : এই প্রথম সে ভাবল, 'বোধ হয় দেনিসই ঠিক।' অভিশপ্ত, মৃত এই গৃহ থেকে ও বিদায় নিয়েছে ; বাপকে ও কি চোখে দেখত ? ছেলেমানুষ দেনিস, অপরিণত ওর বিচারবুদ্ধি, আইনের রীতিনীতি বোঝে না। খুনেদের হয়ে মামলা লড়ে তেসা, নকল নথিপত্র সাজায়, কুখ্যাত সব বদমায়েসদের কাজকর্মের নির্দেশ দেয়—তার পেশাই তাই, দেনিসের চোখে সে নোংরা-মন মিথ্যাবাদী। দেনিসের রাজনীতির জ্ঞান ওই পর্যন্ত। অত্যন্ত জটিল খেলায় নেমেছে তেসা : ব্রতৈলের সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব, আবার ভীইয়ারকে দেখেও হেসে কথা বলে ; ফ্রান্সকে বাঁচাবার জন্যে সেটা করতেই হয়—কিন্তু ব্যাপারটা তো নোংরা বটেই। সুতরাং দেনিসের মনও ঘৃণায় ভরে উঠেছে। বাপের অপরিচ্ছন্ন জীবন থেকে সে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মাকে আর গুপ্তচর ভাইকে ছেড়ে চলে গেছে। খাঁটি-মন, আপোষ-বিরোধী দেনিস।

মেয়ের দৃঢ় মুখখানা স্পষ্ট মনে পড়ল তেসার। ঘুমিয়ে পড়তে পড়তে চারপাশের ছবি আর মূর্তিগুলোর সঙ্গে ক্রমশ মিশে গেল দেনিসের পরিচিত মুখাবয়ব কখনো যেন দেনিস তলোয়ার তুলছে জোয়ান-অফ-আর্কের ভঙ্গীতে, কখনো বা রক্তাক্ত ছোরা ধরছে উঁচিয়ে, লুই মাইকেলের বিষণ্ণ নিস্পলক চোখ দুটো যেন তাকিয়ে রয়েছে তেসার দিকে আর সে বিড়বিড় করে বলে চলেছে, 'শয়তান !' কমিউনিস্টদের খুনে বলেই সে জানে, কিন্তু এখন সে পিতৃ-হত্যাকামী মেয়েকে আশীর্বাদ জানাল। দেনিস এসেছে, মুখখানা পলেস্তারার মত, চোখের জায়গায় দুটো গর্ত, তেসার টুঁটি টিপে ধরল......

ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠল তেসা। আমালি জাগিয়ে তুলল তাকে— তেসার চেঁচানো শুনে ওঠবার চেষ্টা করেছে সে; কিন্তু পারেনি, পড়ে গেছে মেঝেয়। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এসেছে এই ঘরে। দু হাতে তেসার মাথাটা ধরে আমালি বলল, 'কি হয়েছে, পল?'

কিছুক্ষণ লাগল তেসার হুঁশ ফিরে আসতে।

'দেনিসকে স্বপ্ন দেখছিলাম···সবাই আমাদের ছেড়ে চলে গেল, গিন্নী······'

টেলিফোনটা বেজে উঠল। চমকে উঠল তেসা: এত রাত্রে তাকে টেলিফোনে ডাকছে কে? লুসিয়ঁর কিছু হল নাকি? ভয়ানক কিছু?

রিসিভারটা তুলে নিল সে, কথা বলছে মার্শাদ: দশ মিনিট আগে সেনেটে ভোট নেওয়া শেষ হয়েছে। ব্লুম অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দাবী করেছিল। ভোটের ফলাফল—ব্লুমের পক্ষে সাতচল্লিশ, বিপক্ষে দুশোর বেশী।

উত্তেজনায় কথা আটকে গেল তেসার; স্ত্রীকে আমতা আমতা করে বলল, 'কাল থেকে আমি মন্ত্রী। জয়লাভ হয়েছে আমাদের।'

আমালির মনে সান্ত্বনা আর আশা ফিরিয়ে আনবার জন্যে দুটো একটা উৎসাহের কথা বলতে চাইল সে, কিন্তু সারা দিনে বড় বেশী চাপ পড়েছে তার স্নায়ুর ওপর। নীল-পায়জামা পরে টেবিলটার কাছে বসে জামার হাতায় নাক মুছতে মুছতে অঝোরে কাঁদতে লাগল তেসা।

৪

সেনেটের সভ্যরা যখন ব্লুমের বক্তৃতা শুনতে শুনতে ক্রুদ্ধভাবে কাশছেন আর বার্ধক্যগ্রস্ত কাঁপুনি-ধরা ঘাড়ের লাল শিরা ফুলিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করছেন, শহরের আরেক প্রান্তে তখন সীন-কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকরা সভা বসিয়েছে মালিক-পক্ষের জবাব বিবেচনা করবার জন্যে। দু সপ্তাহেরও ওপর হরতাল চলছে তাদের। এবারে দেসের সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে, কারখানা-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে না গেলে শ্রমিকদের সঙ্গে কোন আলোচনার মধ্যে সে যাবে না। আর সে দার্শনিক সাজতে কিংবা উদারপন্থী রসিকের ভূমিকা গ্রহণ করতে রাজী নয়; সময় বদলেছে। তাছাড়া দু বছর আগে যে অদম্য উৎসাহ শ্রমিকদের জয়লাভে শক্তি জুগিয়েছিল, এখন আর সেটা নেই। অন্তদের

দেখাদেখি সীন-কারখানায় হরতাল শুরু হয়; যুদ্ধ-পণ্যোৎপোদনের সবগুলি কারখানা জুড়ে এই ধর্মঘট। এবারে আর ঝাণ্ডা উড়ছে না, ঐক্যতান সংগীতের আয়োজন নেই, নেই পুলিশের সঙ্গে আড়ালে হাসির কথা বলাবলি। জীবন-যাত্রা অসম্ভব হয়ে উঠেছে বলেই তারা ধর্মঘট করেছে; কিন্তু জয়লাভ করবে বলে বিশ্বাস আছে খুব কম লোকেরই।

মিশো নেই, স্পেনের জন্যে এখনো যুদ্ধ করছে সে; বেঁচে আছে না মরে গেছে তা তার কমরেডরা কেউ জানে না। ফেব্রুয়ারীর লড়াইয়ে 'পারী কমিউন' বাহিনীর সাংঘাতিক ক্ষতি হয়ে গেছে বলে শোনা যাচ্ছে। পিয়ের আছে ধর্মঘটীদের পক্ষে, কিন্তু গত দু বছরে অনেক বদলে গেছে সে; এখনকার এই প্রবীণ, স্বল্পভাষী পিয়েরের সঙ্গে আগেকার সেই দিলখোলা, সর্ববিষয়ে উৎসাহী পিয়েরের অনেক তফাৎ; ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে গেছে তার মন। লড়াই করে চলেছে সে এখনো; নিজের স্বার্থ, আনের বিষণ্ণ ক্ষীণদৃষ্টি চোখ, কিংবা একবছরের ছেলে দুদুর আকর্ষণ—কোন কিছুই তাকে রুখতে পারেনি বিপদ মাথায় করে বার্সেলোনা কিংবা কার্তাজেনায় যাওয়া থেকে। এখন সে লড়াই করে জয়লাভের আশায় নয়, বার্থতার তিক্ততা নিয়ে।

ধর্মঘট পরিচালনা করছে লেগ্রে। জুন-ধর্মঘটের প্রাণকেন্দ্র ছিল মিশোর অদম্য উদ্যম, আর এবারকার এই শীতার্ত বসন্তে লড়াইএর প্রতীক যেন লেগ্রের উত্তেজনাহীন দৃঢ়সংকল্প।

মালিক পক্ষের সাফ জবাব লেগ্রে পড়ে শোনাবার পর চুপ করে রইল সবাই। লেগ্রের ধর্মঘট চালিয়ে যাবার প্রস্তাবে হাততালিও পড়ল না, প্রতিবাদও উঠল না। দমে গেছে যেন সবাই।

'কারও কিছু বলবার আছে?'

যন্ত্রণাদায়ক নীরবতার আড়ালে পরাজয় যেন উঁকি মারছে। হঠাৎ একটা ক্ষীণ গলা শোনা গেল লম্বা অন্ধকার কারখানা-ঘরের প্রান্ত থেকে:

'আমি বলতে চাই।'

বুড়ো দুশেন উঠে দাঁড়াল মঞ্চের ওপর। এক সময়ে সে ছিল কারখানার ঢালাই-ঘরের মজুর, কিন্তু ইদানীং অনেক দিন থেকে সে রাত্রে দরোয়ানের কাজ করছে। পিঠ বাঁকাতে কষ্ট হয়, কারখানার উঠোনটায় কোনরকমে থপ্ থপ্ করে হাঁটে, কিন্তু তবু সে চাকরি থেকে অবসর নিতে চায় না; বলে, 'বাড়ীতে ভারী একঘেয়ে লাগে।' দুশেনকে সবাই চেনে। সে যেন পৃথিবীর জন্মের সময়

থেকে এখানে কাজ করছে। ইঞ্জিনীয়াররা তার মতামত মন দিয়ে শোনে, দেসের তার সঙ্গে করমর্দন করে বলে, 'আমাদের গৌরব তুমি।' কান খাড়া করল সবাই, কি বলতে চায় হুশেন? কারও পরোয়া না করে আগুন-ছেটানো বক্তৃতা দেনেওয়ালা ছোকরা নয় হুশেন। কম্‌তি মজুরি আর বাড়্‌তি সাংসারিক খরচের কথা বলে লাভ কি? ও কথা তো সবাই জানে। কিন্তু এটা ১৯৩৬ নয়। দেসেরের মনোভাব অনমনীয়; পরিবারে উপোস শুরু হয়েছে তাদের; ধর্মঘট চালিয়ে যাবার কোন মানে হয় না—জেতার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। হুশেন আবার বলবে কি? অনেক কিছুই তো দেখেছে সে।

মঞ্চের ওপর উঠে কোন কথা না বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল হুশেন—মনে হল যেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে মুখ খুলল সে, বার্ধক্য জড়িত ভাঙা গলায় গান ধরল, 'ইণ্টারন্যাশনাল'-এর প্রথম কয়েকটা লাইন:

'জাগো, জাগো, জাগো সর্বহারা
অনশন-বন্দী ক্রীতদাস...'

দাঁড়িয়ে উঠল সবাই, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলল নীরবে।

ধর্মঘট চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। অন্যান্য কারখানায় আবেদন জানাবার কথা যখন আলোচনা হচ্ছে, তখন লেগ্রেকে উঠে যেতে হল: কমিটি থেকে খবর এসেছে—গভর্নমেণ্টের পতন আসন্ন।

গালের ওপর কাটা দাগটা দেখে দেনিস সঙ্গে সঙ্গে চিনল লেগ্রেকে—মিশোর সঙ্গে যেদিন তার দেখা হয় সেদিন সন্ধ্যেয় ওই তো কথা বলেছিল দেনিসের সঙ্গে। লেগ্রে মিশোর খবর জানতে পারে হয়তো। মাঝে মাঝে মিশোর চিঠি পায় দেনিস: লড়াইএর খবর দেয় মিশো, স্পেনীয় ভাষার অসুবিধার কথা লেখে, লেখে বাহিনীর কমরেডদের সম্বন্ধে, চাষীদের বীরত্ব, আর আরাগঁ-জেলার শীত আর গরমের কথা। চিঠিগুলো কখনো কাগজের টুকরোর ওপর হিজিবিজি করে লেখা, কখনো বা লম্বা কাগজে সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা। পারীর কথাও লেখে কখনো কখনো—দেনিসের সঙ্গে একত্রে কাটানো সন্ধ্যেগুলো সে ভোলেনি। আবার কখনো লেখে লড়াইএর হালচালের খবর, তিরুয়েল-এ কামান সাজাবার ঘুলঘুলি কিংবা জঙ্গী বিমানগুলোর কথা—ওরা যার নামকরণ করেছে 'ভোঁতা নাক'। শেষ চিঠিখানায় তিরুয়েল-সীমান্তের যুদ্ধের সোৎসাহে বর্ণনা দিয়ে শেষে পেন্সিলে লিখেছে, 'ভালবাসি তোমায়, ঠিক তাই!' দেনিস

সর্বদা সঙ্গে রাখে চিঠিখানা, সারাদিনে বারবার দেখে ঠিক আছে কিনা, চিঠিটার প্রত্যেকটি কথা তার মুখস্থ, তবও ঘুরে ফিরে দেখে সে চিঠিখানা।

বাইরে থেকে দেনিসের জীবনটা একঘেয়ে: কাজ, তারপর কোন সভা কিংবা কোন বক্তৃতার রিপোর্ট-নেওয়া। কিন্তু দেনিস বোঝে যে এটাও লড়াই, আর সে রয়েছে মিশোর পাশাপাশি। মিশোর চিঠিগুলো যেন সামরিক ইস্তাহারের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে দেওয়া ছেলেমানুষি ভালবাসার কথায় ভরা— মানসিক ক্লান্তির মুহূর্তে এই চিঠিগুলো তাকে উৎসাহ দেয়। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাস থেকে মিশোর কোন চিঠি সে পায়নি। উদ্বেগ জমে উঠছে মনে, নিজের দুশ্চিন্তাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্যে বারবার নিজেকে বোঝাচ্ছে, 'বেঁচে আছে ও, ভাল আছে'—আর মিশোর অভ্যস্ত উক্তিটা আওড়াচ্ছে মনে মনে, 'ঠিক তাই!' কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই উদ্বেগ বাড়ছে তার। লেগ্রেকে দেখে দুরু দুরু করে উঠল বুক: হয়ত লেগ্রে শুনেছে কিছু...

কমিটির সভায় আলোচনা হল মন্ত্রীত্ব-সংকট নিয়ে। ব্লুমের পদত্যাগ দাবী করেছে সেনেট। পপুলার ফ্রন্ট হয়ত ভেঙে যাবে। র‍্যাডিক্যালরা দু দলে ভাগ হয়ে গেছে; সমাজতন্ত্রীরা নিজেদের অবস্থাটা অসহায় করে তুলবার চেষ্টা করছে— ওদের ভয়, তেসা দল ছেড়ে গেলে কমিউনিস্টদের সঙ্গে পড়ে থাকতে হবে। পারীতে ধর্মঘটের হিড়িক বেড়েই চলেছে, কিন্তু মজুরদের উৎসাহ নেই তেমন। মজুরদের বিরুদ্ধে চাষীদের ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা সফল হয়েছে। গত বছরের তুলনায়, পরিস্থিতি অনেক খারাপ।

কে একজন বলল, 'ঠিক সুযোগটি হারিয়েছি আমরা।'

সমবেত কণ্ঠে প্রতিবাদ উঠল: আপাতত হাতের কাজটায় লেগে থাকো! পপুলার ফ্রন্ট রক্ষার জন্যে পারীতে অভ্যুত্থান ঘটানো অসম্ভব নয়। ব্লুম যদি পদত্যাগ না করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে শুধু ব্রতৈলের দল, কাগুলার আর হয়ত পুলিশ। সামরিক বাহিনী ফ্যাশিস্টদের পক্ষ নেবে না। ব্লুম আর ভীইয়ারকে শুধু রুখে দাঁড়াতে হবে...

সভায় একটা ঘোষণা-পত্র তৈরী করা হল। গভর্নমেণ্ট যেমন আছে তেমনি থাকবে; কাগুলার আর তাদের দলপতি জেনারেল পিকারকে গ্রেপ্তার করবে ভীইয়ার; স্পেনকে সাহায্য পাঠানো দরকার: সীমান্ত খুলে দেবার এই সময়!

লেখবার কোন দরকার ছিল না, সবাই জানে এসব; কথাগুলো শোনাল অত্যন্ত

সাধারণ; 'কি খবর!' কিংবা 'আচ্ছা, আমি তাহলে' কথাগুলো যেমন প্রায় অর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হয় সেই রকম দাঁড়িয়ে গেছে এসব কথাও। ঠিক হল; দুক্লো ব্লুমের সঙ্গে কথাবার্তা কইবে, আর লেগ্রে যাবে ভীইয়ারের কাছে, কারণ নির্বাচনের সময় সে ভীইয়ারের পক্ষে সাহায্য করেছিল। তাছাড়া, ডেপুটিদের মধ্যে কেউ যাওয়ার চেয়ে, শ্রমিকদের কারও যাওয়াই ভাল—ভীইয়ার জানুক জনসাধারণ কি চায়।

ধর্মঘটের ওপর আলোচনা উঠল: চালিয়ে যেতেই হবে ধর্মঘট। সংকটের কি সমাধান হয়—তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। নোম-কারখানার অবস্থা সম্বন্ধে ওরা দেনিসকে জিজ্ঞেস করল।

দেনিস বলল, 'ওরা তো সবাই বলছে ধর্মঘট তুলে নেওয়া উচিত; অথচ, ধর্মঘট করা যে দরকার তাও ওরা জানে। লেগে তো আছে সবাই, কিন্তু আমাদের কমিউনিস্টরা নেতৃত্বের ভার নিচ্ছে না।'

লেগ্রে হাসল, 'ঠিক আমাদের কারখানার মতই অবস্থা!'

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেনিস তার সঙ্গ নিল। 'স্পেনের খবর কিছু পেয়েছ?... মিশো কেমন আছ?'

মনের উদ্বেগ চাপা রইল না দেনিসের গলায়। ভ্রূকুটি করল লেগ্রে; প্রায় তিন মাস সে স্পেনের কোন খবর পায়নি, কিন্তু শান্তভাবে জবাব দিল, 'খবর সব ভালই। একজন কমরেড কয়েকদিন হল এসেছে। অল্প কিছুদিন আগে তার সঙ্গে মিশোর দেখা হয়েছে...'

খুশি চাপতে পারল না দেনিস। ক্ষীণ হাসি দেখা দিল লেগ্রের বিষণ্ণ মুখে—ভেঙে-পড়া ঘরদোর, আর পোড়া গন্ধে ভরা বিলাঁকুর-এর কোন এক জায়গায় বসন্তের আবির্ভাবের মতই এই হাসি।

সে বলল, 'কাল কারখানায় এসে দেখা করব তোমার সঙ্গে। ওদের উৎসাহ জিইয়ে রাখা দরকার। আমাদের কারখানায় ধর্মঘটের অবস্থাও খুব খারাপ। আজ তো বাঁচিয়ে দিল এক বুড়ো: 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান ধরে দিল লোকটা। ধর্মঘট যে চালু আছে তা নেহাৎ অপরের অবজ্ঞাকে সবাই মনে মনে ভয় করে বলেই।

দেনিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাঁধের রাস্তা ধরে চলল লেগ্রে। এদিকটায় পারীর অন্য এক চেহারা: নতুন বাড়ীগুলোর রঙ অস্বাভাবিক রকম শাদা; চারদিকে কারখানা, সাইরেনে ভোঁ বাজছে দিনরাত—বন্দরে যেরকম বাজে।

অদ্ভুত এবারের এই বসন্ত। এপ্রিল মাস এসে গেল, অথচ শীত রয়েছে এখনো। ঘাড় গুঁজে পথ চলতে চলতে লোকে হাঁচে আর কাশে। বাদাম গাছগুলোয় এরই মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করেছে, শীতের উত্তুরে হাওয়ার সবুজ কুঁড়িগুলোকে কেমন যেন বেমানান লাগে। দেনিসের খুশিভরা মুখখানা মনে পড়ল লেগ্রের। মিশোর যদি সত্যিই কিছু হয়ে থাকে? কী সাংঘাতিক হবে তাহলে! মেয়েটা ভালবাসে মিশোকে, দেখলেই বোঝা যায়। চমৎকার মেয়ে। ও নাকি ছাত্রী, মিশো বলেছিল। যাই হোক, ভালবাসার মত একজন লোক পৃথিবীতে থাকাটা বেশ। মেয়েটাকে শান্ত শিষ্ট বলে সবাই, কিন্তু তা নয় ও; সহজেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তা ভালই, প্রাণোচ্ছলতার লক্ষণ ওটা।

লেগ্রে বড় একলা মানুষ—যতদূর তার মনে পড়ে। বাবাকে সে দেখেনি কোনদিন; অল্প বয়সেই মা মারা যায়; মানুষ হয়েছে কাকার কাছে। শুয়োরের মাংস-বেচা কসাই ছিল তার কাকা, অতি কঞ্জুস আর নীচু মন। লেগ্রেকে রক্ত ভরা বালতিগুলো টেনে টেনে নিয়ে যেতে হত, উনুন ধরানো আর মেঝে ধোওয়ার কাজও করতে হত তাকেই, তারপরে সে ঢোকে এক কারখানায়।

লেগ্রের পক্ষে বড় অসময়ে যুদ্ধ শুরু হল—সবেমাত্র জীবনে যখন সে খুশির স্বাদ পেতে শুরু করেছে, অ্যান-মারীর সঙ্গে আলাপ জমে উঠেছে তার, ঠিক সেই সময়ে। যুদ্ধের উগ্রতাটা যখন মিইয়ে এসেছে আর দু পক্ষই দু পক্ষের শক্তি সামর্থ্য কমিয়ে আন্দাজ করছে, সেই সময় আরগঁ-বনের গড়খাইয়ে বসে আন-মারির কথা মনে পড়ত তার। শেলের টুকরো মুখে লেগে আহত হয় সে; ক্ষতচিহ্নটা থেকে গেল। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখে অ্যান-মারীর চিহ্ন নেই কোন; শুনল সে নাকি একজন মার্কিন বৈমানিকের সঙ্গে চলে গেছে।

সেই থেকে মেয়েমানুষ মাত্রই সে সন্দেহের চোখে দেখে। তখন তার জীবনটা ছিল বৈচিত্র্যহীন। সিনেমায় যেতো হরদম, আর মদ খেয়ে বেহুঁশ হত। তারপরে রাজনীতিতে উৎসাহ জাগল তার। আর একবার প্রেমে পড়ল, কিন্তু এবারেও সুযোগ হারাল। কি করে মার্গএর কাছে কথাটা পাড়বে বুঝে উঠতে পারেনি; মার্গ তাকে অপছন্দ করে বলে ধারণা হয়েছিল লেগ্রের। সেবারে গরমকালটায় ভয়ানক গোলমাল গেছে—সাক্কো আর ভাঞ্জেত্তি ...। প্রত্যেকদিনই কোন না কোন সভায় বক্তৃতা দিতে হত তাকে। হেমন্তে মার্গ বিয়ে করল দুবঁ-কে। লেগ্রে ভাবল, ওকেই মার্গ-এর বেশী ভাল লাগবে। নববর্ষের দিন কেল্লার

কাছে তার ছোট বাড়ীটায় তুর্ব নেমন্তন্ন করেছিল বন্ধুদের। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছিল সবাই, প্রচুর মদ খেয়ে চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে তুলেছিল বাড়ীটা; বাইরে বাগানে এসেছিল মার্গ বাতাস পাবার জন্তে; লেগ্রেকে চলে যেতে দেখে কাছে ডাকল; সিনেমার কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করল; 'দুঃখের দ্বীপ' ছবিটা লেগ্রে দেখেছে কি না। চুপ করে রইল লেগ্রে। হঠাৎ মার্গ তাড়াতাড়ি বলল, 'তখন তোমায় ভালবাসতাম আমি...' বললেই ফিরে গেল অতিথিদের ঘরে। নিজের ওপর ভয়ানক চটে উঠেছিল লেগ্রে। সুখের মুখ দেখা তার ভাগ্যে নেই বলেই ঠিক করেছিল আর আরও বেশী বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল ক্রমশ।

এসব কথা এখন কেন ভাবছে সে? এখন অবশ্য জোসেৎ আছে। একজন কমরেডের মেয়ে সে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে লেগ্রের, জোসেৎ যেন তার দিকে প্রীতির দৃষ্টিতে তাকায়। কিন্তু ওর বয়েস চব্বিশ আর লেগ্রের বিয়াল্লিশ। জোসেৎকে সে বলছে, 'তোমার তুলনায় আমার বয়স বড্ড বেশী।' শুনে চটে উঠেছিল কেন জোসেৎ? একবার কথা বলা দরকার ওর সঙ্গে; লেগ্রে তবু পিছিয়ে দিচ্ছে দিনটা—এখনও ঠিক সময়টি আসেনি। দেনিসের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে তার মনে পড়ে গেছে কি সে হারিয়েছে।

গলাবন্ধটা ভাল করে জড়িয়ে নিল লেগ্রে। বৃষ্টিও হচ্ছে না, বরফও পড়ছে না··· কী অদ্ভুত এবারকার বসন্ত। ভীইয়ারকে একবার টেলিফোন করা দরকার। ব্লুম পদত্যাগ করলে দেসেরকে নোয়ানো অসম্ভব হবে। কারখানা থেকে লোকদের হয়ত জোর করে বের করে দেবে ওরা। অল্প কিছুদিন আগেও কিন্তু শ্রমিকদের হাতে সব ক্ষমতাই আছে বলে ভাবা গিয়েছিল। আগামীকাল হয়ত ব্রতৈল ক্ষমতা পাবে। নিজেদের শক্তির ওপর বড় বেশী বিশ্বাস করেছে তারা—সংখ্যাগরিষ্ঠতা, নির্বাচন, পপুলার ফ্রন্ট, মিছিল। কিন্তু ওরা হিসেব করেছে কমিয়ে কমিয়ে। আর এখন সুযোগ চলে গেছে! ঠিক যেমনটি হয়েছিল মার্গ আর তার নিজের বেলায়...ইস্, কী বিশ্রী আজকের আবহাওয়াটা!

ধর্মঘট কমিটির সভা চলছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল লেগ্রে। সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খবর কি?'

তিনটে বিষয় ভেবে দেখা চাই। প্রথম নম্বর হচ্ছে, ধর্মঘট। চালিয়ে যেতেই হবে। অন্যান্য কারখানার মজুররা শক্ত রয়েছে। প্রতিনিধিরাও এসেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। নোম্ কারখানার মজুররা কিছুতেই দমবে না। দেসেরের

অবস্থা খুব খারাপ। এখন ওদের উড়োজাহাজটাই দরকার সবচেয়ে বেশী। হিটলার আবার কিছু একটা করতে চায়। তার মানে দেসেরের ওপর চাপ দেবে ওরা ; মাল যোগান দিতে হবে ওকে। দু নম্বর : মন্ত্রীত্ব-সংকট। গভর্নমেণ্টের কাছে আবেদন জানাব বলে ঠিক করেছি আমরা। কিছুতেই পদত্যাগ করা চলবে না। চেম্বার আস্থা জ্ঞাপন করেছে। সেনেট তো একটা দুঃস্থালয় বলতে গেলে! নির্বোধ বুড়োগুলোর অনেক আগেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। ভীইয়ারের কাছে যাচ্ছি আমি ; আমাদের সমর্থন আছে ওর পক্ষে ; দরকার হলে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল বের করব আমরা।'

কে যেন বলল, 'ভীইয়ারটা অতি হারামজাদা।'

লেগ্রে বলল, 'অস্বীকার করছি না, তবে সব হারামজাদাই একরকম নয়। একজনকে তো বেছে নিতেই হবে আমাদের—আর ব্যাপারটা ঠিক দুটো গোলাপ ফুলের মধ্যে বেছে নেবার প্রশ্ন নয়। তেসা হলে আরও খারাপ।'

'ঠিক। কিন্তু তিন নম্বরটা কি?'

'কিসের তিন নম্বর?'

লেগ্রে হাসল। 'তিনটে বিষয় বললে যে তুমি?'

'ও হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম...তিন নম্বর হচ্ছে এই আবহাওয়াটা। কমরেড্স্, একেই কি তোমরা বসন্ত বলো? না, এ বসন্ত নয় ; এটা একটা কলঙ্ক!'

৫

রু স্যাঁ-তোনোরএর সৌখিন অঞ্চলে ফরাসী-রিপাব্লিকের সভাপতির প্রাসাদ। ভোরবেলা থেকে বাড়ীটার সামনে ভীড় জমেছে। দলে দলে লোক এসে ঊর্ধ্বমুখে তাকাচ্ছে বাড়ীটার দিকে। নোটবুক আর ক্যামেরা নিয়ে তৈরী হয়ে রয়েছে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। আশে পাশের রেস্তোরাঁগুলোয় অনুসন্ধিৎসুরা জমায়েৎ হয়ে কফি কিংবা জল-মেশানো মদের গেলাশে চুমুক দিতে দিতে বাজী ধরছে, সভাপতির কাছে কার ডাক পড়ে তাই নিয়ে। নটার সময় মস্ত একটা মোটর এসে থামল গেটের কাছে। সদ্য-দাড়ি-কামানো তেসা সুগন্ধ ছড়িয়ে গাড়ী থেকে নেমে স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল সামনে। নিজের ছবি তুলতে দিল সে ; রিপোর্টারদের দিকে আঙুল আস্ফালন করে কৌতুক করল :

'সভাপতি মশাই আমাকে ডেকেছেন আলোচনার জন্যে—শুধু এইটুকুই বলতে পারি। সবেমাত্র কুঁড়ি ফুটছে, তাড়াতাড়ি করে ফুলটা ছিঁড়ে লাভ কি? ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরো!'

দলিল হারানোর দুশ্চিন্তা, দেনিসের জন্যে উদ্বেগ, স্ত্রীর অসুখ—সমস্ত ভুলে গেছে তেসা। খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখ চোখ। ঈর্ষার সঙ্গে বলল একজন সাংবাদিক, 'সত্তর বছর বয়স হতে চলেছে লোকটার, ভেবে দেখো একবার!'

ফটোগ্রাফাররা এরিও, দালাদিএ আর বনে-র ছবি নিল। ডেপুটি আর সেনেটররা ব্যতিব্যস্ত আছেন সকাল থেকে, কারুরই ঠিক সময়ে প্রাতর্ভোজন হয়নি। চেম্বারের লবিতে দলে দলে ভীড় জমিয়ে আলোচনা করছেন তাঁরা—সভাপতি মশাই সেনেটের স্পীকারকে ধন্যবাদ জানানোর সময় নাকি আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। হজমের ওষুধটা খেতে ভুলে গেছে দালাদিএ; তেসা সকলের সামনেই ব্রতৈলকে আলিঙ্গন করেছে। 'কমিদি ফ্রাঁসেস'-এর অভিনেত্রীরা, নর্তকী আর থিয়েটারের মেয়েরা এবং অন্যান্য রূপসীরা বৃথাই নির্দিষ্ট সময়ে থেকেছে তাদের প্রভাবশালী প্রেমিকদের অপেক্ষায়; জাতির প্রতিনিধি যারা, তাদের প্রেম করার সময় নেই।

কেবল ভীইয়ার শান্ত আছে আশ্চর্য রকম। সাংবাদিকরা এসে বিরক্ত করেনি তাকে; চেম্বারেও যায়নি সে; এসবের মধ্যে সে নেই। গত শীতেই সে বুঝতে পেরেছিল—র‍্যাডিক্যালরা আবার তৈরী হয়েছে তাদের চিরাচরিত বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যে; সুতরাং এখন আর তার মনে কোন ক্ষোভ নেই। নিজের পারিবারিক ব্যাপারে মন দিয়েছে সে; ছবিগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে নিল—অবিলম্বে সে উঠে যেতে চায় আভিঞঁতে নিজের বাসায়—গোমস্তাকে চিঠি লিখে দিল যেন জুলাইয়ের মধ্যেই মেরামত করে নেয় বাসাটা। অনেকদিন পরে সে এবছর ছুটি উপভোগ করবে কিছুদিন।

মন্ত্রীত্ব-সংকটের কিছুদিন আগে ন্যান্সি থেকে তার মেয়ে ভায়োলেত্ এসেছিল দেখা করতে; তার স্বামীর মাল সরবরাহের ছোট একটা কারখানা আছে সেখানে। সেবারে বাবাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখে গিয়েছিল সে—ভোটের হিসেবে ব্যস্ত ভীইয়ার গজ্ গজ্ করেছে সেনেটরদের নামে, কেউ তার কথাটা বুঝতে চাচ্ছে না বলে নালিশ জানিয়েছে। এখন কিন্তু বাবাকে দেখে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল ভায়োলেত্—ফূর্তির সীমা নেই ভীইয়ারের; মস্ত কাপে কফি খেল, কাপের ওপরে ভেসে ওঠা পাতলা সরটা সরিয়ে দিল ফুঁ দিয়ে, চোখ কুঁচকে দুষ্টু

হাসি হাসল। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো যে না-জানে, ভীইয়ারকে দেখে তার মনে হবে যেন কোন বিজয়োৎসব পালন করছে সে।

ভীইয়ার বলল, 'আজ থেকে আমি পাখীর মতই স্বাধীন। রু-স্ত-লা-বিশি থেকে ছবি দেখিয়ে আনি তোকে, চল্। দের‍্যাঁ-র আঁকা ছবির একটা চমৎকার প্রদর্শনী হচ্ছে ওখানে।'

নিজের পড়ার ঘরে গেল ভীইয়ার; তার সেক্রেটারী অপেক্ষা করছিল: কয়েকটা জরুরী ব্যাপারে নির্দেশ নেওয়া দরকার। শার‍্যঁৎ এ্যাফেরিঅর-এর জেলা-কর্তা বন্যা হয়েছে বলে খবর পাঠিয়েছে; বন্যার্তদের সাহায্য পাঠানো দরকার। গতকালও এরকম খবর পেলে ভীইয়ার বিচলিত হত; প্রাকৃতিক দুর্যোগের কোন ঘটনাকে কিভাবে রাজনৈতিক অশান্তি সৃষ্টির কাজে লাগানো যায় তা সে জানে। কিন্তু এখন সে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বলল:

'এখন ওটার দায়িত্ব যিনি আমার পদের উত্তরাধিকারী, তাঁর। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, তাঁর প্রতি কোন হিংসা আমার নেই। শার‍্যঁৎ এ্যাফেরিঅর-এর জেলা-কর্তা ব্রতৈলের বন্ধু। সে যাই হোক, সমস্ত দপ্তরটাই হয়ে রয়েছে একটা বোলতার চাক। শার‍্যঁৎ-নদীর জল খুব বেশী রকম বেড়ে উঠেছে বলছ?'

সেক্রেটারীর উত্তর না শুনেই ভীইয়ার কল্পনার চোখে দেখতে লাগল: বিরাট ঘোলাটে নদীটা ফুলে উঠছে নিঃশব্দে, আধডোবা গাছের মাথাগুলো জেগে আছে জলের ওপর, ভেসে চলেছে কাকের বাসাগুলো। সরকারী দায়িত্ব-মুক্ত ভীইয়ারের কাছে বন্যাটা শুধুই একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, একটা কবিত্বময় ছবি। অনিমন্ত্রিত জনৈক অভ্যাগত এসে পড়ায় বাস্তব জগতে ফিরে এল ভীইয়ার। লেগ্রে এসে হাজির হল।

সে বলল, 'কমিউনিস্টরা আপনাকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ জানাচ্ছে। নির্বাচনে জিতেছে পপুলার ফ্রন্ট, আর দেশের জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে একমাত্র চেম্বার।'

'কিন্তু সরকারী নিয়মতন্ত্রে…'

'নিয়মতন্ত্র-মাফিক আপনি তো সেনেটের ভোট মেনে নিতে বাধ্য নন। আইনের সমর্থন চান? বেশ তো! র‍্যাডিক্যাল-মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে যখন সেনেট অনাস্থা জ্ঞাপন করেছিল, তখনও তো লিয়ঁ বুর্জোয়া পদত্যাগ করেনি। এই তো একটা দৃষ্টান্ত পেলেন আপনি। আপনার পদত্যাগ করা মানেই ফ্যাশিস্টদের পথ খুলে দেওয়া। প্রথমে দালাদিএ, বনে, তেসা—তারপর ব্রতৈল।'

'বিপদের সম্ভাবনা বড্ড বাড়িয়ে দেখছো, বন্ধু। দালাদিএ পপুলার ফ্রন্টের সংগঠক, তেসাও এমন কিছু ভয়ংকর লোক নয়; যতদূর মনে পড়ে, কমিউনিস্টরাও ওর পক্ষে ভোট দিয়েছিল। লোকটা একটু অস্থিরচিত্ত কিন্তু খাঁটি, ঠিক র‍্যাডিক্যালরা যেমনটি হয় আর কি!…'

চালাকির ধার ধারে না লেগ্রে। দাঁড়িয়ে উঠে গলা চড়াল, 'একবার আপনি আমার সামনেই বলেছিলেন যে আপনার ভাগ্য শ্রমিকদের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত। শ্রমিকরা চায় আপনি থাকুন। আপনার কাছে চাল দিতে চাই না আমি; আপনি জানেন, অনেক সময়ে আপনার রাজনৈতিক নীতির আমরা নিন্দা করেছি। কিন্তু এটা ঝগড়ার সময় নয়। ফ্যাশিস্টরা শ্রমিক-সংগঠনগুলো ভেঙে দেবার সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা রয়েছি আপনার পেছনে; সরে গেলে চলবে না আপনার! সেনেটের সামনে কালকে বিরাট মিছিল বের করব আমরা! ওই বুড়ো ঘাগীগুলোকে দেখিয়ে দেব কাদের জোর বেশী।'

অতি ক্ষীণ হাসি হাসল ভীইয়ার: 'আমার ওপরে এই আস্থা আছে বলে তোমাকে আর তোমার পার্টিকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন এসব অতীতের কথায় দাঁড়িয়ে গেছে। আজ সকালে ব্লুম মন্ত্রীসভার পক্ষে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে সভাপতির কাছে।'

দু চোখে হাত ঢেকে বসে পড়ল লেগ্রে: 'খুব খারাপ হবে এর পরিণাম। শ্রমিকদের মধ্যে ভাঙন ধরানো হবে ওদের প্রথম কাজ। তারপর? ঠিক অস্ট্রিয়ায় যা হয়েছে তাই হবে। জার্মানরা আসবে; স্পেনের দিন তো ফুরিয়ে এসেছে; চেকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে; 'শান্তি প্রতিষ্ঠার' নামে ব্রতৈল—হিটলার কি মুসোলিনী—যে কোন লোকের সঙ্গে হাত মেলাবে।'

সহানুভূতির সঙ্গে ঘাড় নাড়ল ভীইয়ার; সে এখন একজন বামপন্থী ডেপুটি মাত্র, মনের কথা খুলে বলায় আর কোন বাধা তার নেই: 'ঠিক কথা। স্পেন সম্বন্ধে ওরা বড় জঘন্য কাজ করেছে। খোলাখুলি বলতে গেলে, বৈদেশিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকার নীতিটা একটা লজ্জাকর প্রহসন। ইতালীয়ানরা তো যা ইচ্ছে তাই করছে……আমিও তোমার নৈরাশ্যবাদের অংশ গ্রহণ করি।'

লেগ্রের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল, 'দোষটা কার?' কিন্তু আলোচনাটা নিরর্থক

ভেবে চুপ করে রইল। করুণ ভঙ্গীতে হাত নাড়ল ভীইয়ার। লেগ্রের মনে পড়ল, দু বছর আগে সেই সভায় ভীইয়ার তাকে কি ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল। ভীইয়ারের কথার পুনরাবৃত্তি করল সে ঃ

'লজ্জাকর প্রহসন! …আচ্ছা, আসি তাহলে। আপনাকে বিরক্ত করে কোন লাভ নেই।'

লেগ্রে চলে গেলে ভীইয়ার ভাবল, 'একটু আধটু চক্ষুলজ্জা আছে লোকটার; আমি যে কি ভয়ানক ক্লান্ত তা ও বুঝেছে; অন্য লোকে এটুকু বোঝে না, খালি পেছনে লেগে থাকে…হ্যাঁ, কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম সেক্রেটারীকে…'

নোট-বই খুলে দাঁড়িয়ে ছিল সেক্রেটারী।

ভীইয়ার বলল, 'কাল সেনেটের সামনে মিছিল বেরুবে বিক্ষোভ জানাবার জন্যে। পুলিশের কর্তাকে খবর দাও, যেন সে মিছিলটাকে বেআইনী ঘোষণা করে ঃ আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলে ভাববার কোন সুযোগ ওদের দিতে চাই না আমি। ভোটে হেরে গিয়ে পদত্যাগ করেছি—এর মধ্যে কোন চালাকি নেই: পার্লামেন্টের খেলার এই রীতি।'

ঘণ্টা বাজিয়ে চাকরটাকে ডাকল ভীইয়ার: 'ভয়ানক ঠাণ্ডা ভেতরে। আগুনটা জ্বালিয়ে দাও, আর আমার চটি জোড়া আনো।'

আহা, কী শান্তি! আগুনের আঁচে ফেটে যাচ্ছে কাঠগুলো; বুট জোড়া খুলে ফেলল ভীইয়ার, লোমের ঝালর দেওয়া গরম চটির মধ্যে পা ঢুকিয়ে ছুটি উপভোগ করতে লাগল সকাল এগারোটার সময়। যেতে হবে না কোথাও; অলস আরামদায়ক চিন্তায় ভরে উঠল মনটা। লেগ্রে বাড়িয়ে বলেছে। বড় আশ্চর্য দেশ এই ফ্রান্স, প্রতি দশ বছরে একবার করে ধ্বংসের পথে যায়, অথচ মোটেই ধ্বংস হয় না; এবারেও হবে না। হয়ত সেনেটররাই ঠিক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বড় জটিল হয়ে উঠেছে। তেসা, দালাদিএ, সারো, এমন কি লাভাল...ঘরে তৈরী চটি-জুতোর মত যেন ওরা সবাই। ফ্রান্স ওদের চেনে, তাই ওদের ক্ষয়ে যাওয়াটুকুও চোখে পড়ে না। কিন্তু পপুলার ফ্রন্টকে আপাতত কিছু দিনের মত শিকেয় তুলে রাখা রেখে পারে…

ভায়োলেত্‌কে ঘরে ঢুকতে দেখে খুশি হয়ে উঠল ভীইয়ার, কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। ভায়োলেতের স্বামীর কথা, তার ব্যবসা আর নতুন বাসার কথা জিজ্ঞেস করল সে।

'তোর একটা খোকা হবে বলে আশা করছিলাম। নাতিকে আদর করতে ইচ্ছা হয় আমার।' (ভীইয়ারের বড় মেয়ের দুটো মেয়ে আছে।)

'মোরিস তো বলে, এখন ছেলেপুলে না হওয়াই ভাল। ন্যান্সির সবাই বলছে, শিগ্‌গিরই নাকি যুদ্ধ বাধবে।'

রাজনীতির কথা তুলবার ইচ্ছে ছিল ভায়োলেতের। মোরিস তাকে পরে কেবলই খোঁচাবে, 'কি বললেন উনি, তাই বলো।'

'শোনো বাবা, এই দু বছর আমার বড় দুঃখ গেছে। এরা কেউ তোমাকে তোমার মত করে বুঝতে চায় না, অবশ্য আমার সামনে কেউ কিছু বলে না কিন্তু মোরিস আর জীনের মারফৎ সবই শুনতে পাই আমি। কেন জানি না, তোমার ওপরে ওরা সবাই খড়্গহস্ত—তুমি নাকি মজুরদের ডুবিয়ে দিয়েছ! তাই তো বলাবলি করছে কেউ কেউ। এমন কি এই নিয়ে গানও বেঁধেছে ওরা। আর সবাই তো ক্ষেপে আছে তুমি কাগুলারদের জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছ বলে। আমি অবশ্য কান দিই না......কিন্তু তবু চারদিকে বলাবলি হতে শুনছি এসব। কতবার যে কেঁদেছি এসব শুনে।'

বিরক্তিতে কেঁপে উঠল ভীইয়ারের থুতনি। মেয়ের কথার উত্তরে কি বলবে সে? বলবে কি, যে, মহাপুরুষরা সবাই তাঁদের জীবিতকালে নিন্দিত হন? বলবে কি, যে, দু বছর ধরে সে ফ্রান্সকে রক্তপাতের হাত থেকে বাঁচিয়েছে? কিন্তু সে নিজেই বুঝল এ সব বড় বড় কথা অত্যন্ত বেমানান শোনাবে। আগুনের কাছে ঘেঁষে বসে সে বলল ঃ

'জানি, সবাই আমাকে ঘৃণা করে। মা মারা যাবার পর আমার আর কেউ নেই।'

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে একটা গেলাশে কুড়ি ফোঁটা ওষুধ মেপে নিল সাবধানে।

'ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়। খাবার এক ঘণ্টা আগে হজমের জন্যে এটা আমাকে খেতে হয়।'

৬

লুসিয়ঁর প্রতি মুশ্‌ এত আকৃষ্ট হল কি করে? লুসিয়ঁ ওকে মোটেই ভালবাসে না, কোনদিন বলেওনি ভালবাসার কথা। এ পর্যন্ত লুসিয়ঁ যত মেয়ের হৃদয় জয় করেছে তার তালিকা লেখা আছে ওর ঘোড়দৌড়ের হিসেবের খাতায়—মুশ

সেই তালিকায় একটা নামের সংখ্যা বাড়িয়েছে মাত্র : সুন্দরী মুশ্, যার মন পাওয়া বড় কঠিন! এতদিনে লুসিয়ঁ বুঝেছে জিনেত্তের প্রতি তার আবেগ ছিল কত গভীর; ঈর্ষায় জ্বলে গেছে, জীনেত্তের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাবার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠেছে, বিচলিত হয়েছে তার অভিমানে। মুশের কাছে লুসিয়ঁ শুধু একটু আধটু মজা পায়, তার বেশী কিছু না। ইদানীং যেন মুশের আলিঙ্গনে কিছুটা শিথিলতা এসেছে, তাই তার প্রেমকে উদ্দীপ্ত করে তোলার জন্যে লুসিয়ঁ ঠাট্টা করা শুরু করেছে মুশ্ এখনো তার স্বামীর সঙ্গে আছে বলে। জল ভরা চোখে মুশ্ জিজ্ঞাসা করেছে, 'ওকে ছেড়ে যেতে বল তুমি ?' বাপের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে লুসিয়ঁ। মুশ্ ভেবেছে যে ওর সঙ্গে ওই নোংরা ঘরে গিয়ে থাকাটা হবে ভারী সুখের—না খেয়ে থাকবে, জামা-কাপড় ধুয়ে দেবে লুসিয়ঁর আর ওর লেখা প্রবন্ধগুলো পৌঁছে দিয়ে আসবে খবরের কাগজের আপিসে। কিন্তু মুশের স্বামীর প্রতি ঈর্ষার ভাব দেখিয়ে একটু মজা উপভোগ করবার পর লুসিয়ঁ বলেছে, না, 'তোমাকে আমার কোন দরকার নেই। তোমার স্বামী তো তোমায় ভালবাসে খুব।' আরও বেশী কেঁদেছে মুশ্, তারপর অধৈর্য লুসিয়ঁর ভ্রূকুটি দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে উঠে হাওয়াই দ্বীপের গান ধরেছে।

তিন বছর আগে ব্রিটানির কাছে সমুদ্রের ধারে মুশের সঙ্গে গ্রঁদেলের দেখা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয় গ্রঁদেল। পাহাড়ের চূড়ায় ওকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে গ্রঁদেল অনেক গল্প করেছে 'মহাব্যোম বাত্যা' সম্বন্ধে—লেখক হিসেবে তখন নাম করতে শুরু করেছে সে। শীতকালে বিয়ে হল ওদের, দুজনেই অল্প বয়সী, দেখতে সুন্দর, আর বুদ্ধিমান। তাছাড়া গ্রঁদেলের ভাগ্যটাও ভাল, ডেপুটি হয়ে টাকা করল মোটা রকম। তারপর অঁাতইল-এ অনেক ভাড়ায় বাসা নিয়েছে দুজনে; বন্ধুবান্ধবদের নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে ঘন ঘন, সবচেয়ে দামী দরজীর দোকান থেকে পোষাকআশাক কিনেছে মুশ, আর ঘুরে বেড়িয়েছে বিরাট একটা কাডিলাক গাড়ীতে চেপে; মুশের প্রিয় ফুল পার্মা-ভায়োলেট দিয়ে গাড়ীটা সাজিয়ে রাখতে কখনো ভোলেনি সোফারটা।

সংসারে দিব্যি সুখশান্তি ছিল ওদের; বিয়ের চার বছর পরে মুশের দেখা হল লুসিয়ঁর সঙ্গে আর একদম মাথা ঘুরে গেল ওর। প্রথমেই ও আকৃষ্ট হল লুসিয়ঁর দেহ সৌষ্ঠবে। গ্রঁদেলের সৌন্দর্য যেন খানিকটা নিরুত্তাপ আর আবেগহীন,

খোদাই করা ছবির মত। লুসিয়ঁর সব কিছুই যেন আবেগে উচ্ছল : কোঁকড়া বাদামী রঙের চুল, উজ্জ্বল চোখ, অতি-ক্ষীণ হাসি আর লম্বা সরু হাত। অল্প কয়েকদিন তার সঙ্গে মিশেই মুশ্‌ বুঝল যে এরকমটি আর কাউকে ও জীবনে দেখেনি; সামান্য একটা কথায় সে হয়ত জ্বলে ওঠে আগুনের মত, আর পরমুহূর্তেই হয়ত গভীর অজানা এক বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। প্রায়ই তাকে জুয়ো খেলতে লক্ষ্য করেছে মুশ্‌, কিন্তু জুয়ো খেলার সময়ও লুসিয়ঁ লুসিয়ঁ-ই থাকে। নির্মম হয়ে ওঠে কখনো, কঠিনভাবে পীড়ন করে নিজেকে। মহত্তম থেকে জঘন্যতম যে কোন কাজ করতে পারে যেন। তার ভবিষ্যৎ তার নিজের কাছে যেমন তেমনি অন্যের কাছেও রহস্যময়। লুসিয়ঁর খামখেয়ালী স্বভাব, প্রেমের ব্যাপারে অবিশ্বস্ততা আর চরম নৈরাশ্যবাদ—এগুলোও মুশ্‌কে কম আকর্ষণ করেনি। ঔপনিবেশিক সরকারী-চাকুরের কেতা-দুরস্ত, নিয়মতান্ত্রিক পরিবারে মুশ্‌ মানুষ হয়েছে, সেখানে সবই বাঁধা ধরা, মাপা-জোকা বিধি-ব্যবহার—বাবার প্রেমের ব্যাপার, মায়ের প্রার্থনা, ঘুষ আর অল্প মাইনের বাঁধা পুরনো চাকর। গ্রঁদেলকে আত্মসমর্পন করেছিল কারণ মুশের মনে হয়েছিল সে যেন কোন উপন্যাসের নায়ক; কিন্তু তিন বছর তার সঙ্গে থেকেই মুশ্‌ বুঝেছিল যে গ্রঁদেল আসলে অত্যন্ত হিসেবী সাংসারিক প্রতিষ্ঠা-কামী লোক। সে নিজেই একবার মুশের কাছে স্বীকার করেছে যে, জনৈক প্রভাবশালী ডিপুটির কাছ থেকে কি একটা সুবিধা আদায় করে নেবার জন্যে সে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম করে মুশের প্রতি বিশ্বাসভঙ্গ করেছিল। একমাত্র জুয়োখেলায় গ্রঁদেলের অকৃত্রিম উৎসাহ। আগে আগে সে মন্তেকার্লো আর বিয়ারিৎস্‌-এর জুয়োর আড্ডায় নিয়মিত যেত, কিন্তু ডেপুটি হবার পর ওসব জায়গা যাওয়া ছেড়েছে; মুশ্‌কে বলেছে, তার কাছে জুয়োয় ঘুঁটিও যা রাজনীতিও তাই। গ্রঁদেলকে বিশ্বাস করে না মুশ্‌, মনে মনে ঘৃণাই করে। লুসিয়ঁর কাছে মুশ্‌ স্বীকার করেছে, 'আমার মনে হয়, ও যেন কিনে নিয়েছে আমায়।' মুশের কথার উত্তর দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে চটে ওঠে লুসিয়ঁ, এমন কি একবার মেরেও বসেছিল; কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই হেসে উত্তর দেয়, 'গণিকাদের আমি ভালবাসি, ওরা ভারী ভদ্র।'

লুসিয়ঁ যে বাপের থেকে ভিন্ন হয়ে গিয়ে আধ-পেটা খেয়ে থাকে—এতে তার প্রতি আরও বেশী টান অনুভব করে মুশ্‌। কিন্তু গ্রঁদেলের সুনাম রক্ষায়

তার এত আগ্রহ কেন সেটাও বুঝতে পারে না। স্বামীর কোন ব্যাপারে ওর আগ্রহ নেই, কোন দিন ও গ্রঁদেলকে কিছুই জিজ্ঞাসা করে না। গ্রঁদেল প্রেমের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে বলে মুশের ধারণা হয়েছিল একদিন। গ্রঁদেল যে কতখানি দুর্বৃত্ত, মুশ্ তা ভাল করে জানে বলেই লুসিয়ঁর জন্যে ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল ও। কিন্তু মতিনিদের বাড়ী যখন ওদের দুজনে দেখা হল, গ্রঁদেল চিরাচরিত শিষ্ট ব্যবহার করল লুসিয়ঁর সঙ্গে।

নিজের পারিবারিক অশান্তির কথা লুসিয়ঁ কাউকে বলেনি, কারণ তার ভয় ছিল জোলিওর কানে কথাটা উঠলে তার রোজগারের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তেসাও তেমনি ছেলের সঙ্গে ঝগড়ার কথাটা চেপে গেছে। একমাত্র মুশ্ই জানত সব। গ্রঁদেল ইদানীং লুসিয়ঁর কথা মুশ্কে প্রায় রোজই বলে। চুপ চাপ থাকে মুশ্। শেষে একদিন গ্রঁদেল বলল, 'আমি জানি ওর সঙ্গে ভারী ভাব তোমার। ওর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি করার কোন দরকার নেই, আমার কোন হিংসা নেই ওর ওপর। তুমি শুধু ওকে একবার এখানে আনো। আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে ওর সঙ্গে।'

রীতিমত উদ্বেগ নিয়ে মুশ্ গেল লুসিয়ঁর কাছে। কি করে যে স্বামীর প্রস্তাবটা তার কাছে পাড়বে তা ভেবে পেল না। একটা কোন বিপদ ঘনিয়েছে বলে ও আঁচ করেছে। লুসিয়ঁ যেন বিপদটাকে তাচ্ছিল্য করবার জন্যেই খুব হালকা ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগল, ঠাট্টা তামাসা জুড়ে দিল মুশের সঙ্গে। এই প্রথম লুসিয়ঁর আলিঙ্গনে ভয় ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি জাগল না মুশের মনে; ভেতরটা যেন কেঁপে উঠল তার। তারপর নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুশ্ বলল:

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় ও। বড় ভয় হচ্ছে আমার, লুসিয়ঁ।'

'যত বাজে চিন্তা তোমার। গ্রঁদেল ওথেলো নয়।'

'বুঝতে পারছ না তুমি। ঈর্ষার প্রশ্ন নয় এটা। বড় ভয়ংকর লোক ও। কোন বিপদে ফেলতে চায় তোমাকে। ওর এই পাতলা হাসি আমি চিনি। তোমার সঙ্গে ওর দেখা করতে চাওয়ার আর কি কারণ থাকতে পারে?'

'ও বোধহয় জানে না যে আমি বাবার সঙ্গে ভিন্ন হয়ে গেছি; আমার বাবার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চায় গ্রঁদেল। আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া আর কিছু ও চায় না। থাক, ওসব কথা ঢের হয়েছে,' বলে মুশ্কে চুমু খেল লুসিয়ঁ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হঠাৎ বলে উঠল মুশ্:

'চিঠিটা লিখেছে কে ?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'ওটা একটা জালিয়াতি, পেছন থেকে ছুরি মারার সেই চিরাচরিত পন্থা, আর কি! কিলমান নামে একজনের সই আছে চিঠিটায়।'

বালিশে মাথা গুঁজল মুশ্‌। ওর কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে লুসিয়ঁ বলল, 'তুমি জানো কিছু এ সম্বন্ধে ? বলো তাহলে!'

'ও খুন করবে তোমায়।'

'বলো কি জানো তুমি চিঠিটার কথা!'

'না, চিঠিটার কথা আমি কিছুই জানি না। কিন্তু কিলমান্‌কে আমি জানি। দোহাই তোমার, এ কথা বোলো না যেন, তাহলে খুন করবে তোমার! লুসের্নে একটা হোটেলের ঘটনা—কিলমানের সঙ্গে আমাকে কয়েক মিনিটের জন্যে ফেলে রেখে ও চলে গিয়েছিল। আমাদের ঘর দুটো ছিল পাশাপাশি। বীভৎস লোক এই কিলমান, সরু কোমর দেখে মনে হয় যেন কর্সেট্‌ ব্যবহার করে, মাথার পেছন দিকটা একদম কামানো..... ফরাসী কথা বলত মজার ঢঙে, 'ড' গুলো উচ্চারণ করত 'ট'-এর মত, খাঁটি জার্মান-আদমী। কিন্তু কাউকে বোলো না! গ্রঁদেল আমায় কিছু বলতে বারণ করেছিল। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল ও......তুমি তো জানো সাধারণত ও কি রকম শান্ত। ওর সঙ্গে কোন কিছুর মধ্যে তুমি যেতে পাবে না।'

লুসিয়ঁ মুশের সব কথা না শুনে তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিল। তারপরে চিৎকার করে উঠল ঃ

'শিগ্‌গির জামা কাপড় পরে নাও।'

কিসের জন্যে যে লুসিয়ঁ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল তা বুঝতে পারল না মুশ্‌ ; ওর হাতের ওপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরতে চেষ্টা করে বলল ঃ

'লুসিয়ঁ, লক্ষ্মীটি! রাগ কোরো না! আমার সত্যিই কোন দোষ নেই।'

কেঁদে ফেলল মুশ্‌। তারপর লুসিয়ঁকে খুশি করবার জন্যে হাতব্যাগটা খুলে প্রসাধন করতে বসল, পাউডারের পাফটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিল লুসিয়ঁ, 'আঃ এসো, এসো শিগ্‌গির!'

একসঙ্গে বেরিয়ে যাবার সময় ফিস্‌ফিসিয়ে বলল মুশ্‌ ঃ

'ওগো, এত ভয় হচ্ছে আমার!'

ব্লাউজটা খুলে গেছে লক্ষ্য করে মুশ্‌ ছুটে গিয়ে ঢুকল প্রথম দরজাটার আড়ালে।

বেরিয়ে এসে দেখে—কোথাও নেই লুসিয়ঁ। বাস-থামার জায়গাটায় একটা বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল মুশ্—চার পাশে লোকের ভীড়, কিন্তু কারো দিকে ওর লক্ষ্য নেই। প্রায় ওর কানের কাছে একটা খবরের কাগজওলা চেঁচিয়ে উঠল, 'বিপদ কাটেনি এখনো!' ভয় পেয়ে চমকে উঠে হিস্টিরিয়া-রোগগ্রস্তের মত মুশ্ কেঁদে উঠল—ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল চোখ দিয়ে। একটি মহিলা এগিয়ে এলেন ওর কাছে, শান্ত গলায় বললেন, 'কোন ভয় নেই! আমার স্বামী বলেছেন, যুদ্ধ হবে না।'

৭

সন্ধ্যা আটটায় ব্রতৈলের বাড়ী পৌছল লুসিয়ঁ। বসবার ঘরে তাকে নিয়ে এসে চাকরটা অপেক্ষা করতে বলে গেল; খেতে বসেছে ব্রতৈল।

'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতার জীবনযাত্রা একজন সাধারণ মধ্যবিত্তের মত; ঘরের মধ্যে একটা পিয়ানো—কেউ কোনদিন বাজায় না; লাল-সাটিনের রঙটা যাতে চটে না যায় সেইজন্যে আসবাবগুলোর ওপর ঢাকনি দেওয়া। গোল টেবিলটার ওপরে পরিবারের লোকদের ছবির একটা অ্যালবাম আর বিরাট একটা বই 'লোয়ারের তীরের প্রাসাদগুলির উপাখ্যান।' দেয়ালে টাঙানো সমুদ্রে সূর্যাস্ত, আর ফুলেভরা কুঞ্জবনের কয়েকটা দৃশ্যচিত্র।

খাবার ঘরে যাবার দরজাটা খোলা। পুরনো ধরনের কাঁচের আসবাবে ভর্তি কুলুঙ্গিটা চোখে পড়ে; স্ত্রীর মুখোমুখি বসে ব্রতৈল সুরুয়া খাচ্ছে, কোণে রয়েছে একটা উঁচু চেয়ার—ছোট ছেলের বসার জন্যে : ব্রতৈলের স্ত্রী এটা সরিয়ে নিতে দেয়নি। সযত্নে তোয়ালেটা ভাঁজ করে রেখে ব্রতৈল উঠে এল আগন্তুকের কাছে।

লুসিয়ঁর উত্তেজিত মুখচোখ দেখে ভুরু কুঁচকে তাকাল; না বলে কয়ে কেউ এসে তার সঙ্গে দেখা করলে সে বিরক্ত হয়। কিন্তু কোন অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা চাইবার মত মনের অবস্থা নয় লুসিয়ঁর; মুশের কাছ থেকে আসার পর এক ঘণ্টাও হয়নি এখনো।

সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল লুসিয়ঁ :

'চিঠিটা জাল নয়।'

হেসে বলল ব্রতৈল, 'তোমার কৃতী পিতাই বুঝি বললেন একথা?'

'না, বাবা বললে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু কিলমান বলে একজন লোক আছে, আমি জানি ; গ্রঁদেলের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে।'

লম্বা, চাপা ঘরটার এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করল ব্রতৈল ; আড়চোখে তাকে লক্ষ্য করতে করতে লুসিয়ঁ বুঝতে চেষ্টা করল, ও চটে উঠবে, বিস্মিত হবে, না বিহ্বলতার ভাব প্রকাশ করবে। কিন্তু ব্রতৈলের বলিষ্ঠ কঠিন মুখে কোন ভাব প্রকাশ পেল না।

'কে বললে তোমাকে এ কথা ?' জিজ্ঞাসা করল ব্রতৈল।

'নাম বলতে পারব না ; কিন্তু কি যায় আসে তাতে ?' আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি......'

আলোটা জ্বালিয়ে দিল ব্রতৈল ; ঝাড়লণ্ঠনটার উজ্জ্বল আলোয় চোখ কুঁচকাল লুসিয়ঁ। তার পেছনে দাঁড়িয়ে উঁচু চেয়ারটার পিঠে হাত রেখে ব্রতৈল বলল ঃ

'আমি পরামর্শ দিই—এখুনি তুমি যা বললে তা তুমি ভুলে যাও। তুমি এখন অন্ত লোকের হাতে ঘুঁটিমাত্র ' নামটাও করতে চাও না এমন একজন লোক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলছ তুমি! আমি তোমাকে গ্রঁদেল সম্বন্ধে নিঃসন্দেহেই বলছি।'

বিনাবাক্যে হলঘরটায় বেরিয়ে এল লুসিয়ঁ, অন্ধকারে অনেকক্ষণ হাতড়াল টুপিটার জন্তে, তারপর হঠাৎ আবার ফিরে এল বসবার ঘরে। ব্রতৈল তখনো একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

অস্বাভাবিক শান্তস্বরে বলল লুসিয়ঁ, যেন সে আপন মনেই বলছে কথাটা ঃ 'দেড় বছর ধরে আপনার সঙ্গে কারবার করছি আমি. এখন দেখছি ভেতরে কিছু ব্যাপার আছে .....কিন্তু আপনি কি অন্ধ ? নাকি, আপনিও এই কিলমানকে চেনেন ?'

লুসিয়ঁর মনে হল, ব্রতৈল তাকে হয় মেরে বসবে কিংবা 'বদমায়েস' বলে চেঁচিয়ে উঠবে ; কিন্তু কোন ভাব-পরিবর্তন দেখা গেল না তার মুখে ; শুধু বলল, 'অতি তুচ্ছ লোক তুমি, আমাকে অপমান করা তোমার ক্ষমতার বাইরে। আমার উপদেশ শোনো ঃ রাজনীতির মধ্যে তুমি মাথা গলিও না— ও কাজ তোমার নয়, ইতর জোচ্চুরি আর না হয় বেশ্যার দালালী করাই তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে। যাও, বেরিয়ে যাও!'

মুঠো পাকাল লুসিয়ঁ, কিন্তু ব্রতৈলের দিকে এগিয়ে না গিয়ে অনুগতের

মত বাইরে বেরিয়ে এল। রাস্তায় বেরিয়ে আসার পর তার মনে হল, কেন ওকে মেরে বসলাম না! নিজের ওপর বিরক্তিতে সে ভুলে গেল অপমানটা। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, তারই মধ্যে হেঁটে চলল রাস্তা বেয়ে। মে মাসের শেষ, তবু শীত রয়েছে।

আর একবার লুসিয়ঁ অনুভব করল—তার জীবন-ধারণের সমস্ত কারণগুলো যেন ভেঙে পড়েছে চুরমার হয়ে; এই ভাঙনটা রুখবার যেন কোন উপায়ই ছিল না! কে একজন ঘাড়-কামানো কিলমানের কাজে লেগেছে সে—কী বিরক্তিকর! আর মুশ্ কিনা দিব্যি আছে গ্রঁদেলের সঙ্গে। মুশ্ যে বহুবার গ্রঁদেলকে ছেড়ে চলে আসতে চেয়েছে, সে কথা মনেই পড়ল না লুসিয়ঁর; মুশ্‌কেও পাপের অংশীদার বলে মনে হল তার। কে জানে? হয়ত মুশ্‌ও কিলমানের সঙ্গেও থেকেছে। একই দলের ওরা সবাই! তার বাবা ঠিকই বলেছে, 'জার্মানদের হয়ে কাজ করছিস তুই!' কিন্তু বাবার কাছে আর ফিরে যাবে না সে, মের্জোঁ-ত্য-কুলতুরের ওই সব নির্বোধগুলোর কাছেও আর যাবে না—ফিরবার পথ বন্ধ। আর সামনেও খালি শূন্যতা। কালকে হয়ত জোলিও জানতে পারবে, তার বাপ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে; জোলিও কেন ঘোড়দৌড়ের বাজী জেতার টাকার ভাগ দিতে যাবে অন্যকে? ব্রতৈল তাকে অপমান করতে চেয়েছিল; ঠিকই তো—কাল থেকেই হয়ত তাকে চুরিই ধরতে হবে, কিংবা গণিকার অন্নে প্রতিপালিত হতে হবে। তবু, এদের এই রাজনীতির চেয়ে সেটা ভাল।

হঠাৎ লুসিয়ঁ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল: ছবির মত সাজানো একটা আনন্দ-মেলার শোভাযাত্রা চলেছে; অর্ধনগ্ন মেয়েরা শীতের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে পথ-চলতি অল্প কয়েকজন লোকের দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করছে, শোভাযাত্রার হালকা, পীতাভ আলোয় যেন শীতের অনুভূতিটা বাড়িয়ে দিচ্ছে আরও। লুসিয়ঁর মনে পড়ল—তুষার-মেরু আর আঁরির মৃত্যুর কথা। কি ব্যাপার এসব?—শাদা রঙের গাড়ী, পলেস্তারার তৈরী বিরাট হাঁস, পাউডারের পুরু প্রলেপ লাগানো মুখ আর কাগজের ফুলের মুকুট-পরা মেয়েদের এই উৎসব-যাত্রা আজ কিসের জন্যে? অনেক চেষ্টায় মনে পড়ল শেষে: ও, হ্যাঁ, আজকের কাগজে ছিল বটে খবরটা—ফ্রান্সের লোকদের একটু আনন্দ দান করতে চায় পল তেসা। বজ্রমুষ্টি, লালঝাণ্ডা আর প্রাণহীন

রাজনীতি তো ঢের হয়েছে! চিরজীবী হোক গণ-মনের আনন্দ আর দেশের ব্যবসা বাণিজ্য! পল তেসা সমস্ত পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে বলে মনস্থ করেছে—যুদ্ধ কিংবা বিপ্লবের ভয়ে পারী ভীত নয়। বসন্তের আবির্ভাবের সূচনা এই কার্নিভালের শোভাযাত্রা: থিয়েটারে প্রথম রজনীর অভিনয়, হিপোড্রোমে বাজীজেতার পুরস্কার, নাচ আর সৌখিন বেশভূষার প্রদর্শনী শুরু হবে এবার। পারীতে বসন্ত আসছে!—ত্বরা করো, ত্বরা করো ইংরেজ আর মার্কিন আনন্দ-সন্ধানীর দল!—টাকা এনো সঙ্গে করে! নাচের জলসা আর পোষাকের দোকান খোলা রয়েছে তোমাদের জন্যে, সুগন্ধ-বিক্রেতারা আর গণিকারা তোমাদের অপেক্ষায় রয়েছে! ফ্রান্সের রক্ষা-কর্তা পল তেসা রয়েছেন তোমাদের অপেক্ষায়!

আর একটা সুসজ্জিত গাড়ী পাশ কাটিয়ে গেল; কাঁধে তিন-রঙা চাদর জড়ানো একটা মোটা-সোটা মেয়ে একটা বৈদ্যুতিক মশাল তুলে ধরে রয়েছে। যেন ফ্রান্সের প্রতীক ও। শীতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, চোখ দুটো বিষণ্ণ, বিবর্ণ রাঙা ঠোঁট। লুসিয়ঁ দাঁড়িয়ে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল; তারপরে হঠাৎ চ্যাংড়া ছোঁড়াদের মত জিব ভেংচে উঠল মেয়েটার দিকে।

৮

খুব অল্পদিন আগেও 'যুদ্ধ' কথাটা বলতে লোকের মনে কতকগুলো অতীতের স্মৃতি জাগত। পঞ্চাশ বছরের বুড়ো শান্তশিষ্ট শুঁড়ি কিংবা হিসাব-সরকার দীর্ঘ শীতের সন্ধ্যায় বসে যৌবনের সেই উচ্চকিত দিনগুলোর কথা বলতে ভালবাসত; গল্প-বলা আরম্ভ করত এই বলে, 'সেই যুদ্ধের সময়ে... ..' শ্রোতার কথা গ্রাহ্যই করত না কেউ কেউ; বিপদের অভিজ্ঞতাগুলো অনেক বাড়িয়ে, অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে আর গলার স্বরে অনুকরণ করে বোঝাতে চাইত গুলি-গোলার বজ্র-বিভীষিকা আর মুমূর্ষুর গোঙানি। যুদ্ধের পর থেকে যারা গতানুগতিক নিরানন্দ জীবন যাপন করে আসছে, তারা যুদ্ধের বছরগুলোকে দেখে একটা নেশা-ধরানো অ্যাডভেঞ্চার হিসেবে। গড়খাই-এর কাদা, উকুন আর আতঙ্ক ভুলে গিয়ে তারা উৎসাহের সঙ্গে বর্ণনা করত—শত্রুর পরিখার পেছনে দুরূহ অভিযান, সামরিক উৎসব আর প্রেমাভিসারের দুঃসাহসিক বৃত্তান্ত। ছোট ছেলেরা বাপেদের যৌবনের দুঃখকষ্ট আর সাহসের কথা শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিল—তাদের কাছে যুদ্ধটা হয়ে উঠেছিল ঘোড়ার গাড়ী কিংবা তেলের লণ্ঠনের মতই অব্যবহার্য অতীতের জিনিস। এখন আবার এই পরিচিত শব্দটা নতুন করে চালু হল, যুদ্ধ বলতে এখন বোঝায় দুর্দিনের পূর্বাভাস আর উৎপীড়ন, যেন আগামী দিনের পথ আগলিয়ে আছে এই যুদ্ধ। লোকে বলে, 'যদি যুদ্ধ না বাধে তাহলে হেমন্তে বিয়ে করব আমরা' কিংবা, 'জুলাই মাসে পরীক্ষা পাস করব—যদি যুদ্ধটা না বাধে তাহলে।'

এবারকার বসন্তে খুব খানিকটা লেখালেখি হল সুদেতেনদের নিয়ে—যাদের কথা এর আগে কেউ শোনেনি। চেকোশ্লোভাকিয়ার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে উঠল, মনে পড়ল—১৯১৪র কথা, সার্বদের কথা আর সেই গরম দিনটির কথা, যেদিন ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে ছোট ছোট শাদা ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছিল—সাধারণভাবে সবাইকে সৈন্যদলভুক্ত হতে হবে।

মে মাসে যে আতঙ্কটা রটেছিল, দেখা গেল সেটা বাজে গুজব ; কিন্তু তবু সেই গুমোট গরমের আবছায়ার দিকে তাকাতে ভয় পেল অনেকেই, আবার সেই সুদেতেনরা! ছুটি সম্বন্ধে বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে কিইবা বলবার আছে ? সেই একই উত্তর পাওয়া যায়, 'যদি যুদ্ধ না হয়...।'

কিন্তু তবু ছুটির দিনগুলো ঘনিয়ে এল, আর যুদ্ধের ভয় উপেক্ষা করে পারীর লোকেরা বেরিয়ে পড়ল মৎস শিকারে কিংবা পাহাড়ী গ্রামের সন্ধানে। হতভাগা সুদেতেনদের জন্যে তারা রোদ-জ্বলা এই শহরে পড়ে থাকতে রাজী নয়।

ফ্রান্সের আর তার নিজের শুভ জন্ম-লগ্নে তেসা দৃঢ়বিশ্বাসী। সে ঘোষণা করল, 'শান্তির মরুদ্যান আমাদের এই দেশ!' সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংবাদপত্রে আর রেডিয়োতে উচ্চকিত প্রচার চলল ফ্রান্সের শান্তিপ্রিয়তা নিয়ে—যেন জিনিসটা কোন পেটেণ্ট ওষুধ কিংবা শ্রেষ্ঠতর একটা পানীয় বিশেষ! মার্কিনরা যাবে কোথায় ? বাইস্‌বাদেনে ? ওরে বাস্‌রে ! ঝটিকা বাহিনী, সামরিক কুচকাওয়াজ, কয়েদীদের গারদখানা আর ফাঁকি দিয়ে তৈরী নকল-মালে জায়গাটা ঠাসা। কার্লস্‌বাদে নয় নিশ্চয়ই : খোদ সুদেতেনরা থাকে ওখানে। ইতালীতে তো স্পেন-আগত আহত সৈনিকরা ভরে তুলেছে হাসপাতালগুলো, তা ছাড়া ওখানে এমনিতেই বড় গোলমাল চলছে—'কালো-কোর্তা'রা নতুন অভিযান শুরু করবার জন্যে তৈরী হচ্ছে। কিন্তু ভিসি, কান, বিয়ারিৎস্—এসব জায়গা রয়েছে আগন্তুকদের অপেক্ষায়। শান্তির মরুদ্যানই বটে, সুতরাং প্রতি সন্ধ্যায় মাই-ক্রোফোনের সামনে জিনেৎ পুনঃরাবৃত্তি করে চলেছে : 'শান্তির মরুদ্যান...অগ্রিম

স্থান সংগ্রহ করে রাখুন...এমারাল্ড্ উপকূলে আসুন!...লামার্তিনের স্মৃতি-উজ্জ্বল মার্শ দেশের রূপসীদের ভুলবেন না...'হে সান্ধ্য-মঙ্গলধ্বনি, স্মিত-গন্ধা ওগো সোমলতা!'...নাদুস-নুদুস মুরগীর কোর্মা আর চমৎকার মদ...।'

পনেরই আগস্ট জিনেতের ছুটি হল; ফাঁকা রাস্তা দিয়ে গাড়ী চেপে এল গার দ্যু লিয়ঁ-তে। আগের বছরগুলোর মতই পারীকে এ সময়ে মৃত শহর বলে মনে হয়। রাস্তা দিয়ে চলেছে দুচারজন মফস্বলের লোক কিংবা ঘোড়া-টানা টাঙ্গায় চেপে কয়েকজন ইংরেজ টহলদার। ফাঁকা, নিশ্চিন্ত শহরটাকে দেখাচ্ছে গ্রামের মত। কাফের আঙ্গিনায় মোটা সোটা লোকগুলো দিব্যি বসে আছে জামার বোতাম খুলে বুক বের করে। চটি পায়ে দিয়ে দারোয়ানগুলো দরজায় বসে সুতো বুনছে। চারদিকে একটা স্বচ্ছন্দ আবহাওয়া। উদারভাবে হাসছে সবাই; জিনেৎকে স্টেশনে পৌছে দিয়ে ট্যাক্সি-চালক শুভকামনা জানাল—ছুটিটা যেন তার আনন্দে কাটে।

ট্রেনে আলাপ-আলোচনা চলছে আবার সেই সুদেতেন, হিটলার আর যুদ্ধ নিয়ে। ওসব কথায় কান দিল না জিনেৎ—তার কাছে ওসব অবাস্তব আর জীবন-বিচ্ছিন্ন অতি দূরের জিনিস। এই যে, ফ্ল্যারি এসে গেছে।

গরমে ভ্যাপ্সা আর আঙুর-বনে ঘেরা এই শাদা ছোট্ট গ্রামটাকে জিনেতের এত পছন্দ হল কিসে? মদের ব্যবসায়ীরা ছাড়া আর কেউ এটার নামও জানে না। বোধ হয় ছেলেবেলায় শোনা এই মিষ্টি নামটা মনে পড়ে গিয়েছিল তার: ফ্ল্যারি।

অনেকদিন বাদে সে পারীর বাইরে এসেছে। মাঠের সবুজে, চারদিকের নিস্তব্ধতায় আর খোলা হাওয়ায় যেন নেশা চড়ে গেল তার মাথায়; বুক ভরে নিশ্বাস নিল, নীল আকাশের নীচে ভোরবেলাকার তাজা আস্বাদ উপভোগ করল, মাঠে মাঠে ছুটে বেড়াল, পাহাড়ে উঠল, এখানকার সব কিছুই যেন শান্ত আর অচঞ্চল। ছেলেবেলায় দেখা এই রকম ছোট ছোট বাড়ী আর দ্রাক্ষাকুঞ্জ মনে পড়ল জিনেতের আর হেসে উঠে মনে মনে বলল, 'শান্তির মরুদ্যানে...।' অন্তত এই একবার সে আন্তরিকভাবেই বলল তার বিশ্বাসের কথাটা।

আঙুর-গুচ্ছের ওপর গন্ধক ছড়িয়ে দিচ্ছে ভাঁটি-খানার লোকরা; ওদের হাত, জামা, সর্বাঙ্গ নীল রঙে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেকটি আঙুরের গোছা সস্নেহে পরীক্ষা করছে আর খুশির দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে নির্মেঘ আকাশের দিকে। ওদের একজন জিনেৎকে বলল, 'ভাল মদ হবে এ বছর।' প্রতি বছরের গ্রীষ্মঋতুর সঙ্গে এদের জীবনস্মৃতি

জড়ানো—রোদ বেশী পাওয়া গেল কিনা আর আঙুরের ফসল ভাল তুলতে পারল কিনা তারই মাপে এরা সুখ দুঃখের হিসেব করে। ভাল ফসলের সনটা লিখে রাখে পুরনো মদের বোতলের লেবেলে আর আগস্ট মাসের ঝিম-ধরা গুমোট গ্রীষ্মদিনের সঙ্গে সেই স্মৃতি জড়ানো থাকে। এবছর ইতিমধ্যেই আঙুরের রঙ কালো হতে শুরু করেছে।

নীচের উপত্যকাটা গাছে ছাওয়া। প্রত্যেকটি গাছের যেন নিজস্ব একটি জীবন আছে; ওক্‌, এম্‌ আর অ্যাশ্‌ গাছগুলো মানুষগুলোর চেয়ে বয়োবৃদ্ধ আর মানুষগুলোও এই গাছগুলোকে শ্রদ্ধা করে, বিশ্রাম করে এদের ছায়ায় বসে, ক্লান্তির মুহূর্তে আর প্রেমের অভিসারে আসে এদেরই তলায়—খায়, ঘুমোয় আর পরস্পরকে চুম্বন করে এই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। এই গাছগুলোর মধ্যে একটা জিনেতের ভারী প্রিয়ঃ ঘোলাটে ছোট্ট নদীটির কূলে যে লম্বা অ্যাশ গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, সেইটা। আঁধার-বরণ পাতাগুলো যেন উজ্জ্বল আকাশের পটে খোদাই করা, খাড়া দাঁড়িয়ে আছে মাথা তুলে, বাতাসের ঝাপটায় কিছুতেই নোয় না; জিনেতের মনে হয় গ্রামের প্রবেশ-পথে গাছটা প্রহরীর মত যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে শান্তি রক্ষার জন্যে।

যুদ্ধের কথাটা ফ্ল্যারিতেও পৌঁছাল এসে। গ্রাম্য কাফেটার ঠাণ্ডা আবছায়ায় বসে যেখানে চাষীরা মোটা কাঁচের গেলাশ-ভর্তি কড়া মদে আস্তে আস্তে চুমুক দেয়, সেখানে শহরের রেডিয়োর সংবাদ-ঘোষক ওই অমিশুক ঝগড়াটে লোকটার চড়া গলা শোনা গেল। লোকটা সুদেতেনদের কথা আর কে একজন হায়েন-লায়েনের কথা বলল। ভ্রূকুটি করে তাকাল গাঁয়ের লোকেঃ যুদ্ধ গুড়ি মেরে আসছে তাদের ঘরের দিকে? এমন সময়ে এসে হাজির হল ওজেন—লোকটা গাঁয়ের গোপালভাঁড়। গাল দুটো লাল, বিরাট গোঁফ—কি এক অজ্ঞাত কারণে লোকে তার ডাকনাম দিয়েছে 'অস্ট্রিয়ান'; যদিও পাশেরই এক গাঁয়ে তার জন্ম। সে এসেই সোৎসাহে ঘোষণা করল 'চল্লিশটা চিংড়ি মাছ খেয়েছি আমি আজ।' হায়েনলায়েনের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে সবাই এসে ভীড় জমালো 'অস্ট্রিয়ান'কে ঘিরে কোন্‌ নদীতে ওই চিংড়ির সন্ধান পাওয়া গেল তারই বৃত্তান্তটা ওর পেট থেকে বের করবার চেষ্টায়; বজ্জাতটা নিঃশব্দে হাসতে লাগল দাঁত বের করে। অন্যান্য কয়েকটা ঘটনাও ঘটে গেলঃ লিয়ঁ থেকে কয়েকজন লোক এল একজন জোতদারের খামারে ফসল তোলার উৎসব উপলক্ষে মদ কিনে নিয়ে যেতে; বুড়ো বাঁজ লতাপাতা দিয়ে কতকগুলো ঝুড়ি তৈরী করে বেচল কয়েকজন বিদেশী

টহলদারের কাছে; কাফেওলার ছাগলটা পালিয়ে গেল। এই এখানকার জীবন কিন্তু খবরের কাগজে আর রেডিয়োতে একঘেয়েভাবে মৃত্যুর কথাই খালি বলা হচ্ছে—ওসব অনির্দিষ্ট কথায় কান না দেওয়াই হল যারা বেঁচে আছে তাদের চেষ্টা।

গ্রামের জীবনের অংশ হয়ে উঠল জিনেৎ; চাষীরা ওকে মদ দেয় আর কৌতুক করে ওর সঙ্গে; নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'ভারী রংদার মেয়ে'—অর্থ, 'ভারী চমৎকার মন-খুশি-করা মেয়ে।' এখানে এসেই জিনেৎ ভুলে গেল পারীকে যেখানে সে ফেলে এসেছে তার একঘেয়ে ক্লান্তিকর নির্বান্ধব কর্ম-জীবন। পারীর ফিটফাট কেতাদুরস্ত মেয়েদের নিয়ে মোটর গাড়ীগুলো যখন বড় রাস্তা বেয়ে চলে যায়, তখন সেই শত্রুভাবাপন্ন জগতের কথা মনে পড়ে জিনেতের—ভয়-মেশানো চিন্তা জাগে তার মনে, 'শিগ্‌গিরই ফুরিয়ে যাবে এই ছুটির দিনগুলো!'

তারপর, একদিন যখন ভয়ানক গরম পড়েছে, জ্বলন্ত রোদ্দুর থেকে বাঁচবার জন্যে সবাই গিয়ে জুটেছে ঠাণ্ডা কাফেটায়, একজন পারীর লোক এসে আলাপ করল জিনেতের সঙ্গে। ছুটির পোষাক-পরা লোকটার পায়ে রবারের জুতো, জামায় কলার নেই; ভারী ফূর্তিবাজ, ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো পাইপ্, তিল-চিহ্নিত পাতলা মুখ আর উজ্জ্বল চোখ—দেখে মনে হয়, মার্শ বা দির্জ-র কোন মদের ব্যবসায়ী হবে হয়ত; সশব্দে ঠোঁট চেটে আর গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে তারিয়ে তারিয়ে মদ খায় লোকটা। সেদিনটা গরমে তন্দ্রা এসেছে সকলের; কাফেওলার বউটা ঘুমুচ্ছিল নাক ডাকিয়ে; কিন্তু পাইপ মুখে এই লোকটার যেন হাসিখুশির সীমা নেই। 'অস্ট্রিয়ান'-এর সঙ্গে ঠাট্টা করে আর কাফে-উলীকে নিয়ে কৌতুক করে জিনেৎকে হাসাল খুব খানিকটা; তারপর শুরু করল মার্সাইএর উপাখ্যান বলতে: 'অলিভিএ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলে কিনা, 'কানবিএর-এর রাস্তা ধরে আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন দেখা পেলাম মারিয়ুসের। চেঁচিয়ে ডাকলাম, ওহে মারিয়ুস! কিন্তু ফিরেও তাকালো না ও। শেষকালে জানা গেল—কী কাণ্ড দেখো দিকি!—ও কিনা ও নয়, আর আমি আমাতে নেই!' হেসে গড়িয়ে পড়ল জিনেৎ, 'কী কেলেঙ্কারী! ও কিনা ও নয়, আর আমি আর আমাতে নেই...।' এত সংক্রামক হয়ে উঠল হাসিটা যে কাফেউলীটা পর্যন্ত জেগে উঠল দিবানিদ্রা থেকে, তারপর একটু হেসেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এই বিদেশীটাকে জিনেতের পছন্দ হল—যদিও লোকটা বয়সেও তরুণ নয়, দেখতেও সুশ্রী নয়। লোকটার সরল আমোদপ্রিয় স্বভাব আর এক ধরনের জীবনীশক্তি জিনেৎকে আকৃষ্ট করেছে। জিনেতের জীবন কাটে অভিনয়ের জগতে—যেখানে প্রত্যেকের হাবভাব আর বাচনভঙ্গী কৃত্রিম। এই লোকটার মধ্যে—একে সে মদের ব্যবসায়ী বলেই ধরে নিয়েছে—এমন কিছু আছে যা তার হৃদয়কে স্পর্শ করল। সহজভাবেই গল্প করল ওরা দুজনে, তারপর গরম কমে গেলে একসঙ্গে বেড়াতে গেল। জিনেৎ ওকে নিয়ে এল তার সেই প্রিয় গাছটির তলায়; ঘাসের ওপর ও বসে পড়ল, মাথার টুপি নামিয়ে রেখে মস্ত বড় এক সিল্‌কের রুমাল দিয়ে কপাল মুছে বলল, 'আশ্চর্য সুন্দর এই জায়গাটা।' কেমন বিষণ্ণ দেখাল ওকে, জিনেৎও বিমর্ষ বোধ করছিল।

'কেমন যেন মনমরা ভাব দেখছি তোমার' বলল লোকটা, 'এই একটি ক্ষমতা আমার আছে: মানুষের মনের ফূর্তি একেবারে নষ্ট করে দিতে পারি আমি। রূপকথায় শোনা যায়, মুঠো ভরে ধুলো তুলে নিত আর সেটা হয়ে যেত একমুঠো সোনা; আমার বেলায় ঠিক তার উল্টো: সোনা বদ্‌লে হয় ধুলো।'

'বুঝেছি,' বলল জিনেৎ।

জিনেতের দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ল আর একটা গাছের কথা—ধুলোয় ভরা, তন্দ্রাচ্ছন্ন গাছটা দাঁড়িয়ে আছে পারীর সেই পার্কের নাগরদোলাটার পাশে। জিনেৎও সুখী হতে পারত, কিন্তু কেন সে প্রত্যাখ্যান করল সুখকে? সেও এই লোকটির মত—সোনা বদলে হয় ধুলো, এই অচেনা লোকটি তার কাছে আরও প্রিয় হয়ে উঠল। বিস্মিত কণ্ঠে বলল সে:

'আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছে বড় অদ্ভুতভাবে। আমি এখনো জানি না তুমি কে? আমি একজন অভিনেত্রী। তাই বলে ভেবো না আমি খুব নাম করা কেউ। ছোটখাটো অভিনেত্রীদের মধ্যে আমি একজন—রেডিয়োতে কাজ করি। জীন ল্যাঁবের্যার। জিনেৎ। তোমার নাম কি?'

'দেসের। ফ্রান্সে বোধহয় লাখখানেক দেসের আছে।'

'দ্যুপোঁ-র সংখ্যা আরও অনেক বেশী। আমি একজন দেসেরের কথা শুনেছি, কোটিপতি লোক সে। সবাই বলে, লোকটা পাগল, কিন্তু আর সব বড়লোকদের মতই সেও বড় সাংঘাতিক জীব ...।'

হাসল দেসের। বলল, 'নিশ্চয়। কিন্তু পরিচয় আদানপ্রদান তো হল। এবার এস, জ্ঞানী অলিভিএর মত বলা যাক: তুমি কিনা তুমি নও আর আমি

আর আমাতে নেই। কেমন ? অভিনেত্রীর জীবন তোমার বেশ লাগে, না ? কি ধরনের ভূমিকায় নামো তুমি—সরলা কিশোরী ? হতাশ প্রেমিকা ? গ্রাম্য কুমারী ? না, মার্গারিৎ গতিএ ?'

''সিনৎসানো' মদ আর 'জাতীয়' বিছানার বিজ্ঞাপন ঘোষণা করি আমি। ফ্রান্সের স্বচ্ছলতার কথাও বলে থাকি। অতি সামান্য ব্যক্তি আমি। একবার আমার একটা প্রধান ভূমিকায় নামবার কথা ছিল। কিন্তু অন্য একজনকে ওরা দিল ভূমিকাটা ; প্রশ্নটা ছিল অভিনেত্রীর খ্যাতি নিয়ে—অর্থাৎ আসলে যেটা টিকিট বিক্রির টাকার প্রশ্ন। আমার এক মঞ্চ-ব্যবস্থাপক বন্ধু আছে—মারেশাল তার নাম ; বোধহয় কখনো শোনোওনি তার নাম। ভারী বুদ্ধিমান লোক ও—নাটক মঞ্চস্থ করার কথা সর্বদাই ভাবে, কিন্তু কোন নাটক প্রযোজনা করেনি এ পর্যন্ত—টাকা নেই ওর। একটা বিপ্লবী থিয়েটারের দল আছে ওদের, কিন্তু লোকের ফ্যাশন বদলে গেছে আজকাল। অতি আশ্চর্য একটা অভিনব পরিকল্পনায় একটা নাটক প্রযোজনা করেছিল মারেশাল, আর আমার তাতে প্রধান ভূমিকায় নামার কথা ছিল। কিন্তু এ সবই তো স্বপ্ন। আমাকে তো প্রচার চালিয়ে যেতে হবে নকল মুক্তোর আর কোষ্ঠকাঠিন্যের নতুন কোন ওষুধের। এই রকমই চলবে, আর কি ! শুধু, এতো শিগগির আবার পারীতে ফিরে যেতে হবে ভেবে মনটা খারাপ করছে।"

হঠাৎ জিনেতের মনে হল, তার সঙ্গীটি কি করে বা কোথা থেকে এসেছে, সে সব কিছুই জানে না সে। লোকটা পাশের মার্শ গ্রাম থেকে এসেছে, না পারী থেকে ? মৃদুস্বরে শুধোল সে : 'তুমি কি ছুটিতে এসেছ এখানে ?'

'হ্যাঁ। এই কাছেই জুলিয় যাবার পথে এক জায়গায় ছোট একটা বাড়ী নিয়েছি আমি। অক্টোবর পর্যন্ত থাকব এখানে।'

'তোমার পরিবার আছে সঙ্গে ?'

হেসে উঠল দেসের, 'একলা মানুষ আমি। সঙ্গী আর জুটল না কোনদিন। কেন জানি না, লোকে আমার কাছ থেকে পালায়, না আমিই লোকের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচি, তবে তোমার কাছ থেকে পালাইনি।'

'আমিও তোমার কাছ থেকে পালাইনি। আমিও একলা মানুষ। মানে, আমারও নিকট আত্মীয়স্বজন ছিল ;—না, ঠিক বলিনি কথাটা, নিকট আত্মীয় নয়, দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমি শুধু থাকতাম ওদের সঙ্গে—তার চেয়ে বেশী কিছু নয়,—কিন্তু সেটা তো হল আমার সম্পূর্ণ বাহ্যিক জীবন, একটি বিশেষ

ভূমিকায় অভিনয় করার মতই, কিংবা আরও ছোট ব্যাপার—এই ধরো যেমন কোন হোটেলের একটা ঘরে গিয়ে ওঠা—কিন্তু কি যায় আসে বলো ?'

স্নিগ্ধ শান্ত সন্ধ্যা নামল ; হাওয়ায় কেঁপে উঠল অ্যাশ্ গাছের পাতাগুলো ; ব্যাঙের ডাক আর দূরে গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল, কেমন স্তব্ধ হয়ে রইল জিনেৎ। হঠাৎ যেন দেসেরের মুখখানা দেখাল বড় শুকনো আর বুড়োটে, একটাও কথা না বলে তারা গ্রামে ফিরে এল। বিদায় নেবার সময় দেসের পরের দিন আসবে কিনা জিজ্ঞাসা করল ; খানিকটা একটু তিক্ততার সঙ্গেই বলল, 'যেন স্কুলের ছেলের মতই প্রণয় মিলনের কামনা জানাচ্ছি এক জামির গাছের নীচে।'

'জামির গাছ নয় এটা, অ্যাশ্ গাছ। ওসব কথা থাক। মন খারাপ কোরো না যেন ! আচ্ছা, কাল দেখা হবে !'

পরের দিন দেসের এসে অনেকক্ষণ গল্প করল ; বলল, জিনেতের চোখ দুটো পেঁচার মত, পুড্‌ল্ কুকুরের মত তার চুল আর মিষ্টি স্বভাব, পারীর চ্যাংড়া ছুঁড়ীদের মত তার কথা ; কথায় কথায় জানাল, সংসারের ওপর ঘেন্না জন্মে গেছে তার ; আর, শরীর একেবারে ভেঙে না-পড়া পর্যন্ত সে ফ্ল্যারির সমস্ত মেয়ের সঙ্গে একে একে নাচতে রাজী আছে ; আরও জানাল—গাড়ীর টায়ারটা তার ক্ষয়ে গেছে, গায়ের কোটটাও শতচ্ছিন্ন ; লাফোর্গের কবিতা সে ভালবাসে ; তবে যে জন্যেই হোক, সংখ্যাতত্ত্বে তার ভারী আগ্রহ।

আরও কয়েকদিন পরে ওরা দুজনেই পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ে অধীর হয়ে উঠতে লাগল। ওদের দুজনের মনেই কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই, আবার উচ্ছ্বাসপ্রবণ বাচালতাও নেই ওদের স্বভাবে। জিনেৎ ভাবল, 'ব্যাপারটা ওর কাছে ছুটির দিনের একটা অতি সাধারণ অ্যাড্‌ভেঞ্চারের মতই।' দেসের ভাবল, 'আমি বয়সে বুড়ো, দেখতে কুৎসিত—তবে টাকায় সবই কেনা যায়।'

সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকেও গরমটা রয়ে গেল ; ভারী খুশি হল চাষীরা—ফেঁপে ফুলে উঠছে আঙুরগুলো, ভাঁটিখানায় এবার গাঁজানি শুরু হবে শিগ্‌গিরই, কিন্তু জিনেতের আর সেটা দেখা হয়ে উঠবে না—তার ছুটি ফুরোবে আর এক সপ্তাহ পরেই।

শেষের দিনের আগের দিন যখন ওদের দেখা হল, দেসের অদ্ভুতভাবে জড়িয়ে

ধরল জিনেৎকে ; প্রেমের ব্যাপারে সে স্কুলের ছেলেদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ নয়। তার আন্তরিকতা আর আবেগটুকু বুঝল জিনেৎ, তারপর তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বিমর্ষভাবে বলল, 'না, থাক।'

সঙ্গে সঙ্গে ওর নিষেধ মেনে নিল দেসের। তারপর কিছুক্ষণ ওরা একটা বনের পথ ধরে নিঃশব্দে হেঁটে চলল। এক সময়ে জিনেৎ বলল, 'অনেক জাম হয়েছিল এখানে—পাতাগুলো দেখ। রাগ কোরো না, তোমাকে দেবার মত কিছু আমার থাকত যদি···তুমি তো জানো, আমি কুমারী নই। প্রেমের ব্যাপার এমন অনেক ঘটে গেছে আমার জীবনে। কি করে যে কী ঘটে গেছে তা নিজেও জানি না—হয়ত নিজেকে বড় একলা মনে হয়েছে বলেই, কিংবা হয়ত পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি বলেই··· কিন্তু তোমার বেলায় আলাদা কথা!'

চুপ করে রইল দেসের।

এই কথাবার্তার পর জিনেৎ রাত্রে নিজেই নিজের ওপর চটে উঠল : আবার সে সুখকে প্রত্যাখ্যান করতে যাচ্ছে! সে নিজেই অবশ্য জানে না যে লোকটাকে সে সত্যিই ভালবেসেছে, না এটা শুধুই মনের একটা সাময়িক চাঞ্চল্য মাত্র। মাঝে মাঝে জিনেতের মনে হয়েছে, দেসেরের কথায় সে তার নিজের মনের চিন্তাগুলোরই যেন উত্তর পায়, আর সেইজন্যেই ওর সঙ্গে কথা কইতে তার ভাল লাগে। ওরা দুজনেই ক্লান্ত আর একলা। দুজনেই তারা দরদের সন্ধানে ঘুরছে সংসারে—এক হিসেবে তারা দুজনেই স্নেহের ভিখিরী। পরস্পরকে কি দিতে পারে তারা? আঙুর চাষ করে যারা তাদের সঙ্গে কথা কয়ে, ভাঁটি-খানার লোকদের সঙ্গে বিশ্রাম করে, আর গাঁয়ের কাফেটায় বসে সহজ কৌতুক করে মাঝে মাঝে খুশি হয় দেসের। এখন কিন্তু জিনেতের মনে হল যে সে ভালবাসে দেসেরকে। বনের মধ্যে এই ঘটনার জন্যে চটে উঠল ও নিজের ওপর : ওই অদ্ভুত ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ভাবটা দেখাতে গেল কেন? তারপরে চটে উঠল দেসেরের ওপর : তার কথা শুনল কেন ও? শেষে ঠিক করল, কাল ওকে চুমু খাবে। তারপরে ঘুমিয়ে পড়ল জিনেৎ।

পর দিন দেসের শহুরে পোষাক পরে এসে হাজির হল ; মুখে চোখে উদ্বেগের চিহ্ন, কান দিল না জিনেতের কথায়।

'এক ঘণ্টার মধ্যে আমি পারী রওনা হচ্ছি,' বলল সে।

'না না!' বলে উঠল জিনেৎ।

দেসের শান্তভাবে বলল, 'ধন্যবাদ।'

তারপরে পাতলা নীল রঙের একটা কাগজ বের করে বলল :

'টেলিগ্রাম। ফিরতে বলছে ওরা আমায়। হঠাৎ পরিস্থিতিটা অপ্রত্যাশিত রকমের জটিল হয়ে উঠেছে...'

কতকগুলো পরিচিত শব্দ হঠাৎ জিনেতের কানে এল—হিটলার, হায়েনলায়েন, চেম্বারলেন—যেন কোন রেডিয়োর খবর শুনছে।

'যুদ্ধ বাধবে না নিশ্চয়ই ?'

'বাধবে না বলে তো মনে হয় না। তবে শান্তি রক্ষা করা চাই, যে কোন উপায়ে... দেখেছ তো, এখানকার লোকেরা কত সুখী। এদের এই শান্তি রক্ষা করতে হবে আমাদের...'

'হ্যাঁ,' আড়ষ্ট গলায় বলল জিনেৎ।

এক মুহূর্ত পরেই সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু তুমি কেন ? কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। প্রথমে ভেবেছিলাম তুমি মদের ব্যবসাদার। কিন্তু এখন তুমি কথা বলছ—যেন কোন ডেপুটি কিংবা মন্ত্রী।'

মুহূর্তের জন্যে খুশি হয়ে উঠল দেসের, 'না, না, মন্ত্রী নই আমি! ভগবান রক্ষে করুন! আমি ব্যবসাদার বটে, তবে মদের কারবার করি না। সত্যি কথা বলতে কি, আমিই সেই সাংঘাতিক জীব দেসের। তুমি প্রথম দিন বলেছিলে কথাটা, মনে পড়ে ? তারপরে, এখন বোধ হয় তুমি আমায় চুলোয় যেতে বলবে ?'

বিস্মিত দৃষ্টিতে জিনেৎ তাকাল ওর দিকে—যেন এর আগে কখনো সে দেখেনি ওকে। কোটিপতি লোক। তার মনে পড়ল লিয়ঁর উদ্ধত, উন্নাসিক বড়লোকগুলোকে। কিন্তু দেসের চাষীদের সঙ্গে মদ খায়, আলপাকার কোর্তা পরে ঘুরে বেড়ায় আর তৃতীয় শ্রেণীর একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে গল্প করে দিন কাটায়। জিনেৎ যে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, সেটাই যেন সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও বেশী অচিন্ত্যনীয় করে তুলল। লোকটা ফিরে চলেছে পারীতে—যাক গে! অ্যাশ্‌গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল। ওকে চুমু খাবার ইচ্ছে হয়েছিল জিনেতের—কিন্তু হঠাৎ সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল :

'রাত্রে ভেবেছিলাম, তোমাকে চুমু খাব ; কিন্তু এখন আর তা অসম্ভব—এখন তুমি ভাববে, তোমার টাকার ওপর আমার দৃষ্টি পড়েছে।'

চোখে জল এসে গেল দেসেরের ; নিজের আবেগপ্রবণতায় নিজের ওপর চটে উঠে মৃদুস্বরে বলল, 'সেই পুরনো কথা।'

দেসেরকে দ্রুত চুমু খেয়ে, খাড়াই পথটা বেয়ে ছুটে ওপরে উঠে গেল জিনেৎ, তারপর ফিরে ডাকল দেসেরকে, 'আমার টেলিফোন নম্বর, সঁক্রেন '০৮২৬।'

আরও একটু ওপরে উঠে আবার বলল, 'বিদায়! পারীতে আবার দেখা হবে আমাদের, কেমন ?'

দেসের ততক্ষণে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে। একটু কৌতুক মেশানো গলায় সহজভাবে বলল, 'নিশ্চয়। অবশ্য, যদি যুদ্ধ না বাধে।'

৯

ফ্রান্সের নিরাপত্তার কথাটা তেসা এত দীর্ঘকাল ধরে সবাইকে বলে আসছে যে শেষ পর্যন্ত তার নিজেরই সেটায় বিশ্বাস জন্মে গেছে। কাউকে যদি বলতে শোনে, 'যদি যুদ্ধ না হয়,' তাহলে তেসা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে উত্তর দেয়, 'হবে না!' লোকটা যেই হোক না কেন, তেসার মুখে এ কথা শুনে খুশি হয়ে হাসে—হ্যাঁ, তেসা নিশ্চয়ই জানে কিছু! কিন্তু তেসা জানে না কিছুই। অন্য যে কোন লোকের মতই সে অবাক হয়ে ভাবতে পারে, 'যুদ্ধ হবে কি হবে না ?' কিন্তু নিশ্চিন্ত ভাবটা বজায় রাখল সে। তেসার এই প্রশান্তিটা সুদৃঢ় এবং ব্যাখ্যাতীত; নিশ্চিন্তভাবে পানীয়তে চুমুক দিচ্ছে যে অগণিত লোক তাদের দেখে, পর্লেতের অনর্গল কথায়, আর পার্লামেণ্টের চিরাচরিত গালগল্প শুনতে শুনতে তেসার মনে এই নিশ্চিন্ত ভাবটা ক্রমশ প্রশ্রয় পেয়েছিল ; বিশ্বের সব কিছুই বোধগম্য এবং পূর্বনির্দিষ্ট বলে মনে হয়েছিল তার। কোথাকার কোন্ হতভাগা সুদে-তেনদের জন্যে এহেন সুনিয়ন্ত্রিত জীবন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে—তাই কখনো সম্ভব নাকি ?

তারপর এল সেপ্টেম্বর মাস। বার্লিন থেকে তারে খবর এল—নাটকের শেষ অঙ্কটা একটু তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে এসেছে। দু-চারটে আশার কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে তেসা লোয়ার নদীর ধারে এক বাগান-বাড়ীতে কয়েকদিন ছুটি কাটিয়ে আসতে যাবে—এমন সময় ঝড় উঠল। ঘটনার গুরুত্বটা বুঝল খুব কম লোকেই। কাগজের খবর বিশ্বাস করল না কেউ ; মে মাসেও তো খবরের কাগজগুলো এমনি ঘেউিয়েছিল। 'থেমে যাবে

শিগ্‌গিরই,' বলল সবাই। ছুটি যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল; সমুদ্রতীরে রৌদ্রোপভোগ করল সবাই, বেয়ে উঠল পাহাড়-চুড়োয়, বঁড়্‌শি জুড়ে নিল ছিপের ডগায়। ছুটির দিনের শান্ত উষ্ণতার মধ্যে খবরের কাগজের সংবাদগুলোকে মনে হল নিতান্ত অবাস্তব। বৈদেশিক রাজ-দূতদের পাঠানো রিপোর্ট যে কেমন করে স্নানের আমোদ আর ভ্রমণের আনন্দে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে—সেটা বুঝে ওঠা একটু শক্ত বৈকি।

দায়িত্বটা ভয় পাইয়ে দিল তেসাকে; এ রকম বিশ্রী সময়ে কৌশল খেলিয়ে বিপদের সম্ভাবনা কমিয়ে বলে আর আত্মপ্রশংসায় খুশি হয়ে উঠে ক্ষমতা হাতে পেয়ে কোন লাভ আছে কি? নিজের অতীত জীবনের কথা ভেবে সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কয়েকবার: এর চেয়ে কোন খুনীর পক্ষসমর্থন করা অনেক সহজ—নিজের পেশা সম্বন্ধে ওদের একটা সততা আছে, কোন ধনী শ্যালিকার গলা কাটার আগে ওরা বড় বড় বক্তৃতা ঝাড়তে যায় না! কিন্তু মন্ত্রীত্ব ছাড়তে তেসা রাজী নয় কিছুতেই। ক্ষমতালাভের মধ্যে এক ধরনের মাদকতা আছে। বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে তার; এমন কি, পলেৎও লক্ষ্য করেছে এটা। সর্বদাই সচকিত হয়ে আছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, উৎসাহের অন্ত নেই যেন তেসার; নিজেই নিজেকে বোঝাচ্ছে, 'কী সময়ই যে পড়েছে! মন্ত্রী তো অনেকেই হয়েছে—সবাই তারা বিস্মৃত আজ। কিন্তু আমার কথা ইতিহাসের পাতায় পড়বে আমাদের নাতির নাতিরা—যদি শুধু ফ্রান্সের শান্তি রক্ষা করতে পারি!'

দিনে দিনে অবস্থাটা সংকটজনক হয়ে উঠতে লাগল; জার্মানদের রুখবার জন্যে এখনি কিছু একটা করা চাই; ইংরেজরা নিঃশব্দে সব লক্ষ্য করে যাচ্ছে; আর ফ্রান্স শতধা-বিভক্ত। তেসা ফ্লাঁদ্যাঁ-কে একপাশে ডেকে বলল, 'শান্তি ঝুলছে সুতোর ডগায়,' আর কথাটার পুনরাবৃত্তি করল বিষণ্ণ গলায়। তেসার ধারণা ওই চেকরাই যত অনর্থের মূল। তারপর এসে পড়ল দাড়িওলা ফুজে—এসেই চিৎকার করে বলতে লাগল স্বাধীনতার কথা, উদ্ধৃত করল ক্লেমসোর উক্তি, কথার ফাঁকে বারবার বলল 'ফ্রান্স! ফ্রান্স!' ঘাবড়ে গিয়ে তেসা বলল, 'চট্‌ছ কেন এতো? চেক্‌দের ডোবাবো না আমরা। আমি কথা দিচ্ছি...' তারপরে সে এই দাড়িওলা মূর্তিমান ক্রোধের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'আপাতত দেখা যাচ্ছে—যুদ্ধে নামতেই হবে আমাদের।'

তখনই প্রাগ থেকে একটা টেলিগ্রাম এল তার হাতে: দু-একদিনের মধ্যেই সুদেতেনদের অভ্যুত্থান হবে; জার্মান ফৌজ তাদের 'ভাইদের রক্ষা করার জন্যে' সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকবে; চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর কোনদিন হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তের জন্যে জোর করছে বেনেস। তেসা ভাবতে বসল—ফ্রান্সই যখন সর্বনাশের দুয়োরে, তখন চেকদের বাঁচানো সম্ভব কিনা? দক্ষিণপন্থীরা বিদ্রোহ করবে বলে শাসাচ্ছে। পাতলা-নেশা-ধরানো পানীয়তে চুমুক দিতে দিতে দালাদিএ বলছে, 'ফ্রান্সের চাষীদের কচু-কাটা হতে দিতে পারি না আমি!' লেব্রঁ্য তো কাঁদছে। আর দেনিসের দল কতকগুলো ঝগড়াটে প্রস্তাব পাশ করছে আর ধর্মঘট পাকিয়ে তুলছে—হ্যাঁ, কোন সাংঘাতিক খুনীর পক্ষসমর্থন করার চেয়েও এই সমস্যাটা নিশ্চয়ই দুরূহতর।

ব্রতৈলকে তার ঘরে ঢুকতে দেখে তেসা সখেদে নাক ঝাড়ল: আবার সেই অপ্রিয় কথাবার্তা শুরু করতে হবে তাকে; যেন সুদেতেনরাই তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, পার্লামেণ্টে বিরোধী-পক্ষের তাল সামলাতে হবে তাকেই, আবার ব্রতৈলকেও খুশি রাখতে হবে। হঠাৎ তেসার মনে পড়ল লুসিয়ঁকে আর সেই অপহৃত চিঠিখানার কথা। গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল, সুতীক্ষ্ণ নাকটা তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল শিকারী পাখির মত।

'আপাতত দেখা যাচ্ছে, যুদ্ধে নামতেই হবে আমাদের,' বলল তেসা।

'মোটেই না,' শান্তভাবে বলল ব্রতৈল, 'যুদ্ধে নামা আমাদের চলবে না, যুদ্ধে নামবোও না আমরা। যুদ্ধ-বিরোধী করে তুলতে হবে দেশটাকে। যুদ্ধের এই আতঙ্কটা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাকেও ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। আজ শেয়ার বাজারে গিয়ে দেখি...'

'কিন্তু সুদেতেনরা এই সপ্তাহেই অভিযান শুরু করে দেবে বলে মনে হয়—কথাটা শুনছো কি? সব ব্যবস্থাই করা আছে—জার্মানরা সীমান্ত পেরিয়ে আসবে। আমাদের আর কেটে পড়ার কোন উপায় থাকবে না।'

"যদি সামরিক ব্যবস্থা জারী করো, তাহলে গৃহযুদ্ধ শুরু হবে। ফ্রান্সের পরাজয় তো নিশ্চিত। অবশ্য জার্মানী আমাদের প্রাকৃতিক শত্রু। কিন্তু লড়াইয়ে নামার আগে তৈরী হয়ে নেওয়া দরকার, অথচ ফ্রান্সে আজ ঐক্যের অভাব। অনেকেই তো বলছে, সুদেতেনদের জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হতে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়: ঈশ্বরকে উৎসর্গ করো ঈশ্বরের প্রাপ্য, হিটলারকে নিতে দাও তার যা প্রাপ্য

—আমার দলের ডেপুটিদের তো এই যুক্তি। জার্মানীকে গোটাকতক সুবিধা ছেড়ে দেবার বিরুদ্ধে কারা? কমিউনিস্টরা, পপুলার ফ্রন্টের লোকরা, আর ঐ মস্কো-মোহমুগ্ধ ফ্রুজেটা। চেকদের জন্যে ওদের বিন্দুমাত্র চিন্তা নেই, ওরা চায় খালি নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে। একশোজন ফরাসীর মধ্যে দশজন চায় আপোষ-রফা, পাঁচজন বেনেসের পক্ষে, আর বাদবাকী সবাই শ্রেফ তিক্তবিরক্ত হয়ে উঠেছে সমস্ত ব্যাপারটায়। তুমি নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের পথে পা বাড়াবে না।'

'এ ব্যাপারে কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংস্রব কি? প্রশ্নটা হচ্ছে চেক্‌দের নিয়ে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওই চেক্‌দের যে মস্কোর সঙ্গে মিতালী।'

'আর আমাদের নিয়ে। প্রাগের সঙ্গে চুক্তিতে সই করেছিল লাভাল, কাশ্যাঁ নয়; পররাষ্ট্র-নীতির ব্যাপারে দলগত স্বার্থের খাতিরে পরিচালিত হওয়া উচিত নয়।'

ব্রতৈল বলল, 'মৈনাক-চুড়োয় বসে নেই আমরা। তুমিই তো বলেছিলে, বার্সেলোনার অ্যানার্কিস্টদের জন্যে ফরাসীরা প্রাণ দিতে চায় না। না, থামো! বলেছিলে কিনা? বেশ। তাহলে এখন, এই কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্যে ফরাসীরা প্রাণ দিতে চায় না; তাছাড়া, ক্রেমলিনের লোকরা শাসন করে ঐ দেশ। পল, তুমি তো বোঝো, চেকোশ্লোভাকিয়া মস্কোর একটা ঘাঁটি মাত্র। হিটলারের বেড়া ডিঙোতে চাওয়াটা তো না-বুঝবার মত কিছু নয়।'

ব্রতৈলের সুস্পষ্ট, দৃঢ় মুখখানার দিকে তাকিয়ে তেসা বিস্মিত হয়ে ভাবল, ফ্রুজের সেই প্রমাণপত্রখানা চুরি হয়ে যাবার কথা ও জানে কিনা। শেষ পর্যন্ত বলে উঠল, 'গ্রঁদেল সম্বন্ধে তোমার মনোভাবটা কি?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ব্রতৈল বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে এসেছি, আর তুমি কিনা শুধোচ্ছ এক অতি অকিঞ্চিৎকর হতভাগার কথা। তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি, পল জেনে রেখো!'

ব্রতৈল চলে গেলে তেসা হিসেব করতে বসল: দক্ষিণপন্থীরা বেরিয়ে গেছে—তার মানে দুশো চল্লিশ ভোট চলে গেল বিপক্ষে। একটা কথা ব্রতৈল ঠিক বলেছে—বিভক্ত হয়ে গেছে দেশ। গ্রঁদেল-সংক্রান্ত কথাটা সে তুলবে নাকি? কিন্তু তাহলে তো শুধুই বোকা বনবে সে—প্রমাণ কই তার হাতে? বার্লিনের সঙ্গে একবার যোগাযোগ করলে কেমন হয়? কিন্তু হিটলার যদি রাজী না হয়? বড় বিপজ্জনক হবে চালটা। জেনারেল গামলাঁ্যা 'চেক-ম্যাজিনো

লাইন' সম্বন্ধে ঝাড়া তিন ঘণ্টা বক্তৃতা দিল, কিন্তু দালাদিএ যখন সোজাসুজি প্রশ্নটা তুলল তখন গামল্যা বলে পড়াটাই ভাল বলে মনে করল: 'সামরিক বিভাগ গভর্নমেণ্টের আদেশ পালন করবে।' আদেশ পালন করাটা সোজা, আদেশ দেওয়াটাই কঠিন।

মধ্যাহ্নভোজনের আগে তেসা ডেকে পাঠাল তার বন্ধু জেনারেল পিকার্‌কে—লোকটার ওপর ভরসা আছে তার। পিকার্‌কে তরুণ এবং শান্ত দেখাচ্ছিল—কি করে যেন মনে হয়, লোকটা ফ্রান্সের অপরাজেয় সমর-শক্তির প্রতীক। ব্রতৈল বা ফুজের মত সমালোচকের মনোভাব নিয়ে সে তেসাকে বিব্রত করল না, এড়িয়ে যাবার চেষ্টাও করল না; ঠাণ্ডা মেজাজে নিজের মতামত ব্যক্ত করল:

'সমস্যার রাজনীতিক দিকটা আমি বাদ দিয়ে বলছি—আমি সৈনিক মাত্র। চেকোশ্লোভাকিয়ার সুরক্ষিত সীমান্তটা হারালে অবশ্য আমাদের পক্ষে ভয়ানক ক্ষতি হবে। কিন্তু সত্যি কথাটা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই। সামরিক ব্যবস্থা জারী করে আমরা সফল হবো বলে তো মনে হয় না। দেশের মনোভাব তুমি জানো। লোকে বুঝতে চায় না, সুদেতেনদের জন্যে কেন তারা লড়াই করতে যাবে। যুদ্ধ রুখবার জন্যে যুদ্ধ—এরকম কোন ধারণায় তাদের বিশ্বাস নেই। জার্মানী সম্বন্ধে...'

'কিন্তু চেকরা ওদের রুখবে।'

'বেশ তো! এই ধরো সপ্তাহখানেকের জন্যে। এদিকে চলছে সাঁড়াশী-অভিযান; আসল আক্রমণটা আসবে অস্ট্রিয়ার দিক থেকে। হাঙ্গেরিয়ানরা এগুতে থাকবে, পোল্‌রাও। জার্মানরা সোজাসুজি আমাদের আক্রমণ করতে পারবে। অবশ্য আমাদের ম্যাজিনো লাইন আছে; কিন্তু—'

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু আমাদের উড়োজাহাজ নিতান্ত কম। আমাদের বৈমানিকদের সামরিক শিক্ষা অতি সামান্য। বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলোও আমাদের মোটেই আশানুরূপ নয়। আর স্পেনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে—'

বাধা দিয়ে বলল তেসা, 'তাহলে, অসম্ভব?'

ভদ্রতার সঙ্গে হাসল পিকার্, 'সৈনিকের কাছে ও কথাটার কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু সব দিক ঠিকমত ওজন করে নেওয়া চাই। সামরিক পরাজয়ের চেয়ে চেকোশ্লোভাকিয়াকে হারানো ভাল।'

পিকার্‌কে পেয়ে প্রথমটায় তেসা খানিকটা ভরসা পেয়েছিল, কিন্তু এখন বেশ একটু দমে গেল সে। পারী ধ্বংসলীলার ভয়ংকর একটা ছবি এঁকে দেখাল পিকার্‌। পিকার্‌ যা জানে জার্মানরাও তা জানে নিশ্চয়—চাল মারা আর সম্ভব নয়। কি করা উচিত এখন? আত্মসমর্পণ করা? কিন্তু, তাহলে ফ্রান্সের দায়িত্ব? ফ্রান্সের সম্মান? . ...অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠল তেসা; যেন বেলজিয়াম বা পর্তুগালের মন্ত্রীত্বের সমতুল পদে তার অবনতি হয়েছে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল সে। নিজের ঘরে গোধূলির আলোয় একলা বসে তার মনে পড়ল: ভের্দাঁর দিনগুলো, যুদ্ধে নিহত কমরেডরা, আর ১৯১৮র পেয়েও-না-পাওয়া বিজয়। হ্যাঁ, লুভ্‌র্‌-এর সেই প্রতিমূর্তিটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ: জয়ের দেবী পক্ষ-সমন্বিতা, কিন্তু ছিন্নমস্তা তিনি।

দেসেরের সঙ্গে খেতে বসল তেসা। চমৎকার সব খাবার খাইয়ে কি করে বন্ধু-বান্ধবকে পরিতৃপ্ত করতে হয় দেসের তা ভালভাবেই জানে, কিন্তু তবু যেন খাওয়াটা জমল না তেমন। এমন কি, খাবারের তালিকার দিকেও তেসা একবারও তাকাল না। মার্সাই অঞ্চলের সব রকম খাদ্য মেলে এই রেস্তোরাঁটায় —রসুনের গন্ধ থেকে আর ধনে শাকের ওপর বিছানো ভাজা মাছ থেকেই সেটা ধরা যায়। অন্য সময় হলে, তেসা অনুপ্রাণিত হয়ে বক্তৃতা দিত উর্বরা দক্ষিণ দেশের বিচিত্র সুখাদ্যের স্বাদ-গুণ বর্ণনা করে। কিন্তু এখন তার মনটা কোন একটা অধঃপতনের গ্লানিতে ভরে উঠেছে।

হেসে বলল দেসের, 'কই, মদ মেশানো চিংড়ির শুরুয়া পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞেস করলাম না তো? সত্যি, কী ভয়ানক রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠেছি আমরা আজকাল!'

দেসেরও কিন্তু বিমর্ষ বোধ করছিল; একটা অতি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য তার আছে: একই দিনে তাকে দেখে কখনো মনে হবে যেন কুড়ি বছর বয়স কমে গেছে তার, আবার কখনো মনে হবে যেন বয়স বেড়ে গেছে কুড়ি বছর। এখনকার এই ঢিলে-ঢালা বিমর্ষ লোকটাকে যদি জিনেৎ দেখত, তাহলে একেই সেই প্রেম-কাঙাল, রোমান্টিক, অ্যাশ্‌ গাছের ছায়ায় অভিসার-যাত্রী বলে চিনে নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হত।

গত কয়েক বছরে দেসের যেন দমে গেছে বেশ খানিকটা। আগে আগে যখন দিনকাল ছিল অন্য রকম, তখন কোন কিছুতেই তার বিশ্বাস না থাকলেও একটা মানসিক একাগ্রতা তার ছিল; বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলত

কিংবা ফেল মারিয়ে দিত, শেয়ার বাজারের লেনদেনে গোলমাল বাধিয়ে দিত আর ইচ্ছামত মন্ত্রীর অদল বদল ঘটাত—যেন হাতের দস্তানা বদলাচ্ছে। একটা প্রাণহীন সমাজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর ছোটখাটো আনন্দগুলি জিইয়ে রাখার কাজে নিজের সমস্ত শক্তি সে নিয়োগ করেছিল। ধর্মঘটের হিড়িক, ফ্যাশিস্টদের সন্ত্রাসবাদ, স্পেনের নাটকীয় ঘটনা, হিটলারের অস্ট্রিয়া আত্মসাৎ আর দেশের পক্ষে ব্যাপকতর ও বৃহত্তর পরীক্ষার সম্মুখীন হবার সমস্যা—ইত্যাদি যে সব ঘটনা গত কয়েক বছরে ঘটে গেছে, তার ফলে জীবন অর্থহীন হয়ে উঠেছে তার কাছে। সমস্ত পৃথিবীটার আবহাওয়াই গেছে বদলে; সেই পুরনো ধাঁচের ফ্রান্সের উৎসাহী মৎসশিকারী, গ্রাম্য নৃত্যোৎসব আর র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রী এদের কোন এক আশ্চর্য উপায়ে বাঁচানো যাবে বলে কল্পনা করাও অসম্ভব। দেসের কাজ করে চলেছে বটে, কিন্তু সে যেন অনেকটা অভ্যাসবশেই। গোঁয়ার জুয়াড়ীর মতই সে একটিমাত্র সংখ্যার ওপরে সমস্ত বাজী ধরছে আর জুয়োর ঘুঁটিগুলো যেন ওকে বোকা বানিয়ে মজা দেখছে। অত্যন্ত গুরুতর হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি : লোকে তাকে প্রশ্ন করে, তাকেও উত্তর দিতে হয়, আর তার প্রত্যেকটি কথা নির্দেশ হিসেবে গৃহীত হয়।

তেসাও তাকে সেইভাবেই দেখে। চিংড়ি মাছের শুরুয়ার জন্যে তেসা এই রেস্তোরাঁয় আসেনি। ভোজ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্যে দেসের অন্যদিকে তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে চায়; কিন্তু প্যারীর ধ্বংসলীলার চিন্তায় আর দক্ষিণপন্থীদের ভোটের কথা ভেবে তার মন ভারাক্রান্ত।

'কি হবে ?' ক্লান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল সে।

'পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। ব্রতৈলের সঙ্গে কথা হয়নি তোমার ?'

'হ্যাঁ; ভয়ানক গরম গরম কথাবার্তা বলছে ওরা। ওদের কাছে বেনেসও 'বলশেভিক'।'

হেসে ফেটে পড়ল দেসের, 'তা তো বটেই, আজানা হল গিয়ে প্রথম বলশেভিক। তৃতীয় বলশেভিক কে হবে কে জানে! তুমি, না চেম্বারলেন ? ভারী মজার কথা। কিন্তু সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট : পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের। হাতের তাসগুলো সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছে ওরা—তা তো তুমি বোঝো। এখন আর ধর্মযুদ্ধে নামা অসম্ভব; যুদ্ধমাত্রেই এখন গৃহযুদ্ধে পরিণত হবে। আগে হলে, এই গৃহযুদ্ধের বিপদটা আসত গোপন রাজনৈতিক আন্দোলন কিংবা জনসাধারণের অসন্তোষ কিংবা সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ থেকে;—এসব তো

রীতিমত লোককাব্যের বিষয়বস্তু! কিন্তু এখনকার কারবার হচ্ছে বিরাট একটা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিয়ে, যে রাষ্ট্রে বড় বড় সব রাজনীতিজ্ঞরা রয়েছেন আর রয়েছে বিমান-বাহিনী—এইটাই আরও খারাপ। পূর্ব ইউরোপের দিকে লোকের সন্দেহের চোখে তাকানোটাই স্বাভাবিক। রুশরা যদি আমাদের সঙ্গে আসে, তাহলে ব্রতৈলের দল পরাজয়বাদী হয়ে উঠবে। রুশরা যদি আমাদের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে শ্রমিকরা হয়ে উঠবে পরাজয়বাদী। আর যদি রুশরা নিরপেক্ষ থেকে অপেক্ষা করা আর লক্ষ্য করে যাওয়ার নীতি গ্রহণ করে, তাহলে সবাই পরাজয়বাদী হয়ে পড়বে, আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরাজয়ের কথা ভাবতে ভয় পায় আবার জয়ের কথাতেও ঘাবড়ায়। সবচেয়ে ভয় পায় ওরা মস্কোর শক্তিবৃদ্ধিতে। এমন অবস্থায় যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা করে দেখো না একবার! শ্রমিকরা যে 'লা-মার্সাই' গান গায়, সেটা বুঝি। কিন্তু ওসব গ্রাহ্য কোরো না। গান গাইতে চায় গেয়ে বেড়াক; কিন্তু পথ ছেড়ে দিতেই হবে আমাদের।'

এক প্লেট চিংড়ি মাছ নিয়ে চুপ করে বসে রইল তেসা; আরও বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। গরম সম্বন্ধে অভিযোগ জানিয়ে ন্যাপকিন দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, তারপর বলল, 'বড় ক্লান্ত আমি। কিন্তু একটা কিছু ঠিক করতে হবে। দালাদিএটা কি রকম লোক তা তুমি জানো—ও খালি ঘুষি আস্ফালন করে চেঁচাতে পারে, 'আমি, আমি, আমি...' নেপোলিয়ন...কিন্তু আসলে ও একটা ভাঁড়; বাজে কথা বলে ভুল বোঝাতে চায় ও। কিন্তু জার্মানরা যদি পাঁচশ কি হাজার বোমারু-বিমান পাঠিয়ে জবাব দেয়, তাহলে? পিকার্ বলছে, আমাদের বিমান-বাহিনী কোন কাজের নয়। ভয়ানক একটা দায়িত্ব চেপেছে আমার ঘাড়ে। প্রাগ রয়েছে উত্তরের অপেক্ষায়; আমরা ওদের কথা দিয়েছিলাম...'

'সম্প্রতি চেম্বারলেনের সঙ্গে আমি নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছি,' বলল দেসের, 'ভারী হুঁশিয়ার ব্যবসাদার লোকটা—হিংসুটে, কিন্তু কথাবার্তা যেন মধুর মত! ওর ঠাকুরদাদার দেওয়া মস্ত একটা গোলগাল ঘড়ি বের ক'র দেখাল, একটা নীতিবাক্য খোদাই করা আছে ঘড়িটার গায়ে: 'এমন কোন প্রতিজ্ঞা কোরো না যা পূর্ণ করতে পারবে না'—ব্যবসাদারের পক্ষে ভারী উল্লেখযোগ্য নীতি। কিন্তু মন খারাপ কোরো না; তুমি তো কোন প্রতিজ্ঞা করনি, ও কাজটা করে গেছে তোমার পূর্ববর্তীরা। আর, তুমি করলেও কিছু যেতো আসতো না। রাজনীতি ব্যবসা নয়—রাজনীতিতে সততা বজায় রাখাও অসম্ভব।'

'কিন্তু একটা কিছু ঠিক করতে হবে আমাদের...'

'ঠিক যা করবার তা অন্তরাই করবে আমাদের হয়ে...এক ঘণ্টা আগে লণ্ডন থেকে ডেকেছিল আমায় টেলিফোনে। মাননীয় চেম্বারলেন হিটলারের সঙ্গে চুক্তি করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন—বুড়োটা ভারী ঘাগী। সুতরাং কোন দুর্ভাবনা নেই তোমার। আপাতত আমরা হলাম একটা বৃটিশ উপনিবেশ, পরে হয়ত জার্মানীর কোন একটি প্রদেশও হয়ে দাঁড়াতে পারি। ব্রতৈল হবে গলেতিএ। অত্যন্ত শয়তানী ব্যাপার—কিন্তু করার নেই কিছু। ফরাসীরা হাল ছেড়ে দিয়েছে। আমি আবার বলছি—পথ ছেড়ে দিতেই হবে আমাদের।'

আরও বেশী বিষণ্ণ হয়ে পড়ল দেসের। কিন্তু তেসা এতক্ষণে হাসতে শুরু করেছে, চেম্বারলেনের সিদ্ধান্তের খবরটা ভারী উৎফুল্ল করে তুলেছে তাকে, এখন তার গভর্নমেণ্ট দায়িত্বমুক্ত। বৃটিশরা যদি সরে দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে, এমন কি ওই ফ্রুজেটাকেও লেজ গুটোতে হবে; তাহলে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলকেই মন্ত্রীদলের পক্ষে ভোট দিতে হবে, আর এই বলে চমৎকার একটা বক্তৃতা দেবার সুযোগ পাওয়া যাবে যে 'এই দুর্যোগের মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের একান্ত প্রয়োজন।'

চিংড়ি মাছটার বেলায় অন্যমনস্ক ছিল তেসা, কিন্তু এবার এই ষাঁড়ের লেজের কোর্মাটা অত্যন্ত উপভোগ করল; লোভীর মত ঠোঁট চেটে, ঢেঁকুর তুলে আরাম করল; তারপর ক্লান্তভাবে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে, ক্ষীণ হাসি হেসে, বিস্মিত কণ্ঠে বলল, 'কই, কিছু খাচ্ছো না তো তুমি?'

'খিদে নেই।'

এতক্ষণে তেসা লক্ষ্য করল কেমন যেন খারাপ দেখাচ্ছে দেসেরের চেহারাটা। মুরুব্বিয়ানা করে সে এই সর্বশক্তিমান কোটিপতির পিঠ চাপড়াল, 'দু-এক বছরের মধ্যেই আমরা সামলে নেব সমস্ত। এখন দেরী করিয়ে দেওয়াটাই আসল কাজ। কিছু না খেয়ে ভাল করছ না তুমি। পবিত্র মশাল তুলে ধরে রাখতেই হবে আমাদের। হ্যাঁ, খাওয়াটি দিব্যি হল। এত খিদে পেয়েছিল, অথচ জানতেও পারিনি এতটুকু। আচ্ছা, আর একটু ছানা নেওয়া যাক।'

খেয়েই চলল তেসা। দেসের হেসে বলল, 'খুড়ীমা মারা যাবার পর আমার কাকা দু-দুটো আস্ত হাঁসের কাবাব খেয়ে বলেছিলেন, 'বড় দুঃখ পেয়েছি তাই'...

তেসা বাড়ী ফিরল খোশ্‌ মেজাজে।

আমালি জিজ্ঞাসা করল, 'মদ খেয়ে এসেছ নাকি?''
'না। খাওয়াটা দিব্যি হয়েছে, চমৎকার হয়েছে। তাছাড়া, অনেক গুরুতর রাজনৈতিক খবরাখবরও পাওয়া গেল। ওসব তুমি বুঝবে না—সাংঘাতিক জটিল সব ব্যাপার। তবে সিদ্ধান্তটা স্পষ্ট : পথ ছেড়ে দিতে হবে আমাদের।'
পোষাক ছাড়তে ছাড়তে তেসা হাল্‌কা মনে গান ধরল গুনগুনিয়ে, 'পথটি ছেড়ে দাও···দাও···দাও···দাও।'

১০

জোলিও অভিযোগ করছিল, 'ওই খনিজ-জলের উৎসটা দেখতে গিয়ে আমায় না খেয়ে থাকতে হয়েছে, তবু একটুও রোগা হইনি আমি ; কিন্তু এখন বোধহয় পাঁচ সের ওজন কমে গেছে আমার।' সম্পাদকের আপিসটা দেখে সামরিক হেড্-কোয়ার্টার বলে মনে হয়। জোলিওর ব্যবহারটা জেনারেলের মত ; রহস্যজনক সব প্যাকেট আসে তার নামে, অধিকতর রহস্যজনক সব হুকুম জারী করে ; দেওয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরাট এক মানচিত্র। আসলে সে নিজেই কিছু বোঝে না, দুর্ভাবনায় রোগা হয়ে গেছে সে। দেসেরকে চটাতে সে ভয় পায়, কারণ দেসের এখনো 'লা ভোয়া নুভেল্'-এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু দেসেরের পেট থেকে কিছু বের করা অসম্ভব ; খালি বলে, গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করে যাও, কিন্তু সমর্থন করবে কাকে? মন্ত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে একমত হতে নারাজ ; দালাদিএ মাদেলের বিরুদ্ধে ; তেসা রেনোকে পাত্তাই দেয় না ; অথচ এদের প্রত্যেকেই জোলিওর কাছ থেকে কাজ পাবার ফিকিরে আছে।
দেসেরকে ধন্যবাদ—'লা ভোয়া নুভেল্' সব চেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকাগুলির অন্যতম হয়ে উঠেছে। জোলিও বেপরোয়াভাবে তার পৃষ্ঠপোষকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ; পররাষ্ট্র-বিভাগের গোপন তহবিল থেকে সে টাকা নেয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকেও ঘুষ নিতে ইতস্তত করে না। টাকা-পয়সার ব্যাপারে এই দুর্বলতাটুকুর জন্যে সে মাঝে মাঝে নিজের ওপরই চটে ওঠে ; যদি দেসের হঠাৎ জানতে পারে তাহলে কি হবে?—কিন্তু তার রোজ-গারের অনেক উপায় আছে—এই ভেবে নিজেকে সে সান্ত্বনা দেয়। তাছাড়া, তার

স্ত্রীর একটা পশমের কোট চাই, তার সহকারী-সম্পাদকরা ভারী লোভী, এবং টাকা নিচ্ছে সে দেসেরের বন্ধুদের মত খাঁটি সব ফরাসীদের কাছ থেকেই—সুতরাং কাউকেই ঠকাচ্ছে না সে। কিন্তু ইদানীং বেচারী বড় গণ্ডগোলের মধ্যে পড়েছে, সরকারী ইস্তাহারগুলো যেন স্কটিশ ধারাস্নানের মত—কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জল। গভর্নমেণ্টের মতলব বুঝে ওঠা কঠিন; কর্তৃপক্ষ কি যুদ্ধের জন্যে তৈরী হবে, না আত্মসমর্পণ করবে? জোলিও স্ত্রীকে বলে, 'রাজনীতি বলে না একে। একটা গণিকালয় এটা, ওরা শেষ পর্যন্ত মূর্খের মত কিছু করে না বসে—ভগবানের কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা!' কিন্তু সহকারীদের সামনে সে সবজান্তা ভাব দেখায়—যেন কূটনৈতিক গোপন তথ্যগুলো সবই তার জানা। কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে তার সেই একই উত্তর: 'ভারী জটিল খেলায় নেমেছি আমরা, অত্যন্ত জটিল....'

দেশের লোক দিশেহারা। কোন কোন কাগজে লেখা হল, হিটলার স্ট্রাস্‌বুর্গ আক্রমণের আয়োজন করছে; অন্যান্য কাগজ ঘোষণা করল, চেকরা সুদেতেনদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে তবে এ ব্যাপারের সঙ্গে ফ্রান্সের কোন সম্বন্ধ নেই। ডজনখানেক প্রবন্ধ পড়ার পর লোকে বিব্রত হয়ে শুধোয়, 'দুত্তেরি ছাই! কি বলতে চায় এরা? আর, সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, কি করলে মিটবে এসব?' ইতিমধ্যে দৈনন্দিন জীবন যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল। আঙুরের ফসল তুলবার জন্যে তৈরী হল চাষীরা, নতুন নাটকের প্রথম রজনীর অভিনয়ের ব্যবস্থা হতে থাকল থিয়েটারগুলোয়, স্কুলের ছেলেরা রইল ইস্কুল খোলার অপেক্ষায়। চিনি আর চালের বরাদ্দ নিতে গিয়ে মেয়েরা বলাবলি করল, 'শুধু যদি যুদ্ধটা না বাধে!' আর, সর্বত্র লোকে উত্তর দিল, 'হবে না যুদ্ধ। চেকদের ব্যাপারে আমাদের কি? খালি এই মার্কস্‌বাদীরা আর ইহুদীরা যুদ্ধ চায়। কিন্তু আমরা শিগগিরই ওদের থামিয়ে দেব...।' বুর্জোয়ারা চেম্বারলেনের প্রেমে পড়ে গেছে, নামকরণ করেছে 'শান্তির দেবদূত'; কবিরা তার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছে; কাগজগুলো অর্থ সংগ্রহ করছে চেম্বারলেনকে কোন একটা মূল্যবান উপহার পাঠাবে বলে; ফ্রান্সের বিভিন্ন শহরের রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে 'রু চেম্বারলেন'। বাহারে স্নানাগারগুলিতে, জুয়োখেলার আড্ডায়, গ্রামের জমিদারীতে আর পারীর ধনী-অঞ্চলে গ্রীষ্মদিনের দিবানিদ্রা থেকে অসময়ে জেগে উঠে লোকে চেকদের অভিশাপ দিয়ে বলল, ওরাই গণ্ডগোলের মূল আর বুলগেরিয়ানদের চেয়েও ওরা খারাপ,

আধা বলশেভিক আর আধা 'ব্যাশ্ই-ব্যাজুক্' ওই চেকরা। কিন্তু শহরতলীর শ্রমিক-অঞ্চলে লোকে দালাদিএকে গালাগাল দিল, স্পেন আর 'নিরপেক্ষতার' নীতি স্মরণ করল, আর চিৎকার করে বলল, 'আত্মসমর্পণ আর নয়!'

বিকালবেলায় আতঙ্কজনক সংবাদ এল: চেম্বারলেনের দ্বিতীয় বারের সফরও ব্যর্থ হয়েছে। হাত দুটো বিক্ষিপ্ত করল জোলিও: শান্তির দেবদূত—যিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও আরেকটি বিমানযাত্রার ভয়ে ভীত নন—তাঁর এই বিনা রক্তপাতে যুদ্ধজয়ের কথাটা সে কয়েক কলম লিখবে বলে এইমাত্র ঠিক করেছিল। আর এই সময়ে কিনা আবার গোলমাল বাধল! কি করতে হবে বুঝে উঠতে না পেরে জোলিও আপিস ঘরে এদিক ওদিক পায়চারি করছে, এমন সময় দেসের টেলিফোনে ডাকল তাকে: 'এখুনি এসে একবার দেখা করো আমার সঙ্গে।'

অ্যাভালিদ্-অঞ্চলের এই রাস্তাগুলো নির্জন আর অন্ধকার। অজ্ঞাত আশঙ্কায় জোলিও কেঁপে উঠল; ছোট ছোট নীল আলোগুলো তার দিকে তাকিয়ে রইল কবরখানার আলোর মত। দেসেরের চেহারা দেখেও সান্ত্বনা পেল না সে—সেই স্থূল মুখ, আর স্তিমিত চোখের নীচে ঝুলে পড়া মাংস; এমন কি, দেসেরের টেবিলটা পর্যন্ত দেখে কেমন একটা বিষণ্ণতা মনে জাগে; সাধারণত কাগজপত্র ছড়ানো থাকে টেবিলটার ওপর, কিন্তু এখন শুধু এক গ্লাশ জল আর কয়েকটা মাথাধরার বড়ি ছাড়া টেবিলটা ফাঁকা।

জোলিও ঢোকামাত্র দেসের বলল, 'পরিস্থিতিটা ভয়ানক গুরুতর। অবশ্য, যুদ্ধ কেউই চায় না, জার্মানীও না; কিন্তু ওরা চাল মেরে যতটা পারে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। জনসাধারণ যুদ্ধ চায় না; যদি যুদ্ধ বাধে তাহলে যাদের হাতে রাইফেল তারাই বাধাবে। আমি কিন্তু এখনো আশাবাদী। আচ্ছা, আমার কথাটা তাহলে শোন; তোমার কাগজ পড়ে সব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা; কিন্তু তারা কেউ মোরিস দেয়াকে বিশ্বাস করে না, লোকটার বদনাম আছে। মোরিস রস্তাঁ-র কবিতা নিয়ে ওরা হাসাহাসি করছে। ওসব লোক দিয়ে চালানো অসম্ভব! নামগুলো দেখ: কেরিলি, দুকান, ফুজে, কার্শ্যাঁ। আর এদের বিরুদ্ধে তুমি খাড়া করছো কাদের? কতকগুলো ন্যাকা-বোকা ছিচকাঁদুনেকে।'

উত্তেজনায় দমবন্ধ হয়ে এল জোলিওর। তন্ন তন্ন করে হাতড়াল পকেটগুলো—চিঠি, জমাখরচের হিসাব আর তাগা-তাবিজে ভর্তি তার পকেট; একটা

প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি খুঁজছে সে। না, সে শুধুই মাইনে নিচ্ছে না বসে বসে! সগর্বে দেসেরকে দিল একটা পাতলা দুমড়ানো কাগজ: 'এই যে!'
জনৈক বিখ্যাত লেখকের লেখা একটা প্রবন্ধ; রচনাটার শিরোনামা: 'মৃত্যুর চেয়ে দাসত্ব শ্রেয়'। আগাগোড়া পড়ে কাগজটা একপাশে সরিয়ে রাখল দেসের। ওরকম ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠেছে কেন তার মুখে? প্রবন্ধে যে সব কথা বলা হয়েছে, ওসব সে আগে একাধিকবার বলেছে—জার্মানদের সুবিধা ছেড়ে দেবার পক্ষে সমর্থন জানিয়েছে, ফ্রান্সের নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রাষ্ট্রশক্তি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া উচিত বলে ঘোষণা করেছে, ব্যঙ্গ করেছে যারা শেষ পর্যন্ত যুঝতে চায় তাদের নিয়ে। দেসের ভয় করে মৃত্যুকে, শবযাত্রায় যোগদান করতে ঘৃণা করে সে। প্রায়ই ভেবেছে, 'বাঁচবার জন্যে যে কোন কাজ করতে রাজী!' আর এই পাতলা কাগজটির ওপর লেখা রয়েছে কিনা, 'মৃত্যুর চেয়ে দাসত্ব শ্রেয়।' কথাটা ভারী রূঢ় আর অপ্রিয়—দেসেরের শৈশব-স্মৃতির সঙ্গে কেমন যেন খাপ খেল না কথাটা; উৎসুক ছেলের আর অসন্তুষ্ট বুড়োর দল, নাচঘরের গাইয়েরা, সমুদ্রের হাওয়া—আর তার প্রিয় লেখকদের স্মৃতির সঙ্গে বড় বেমানান কথাটা।
নিঃশব্দে কাগজটা ফিরিয়ে দিয়ে দেসের আর একটা মাথাধরার বড়ি খেল। তারপর বলল, 'ভীইয়ারের লেখা কোন প্রবন্ধ যদি ছাপাতে পারো তাহলে ভাল হয়। কিংবা তার সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনার সংবাদ। অবশ্য গবর্নমেণ্টে ঢোকার পর থেকে লোকটা খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, তবে শ্রমিকদের মধ্যে অনেকের কাছেই ও এখনো খাঁটি লোক বলে পরিচিত। ভীইয়ার যদি আপোষ-রফার পক্ষে কিছু বলে, তাহলে ও নিজের চাকায় তেল দিচ্ছে বলে কেউ সন্দেহ করবে না। পাঁচজনে ওকে বলবে, 'আন্তর্জাতিকতাবাদী, যুদ্ধবিরোধী...এই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে বলতে পারি—এর বক্তব্যগুলো ঠিক, কিন্তু সে যাই হোক, আমি এই 'দাসত্ব' কথাটা বদলে দিতে চাই।
কেন যেন হঠাৎ দেসেরের মনে পড়ল, বনের পথে জিনেতের সেই বিষণ্ণ গলার নিষেধ, 'না, কোরো না।'
'আমি ও জায়গায় একটা সম্পূর্ণ আলাদা কথা বসাতে চাই: 'অবমাননা' কিংবা 'কষ্টবরণ।'
পরের দিন ভীইয়ারের সঙ্গে দেখা করল জোলিও। বেঁটে খাটো ভোঁতা লোকটা

এসেই খুলে বলে ফেলল তার আসার কারণটা। ক্লান্ত স্বরে ভীইয়ার উত্তর দিল, 'জানি। দেসের ইতিমধ্যে সব বলেছে আমাকে। কিছু মনে কোরো না, এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে। আমি জানতাম না যে হিটলারের আজ বেতার-বক্তৃতা দেবার কথা। এক্ষুনি শোনা যাবে ওর বক্তৃতাটা। হিটলার কি বলে তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'জার্মান জানেন আপনি?'

'জানি বৈকি। আন্তর্জাতিক কংগ্রেসগুলোয় পুরনো সব সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটদের বক্তৃতা শুনেছি আমি: বেবেল, লীব্‌ক্‌নেখ্‌ট্‌, কাউট্‌স্কি, সকলের। যুদ্ধের ঠিক আগে বাল-এ বেবেল একটা বক্তৃতা দিয়েছিল, মনে পড়ছে—দিনকাল ভাল ছিল তখন, এখনকার মত নয়! হ্যাঁ, এই পরিস্থিতিটা ভয়ানক জটিল, আমরা সমাজতন্ত্রীরা তখন বলেছিলাম—জার্মানীতে ভীইমার রিপাব্‌লিককে জিইয়ে রাখা দরকার, স্ট্রেসেমানের সঙ্গে চুক্তিতে আসাও অনায়াসসাধ্য। কিন্তু শোনেনি ওরা আমাদের কথা। আর, এই হচ্ছে তার ফল! কিন্তু যুদ্ধ হতে দিতে পারি না আমরা, হতে দেবও না কিছুতেই। গণতন্ত্র যুদ্ধ করবার জন্যে নয়—এতো স্বতঃসিদ্ধ। যুদ্ধ গণতন্ত্রকে হয় ধ্বংস করে, না হয় ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয়। ক্লেমসো তো আর একটু হলে পার্লামেন্টকে পকেটে পুরত। ইতালীতে কি হয়েছে দেখ; আর কেরেনস্কির পরিণামটা? যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে বিপ্লব অনিবার্য। সবাই তা বোঝে। আর, যুদ্ধে জিতলেই বা লাভটা কি? সমর-বিভাগের কোন কর্তাব্যক্তি হয়ত ক্ষমতা দখল করে বসবে। অবশ্য দু-একজন সৎলোক যে আমাদের জেনারেলদের মধ্যে নেই, তা নয়; যেমন ধরো বুড়ো পেতঁ্যা—ওরকম খাঁটি লোক দু-একজনই আছে। কিন্তু তেমনি আবার ভাগ্যান্বেষী, বেপরোয়া ক্ষমতাপ্রিয় লোকও আছে অজস্র। সামরিক কমিশনের একটা সভায় সেদিন ছিলাম—কে একটা কর্নেল স্থ-গল্‌কে দেখলাম, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভারী সুনিশ্চিত, আর অতি উঁচু আকাঙ্ক্ষা লোকটার। সে তো ঘোষণা করল: শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি আমরা, সরকারী ব্যয় বরাদ্দ নতুন করে সংশোধন করা দরকার, সামরিক বাহিনীতে আরও বেশী যান্ত্রিক উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ হেন দুর্দান্ত গোঁয়ার লোক তো সুযোগ পেলে এক মুহূর্তে ডিক্টেটর হয়ে বসবে। সাধারণত আমার মনে হয়—সামরিক লোকজনকে এ ব্যাপার থেকে দূরে রাখতে হবে। ওদের উপদেশ নিতে যাওয়াটা বোকামি।

আর, দালাদিএকে...' কথাটা শেষ না করেই ভীইয়ার ছুটে গেল রেডিওটার কাছে। একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরুল যন্ত্রটা থেকে।

'এইবার বক্তৃতা হবে হিটলারের। ভেবে দেখ, ঠিক এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীর লোক নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে রেডিওর সামনে।'

জোলিও কত রকম ভাষা জানে ভীইয়ার জিজ্ঞাসা করায় সে সগর্বে উত্তর দিল, 'ফরাসী আর মার্সাই অঞ্চলের ভাষা।' সত্যি কথা বলতে কি, জোলিও এক বর্ণও জার্মান বোঝে না। কিন্তু তবু সে কাটা-কাটা উচ্চারণে উচ্চকিত সেই বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে বসল। হিটলার তার বক্তৃতা আরম্ভ করল সংযতভাবে, কিন্তু খুব অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙা গলায় চিৎকার করে শাসাতে আরম্ভ করল। অবোধ্য সব কথা বেরিয়ে আসতে লাগল লাউড-স্পীকারটার ভেতর থেকে—অবোধ্য বলেই জোলিওর কানে কথাগুলো আরও ভয়ংকর শোনাল। বুড়ো নেকড়ে বাঘের মত খেঁকাতে থাকল হিটলার। অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল জোলিও; চেয়ারের পেছন দিকটা চেপে ধরল, দৈববাণীতে তার গভীর বিশ্বাস, কাঠ ছুঁয়ে থাকলে অমঙ্গল কেটে যায়—এ বিশ্বাসও তার আছে।

ভীইয়াব মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে থাকল, যেন অদৃশ্য সেই বক্তার কোন উক্তি সমর্থন করছে; মাঝে মাঝে ঘাড় ঝাঁকুনি দিল বিরক্তভাবে; তার থুতনি, নাক আর প্যাঁশনে চশমা ঈষৎ কাঁপতে থাকল। জোলিও আগাগোড়া সাগ্রহে লক্ষ্য করে গেল ভীইয়ারের মুখের ভাব—যদি তার থেকে অবোধ্য বক্তৃতার খানিকটাও বুঝতে পারে সেই চেষ্টায়। মাঝে মাঝে যে জনতার সামনে হিটলার বক্তৃতা দিচ্ছে, সেই জনতার 'জার্মানী জিন্দাবাদ' চিৎকার ধ্বনিতে ভরে উঠল ঘরটা—সঙ্গে সঙ্গে জোলিও চেয়ারের পেছনটা প্রাণপণে চেপে ধরল। ঝাড়া এক ঘণ্টা ধরে এরকম চলল; শেষে প্রচণ্ড একটা উল্লাসের চিৎকার শোনা গেল। রুমাল দিয়ে কপাল মুছল ভীইয়ার। জোলিও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হল?'

'ও, না বিশেষ কিছু না। এসব আগেই জানতাম। মোটের ওপর আমার এখনো আশা আছে। আল্‌সাসের ওপর হিটলারের আর কোন দাবীদাওয়া নেই একথাই সে বারবার বলল। আর এইটাই আমাদের পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা।'

'চেকদের সম্বন্ধে?'

'ওদের সম্বন্ধে কোন কথা শুনতে চায় না ও। কিন্তু যেহেতু পশ্চিম দিকে ওর কোন দাবী নেই বলে ঘোষণা করেছে, সেহেতু ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্পূর্ণ সম্ভব বলে আমি মনে করি। শেষ পর্যন্ত প্রাগের ভাগ্য আমাদের ওপর নির্ভর করছে। আপোষ রফার একটা ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা দরকার। আমি এক্ষুনি একটা বিবৃতি দিচ্ছি।'

ঘণ্টা বাজতেই, কোঁকড়া-চুল, পুরু পাউডারের প্রলেপ লাগানো একটি টাইপিস্ট মেয়ে ঢুকল ঘরে। ভীইয়ার বলে যেতে লাগল, মেয়েটা টাইপ করে গেল। ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে করতে, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে, ভীইয়ার যেন বক্তৃতা দিচ্ছে কোন অদৃশ্য জনতার সামনে; মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বলে নিজেকে কল্পনা করে নিল, আবেগে কেঁপে উঠল তার গলা :

'যুদ্ধ-রাক্ষসী যাদের রক্ত শুষে খেয়েছে, সেই তরুণদের স্মৃতির ব্যথায় লক্ষ লক্ষ মায়ের বুক এখনো ভারাক্রান্ত। ভের্দাকে আমরা ভুলে যাইনি! বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক হিসেবে হিটলার সেই ভয়ংকর সর্বনাশের বিভীষিকা বিস্মৃত হয়নি দেখে আমরা আনন্দিত। তাঁর প্রসারিত হস্ত আমরা—ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধি...'

নিজের হাতটা প্রসারিত করে ভীইয়ার ভাবল কিছুক্ষণ।

'প্রতিনিধির পরে দাঁড়ি বসাব?' জিজ্ঞাসা করল টাইপিস্ট মেয়েটা।

'না, কমা বসাও। আমরা, ফরাসী গণতন্ত্রের প্রতিনিধিরা, শান্তিপ্রিয় জাতির এই সন্তানরা, জোরের শিষ্যরা...'

তারপরে প্রবন্ধটা আগাগোড়া পড়ে দেখে সই করে দিল সে। জোলিও যখন বিদায় নিচ্ছে, তখন ভীইয়ার তাকে বলল, 'আটলান্টিক এজেন্সি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত—এই কথাটা শেষে বসিয়ে দিও—ওটা ওই মার্কিনদের জন্যে। পেটের দায়টাও তো দেখতে হয়, বুঝলে কিনা, ও ভাবনাটা থেকে রেহাই নেই কিছুতেই। আমি সাংবাদিকের পেশায় আবার ফিরে এসেছি, জানো? আমরা এখন সহযোগী।'

তারপরে একলা বসে ভীইয়ার বক্তৃতার কথাগুলি স্মরণ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; না, কথাগুলো নিশ্চয়ই বেবেলের নয়! মন্ত্রীত্ব-সংকটটা বসন্তকালে হয়ে ভালই হয়েছিল। নোংরা ব্যাপার যতসব! স্পেনের বেলায় যা হয়েছিল, তার চেয়েও খারাপ। অপরের অর্থে ফ্রান্সকে আত্মমোচনের মূল্য দিতে হবে। তাছাড়া, চেকদের পক্ষে আত্মসমর্পন করাই ভাল, নইলে ওরা অবিলম্বেই ধ্বংস

হয়ে যাবে। এরকম সময়ে সাংবাদিক হওয়া ঢের ভাল, ওকাজে দায়িত্ব কম। তাহলে, র‍্যাডিকালরা সমাজতন্ত্রীদের মন্ত্রীদল থেকে বের করে দিতে চায়।—তা দিতে চায় দিক, জঞ্জাল সাফ হয়ে যাক!

চেয়ারটায় বসে বসে ঢুলতে লাগল ভীইয়ার। হঠাৎ নারীকণ্ঠস্বরে ঘুম ভেঙে গেল: তার বড় মেয়ে লুই অপ্রত্যাশিতভাবে এসে পড়েছে পেরিগো থেকে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল লুই:

'কাল সন্ধ্যায় গাস্ত-র ডাক পড়েছে। বিমান-বিধ্বংসী বাহিনীতে ও আছে। কি হবে, বাবা?'

ভীইয়ার ঔদার্য ফুটিয়ে তুলল মুখে চোখে, অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছে সে। মেয়েদের কোন কিছু উপহার দেবার সময় যে ভাবে কথা বলত, সেইভাবে বলল:

'পরে বলব ওসব কথা। থাম, থাম, কাঁদিসনি। সব ঠিক হয়ে যাবে এখন। যুদ্ধ বাধতে দেব না আমরা, বুঝলি, কিছুতেই দেব না।'

অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে জোলিও বাড়ী ফিরল। দেসের যা করেছে তা নিশ্চয়ই জেনেশুনে করছে, কিন্তু সেই নীল আলো, আর হিটলারের বক্তৃতা...আর! ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করল সে। জোলিওর স্ত্রী হৈ চৈ বাধিয়ে দিল, তাড়াতাড়ি চটিজোড়া এনে দিয়ে ভেরভ্যাঁ-লতার রস তৈরী করতে বসল—সর্দির ওষুধ হিসেবে এই জিনিসটা জোলিওর ভারী প্রিয়।

'একটা প্রবন্ধ বাগিয়েছি ভীইয়ারের কাছ থেকে,' বলল সে, 'ঝাড়া তিনশো লাইন! একেবারে সামনের পাতায় ওর ছবিশুদ্ধ ছাপান হচ্ছে। খুশি হবে দেসের। কিন্তু ওদের যদি একবার দেখতে তুমি! সবাই বলছে আশার কথা, কিন্তু মুখগুলো দেখাচ্ছে ভিজে বেড়ালটির মত। দেসেরের বোধহয় কোন অসুখ-বিসুখ হয়েছে, অন্তত দেখে তো তাই মনে হল। ক্যান্সার হল না কি? তাহলে তো হয়েছে—কাগজটা উঠে যায় আর কি!'

রসটা তৈরী করে ঢেলে দিল তার স্ত্রী। তারপর মৃদুস্বরে শুধোল, 'যুদ্ধ বাধবে না কি?'

হেসে উঠল জোলিও, 'কিসের যুদ্ধ? ওরা প্রাণ ছেড়ে দেবে, দেখে নিও! হিটলারটা হরদম চেঁচাচ্ছে, আমি ওর সমস্ত বক্তৃতাটা শুনেছি—লোকটা একেবারে বদ্ধ পাগল। একদম উন্মাদ লোক। কাগজের মত শাদা হয়ে গিয়েছিল ভীইয়ারের মুখ ওর বক্তৃতা শুনতে শুনতে। আমার কি ভয় হচ্ছে জানো?—

ওরা হয়ত মার্সাইও ছেড়ে দেবে! তা যদি হয়, তাহলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবার মত কোন জায়গা থাকবে না। মরুক গে যাক!'

১১

আঁদ্রে সারাদিন ধরে পারীর উত্তেজিত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে আর উৎকণ্ঠ কথাবার্তার টুকরো তার কানে ঢুকেছে: 'হবে নাকি?...হবে না তাহলে?...' সন্ধ্যার দিকে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল রু শেরস্-মিদিতে। কিন্তু সেখানেও শান্তি নেই। মুচিটা চেঁচাচ্ছে, 'এখুনি না সামলালে ওরা এখানে পর্যন্ত এসে যাবে, পেটের জ্বালায় পাগল ওই ইঁদুরগুলো!' পুরনো মালের দোকানদার বুড়ো বোয়ালোর পাকা-চুল, কাঁচুলি-আঁটা বউটা অভিযোগ করছে, 'না! ফ্রান্সের এতে কি করবার আছে তাই বলো? কোন জ্যান্ত চেক্‌কে কোনদিন চোখেও দেখেছ কি?' 'তামাক-খোর কুকুর' কাফেটায় বসে একজন খদ্দের প্রমাণ করতে চাচ্ছে যে জার্মানদের আরও জায়গার দরকার: 'যেমন ধরো, রবিবারের দিনে এই কাফেগুলো। প্রায়ই ওরা অনেক বেশী জায়গা জুড়ে টেবিল পাতে। তাই করাটাই তো স্বাভাবিক।' ভ্রূকুটি করল কাফেওলা: 'কিন্তু সে জন্যে ওদের জরিমানা হয়।' একজন মিস্ত্রী চেঁচিয়ে উঠল, 'জার্মানদের আরও জায়গার দরকার? তাহলে আমার বেলায় কি? কেমন ধারা ফরাসী তুমি? শয়তান, ফ্যাশিস্ট!' ঘুষোঘুষি হয়ে গেল তাদের মধ্যে।

বুড়ো বোয়ালোর দোকানের জানলায় সাজানো জিনিসগুলোর দিকে তাকাল আঁদ্রে। জিনিসগুলো দেখতে দেখতে খুশি হয়ে উঠল তার মন। বিচিত্র সব জিনিসের অদ্ভুত এক সমাবেশ! একটি উলঙ্গ নিগ্রো দেবতার মূর্তি—অত্যন্ত মহিমাময় এবং নির্লজ্জ ভঙ্গীতে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বের দিকে, মৃদু আলোয় জ্বলছে ডেল্‌ফ্‌ট্-এ তৈরী মাটির বাসনগুলো; জমে যাওয়া নদীর জলের মত নীল আর শাদা—ওগুলো রুয়োর জিনিস; কঁ্যাপার থেকে আনা পাখী আর সৈনিকদের ছোট ছোট মূর্তিগুলোর গোলাপী উষ্ণ রঙ; হাতীর দাঁতের চীনে বোতাম; ছুঁচলো ছিপি বসানো নস্যদানগুলোর গায়ে খোদাই করা চিরন্তন নীতিবাক্য 'সাম্য অথবা মৃত্যু।' গালা-পাথরের ভারী কণ্ঠহার, গোমেদ বসানো কঙ্কন, পারসীক নীলমণি। জরিদার কাপড়ের পাড়, চুম্‌কী বসানো ওড়না, ভেনিসের রেশমী ফিতে, নীল কাঁচ। ইংলণ্ডে ছাপা ঘোড়-দৌড়ের ছবি—সবুর

রঙের কোর্তা-পরা সওয়ার আর লাজুক ফ্যাকাশে ঘোড়া। একটা হুঁকো—অ্যালকেমিস্টের পাত্রের মতই রহস্যময় আর জটিল, পরী, পুরনো মুদ্রা, চুলের গোছা, মোমের তৈরী গোলাপ ফুল। সব মিলিয়ে কত পরিশ্রম রয়েছে এই জিনিসগুলোর পেছনে।

এই পুরনো জিনিসের দোকানটার পাশেই একটা দুধের দোকান। মুগ্ধ দৃষ্টিতে আঁদ্রে তাকিয়ে রইল ছানা-মাখন-পনীরের দিকে—যেন মহাশিল্পীদের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাল রঙের তাল পাকানো ডাচ মাখন; একটা সুইস্ ছানার স্তূপ থেকে জল চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে; শুকনো মোমের মত জমাট দুধ; ক্ষীরের রঙটা যেন শ্বেত পাথরের লাল নীল রঙের ছিটেফোঁটা সোনালী ঘি গলে গলে পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়; সবুজ পাতায় মোড়া ছাগলের দুধের মাখন, বিচিত্র রঙে আর আকারে সাজানো নানা জিনিস।

তার ওপাশে একটা মদের গুদোম। বোর্দোর মদ-ভরা লম্বা-গলা সুষ্ঠু আকারের বোতলগুলো পারিবারিক আবহাওয়ায় মানায় ভাল—সেনেটরদের আর জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকদের ভারী প্রিয়; বারগ্যাণ্ডি মদের পেট-মোটা খাটো বোতলগুলো দেখে খুড়ীমার আকৃতির কথা মনে পড়ে—প্রবীণদের জন্যে ওই পানীয়; কিন্তু প্রণয়ী-যুগলের প্রিয় ওই 'ভ্যাঁ-দালসাস্' মদের বোতলগুলোর নীল রঙ আর ঋজু গড়নের চেহারাটা ভারী রোমান্টিক। বোতলগুলোর লেবেলের গায়ে বিভিন্ন গ্রামের নাম লেখা: শাঁবের্‌ত্যাঁ শাব্‌লি, বারসাক, বোন্, ভুভ্‌রে, শ্যাতোনফ্-দ্যু-পাপ—গোটা পৃথিবী জুড়ে এইসব গ্রামের খ্যাতি। কনিয়াক মদের একটা বোতলের গায়ে এত পুরু হয়ে ধুলো জমেছে যে ওটা অনায়াসে ওই পুরনো জিনিসের দোকানে স্থান নিতে পারত। আঁদ্রে ভাবল, 'আমার চেয়ে ওই মদের বয়স ঢের বেশী।'

তার পরের দোকানের জানলাটা আঁদ্রের ভারী প্রিয়, তামাক-খাওয়ার পাইপ্‌গুলো সে প্রায়ই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে: পর পর সাজানো আছে লম্বা পাইপ আর নাক-গরম করা বেঁটে পাইপ, সিধে পাইপ আর পাহাড়ী ভেড়ার শিঙের মত বাঁকা-চোরা পাইপ, ফোতো-বাবুদের জন্যে ক্ষুদে পাইপ, নাবিকদের জন্যে মোটাসোটা ভারী পাইপ—কালো, বাদামী, হালকা লাল রঙের পাইপ। দোকানদারটা একদিন আঁদ্রেকে বুঝিয়েছিল কি ভাবে হিদার গাছের শেকড় থেকে এই সব পাইপ তৈরী হয়; মাটির নীচে এই শেকড়গুলোর অন্তত পঞ্চাশ বছর কাটা চাই—তা নইলে

তামাকের স্বাদটা ভাল পাওয়া যায় না; এই মৃত শেকড়গুলো সম্বন্ধে আঁদ্রের এখন আর একবার গল্প করবার ইচ্ছে হল, কিন্তু তামাকওলাটা তাকে দেখবামাত্র আবেগ-উত্তেজিত কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'আ—আ—আপনার কি মত? যুদ্ধ হবে বলে আপনি মনে করেন?' ফিরে এল আঁদ্রে নিজের স্টুডিয়োয়। পিয়ের ঢুকল তার পরেই। তাড়াতাড়ি করে সবটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টায় বিব্রত হয়ে উঠল সে; সন্ধ্যার সময় কারখানায় একটা সভা আছে, মজুররা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে ভয়ানক রকম। এই ক-বছরে পিয়ের খানিকটা বুড়িয়ে গেছে বটে, তবু দক্ষিণ অঞ্চলের লোকের মানসিক উদগ্রতাটুকু বজায় আছে তার। ঘটনার গুরুত্বটা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছে, বক্তব্যটা অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে তার। কথা বলতে বলতে সমস্তক্ষণ রেডিওটা একবার খুলে দিচ্ছে, পরক্ষণেই বন্ধ করে দিচ্ছে: 'সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে!' চিৎকার করে বলল পিয়ের—'এখন সরে দাঁড়াতে পারে না ওরা, গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে—তবু কিনা ভয় ঘুচছে না ওদের!...ভীইয়ারের প্রবন্ধটা পড়েছ? কী লজ্জাকর সব কথা! কিন্তু শ্রমিক শ্রেণী...'

আঁদ্রে বাধা দিল তার কথায়: 'কল্পনাবিলাসী! কিন্তু মোটের ওপর কিছুই বুঝতে পারছি না আমি—আমার স্বভাবই এই রকম। তোমার কি মনে হয়? যুদ্ধ চাও তুমি? জঘন্য ব্যাপার এই যুদ্ধ। ভার্সাই চিত্রশালার ছবিগুলিতে কেবল জেনারেল, পতাকা আর মেঘই দেখা যায়, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কাদা আর উকুন। সত্যি বলছি, কি করে যে আমার জীবনটা কাটবে আমি নিজেই তা জানি না। তুমি আছ বেশ; প্রথমত, তোমার—' আঁদ্রে তার মস্ত বড় গিঁঠে বুড়ো আঙুলটা বেঁকিয়ে ধরল—'আনে আছে। দ্বিতীয়ত, একটি ছেলে আছে তোমার। তৃতীয়ত, তোমার আছে, যাকে বলে, আদর্শবাদ। কিন্তু আমার কিছুই নেই, স্রেফ কিছুই নেই!'

'কিন্তু তোমার আর্ট আছে।'

'আর্ট? ও সব কথার কথা, পিয়ের। আবহাওয়াটাই আর্টের উপযুক্ত নয়। কাল বাবার কাছ থেকে এক চিঠি পেলাম, যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। আপেলের জন্যেই তার এই জিজ্ঞাসা। হ্যাঁ, আমিও জানতে চাই; আমার ছবির জন্যেই আমার জিজ্ঞাসা। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার মত লোক আমার কেউ নেই। এখন বিপদটা কেটে গেলেও দু-এক বছরের মধ্যেই আবার ঘনিয়ে আসবে। আর, তুমি কিনা বলছ আর্ট নিয়েই জীবন কাটাতে!

জীবনের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে সর্বত্র, আবার গতিশীল হয়ে উঠতে বেশ কিছুটা সময় নেবে। একটা আশ্চর্য পাইপ দেখেছি আজ, কাঠের আঁশগুলো সব উঠেছে ওপরের দিকে; কি দিয়ে তৈরী জানো? হিদারগাছের মরা শেকড় থেকে, বুঝেছো? কিন্তু শেকড়টা মাটির নীচে ছিল একশো বছর ধরে। আর এখানে কি দেখছি—ধর্মঘট, মিছিল, হিটলারের খেঁকানি, কোথাকার কতকগুলো সুদেতেন—আর তুমি কিনা চাও আমি বসে বসে মহৎ শিল্প রচনা করি! যত বুজরুকি!'

এবারে পিয়েরের বদলে আঁদ্রেই রেডিওটার কাছে ছুটে গেল। পিয়ের ওকে থামিয়ে বলল, 'এখনো সময় হয়নি, আপাতত আধ ঘণ্টার মত খবর বলা হবে না।'

চেম্বারলেনের বিমানযাত্রায় রোম বা ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সে যে উদাসীন ছিল, একথা আঁদ্রে স্বীকার করতে পারল না—এই রকমই একটা কিছু হবে বলে আশা করেছিল সে। এই দীর্ঘ দুর্যোগময় দুটি বছর ধরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সে একাগ্র মনে জিনেতের কথা নিয়মিত শুনে এসেছে; জিনেতের সঙ্গে আর তার দেখা হয়নি, তার দুঃখের কথা আঁদ্রে কিছুই জানে না, কিন্তু তবু তার কাছে জিনেৎ যেন সেই একই জিনেৎ আছে।—হ্যাঁ, এই উন্মাদ জগতে একমাত্র জিনেৎই খালি আঁদ্রের চোখে বদলায়নি। আঁদ্রে বলল, 'খবরটা শোনার সুযোগ হারাতে চাই না আমি, প্রথমে বিজ্ঞাপন ঘোষণা করে বটে, কিন্তু বেশীক্ষণের জন্যে নয়।'

রেডিওটা কিন্তু নির্বাক রইল। জিনেতের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল না। আঁদ্রের কাছে এটা ভয়ানক একটা দুর্লক্ষণ বলে মনে হল। 'কোন বোঝাপড়া ওদের মধ্যে হয়নি এখনো'—বলল সে।

'আমার ভয় হচ্ছে, দালাদিএ শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে দাঁড়াবে।'

ওদের দুজনের ভাবনা দু রকম, দু জনের ভয় দু রকম। জিনেতের গভীর গলার স্বর কিংবা সাধারণ সংবাদ-ঘোষণার বদলে, সময়-সংকেতের ঘড়ির টিক্‌টিক্ আওয়াজটা শোনাল কর্কশ আর নির্মম। হঠাৎ অত্যন্ত নির্লিপ্ত একটা কণ্ঠস্বরে ঘোষণা হল:

'সামরিক কাজের উপযুক্ত যে সব ব্যক্তির নাম 'অ' আর 'আ' দিয়ে আরম্ভ...'

খুশি হয়ে উঠল আঁদ্রে; একটা বোঝা নেমে গেল তার ঘাড় থেকে। এখন থেকে তার ভাবনা ভাববে অন্য লোকে।

বলল, 'তা বেশ হল এটা। তার মানে, যুদ্ধে নামছি আমরা
পিয়েরের কোন যুক্তি, সিদ্ধান্ত বা স্বীকৃতিতে কান দিল না সে। পুরনো পরিচি
রাস্তাটা রয়েছে ঠিক আগেরই মত—উলটো দিকের বাড়ীর বারান্দায় এক
ফুলে ভরা পাত্র, উজ্জ্বল আকাশে বিবর্ণ মুমূর্ষু চাঁদ। আঁদ্রের মনে হল, এ
কয়েকটা বছর তার কেটেছে যেন যন্ত্রণাদায়ক বিরতির মত—লাল ঝাণ্ডা
শোভিত সেই জুন মাসের দিন, পথে পথে টহল দিয়ে কাটানো সেই রাত থেকে
শুরু করে আজকের এই সময়-সংকেতের টিক্ টিক্ আওয়াজ, জানলার নীচে
পথ-চলতি লোকের পায়ের শব্দ, আর এক্ষুনি এই সামরিক কাজে যোগদানের
ঘোষণা পর্যন্ত। কোন কিছু জানতে, ভাবতে অথবা স্মরণ করতে ইচ্ছে হল না
তার, মুহূর্তের জন্যে একটা বেদনা অনুভব করল সে ঃ জিনেতের কি হল ?...
কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাটাও নিরর্থক ; সব কিছুই যেন পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে, তলিয়ে
যাচ্ছে, অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পিয়েরের সঙ্গে বাইরে এল আঁদ্রে। সদর দরজাটার
কাছে বসে কাঁদছে একটা মেয়ে। রিজার্ভ-ফৌজের কয়েকজন লোক হাতে
পেঁটরা ঝুলিয়ে 'লা-মার্সাই' আর 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে চলে গেল।
উষ্ণ গ্রীষ্ম-রাত্রি। 'প্রেমিকদের স্বর্গোদ্যান,' ভাবল আঁদ্রে আর জুলাই-
রাত্রির আলোকোজ্জ্বল এই প্লাস কঁত্র্-এসকার্প্‌টা চেয়ে চেয়ে দেখল আর
একবার...

পিয়ের বলল, 'আমাকে সুড়ঙ্গ-ট্রেনটা ধরতে হবে। দেরী হয়ে গেল বোধহয়।
আচ্ছা, আঁদ্রে আসি তাহলে। আবার দেখা হবে।'

পিয়ের কিন্তু একথা বলেই চলে গেল না। এই 'আবার দেখা হবে' কথাটায়
দুজনের মনই পীড়িত হয়ে উঠল। সন্তানের পিতা এই পিয়েরকে যেন ভুলে
গেল আঁদ্রে ; ভুলে গেল ইঞ্জিনীয়ার পিয়েরকে—দেসের, সমাজতন্ত্রী-দল, কিংবা
যুদ্ধ সম্বন্ধে অনর্গল কথা বলে যে পিয়ের। আঁদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার
ইস্কুলের সহপাঠী ; দুষ্টু, কল্পনাপ্রবণ বারো বছরের পিয়ের, যে একদিন
গ্রীনল্যাণ্ডে বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করেছিল তার কাছে।

আঁদ্রে বলল, 'তোমার সেই গ্রীনল্যাণ্ডে বেড়াতে যেতে চাওয়ার কথা মনে পড়ে ?
তিমি-শিকার! কী মজার ছিল দিনগুলো! তোমারও বোধহয় ডাক পড়বে
ফৌজে যোগ দেবার জন্যে। পোকা-মাকড়ের মত মারা পড়ব আমরা—কোন
সন্দেহ নেই এতে। ঠিক ভের্দ্যাঁর মত দাঁড়াবে ব্যাপারটা, তবে এবারকার যুদ্ধে
আকাশ থেকেও মৃত্যু নামবে। কিন্তু কিছু যায় আসে না তাতে। এখন

আমরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন—এটা ভাল কথা। ওভাবে তো আর চলত না, ঠাটটা চুকে গেছে এবার। একটা কবিতা আছে, কার লেখা ভুলে যাচ্ছি: প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী...। কিন্তু সব চেয়ে মজার ব্যাপারটা কি জানো? অনেকদিন আগেকার কথা; আমাদের ওই কাফেটায় আমার পাশে বসেছিল এক জার্মান। নীল-চোখ আর ঘাড়-ছাঁটা দেখেই বোঝা যায় লোকটা দস্তুরমত জার্মান; আমি ভেবেছিলাম আশ্রয়প্রার্থী বুঝি, কিন্তু শেষে বোঝা গেল মনে-প্রাণে খাঁটি জার্মান ও। মাছ সম্বন্ধে ওর আগ্রহ আছে; আমার আঁকা দৃশ্যচিত্রগুলো ভাল লেগেছিল ওর। লোকটা মাতলামির ঝোঁকে বলেছিল যে যুদ্ধ একটা হবেই আর পারীকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে যাবে জার্মানরা। ভারী মজার লোক! আমার মজা লাগছে এই ভেবে যে, ওরও বোধহয় ফৌজে যোগ দেবার ডাক পড়েছে। তার মানে, ও লড়াই করবে আমার বিরুদ্ধে? বুজরুকি ছাড়া আর কি, বলো? কিন্তু তবু আমি খুশি হয়েছি, পিয়ের; অনিশ্চয়তার মধ্যে আর থাকতে হবে না। যুদ্ধ যদি হয় তো যুদ্ধই হোক।'

পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল ওরা।

১২

ব্রতৈল যেন দাঁড়াতেও পারছে না আর। পর পর রাত্রি জাগার ফলে লাল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটো; খাড়া আছে কেবল তার ইস্পাতের মত শক্ত শরীর আর ইচ্ছাশক্তির জোরে। যে কোন উপায়ে হোক একটা আপোষ-রফা করা চাই; জার্মানীর সঙ্গে চুক্তিতে আসা সম্ভব। মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের চুক্তিপত্রটা ছিঁড়ে ফেলাই আসল কাজ। কিন্তু অতি দ্রুত ক্রমপর্যায়ে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে; হিটলার অপেক্ষা করবে না; দিশেহারা ইউরোপের ওপর দিয়ে 'শান্তির স্বর্গদূত' বৃথাই আকাশ-যাত্রা করে গেছেন; ফ্রান্সে যারা এখনো পপুলার ফ্রণ্টকে শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে তারা প্রতিরোধের জন্যে জোর করছে। ব্রতৈল প্রবন্ধ লিখছে, পুস্তিকা প্রচার করছে, আলোচনা করছে কূটনীতিকদের সঙ্গে, নির্দেশ দিচ্ছে 'মন্ত্রশিষ্য'দের; আর জেনারেল পিকারের মারফৎ সমর-বিভাগের অফিসারদের পরিচালনা করছে।

নিষ্প্রদীপ হয়ে গেছে পারী। অন্ধকারের আড়ালে ব্রতৈলের লোকরা প্ররোচিত আর উত্তেজিত করে বেড়াচ্ছে জনসাধারণকে: 'চেকরা নিজেরাই এর জন্যে দায়ী। শুধু ধনী ইহুদীরাই যুদ্ধ চায়।'

'মাদেল যুদ্ধের পক্ষে—ওর আসল নাম রথ্‌স্‌চাইল্ড্‌। বেনেস টাকা খাইয়েছে ওকে, আর আমাদের সন্তানদেরই কেবল পাঠানো হচ্ছে কসাইখানায়!'

'এক লাখ উড়োজাহাজ আছে জার্মানদের। একদিনেই পারীকে ওরা গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে···'

কর্মমুখর হয়ে উঠেছে গার দ্য লেস্ত্‌; রিজার্ভ-ফৌজ ভর্তি ট্রেনগুলো কয়েক মিনিট অন্তর ছাড়ছে; ওদের মধ্যে কেউ কেউ বজ্রমুষ্টি তুলছে, গান গাইছে আর বলছে, 'জার্মানদের দেখিয়ে দিতে হবে হামাগুড়ি-দেওয়া শিশু নই আমরা।' অন্য কেউ অপ্রসন্নভাবে বলছে, 'কেনই বা হামাগুড়ি দিতে যাব আমরা?' মেয়েরা কাঁদছে। অবাধ সুযোগ পেয়েছে ফ্যাশিস্টরা; ওরা বলে বেড়াচ্ছে, সামরিক ব্যবস্থা জারী করাটা বে-আইনী হয়েছে, চেকরা নিজেরাই চুক্তিভঙ্গ করেছে, এবং ফরাসীদের উচিত ছিল ওদের চুলোয় যেতে দেওয়া।

স্পেন-যুদ্ধের গোড়ায় যে রকম হয়েছিল, ঠিক তেমনি এবারও ফ্রান্স দু ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। সাঁজ-এলিজে অঞ্চলে 'যুদ্ধ-বিরোধী আদর্শ'টাই জয়লাভ করেছে; যুদ্ধের বিভীষিকার নামে অভিশাপ দিচ্ছে সবাই আর আবেদন জানাচ্ছে মানবিকতার মনোভাবের কাছে—এমন কি, 'ভ্রাতৃত্ব-বোধ'-এর কাছেও। নিজেদের সাম্প্রতিক উক্তিগুলো সহজেই ভুলে গেছে তারা, এমন কি, নিজেদের জীবনযাত্রার ধরন, শ্রেণী-ঐতিহ্য আর জাতি-তত্ত্বের রূপকথাও ভুলে বসেছে। ফ্যাশিস্টরা যাদের বলে 'কুড়ের দল', সেই শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের অন্ধ বিদ্বেষটাই সব চেয়ে তীব্র। ঔপনিবেশিক সামরিক বিভাগের ক্ষমতামত্ত যথেচ্ছাচারী কর্তারা—যাঁরা রিফ্‌-অভিযানে অংশ নিয়েছেন কিংবা সামান্যতম অপরাধের জন্যে সৈন্যদের গুলি করে মেরেছেন, তাঁরা এখন বলছেন, রক্তপাতটা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়। এই সেদিনও যে সব পণ্ডিত অধ্যাপকরা 'ফ্রান্সের দুর্ভেদ্যতা'র কথা সগৌরবে ঘোষণা করেছেন আর মার্শাল ফশ্‌-এর উদ্ধৃতি আউড়েছেন, আজ তাঁদের মুখে শোনা যাচ্ছে, যুদ্ধে যোগদান করা অসম্ভব: জার্মানদের একটি আঘাতেই ম্যাজিনো লাইন তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়বে। আর, লোরেন্‌-নিবাসী ব্রতৈল—যে একদিন ফরাসী সৈন্যের মেৎস্‌-প্রবেশের মুহূর্তটিকে তার জীবনের চরমতম সুখের ক্ষণ বলে ঘোষণা করেছিল—সে

এখন বলছে, 'বলশেভিকদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে রক্ষা করার দায়িত্বের তুলনায় সীমান্তের প্রশ্নটা নিতান্ত গৌণ।'

ধনী-অঞ্চলগুলো ক্রমশ দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে; স্নানাগারগুলো প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার মত অবস্থা; কাগজের খবরে সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটির আরাম উপভোগ মুলতুবী রেখেই সবাই ফিরে এসেছে রাজধানীতে। কিন্তু যেই সামরিক ব্যবস্থা জারী আর নিষ্প্রদীপ চালু হল অমনি বুর্জোয়ারা সব পারী ছাড়তে আরম্ভ করল আর পরিবারের লোককে পাঠিয়ে দিল সুদূর গ্রামাঞ্চলে। ফলে, বছরের এই অন্য একটা সময়ে সমুদ্র ও পর্বতের ধারে ধারে গ্রামগুলো অপ্রত্যাশিতভাবে আবার সচকিত হয়ে উঠল। ইতিমধ্যেই গাছের পাতা-ঝরা শুরু হয়ে গেছে; হৈমন্তিক ঝড় বইতে শুরু করেছে ইংলিশ-চ্যানেলের বুকের ওপর দিয়ে। ছুটি উপভোগ-কারীর দল শীতে জড়োসড়ো হয়ে বসে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে গজ্‌গজ্‌ করে বলল, 'যাই বলো, এই হতভাগা চেক্‌দের দমন করার সময় এসেছে!'—সুদেত্তেনদের কথা আজকাল আর কেউ ভাবে না।

শহরতলীর শ্রমিক-অঞ্চলে কিন্তু কথাবার্তা অন্য ধরনের। সেখানকার কেউই যুদ্ধের সম্ভাবনায় খুশি হয়ে ওঠেনি; তবু তারা নিঃশব্দে এগিয়ে এসেছে দেশকে রক্ষা করার জন্যে। তারা বুঝছে যে ফ্রান্স কোণঠাসা হয়ে গেছে, আর নিজেদের বুঝিয়েছে, এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব। 'আক্রমণকারী' কথাটা সবাই বোঝে, দৈনন্দিন কথাবার্তার অংশ হয়ে উঠেছে ওই শব্দটা; রিজার্ভ-ফৌজের লোকেরা প্রায়ই 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে গাইতে যায়। ভবিষ্যতের দিকে ওরা আশা নিয়ে তাকায়: ফ্যাশিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আর তাদের ফরাসী বন্ধু ব্রতৈল-দোরিওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে চলেছে তারা। মাঝে মাঝে মনে হয়, ১৯৩৬-এর জুন মাস যেন ফিরে আসছে। বিলাঁকুর্-এ চেম্বারলেনের প্রশংসা করতে গিয়ে অব্রি মার খেয়ে এসেছে। পুলিশ যখন তাকে তুলে নিয়ে যায়; তখন রাস্তার ছোঁড়ারা চিৎকার করে ওঠে, 'লড়াই শুরু হয়ে গেছে!'

'জাতীয় মনোভাবাপন্ন ডেপুটিদের' এক সভায় ব্রতৈল বলল, 'কোন যুদ্ধ হবে না, হলেও চলবে না। চেকরা চুক্তি করেছে মস্কোর সঙ্গে—অর্থাৎ, আমাদের কমিউনিজ্‌মের পক্ষে লড়াই করবার জন্যে বলা হচ্ছে। একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। সব দিক ঠিকমত বিবেচনা করে দেখা যাক: বলশেভিকবাদ সিঁদ কেটে ঢুকেছে আমাদের দেশে; স্পেনে এখনো জাতীয়-যুদ্ধ চলছে;

ইংলণ্ড তো তার নিজের দ্বীপে এই সব বিষাক্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত ; ইংরেজরা ভণ্ডামী করতে পারে, চাল দিতে পারে, উদারনৈতিক আদর্শ নিয়ে গদগদ হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু আসলে ইউরোপকে কমিউনিজমের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে পারে কে ? একমাত্র হিটলার। তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের মিত্রপক্ষই আমাদের আসল শত্রু. আর শত্রুপক্ষই আমাদের আসল বন্ধু।'

এই প্রথম ব্রতৈল দুকানের সামনে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতে সাহস করল। খুব একটা বাদ-প্রতিবাদ আর দেশভক্তিমূলক বক্তৃতা শুরু হবে বলে সে আশা করেছিল। দুকানের সাম্প্রতিক মনোভাবটা তার জানা নেই, সেপ্টেম্বর মাসের সেই আতঙ্ক-রটনার পরে আর দুকানের সঙ্গে তার দেখা হয়নি, আর সেও এড়িয়ে গেছে দুকানকে। ব্রতৈলের বক্তৃতা শুনে প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল দুকান—গোঁয়ার আর মন্থর স্বভাবের লোক হলেও সে মোটেই নির্বোধ নয়, এখন যেন সচেতন হয়ে উঠল সে। দক্ষিণপন্থীরা 'মহান ফ্রান্স'-এর পক্ষে—এই বিশ্বাসের বলেই দুকান তাদের দলে আসে ; আর এখন কিনা তারাই—ব্রতৈলের আর তার নিজের ভূতপূর্ব বন্ধুরাই—সামরিক উদ্যোগ-আয়োজন বানচাল করে দিচ্ছে, দলত্যাগ আর বিশ্বাসঘাতকতার কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। আর ফ্রান্সকে সত্যিই রক্ষা করতে চায় কারা ? শ্রমিকরা, কমিউনিস্টরা ! বড় ভয়ানক কথা। দুকানের পক্ষে এটা মস্ত একটা আঘাত ; সত্যি কথাটা উপলব্ধি করতে তার বহুদিন লেগেছে। হাজার হাজার লোক যে শ্রেণীগত আত্মকেন্দ্রিকতায় অন্ধ, ব্রতৈল তার বিরুদ্ধে—এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছে এতদিন। কিছুদিন থেকেই সে ব্রতৈলের সঙ্গে একবার আলোচনা করবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ব্রতৈলকে ধরতে পারছে না কিছুতেই। ইদানীং তার মন অবিশ্বাসে ভরে উঠেছে। দুকানের যদি বয়স কম হত তাহলে কোন সামরিক কাজে ঢুকে হয়ত স্বস্তি পেত সে ; কিন্তু ছাপ্পান্ন বছর বয়সে আকাশ-যুদ্ধের কথা ভাবা কঠিন। পরাজয়বাদীদের প্রচারের বিরুদ্ধে সে যথাসাধ্য করেছে। ওরা এড়িয়ে চলে দুকানকে ; কখনো বা ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে অনুকম্পার সঙ্গে বলে, 'স্বপ্ন-বিলাসী' ; কিংবা চটে উঠে এক ধমকে থামিয়ে দেয়, 'মস্কোর নির্দেশ ওসব।' যে সব কথায় তার মন ঘৃণায় ভরে ওঠে, ঠিক সেই কথাগুলোই সে আজ শুনল ব্রতৈলের এই বক্তৃতায়। দুকানের ইচ্ছে হল, তার এই ভূতপূর্ব শিক্ষক আর ফ্রান্সের শত্রুদের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে দেয়, কিন্তু ভীষণ উত্তেজনায় কথা আটকে গেল তার ; উচ্চারণের ত্রুটি এতোই বেড়ে গেল

যে, জিভ আড়ষ্ট হয়ে গিয়ে একটা যন্ত্রণার গোঙানি বেরুতে থাকল তার গলা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত একটা অস্বাভাবিক স্বরে চিৎকার করে উঠল দুকান :

'তাহলে এইটাই তোমার আসল মূর্তি! হিটলারের গুণগান করে বেড়াও! তুমি যুদ্ধে আহত হয়েছিলে—কিন্তু ওই সম্মানের চিহ্নটার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তুমি!'

চোখে জল এস গেল দুকানের; ছোঁ মেরে তুলে নিল টেবিলের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রগুলো; দ্রুত পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ডেপুটিরা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'লোকটা পাগল!' কেউ কেউ বলল, দুকান সম্বন্ধে অত কড়াকড়ি বিচার করলে চলবে না: গত যুদ্ধে আহত হবার ফলে ওর খুলি ফুটো করে অস্ত্রোপচার করা হয়েছিল; এই ব্যাপারটা বোধ হয় ওর মনকেও খানিকটা প্রভাবান্বিত করেছে। গ্রঁদেল শুধু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল, 'পাগলামির ভান করলেও হালচালে ও দিব্যি সেয়ানা। কাল ক্লুজের সঙ্গে ওকে দেখলাম। দেশপ্রেমের জন্যে ততখানি নয় যতখানি মস্কোর মাখন-রুটির জন্যে...'

ব্রতৈলের অভিমত—ও নিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়, দুকানের ব্যাপারটা আরও শান্ত সময়ের অপেক্ষায় মুলতুবী রেখে আপাতত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে মন দেওয়া দরকার—যে কোন মুহূর্তে অবস্থা চরমে উঠতে পারে।

'মুসোলিনীর ওপর আমাদের ভরসা রাখতে হবে। হিটলারের সঙ্গে আমাদের মিটমাট ঘটিয়ে দেবে সে। চেম্বারলেনেরও যথেষ্ট আগ্রহ আছে এ ব্যাপারে। আমরা যে চতুঃশক্তি-চুক্তির স্বপ্ন এতকাল দেখে এসেছি, তার প্রয়োজনীয়তা র‍্যাডিকালদের উপলব্ধি করানো চাই-ই।'

সভায় একটা প্রস্তাব গৃহীত হল: 'জাতীয় মনোভাবাপন্ন ডেপুটিদের এই সভা আশা করে যে শান্তিরক্ষার জন্যে গভর্নমেণ্ট যথাসাধ্য করবেন এবং কোন দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকবেন।'

ডেপুটিরা সবাই চলে যাবার পর গ্রঁদেল ব্রতৈলের কাছে গিয়ে বন্ধুত্ব দেখিয়ে বলল, 'আশ্চর্য রকম সংযত ছিলেন আপনি! আমি হলে তো রীতিমত চটে উঠতাম। আপনার ওই ক্ষতচিহ্নটার কথা...কী হীন বদমায়েশী!'

ব্রতৈল একবার চারদিকে দেখে নিল, ঘরে আর কেউ নেই। তারপর নীচু স্বরে বলল, 'আমায় লোকে বোকা বলে ভাবুক এ আমি চাই না। দুকানটা

একটা নির্বোধ, মানসিক ব্যাধিতেও ভুগছে। কিন্তু আপনার আমার মধ্যে বলেই বলছি কথাটা: আপনার দেশপ্রেমের আসল প্রেরণাটা জানতে পেরেছি আমি। আশা করি, আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন?'

ঘাবড়ে গিয়ে চোখ পিট্‌পিট্ করতে লাগল গ্রঁদেল। 'কই না, পারছি না তো।'

'তাহলে আরও খুলে বলি কথাটা। আমি জানি, জনৈক কিলমান—'

'আবার সেই জালিয়াতি!'

'মাফ করবেন; আপনি যে ওর সঙ্গে সত্যিই দেখা করেছিলেন, তার প্রমাণ পেয়েছি আমি।'

কাগজের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল গ্রঁদেলের মুখ: ব্রতৈল যদি তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহলে তার আর কোন ভরসা নেই। চুপ করে রইলে সে।

'তবু ভাল যে আপনি প্রতিবাদ করলেন না,' বলল ব্রতৈল, 'কাউকে আমি বলিনি কথাটা, আর বলতেও চাই না। তবে আপনি যে আমাকে হাবাগোবা লোক বলে ধরে নেবেন—তা হবে না। আপনার বার্লিনের প্রভুদের ধারণা যে ওরা আমাকে নিজেদের কাজে ব্যবহার করে নিচ্ছে। ওরা যা ভাবে ভাবুক। ব্যক্তিগতভাবে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমিই ওদের নিজের কাজে ব্যবহার করছি। বুঝলেন মশিয় গ্রঁদেল, আমি জাতীয় ফ্রান্সের সেবক, কিলমানের নই।'

নিজেকে সামলে নিল গ্রঁদেল, এমন কি উৎফুল্ল হয়েই বলল, 'আরে মশাই, শেষ পর্যন্ত তো প্রশ্নটা দাঁড়ায় কথার মানে নিয়ে। ও নিয়ে তর্ক তুলে লাভ কি?'

বাইরে রাস্তার মুখরতা সেই একই রকম উৎকণ্ঠ; লোকে আসছে যাচ্ছে, ছোট ছোট দলে জড়ো হয়ে গুজব নিয়ে আলোচনা করছে, রাস্তার ধারের দোকানগুলো থেকে সাগ্রহে কিনছে কাগজের সর্বশেষ সংস্করণ, পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে, তর্ক করছে, গান গাইছে। একটু তাড়া ছিল ব্রতৈলের; রোমের একটা কাগজের একজন সংবাদদাতার সঙ্গে তার দেখা করার কথা, কিন্তু যাবার পথে সে ঢুকল স্যাঁ জেরম্যাঁ দে প্রের গির্জাটায়। স্ফটিকপাত্রে রাখা পবিত্র জলে ফ্যাকাশে আঙুলটা ডুবিয়ে নিয়ে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল নিজের বুকে, তারপরে ডান দিকে যেখানে বেদীর ওপরে মেরী-মাতার মূর্তির চারদিকে প্রদীপ জ্বলছে, সেখানে, একটা হাঁটু গেড়ে বসে ব্রতৈল প্রার্থনা-বাক্য উচ্চারণ করল। চারদিকে মেয়েরা প্রার্থনা করছে তাদের স্বামী-পুত্রদের জন্যে।

গির্জার ছায়া থেকে বাইরে এসে রোদটা অসহ্য লাগে। ব্রতৈল চোখ কুঁচকে তাকাল—মুহূর্তের জন্যে মনে হল সব কিছু যেন ভেসে উঠে পাক খেয়ে যাচ্ছে: বিনিদ্র রাত্রিগুলো শোধ তুলতে চায়। খবরের কাগজওলারা ছুটোছুটি করছে সমানে। আলখাল্লা-পরা একজন পাদ্রী বেরিয়ে এলেন সেই সঙ্গে সঙ্গে; কেউ একজন মারা যাচ্ছে, লোকটির আত্মশুদ্ধির জন্যে ধর্মপুস্তক ইত্যাদি নিয়ে তাড়াতাড়ি চলেছেন তিনি; গির্জার ধর্ম-সংগীত গাইয়েদের মধ্যে শাদা লুঙ্গি আর ফ্রক-পরা একটি ছেলে একটা ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। আঙিনায় ডাকাডাকি করছে একদল পাখী। আর, উল্‌টো দিকে কাফেটার বারন্দায় বসে মৌরী, এরারুট্, ইউক্যালিপ্‌টাস, কমলালেবু আর লিলি-অফ-দি-ভ্যালীর রস মেশানো সুগন্ধী সরবত খেতে খেতে পারীর লোকেরা এমন একটা ভাব দেখাবার চেষ্টা করছে, যেন বিশ্বসংসারে কিছুই ঘটেনি।

১৩

'সীন' কারখানার ধর্মঘটীদের সভা অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল; বাক্যব্যয় করার ইচ্ছে নেই কারও। সবাই জানে দেশের দায়িত্ব এসে গেছে কতকগুলো অকিঞ্চিৎকর হীন-চরিত্রের লোকের হাতে—যে কোন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ ওদের দ্বারা সম্ভব। শ্রমিকরা লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু এই প্রস্তুতির পেছনে কোন স্ফূর্তির ভাব কিংবা আবেগ নেই। তাদের দৃঢ় সমর্থন জানাবার জন্যে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতিনিধির কাছে শ্রমিকদের এক প্রতিনিধি দল প্রেরিত হবে বলে স্থির হল।

পরের দিন সকালে চেক-দূতাবাসে যাবার পথে শাঁ-দ্য-মার পার হবার সময় লেগ্রে আর পিয়ের সারি সারি ট্যাঙ্ক যেতে দেখল। দড়ি ঘুরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলছে মেয়েগুলো। অবস্থাপন্ন চেহারার একজন মধ্যবয়সী লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'চেকোশ্লোভাকিয়ার বিয়ার খুব ভাল শুনেছি, কিন্তু আমি বিয়ার ভালবাসি না। তা, তোমাদের জিজ্ঞেস করি—ওদের ব্যাপারে আমাদের কি করার আছে?'

লেগ্রে পিয়েরকে বলল, 'তুমি কাল বলছিলে—ফ্রান্স শিগগিরই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কথাটা ঠিক। কিন্তু আমরা যে ফ্রান্সের মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন।

পপুলার ফ্রন্টের কথা আমরা এখনো বলি, কিন্তু তার আর কোন অস্তিত্ব নেই। সমাজতন্ত্রীদের চেয়ে ছুকানকে ঢের পছন্দ করি আমি—লোকটা খাঁটি। শ্রমিকরা চমৎকার তৎপরতা দেখাচ্ছে—অনেক পরিণত হয়ে উঠেছে ওদের আন্দোলন। কিন্তু চাষীরা? দালাদিএ যদি আত্মসমর্পণ করে তাহলে ওরা খুশি হয়।'

পিয়ের হেসে বলল, 'শুধু চাষীরাই নয়, আমার আনেও খুশি হবে—আর ও তো মজুরের মেয়ে। ওর বোঝা উচিত—কিন্তু সব কিছুই ও একেবারে গুলিয়ে ফেলেছে। আমাকে প্রায়ই বলে: কিন্তু তুমি তখন কি লিখেছিলে দেখ। ব্যক্তিগতভাবে নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আছে। স্পেনের ব্যাপারেও ঠিক তাই হল......বার্সেলোনায় আজানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। একদম খাঁটি র‍্যাডিকাল—আমাদের সারোর মতই। তোমার কি মনে হয়, শ্রমিকদের ও ডুবিয়ে দেয়নি? নিশ্চয়ই ডুবিয়েছে; তবু প্রশ্নটা ওকে নিয়ে নয়। চেকদের বেলাতেও ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু আনে বুঝতে চায় না—সব একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে ফেলে ও।'

'আনে বোঝে হয়ত, কিন্তু ওরা তোমাকে সীমান্তে পাঠাতে পারে ভেবে ভয় পেয়েছে। একটা ছেলে আছে তার। এতো বোঝাই যায়......' নিশ্বাস ফেলল লেগ্রে: সংসারে সে একলা মানুষ, তার জন্যে কারও ভাবনা নেই।

মেঘলা দিন, কিন্তু আবছায়ার আড়ালে রোদ অনুভব করা যায়।

পিয়ের বিড়বিড় করে বলল, 'পথ ছেড়ে দেবে ওরা...'

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পিয়ের যেন একটা কিছুর জন্যে আশায় আশায় দিন কাটাচ্ছে। এমন কি স্পেনের চিন্তাটাও তলিয়ে গেছে। হিটলারের কাছে চেম্বারলেনের প্রথম ও দ্বিতীয় বিমানযাত্রার মধ্যবর্তী সময়ে যেন কয়েক বছর কেটে গেছে। কাজ, চিন্তা কিংবা ঘুমোনো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। পপুলার ফ্রন্টের দিনগুলোর সেই উৎসাহ আর পিয়েরের মধ্যে অবশিষ্ট নেই। আছে শুধু আশাভঙ্গের তিক্ততা; এমন কি, একটা নিষ্ক্রিয়তার মনোভাবও যেন পেয়ে বসেছে তাকে। তার স্বভাবের সঙ্গে এ জিনিসটা মোটেই খাপ খায় না; পিয়ের ভাবছে, 'এগুবার পথও আমার আর নেই, পিছুবারও উপায় নেই।' অস্ত্রশস্ত্র-বিক্রেতাদের সঙ্গে কয়েকটা কূটনীতিক কথাবার্তা চালানোর সুযোগ ঘটেছে তার। স্পেনে বারকয়েক যাতায়াত করেছে, সেই সব দিনগুলোকে আশ্চর্য স্বপ্নের মত মনে পড়ে। সে আশা করছে শিগগিরই একটা কিছু ঘোষণা

করা হবে, যুদ্ধ বাধবে, আর তাকে যেতে হবে সীমান্তে। কিন্তু তার মনের মধ্যে এখনো যেন একটি শিশু বাস করছে, পের্‌পিঞাঁর সেই অলস স্বপ্নবিলাসীটি সুখী-জীবনের দাবী জানাচ্ছে। পাশের বাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে পিয়ানোর সুর তার কানে ঢুকতেই থেমে গেল পিয়ের, খুশি হয়ে নিমীলিত করল চোখ দুটো :

'পুরনো সেই সুর...কী সুন্দর!'

চেকোশ্লোভাকিয়ার দূতাবাসের প্রধান সেক্রেটারী তাদের অভ্যর্থনা করল। মোটাসোটা ঢিলেঢালা প্রকৃতির লোক এই ভানেক, চাষীদের মত চওড়া হাত, মোটা ঘাড়ের ওপর গলাটা শার্টের শক্ত কলারে জড়ানো।

গত কয়েকদিন ধরে অনবরত শ্রমিকদের প্রতিনিধি-দল দূতাবাসে আসছে. আর প্রত্যেকবার ভ্রূকুটি করছে ভানেক। 'সর্বহারা-শ্রেণীর দৃঢ় ঐক্য' শুনে সে ভেবেছে, 'কি ঘটেছে ব্যাপারটা?' কে এই লোকগুলো যারা তার সঙ্গে দেখা করতে এসে করমর্দন করছে, ক্রুদ্ধভাবে কথা বলছে আর ভরসা দিয়ে যাচ্ছে? কমিউনিস্ট ওরা! চেক্‌-প্রতিনিধির কাছে গিয়ে সে স্বীকারোক্তি করল, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি!'

ন-বছর আগে ভানেক মোরাভিয়ার ওস্‌ট্রাভ্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বে অধ্যাপনা করত; মতামতের দিক দিয়ে সে ছিল উদারপন্থী। সেখানে কমিউনিস্টরা নতুন সামরিক আইন-জারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় গোলমাল শুরু হল; গেপ্তার হল কমিউনিস্টরা। বিচারের সময়ে ভানেক অন্যতম সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত ছিল; রায় শুনে খুশি হয়েছিল সে : দলের নেতাদের জন্যে চার বছর কারাদণ্ড। আর এখন পারীর সেই কমিউনিস্টরাই ভরসা দিচ্ছে তাকে! কিন্তু যাদের সঙ্গে এতদিন ধরে ভানেকের মেলামেশা, যে সব বন্ধুদের সে নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে আর যাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছে ম্যাজিনো-লাইন, টিটুলেস্কুর বক্তৃতা কিংবা স্মেটানার নৃত্যনাট্য সম্বন্ধে, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল সেই সব সংস্কৃতিবান দরদী লোকগুলো? গত বসন্তে তেসা যখন মন্ত্রী নির্বাচিত হল, তখন কী খুশিই না হয়েছিল ভানেক! মাসারিক-এর জয়ন্তী উপলক্ষে তেসাই তো লিখেছিল, 'ইউরোপের কেন্দ্রে চেকোশ্লোভাকিয়া আমাদের পাশ্চাত্য-সভ্যতার দুর্ভেদ্য প্রাকার। মানবতার দেশ এই চেকোশ্লোভাকিয়া...' আর এখন তেসার কাছে ঘেঁষাও অসম্ভব। তার দেশের ভাগ্যে কি ঘটবে সে কথা ভেবে ভানেক উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। ফরাসী সংবাদপত্রে প্রবন্ধগুলো পড়ে চটে আগুন হয়েছে সে;

ব্রতৈল যে প্রবন্ধে চেকদের 'বর্বর' বলেছে, সেই প্রবন্ধটা পড়ে রাগের ঝোঁকে কফির কাপ ভেঙে চুরমার করেছে। এর ওপরে তার ব্যক্তিগত দুঃখ-দুর্ভাবনাও আছে; মোরাভিয়ার ছোট একটা সীমান্তবর্তী শহরে ভানেকের জন্ম; সেখানে থাকেন তার বুড়ো বাপ-মা আর বোন। গোঁয়ারের মত সে দিনে একশোবার পুনরুক্তি করে, 'ফরাসীরা নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।' বৈদেশিক বিভাগের দপ্তরে গিয়ে ভানেক তার জানাশোনা ডেপুটিদের চেপে ধরেছে, কিন্তু তারা হয় কিছু বলতে পারেনি আর না হয় নিশ্বাস ফেলেছে শবযাত্রাকারীর মত। দূতাবাসে প্রতিনিধি দল আসতেই থাকছে; কিন্তু ভানেক বৃথাই রয়েছে ফরাসী সংবাদপত্রের প্রতিনিধি দল, অধ্যাপক, আইনজ্ঞ, র‍্যাডিকাল কিংবা সমাজতন্ত্রীদের প্রতীক্ষায়। যারা এসেছে তারা সবাই শ্রমিক আর সবাই এসে একই কথা বলে গেছে। ভানেক ওদের ধন্যবাদ জানিয়ে করমর্দন করেছে আর মনে মনে ভেবেছে 'আবার সেই কমিউনিস্টরা?'

দূতাবাসে এসে লেগ্রে সমস্তক্ষণ চুপ করে রইল; কথাবার্তা সবই পিয়ের বলল। পিয়েরের জোরালো ভঙ্গী আর অসাধারণ বাক্যপ্রয়োগের ক্ষমতায় ভানেক আকৃষ্ট হল; সে বুঝল, 'এ মজুরও নয় কমিউনিস্টও নয়—স্বাধীনভাবে চিন্তা করে; লোকটার মতামত আর মনের গড়নটা তার নিজের মতই।

'অত্যন্ত খুশি হলাম আপনার কথা শুনে,' বলল ভানেক, 'সব রকম মতের লোকই যে আমাদের কাছে আসছেন, এটা আনন্দের কথা। নইলে, খালি কমিউনিস্টরাই আসছে বলে ধারণা হতে পারত।'

পিয়ের আড়ষ্টভাবে বলল, 'আমি কমিউনিস্ট।'

ভদ্রভাবে হাসল ভানেক। দোতলার খোলা জানলাটার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল তারা। কানে আসছে কাগজওলাদের আতঙ্কজনক চিৎকার। আলোর দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে ভানেক ভাবল, তেসা আজ তার সঙ্গে দেখা করবে কিনা কে জানে।

বাইরে এসে লেগ্রে পিয়েরকে বলল, 'শোন, পিয়ের। অবশ্য জানি, এখন এই নিয়ে আলোচনা করার সময় নেই; তবু আমি কিছুদিন ধরে তোমাকে কথাটা শুধোব ভাবছিলাম। তুমি পার্টিতে যোগ দিচ্ছ না কেন?'

পিয়ের কিছুক্ষণ চুপ করে রইল; তারপর বলল, 'কেন তা জানি না—এইটাই বোধহয় খাঁটি কথা।'

শেষ পর্যন্ত তেসা ভানেকের সঙ্গে দেখা করল। পাছে কোন অভিযোগ শুনতে হয়, এইজন্যে মন্ত্রী-মশাই আগে থেকেই চেঁচাতে লাগলেন :

'বোঝেন না কেন আপনারা? শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির ওপরেই ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোর ভাগ্য নির্ভর করছে। আমরা আপাতত যুদ্ধে নামতে অপারগ। কিন্তু আমাদের হাতিয়ারের আয়োজন সম্পূর্ণ হলেই, ওসব প্রদেশগুলো আবার ফিরে পাইয়ে দেব আপনাদের। সবুর করতে জানা চাই। প্রাশিয়ানরা যখন শ্‌ক্লেস্‌ভিগ অধিকার করে নেয়, তখন আমরা বাধা দিইনি বটে, কিন্তু অর্ধ-শতাব্দী পরেই আমরা ডেনদের ফিরিয়ে এনে দিয়েছি তাদের সম্পত্তি। এটা তো হল গিয়ে রাষ্ট্রনীতির অ-আ-ক-খ।'

ভানেক সাধারণত অল্পভাষী; কিন্তু এখন সে একটা হঠকারিতা করে বসল, 'শ্‌ক্লেস্‌ভিগ অধিকার করে নিতে দিয়ে অস্ট্রিয়ার পরাজয় ঘটতে দিয়ে ফ্রান্স সিড্যানের পথ তৈরী করে দিয়েছিল ......'

তেসা মুখিয়ে উঠল, 'ও উপমাটা এক্ষেত্রে খাটে না। দ্বিতীয় রিপাব্‌লিকের তখন ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা; কিন্তু আজ এই ১৯১৮ সালে ফ্রান্স দুর্নিবার শক্তিতে বিকশিত হচ্ছে। কিচ্ছু ভাববেন না : সিড্যান-এর পুনরাবৃত্তি হবে না। কিন্তু সবুর করা চাই। সুদেতেন প্রশ্নের ওপর ফ্রান্স দু দলে ভাগ হয়ে গেছে।'

চুপ করে রইল ভানেক। তার রোদ-বৃষ্টি-ঝড় সওয়া লাল মুখখানা আরও লাল হয়ে উঠল, কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠল। কিন্তু তেসা মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলল; তার ক্রোধ পরিবর্তিত হল অমায়িকতায়। ভানেকের কাছে সবে এসে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল :

'বিশ্বাস করুন, আপনাদের দুঃখে আমরাও দুঃখী। প্লাস্‌ দ্য লা কঁকর্দ-এ স্ট্রাস্‌বুর্গের প্রতিমূর্তি যখন শোক-বস্ত্রে ঢেকে গিয়েছিল তখনকার কথা আমার বেশ মনে আছে। আপনারা হাড়িকাঠে চাপছেন বলিদানের অর্ঘ হিসেবে। শান্তিরক্ষার জন্যে আপনারা যথাসর্বস্ব ত্যাগ করছেন। একথা ফ্রান্সের নারীজাতি কখনো ভুলবে না......'

ভানেকের মনে পড়ল কালো ঘোমটার নীচে তার বৃদ্ধা মায়ের মুখখানা—চাষী-বৌদের মতই তাঁর বেশভূষা। একটা অসম্ভব, ছেলেমানুষি আশা জাগল তার মনে : হয়ত শেষ পর্যন্ত এরা চেকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নাও করতে পারে।

ভানেক বলল, 'আপনি বলছেন, সুদেতেন-প্রশ্নের ওপর ফ্রান্স দু দলে ভাগ

হয়ে গেছে; কিন্তু যে অঞ্চলটা নিয়ে বিরোধ বেধেছে, সেখানে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানকার বাসিন্দারা সবাই চেক, একটাও জার্মান নেই সে সব জায়গায়। এ আমি খুব ভাল করে জানি। আমি ওই জায়গারই লোক। অন্তত ওই অঞ্চলগুলো বাঁচানো একান্ত প্রয়োজন।'

হাই তুলল তেসা, এ ধরনের কথাবার্তায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে সে: 'এক ঘণ্টা আগে দালাদিএ জানিয়েছে যে সে মিউনিকে বিমানযাত্রা করছে। ওখানে একটা বোঝাপড়া করে নেবে ওরা। আপনার গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধিকে সবই জানানো হবে নিশ্চয়ই। সুতরাং বর্তমানে ভূগোল নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

ভানেকের নীল চোখ ঝাপসা হয়ে এল, কিন্তু তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে তেসাকে ধন্যবাদ দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। তারপর তেসা আপনমনে ভাবল, 'কী কাজই না চেপেছে ঘাড়ে! খুনীদের সঙ্গে গিলোটিনে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল। এই চেকটা লোক ভাল, কিন্তু বড্ড বেশী সরল! আমরা যে সব কিছুরই ঝুঁকি নিতে পারি না, তা ওরা বোঝে না কেন? যথেষ্ট বদান্যতা দেখানো গেছে! ফ্রান্সের এখন নিজের কথাটা নতুন করে একবার ভেবে দেখা দরকার।'

পলেৎকে টেলিফোনে ডাকল সে:

'আসব নাকি একবার? একটু সান্ত্বনা চাই আমি। না, না, খবর সব ভাল, এমন কি—ভয়ানক ভাল। কোন যুদ্ধ হবে না। কিন্তু অতি বিশ্রী মানসিক অবস্থা আমার। কি যেন বলেছেন ভেরলেন?—'মন যে কেমন করে অকারণে।' বেশ! আমি আসছি তাহলে। এক্ষুনি পৌঁছে যাব।'

১৪

গায়ের কোটটা খুলে ফেলে জোলিও তার ছাপাখানার ঘরে ব্যস্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিশেষ-সংস্করণ কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদগুলো কি ভাবে সাজানো হবে সেটা ঠিক করা হচ্ছে; চেম্বারলেনের ছেলেবেলার গল্পটার জন্যে জোলিও বিশেষভাবে গর্ব অনুভব করছে: অন্যান্য ছেলেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হলে বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মহোদয় মিটমাট করিয়ে দিতেন এবং তাঁর মা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্য-জীবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

একজন সহকারী সম্পাদক এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি শিরোনামা দেব ?—'মিউনিক চুক্তি সম্পাদিত' ?'

জোলিও ভ্রূকুটি করে বলল, 'খেলো শোনাচ্ছে। মোটেই জোরালো হল না কথাটা। ঠিক লাগসই হচ্ছে না।'

'তাহলে, 'শান্তির বিজয়-অভিযান' কথাটা কেমন হবে ?'

এটাও জোলিওর পছন্দ হল না ; মাথাটা পেছনে হেলিয়ে চোখ দুটো নিমীলিত করে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ফ্রান্সের বিজয়-অভিযান—গোটা প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপাও শিরোনামাটা...'

পারীতে ফিরে এসে দালাদিএ মৃত সৈনিকদের স্মৃতি-স্তম্ভের নীচে ফুলের তোড়া রাখল ; সমস্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, আপিস, দোকান, ইত্যাদি বন্ধ আছে ; সাঁজ-এলিজের চওড়া ফুটপাথে ভীড় জমেছে, জনসাধারণ আনন্দ-মুখর, যুদ্ধক্ষেত্রের গড়খাইয়ে গিয়ে আর বসতে হবে না তাদের। বিশেষ করে নারীর সংখ্যাধিক্যটা লক্ষ্যণীয় ; পতাকা উড়ছে সর্বত্র, ফুলের দোকানে গোলাপ আর জেরানিয়মের তোড়া বিক্রি হচ্ছে! গতকাল অন্ধকার রাস্তায় রাস্তায় শোনা গিয়েছিল নীচু গলায় বিষণ্ণ বাক্যালাপ, কান্নার ফোঁপানি আর ভাঙা গলার গান। আর আজ সর্বত্রই ছুটির দিনের মুখরতা।

সাঁজ-এলিজের কাছে একটা মাঝারি গোছের রেস্তোরাঁর এক অন্ধকার কোণের টেবিলে বসে আছে দেসের। দুপুরের খাওয়া এইমাত্র শেষ করে সে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। এই রেস্তোরাঁয় লোকজন বড় একটা আসে না, জানাশোনা লোক এড়াবার জন্তেই দেসের এখানে এসেছে। কাগজওলার কাছ থেকে একখানা 'লা ভোয়া নুভেল্' কিনে নিয়ে সামনের পাতাগুলো চোখ বুলিয়ে উল্টে গেছে, এখন পড়ছে ক্ষুদে অক্ষরে ছাপা ডাকাতির আর আগুনলাগার খবরগুলো। অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছে তার মন, আর চোখ তুলেই ফুজেকে দেখতে পেয়ে বিষণ্ণতাটা আরও বেড়ে গেল।

'তুমি এখানে ?'

'দেখতেই পাচ্ছো...'

অন্ত যে কোন সময় হলে ফুজেকে দেখে দেসের খুশি হত। অনেকদিনের বন্ধু তারা ; দুজনে একসঙ্গে 'পলিটেক্‌নিক্'-এ পড়েছে আর ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন দেখেছে। পরে দেসেরকে মন দিতে হয়েছে ব্যবসা-সংক্রান্ত নানা কাজে, আর ফুজে নামল ইতিহাস আর রাজনীতির গবেষণায়। কচিৎ দেখাশোনা হয়

তাদের, কিন্তু দেখা হলে তারা বন্ধুভাবেই কথাবার্তা বলে, আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দেয় না। দেসেরকে যদি কেউ বলে যে তার প্রিয়পাত্র ওই র‍্যাডিকালরা হীনচরিত্রের লোক, ওরা রিপাব্‌লিকের রক্ত শোষণ করছে, আর আড়ালে-আড়ালে স্টাভিস্‌কির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ আছে, তাহলে দেসের জিজ্ঞাসা করে, 'ফুজে সম্বন্ধে কি বলতে চাও?' তার কাছে এই শ্মশ্রু-মণ্ডিত কর্মী ব্যক্তিটি প্রাচীন ফ্রান্সের সমস্ত সদগুণের মূর্তিমান প্রতীক।

ঐতিহাসিক হিসেবে ফুজে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। পিকার্ডির জ্যাকোবিন সম্প্রদায় আর শুআঁদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম সম্বন্ধে তার লেখা বইগুলো মূল্যবান রচনা বলে সর্বস্বীকৃত। বিদ্যার সাধনাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, ফরাসী বিপ্লবের আদর্শকে সম্পূর্ণ করাও তার লক্ষ্য। তার কাছে দেশভক্তির অর্থ আর সাদাসিধে ব্যবহারের অর্থ একই। সহজ আন্তরিকতার সঙ্গেই সে বলে, 'পিতৃভূমির সংকট!' তাকে যারা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে, এমন কোন লোকের সদ্যজাত সন্তানকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে ফুজে লোকটিকে বলে, 'একজন খাঁটি ফরাসী নাগরিক আপনি!' ফুজে নিজেকে জ্যাকোবিনদের উত্তরাধিকারী বলে মনে করে।

অতীতের প্রতি তার অন্ধ অনুরাগ। কেউ না কেউ সর্বদাই রিপাব্‌লিকের শত্রুতা করছে বলে তার দৃঢ় বিশ্বাস। নেপোলিয়নের বংশধরদের যে কোন সমর্থককে সে সন্দেহের চোখে দেখে, আর রাস্তায় দেখলেই বিরক্তির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তার পৃথিবী ফ্রান্সের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, অন্য দেশে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে তার কোন আগ্রহ নেই। প্রত্যেকটি বিদেশী কথা সে ফরাসী ঢঙে উচ্চারণ করে—সোভিয়েটকে বলে 'সোভিএ,' চেম্বারলেন কে 'শংবেরলাং', ডুচেকে 'দিউস্‌'; শুধু তাই নয়, ক্রোটদের সে বলে, 'সন্ত্রাসবাদী, কালাপাহাড়ী, বন্ধানদের দল,' আর গান্ধীকে বলে 'হিন্দু দাতঁ'।

ফুজের বাবা ছিলেন পাথর খোদাইয়ের কারিগর, গভীর একনিষ্ঠতা ছিল তাঁর নিজের কাজে, তাই ছেলেবেলা থেকেই ফুজে কাজ ভালবাসতে শিখেছে। বরাবরই সে নিজের মনের মত কাজ পেয়েছে, এটা তার একটা সৌভাগ্য। যারা ন্যায্য বেতন পায় না বলে কাজকে ঘৃণা করে সেই হাজার হাজার শ্রমজীবীকে সে দেখতেই পায় না। তার মতে, সমাজতন্ত্রী আন্দোলনটা কতকগুলো সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত কিন্তু বস্তুসম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন লোকের উদ্ভট পরিকল্পনা মাত্র।

ফরাসী ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীদের ফুজে উপদেশ দেয়, 'তা যাই বলো, এর পেছনে ভাটিক্যানের চক্রান্তটা অগ্রাহ্য কোরো না!'

যাদের ওপর অবিচার করা হয়েছে এমন সব লোকের অভিযোগ সম্পর্কিত কাগজপত্রে তার পকেট সর্বদাই ঠাসা থাকে। বাসাবাড়ী থেকে বিতাড়িত বিধবার জন্যে ফুজে তদ্বির করে, সেনিগলের অধিবাসীদের সমর্থনে কিংবা এ্যানার্কিস্টদের পক্ষে দাঁড়ায়। সুতরাং 'নাগরিক সর্ব-সাধারণের অধিকার রক্ষার জন্যে সংঘ'-এর সে একজন শ্রেষ্ঠ উৎসাহী কর্মী। তার স্ত্রী তাকে কৌতুক করে বলে, 'ব্যস্তবাগীশ!' মোটাসোটা, শান্ত স্বভাবের মেয়ে তার স্ত্রী—সর্বদাই বাড়ীর কাজকর্ম করছে, বাতি-দানের ঠুলী তৈরী করছে, ছবি টাঙাচ্ছে কিংবা চেয়ারের ওড়নায় নক্সা সেলাই করছে। ফুজে ঠাট্টা করে অভিযোগ করে, 'পিঠের ওপর বাড়ী-বয়ে-বেড়ানো এক শম্বুককে বিয়ে করে এনেছি।' ছেলেগুলো বড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু একটাও কোন কর্মের নয়, কিছু করবার ইচ্ছেও নেই; ফুজের কাছ থেকে টাকা বাগায় আর তাকে মনে করিয়ে দেয় যে 'অপরের সম্বন্ধে সহিষ্ণু' হওয়াই তার নীতি।

চেম্বারের সবাই ফুজেকে র‍্যাডিকাল বলে মনে করে; কিন্তু তেসার মতে, সে বলশেভিক। তেসা চেঁচামেচি করে, 'কী কাণ্ড! লোকটা বলে কিনা, বামপন্থী-দের মধ্যে র‍্যাডিকালদের কোন শত্রু নেই! তাহলে কমিউনিস্টরা কি?' ফুজে একবার কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে বলেছিল, 'ওদের কথাবার্তা সব অত্যন্ত অবাস্তব, কিন্তু সাচ্চা দেশভক্ত ওরা।' মাত্র বাহান্ন বছর বয়স তার, কিন্তু আচারে ব্যবহারে সে পুরোদস্তুর প্রাচীনপন্থী; চেম্বারে সবাই ওকে নামে দিয়েছে 'পারীর ঘোড়ারগাড়ীওলাদের শেষ বংশধর'।

দেসেরের মনটা কি রকম ভারাক্রান্ত হয়ে আছে; কথা বলার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু জানত যে ফুজের বাক্যালাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না; আর সত্যিই ফুজে নানা প্রশ্ন তুলল—দেসেরের অন্তরালবর্তী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সে রীতিমত খোঁজ খবর রাখে:

'তুমি সাঁজ-এলিজে যাওনি কেন? শ্যাম্পেন খাচ্ছো না কেন? তোমার তো খুশি হওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত এটা তোমাদেরই জয়।'

'কি বলব বলো? এত সহজে আর এত উচ্চকিত জয়লাভ করাটা খুব সুখের কিছু নয়।'

কথাটা বুঝতে না পেরে ফুজে বিরক্ত হয়ে উঠল। দাড়িটা কাঁপতে থাকল তার।

'কথা, খালি কথা! এই তো চেয়েছিলে তোমরা—অস্বীকার করবার চেষ্টা কোরো না। এমন কি ওই যাদুঘরের মড়া ভীইয়ারটাকে পর্যন্ত দলে টেনেছো। সবই জানি আমি। বিজয় উৎসবের অনুষ্ঠান করতে পারো বৈকি তোমরা!'

'না, আমি এ চাইনি। যুদ্ধের জন্যে আমরা যে প্রস্তুত নই আর যুদ্ধ করতেও পারতাম না, তা আমি জানতাম। আমি ছিলাম আপোষ-রক্ষার পক্ষে। কিন্তু প্রথমত, আপোষের শর্তগুলো আমরা যা আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশী গুরুভার হয়েছে; দ্বিতীয়ত—এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—আমার কথাটা বড্ড বেশী রকম সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে। বুঝেছো? বড্ড বেশী রকম সঠিক! আজ দেখা গেছে, ম্যাজিনো লাইন কিংবা অস্ত্রশস্ত্র কোনটাই আমাদের কোন কাজে লাগবে না; কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। সাঁজ-এলিজের ভীড় দেখে এখানে পালিয়ে এসেছি। কূটনীতির ক্ষেত্রে এটা ঠিক সিড্যানের মতই একটা ব্যাপার—অথচ এটাকে ওরা কিনা একটা বিজয়োৎসবে দাঁড় করিয়েছে! বিমানঘাঁটিতে নেমে দালাদিএ নিজের মুখ দেখাতে ভয় পাচ্ছিল, ভেবেছিল ওরা তাকে পচা ডিম ছুঁড়ে মারবে। কিন্তু ওরা এসে তাকে অভিনন্দন জানাল ফুলের তোড়া নিয়ে—নর্তকীকে যেমন করে লোকে। যে দেশের লোক এরকম করে, তারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ।'

'দেশের লোকের ওপর দোষ চাপাচ্ছে কেন? এর জন্যে তোমরাই দায়ী, আর বিশেষ করে এই তুমি। আমি একথা তোমায় স্পেন-ঘটনার শুরুতেই বলেছিলাম। তোমরাই ভীরুতাটাকে একটা নাগরিক ধর্ম হিসেবে প্রচার করেছ, আর এখন কিনা জনসাধারণকে আত্মসমর্পণ করে খুশি হতে দেখে অবাক হচ্ছ! যে সব কাগজে পালিয়ে বাঁচাকেই গৌরবের সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে, সেই সব কাগজের পৃষ্ঠপোষকতা করছ তুমি। ফ্রান্সের শত্রুদের সাহায্য করছ। তুমি চাও—'

তাকে বাধা দিয়ে দেসের বলল, 'কি যে চাই তা আমি নিজেই জানি না। আমার তাস তুরুপ হয়ে গেছে। আমাদের দেশের তাসও তাই, বোধ হয়। আমি কি ভেবেছিলাম জানো? কুঁদুলে আর বুভুক্ষু সব উঠ্‌তি জাতিগুলোর মধ্যে ফ্রান্সের শান্ত সুখী জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে যাব বলেই ভেবেছিলাম, কিন্তু তা হল না। এখন যেটা করবার রয়েছে সেটা মন টানবার মত কিছু নয়। সম্ভব হলে তাহিতি চলে যেতাম। কিন্তু ব্যবসার জালে বাঁধা পড়ে গেছি; ব্যবসার জন্যে মোটেই গ্রাহ্য করি না, তবু একেবারে সব ছেড়েছুড়ে দিতেও পারি না। সব সময়ে স্নায়বিক ব্যাধিতে ভোগাটা কবির পক্ষে স্বাভাবিক হতে পারে, কাব্য-

দেবীরা সেটা পছন্দ করেন বলেই মনে হয়। শেয়ার-বাজারে ওসব চলে না।'
খাবারের বিল শোধ করে দিল দেসের। তারপর যেন তারা দুজনেই মন্ত্রমুগ্ধের মত চলে এল সাঁজ-এলিজের দিকে; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল। একটা খোলা মোটরে চেপে যাচ্ছে দালাদিএ। জনতা সোৎসাহে অভিনন্দন জানাল তাকে। তার পেছনে আর একটা মোটরে চলেছে তেসা। সে সমস্ত ব্যাপারটাকে দেখছে তার নিজের উৎসব-দিবস হিসেবে, সমস্ত তারিফটা একা দালাদিএকে নিতে দিতে চায় না সে। জনতার হর্ষধ্বনির উত্তরে মাথা নোয়াবার সময় সময় কেঁপে উঠল তার টিকোল নাকটা; সলজ্জভাবে এবং আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে হাসল তেসা—বিয়োগান্ত নাটকের কোন অভিনেতা করুণ স্বগতোক্তির শেষে যেমন হাসে। একজন মহিলা একটা গোলাপ ছুঁড়ে দিল তার দিকে, বুকের ওপর ফুলটাকে সে চেপে ধরল।
'ভারী ফূর্তির শবযাত্রা,' বলল ফুজে, 'ফ্রান্সকে গোর দিতে চলেছে ওরা।'
দেসের অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠল, 'তেসাকেই বড় ভাল মানিয়েছে। গোলাপ কেন? লরেল-পাতার মুকুট পরা উচিত ওর।'
ফুজে খেঁকিয়ে উঠল, 'এটা ইয়ারকি দেবার সময় নয়, দেসের। পিতৃভূমির সংকট! হয়তো আর বছরখানেকের মধ্যেই জার্মানরা সাঁজ-এলিজের ওপর মার্চ করে যাবে। মাগীগুলো তখন তাদের দিকেও অমনি করেই গোলাপ ছুঁড়ে দেবে।'
'পিতৃভূমির সংকট, এ্যাঁ? তুমি খাঁটি লোক, কিন্তু তোমার ওই বক্তৃতা ঝাড়ার স্বভাব আর কিছুতেই শোধরাল না। কিন্তু এমনও হতে পারে যে পিতৃভূমির আর কোন অস্তিত্বই নেই। আচ্ছা, তাহলে চলি, ফুজে, আবার দেখা হবে!'

১৫

ঠুনকো দেওয়ালের আড়াল ভেদ করে বাড়ীর সমস্ত বাসিন্দাদের কানে এসে পৌঁচচ্ছে রেডিওর খবর; সংবাদ-ঘোষকের গলাটা যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে ফিরে আসছে।
ছেলের জন্মের অল্পদিন আগে পিয়ের এই বাড়ীটায় এসে বাসা নিয়েছে। দশটা মহলওলা এই বিরাট বাড়ী মিউনিসিপালিটি তৈরী করেছে একটা

পোড়ো জমির ওপর। অল্পদিন আগেও জমিটা বুনো ঘাস আর আগাছার জঙ্গলে ভরাট ছিল, আর শত্রুর আক্রমণ রুখবার জন্যে বড় বড় গড়খাই কেটে রাখা হয়েছিল এখানে। পিয়ের একদা এইখানেই প্রণয় অভিসারে এসেছে, উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কবিতা আউড়েছে আর শাশ্বত প্রেমের প্রতিজ্ঞা করেছে। এখন এই জায়গাটায় চারদিকে বিরাট বিরাট দালান, রাত্রে হাজার জানলায় আলো জ্বলে। ভাড়াটেরা সবাই চাকুরে, কারিগর আর মজুর। দুটো ছোট ঘরওলা এক-একটা খোপ নিয়ে এক-একটা বাসা; প্রত্যেকটি বাসার জীবনযাত্রা একই ধরনের: সকালে উঠেই লোকে ছোটে সুড়ঙ্গ-ট্রেন ধরার জন্যে; সকাল নটায় মেয়েরা বিছানা-তোষক রোদ-বাতাস লাগাবার জন্যে জানলার বাইরে টাঙিয়ে দিয়ে ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে; বেলাবারোটায় কাটা-কোর্তা পরা ইস্কুলের পোষাকে কালি-মাখা হাতে ফেরে ছোট ছেলে-মেয়েরা। মাখন, পেঁয়াজ আর কফির গন্ধে বাতাস মন্থর হয়ে থাকে। বিকেলের দিকে রেডিওটা মুখর হয়ে ওঠে, সাড়ে সাতটায় সবাই সান্ধ্য-ভোজন শেষ করে এগারটায় আলো নিভিয়ে শুতে যায়।

গত কয়েকদিন ধরে রেডিওটা মাঝরাত্রি পর্যন্ত অনবরত চেঁচিয়েছে: সাংঘাতিক সব খবর আশা করছে লোকে। কিন্তু আজ সংবাদদাতাটি সকলের ভয় ঘুচিয়েছে: যুদ্ধ হবে না।

পিয়ের আর আনে খেতে বসেছিল। খবরটা শুনে পিয়ের শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কাঁটা-চামচটা হাতে নিয়ে; তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের ওপর বিছানো চাদরটা টান দিয়ে ফেলে গাল দিয়ে উঠল। আনের মনে নানা বিরোধী আবেগের একটা মিশ্রিত অনুভূতি জেগেছে। সে খুশি হল পিয়েরকে যুদ্ধে যেতে হবে না বলে; যুদ্ধ না হলে ভেঙে-পড়া বাড়ীঘর আর অঙ্গহীন শিশুর মৃতদেহের দৃশ্যও আর দেখতে হবে না, এ ভেবেও খুশি হল আনে; কিন্তু তবু একটা অজানা দুঃখে ভরে উঠল তার মন—স্বামীর মতামত বা ধারণার অংশীদার সে নয়, কিন্তু স্বামীর দুঃখটা সঞ্চারিত হওয়ায় সে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল।

ওদের দুজনের মধ্যে কত অমিল। চঞ্চল আর মুখর স্বভাব পিয়েরের, প্রত্যেকটি ভাব ফুটে ওঠে তার মুখে, উল্লাস থেকে হতাশা পর্যন্ত প্রত্যেকটি অনুভূতির মধ্যে তার মন ক্রমাগত দোল খায়। আনে চাপা স্বভাবের মেয়ে, এমন কি খানিকটা গোপনীয়তা আছে তার মধ্যে; একরোখা,

সর্বদাই মূল সত্যটাতে যেতে চায়, স্বাস্থ্যবতী, মাতৃত্বের আনন্দে ভরপুর; তার দৈহিক কামনাগুলো সহজ আর সরল। প্রীতির সঙ্গে ওরা দুজনে জীবনযাপন করে; মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে প্রচণ্ড কিন্তু ক্ষণস্থায়ী মতবিরোধ দেখা দেয়; পরস্পরের প্রতি ওরা সর্বদাই চেতনা-বহির্ভূত আর স্বেচ্ছাতীত একটা একাত্মতা-বোধ অনুভব করে। ওদের দুজনেরই নিজস্ব জীবন, কর্মক্ষেত্র আর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা আছে। আনে তার কাজ করে যায় সত্যিকার একটা প্রেরণা নিয়ে; তার চোখে প্রতিটি শিশুই রহস্যময় ক্ষীণজীবী চারা-গাছের মত—যেন শুকিয়ে যাবে, আর না হয় সতেজে বেড়ে উঠবে। আনে মনে মনে বলে, 'ওরা সবাই আমার ছেলে, দুদুর মতই।' কিন্তু কথাটা সত্যি নয়; ছেলের প্রতি তার অন্ধ, একাগ্র স্নেহ; দুদুর সোনালী চুল আর আধো-আধো কথায় বুক ভরে ওঠে তার। আনের আর কোন অনুভূতি এর চেয়ে গভীরতর নয়, একমাত্র পিয়েরের প্রতি ভালবাসা ছাড়া। স্বামীর প্রতি এই ভালবাসাটুকু সে পিয়েরের কাছে গোপন রাখে, এমন কি নিজের কাছেও। কিশোরীর মত একটা প্রতিরোধ রয়ে গেছে আনের মধ্যে; পিয়েরকে আত্মদান করার সময় প্রত্যেকবারই তার মনে প্রথমবারকার সেই বিস্ময় আর সুখের শিহরণ জাগে।

আনের ছোট্ট বাসাটা পরিচ্ছন্ন আর নিরাভরণ; জিনিসপত্রের বাহুল্য ও পছন্দ করে না। কিন্তু পিয়েরের টেবিল হরেক ভূতাত্ত্বিক নমুনায় স্তূপীকৃত—একটু উল্‌টে পাল্‌টে দেখলেই বোঝা যাবে, অধুনা-পরিত্যক্ত কত বিচিত্র সব শখ আর সংগ্রহের বাতিক এক সময়ে পিয়েরের ছিল।

বুলভার ক্রুনের এই ছোট গুমোট বাসাটায়, ইস্কুলের বই, ছবি আর মোটাসোটা গোলাপী-রঙ দুদুকে নিয়ে ওরা সুখী হতে পারত। কিন্তু সুখী নয় ওরা: বাইরের কোন একটা বাধা ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে ওদের জীবনে। আনে এটা অনেকদিন আগেই বুঝেছে—গ্রাঁদ্ বুলভারের সেই কাফেটায় বসে সৈন্যদের যখন সে আগামী যুদ্ধ নিয়ে তামাসা করতে শুনেছে, তখন থেকেই। যুদ্ধের অপেক্ষায় গত দু বছর ধরে একটানা মানসিক পীড়ন সইতে হয়েছে। এই জীবনটাকে ওরা নিতান্ত সাময়িক বলে ধরে নিয়েছে—ভ্রমণকারীরা যেমন একদিনের জন্যে কোন হোটেলের ঘর ভাড়া নেয়। আনে একবার পিয়েরকে বলেছিল, 'তবু যা হোক, আর একটা দিন ওরা দিয়েছে আমাদের।' পিয়েরের কাছে এই জীবনটা তার সংগ্রামের অংশ এবং নিজের ধ্যানধারণা

আর আশা-নিরাশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ওর উত্তেজিত কথাবার্তা হৃদয় দিয়ে বুঝতে গিয়ে আনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষত গত কয়েকদিন কেটেছে একেবারে দিশেহারা অবস্থায়। স্পেনের যুদ্ধে এমন একটা কিছু ছিল যার আবেদনটা মানবিক। মাদ্রিদ-ধ্বংসের ফটো দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল আনে, অনিচ্ছাকৃতভাবেই প্রশংসা করেছে 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'র বীরত্বের। ও তখন পিয়েরকে বলেছিল, 'আমার সংগ্রাম এটা নয় বটে, তবে এর মধ্যে কোথাও কোন গলতি নেই।' আনের পক্ষে এই 'কোন গলতি নেই' উক্তিটা একটা স্বীকৃতি নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন, যখন সব কিছুই ঘুলিয়ে গেছে—রাজনীতি আর ব্যক্তিগত আবেগ, শান্তিপ্রিয়তা আর ভীরুতা, 'ইণ্টারন্যাশনাল' আর জেনারেলদের মহড়া, সবই যখন মিশে গেছে পরস্পরের সঙ্গে, তখন আনে নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নির্বাক থেকেছে। কাঁদতে কাঁদতে মায়েরা ইস্কুলে আসত: অশুভ দিনটা এগিয়ে আসছিল ক্রমশ। আর শেষ পর্যন্ত এই এক সরকারী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হল মিউনিক চুক্তির কথা। যুদ্ধ আর বাধবে না তাহলে!

'পিয়ের, ঠিক এই মুহূর্তে কত লোক আনন্দ করছে? জার্মানদের মধ্যেও। তোমার কি মনে হয় ওদের মন অন্য রকম? তোমার ওই রাজনীতি ভুলে যাও, অন্তত মিনিট খানেকের জন্যে!'

'তোমার যুক্তিটা আঁদ্রের মত,' বলল পিয়ের।

'আঁদ্রের মত কেন? লক্ষ লক্ষ লোকের মত! তোমরা যাদের বল 'জন-সাধারণ'। এতে কোন সন্দেহ নেই যে তোমাদের সময় এসেছে...'

'কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আমি।'

'আগেকার দিনে মানুষ বাসা বাঁধত, কাজকর্ম করে যেত, আর ছেলেপুলে মানুষ করত। কিন্তু তোমরা, অর্থাৎ তোমার মত লোকরা, সেটা শুধুই সয়ে গেছ, কোনরকমে সয়ে গেছ। তখনকার দিনে বড় বড় বই লেখা হয়েছে, নতুন নতুন রাস্তা তৈরী হয়েছে, ওষুধের আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু এখন সবাইকে তোমাদের মত লোকের মুখ চেয়ে চলতে হয়। আমি মতামতের কথা বলছি না, বলছি চরিত্রের কথা। ইদানীং যেন সবই বিশেষ একটা কিছুর মুখ চেয়ে রয়েছে...আর সেটা কী সাংঘাতিক......'

তর্ক তুলবার চেষ্টা করল না পিয়ের। খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে পড়তে লাগল—আজ সকালের জীবনটা অতীতের ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। আনের

মনে কিন্তু দুশ্চিন্তা জেগেছে, সে বুঝেছে যে সমস্যার কোনই সমাধান হয়নি। যুদ্ধটা আপাতত মুলতুবী থাকল বটে, কিন্তু কতদিন টিকবে এই শান্তি? এক সপ্তাহ? এক বছর? জীবনকে বিন্দু বিন্দু করে দান করে কি ভাবে নিঃশেষ করে দেওয়া যায়?

ছুছুর কাছে উঠে গেল আনে। আরামে ঘুমোচ্ছে ও। আনে ভাবল, ছুছুর জীবন যেন সুদীর্ঘ হয়; ওর দুধের দাঁত পড়ে গিয়ে আবার নতুন করে গজাবে। কেমন ধারা হবে ওর জীবনযাপন? একটা সামরিক সমাবেশ থেকে আর একটায়? ওকে চুমু খেতে ইচ্ছে হল আনের, কিন্তু সংযত করল নিজেকে। ইস্কুলের খাতাগুলো দেখতে বসল সে। নিঃশব্দতাটা পীড়াদায়ক; এর চেয়ে রেডিওর চিৎকার অনেক ভাল; কিন্তু রেডিওটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক সপ্তাহের জন্যে? এক বছরের জন্যে? মনটাকে গুছিয়ে নিয়ে খাতার পাতায় ছেলেমানুষি লেখাগুলোয় মন বসাতে বৃথাই চেষ্টা করল সে। দশ-বারোবার পড়ল: 'ফন্তেনেতে আমার কাকার কতকগুলো খরগোস আর একটা গরু আছে।' একটা কামনা জাগল তার মনে—গাছপালায় ছাওয়া গোয়ালঘর আর শান্ত অচঞ্চল জীবনের জন্যে—যে জীবনে তাড়াহুড়ো নেই, অপেক্ষা করা নেই, কোন ভাবনা নেই।

গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা, রাত্রি জেগে কাজ আর সভা করার ফলে পিয়ের অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। খবরের কাগজের ধূসর পাতাটার ওপর এলিয়ে পড়েছে তার অকালপক্ক চুলে ভরা কালো মাথাটা। ওর নিয়মিত নিশ্বাসপতনের শব্দ একটা শান্ত প্রভাব বিস্তার করল আনের মনে: এখন তবু জীবনটা খানিকটা মনের মত হয়ে উঠছে। তারপর পেন্সিলটা ভেঙে যাওয়ায় উঠে পড়ল আনে, আর পিয়েরের মুখের দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—কেমন যেন মড়ার মুখের মত রক্তহীন, কঠিন দেখাচ্ছে পিয়েরের মুখ, যেন জমে শক্ত হয়ে গেছে। আনের চিৎকারে জেগে উঠে ঘুমভরা গলায় 'অ্যাঁ?' বলেই পিয়ের আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

১৬

সৈন্য-সমাবেশের হুকুম জারী হওয়ায় লুসিয়ঁ ভারী স্বস্তি পেয়েছিল; গ্রীষ্মকাল থেকেই ভয়ানক বিশ্রী রকম কাটছে তার দিন। যা ভয় করেছিল ঠিক তাই ঘটে গেছে: বাবার সঙ্গে তার ভিন্ন হয়ে

বাবার গুজবটা জোলিওর কানে পৌচেছে; ভোঁতা-বুদ্ধি বেঁটেখাটো এই সম্পাদকটি লুসিয়ঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্যে তাকে অনেকদিন থেকেই অপছন্দ করত, ঘোড়দৌড়ের স্তম্ভটা জোলিও এখন তার ভাগ্নেকে দিয়ে দিল। লুসিয়ঁর অন্য কোন রোজগারের উপায় জানা নেই। খিদে সয়ে থাকা, ময়লা জামা পরা আর বিনা-সিগারেটে সন্ধ্যা কাটানোয় অভ্যস্ত হয়ে উঠল সে। নিয়মিত বিল শুধে উঠতে পারে না বলে হোটেলের কর্তা লুসিয়ঁর দিকে আড়চোখে তাকায়; নিজের টাকার অভাবটা তাকে জানতে না দেবার জন্যে লুসিয়ঁ খাওয়ার সময় হোটেল থেকে বেরিয়ে যায়। রাস্তার গরমে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়; বারান্দায় বসে লোকে খাওয়া-দাওয়া করছে—দেখে দেখে ভারী বিরক্ত হয় লুসিয়ঁ; ওরা খাবারের তালিকাটা খুঁটিয়ে বিচার করছে কি খাবে তাই পছন্দ করার জন্যে, এটা ওটার গন্ধ শুঁকছে, সোরগোল করছে, আর হাসছে। খাবারের গন্ধে গা ঘুলিয়ে ওঠে তার। তারপর হঠাৎ দেখা পেয়ে যায় কোন বন্ধুবান্ধবের—কোন সাহিত্যিক কিংবা মেজোঁ-দ্য-কুলতুরের কোন সভ্য, ব্রতৈলের দলের কেউ কিংবা জুয়োর আড্ডায় পরিচিত কোন লোক। লুসিয়ঁ চট্‌ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেলে: বাড়ীতে টাকার থলিটা ফেলে এসেছে, কিংবা ইজিপ্‌শিয়ান পাউণ্ড বদ্‌লে নিতে বড় অসুবিধা ছিল আজ—বলেই জোর করে হাসতে হাসতে চেয়ে নেয় পাঁচশো ফ্রাঁ, আর অল্পক্ষণের মধ্যেই উড়িয়ে দেয় টাকাটা।

একদিন মার কাছ থেকে এক চিঠি পেল সে: শরীর তাঁর আরো খারাপ হয়ে গেছে, অনুনয় করেছেন লুসিয়ঁ যেন তার বাবার সঙ্গে একটা মিটমাট করে ফেলে। মুহূর্তের জন্যে মায়ের প্রতি গভীর করুণায় ভরে উঠল তার মন: মনে পড়ল ছেলেবেলায় হাম জ্বরে ভোগার কথা, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ওপরেও করুণা জাগল। হয়ত মায়ের কথা মত চললে শেষ পর্যন্ত ভালই হবে। না খেয়ে থাকা আর টাকা ধার করা তো যথেষ্ট হল! এমন কি, চিঠিখানার উত্তর দেবার জন্যে সে একটা কাগজ নিয়েও বসল, কিন্তু দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল কাগজটা। না, না! ওখানে অবশ্য পরিষ্কার বিছানা আর তিন পর্বের আহার পাওয়া যাবে কিন্তু সেটুকুর জন্যে নিজেকে ছোট করতে যাবে না সে। ব্রতৈলকে বিশ্বাস করে ভুল করেছে সে, কিন্তু এই ভুলের মধ্যে কোন অসাধুতা নেই। আর তার বাবার মন ভারী প্যাঁচালো আর বিবেকহীন। তাছাড়া ভারী একঘেয়ে ওখানকার জীবন—আবার গিয়ে সেই বক্তৃতা শোনা: 'কাজ করো, তাহলেই সব পাবে। এই আমি তো আর ওমনিই মন্ত্রী হয়ে উঠিনি।'

লুসিয়ঁর মাঝে মাঝে মনে পড়ে মুশের কথা আর তাদের মিলনের সেই শেষ সন্ধ্যায় তার আবেগের কথা। স্বীকার না করলেও মুশ সম্বন্ধে একটা অনুশোচনার ভাব আছে তার মনে, যদিও এসব মনোভাবকে সে 'আবেগের উচ্ছ্বাস' বলে উড়িয়ে দেয়। মুশ তাকে কয়েকবার চিঠি লিখেছে: তার ক্ষমা চেয়ে অনুনয় করেছে আর জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বলে জানিয়েছে। বেদনার সঙ্গে ভ্রূকুটি করে লুসিয়ঁ বেগুনী রঙের কাগজে লেখা সেই চিঠিগুলো ছোট ছোট টুকরোয় ছিঁড়ে ফেলেছে, ইদানীং সে আর মুশের চিঠি খোলে না; কি লাভ পড়ে? মুশকে সাহায্য করবার নেই কিছু। নিজেই সে যথেষ্ট দুঃখী। সংসারে এতটুকু দরদ নেই: আঁরি মরে গেছে, জিনেৎ তাকে ছেড়ে চলে গেছে, আর ব্রতৈলকে একটা হীন ষড়যন্ত্রকারী বলে জানা গেছে।

ব্রতৈলের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর লুসিয়ঁ রাজনীতির প্রতি একেবারে নিরাসক্ত হয়ে পড়েছে; এমন কি, খবরের কাগজের দিকেও সে আর তাকায় না। জগত-জোড়া ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো তার কাছে ক্লান্তিকর আর নোংরা বলে মনে হয়—তার বাবার কাগজের ফাইলগুলো, ব্রতৈলের বাড়ী কিংবা জনৈক কিলমানের ঘাড়ের মতই। রাস্তায় কিংবা কাফেতে হিটলার বা যুদ্ধের কথা শুনে হাই তোলে লুসিয়ঁ: স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তার বাবা ফুজের সঙ্গে বোঝাপড়ায় লেগেছেন। তারপরে হঠাৎ একদিন ফৌজে যোগ দেবার জন্যে তার ডাক পড়ল। মনে পড়ল সালামাঙ্কার কথা, উদ্ভ্রান্ত সৈন্যসমাবেশ আর যুদ্ধ-সীমান্ত থেকে ফিরে ফ্যালাঞ্জিস্ট্‌দের মদ খাওয়ার প্রতিযোগিতার কথা ভেবে খুশি হয়ে উঠল সে।

দিনকতক বাদে অবশ্য মিউনিক চুক্তি ঘোষিত হল। নিজেকে বিদ্রূপ করল লুসিয়ঁ: আবার ওরা তাকে বোকা বানিয়েছে। পারীর ট্যাঙ্ক-চলা রাস্তায় রাস্তায় নিষ্প্রদীপ আর সৈন্যসমাবেশের মধ্যে সেও লক্ষ লক্ষ হাঁদারামের ভীড়ে জুটে গিয়েছিল। কিন্তু তার বাবা এদিকে ব্যাপারটাকে কাজে লাগিয়েছেন চেম্বারে ভোট সংগ্রহের উপলক্ষ হিসেবে,—অসুস্থ লোকের মত ঘন ঘন হাই তুলল লুসিয়ঁ: এখন আবার তাকে বেরুতে হবে টাকা যোগাড়ের চেষ্টায়, বিল না শোধার জন্যে হোটেলওলাটা আবার গজ্‌গজ্‌ করতে থাকবে, আর তার নিজের ক্রুদ্ধ দাড়ি-গজিয়ে-ওঠা মুখখানা প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে দোকানের জানলাগুলোয়।

কিন্তু ভাগ্য দয়া করল তার ওপর। মাদলেনের কাছে দেখা পেয়ে গেল তার ভূতপূর্ব প্রকাশক গতিএ-র। অন্য যে কোন দিন হলে গতিএ তাকে দ্রুত এড়িয়ে যেত, কিন্তু আজ গতিএ ভারী খোশমেজাজে আছে: সেদিন সকালেই সে মরতে চলেছে ভেবে তিন বছরের মেয়ের দোলনার কাছে গিয়ে অশ্রুপাত করেছে; তারপর অতি অকস্মাৎ 'লা ভোয়া নুভেল্'এর বিশেষ সংস্করণটা যেন তাকে তার হৃত জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে। গতিএ যে কেবল লুসিয়ঁকেই চুমু খেতে প্রস্তুত আছে তাই নয়—পারলে সে যেন খবরের কাগজওলাকে আর পুলিশটাকেও চুমু খায়। লুসিয়ঁর শুকনো দাড়ি-গজানো মুখ আর ময়লা পোষাক দেখে সে ধরেই নিল যে এই ক-দিনের অস্বাভাবিক অবস্থার জের ওটা।

'আমার তো বিশ্বাসই হতে চায় না,' চেঁচিয়ে উঠল গতিএ, 'বুঝতে পারছ, ভাগ্যটা কত ভাল? গতকাল আমার কোলমার-এ যাবার কথা ছিল, গোলন্দাজ বাহিনীর সার্জেণ্ট হয়েছিলাম কিনা! আর এখন...' দম নেবার জন্যে থেমে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার খবর কি?'

'আমার? পদাতিক বাহিনী। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার।'

'বলো কি হে! খুশি হওনি তুমি? হাঁদা কোথাকার!'

'সত্যি বলতে কি, আমার কাছে ও সবই সমান।'

'উঁচ্ কপালে! না, দাঁড়াও বলছি, স্নায়বিক ব্যাধিতে ভুগছ তুমি.' লুসিয়ঁর মনে পড়ল, টাকা চাই! রহস্যজনকভাবে সে হেসে বলল:

'তাছাড়া ভারী বিশ্রী একটা অবস্থায় পড়েছি আমি। একজন অভিনেত্রীকে নিয়ে ক্রভিল্-এ গিয়েছিলাম, এমন সময়ে এই সব হৈ চৈ শুরু হল। আমি যে ভাবেই হোক জানতাম, যুদ্ধ টুদ্ধ হবে না। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে এই সামরিক ব্যবস্থা জারী হল, আর আমিও মেয়েটিকে ওখানেই রেখে আসতে বাধ্য হলাম। কিন্তু এখন আবার ক্রভিল্ গিয়ে ওকে নিয়ে আসতে হবে। ওরা আমায় ছুটি দিয়েছে, কিন্তু ভারী গণ্ডগোলের মধ্যে পড়ে গেছি। ব্যাঙ্কগুলো সব বন্ধ। কাল পর্যন্ত ফেলে রাখতে চাই না কাজটা। অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব, যদি তুমি আমায় সাহায্য করো, কিন্তু তোমার অসুবিধা হলে...'

'না, না, মোটেই না!...'

থলিটা খুলে হাজার ফ্রাঁর একটা নোট বের করে দিল গতিএ। হাসল লুসিয়ঁ: গতিএ কী ভয়ানক কৃপণ তা সে জানে। বই বিক্রির টাকা থেকে তার প্রাপ্য

অতি কষ্টে আদায় করতে হত তাকে। আর এখন কিনা হাজার ফ্রাঁ দিচ্ছে সে —লুসিয়ঁ বড় জোর দুশো আশা করেছিল। গতিএ চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও! তোমাকে অমনি ছেড়ে দিচ্ছি না আমি। তোমার ট্রেন কখন? অনেক সময় আছে।'

একটা মদের দোকানে গিয়ে তারা দুজনে গেলাশ দুয়েক মদ খেল। খুশিভরা একটা তৃপ্তির ভাব জাগল লুসিয়ঁর মনে। গতিএ-র কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটা ট্যাক্সি চেপে এল মঁপারনাস্-এ। বিরাট একটা রেস্তোরাঁর তেতলায় উঠে এল। একটা আয়নায় নিজের চেহারার দিকে তাকিয়ে অমায়িকভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে ভাবল: আজকালকার দিনে দাড়ি-না-কামানো চেহারা আর নোংরা পোষাক তো হতেই পাবে যে কোন লোকের, কিন্তু রূপ কখনো ম্লান হয় না; কোট-টুপি জিম্মা রাখার ঘরের এই পরিচারিকাটি নিশ্চয়ই তাকে মনে মনে তারিফ করছে।

ফলাও আহারের হুকুম দিল—নিজের গল্প বানাবার কুশলতায় আর খামখেয়ালী স্বভাবে ভারী আনন্দ পায় লুসিয়ঁ। আসলে তার ভয়ানক খিদে পেয়েছে, টেবিলের ওপর রাখা রুটিটা এক গ্রাসে শেষ করে দেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে, কিন্তু তা না করে অত্যন্ত আয়েসী ঢঙে হোটেলের ওয়েটারটাকে বলল, 'এটার পরে, মুরগীর কোর্মা এনো দয়া করে, অবশ্য যদি ধানী মুরগী হয়...'

চারদিকেই লোকে উৎসব করছে। সামরিক বয়সের লোক যারা, তাদের কেন্দ্র করেই আসর জমেছে; ক্লান্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে ওদের, যেন এইমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে। কেউ কেউ সামরিক উর্দি পরা, প্রায় সকলের দাড়ি-না-কামানো মুখ; ওরা ইচ্ছে করে স্থূল ভাষায় কথা কইছে আর কথায় কথায় দিব্যি দিচ্ছে। মেয়েরা ওদের ঘিরে অনর্গল কথা বলছে—কেউ বা ধর্ম-মা কেউ বা ধর্ম-বোন, আর না হয় বীরের আশায় বহু-প্রতীক্ষিতা বিশ্বস্ত প্রণয়িনী। মোটা কাগজের ঠুলি পরানো বাতিদানের মৃদু আলোয় রঙের ছোঁয়াচ লেগেছে সব কিছুতে। ট্যাঙ্গো-নাচের চটুল সুরে গাওয়া হচ্ছে স্বর্গ পুনরধিকারের কাহিনী। শ্যাম্পেন-বোতলের ছিপি খোলার শব্দ উঠছে, মদের গেলাশে গেলাশ ঠেকানোর টুং টাং আওয়াজ করে উৎসব-মুখর নরনারীর দল পরস্পরের শুভকামনা করছে 'শান্তির উদ্দেশে!' কে একজন কয়েক বোতল মদ শেষ করার পর জোলিওর উদ্দীপ্ত বাণী স্মরণ করে চেঁচিয়ে উঠল, 'বিজয়ের উদ্দেশে!'

এক বোতল শাঁবেরঙ্যা-মদ খাওয়ার পর লুসিয়ঁর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। আর সে কিলমান বা হোটেলওলা বা নিজের লজ্জাকর অস্তিত্বের কথা ভাবছে না। আবার সে যেন হয়ে উঠেছে বিখ্যাত লেখক, সুর্‌রিয়ালিস্টদের বন্ধু, শৌখিন এক ব্যবহারজীবীর ছেলে, সুন্দরী এক অভিনেত্রীর প্রণয়ী ; আবার সে যেন বেঁচে উঠেছে।

আরও অনেকের মতই লুসিয়ঁও দিনের ঘটনা আর রাতের পানোন্মত্ততার ফলে সময়ের অভিজ্ঞান থেকে মুক্তি পেল। আশেপাশের লোকজন সবাই আজকের এই সন্ধ্যাটির অসাধারণত্ব আর গতানুগতিক কর্মমুখর দিনগুলির থেকে এর বিভিন্নতাটুকু বুঝে নিয়েছে। গ্যিইও যখন তার কাছে এসে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আজকাল আর আমার ছবির দোকানে আসো না কেন? একটা মুক্তো কুড়িয়ে পেয়েছি হে ছোকরা, খাঁটি মুক্তো!'—তখন লুসিয়ঁ মোটেই বিস্মিত হল না। একটা ছবির দোকানের মালিক এই গ্যিইও, লুসিয়ঁর সঙ্গে তার তিন বছর দেখা হয়নি।

গ্যিইওর অবস্থা টলটলায়মান ; গোল, লাল মুখখানা তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ; বুকে গোঁজা একটা শাদা মোমের পাঁপড়ি-ভাঙা ক্যামেলিয়া ; লুসিয়ঁকে সে টেনে নিয়ে গিয়ে বসাল নিজের টেবিলে। লুসিয়ঁরও ওর সঙ্গে গিয়ে বসার আগ্রহ হয়েছে—ওর টেবিলে একটা মেয়েকে দেখে সে তৎক্ষণাৎ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। তন্বী মেয়েটির গাঢ় গায়ের রঙ, নিটোল মাথা, অল্প ভোঁতা নাক, অর্ধস্ফুট পুষ্ট ঠোঁট আর চীনেমাটির মত সবুজ চোখ। হেঁচকি টেনে টেনে গ্যিইও বলল, 'জুটে পড় আমাদের সঙ্গে। এই যে সেই মুক্তোটি স্বয়ং—জেনী, একজন শিল্পী। আর এ হচ্ছে আমাদের শ্রেষ্ঠ এক সাহিত্যিক—লুসিয়ঁ তেসা। ওর বাবার সঙ্গে ওকে গুলিয়ে ফেলো না যেন।'

হেসে ফেটে পড়ল লুসিয়ঁ, 'কি বক্‌বক্ করছ? মোটেই সাহিত্যিক নই আমি। আমি হচ্ছি ঘোড়ার বংশাবলী ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ।'

জেনী তাকাল লুসিয়ঁর দিকে, চোখের দৃষ্টি তার আবিষ্ট হয়ে উঠল। 'আপনার বই পড়েছি আমি, ওই যেটা মৃত্যুর সম্বন্ধে লেখা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার আপেক্ষায় ছিলাম আমি, বোগদাদের সেই পারসীক মালীটি যেমন ছিল মৃত্যুর অপেক্ষায়।'

মেয়েটির কথায় ইংরেজী উচ্চারণের ঢঙে কেমন একটা ছেলেমানুষি ভঙ্গী ফুটে উঠেছে। লুসিয়ঁ মনে মনে ভাবল, 'দু-এক গেলাশ টেনেছে, কিন্তু

কী রূপসী!' ওদের সঙ্গে বসে এক গেলাশ শ্যাম্পেন খেল লুসিয়ঁ, তারপর বলল :

'আমিও আপনার অপেক্ষায় ছিলাম, তবে আরও গল্পের ভাষায় বলি, আমার আগ্রহটা সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্তেই। আচ্ছা, পরিচয় তো হল, এবার একটু পান করা যাক।'

'আচ্ছা, তবে আমি শুধু হুইস্কি খাই।'

আমেরিকার কেন্‌টাকি প্রদেশের এক সব চেয়ে প্রাণহীন শহরে জেনী জন্মেছে আর বড় হয়ে উঠেছে। তার মেথডিস্ট্ বাবা ছিলেন কেরাসিন কাঠের ব্যবসাদার। ছেলেবেলা থেকেই জেনী ভয়ানক কল্পনাপ্রবণ : শেলী আর কীট্‌সের কবিতা উৎসাহের সঙ্গে পড়েছে, আর রোমান ক্যাথলিক হতে চেয়েছে ; নিগ্রোদের দুঃখকষ্ট নিয়ে কতকগুলো গল্প লিখেছিল ; আর একবার ইউরোপ-প্রত্যাগত প্রেসিডেণ্ট উইলসনকে অভ্যর্থনা করবার জন্তে পালিয়ে এসেছিল বাড়ী থেকে। তখন তার বয়স ষোল বছর। আঠারো বছর বয়সে এক ভবঘুরে আলোক-চিত্রশিল্পীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়—সে জেনীকে হলিউডে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যেই ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়, কিন্তু তাই বলে জেনীর হলিউডে আসা আটকায়নি ; সিনেমা-তারকা হতে চেয়েছিল সে। ওখানে এসে তার দারিদ্র্য আর অপমানের সঙ্গে পরিচয় হল। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ আর সহকারী পরিচালকরা অত্যন্ত ব্যবসাদারী ভঙ্গীতে বলত, 'একদিন একসঙ্গে নৈশ-ভোজন করা যাক, তারপর না হয়...' জেনী অত্যন্ত ঘৃণার সঙ্গে এই সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তারপর সে ছবি আঁকা ধরল : খালি পেটে থেকে দৃশ্যচিত্র আঁকত—লালচে পিঙ্গল মাটির বুকে ফণিমনসার ঝাড় আর বহুবর্ণের বাড়ীঘর। ছবি আঁকার ব্যাপারে জেনীর কৃতিত্ব আছে কিন্তু রুচির বালাই নেই ; আসলে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু স্থূল আর উচ্চকিত, তাই তার ভাল লাগে। হঠাৎ তার ভাগ্য খুলে গেল : লস্ এঞ্জেল্‌স্-এর এক বিমান-কারখানার ইঞ্জিনীয়ার তার প্রেমে পড়ল, জেনীরও তাকে পছন্দ হল, ফলে বিয়ে হয়ে গেল ওদের। দারিদ্র্য থেকে ঐশ্বর্যের মধ্যে এসে পড়ল জেনী। পারিবারিক জীবনে এই ইঞ্জিনীয়ারটি একটু ভোঁতা স্বভাবের হলেও তার ব্যবহার ছিল দরদ-মেশানো আর ভদ্র। জেনী মনে মনে ভাবত, 'খাঁটি প্রেম যে এই রকম, তা তো জানতাম না।' দু বছর বাদে একটা বিমান-দুর্ঘটনায়

তার স্বামী মারা গেল। ছ শিশি সেঁকো-বিষ খেয়ে ফেলল জেনী; ডাক্তাররা বাঁচিয়ে তুলল তাকে। একটা বিলে ঝাঁপ দিল; পাঁচজনে ধরে জল থেকে তুলে ফেলল তাকে। কয়েক মাস একটা অন্ধকার ঘরে প্রায় সমস্তক্ষণ বসে রইল। তারপর আবার উজ্জীবিত হয়ে উঠল—জানতে পারল স্বামী তার জন্যে প্রচুর টাকা রেখে গেছে। ইউরোপ-যাত্রায় জাহাজে চাপল আর দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে বেড়াল যাদুঘরে আর নৈশ-ক্লাবে। অনেক বেপরোয়া রোমাঞ্চ-সন্ধানীর সঙ্গে জেনীর প্রণয়ব্যাপার ঘটেছে—'খাঁটি প্রেম' কি রকম তা জানবার ভারী আগ্রহ তার। বিভিন্ন শিল্প-বিদ্যালয়ে সে স্কুলের মেয়ের মতই নিয়মিত যাতায়াত করেছে। তারপর স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেছে পারীর এই মঁপারনাস্ অঞ্চলে, যেখানে বদমেজাজী মার্কিনরা এসে হুইস্কি খায় আর ইউরোপ-আমেরিকার প্রাচীন আর নয়া জগত নিয়ে হাসিঠাট্টা করে। জেনীও মদ খেতে খেতে এই সব হাসিঠাট্টায় যোগ দেয়।

লুসিয়ঁর চেয়ে সে এক বছরের বড়, কিন্তু লুসিয়ঁকে ধরে নিল নেহাৎ ছোট ছেলে বলে। আর একবার জিতল লুসিয়ঁ: তার উজ্জ্বল চোখ, বাদামী চুল আর কথাবার্তার মধ্যে বিষণ্ণ দুঃখবাদ জেনীকে এত আকৃষ্ট করল যে সে গ্যিইওর বকবকানিতে কান না দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল লুসিয়ঁর দিকে। এমন কি জেনী নাচতেও চাইল না। বড় প্রগাঢ় অনুভূতি এটা; লুসিয়ঁও সাড়া দিল—ভাবল প্রেমে পড়ে গেছে সে।

ছুরি দিয়ে গেলাশটা ঠুকতে ঠুকতে গ্যিইও বলল, 'আমি একটা 'স্বাস্থ্য-পানের' প্রস্তাব করছি। লুসিয়ঁ পদাতিক বাহিনীতে, আমি বিমান বিধ্বংসী বাহিনীতে, শার্ল বৈমানিক, দ্যুর্ম ওই পদাতিক বাহিনীতেই একজন ক্যাপ্টেন। আমরা এই কজনেই হয়ত আজ থেকে একমাস বাদে আলসাস্-এর মাঠে সার বনে যেতাম। কিন্তু বেঁচে আছি আমরা, বেঁচেই থাকব। এটা আমাদের একটা সত্যিকারের জয়লাভ—আমাদের রাষ্ট্রনীতিক আর লেখকদের জয়, পল ভালেরী আর দেরঁ্যার জয়, আঙুর ক্ষেতের চাষীদের, দর্জিদের আর দারোয়ান-চাপরাসীদের জয়। আমি অনুরোধ করছি, দারোয়ান-চাপরাসীদের অবজ্ঞা কোরো না—ওরাও প্রত্যেকে শান্তির স্বর্গদূত। আমি প্রস্তাব করছি, ফ্রান্সের এই যে সুন্দরতম বিজয়, এরই উদ্দেশ্যে আমরা পান করি এসো।'

জেনী হাততালি দিয়ে উঠল। তারপর লুসিয়ঁকে বলল, 'আমার ভালেরীর কবিতা ভাল লাগে না। এলুয়ারকে বেশী পছন্দ করি আমি। আপনি?

গ্যিইওর কথাগুলো শোনাল ঠিক উইলসনের মত, কিন্তু তখন ফরাসীরা ছিল উইলসনের বিরুদ্ধে। রাগ করবেন না। আমি রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু এত আনন্দ হচ্ছে আমার। ভাবতেও ভয়ানক মনে হয়, ওরা আপনাকে মেরে ফেলতে পারত!......'

হেসে উঠল লুসিয়ঁ।

'তার চেয়েও সহজ মনে হয়, আমাদের দেখা না হতেও পারত।' গ্যিইও চেঁচিয়ে ডাকল, 'বিল আনো!' টাকাটা লুসিয়ঁই দেবে বলে পীড়াপীড়ি করল; বুড়ো ওয়েটারটাকে একশো ফ্রাঁ বকশিশ ছুঁড়ে দিল। বুড়োটা হেসে বলল, 'ধন্যবাদ, মেজর মশাই।'

'ভুল হল। দ্বিতীয় দফার হাবিলদার মশাই।'

জেনীকে সে নীচু গলায় বলল, 'শেষবারের মত একবার পান করা যাক আপনার উদ্দেশে। সেই পারসীক মালীটি ভয়ে পালিয়ে আসে বোগদাদে। সেখানে এক পরমা সুন্দরীর সঙ্গে তার দেখা হয়। ওরকম কাউকে সে এর আগে দেখেনি......তারপর মৃত্যুকে সে হাঁকিয়ে দেয়।'

জেনী লুসিয়ঁর হাতটা চেপে ধরল।

বেরিয়ে এসে পাসি পর্যন্ত গাড়ী চেপে এল ওরা দুজনে। নিস্তব্ধ এক রাস্তার ওপর জেনীর বাড়ী। বাড়ীর পাশে মস্ত এক গাছের পাতাগুলো রাস্তার আলোয় অস্পষ্টভাবে কাঁপছে। জেনীর বিদায় নেবার ইচ্ছে হল, কিন্তু লুসিয়ঁ চলে এল হলঘরটার ভেতরে। অস্বস্তি বোধ করল জেনী, ছেলে-মানুষের মত অনুনয় জানাল, 'না, না,......'

জেনীর মনে হল, এই হচ্ছে খাঁটি প্রেম। এক মুহূর্তেই সমস্ত সুযোগ হারিয়ে বসবে ভয় হল। ওভারকোটটা না খুলেই লুসিয়ঁ একটা নীচু আরাম-কেদারায় বসে পড়ে চোখ বুজল। তার মুখে শ্রান্তি আর ক্লান্তির ভাব ফুটে উঠল। হঠাৎ শান্ত হয়ে উঠল জেনী:

'একটু কফি তৈরী করি, কেমন?'

কফি তৈরী করার যন্ত্রটা নিয়ে এসে কাঁচের গোল ঠুলির নীচে নীল আগুনের শিখা জ্বালিয়ে নিল। চোখ দুটো অল্প খুলে লুসিয়ঁ বলল:

'অ্যালকেমী......'

একটা বিশ্রামের ভাব জাগল তার মনে; কিছুই যেন চাইবার নেই; কড়া, মিষ্টি কফির আস্বাদটা তার কাছে চরম সুখ বলে মনে হল। অনর্গল

কথা বলে চলল জেনী: নৈঃশব্দ্যের প্রতি তার একটা প্রবৃত্তিগত ভয় আছে। যদিও তার জীবনে প্রেমের ব্যাপার বড় কম ঘটেনি, তবু তার ব্যবহারটা হয়ে উঠল অনভিজ্ঞ বালিকার মত।

'হলদে গোলাপ ভীষণ ভালবাসি আমি, সোনালী গোলাপ নয়, হলদে গোলাপ। মঁপারনাসে বর্মার দোকানে এক গাদা হলদে গোলাপ আছে। আশ্চর্য গন্ধ। যদি সত্যিই তুমি আমাকে খুশি করতে চাও তাহলে কিছু ওই গোলাপ এনে দিও......'

'পারব কিনা সন্দেহ।' আরাম-কেদারা থেকে বলে উঠল লুসিয়ঁ, 'সুড়ঙ্গ ট্রেনে ফিরবার ভাড়াটা পর্যন্ত আমার নেই...'

নিজের দারিদ্র্যের জন্যে লজ্জিত হল লুসিয়ঁ, এমন কি নিজের এই স্বীকারোক্তিতে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এখানে আসার উদ্দেশ্যটা ভাল করে জেনে শুনেই সে এসেছে। তারপরে যেন সব কিছু ঘুলিয়ে গেছে—কফি, জেনীর বসার সমুন্নত ভঙ্গী, শিল্প-প্রসঙ্গে আলোচনা, গ্রীস আর ফুল। তা ছাড়া, অত্যধিক মদ খাওয়ার ফলে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। তার গলার স্বর বহু দূর থেকে ভেসে আসছে বলে মনে হয়। জেনী ভাবল, ঠাট্টা করছে লুসিয়ঁ: তাদের রেস্তোরাঁয় খাওয়ার সমস্ত খরচ তো সে-ই দিয়েছে। হেসে জেনী বলল, 'এই রে! বেশী ফূর্তি লোটার এই ফল।'

চোখ মেলে তাকাল লুসিয়ঁ; জেনীর এই কৌতুকের বকুনিতে বিরক্ত হল সে।

'গতিএ নামে একজন লোকের টাকায় ওই ফূর্তিটুকু লুটেছি। এমন সুযোগ কদাচিৎ মেলে। সাধারণত অল্প স্বল্প টাকা ধার করে চালাই আমি—গোলাপ ফুল কেনার জন্যে নয়, শাক-রুটির জন্যে। ও তুমি বুঝবে না। ধনী মার্কিন তুমি। আমি একজন অতি সাধারণ বেকার। আমাদের শ্রেণী আলাদা।'

জেনীর প্রতি এমন কি একটা ঘৃণাও বোধ করল লুসিয়ঁ—ধনী ব্যক্তিকে দুস্থ লোকে যেমন ঘৃণা করে। জেনীর দিকে তাকাল না; বুঝতে পারল না যে ও কাঁদছে।

দারিদ্র্য কি তা জেনী ভাল করেই জানে, হলিউডের সেই দু বছর সে ভোলেনি—যখন খিদেয় মূর্ছা যাবার মত অবস্থাতেও সে বন্ধুবান্ধবদের বলত যে মোটা হবার ভয়ে সে খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে এক তাড়া নোট নিয়ে ফিরে এসে টাকাটা লুসিয়ঁর পকেটে গুঁজে দেবার চেষ্টা করতে লাগল:

'দয়া করে নাও এগুলো। আমি অনুনয় করছি।'

একটা কুৎসিত ভঙ্গীতে বিকৃত হয়ে গেল লুসিয়ঁর মুখ ; দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল নোটগুলো টেবিলের ওপর।

'এই জন্যে আসিনি আমি,' বলল সে।

যন্ত্রণাদায়কভাবে সে চেপে ধরল জেনীর কাঁধ। কোন বাসনা বা কামনা অনুভব করল না লুসিয়ঁ; নিজের উদ্দেশ্যের সাধুতাটুকু সে প্রমাণ করতে চায়। জেনী ভাবল, ধনবতী হবার জন্যে লুসিয়ঁ ক্ষমা করেছে তাকে, ভালবেসেছে ও ; আর ও দেরী সইতে চাচ্ছে না, পারছেও না...তারপর সে লুসিয়ঁকে আত্মদান করল বিনা দ্বিধায়, বিনা অনুশোচনায় ; অতল সাগরের প্রবাল-পাথারে ঝাঁপ দিল জেনী।

জেনী পরিশ্রান্ত একটা সুখানুভূতির মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। লুসিয়ঁর চোখে ঘুম এল না। তার গত ক-মাসের জীবন সে মনে মনে পর্যালোচনা করে চলল : কি করবার আছে তার? জোচ্চুরি করাই যাদের কাজ এই রকম কোন তুচ্ছ সংবাদপত্রে কাজ করবে? বাবার কাছে ফিরে গিয়ে নতি স্বীকার করবে? কারও যথাসর্বস্ব লুট করবে? জেনীর দিকে চোখ পড়তেই বেশ একটু বিস্মিত হল ; ওর কথা প্রায় ভুলে বসেছিল সে ; লুসিয়ঁ খুঁতখুঁতের মত মুখ বিকৃত করল। পাশবিক পরিতৃপ্তির একটা উষ্ণ ঘ্রাণ পাওয়া যাচ্ছে ওর গা থেকে। প্রথমটায় ভালেরী, শিল্পকলা আর হলদে গোলাপ সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবী-সুলভ কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে কাছে ঘেঁষতে না দেবার চেষ্টায় ছিল। কিন্তু এই ধরনের রোমাঞ্চকর ঘটনা কত ঘটে গেছে ওর জীবনে? ওকে জাগিয়ে তুলে গালাগাল দিতে আর মারতে ইচ্ছে হল লুসিয়ঁর। কিন্তু একটুও না নড়ে শুয়ে রইল নিজের জায়গায়। ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল, লুই-স্যাজের সময়কার অনুকরণে আসবাব, ওয়াত্তো-র আঁকা একটা ছবির পুনর্মুদ্রণ, লিলি ফুলে ভরা একটা পাত্র। আসবাব-পত্রে-সাজানো বাড়ী ভাড়া নিয়েছে জেনী ; সমস্ত জিনিসই অন্যের ; কিন্তু লুসিয়ঁর কাছে এগুলো ওর মধ্যবিত্ত পরিবেশের প্রতীক। আর একবার সে তাকাল জেনীর দিকে। সকালবেলার তীক্ষ্ণ আলোয় বয়সের চিহ্ন ধরা পড়ল জেনীর মুখে ; ওর গায়ের চামড়াটা অত্যধিক কোমল, জীর্ণ হয়ে আসা ফুলের মত ভাঁজ বসে যায় তাতে। একটা হাই তুলে লুসিয়ঁ এ পর্যন্ত যত মেয়েকে ভালবেসেছে তার একটা সংখ্যা গুনতে লাগল। কুড়িটা পর্যন্ত গুনে সব ঘুলিয়ে ফেলল—তুটো মার্গো ছিল। দ্বিতীয়টাকে ধরেনি, না কি ধরেছে? রূপোলী চুল ছিল তার—চুলের রঙটা ওইভাবে কলপ করে নিয়েছিল বললেই ঠিক হয়—জনৈক সংগীত-শিক্ষকের মেয়ে।

নিজের চিন্তায় ছেদ টানল সে : কী অসহ্য নীচতা এসব! অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে নিঃশব্দে পোষাক পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে যাবে, এমন সময় জেনী জেগে উঠল; তখনো হাসছে জেনী, স্বপ্নময় হয়ে আছে তার মুখ চোখ। তারপর লুসিয়ঁকে দেখতে পেল সে।

'পোষাক পরেছো কেন?' কাঁপা গলায় শুধোল জেনী।

'যাবার সময় হয়েছে।'

'লুসিয়ঁ......'

কৃত্রিম ভঙ্গীতে হেসে উঠল লুসিয়ঁ :

'গ্যিইও মদ খেয়েছে বিজয়ের উদ্দেশ্যে। আসলে জিত হয়েছে জার্মানদের। একথা শিশুরাও বোঝে। কিন্তু মদ খেতে গেলে মিথ্যা বলতেই হয়। এখন তো আর আমরা মদ খাচ্ছি না। কাল তুমি ছিলে বড় সুন্দরী, তাই না? কিন্তু এখন দেখছি মার্কিন দেশের খুড়ীমা তুমি, মোটেই খুকিটি নও, আমিও পারসীক মালী নই, আমি হচ্ছি 'হুলো বেড়াল'। 'হুলো বেড়াল' কাকে বলে জানো না বোধ হয়? পল ভালেরীর ভাষায় ও কথাটার মানে— 'গণিকার অন্নদাস।'

কিছুই বুঝল না জেনী; কান্নায় ভেঙে পড়ে লুসিয়ঁর পা দুটো চেপে ধরল।

'আজ বিকেলে আবার আসতেই হবে তোমায়! কথা দাও!'

লুসিয়ঁর মধ্যে কিছু যেন একটা লোপ পেল—ভেঙে পড়ল তার শেষ অভিমান, নিঃশেষ হয়ে গেল তার আত্মিক পবিত্রতার অবশিষ্টাংশটুকু। টেবিলের ওপর দুমড়ানো নোটের তাড়াটার দিকে তাকালো একবার : হালকা গোলাপী রঙের হাজার ফ্রাঁর নোট। অন্তত দশ হাজার ফ্রাঁ আছে ওতে। টাকাটা পকেটে পুরে নির্বিকারভাবে বলল :

'আচ্ছা, আসব। আজ আসতে পারব না হয়ত; কাল কিংবা পরশু।'

সকালটা আশ্চর্য সুন্দর, পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। লুক্সেম্বুর্গ্ বীথি পর্যন্ত হেঁটে এল লুসিয়ঁ। তাকিয়ে দেখল গাছের পাতাগুলোর রঙ—তামাটে, সোনালী আর লাল, কোন ধ্বংসপুরীর যেন ইতস্তত ছড়ানো ঐশ্বর্য। বাগানের ভেতরটায় সেই চিরাচরিত জীবনের চিহ্ন। এত সকালেও মায়েরা আর ধাত্রীরা ঠেলে নিয়ে এসেছে তাদের দোলনা-গাড়ীগুলো; বিবর্ণ বাদামী বালুকাস্তূপের ওপর শিশুরা খেলে বেড়াচ্ছে; ছেলেরা নৌকা ভাসাচ্ছে পুকুরে। বুড়ো আমানত-মালিক আর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা রোদ পোয়াতে

পোয়াতে খবরের কাগজ পড়ছে। চড়ুই পাখী লাফালাফি করছে ঘাসে ঘাসে। ওপরের দিকে তাকিয়ে ভেরলেন-এর মাথাটা দেখতে পেল লুসিয়ঁ : কবিকে দেখে মনে হয় যেন কোন বুড়ো রাখাল ; কালো কালো ছাপ পড়েছে পাথরের গায়—ভেরলেন কাঁদছিলেন। আপনার থেকেই কবিতার এক পংক্তি আবৃত্তি করল লুসিয়ঁ : 'শান্ত সহজ জীবনখানি... ।' এ হেন জীবন কেন সম্ভব হল না তার পক্ষে? শান্ত আর সহজ জীবন—কাজকর্ম করো, শাদাসিধে খাও, ছেলেপুলে আদর কর আর এই বাগানে বেড়াও।

আশেপাশের লোকজন বলাবলি করছে, 'চেম্বারলেন বিশ বছরের মত শান্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'আরে বাপু, আমি বিশ বছরের স্বপ্ন দেখতে চাই না। যদি মোটে দশ বছরও হয়......'

যে বলছিল তার দিকে চেয়ে দেখল লুসিয়ঁ : অন্তত সত্তর বছর বয়স লোকটার। দশ বছরের মত শান্তি চায় ও কিসের জন্যে? বিড় বিড় করে বলল সে : 'কক্ষনো না!' বুড়োটা বিরক্ত হয়ে চোখ পিটপিট করে তাকাতেই লুসিয়ঁ দাঁড়িয়ে উঠে হাই তুলল। কি করবার আছে তার? তারপর হঠাৎ মনে পড়ল টাকার কথাটা। রাত্রিটাকে কি রকম অবাস্তব বলে মনে হল। সন্দেহ জাগায় একবার হাতড়ে নিল পকেটটা : মচ্ মচ্ শব্দ করে উঠল নোটগুলো...। তারপর এক মোটরে চেপে এল র্যু পিরামিদ্-এ এক ইংরেজ দর্জির দোকানে : স্কট্ল্যাণ্ডে তৈরী সবুজ রঙের টুইড কাপড়ের একপ্রস্থ পোষাক বানিয়ে নিতে চায় সে।

১৭

অনেকদিন বাদে দেনিস মিশোর কাছ থেকে চিঠি পেল।

প্রিয় দেনিস!

এখান থেকে দুবার চিঠি দিয়েছি তোমায়, কিন্তু চিঠিগুলো তোমার হাতে পৌঁছয়নি বলে মনে হচ্ছে—একবার ওরা ডাকের গাড়ীটা পুড়িয়ে দেয়, অন্য চিঠিখানা এক ঘর-ফেরতা সার্ব কমরেডের মারফৎ পাঠিয়েছিলাম। শোনা গেল, কমরেডটি সেরবের-এ ধরা পড়েছে। আমরা এদিকে বেশ একটু ব্যতিব্যস্ত আছি। চিঠি লেখার একটুও ফুরসৎ নেই! আপাতত

ফ্রন্ট থেকে দশ মাইল দূরে আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি। আজ সকালে খানিকটা জল এনে দিল এরা। দিব্যি স্নান করে নেওয়া গেল, আর খানিকক্ষণ আড্ডা দিয়ে নেওয়া যাচ্ছে আর কি। শুধু তামাকের অভাবে ভারী অসুবিধা হয়, মাঝে মাঝে রাত্রিতে ধূমপানের তৃষ্ণায় মাথা খারাপ হয়ে যায় আমাদের। যা পারো পাঠিও। সবই আমাদের লোকদের জন্তেই।

কাল আমরা আর একবার ফ্যাশিস্টদের আক্রমণ ঠেকিয়ে দিয়েছি— এই নিয়ে আমরা আটবার রুখলাম ওদের। আমাদের এব্রো-নদী পেরিয়ে আসবার পর থেকে ওরা আর থামেনি। নিজেদের ফৌজের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার জন্তে ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। কি করে আমরা নদীটা পার হলাম, সে গল্প একদিন শোনাব তোমায়। অত্যন্ত খরস্রোতা এই নদীটা, জলের বুকে ঘূর্ণি লেগেই আছে। দেশে এমন নদী দেখিনি আমি। সারারাত্রি মার্চ করে এসেছি। এই স্প্যানিয়ার্ডরা ভারী সাহসী। এখানে পৌঁছে এদের মধ্যে সব কিছুরই অভাব দেখেছিলাম। খেতে যাবার সময় সবাই নিজের নিজের মোহড়া ছেড়ে চলে যেত। বিশৃঙ্খলা হয়ে উঠেছিল অবর্ণনীয়। চারদিকেই বিশ্বাসঘাতকের দল। এখন এটা সত্যিকারের ফৌজ হয়ে উঠেছে। আর, মনের জোর কমেনি এতটুকু। ক্লিস্ অধিকার করে নিয়ে আমরা 'ইণ্টারন্যাশনাল' গান জুড়ে দিলাম। স্প্যানিশ ছেলেরাও তাদের নিজেদের ভাষায় গাইতে গাইতে বাঁ দিকে চালাল আক্রমণটা। এরা সবাই অল্পবয়সী চাষীর ছেলে।

আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্তে ফ্যাশিস্টরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। ওদের বৈমানিকেরা সব জার্মান। এব্রোর সমস্ত মাছ মেরে ফেলেছে ওরা। চারদিকে বোমা পড়েছে, তারই মধ্যে নৌকোর সাঁকোটা তৈরী করে নেওয়া হল। আমরা ৫৪৪ নম্বর মোহড়াটা রুখেছি সাত সপ্তাহ ধরে। ওদের বোমারু হাওয়াই-জাহাজগুলো মাথার ওপর সারাদিন ধরে উড়ছে। আমরা ওগুলোকে বলি, 'রামপাখী'। টন-টন বোমা ফেলেছে ওরা। তাছাড়া আছে গোলন্দাজ ফৌজ। কাল ওরা সিদ্ধান্ত করেছিল— আমাদের আর কেউ বেঁচে নেই, আসলে কিন্তু আমাদের মোটে চারজন মারা গেছে। কারপিনোর জন্তে বড় দুঃখ হয়। তুলুজ থেকে এসেছিল ও, চমৎকার ছেলে, ভারী হাসিখুশি। একদিন আমরা স্পেনীয়দের জন্তে একটু আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করেছিলাম, কারপিনোকে প্রধানা-নর্তকী

সেজে 'লাকমে'র সুর ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকতে দেখে সবাই তো হেসে গড়াগড়ি। ভারী সাহসী ছিল ছেলেটি। শত্রু-পরিখার পেছনে এক অভিযানে গিয়ে তিনটে ইতালীয়ানকে ধরে এনেছিল।

বিকেলের দিকে আক্রমণ চালাল ফ্যাশিস্টরা। সূর্য ডুবছে ততক্ষণে! অদ্ভুত এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য—চাঁদের মরা পাহাড়ের ছবির মত দেখতে। গাছপালা চোখে পড়ে না একটাও, পৃথিবীটাকে যেন ভেতর দিক থেকে বাইরে টেনে উলটে নেওয়া হয়েছে। হামলা শুরু করবার আগে ওরা দু ঘণ্টা ধরে গোলা ছোঁড়ে। ওদের কতগুলো কামান-বাহিনী আছে জানতে পারলে বেশ হত! আমরা ওদের প্রায় একশো গজ এগিয়ে আসতে দিলাম, তারপর মেশিন-গান ছুটিয়ে দিলাম ওদের ওপর। উলটো মুখে পাক খেয়ে গড়িয়ে গেল ওরা, ঠিক তাই! ওরা পেলেতিএকে জখম করেছে, ও একজন বেলজিয়ান। আমি ওর জখম বেঁধে দিলাম, আর ও চেঁচিয়ে উঠল: 'ওদের ভাগিয়ে দিয়েছি তো? সাবাস!'

দেখতে পাচ্ছ, আমাদের মনের জোর মোটেই কমেনি, অবশ্য সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত। আর ওই তো বললাম, তামাক খেতে পাই না একবারও। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। আসল কথা, আমরা প্রতিরোধ করেছি।

ওরা যে ভ্যালেন্সিয়ার দিকে এগোয়নি, এটা একটা তার কারণ। ওদের ফৌজ ঢের শক্তিশালী, ওদের বিমান-বাহিনী আমাদের দশগুণ। অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা বুঝতে পারছি 'নিষ্ক্রিয় নীতি'র ফলাফল। ব্লুম আর ভীইয়ারকে চিনে নিয়েছে আমাদের সবাই, ওদের উদ্দেশ্যে গাল পেড়ে বলে, 'আর এই ভীইয়ারটা...'। ফ্যাশিস্টদের পদাতিক ফৌজ অনেক আছে, বেশ ভাল যোদ্ধাও বটে—গুয়াদালাজারার ইতালীয়ান ভাড়াটে সৈনিকদের মত নয়, মূর কিংবা নাভারীজ সৈনিকদের মত! কিন্তু আমরা ওদের রুখতে পারব বলে মনে হয়। শুধু অল্প কিছুদিন থেকে আমাদের লোকেরা নিরুৎসাহ হয়ে পড়ছে। এটা হচ্ছে আমাদের দেশের লোকের জন্যে। খবরের কাগজ খুলে আর একটা আত্মসমর্পণের কথা পড়ে ভয়ানক দমে যেতে হয়। স্প্যানিয়ার্ডরা আমাদের ছোট চোখে দেখে, আর অবাক হয়ে ভাবে, কি ধরনের লোক আমরা! আর আমাদের মতে ওরা ঠিকই ভাবে। কিন্তু আমার তো মনে হয়, এবার বদলে যাবে সব কিছু। আরো পিছু হটা অসম্ভব। আমাদের রেডিওয় আংশিক

সামরিক ব্যবস্থা জারীর কথা ঘোষিত হয়েছে। আমরা সবাই ভারী উৎসাহ পেয়েছি খবরটা শুনে। এমন কি, র‍্যাডিকালদেরও স্বীকার করতে হবে যে আমরা এখানে ফ্রান্সের জন্যেই লড়ছি।
আমাদের খুব ভাল একজন কমরেডের মারফৎ এই চিঠিখানা তোমার হাতে পৌঁছবে। ওকে উৎসাহ দিও, ওর কোন দেশ নেই, আত্মীয়-পরিজন নেই। আমাদের এখানকার জীবন আর সামরিক অভিযান ইত্যাদি সম্বন্ধে সবই ও তোমাকে বলবে। আর যেটুকু বলবে না, সেটুকু তুমি বুঝে নিও। কি বলতে চাচ্ছি, বুঝতে পারছ তো? আমার কেবলই মনে পড়ে, সেই কুয়াশা-ঢাকা রাতে তুমি কি ভাবে হেঁটে বাড়ী ফিরেছিলে—প্রায়ই মনে মনে দেখি সেই ছবিটা। কি বলতে চাই—বুঝছো নিশ্চয়। অনুভূতিটা এত তীব্র হয়ে উঠতে পারে—ভাবিনি কখনো। বলতে চাই, কিন্তু বলতে পারাটা বড় শক্ত, বিশেষ করে চিঠিতে। এইটাই শুধু বলতে পারি, শিগগিরই আবার মিলিত হব আমরা। আমার নিবিড় আলিঙ্গন নিও।

তোমারই,
মিশো

সেইদিন সন্ধ্যাতেই দেনিস উত্তর দিল:

প্রিয় মিশো! পারী, ৪ঠা অক্টোবর

কী খুশি হলাম তোমার চিঠি পেয়ে! আমি ইদানীং তোমার জন্যে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলাম—কথাটা লুকোতে চাই না। তোমার আর আমার শুভ জন্মলগ্নে আমার একটা অস্পষ্ট বিশ্বাস আছে, সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। যে কমরেডটি তোমার চিঠিখানা পৌঁছে দিল, তার কাছ থেকে তোমার অনেক খবর জানতে পারলাম। প্রত্যেক খুঁটিনাটির ওপর আমার আগ্রহটুকু সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছে। দরদী আর সাহসী এই কমরেডটি।
মনের কথাটা খুলে বলছি তোমায়, তোমার ওপর হিংসে হয় আমার। সোজাসুজি, সামনাসামনি লড়াই করা কত সুখের! প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে তোলা, খাঁটি আর সাহসী সঙ্গীদের মধ্যে থাকা আর তাদের

গভীর বন্ধুত্ব অনুভব করার মধ্যে সত্যিই আনন্দ আছে। এখানে লোকে প্রায়ই বলে, স্পেনের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে, আর লড়াই চালানোর কোন মানে হয় না। কথাটা সত্যি নয়। একজন লোকের হাতেও যতক্ষণ বন্দুক থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোঝাপড়া চুকবে না।

এখানে যে সব ব্যাপার ঘটছে, আমার পক্ষে সে সব তোমাকে লেখা বড় কঠিন। নীচতা, ভীরুতা আর মিথ্যাচারের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে আসছে আমাদের। মিউনিক চুক্তির আগে আমাদের সবাই প্রতিরোধে বিশ্বাস করত। পারীর রাজমিস্ত্রীদের এক ধর্মঘট চলছিল, দেশের স্বার্থ বিবেচনা করে মিউনিকের চারদিন আগে ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল ওটা দালাদিএ, আমার বাবা আর তাঁদের দলবলের একটা খেলার চাল মাত্র। ওরা জনসাধারণকে কি রকম ভয় পাইয়ে দিয়েছে আর কি রকম সংগঠিতভাবে আতঙ্ক প্রচার করছে, যদি তুমি দেখতে!

গত দু দিনে বদলে গেছে সব। এখন ওরা লড়তে চাইলেও কোনই ফল হবে না তাতে। পপুলার ফ্রন্ট ভেঙে যাওয়াতে ভারী খুশি হয়েছে ওরা, কিন্তু আসলে ফ্রান্সেরই মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। ওরা মেতেছে, বিজয়োৎসব পালন করছে, যৌথ-নৃত্যের আয়োজন করছে, এমন কি বিজয় শোভাযাত্রা বের করেছে, কাল গ্রাঁদ বুলভারে জার্মান পতাকা উড়তে দেখলাম। কী সাংঘাতিক! ফ্লাঁদ্যাঁ হিটলারকে অভিনন্দন জানিয়ে তার করেছে। তোমার চিঠিখানা পড়ে আমার ভারী মজার একটা ছোটখাটো ঘটনার কথা মনে পড়ল। তুমি একজন কমরেডের কথা লিখেছ, সে নাকি 'লাকমে'র অনুকরণ করেছিল। আমাদের ইঞ্জিনীয়ারের কাছে শুনলাম, সে 'অপেরা কমিক'-এ 'লাকমে' দেখতে গিয়েছিল; গায়িকাটি তার গানের মধ্যে নিজের এক লাইন জুড়ে দেন, 'চেম্বারলেনে চুম্বন করি, বড় সাধ জাগে মনে!' আর, সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাততালি পড়ে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা কী নির্বোধ আর কুৎসিত, দেখো দিকি!

শ্রমিকরা ক্ষেপে আছে। গত এক সপ্তাহে পার্টির প্রভাব বেড়ে গেছে। আমাদের কারখানায় আজ একটা সভা ছিল, সেখানে ঠিক করা হল, অতিরিক্ত সময়ের কাজ আর করা হবে না। আমাদের দল থেকেই প্রস্তাবটা পেশ করা হয়। বেকার লোক তো দেশে যথেষ্টই আছে।

আমাদের কারখানায় যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরী হচ্ছে, সে কথা ভেবেই আমরা ইতিপূর্বে কোন প্রতিবাদ করিনি। কিন্তু এখন তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ফ্রান্সকে রক্ষা করার প্রশ্ন আর ওঠে না। ইউক্রেন-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, এমন কি মানচিত্রও ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে। ওরা জার্মানদের সহযোগিতায় সোভিয়েট-বিরোধী আন্দোলনে নামছে শুনলে মোটেই আশ্চর্য হব না আমি। এখানকার সব শান্তিবাদীরা হঠাৎ ভয়ানক রকম জঙ্গী হয়ে উঠেছে!

সেই সঙ্গে পার্টির ওপর নির্যাতন শুরু হয়ে গেছে। শোনা যাচ্ছে, আমার বাবা নাকি পার্টিকে বেআইনী করে দেবার পক্ষে। আমরা সেজন্যে প্রস্তুত আছি। গোপনে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে—এমন একটা ছোট সংগঠন গড়ে নিয়েছি আমরা।

এবারে বলি, চরম শয়তানির কথাটা। কাল লেগ্রে বলল, সামরিক ব্যবস্থা জারী হওয়ার সময় তোমরা সৈন্যদলভুক্ত হওনি—এই অজুহাতে ওরা 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'র লোকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করার অভিযোগ আনবে। ভেবে দেখ একবার—যারা নিজেরাই দলত্যাগী, তারাই কিনা অভিযোগ আনছে সেই সব লোকের বিরুদ্ধে, যারা বিশ্বাসঘাতকতার মোহড়া রুখছে ছুটি বছর ধরে!

আমার নিজের কথা কি আর বলবো বলো? 'নোম' করখানায় এখনো কাজ করছি। মনের কথাই বলছি, পার্টির কাজের জন্যেই বেঁচে আছি আমি। আর কোন কিছুতে আমার একটুও আগ্রহ নেই। সেদিন এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল; ভদ্রলোক দিব্যি সংস্কৃতিবান, বামপন্থী, মতামতের দিক থেকে অ্যানার্কিস্ট আর ব্লুম-পন্থীদের মাঝামাঝি। তিনি বললেন, 'আপনারা অন্ধ। মধ্যযুগীয় অবিশ্বাসীদের যে সময়ে দমন করা হয়েছিল, সেই সময়ে জন্মান উচিত ছিল আপনাদের। উগ্র ধর্মান্ধতা ছিল তখনকার হাল।' একদম বাজে কথা! কিন্তু প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধে পড়াশোনা করেই এতগুলো বছর কাটিয়েছি, ভেবে সত্যিই আমার দুঃখ হয়; বিষয়টার কোন দরকার নেই বলে নয়; নিশ্চয় আছে। আমি জানি, সাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়ে সৌন্দর্য ঢের বেশী উত্তরজীবী। দেখতে পাচ্ছ, আমি অন্ধ নই। কিন্তু ওই বিষয়টার ওপরে আমার কোন কিছু নির্ভর করছে না। ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দ্বারাই আগামী

একশো বছরের মত সব কিছুরই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যাবে, শুধু আমাদের ব্যক্তিগত ভাগ্যই নয়, আমাদের সভ্যতার ভবিষ্যৎও। এর তুলনায় অন্য সমস্ত জিনিসই নিতান্ত গৌণ আর অপ্রত্যক্ষ বলে মনে হয়।

চিঠিখানা একটু শাদাসিধে হয়ে পড়ল, কিন্তু আমি অন্য ধরনের ভাষা ব্যবহারের অভ্যাস কাটিয়ে উঠেছি আজকাল। তুমি যে যুদ্ধ করছ, সেটা একটা আসল কাজ। আর আমরা গর্ত খুঁড়েই চলেছি উইপোকার মত…। এবার আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে একটা কথা বলি : মিশো, তোমার কথাটা বুঝিনি ভেবো না। প্রতিদিন তোমার অপেক্ষায় রয়েছি। মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি এই এসে পড়লে হয়ত, কিংবা এসে গেছ, আর ব্যস্তসমস্ত ভাবে বলছ 'ঠিক তাই!' সর্বক্ষণ তোমার সঙ্গেই আছি আমি, যখন অন্য কিছু ভাবি তখনো। আমি এই রকমই। ও কথা লিখে আর নিজের মনটাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলতে চাই না। না বললেও তুমি বুঝতে পারবে।

তোমার দেনিস

১৮

জনতার অভিনন্দনের উত্তরে যেদিন তেসা গোলাপ ফুল বুকে চেপে ধরে মাথা নুইয়ে প্রত্যাভিবাদন জানিয়েছিল, তার পরে এক মাস কেটে গেছে। কিন্তু সেই সব সুখের মুহূর্তগুলি আজকাল ভুলে গেছে সে; প্রতিদিনই সে নতুন নতুন দুঃসংবাদ পায়।

নেশার ভাবটা কেটে যাবার পর একটা প্রতিক্রিয়ার অবসাদ এসেছে দেশে। আলোয় উজ্জ্বল রাস্তাগুলো দেখে আর লোকের মনে ফূর্তির ভাব জাগে না। সেপ্টেম্বরের সেই ভয়-চকিত ভাবটা অল্প দিনেই কাটিয়ে উঠেছে সবাই। সামরিক সংগঠনের ব্যাপারটা একটা আর্থিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে; যে টাকাটা ওই জন্যে খরচ করা হয়েছিল, সেটা তুলতে হবে। প্রতিদিন গভর্নমেণ্ট নতুন নতুন কর বসাচ্ছে। পাউরুটির দাম চড়ে গেছে। মোটর-বাসে চড়া তো একটা বিলাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধর্মঘট শুরু হচ্ছে এখানে ওখানে। মালিকরা কড়া ব্যবস্থা দাবী করছে। কাগজে দেশের স্বচ্ছলতার কথা লেখা হচ্ছে বটে, কিন্তু

আজকাল আর কেউ ওসব বিশ্বাস করে না। ব্রতৈলের 'পাড়া-সমিতি'গুলো আসন্ন 'অভ্যুত্থানের' জন্যে অতি দ্রুত আয়োজন করে চলেছে। অব্রি ঘোষণা করেছে, 'নববর্ষের মধ্যেই আমরা শৃঙ্খলা স্থাপন করব।' দালাদিএ তার 'ইস্পাতের মত কঠিন ইচ্ছা-শক্তি'র কথা উল্লেখ করে মৃগী-রোগীর মত আর্তনাদ করেছে, আর তার ফলে, সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে অনেকের কাছে। গভর্নমেণ্ট টিঁকে রয়েছে যেন শেষ আশ্রয়টুকুর ওপর নির্ভর করেই, আর তেসা পাগলের মত ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে চেম্বারের লবিতে।'

ফ্যাশিস্টরা বিদ্রোহ করবে—এ বিশ্বাস তেসার নেই, ধর্মঘটকেও ডরায় না সে। পথেঘাটে যে সব উপদ্রব হয়, সেগুলোর সঙ্গে চেম্বারের তর্ক-বিতর্কের একটা স্বাভাবিক যোগাযোগ আছে বলেই সে মনে করে। তার ভয় অন্য কিছুর জন্যে : চেম্বার কি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা-জ্ঞাপন করবে ? কতবার সে দালাদিএকে বলেছে, 'খুব সাবধান ! আস্থার প্রশ্ন তুলো না যেন। কিসে যে কি করে বসবে ওরা তা বলা যায় না।' ভীইয়ার যখন একদিন বলল, 'দেশের লোকে যে কি ভাবছে, তা কি আমরা জানি ?' তখন তেসা হাত নেড়ে উত্তর দিল, 'তার চেয়েও খারাপ—ডেপুটিরা যে কি ভাবছে, তাই জানি না আমি !'

গভর্নমেণ্টের অস্থায়িত্বটুকু উপলব্ধি করে ব্রতৈল ইদানীং তেসার সঙ্গে নিম্নতন কর্মচারীর মত কথা কইতে শুরু করেছে। কমিউনিস্ট পার্টিকে দমন করা হোক বলে দাবী জানাল সে, এ ধরনের পরামর্শে ভয়ানক বিচলিত হয়ে পড়ল তেসা : কোন রাজনৈতিক দলকে বেআইনী করে দেওয়াটা ইয়ারকির কথা নয় , ভয়ানক হৈ-চৈ হবে। অবশ্য সমাজতন্ত্রীরা ভারী খুশি হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ওদের মধ্যে বেশ খানিকটা অসন্তোষ নিশ্চয় দেখা দেবে। বামপন্থী র‍্যাডিকালদের ওরা নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নেবে, আর তেসাকে পড়ে থাকতে হবে ব্রতৈলের অনুগ্রহের ওপর নির্ভর করে। শেষে ব্রতৈল হয়ত কোনদিন বলে বসবে, 'তেসাকে দিয়ে ওর কাজ তো করিয়ে নেওয়া গেছে। এবার ওকে সরিয়ে দিয়ে লাভালকে আনো।'—ব্রতৈল যে এমন কথা বলে বসবে না, সে সম্বন্ধে ভরসা দিতে পারে কে ?

গ্র্যাঁদেল আগাগোড়া সক্রিয় রয়েছে ব্রতৈলের পেছনে। তার খ্যাতি বেড়ে গেছে। লোকে বলে, সেপ্টেম্বরের বিপর্যয় থেকে সে ফ্রান্সকে বাঁচিয়েছে। লা-ক্রেস্ শহরের রিজার্ভ ফৌজের সৈনিকদের স্ত্রীরা তাকে এক সেট টেবিল-শুদ্ধ লেখার জিনিসপত্র উপহার দিয়েছে। কাগজ চাপা দেবার পাথরটার ওপর

একটি স্ফটিক-নির্মিত পায়রা, অলিভ-শাখা ধরা রয়েছে তার ঠোঁটে। ক্রমশই অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে তার বক্তৃতাগুলো। একটা সভায় সে ঘোষণা করল, 'ফ্রান্সকে কমিউনিস্টদের কবল থেকে আর আন্তর্জাতিক ধনিকতন্ত্রের হাত থেকে মুক্ত করবার সময় এসেছে। এই তেসাদের সরিয়ে দিতে হবে!' গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সেই দলিলখানা দুর্ভাগ্যবশত হারিয়ে ফেলার জন্যে দারুণ ক্ষোভ মিশ্রিত দুঃখ জেগেছে তেসার মনে। শুধু যদি সেই চিঠিখানা থাকত তাহলে গ্রঁদেলকে সে গুঁড়িয়ে দিতে পারত আর ব্রতৈলের এই লেজে-খেলানোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেত! আর কে তাকে ফেলেছে এই বিশ্রী অবস্থায়? লুসিয়ঁ! ওকথা মনে পড়লেই রাগে আত্মহারা হয় তেসা। নিজের ছেলেমেয়েই কিনা বেইমানি করল তার প্রতি: দেনিস মজুরদের উস্কানি দিচ্ছে বাপের বিরুদ্ধে আর লুসিয়ঁ হয়েছে গ্রঁদেলের সহকর্মী।

নিজের চারদিকে শত্রু গজিয়ে উঠতে দেখল তেসা। ব্রতৈলের বিরুদ্ধতাটা স্বাভাবিক; বিরোধী-দলের একজন প্রতিনিধি সে। এটা তো পার্লামেন্টের খেলায় নিয়মসম্মত। কিন্তু র‍্যাডিকাল পার্টির মধ্যেও তেসার বিরুদ্ধে বলাবলি হতে শোনা যাচ্ছে। এবারেও সেই অতি-উগ্র ফুজেটাই পালের গোদা। ঘৃণায় ভরে উঠেছে তেসার মন। নিজে বাঁচা আর অপরকে বাঁচতে দেওয়ার নীতিটা জানা উচিত লোকের। ফুজের বিরুদ্ধে সে কোনদিন ষড়যন্ত্র করেনি; তাদের দুজনের নির্বাচন কেন্দ্র আলাদা, পেশা আলাদা, স্বার্থও আলাদা। ফুজে একটা বইয়ের পোকা আর তেসা হচ্ছে প্রাণবন্ত মানুষ। আর ফুজে এখন কিনা সাহস করল তার দেশভক্তির প্রতি সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে; পার্টি-সভায় ও বলেছে, তেসা মিউনিকের সমর্থক। মিউনিক-চুক্তিকে সমর্থন করার অধিকার তার আছে। কিন্তু ওই জার্মানদের ভাড়াটে লোক গ্রঁদেলকে বাঁচাবার জন্যে আমার দেওয়া সেই প্রমাণপত্রখানা সে নষ্ট করে ফেলল কেন?' এর উত্তরে তেসা খুব একটা উদ্দীপনাময় কিন্তু অস্পষ্ট বক্তৃতা দিয়ে ফ্রান্সের উচ্চতর স্বার্থের কথা আর কূটনৈতিক ব্যাপারের গোপনীয়তা উল্লেখ করেছিল। খুব তারিফ পেয়েছিল সে। কিন্তু যাই হোক কয়েকজন ডেপুটি ফুজেকেই বিশ্বাস করেছে আর গ্রঁদেলের সঙ্গে তেসার গোপন যোগাযোগ আছে—এমন কথাও বলাবলি হচ্ছে। রেগে আগুন হয়ে উঠল তেসা কিন্তু ওই দলিলের ব্যাপারটা একদম চেপে গেল। লুসিয়ঁ যদি এর মধ্যে জড়িত থাকে তাহলে কি করে সে এ সম্বন্ধে সব খুলে বলবে? তবু চেষ্টার ত্রুটি করল না ফুজে।

দালাদিএ প্রস্তাব করল বর্তমান পার্লামেণ্ট বাতিল করে দিয়ে অবিলম্বে একটা সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করা হোক। ডেপুটিরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। তেসা বুঝল কথাটা নিতান্ত নির্বোধের মত। এর ফলে কমিউনিস্টদের আর দক্ষিণপন্থীদের শক্তিবৃদ্ধি হবে। অন্তত পঞ্চাশটি আসন হারাবে র‍্যাডিকালরা। এর মানেটা দাঁড়ায় নিজের কবর নিজেই খোঁড়ার মত। তাছাড়া চেম্বার এতে রাজী হবে না: আত্মহত্যার সম্ভবনার প্রতি কেউই আকৃষ্ট হয় না। সরকারের বিরুদ্ধে এই একটা বিষয়ে সবাই একমত হবে—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দলই: চেম্বারে নিজের আসনটি বজায় রাখতে চাইবে না—এমন কোন লোক আছে কি? দালাদিএ বলেছে, উনিশশো চল্লিশের নির্বাচনের ফলাফল হবে সাংঘাতিক। তা তো হবেই। কিন্তু আগামী নির্বাচন হতে ঢের দেরী এখনো। সবচেয়ে যা খারাপ—ডেপুটিরা ইতিমধ্যেই তাদের ভোটদাতাদের খুশি করতে লেগেছে; হয় তারা নতুন করধার্যের বিরুদ্ধে না হয় মজুরদের খুশি রাখতে উদগ্রীব। কি করা যায়? অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল তেসা, শেষ পর্যন্ত এক উপায় বের করল: চেম্বারের অতিরিক্ত ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারের মেয়াদ আরো দু বছর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এই টোপটা গিলবে সবাই। বুরবঁ প্রাসাদে আরো দু বছর বেশী বসতে পাবার সম্ভাবনায় কেই বা আত্মশ্লাঘা অনুভব না করে পারে? এই চালটা দিতে পারলে মন্ত্রীদলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্বন্ধে বছর খানেকের মত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তার বেশী ভাবতে যাওয়াটা নির্বুদ্ধিতা হবে। এক বছরের মধ্যে কি হবে কে জানে?

শুধু যদি ফুজের মুখটা বন্ধ করে দেওয়া যেত! তেসা র‍্যাডিকাল পার্টি সম্মেলনের মুখ চেয়ে আছে, সেখানে বিরোধী পক্ষকে দমন করতে পারা যাবে। উদ্দীপনাময় আর কুশলী একটা বক্তৃতা লিখে নিয়ে প্রস্তুত হল সে সম্মেলনের জন্যে। বক্তৃতার মধ্যে অজস্র উদ্ধৃতি দিল প্লুটার্ক আর গ্যামবেতা থেকে, মার্ন-এর শহীদদের করুণ স্মৃতিকথার সঙ্গে উল্লেখ করল দেশের বিমান-যন্ত্রশিল্পের নানা ত্রুটির কথা। আয়োজনটা যাতে বেশ বিরাট রকমের হয়, সে জন্যে তেসা নিখুঁত ব্যবস্থা করল; নির্দেশ পাঠাল জেলা কমিটিগুলোয়, উপযুক্ত প্রতিনিধিদের যাতায়াতের খরচ যোগাল, মোটা মাইনের বিনা-কাজের চাকরি আর পদক ইত্যাদির প্রতিশ্রুতি দিল।

আমালি যখন বলল, 'কী ভয়ানক চেহারা খারাপ হয়ে গেছে তোমার। এত খাটলে কি করে চলবে?' তখন তেসা মৃদুভাবে উত্তর দিল, 'গিন্নী, আর কি

করবার আছে বলো? ছেলেমেয়েরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। এখন আমার রইল শুধু ফ্রান্স।' গত এক বছরে অত্যন্ত রোগা হয়ে গেছে আমালি; কিছুই খেতে পারে না, আর ঘুমও ভাল হয় না। শুকিয়ে আসা বিবর্ণ শিশুর মত দেখতে হয়ে গেছে সে। তেসা উঠে পড়ল; বড় দুঃখ হয় তার স্ত্রীর জন্যে। বক্তৃতাটা তৈরী করবার সময় বাইবেলের জেরেমিয়ার অধ্যায় থেকে একটা উদ্ধৃতি দিতে গিয়ে তার চোখে পড়ল জব-এর কাহিনী। পাতা দুয়েক পড়ে তেসার মনে হল যেন তার নিজের সম্বন্ধেই ওই গল্পটা লেখা। জবের মতই সব কিছুই হারিয়েছে সে; ভেঙে চুরে গেছে তার সংসার। ছেলেমেয়েরা তাকে ছেড়ে চলে গেছে; স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়; আর, সবাই নিন্দা রটাচ্ছে তার নামে। সে কত একাকী আর কত অসুখী, সে কথাটা কেউ বোঝে না। জবের না হয় ঈশ্বর সহায় ছিলেন, কিন্তু তেসা যুক্তিবাদী মানুষ। আমালির মত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভয়ের জগতে বাস করতে চায় না সে। জন্মান্তরে কোন ক্ষতিপূরণের আশাও সে রাখে না। তেসার সহায় তাহলে কি? কথাটা ভাবার পর তেসা নিজেকে বোঝাল, আত্মনির্ভরতা আর মানবিক সম্ভ্রমবোধই তাব অবলম্বন।

পার্টি সম্মেলনের জন্যে যারা প্রস্তুত হচ্ছে তাদের মধ্যে ফুজে অন্যতম। চেম্বারে সরকার পক্ষের বিরোধিতা করতে সে অনিচ্ছুক, কারণ সরকারী দলে তার পার্টি সহযোগীরা রয়েছে অনেকে। পার্টির একান্ত অনুগত :সে, তার বিশ্বাস—র‍্যাডিকালরাই জ্যাকোবিনদের নৈতিক উত্তরাধিকারী, আর. তেসা তাদের দলে দুর্ঘটনাক্রমে ঢুকে পড়েছে বলে সে মনে করে। পার্টির শ্রেষ্ঠ কর্মীরা আসবে এই সম্মেলনে; জেলা-অঞ্চলের কর্মঠ, খাঁটি সব লোক, যারা রিপাব্‌লিককে বাঁচাবার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত। ফুজে স্থির করেছে, সম্মেলনে সে গ্রঁদেলের বিশ্বাশ্বাসঘাতকতার কাহিনী বলে দেবে, তেসার দু-মুখো নীতি প্রকাশ করে দেবে, আর দাবী জানাবে দালাদিএ যেন প্রিন্স দ্য কঁদের বদলে রোবস্‌পিয়ের-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়।

ফুজের দৃঢ় বিশ্বাস—'মুক্তি' কথাটা যদি সম্মেলনে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়, তাহলে একটা ঝড় উঠবে আর তার ফলে বর্তমান সরকারের পতন ঘটানো সম্ভব হবে। সে ঘোষণা করল, 'হয় র‍্যাডিকালদের আত্মসমর্পণের এই লজ্জাকর নীতি ত্যাগ করতে হবে, আর না হয় সর্বসাধারণের বিক্ষোভের ফলে তলিয়ে যাবে তারা।' জনসাধারণের এই বিক্ষোভের আত্মপ্রকাশ কি রূপ নেবে—একথা জিজ্ঞেস করলে, সে বিনা দ্বিধায় উত্তর দেয়, 'ব্যূহমুখ তৈরী হবে রাস্তার

মোড়ে মোড়ে বুঝেছেন মশাই, কাঁটাতার দিয়ে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলবে ওরা!'

মার্সাইএ সম্মেলন হবার কথা। দক্ষিণে রওনা হবার আগের দিন ফ্লুজে ফরাসী-বিপ্লব অনুশীলন সমিতির এক সভায় যোগদান করতে গিয়েছিল। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বাড়ী ফিরল সে। দার্ত-পন্থীরা কয়েকটি দলিলপত্রের প্রামাণ্য অস্বীকার করেছে, আর এখনো রোবস্‌পিয়েরের বিরুদ্ধে নকল নথিপত্র সাজাবার অভিযোগ করে চলেছে সমানে। ফ্লুজে চটে উঠে একজন শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিককে বলেছে 'এটা আপনার ইচ্ছাচারিতা।' বাড়ী ফিরে হল-ঘরটায় ঢুকেই সে চিৎকার করে উঠল, 'এমন অন্ধ বুদ্ধিবিভ্রাট তো আর কখনো দেখিনি!'

দার্তর নীতিহীনতার ওপর এক লম্বা বক্তৃতা শোনার পর তার স্ত্রী বিষণ্ণ মৃদু গলায় বলল, 'আমি ভাবছি তার চেয়েও গুরুতর একটা কথা।'

প্রসন্ন হাসি হেসে ফ্লুজে বলল 'বোধহয় বলতে এসেছ যে মশারীটার মধ্যে মাছি ঢুকে গেছে?'

ফ্লুজের ধারণা, তার এই স্থূলকায়া স্ত্রী মারি-লুইয়ের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে পরিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য আর গৃহের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। কিন্তু মারি চটে উঠে বলল, 'তুমি না হয় আকাশে চরে বেড়াও কিন্তু সব দিক সামলে চলতে হয় তো আমাকেই। কে একটা মেয়ের সঙ্গে আমাদের লুই জড়িয়ে পড়েছে। একজন সরকারী চাকুরের মেয়ে সে; ক্যাথলিক পরিবার। মেয়েটি গর্ভপাতের ব্যবস্থা করিয়ে নেবে; টাকা দাবী করছে সে। ওর বাপ-মাকে সমস্ত জানিয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে মেয়েটা।'

অত্যন্ত বিরক্তভাবে চেঁচাতে লাগল ফ্লুজে, 'আমি এর বিরুদ্ধে! এ আমি কিছুতেই হতে দিতে পারি না। কী কেলেঙ্কারী! লুই ওকে বিয়ে করুক আর না হয় পাদ্রীর শরণ না নিয়েই সংসার পাতুক দুজনে মিলে। যা হয় করো খালি ওইটি ছাড়া।'

'কিন্তু লুই বিয়ে করতে চায় না যে। ও বলছে, মেয়েটিকে মোটেই ভালবাসে না ও আর সমস্ত ব্যাপারটাই একটা নিতান্ত সাময়িক ঘটনার ফল।'

পাশের ঘর থেকে ছুটে এল লুই। ছোকরার মুখময় ব্রণ, গায়ে নীল কোর্তা, নাকী সুরে বলে উঠল 'ঘৃণা করি আমি ওকে। ও একটা ভণ্ড আর স্বার্থপর মেয়েমানুষ। আর ওর বাপ একটা ক্যাথলিক, সাংঘাতিক পরচর্চা করে লোকটা দিনরাত। এখন তোমার সেই 'পরমত-সহিষ্ণুতা' গেল কোথায়?'

গোঁয়ারের মত ফ্লজে বারবার বলল, 'আমি এর বিরুদ্ধে।' ফাঁকা ঘরে সমানে চিৎকার করে যেতে থাকল, খেয়ালই হল না যে মারি-লুই আর তার ছেলে ঘর ছেড়ে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়ে কাজে মন দিল সে। মার্সাইএ যে বক্তৃতাটা দেবে তার নোটগুলো সংশোধন করতে বসল। মারি-লুই সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে, কাজে অভিনিবিষ্ট স্বামীর দিকে একবার তাকিয়ে শেষে ভয়ে ভয়ে বলল, 'দু হাজার। লুইয়ের জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যে। ভারী শস্তা একটা পশমের কোট পেয়েছি!'

'আগে বলোনি কেন?' অন্যমনস্কভাবে বিড় বিড় করে বলল ফ্লজে, 'এইমাত্র আমি চেক আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়ে এসেছি। মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত সবুর করতে হবে তোমায়।'

মারি-লুই মিতব্যয়ী গৃহিনী। পুরনো পোষাকের হাল ফিরিয়ে নিতে সে জানে, নীলামী মাল থেকে মোজা কিনে আনে স্বামীর জন্যে, শস্তায় টেবিলের ঢাকনি কিংবা চেয়ার কেনবার জন্যে দশ বারোটা দোকানে ঘোরাঘুরি করে; আরো বেশী টাকা না দেবার জন্যে কখনো স্বামীকে তাড়না করে না। কিন্তু এখন এই গোঁয়ার্তুমির জন্যে বিরক্ত হয়ে উঠল সে। লুইয়ের জন্যে দু হাজার ফ্রাঁ যোগাড় করার উদ্দেশ্যেই তাকে বাধ্য হয়ে এই পশমের কোটের গল্পটা বানাতে হয়েছে।

'আমি তোমার কাছে এমন কিছু ঘন ঘন টাকা চাইতে যাই না!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ওই আশ্রয়প্রার্থীদেরই যদি ভরণপোষণ করতে চাও, তবে ব্যবসায় নামো না কেন? আমাকে সবাই বলে, 'ডেপুটির গিন্নী তুমি তোমার তো অনেক টাকা।' আর এদিকে আমি কিনা ঝিয়ের মত খেটে মরছি। অন্য ডেপুটিরা তো টাকা করে প্রচুর। রোবস্‌পিয়েরের ওপর ওই বইটা লিখে কত টাকা রোজগার করেছ তুমি?'

রাগে পাগল হয়ে উঠল ফ্লজে। মেঝের ওপর লাথি মেরে বলে উঠল, 'চোপ রও! কী ভেবেছ তুমি আমায়? আমি তেসা নই! বরং দোকানের জানলা সাফ করব গিয়ে, সেও ভাল আমার পক্ষে!'

মারি-লুই আঙুল মটকাতে মটকাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ছেলেকে বলল, কালই সে তার রুপোর বাসনগুলো বাঁধা দিয়ে টাকা ধার করে আনবে। এগুলো সে বিয়ের উপহার হিসেবে পেয়েছিল, তার জীবনে এই প্রথম সে এগুলো

হাতছাড়া করছে। রান্নাঘরে গিয়ে সে চিনির শিশি, দুধের গামলা, সাঁড়াশী আর চামচেগুলো পালিশ করতে লাগল বসে বসে।

ফুজে রাতভোর ঘরের এদিক ওদিক পায়চারি করল, আর প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে গাল পাড়ল—লম্পট চরিত্র লুইয়ের উদ্দেশ্যে, তেসার উদ্দেশ্যে, সেই ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্যে যিনি 'বিশুদ্ধ-চরিত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান'-এর নামে নিন্দা রটনা করেছেন, আর নিজের উদ্দেশ্যেও—আরো শাদাসিধে, আরো কঠোর, আরো পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করা উচিত ছিল তার! তারপর অল্প একটু জলে মুখখানা ধুয়ে, আর উস্কোখুস্কো দাড়িটা আঁচড়ে নিয়ে সে রওনা হল রেল-স্টেশনের দিকে।

একই দিন সকালে তেসার রওনা হবার কথা, কিন্তু দালাদিএ মন্ত্রীদলের একটা সভা ডেকেছে: ব্যাঙ্ক-মালিকরা মারশাঁদ-র বিলের বিরোধী। সভা যতক্ষণ ধরে চলল, তেসা কেবল হাই তুলল আর মনে মনে হিসেব করতে থাকল পার্টি সম্মেলনে ফুজের পক্ষে কতগুলো প্রস্তাব উঠতে পারে। সভা ভাঙার পর বাড়ী এল জিনিসপত্রগুলো তুলে নেবার জন্যে। হলঘরে একজন অপরিচিত লোক অপেক্ষা করছিল।

তেসা চেঁচিয়ে উঠল, 'সময় নেই আমার!'

'পাঁচ মিনিটের বেশী সময় লাগবে না, মন্ত্রী-মশাই। ব্যাপারটা বিশেষ জরুরী।'

তেসা শুনতে চায় না। সে ভাবল, লোকটা হয়ত সরকারী চাকুরে, কোন অভিযোগ জানাতে এসেছে।

'তাহলে, মন্ত্রী-মশাই, মার্সাইতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?'

তখন তেসা বুঝতে পারল, লোকটা পার্টি-সম্মেলনের প্রতিনিধি, আর সম্মেলন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে ও এসেছে। সুর বদলে ফেলল তেসা। অমায়িকভাবে এনে বসাল ওকে নিজের লেখা-পড়া করবার ঘরটায়। প্রতিনিধির কাগজপত্র বের করে লোকটা আত্মপরিচয় দিল, 'আমার নাম বাইস, হট-রীন বিভাগের কোলমার-দলের প্রতিনিধি।'

সুন্দর চেহারা বাইসের, করুণ নীল চোখ, কোঁকড়ানো চুল। জেলা-অঞ্চলের লোক বলে মনে হয় তাকে দেখে, উঁচু কলারের কোট আর ডোরা কাটা পাতলুন, কোর্তার ওপর সোনার চেন ঝোলানো। কথায় উচ্চারণে আলসেশিয়ান টান।

'কোলমারের র‍্যাডিকালরা বরাবরই পপুলার ফ্রন্টের বিরোধী, পার্টির আসল নেতা হিসেবে আমরা আপনার মুখ চেয়েই আছি। ফুজে সম্মেলনে গণ্ডগোল বাধাতে চায় শুনে ভয়ানক বিরক্ত হয়েছি আমরা।'

'কিন্তু ফুজে পার্টির বহুদিনের সভ্য। তার বক্তব্যটা যতই ভুল হোক না কেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সম্পূর্ণ অধিকার তার আছে।'

'কোলমারের র‍্যাডিকালরা মনে করে, ফুজে বর্ণচোরা কমিউনিস্ট, লোকটা মস্কোর নির্দেশ মত চলে। গির্জার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করে চলেছে ও; ওর চেষ্টা আলসাস যাতে মাতৃভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একাধিকবার ও দলের প্রতি বেইমানি করেছে। বেসার্স-র অস্ত্র-তৈরীর কারখানায় মজুররা যেবার অবস্থান-ধর্মঘট করে, সেবার ও মজুরদের হটিয়ে দেবার কাজে পুলিশকে বাধা দেয়, অর্থাৎ ফ্রান্সের আত্মরক্ষার প্রস্তুতিকে ও বানচাল করে দিয়েছিল। জার্মানীর সঙ্গে যাতে আমাদের একটা হাঙ্গামা বাধে, সেই জন্যে ও জার্মানী-আগত আশ্রয়-প্রার্থীদের সুপারিশ-চিঠি দিয়েছে। আর সব চেয়ে বড় কথা, অপ্রাপ্ত বয়স্কদের চরিত্র খারাপ করার অপরাধে অভিযুক্ত লারিশো-র মুক্তির ব্যবস্থা মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছে ও।'

একঘেয়ে ভোঁতা গলায় বলে চলল বাইস, যেন কোন লিখিত অভিযোগপত্র পাঠ করছে। পৃথিবীতে যে কত রকমের নীচতা আছে, সে কথা ভেবে একটা শিশুসুলভ বেদনা প্রকাশ পেল তার দুই চোখে। লারিশোর নামটা শুনে তেসা হাসল। ও ব্যাপারের সবই সে জানে। লারিশোর মা ফুজের কাছে আবেদন জানিয়েছিল; উকিলের পরামর্শ নিতে গিয়েছিল ফুজে, কিন্তু ব্যাপারটার মধ্যে অনেক গণ্ডগোল আছে জানতে পেরে চেঁচাতে লাগল সে, 'ও রকম লোককে বাঁচাতে চাও কেন? ওকে গিলোটিন করলেও যথেষ্ট হয় না!' যাই হোক, লারিশো শেষ পর্যন্ত টাকার জোরে নিজের মুক্তি কিনে নিতে পেরেছিল। মেয়েটির মা ঘুষ খেয়ে সাক্ষ্য দিয়ে আসে যে একজন নির্দোষ লোকের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করার জন্যে সে তার মেয়েকে প্ররোচিত করেছিল। বাইসের সঙ্গে এ ব্যাপার নিয়ে তেসা আলোচনা করতে চাইল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'কি করতে চান আপনি?'

'ফুজের মুখ বন্ধ করে দিতে চাই।'

'কিন্তু সেটা তো আমাদের পার্টি-ঐতিহ্যের বিরোধী। মত প্রকাশের স্বাধীনতা...'

'শয়তানদের জন্যে নয়!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল তেসা। তারপর একটু হেসে বলল, 'আপনার মনের অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি, আপনার মত তরুণরাই তো দেশের আশা-ভরসা। কিন্তু এত পরমত অসহিষ্ণু হলে চলবে কেন? যাই হোক, আপনাকে নিবৃত্ত

করার কোন অধিকার আমার নেই। একজন নাগরিক হিসেবেই আপনার কর্তব্য করতে যাচ্ছেন আপনি। মার্সাইএ আবার দেখা হবে আমাদের। ওখানে পৌঁছে আপনি আমার বন্ধু বিলে-র সঙ্গে দেখা করবেন। ওর বয়স প্রায় ষাট, কিন্তু মনের দিক থেকে ও তরুণ, আর সেও আপনার সঙ্গে একমত। ও আপনাকে সাহায্য করবে।'

বাইস চলে যাবার পর তেসা চাকরাণীটাকে তার জিনিসপত্র বাইরে পৌঁছে দিতে বলল। তারপর এল আমালির কাছে বিদায় নিতে। বিছানায় শায়িত আমালিকে দেখাচ্ছে ভয়ানক বিবর্ণ, ক্রশ চিহ্নিত মালা স্পর্শ করে অস্ফুট ওষ্ঠ বিক্ষেপে প্রার্থনা মন্ত্র বলে চলেছে। আমালিকে মৃদু চুম্বন করে তেসা বলল :

'আচ্ছা, তাহলে আসি গিন্নী। ভাল হয়ে যাবে তুমি! আমি সব আঁট-ঘাঁট বেঁধে ফিরে আসব বলে আশা করছি। লোকটা যদি মুখ খুলতে সাহস করে, তাহলে একবার দেখে নেব ওকে।'

১৯

মার্সাইকে লোকে বলে 'ফ্রান্সের শিকাগো'। এই বন্দরের অলিতে গলিতে বোম্বেটে আর ছেলেমেয়ে-বিক্রীর গোপন ব্যবসাদারদের ভীড়; এখানে গণিকাদের দালাল, চোরা-কারবারী, আফিম আর কোকেনের ফড়েদের একচ্ছত্র অধিকার। এমন লোকও অজস্র আছে যারা রিভলভার থেকে বোমারু-বিমান পর্যন্ত সব কিছু অস্ত্রশস্ত্র কেনা-বেচা করে—এদের অনেকেই ব্রতৈলের দালাল আর ভাড়াটে গুণ্ডা, স্পেনের দুরবস্থার সুযোগে যারা দু হাতে টাকা লুটে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে শহরের পথে ঘাটে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় : যারা দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, কিংবা মুখ বুজে থাকতে না পেরে প্রতিবাদ করেছে, তাদের সাবাড় করে দিয়েছে গুণ্ডারা। 'পুরনো বন্দর' অঞ্চলের সরু সরু রাস্তায় অসংখ্য গণিকালয়ের ঘিঞ্জি। পরিব্রাজক, কেরানী, ব্যবসাদার আর নাবিকদের জন্যে প্রতীক্ষায় থাকে অর্ধনগ্ন মেয়েরা; পথ-চলতি লোক যদি তাদের দেখে মুগ্ধ না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায় তাহলে মেয়েগুলো তার টুপি কেড়ে নেয়, কিংবা নোংরা জল ছিটিয়ে দেয় তার গায়ে। গণিকাদের

দালালরা আর তাদের ভাড়াটে লোকরা নির্বাচনী প্রচারের বন্দোবস্ত করে, ধর্মঘট ভেঙে দেয়, আর গুপ্তচরদের দরকার মত লুকিয়ে রাখে কিংবা ধরিয়ে দেয়।

নির্বাচনের আগের কয়েকটা দিন গুণ্ডাদের ভারী সুদিন, দু হাতে টাকা লোটে ওরা। নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে যারা, তাদের একটু দরাজ হতে হয়, তা নইলে গুণ্ডারা বক্তাকে ধরে মার লাগাবে, দেয়ালে লটকানো ভোটের আবেদন টেনে ছিঁড়ে দেবে, আর ভোটদাতাদের হাঁকিয়ে দেবে। বোম্বেটেরা দুটো গোষ্ঠীতে বিভক্ত; প্রথম দলের নেতৃত্ব করে লেপেত্তিত নামে একজন কানা লোক, স্থানীয় পৌর-সভার মাইনে বাঁধা লোক ও। সেখানে সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য। খুব অল্পদিন আগেও তার যা কিছু আগ্রহ ছিল একমাত্র কোকেনে; অত্যন্ত অমায়িকভাবে লেপেত্তি ব্যাখ্যা করে: 'আমি নিরস্ত্রীকরণের পক্ষে।' দ্বিতীয় দলটি ব্রতৈলের হয়ে কাজকর্ম করে, ওদের নেতা লেব্রক; জনৈক ব্রেজিলীয় ব্যবসায়ীকে খুন করার পর থেকেই তার কর্মজীবনের সূত্রপাত। বোম্বেটেরা অনায়াসে এদল থেকে ওদলে গোষ্ঠী বদল করে। এদের সহযোগিতা সম্বন্ধে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি না পেলে চেম্বারের প্রতিনিধি হিসেবে দাঁড়ানো যেমন বিপজ্জনক, কানবিএরে কাফে খুলতে চাওয়াও তেমনি অসম্ভব।

এই র‍্যাডিকাল সম্মেলন উপলক্ষে মার্সাইএর গুণ্ডারা যা পারে বাগিয়ে নেবার চেষ্টায় আছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, সব কিছু বিবেচনার পর তেসার বন্ধু বিলে স্বয়ং লেব্রকের সঙ্গে দেখা করে আরজি পেশ করল। বিলে কফির পাইকারী কারবার করে, সে লেব্রককে বিশ্বস্ত লোক বলে জানে। ছিঁচকে চোররা যাতে কফি চুরি না করতে পারে সেজন্যে সে অনেকবার তার সাহায্য নিয়েছে। এবার সে লেব্রককে সম্মেলনের অধিবেশনে শান্তি আর শৃঙ্খলা বজায় রাখার ভার নিতে অনুরোধ জানাল। দুশোজন বেশ্যার দালাল আর চোরা-কারবারীকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেওয়া হল; কেউ কেউ আমন্ত্রিত হল অতিথি হিসেবে। কাউকে বলা হল সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আসতে। ফুজে যাতে কোন ব্যবস্থা ভণ্ডুল না করে দিতে পারে, সেজন্যে সমস্ত রকম আয়োজন করা হল।

বিরাট হলঘরটায় ঢুকে বিস্মিত হয়ে গেল ফুজে। সে এই ধরনের সভায় মধ্যবয়সী, ঘাড়-মোটা, দাড়িওলা মফস্বল অঞ্চলের লোক দেখতে অভ্যস্ত; দোকানদার, উকিল, জোতদার, অধ্যাপক, টহলদার ব্যবসায়ী, কারুশিল্পী—

এক কথায় ফ্রান্সের মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সব সভায় যোগদান করে। অবশ্য এবারকার অনুষ্ঠানে সাধারণত অন্যান্য বারের মতই তার অতিপ্রিয় গোটাকতক দাড়ির দেখা সে পেল, কিন্তু তারা সবাই হারিয়ে গেল খেলোয়াড়ী চেহারার ছোকরাদের ভীড়ে—যারা তাদের বলিষ্ঠ বাহু আর চকচকে সিধে চুল সম্বন্ধে ভারী গর্বিত। এদের মধ্যে অনেকেই লেব্রক কর্তৃক সংগৃহীত 'নিমন্ত্রিত ব্যক্তি'। অন্যেরা এসেছে 'প্রতিনিধি' হিসেবে, এরা নিজেদের 'তরুণ র‍্যাডিকাল' বলে থাকে। তেসাকে যে সব দল সমর্থন করে তারা, আর না হয় অর্থ-লোভীরা এদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছে।

এই 'তরুণ র‍্যাডিকাল'দের মধ্যে অনেকেই আগে ফ্যাশিস্ট সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল; ফ্যাশিস্টদের আসন্ন ক্ষমতাপ্রাপ্তির সম্ভাবনায় ওরা প্রলুব্ধ হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখল—ব্রতৈলের অনুগামী হওয়া মানে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার জন্যে অপেক্ষা করা, আর এই দলে এলে আরামের চাকরি, লাল-ফিতে শোভিত সম্মান-পদক কিংবা অন্তত কয়েক হাজার ফ্রাঁ সহজেই বাগানো যায়। এই 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা শ্রমিক আর ইহুদীদের গাল পাড়ে, 'চূড়ান্ত ক্ষমতাপন্ন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের জন্যে দাবী জানায়, আর মুসোলিনীর 'বাস্তব বোধ' এবং হিটলারের 'বীরত্ব' সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্ছসিত উৎসাহ দেখায়। হলের এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা, নিজেদের মধ্যে নানারকম টিপ্পনী কাটছে, হাই তুলছে আর সোরগোল করছে—সম্মেলনের অধিবেশন দেখে ফুটবল খেলায় দর্শকের ভীড়ের কথা মনে পড়ে।

দালাদিএকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান হল; পুরনো দিনের দাড়িওলা সভ্যরা, 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা, আর বেশ্যার দালালরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠল, 'শান্তি দীর্ঘজীবী হোক!' কেউই লড়াই করতে চায়নি। সামরিক বয়সের যুবকরা মন খুলেই ধন্যবাদ জানাল এই ঘোলাটে চোখ, ছোটখাটো মানুষটিকে—যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের গড়-খাইয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ফ্রান্সের নায়ক ও প্রাচীন র‍্যাডিকাল-পন্থী নাগরিক এডুয়ার দালাদিএ যে তাদেরই একজন পার্টি-সহযোগী—একথা ভেবে প্রবীণ পার্টি-প্রতিনিধিরা গর্বে স্ফীত হয়ে উঠল। তেসা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল—আবার দালাদিএ সমস্ত তারিফটুকু একাই লুটছে। কিন্তু দালাদিএ যে প্রতীক মাত্র,—একথা উপলব্ধি করে সে মনে মনে ভাবল, 'ওরা আমাকেও বাহবা দিচ্ছে।' এটা ভাববার পর সেও এই হর্ষধ্বনিতে যোগ দিল। উচ্চকিত গলায় বক্তৃতা শুরু করল দালাদিএ, মাঝে মাঝে স্বরটা চিৎকারের পর্দায় চড়ে

গেল। অনেক দুর্বল স্বভাব ব্যক্তির মতই সেও অনমনীয় দৃঢ়তার ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল। নিজের শক্তিমত্তার ধারণায় সে বারবার চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি এ কথা বলেছিলাম!...আমি চাই!—আমি এ হতে দেব না!—'

মাঝে মাঝে তার গলার স্বরে একটা করুণ আর্তনাদ প্রতিধ্বনিত হতে শোনা গেল—সে যেন কোন ক্ষুদ্র ইস্কুল মাস্টার, যাকে নিয়ে সবাই বিদ্রূপ করে আর ভাগ্যের চক্রান্তে যাকে নেপোলিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। দালাদিএ চিৎকার করে বলল, 'আমি বারণ করেছিলাম, যাতে কেউ আত্মসমর্পণের কথা না বলে! মিউনিক-চুক্তিটা মোটেই আত্মসমর্পণ নয়!' বক্তৃতা দিতে দিতে গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, বুক-খোলা কোর্তাটার ওপর চেপে ধরল এক জোড়া আঙুল, কায়দা করে মাথা নোয়াল: বোধ হয় সত্যিই সে নেপোলিয়ন, যে বিনা রক্তপাতে যুদ্ধ জয় করেছে। মুহুর্মুহুঃ হর্ষধ্বনিতে হলঘরটা কেঁপে উঠল। কিছুক্ষণের জন্যে সবাই আত্মবিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল: প্রতিযোগিতাটা কেবল ফুজের বিরুদ্ধেই নয়, ইতিহাসের বিরুদ্ধেও।

দালাদিএ মঞ্চ ত্যাগ করার পর প্রতিনিধিদের মধ্যে একটা মানসিক অবসাদের ভাব জাগল। সবাই হলের এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হৈ চৈ করে পরস্পরের সঙ্গে হাসিঠাট্টা জুড়ে দিল। সভাপতি মহাশয় বৃথাই তাঁর হাতের কাছের ঘণ্টাটি বারবার বাজালেন। পরবর্তী বক্তা ফ্রান্সের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর একটা রিপোর্ট পেশ করছিল—তার কথায় কেউ কান দিল না। অত্যন্ত বেসামরিক মনোভাবাপন্ন এই নাগরিকদের মনে সামরিক সমস্যা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা এখানে এসেছে শান্তিরক্ষার নীতিতে সমর্থন জানাতে, পপুলার ফ্রণ্টকে গোর দিতে, আর 'ফালতু লোক'দের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থার দাবী জানাতে। ফ্রান্সের প্রতিরোধ-ব্যবস্থার জন্যে এত বাক্যব্যয় কেন? কিসের জন্যে? মিউনিকের পরে, এক কমিউনিস্টরা ছাড়া আর কে ফ্রান্সের বিপদ ঘটাতে পারে? মাত্র একজোড়া দাড়িওলা মদের ব্যবসায়ী বক্তার প্রতি মনোযোগ দিয়ে অপরিচিত পরিভাষা আর সংখ্যাগুলো বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। পরে ওদের একজন অপরজনকে বলল, 'বক্তব্যটা আগাগোড়াই খুব অস্পষ্ট, কিন্তু আমাদের যখন ম্যাজিনো লাইন আছে, তখন নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারি আমরা। অবশ্য ওটা তৈরী করতে

প্রচুর টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু তেমনি আবার উনি যা বললেন, সমস্ত খরচটাই মোটে একবারের বেশী তো নয়—'

হলের বাইরে এল প্রতিনিধিরা। শহরের সমস্ত কাফে আর মদের দোকান-গুলো ভর্তি করে তুলল তারা, সান্ধ্যভোজন শেষ করে হালকা মদ খেল, আর তারপর ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়ে ভীড়াক্রান্ত করে তুলল 'পুরনো বন্দরের' পথগুলো। এখানে বহু বিচিত্র ধরনের সব লোক তাদের অপেক্ষায় রয়েছে: গণিকালয়ের বাড়ীউলী, মেয়েমানুষ, পিয়ানো-বাজিয়ে, জুয়াড়ী—আর রয়েছে লেত্রকের দলের অল্পবয়সী ছোকরারা, যারা এই সব প্রতিনিধিদের সামরিক কায়দায় এক অভ্যর্থনা জানাবার আয়োজন করেছে। সম্মেলনের খবর পাবার পর থেকেই 'নিষিদ্ধ অঞ্চল'গুলো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে: দৈনন্দিন খরিদ্দার আর জাহাজ-ভর্তি মার্কিন পরিব্রাজকদের চেয়ে নতুনতর এক আস্বাদ কিছুদিনের মত পাবে তারা। মফস্বল-অঞ্চলের প্রতিনিধিদের কাছে সম্মেলনটা শুধু নাগরিক কর্তব্য পালনের ব্যাপার নয়—একটা রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারও বটে। পাঁচ দিনের মত সবাই পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে গেছে, সবাই অবিবাহিত বনে গেছে, আর স্বপ্নাচ্ছন্ন মফস্বল শহর থেকে এসে পড়েছে উদ্দাম মার্সাইএ। কয়েকজন বাড়ীউলী তো তাদের বাড়ীর গায়ে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছে: কেবলমাত্র প্রতিনিধি মহাশয়দিগের জন্যে।'

সে যাই হোক, প্রতিনিধি মহাশয়রা প্রণয়-বিভ্রমটুকু উপভোগ করলেও রাজনীতির কথা বিস্মৃত হল না। আদিরসাত্মক কবিতা আওড়াবার ফাঁকে ফাঁকে রাজনৈতিক তর্কাতর্কি বেধে গেল। সামান্য যে ক-জন সরকার-বিরোধী ছিল, তাদের দু-চার কথায় দমিয়ে দেওয়া হল। প্রথমে ফ্যাশিস্টদের আর তারপরে তেসার প্রচারকার্য দেশের জনসাধারণের মনের গভীরে প্রবেশ করেছে। পপুলার ফ্রন্টের ওপর দোকানদারদের ভয়ানক রাগ: 'গণ-তন্ত্রকে ফ্যাশিস্টদের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যেই আমরা ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা বোকা বানিয়েছে আমাদের। ওরা মজুরদের বিগড়ে দিয়েছে, ধর্মঘটে উস্কানি দিয়েছে, আর দেশটাকে উচ্ছন্নে দিয়েছে!' জোতদাররা মিউনিক-চুক্তির পক্ষে সমর্থন জানাল: 'ওরা কাদের যুদ্ধের পথে ঠেলে দিচ্ছে? আমাদের। মজুররা তো কারখানাতেই থাকবে। রীতিমত জোচ্চুরি!' দু-চার বোতল শ্যাম্পেন টানার পর প্রতিনিধিরা সবাই

অত্যন্ত ঝগড়াটে হয়ে উঠল, চিৎকার করে শাসাল, আর তোরেকে, ধর্মঘটীদের, এমন কি ব্লুমকেও গুলি করতে চাইল। গণিকাদের দালালরা যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, তারা সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার জুড়ে দিল, 'সাবাড় করে দাও ওদের সবাইকে!' কিন্তু মেয়েগুলো প্রতিনিধিদের কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমায় ছোট্ট একটা উপহার কিনে দাও খোকন!' আর, দাড়িওলা 'খোকন' বিরক্তিতে বিড় বিড় করতে করতে বিরাট টাকার থলিটা পকেট থেকে বের করল।

ব্যাপারটা চরমে উঠল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে। ফুজে মঞ্চে উঠে দাঁড়াতেই হলের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা নেমে এল—সবাই যেন একটা অস্বাভাবিক কিছু আশা করছে। নিজের সামনে কাগজপত্র বিছিয়ে নিল ফুজে; সারারাত্রি জেগে সে এই বক্তৃতা তৈরী করেছে। প্রতিনিধিদের মনোভাব লক্ষ্য করে সে তার বক্তব্যের অনেক জায়গায় সুর নরম করে দিয়েছে, আব দালাদিএর প্রসঙ্গ উল্লেখ করবার সময় সাবধান হবে বলে স্থির করে এসেছে। সংকট সৃষ্টি করার জন্যে যে কোন সুবিধা ছেড়ে দিতে সে রাজী। মনে মনে ভাবল, 'সম্মেলনকে' এবং সম্মেলনের মারফৎ গোটা দেশকে, দেখিয়ে দিতে হবে যে বিশ্বাসঘাতকরা ফ্রান্সকে গহ্বরের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। মতামতের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তেসা গ্রঁদেলের যে চিঠিখানা লুকিয়ে ফেলেছে, সেই চিঠির কথা যখন প্রতিনিধিরা জানতে পারবে তখন কি ভাববে তারা?

ফুজে শান্তভাবে বক্তৃতা আরম্ভ করল:

'অসুস্থ মায়ের শয্যার পাশে সন্তানরা কখনো ঝগড়া করে না, এবং ফ্রান্স আজ সাংঘাতিক পীড়িত...'

একটা চিৎকারে বাধা পেল সে। দ্বিতীয় সারিতে একজন লম্বা লোক দাঁড়িয়ে উঠল, লোকটা বাইস।

'কমিউনিস্টদের একজন দালালকে আমরা এখানে বক্তৃতা করতে দিতে রাজী নই...'

হতবুদ্ধি ফুজে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে?'

'কোলমারের প্রতিনিধি আমি।'

সঙ্গে সঙ্গে যেন কারো আদেশেই, 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা আর লেব্রকের ছোঁড়ারা খেঁকিয়ে উঠল, 'বসে পড়ো! মস্কোয় যাও!' 'আলসাস্ জিন্দাবাদ!

গুলি করে মারো কমিউনিস্টদের!' 'ডাকাত! লারিশোর টাকার কি করেছ?' 'বেসার্স!' 'লোকটা ধর্ষণ করেছে একটা মেয়েকে! গুলি করে মারো শালাকে!'

ফুজে বৃথাই কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল, তুমুল গণ্ডগোলে ডুবে গেল তার গলা। সভাপতি-মশাই প্রাণপণে ঘণ্টা বাজিয়ে টেবিলের উপর চড় মারতে লাগলেন। তারপর তিনি মৃদু স্বরে ফুজেকে বললেন, 'আমার মনে হয়, আর পীড়াপীড়ি না করাই ভাল।'

প্রতিনিধির মধ্যে কয়েকজন যারা ফুজের পক্ষে, তারা সাংঘাতিক চটে উঠল, কিন্তু তারা হলের মধ্যে ইতস্তত ছড়িয়ে বসে আছে, আর তাদের ঘিরে বসে রয়েছে লেব্রকের বন্ধুরা। এখানে ওখানে হাতাহাতি হয়ে গেল তাদের মধ্যে। সখেদে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এরিও খাবার ঘরটায় ঢুকে গেল। শেষ পর্যন্ত ফুজে কাগজপত্র গুটিয়ে নিয়ে নেমে পড়ল মঞ্চ থেকে। সভাপতি পরবর্তী বক্তাকে আহ্বান করলেন। সবাই দরজার দিকে ভীড় জমিয়ে তুলল। হঠাৎ আর একবার ফুজের চড়া গলা শোনা গেল: 'গ্রঁদেল সংক্রান্ত সেই প্রমাণ পত্রখানা আমি যখন তেসাকে…'

আর কিছু বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল; আবার সেই গণ্ডগোলটা শুরু হয়ে গেল। এর পর সভাপতি কিছুক্ষণের জন্যে অধিবেশনের কাজে বিশ্রাম ঘোষণা করলেন।

বাইস হয়ে উঠল এদিনের নায়ক। প্রতিনিধিরা তার কাছে এসে করমর্দন করে অভিনন্দন জানাল। মার্সাইএর র‍্যাডিকাল দলের সভাপতি বিলে—যে তেসার ইঙ্গিতমত সমস্ত বন্দোবস্ত আগে থেকে করে রেখেছিল—বাইসকে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ জানাল অভিজাত 'লুকুলাস' রেস্তোরাঁয়। বিলে নিখুঁতভাবে আপ্যায়ন করতে জানে। জাফরান আর লাল মরিচের গুঁড়ো ছিটানো বিখ্যাত 'ব্যুঅ' মাছের কালিয়াটা চমৎকার রান্না হয়েছিল—এই খাদ্যটা মার্সাইএর গর্ব। স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বাইস বলল, 'ঝাল-নোনতা জিনিস খেতে বড় ভালবাসি আমি।'

শহরের প্রায় মাঝখানে চিড়িয়াখানার কাছাকাছি এক জায়গায় একজন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে খাবার জন্যে চলল ফুজে। মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে সে পায়ে হেঁটে চলেছে। পরের দিন পার্টি-কমিটির কাছে এক খোলা চিঠি পাঠাবে বলে স্থির

করেছে সে। র‍্যাডিকাল সংবাদপত্রগুলো যদি চিঠিখানা ছাপাতে রাজী না হয়, তাহলে সে চিঠিটা 'লুমানিতে'য় পাঠাবে। কিলমান-সংক্রান্ত তথ্যগুলো সে বর্ণনা করবে তাতে। তারপর দেশের লোকে বিচার করবে কে খাঁটি দেশভক্ত —সে না তেসা ?

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পথ চলেছে ফুজে, এমন সময় বেঁটে-পাতলুন আর বাদামী রঙের খেলোয়াড়ী-কোর্তা পরা দুজন লোক এসে তার গা ঘেঁষে রাস্তার মাঝখানে সামনে থেকে পথ রুখে দাঁড়াল। পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় ফুজে বলল, 'মাফ করবেন।'

'এই দেখ্ তাহলে, শুয়োরের বাচ্চা!

ঘুষি খেয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেল ফুজে রাস্তার ওপর। অন্ধকার রাস্তাটা প্রায় নির্জন। একটা বেড়াল ডাকছে করুণ সুরে। পচা পাতার গন্ধ নাকে এসে লাগে; দক্ষিণ অঞ্চলের দীর্ঘায়িত হেমন্ত দিন শেষ হয়ে আসছে।

সন্ধ্যার সময় হোটেলের বিশ্রামের ঘরটায় তেসা অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসে লেবুর রস মেসানো চা খাচ্ছে, এমন সময় তার অল্প-বয়সী সেক্রেটারী দ্রুত পায়ে এল তার কাছে :

'ফুজেকে গুণ্ডারা আক্রমণ করেছিল। হাসপাতালে নিয়ে গেছে তাকে। পুলিশ বলছে, তার টাকার থলিটা চুরি গেছে।'

'কী সাংঘাতিক কাণ্ড!' বলে উঠল তেসা।

অত্যন্ত বিচলিত আর দুঃখিত হয়ে পড়ল সে; গভীর বেদনা অনুভব করল ফুজের জন্যে। যদি শরীরের ভেতরে রক্তপাত হয়ে ও মারা যায়, তাহলে? একলা! হাসপাতালেই মারা পড়বে লোকটা। মারশাঁদর দিকে ফিরে বলল তেসা, 'অবশ্য রাজনীতিক হিসাবে ফুজে একেবারেই অকর্মণ্য, তবে ভারী করিৎকর্মা ছিল লোকটা...'

'অতি জঘন্য এদের নীতিজ্ঞান! বলি, এই সব গুণ্ডাগুলোকে মার্সাই থেকে ওরা সরাবে কবে?'

'সরিয়ে দেবার সময় এসেছে! আশা করি যারা এ কাজ করেছে তারা সবাই ধরা পড়বে।'

রুমাল দিয়ে মুখ মুছে তেসা কাপটা ঠেলে দিল একপাশে। ভয়ানক গরম পড়েছে। মারশাঁদ বরাবরই একটু হাঁদা গোছের, সে জিজ্ঞাসা করে বসল,

'ও কোন্ চিঠির কথা উল্লেখ করছিল? তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্পর্ক কি?'

ঘাড় ঝাঁকুনি দিল তেসা: 'তোমার ভাব দেখে মনে হয়, যেন ফুজেটাকে তুমি কোনদিন চেনো না। ও একটা উন্মাদ! ডন কুইক্সোটের মতই পুঁথির জগতে ওর বাস। হয়ত দার্ত-সম্পর্কিত কোন নথিপত্রের চিন্তায় ভরে আছে ওর মাথাটা আর সমস্ত ব্যাপারটা গ্রঁদেলের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলেছে। কিন্তু ওর জন্যে আমি ভারী দুঃখিত।

পরের দিন তেসা স্বয়ং বক্তৃতা দিল; যদিও তার আর কোন বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভবনা নাই, তবু সে খুব একটা স্নায়বিক উত্তেজনা অনুভব করতে থাকল। সুন্দর হল তার বক্তৃতাটি। অন্যান্য বাক্য-বাগীশরা সব পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস্ করল, 'আজ ওর এলেমদারী ভারী জবর!' তেসা বলল—পিতৃভূমির প্রতি তার বিনম্র ভালবাসার কথা, যে ভালবাসা আত্ম-আকাঙ্ক্ষা বর্জিত; উদ্ধৃত করল লামার্তিনের কবিতা; তারপর বলল যুগযুগান্তরের ঘর্মশিক্ত আর রক্তরঞ্জিত 'মহাদেশের' কথা:

'এশিয়ার বর্বরতার উই-টিপির আক্রমণের বিরুদ্ধে আর মার্কিন দেশের সদ্য-তৈরী টোটকা দাওয়াই এর হাত থেকে ইউরোপকে রক্ষা করতেই হবে আমাদের। সুপ্রাচীন ধর্মমন্দিরের স্রষ্টাদের মতই, বিভিন্ন দেশের জনগণকে সাধ্যমত শক্তি যোগাতে হবে নতুন আর উন্নততর ইউরোপ গড়ে তোলার কাজে। কী আমাদের ভিন্ন করে রেখেছে জার্মানীর থেকে? একটা নদী, আর গোটাকতক কুসংস্কার। ইউরোপের সীমান্ত এখানে নয়, দূর পূর্বপ্রান্তে সেই সীমান্ত—যেখানে খ্রীষ্টীয় বীরপ্রসবিনী পোল্যাণ্ড আজ স্থান ছেড়ে দিচ্ছে আধাপ্রাচ্য এক সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠীকে।'

পাগলের মত হাততালি দিল 'তরুণ র‍্যাডিকাল'রা। আর তারপরে তেসা যখন বলল, 'কমিউনিস্টরা পপুলার ফ্রন্টের চুক্তি ভঙ্গ করেছে। ওরা জাতি-বহির্ভূত।' তখন তারা আর একবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। প্রতিনিধিরা সব মাঝামাঝি রফা-ব্যবস্থায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল, এখন তারা তেসার নেতৃত্ব অনুসরণ করল। তেসাকে সম্মান দেখাবার জন্য 'মার্ন-এর প্রতিনিধিরা এক ভোজসভার ব্যবস্থা করল; সেখানে সে সগর্বে ঘোষণা করল:

'ইউরোপের আবহাওয়া বদলে গেছে। মনে প্রাণে আমি তরুণদের সহযোগী। অতীত দিনের বুলি আওড়ে কোন লাভ নেই। র‍্যাডিকাল পার্টি বরাবরই

অত্যন্ত সজীব। ব্রতৈল সরকারী ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আনতে পারবে বলে আশা করছে, ও আমাদের ওপর একটা আমদানী করা রাষ্ট্রতন্ত্র চাপিয়ে দিতে চায়। সেটি হবে না, আমরা নিজেরাই পার্লামেন্টিয় নিয়মতান্ত্রিকতার নানা ব্যাধি থেকে মুক্ত করব নিজেদের। আমাদের জাতীয় প্রতিভাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং আমাদের পার্টির স্বাধীনতা-প্রেমের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে, আমরা সর্বক্ষমতাসম্পন্ন গণতন্ত্র সৃষ্টি করব।'

তেসা যখন ভোজন-পর্বের অতি উপাদেয় আহার্য দ্রব্যগুলো হজম করছে, তখন সে খবর পেল—শহরের মাঝখানে আগুন লেগেছে। তেসা কোনদিনই সাংঘাতিক কোন দুর্ঘটনা পছন্দ করে না। ছেলেবেলায় যখন কোথাও অগ্নিকাণ্ড বা বন্যা দেখতে অন্য ছেলেরা ছুটে যেত, তখন সে চটে উঠত! ভয়ংকর কোন কিছুর দৃশ্যে আশঙ্কায় ভরে ওঠে তার মন। কিন্তু এখন সে ভাবল দুর্ঘটনা-স্থলে গিয়ে হতভাগ্য শহরবাসীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আসা দরকার।

মনিহারীর দোকান 'বিশ্বভাণ্ডার' দেশলাইয়ের বাক্সের মত জ্বলছে। ফ্রান্সের দক্ষিণ অঞ্চলে এই সময়টায় উত্তর-পশ্চিমগামী একটা ঝড় বইতে থাকে; ফলে রাস্তাটার অন্য দিকে যেদিকে শ্রেষ্ঠ সব হোটেলগুলো রয়েছে সেদিকেও আগুনটা ছড়াল। কানবিএরের পথ আগলে রাখা হয়েছে? পুলিশরা তেসাকে দেখেই সেলাম দিতে থাকল, আর কর্মব্যস্ত ভাব ফুটিয়ে তুলতে লাগল, ধোঁয়ায় কাশি এসে গেল তেসার। মোটা এরিও তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'কী নারকীয় কাণ্ড, দেখো দিকি! আগুনের হাত থেকে বাঁচবার কোন বন্দোবস্ত শহরে নেই! লিয়ঁর দমকলকে খবর দিয়েছি। কিন্তু তারা যে কখন পৌঁছবে ভগবান জানেন!' রাস্তায় লোকে বলাবলি করছে, আগুন লাগলে অন্য পথ দিয়ে বেরিয়ে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় গোটাকতক দোকানী-মেয়ে আগুনে মারা পড়েছে। লেব্রকের দলের ছোঁড়ারা সম্মেলনের কথা ভুলে হোটেলগুলোর ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে, আর হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই পকেটস্থ করছে। ভীড়ের লোকরা চটে উঠে বলাবলি করছেঃ 'একটাও সিঁড়ি নেই! জলের নল নেই!' ফ্যাশিস্টরা একটু প্রচার করে নেবার সুযোগ নিয়েছেঃ 'গোটা সরকারী ব্যবস্থাটায় ঘুণ ধরে গেছে। এরকম কোন ঘটনা ইতালীতে ঘটতে পারত কি?'

এক মুহূর্তের জন্যে তেসা দৃশ্যটার তারিফ করল। আগুনের শিখাগুলো লম্বা

বাড়ীটার মাথার ওপর দিয়ে লাফ মারছে ধোঁয়ায় আঁধার আকাশের দিকে। আকস্মিক বিপৎপাতের ভয়ংকরতা সত্ত্বেও, 'তার মনে হল সমস্ত ব্যাপারটা একটা আতশবাজীর মতই—খুব সাংঘাতিক কিছু নয়। তারপরে সে নিজের হুঁশ ফিরিয়ে আনল, তীব্র ভ্রূকুটি করে ভাবল—এটা একটা জাতীয় দুর্ভাগ্য। ব্রতৈল অবশ্য এই অগ্নিকাণ্ডের সুযোগ নেবে। কী যোগাযোগ—ঠিক সম্মেলনের সময়েই কিনা ঘটল! শহরের পৌরসভায় যে সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য, র‍্যাডিকালদের নয়, এটা ভাল কথা। যে শহরে দশ লক্ষ বাসিন্দা, সেখানে একটাও আগুন-বাঁচানো সিঁড়ি নেই—কথাটা শুনে কি বলবে ভীইয়ার? যত সব ফালতু লোকের কাণ্ড আর কি! ব্যাপারটা থেকে এরিও খানিকটা তারিফ কুড়িয়ে নিল—এই যা আফসোস; লিয়ঁতে ও সব ব্যবস্থা মজুদ রেখেছে। আর ওই হতভাগী দোকানের মেয়েগুলো...কী ভয়ানক কাণ্ড! কী সাংঘাতিক!

তেসা যে হোটেলটায় আছে, সেটা আধাআধি পুড়ে গেছে। স্থানীয় আদালত-বাড়ীতে মন্ত্রীদের ঘর দেওয়া হল আর জিনিসপত্র পৌঁছে দেওয়া হল। প্রতিনিধিদের অনেকেরই কাগজপত্র, দলিল, ইত্যাদি চুরি গেছে দেখা গেল। তেসা গর্বের সঙ্গে তার হাতব্যাগটা নাড়াচাড়া করল—লুসিয়ঁর ব্যাপারটার পর থেকে সে খুব সাবধান হয়ে উঠেছে। তার ক্ষতিটা অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। তার প্রসাধনের বাক্সটা ছাড়া আর কিছু হাতাতে পারেনি ওরা—কিন্তু ভারী সুন্দর কচ্ছপের খোলা দিয়ে ফিট করা ছিল এই বাক্সটা। আদালত বাড়ীর অভ্যর্থনা গৃহের উনুনটায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হল; আগুনের প্রসন্ন শিখাগুলোর দিকে তাকিয়ে তেসা কানেবিএর-এর অগ্নিকাণ্ডের কথাটা স্মরণ করল: যাই হোক, ভারী সুন্দর দেখতে লাগছিল দৃশ্যটা। হেসে দালাদিএকে বলল:

'খুব সামান্যই ক্ষতি হয়েছে। মাত্র একটা প্রসাধনের বাক্স...'

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছে দালাদিএ। এই অগ্নিকাণ্ডটায় সে একটা 'অশুভ লক্ষণ' দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তেসা দিব্যি খোশ মেজাজে আছে, আর একবার সে সম্মেলনে নিজের জয়লাভের কথাটা ভাবছে। একটা অগ্নিকাণ্ডের মত ছোট খাটো ঘটনায় কি যায় আসে। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যাপারটা ভুলে যাবে সবাই। কিন্তু ফ্রান্সের নীতি নির্ধারিত হয়ে গেল আগামী কয়েক বছরের মত। একটা নবযুগের আরম্ভ হতে চলেছে। আর একটা সংকট দেখা দিলেই পল তেসা দেশের পুরোভাগে চলে আসতে পারবে।

চোখ বন্ধ করে একটা আরাম-কেদারার গহ্বরে সে বসে আছে, এমন সময়ে এক

টেলিগ্রাম এল তার হাতে: পারিবারিক চিকিৎসক জানাচ্ছেন, আমালির অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়েছে।

চোখের জলের নোনতা স্বাদ মুখের মধ্যে অনুভব করল তেসা; কিন্তু সংযম বজায় রাখল সে। নীল কাগজখানা এগিয়ে দিল দালাদিএর দিকে।

'এক্ষুনি পারী ফিরে যেতে হবে আমায়, কিন্তু কিছু যাবে আসবে না তাতে—কালকের অধিবেশনটা নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে। তুমি কিন্তু ঠিকই বলেছিলে—অগ্নিকাণ্ডটা সত্যিই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। না, না, ভেঙে পড়িনি আমি। আমি আত্মসংবরণ করেছি।'

২০

আধা-অন্ধকার ঘরটায় দুটো মোমবাতি জ্বলছে। লিলি ফুলের গন্ধটা কেমন যেন অস্বস্তিকর। আমালির মুখখানা শান্ত দেখাচ্ছে, এমন কি, শারীরিক যন্ত্রণা আর উদ্বেগ থেকে মুক্তির অনুভূতিতে যেন একটা সুখের ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে। তেসা বসে আছে বিছানার পাশে। ঘটানাটা এখনো যেন সে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারেনি, ছত্রিশ বছর কাটিয়েছে সে স্ত্রীর সঙ্গে; আমালিকে সে সর্বদা নিজের পার্শ্ববর্তিনী হিসাবেই জানত—দুর্ভাবনাগ্রস্ত, যন্ত্রণাক্লিষ্ট আমালি। মৃত্যুর পরেও সে যেন বেঁচে আছে। তেসা যখন মনে মনে বলল, 'ও আর নেই,' তখন কথাটা শোনাল নেহাৎ মামুলি বুলির মতই। বেঁচে আছে আমালি: গোধূলির আলো এসে পড়েছে তার মুখে, চারদিকে ফুল আর কেঁপে কেঁপে ওঠা মোমবাতির শিখার দিকে তাকিয়ে তেসা অতীতে ফিরে গেল। যে কোন কারণেই হোক, নিজের ছাত্র-জীবনের চ্যাংড়ামিগুলো মনে পড়ল তার। সব কিছু যেন ভেসে উঠল এক উজ্জ্বল আবছায়ার ভেতরে। মনে মনে সে ভাবল, 'এটা ঠিক না।' দুঃখটা কমে আসছে বলে মনে হওয়ায়, একমাত্র আমালির দুঃখেই মনটাকে একাগ্র করে রাখতে চাইল। ইদানীং অনেকদিন সে আর আমালির জন্যে ফুল কিনে আনেনি। এক সময়ে সে স্ত্রীকে নিয়মিত ফুল এনে দিত। প্যান্সি আর আনিমোন আমালির বড় প্রিয় ছিল। কি ভাবে তাদের প্রথম দেখা হল সে কথা মনে পড়ল তেসার।

তখন বসন্তকাল,—তার আগের বছর তেসা কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে।

তেসা তখন 'লাতিন কোয়ার্টারে' থাকে, চওড়া কানাওলা টুপি পরে, গলাবন্ধনী ফিতেটা ঢিলে করে বাঁধে, জোরের বক্তৃতা আর রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের তারিফ করে, একক এবং অদ্বিতীয় প্রেমে বিশ্বাস করে—কিন্তু কোন চাকরানী বা মজুরনীকে দেখলেই তার পেছন ধরে আর চেঁচায়ঃ 'আমাদের রক্তে শ্রমিকের রক্ত সঞ্চারিত হোক!' আর, গেলাশ দুয়েক হাল্‌কা-নেশা-ধরানো পানীয় খাবার পর হয়ত কোন বিমুগ্ধা শ্রমজীবিনীর কানে কানে রেমী দ্য গুর্মঁর কবিতা আবৃত্তি করেঃ

'ক্ষমার স্পর্শ লভুক তোমার কলঙ্কী ওই বুকের চূড়া দুটি
মুক্ত-বসন ওরা যে আজ ফাগুন-ফুলের প্রায় উঠেছে ফুটি!

আমালির কাছেও সে এই কবিতা আবৃত্তি করত। আমালি তখন উরসুলিন-এ পাদ্রীদের ইস্কুল থেকে লেখাপড়া শেষ করে পারীতে ফিরে এসেছে। কবিতাটা শুনে অত্যন্ত বিব্রত হয়ে কেঁদে ফেলেছিল আমালি. থতমত খেয়ে বলেছিল, 'শোন, পল...' তারপর থেমে গিয়ে ছোট্ট ফিতের রুমালখানা বলের মত করে দলা পাকিয়ে ফেলেছিল। একদিন তেসা তাকে থিয়েটারে নিয়ে গেল; সেদিন ছিল 'ঈডীপে' নাটকের অভিনয়। বিখ্যাত বিয়োগান্ত-অভিনেতা মুনে-সুলি বলে উঠলেন—'কী সাংঘাতিক এই জীবন!' তখনকার দিনে ঘোড়া-গাড়ীর চল ছিল, গাড়ীগুলোর ছোট ছোট জানলায় ঘন নীল রঙের পর্দা ঝোলান থাকত, লম্বা টুপি মাথায় দিয়ে গাড়োয়ান বসত সামনের দিকে। বোয়া দ্য বুলোঞ়্‌র এক অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যখন তাদের গাড়ীটা চলেছে, তখন তেসা চুমু খেল আমালিকে। লম্বা ফিতে ঝোলান ঘোমটার মত করে পরা এক টুপি পরে ছিল আমালি। তেসাকে জড়িয়ে ধরে সে বলে উঠল, 'কী মধুর!' তারপরে বলেছিল, 'কিন্তু এ যে অন্যায়!' আর আরো বেশী করে জড়িয়ে ধরেছিল তাকে। আমালির ঠোঁট দুটো ছিল ফুলো-ফুলো, পলেতের মত......

নিজের ওপর চটে উঠল তেসা। এসব চিন্তা অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক। সে জানে, এই সব অসংলগ্ন স্মৃতির চেয়ে তার দুঃখ অনেক বেশী গভীর। বারবার সে পুনরাবৃত্তি করল, 'মরে গেছে, আমালি মরে গেছে।' বোধহয় এই উক্তিটা তার দুঃখের প্রকাশ, কিন্তু কথাটা শোনাল সরকারী বিবৃতির মতই নেহাৎ ফাঁকা। অন্যের সম্পর্কে এই কথাটা কতবার সে উচ্চারণ করেছে? আর এখন তো আমালিকে ডাকলেও শুনতে পাবে না সে। তাই কখনো সম্ভব? খুব

পাতলা ঘুম ছিল ওর—হ্যাঁ, এখন থেকে বলতে হবে 'ছিল'। মাসাইএর সমস্ত বিবরণ, ফুজের ব্যাপার আর ওই অগ্নিকাণ্ডের কথা আমালিকে কিছুই বলা হয়ে উঠল না। কোনদিন আর কোন কিছু তাকে বলা যাবে না। ওর সেলাইয়ের জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে ওখানে। তেসার জন্যে যে গলাবন্ধটা সে বুনছিল, সেটা শেষ করা হয়ে ওঠেনি। ছুঁচ আর পশমগুলো পড়ে রয়েছে —সেলাইয়ের ঘরগুলো তেসা গুণতে লাগল—তারপরে ঘুমে ঢুলে পড়ল। ট্রেনে সে দুর্ভাবনায় ঘুমোতে পারেনি।

দেনিসের ঘরে ঢোকার শব্দ সে শুনতে পায়নি। মায়ের মৃত্যুসংবাদ কাগজে পড়ে দেনিস তাড়াতাড়ি ছুটে এসেছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হল দেনিস—আমালিকে এরকমটি আর কখনো দেখেনি সে। এমন একটি বিচক্ষণতার ভাব ফুটে উঠেছে আমালির মুখে, যে দেনিস মনে মনে ভাবল, 'মাকে আমি কোনদিন ঠিকমত চিনে উঠতে পারিনি!' এখন তো সময় চলে গেছে। বাবার দিকে তাকাল দেনিস; ঘুমন্ত তেসার হাঁটুর ওপর একটা সবুজ পশমের তাল। আর ঘর ভর্তি লিলি ফুল—গির্জায় যেমন থাকে। সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অসহ্য ঠেকে—দুঃস্বপ্নের মত। সব কিছুই অত্যন্ত অনাত্মীয় বলে মনে হয়। শুধু মায়ের হাত দুটো পরিচিত। এই প্রথম দেনিস অনেক দূর থেকে নিজের শৈশবকে প্রত্যক্ষ করল। মায়ের সরু ঠাণ্ডা হাতখানার ওপর নিজের উষ্ণ ঠোঁট চেপে ধরল, তারপর বুঝল—সে কাঁদছে। চোখের জলের মধ্যে দিয়ে সহজ হয়ে উঠল সব কিছু, কিন্তু তাতে দুঃখটা কমল না, মনের অস্থিরতাটুকুও ঘুচল না। কান্নার শেষে দেনিস নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে; পরিচিত লম্বা বারান্দাটা পার হয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। উকিলের পোষাক-পরা তেসার ফটোগ্রাফটা তার দিকে চেয়ে রইল ঠিক আগের মতই। পথে পথে একটা উৎসবের আবহাওয়া দেখা দিয়েছে; কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পিচ-ঢালা পথের বুকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আলোর প্রতিবিম্ব—কালো, ঘন-বেগুনী, আর রূপোলী রঙে জ্বলছে গোটা দৃশ্যটা।

মৃত্যুর আগেই আমালি তার শেষ ধর্মকৃত্য সম্পন্ন করে গেছে, কিন্তু ধর্মের সঙ্গে যাতে কোন সম্পর্ক না থাকে এমন ভাবে তার অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা করল তেসা। বামপন্থীদের চটিয়ে লাভ কি—বিশেষত মাসাই-সম্মেলনের ঠিক পরেই? সমাধি-স্থান-সংলগ্ন গির্জায় ঘণ্টা বেজে উঠল; ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল শবযাত্রা, তেসা হেঁটে চলেছে পুরোভাগে, পেছনে পুরুষরা, তারপর মেয়েরা। মন্ত্রী-

পত্নীর শবযাত্রা একটা ঘটনা-বিশেষ, 'পারীর সর্বসাধারণ' এসে হাজির হয়েছে এই উপলক্ষে। শতাধিক মোটর-গাড়ী থেমে রয়েছে আশেপাশের রাস্তাগুলোয় —বুরবঁ-প্রাসাদে বিরাট বিতর্কের দিনে, কিংবা থিয়েটারে প্রথম রজনীর অভিনয়ে এই সব গাড়ীকেই বাইরে থেমে থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন দলের ডেপুটিরা তেসাকে সমবেদনা জানাতে উদ্‌গ্রীব। এদের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—ভীইয়ার, মারশাঁদ, ব্রতৈল আর ওই বুড়ো ঘাগী মার্ব্যা। আইনজীবীরাও আছে, আর আছে তেসা যে-সব ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রতিনিধিরা, এটর্ণী আর ব্যবসায়ী—ব্যারন রথ্‌স্‌চাইল্ড্, দেসের, মিয়েজার, জোলিওর নেতৃত্বে সাংবাদিকের দল, পল মরাঁ, নাট্য-প্রযোজক আর কূটনীতিকরা। এরা বলাবলি করল, জার্মান বৈদেশিক বিভাগের স্থানীয় উপদেষ্টা যে উপস্থিত আছেন, সেটা 'ভাল লক্ষণ'।' আলাদা একটা লরিতে ফুলের মালাগুলো বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। বিরাট একটা গিঁঠওলা মালাক্কা-বেতের ছড়ি আস্ফালন করে জোলিও সাংবাদিকদের বোঝাচ্ছে: 'ফুজে? ও, ওই লোকটা! আরে বাপু, মার্সাই শহরকে তো আমি চিনি...' তেসা এগিয়ে চলেছে ধীর পায়ে, কিন্তু ঘন ঘন রুমালটা বের করে নাক ঝাড়ছে বিষণ্নভাবে।

পের-লাশেস-এ আমালিকে সমাধিস্থ করা হল। এইটাই পারীর সৌখিনতম সমাধিস্থান। তেসা খরচ করতে কার্পণ্য করল না; সুন্দর দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে নিজের জন্যেও তৎক্ষণাৎ খানিকটা জমি কিনে ফেলল। এই রকম করাটাই নিয়ম, জীবনের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের এটাও একটা অংশ মাত্র; প্রত্যেকেই তাই করে। জমি-সংক্রান্ত কথাবার্তা চলল খানিকক্ষণ, প্রতি বর্গ-গজের অমুক দাম, কিন্তু তেসা আলোচনাটাকে মৃত্যুর চিন্তার সঙ্গে জড়িত হতে দিল না, চুক্তিপত্রে সই করে দিল, 'চিরতরে আমার ব্যবহারের জন্য রহিল ...' মান্যগণ্য লোকের কবরের পাশে সমাধিস্থ হওয়াটাই ঠিক। আমালির বাঁ দিকে একজন নৌ-সেনাপতির কবর, ডান দিকে শায়িত আছেন জনৈক সেনেটরের স্ত্রী।

তেসা বহুবার গোরস্থানে এসেছে; মন্ত্রীদের আর ডেপুটিদের সমাধি-অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা তার অন্যতম কর্তব্য। কিন্তু এবার এই সমাধিস্থানটা ভাল করে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হল। এ যে রীতিমত শহর! রাস্তাগুলোর নাম আছে, বাড়ীগুলোয় নম্বর আছে—না ঠিক বাড়ী নয়, সমাধিগৃহ। আর এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চারদিক। ঝোপের শুকনো ডালগুলো ছেটে দিচ্ছে

মালীটা। অবশ্য কবরগুলো বড় ঘেঁসাঘেষি, মৃত্যুর পরে লোকে কেমন যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবু যা হোক, পাড়াটা ভারী চমৎকার। গোরস্থানটা যে একটা শহর, আর জীবনেরই অন্যতম অংশ, এই কথাটা ভেবে তেসা খানিকটা স্বস্তি পেল।

উন্মুক্ত কবরের প্রান্তে তেসা দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দূরে লুসিয়ঁর বাদামী মাথাটা চোখে পড়তেই ঘুরে দাঁড়াল সে। লুসিয়ঁটা একেবারে ওর কাকা রবের-এর মত দেখতে! রবেরটা তো একটা জোচ্চোর... একটা স্মৃতি-স্তম্ভের আড়ালে লুসিয়ঁ অদৃশ্য হয়ে গেল। ও আর কিছু ভাবেনি, শুধু মাকে একবার শেষবারের মত দেখে নিতে এসেছিল—বাড়ীতে যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু এখানে এসে রূপোলী পাতায় অলঙ্কৃত শবাধার, গোরস্থানের কর্তার লোকজনের মাথায় বাহারে টুপি, ব্রতৈলের চাঁচাছোলা মুখ আর জোলিওর ধানশিসের মত নীল রঙের গলাবন্ধনীর দিকে তাকিয়ে লুসিয়ঁ বুঝল, তার মায়ের আত্মা এখানে অনুপস্থিত। ধর'-পড়ে-যাওয়া চোরের মত নিজের চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

শবানুগামীরা সবাই সার বেঁধে দাঁড়াল; যে লোকটা কবর খুঁড়েছে তার পাশ দিয়ে একে একে ঘুরে গেল সবাই, আর যাবার সময় প্রত্যেকে লোকটার হাতে-ধরা একটা থালা থেকে অল্প একটু ধুলো তুলে নিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল। তারপর তারা তেসার করমর্দন করল।

তেসা কতবার এইরকম এক টিপ ধুলো তুলে নিয়ে করমর্দন করেছে বিধবা আর বিপত্নীকদের সঙ্গে! কিন্তু এখন সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলে মনে হল। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—চোখে জ্বালা ধরে যায়। তেসা চোখ দুটো কোঁচকালো। হঠাৎ তার মনে হল, 'হয়ত আমায় গোর দিচ্ছে এরা? সমাধির জায়গা তো দুটো।' তেসার শরীরটা টলে উঠল। কে একজন হাত বাড়িয়ে ধরল তাকে। চারদিকে তাকিয়ে দরময়-এর দাড়িটা তার চোখে পড়ল; মনে মনে ভাবল, 'আর ওরা কিনা বলে, দরময় আমাকে ঘেন্না করে।'

এতক্ষণে তেসা মুখগুলো লক্ষ্য করতে লাগল—ডেপুটিদের মধ্যে কে কে এসেছে। এর থেকে মনে পড়ে গেল চেম্বারে ভোটগ্রহণের কথাটা, আর সে বেঁচে আছে ভেবে খুশি হল। শুধু একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছে সে।

সন্ধ্যার দিকে তেসা এল পলেতের কাছে। মনস্থির করবার আগে অনেকক্ষণ ইতস্তত করেছে সে—ওর কাছে গেলে আমালির স্মৃতির প্রতি অসম্মান দেখানো হবে হয়ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল; তেসা একটু সহানুভূতি আর স্নেহ পেতে চায়। বাড়ীটা বড্ড খাঁ-খাঁ করছে, এটা-ওটা প্রত্যেকটা জিনিসই মনে করিয়ে দিচ্ছে আমালির কথা।

পলেৎ স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী মেয়ে; গলাটা মোটের ওপর বেশ মিষ্টি, পেশাদারী সংগীত-বাসরগুলিতে সে গান গায়, এই সব গানের বিষয়বস্তু কখনো বা অত্যন্ত উচ্ছ্বাস ভরা—নাবিকের বউএর বিরহব্যথা কিংবা মরুভূমিতে সৈনিকের মৃত্যুবেদনা নিয়ে রচিত, আর কখনো বা অত্যন্ত অশ্লীল। আসলে সে জীবনের যৌন-দিকটাকে অপছন্দ করে। ভাল-মানুষ স্বভাবের মেয়ে সে, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনের জন্যেই জন্মেছে; ছোট ছেলেমেয়ে, বাগান আর ছোটখাটো সাংসারিক কাজ ভালবাসে। কৈশোরের এক অত্যন্ত ছেলেমানুষি প্রণয়-ব্যাপারের ফলে পলেৎ ঘটনাচক্রে রঙ্গমঞ্চে এসে পড়ে। তিন বছর আগে তেসার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত। তেসার সঙ্গে এই যোগাযোগের ফলে পলেৎ বেশ একটু গর্ব অনুভব করেছিল: তার মত একজন ছোটখাটো অভিনেত্রীর কাছে তেসার মত একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী, চেম্বারের ডেপুটি এবং সম্প্রতি যে মন্ত্রী হয়েছে—এমন একজন লোক যে যাতায়াত করে—এটা ভেবে পলেৎ খুশি হয়। মফস্বলের জনৈক দোকানদারের অল্পশিক্ষিত মেয়ে সে, ভাল বানান জানে না, ডিটেকটিভ-গল্প ছাড়া আর কিছু পড়েনি কোনদিন। তেসার প্রতি ওর গভীর শ্রদ্ধা: তেসা সবজান্তা, কথা কইবার সময় অজস্র কবিতা আর লাতিন প্রবচন উদ্ধৃত করে, আর আমেরিকার কথা বলে এমন ভাবে যেন গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ালেই দেশটা দেখতে পাওয়া যায়। তেসার জন্যে দুঃখও হয় পলেতের; লোকটা কঠিন পরিশ্রম করে, বউটা চিররুগ্ন আর ছেলেমেয়েদের কোন দরদ নেই বাপের ওপর। তেসাকে আনন্দদান করতে চেষ্টা করে পলেৎ—তার পছন্দ-মাফিক চুল বাঁধে, গলাবন্ধ বুনে দেয়, নানারকম খাবার তৈরী করে খাওয়ায়। অতিরিক্ত আদর দিয়ে তেসা পলেতের মাথাটি খেয়েছে; পলেতের দৃঢ়বিশ্বাস, সে তেসার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। আসলে কিন্তু পলেতের আর একজন প্রণয়ী আছে—আলবের নামে একজন ঘোড়দৌড়ের সওয়ার, এর অস্তিত্ব তেসা কোনদিন সন্দেহ করেনি। এটাকে পলেৎ অবিশ্বস্ততা বলে মনে করে না। সপ্তাহে একবার

পলেৎ এই অশ্বধুরন্ধর ছোকরাটির সঙ্গে ফূর্তি করে—লোকটা দৌড়বাজ-ঘোড়ার নাম ছাড়া আর কিছু জানে না; এমন কি ডিটেকটিভ-গল্পও তার কাছে ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। পলেৎ তার সঙ্গে গল্প সল্প করে না, গলাবন্ধও বুনে দেয় না, খাবার রেঁধেও খাওয়ায় না; শুধু তার প্রেম উপভোগ করে নিঃশব্দে আর লোভাতুরের মত—ক্ষুধার্ত লোকে যে ভাবে খেয়ে চলে, ঠিক সেইভাবে। আলবের-এর কাছ থেকে চলে আসার পর পলেৎ দুঃখিতও হয় না, আত্মগ্লানিও অনুভব করে না।

সারস পাখী আঁকা নীল রঙের একটা জাপানী মেয়েদের পোষাক পরে পলেৎ ঘরে বসে আছে, এমন সময় দরজার ঘণ্টিটা বেজে উঠল। তেসাকে দেখে ও অবাক হয়ে গেল, তেসা আজ আসবে বলে পলেৎ মোটেই আশা করেনি। নিশব্দে সে তেসাকে অভ্যর্থনা জানাল, ঘরে গিয়ে পাশে বসল, আর তার জামার কলারটা খুলে দিল। তেসার বড় অদ্ভুত লাগছে নিজেকে, সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতেও পারছে না। গভীর সহানুভূতিতে ভরে উঠল পলেতের মন। কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না, নিস্তব্ধতা অসহ্য হয়ে উঠল। তেসাই প্রথম কথা কইল:

'মার্সাইএ যখন অগ্নিকাণ্ডটা ঘটল, সবাই বলল, ওটা দুর্লক্ষণ। আমি ওসব কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না। সে যাই হোক, মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হতে হয়. .'

পলেতের অনেক কুসংস্কার আছে—মইয়ের তলা দিয়ে যেতে সে ভয় পায়, আয়না ভেঙে গেলে কান্নাকাটি করে। তেসার কথায় অস্বস্তি বোধ করল সে। হয়ত সত্যিই কোন অজ্ঞাত শক্তি আছে? কিন্তু তেসা ইতিমধ্যেই অন্য কিছু বলতে শুরু করেছে:

'এ সময়ে এরকম ব্যাপার ঘটা বড় সাংঘাতিক! একেবারে বেসামাল হয়ে পড়েছি আমি, অথচ কাজ করে যেতেই হবে আমায়। ওরা সাধারণ-ধর্মঘটের জন্যে তৈরী হচ্ছে। একটা দুর্দৈব ঘটে যাবে, দেখছি। মাত্র একচুলের জন্যে আমরা যুদ্ধটা কোনক্রমে এড়াতে পেরেছি…'

পলেৎ পুরনো আর্মাঞ্যাক্ মদের একটা বোতল বের করল। হাত দিয়ে গেলাশটা গরম করে নিয়ে তেসা খেয়ে ফেলল পানীয়টা। আবার ক্লান্তি পেয়ে বসল তাকে—কবরের পাশে যেমন হয়েছিল। সমস্ত ঘুলিয়ে ফেলল সে, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'দুটো জমি কিনেছি, জান?' পলেৎ মুখ ফিরিয়ে নিল।

তেসা মনে মনে ভাবল, 'আমিও ঠিক এই রকমই করেছি—আমালির প্রতি।' শার্টের নীচে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নিজের বুকটা চেপে ধরল তেসা ; দেহের উত্তাপ অনুভব করে স্বস্তি পেল—বেঁচে আছে সে! নিজের জন্যে আর পলেতের জন্যে আরও খানিকটা মদ ঢেলে নিয়ে পরস্পরের গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে আওয়াজ করে তেসা বলে উঠল :

'তোমার শুভকামনা করি। আমার স্নায়বিক উত্তেজনা শান্ত করার জন্যে ডাক্তার কি একটা ওষুধ দিয়েছে। সে তো বলে, আমালি কোন কষ্ট পায়নি। সে যাই হোক, ঘটনাটা বড় সাংঘাতিক! কি যে ঘটে গেল কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমালির পক্ষে ব্যাপারটা সহজ ; তার মনে বিশ্বাস ছিল। নরকে যাবার বড় ভয় ছিল ওর। কিন্তু আমার ভয়টা কিসের কি জানি। নৌ-সেনাপতি লেপেরিএ-র পাশেই···'

আরেকবার মদ খেল তারা। পলেতের পোষাকের দিকে তাকিয়ে তেসা বলল, 'কী ছেলেমানুষি পোষাক! পাখী আঁকা কেন?'

ঘরটার চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখল সে—যেন এর আগে আর কখনো আসেনি এখানে। একটা কাঁধ-উঁচু পিয়ানো, দেয়ালে ঝুলছে খুব জাঁকালোভাবে সই করা অভিনেতাদের ছবি, একটা আরাম-কেদারা আর ডজন খানেক উজ্জ্বল রঙের কুশান। আর্মাঞাক্ মদটা চমৎকার, ভারী চমৎকার। 'এই মদটা পেলে কোথায়?···ওর সাধ ছিল, পাদ্রীরা যেন ওকে কবর দেয়। আমার তাতে আপত্তি ছিল না! কিন্তু আমার রাজনৈতিক পদবীটাও তো দেখতে হবে। অবশ্য, ব্রতৈল ভারী খুশি হত, কিন্তু বামপন্থী দলটার সঙ্গেও মানিয়ে চলতে হবে আমায় ; ওরা ইদানীং বিশ্রী মেজাজে আছে। আর আমালির কাছে এখন সবই সমান—ও তো আর শুনতে আসছে না কিছু। ওকে ডাকলেও আর সাড়া দেবে না···ও সবই আমি ভেবে দেখেছি। পলেৎ, লক্ষীটি, একটা দুঃখের গান গেয়ে শোনাও আমায়।'

'মাগো! তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই!···'

২১

হলদে, তামাটে, ধূসর রঙের কুয়াশায় ঢাকা নভেম্বরের সকাল। শহরতলীর ঘিঞ্জিতে বিষণ্ণ বাড়ীগুলোর ভিজে দেওয়াল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে। এবারের

হেমন্তে একটা হতাশার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে জনসাধারণের মন। ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মকালে শ্রমিকদের যতগুলো জয়লাভ হয়েছিল, একে একে তা সবই তারা হারিয়েছে। প্রত্যেকটি সরকারী ঘোষণায় নতুন নতুন বিধি-নিষেধ আর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয়েছে তাদের ওপর। সপ্তাহে খাটুনির ঘণ্টা বেড়ে গেছে, অতিরিক্ত-সময়ের খাটুনির মজুরি কমে গেছে, শ্রমিকদের প্রাণধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত মাইনের ওপরেও আবার কর চাপানো হয়েছে। এলোমেলোভাবে ধর্মঘট বেধে যাচ্ছে। পুলিশ ধর্মঘটীদের হাঁকিয়ে দিচ্ছে কারখানা থেকে, যারা কারখানার দরজায় পিকেটিং করছে, তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে কাঠগড়ায়; আর বিচারপতিরা 'দলের পাণ্ডা'দের ওপর কঠিন দণ্ডদান করছেন। দেশ শাসন করছে যারা, তাদের মধ্যে আছে—দালাদিএ, যে অল্প কিছুকাল আগেও প্লাস্ দ্য লা বাস্তিল্-এ মুঠি-আস্ফালন করে বলেছিল, 'আমি রুটিওলার ছেলে, জনগণের বন্ধু'; আর আছে, তেসা, যার পক্ষে পোয়াতিএরের কমিউনিস্টরা ভোট দিয়েছিল। দেশ জোড়া গভীর হতাশা। খবরের কাগজের কাটতি কমে গেছে। সভা-সমিতিতে হল-ঘরের অর্ধেকটাও ভর্তি হয় না। মজুররা জড়ো হয় যে সব কাফেতে, সেখানে একটা ক্লান্ত নিস্তব্ধতা নেমেছে। স্পেনের মৃত্যুযন্ত্রণা লক্ষ্য করে সবাই বলাবলি করছে, 'এবার আমাদের পালা।'

মজুরদের ওপর জুলুম চালালে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে তা ভেবে দালাদিএ আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। ফ্রান্সকে যে কী গভীর ক্লান্তিতে পেয়ে বসেছে, সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই নেই; আর তার প্রতিপক্ষের লোকেরা তো স্বপ্ন দেখছে। ট্রেড ইউনিয়নগুলো একদিনের জন্যে সাধারণ ধর্মঘট করবে বলে স্থির করল। অনেকদিন আগে থেকেই তারা ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করে দিল। তেসা আমালির সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে চাঙ্গা হয়ে উঠল: সে হল প্রধান নির্দেশদাতা। আর একবার দেওয়ালগুলো ছেয়ে গেল শাদা ইস্তাহারে—সামরিক আদেশজারী ঘোষণা হয়ে গেল, রেলকর্মীদের, যুদ্ধোপকরণ তৈরীর কারখানার শ্রমিকদের আর অন্যান্য সার্বজনীন সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাধারণভাবে সৈনিকদের সমপর্যায়ভুক্ত করে নেওয়া হল। গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করল, যে ধর্মঘট করবে তাকেই সৈন্যদলত্যাগী হিসেবে গণ্য করা হবে। আত্মসন্তুষ্টির হাসি হেসে তেসা জাহির করল, 'ফন্দিটা আমারই। একবার খালি চালু করতেই যা একটু মুশকিল। কিন্তু এখন তো সামরিক আদেশ জারীটা বলতে গেলে একটা স্বাভাবিক ঘটনা বলেই বুঝে নিয়েছে সবাই।'

তেসার সঙ্গে আলোচনার পর জোলিও তার কাগজে লিখল, হরতাল করা মানেই জার্মানদের খপ্পরে গিয়ে পড়া—'ফরাসীগণ! মস্কো-মোহমুগ্ধ গ্রীকদের উপহার লইতে বিরত হউন!'

দেসেরের পরাজয়টাই সাম্প্রতিক আলোচনার একমাত্র বিষয় হয়ে উঠল। কারখানা মালিকদের এক সভায় সে আপোষরফার কথা তুলেছিল: শ্রমিকরা প্রস্তাবিত ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেবে আর সরকারপক্ষও নতুন যে সব আদেশ জারী করা হয়েছে সেগুলো পুনর্বিবেচনা করে দেখবে। মালিকরা রাগে বিরক্তিতে ফেটে পড়ল: তারা কি কমিউনিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করবে নাকি? দেসের বৃথাই বোঝাতে চাইল, যুদ্ধের হুমকি আমাদের সামনে। এ সময়ে শ্রমিকদের চটানো ঠিক নয়।' সক্রোধে গর্জন করে উঠল মতিনি, 'ওসব বন্ধ করে দেবার সময় এসেছে। হিটলার আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। হরতাল করতে দাও একবার, তারপর ওই কমিউনিস্টদের সাফ করে দেব কারখানা থেকে।'

বগল থেকে থার্মোমিটারটা বের করে নিয়ে ভীইয়ার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সাড়ে নিরানব্বুই।' ইনফ্লুয়েঞ্জা তাকে দায়িত্বের হাত হতে নিষ্কৃতি দিয়েছে। র‍্যাডিকালদের নীতিতে ভারী বিরক্ত হয়ে সে বলেছে, 'ওরাই মজুরদের ঠেলে দিচ্ছে কমিউনিস্টদের কোলে। এর পরিণামে বিপ্লব বাধবে আর ফ্যাশিজম জয়ী হবে।' ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হবার আগে অস্পষ্ট ভাষায় লেখা এক প্রবন্ধে সে বলেছিল, 'প্ররোচনার বিপদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। সরকারের নতুন আদেশ-জারীর বিরুদ্ধে ন্যায়-সঙ্গত প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে যদি শ্রমজীবীরা অসহযোগ করে বসে, তাহলে সেটা একটা জাতীয় দুর্বিপাকে পর্যবসিত হতে পারে।' সে হরতালকে সমর্থনও করেনি, নিন্দাও করেনি। কিন্তু তার বন্ধুদের মধ্যে দু-চারজন শ্রমিকদের আবেদন জানিয়েছে ধর্মঘট না করবার জন্যে।

পারীর বাসিন্দারা সকালে তাদের ঘরের জানলা খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে উদ্বেগের সঙ্গে ভাবল, আজ কি ঘটে যায় কে জানে! কাফের আঙিনাগুলো জমজমাট করে তুলেছে তারা। বিষণ্ণ কুয়াশাচ্ছন্ন আজকের এই সকালটা। কিন্তু কারখানাগুলোর কাছাকাছি শিরোস্ত্রাণগুলো ঝলসে উঠেছে। রেল স্টেশনে, সরকারী আপিসে আর ডাকঘরগুলোয় স্পেশ্যাল পুলিশ-বাহিনীর ছোট ছোট দল মোতায়েন আছে। বাসচালকদের পাশে একজন করে পুলিশ বসে

রয়েছে। ঘোড়ার লেজের ঝালরওলা পিতলের শিরোস্ত্রাণ শোভিত শান্ত্রীরা রাস্তায় পায়চারি করছে এদিক ওদিক। সবাই বলাবলি করছে—কঠিন সাজার কথা, সারবন্দী অপরাধীর দল, আর লম্বা হাজতবাস...

প্রবীণ মজুরদের মধ্যে একটা থমথমে নিরুৎসাহ ভাব; ধর্মঘট ভেঙে যাবে বলে ওদের সন্দেহ। আজকের দিনটা দেনিসের পক্ষে সংগ্রামে দীক্ষিত হবার দিন। গভর্নমেণ্ট যে এ আঘাতের সামনে দাঁড়াতে পারবে না, এ সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। তারপর হবে এ কলঙ্কের অবসান। পারীর মজুররা বাঁচাবে স্পেনকে, যে স্পেন হৃতশক্তি হয়েও আজও বেঁচে আছে।

আজকের এই দিনটির জন্যে দেনিস অনেকদিন ধরে তৈরী হচ্ছে। এক-একবার মনে হয়েছে, হয়ত ততখানি শক্তি, সব দিক সামলাবার ক্ষমতা আর সাহস তার নেই। সে অনুভব করেছে—মিশোর চিঠি থেকে এব্রোর যোদ্ধাদের বীরত্বের কথা যদি সে পড়ে শোনায়, তাহলে দুর্বলচিত্তদের মনে লজ্জা জাগবে। যদি কোন মিলিটারী এসে তাকে বাধা দেয়, তাহলে সে তাকে বলবে: তোমরা আমাদের ভাই! দেনিসের শুকনো, জ্বলজ্বলে দুই চোখে তার মানসিক অতিপ্রয়াসটা প্রকাশ পাচ্ছে।

শ্রমিকদের এক সভা চলছিল। কেউই কাজে যায়নি। এমন সময় একজন এসে খবর দিল, ঢালাই-ঘরের মজুরদের একটা অংশ কাজে যোগ দিয়েছে। শ্রমিকরা 'তরুণ যোদ্ধা'র গানটি গাইবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বিষণ্ণ এক নিস্তব্ধতার মধ্যে তাদের গলার স্বর ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। বড় ইঞ্জিনীয়ার কারখানা-ঘরে ঢুকলেন, তাঁকে ঘিরে রয়েছে কতকগুলো সাধারণ পোষাক-পরা পুলিশের লোক; ওদের একজনকে একটা রিভলভার আস্ফালন করতে দেখা গেল। ইঞ্জিনীয়ার বললেন, 'তোমরা যদি কাজ করতে না চাও, তাহলে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, এ জায়গা ছেড়ে চলে যাও।' তীব্র প্রতিবাদের চিৎকারে তাঁর কথার উত্তর এল! ইঞ্জিনীয়ার হাত নেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু পুলিশগুলো থেকে গেল। তারপর মজুররা নীচু গলায় আলোচনা শুরু করল—তাদের কি করা উচিত।

'ঢালাই-ঘরে ওরা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।'

'কিচ্ছু হবে না এই ধর্মঘটে।'

দেনিস চেঁচিয়ে উঠল, 'কমরেড্‌স্!'

সাধারণ পোষাক-পরা পুলিশের লোকরা তাকে ধরে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। একজন মুচড়ে ধরল তার হাতটা।

মজুরদের মধ্যে জনকতক কাজে যোগ দিল; বাদবাকী সরে পড়ল। যারা ততটা নিরীহ নয়, তাদের মধ্যে জন বারোকে বাইরে কারখানার আঙিনায় ধরে আনা হল। পাশের একটা রাস্তায় পুলিশের একটা কয়েদী চালান দেবার গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গ্রেপ্তার-করা লোকদের ওরা পাঁজাকোলা করে ছুঁড়ে দিল গাড়ীটার মধ্যে ; এই ছুঁড়ে দেবার প্রক্রিয়াটার ফলে একজনের দাঁত ভেঙে গেল। দেনিসের পোষাক ছিঁড়ে দিল ওরা। কমরেডদের সে বলল, 'আমাদের লোকরা কেউ নড়বে না!' নিজের গ্রেপ্তার হওয়া আর শারীরিক বেদনাটাকে সে দেখছে কাজের পুরস্কার হিসেবে। সঙ্গী কমরেডদের দমে যাওয়া ভাব কিংবা হাজতের নোংরা অন্ধকার ঘর—কিছুতেই তার উৎসাহ কমবে না।

পুলিশ তাকে খানাতল্লাসী করল। গোঁফওলা শান্ত্রীটার মুখে মদের গন্ধ ; মোটা চওড়া হাতটা দেনিসের সর্বাঙ্গে বুলিয়ে দিতে দিতে লোকটা কতকগুলো অশ্লীল টিপ্পনী কাটল। ফাঁকা চোখে দেনিস তাকিয়ে রইল, যেন সে সেখানে নেই। তার একমাত্র চিন্তা, ধর্মঘট কি করে চলবে।

পারীর অন্য প্রান্তে, বিলাঁকুর-এ 'সীন' কারখানার ওপর হামলা চালাবার আয়োজন চলেছে। দেসের তার টেবিলের কাছে ঘোলাটে চোখে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছে। পাইপটা জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নিভন্ত অবস্থা-তেই রেখে দিয়েছে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার ; বাঁ হাতে আর কাঁধে বেদনা হয়েছে ; অস্পষ্টভাবে ভাবছে, হৃদ্‌পিণ্ডে বাত ধরল কিনা। জীবনে এই প্রথম দেসের একটা অসহায় ভাব অনুভব করেছে। মালিকদের মূর্খতা আর দূরদর্শিতার অভাব দেখে সে অবাক হয়ে গেছে। ওরা সবাই অন্ধ। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেশটাকে? ধর্মঘট বন্ধ করার জন্যে সে যথাসাধ্য করেছে। দালা-দিএ, তেসা, ফ্রসার—এদের সঙ্গে আলোচনা করেছে, নিজের যুক্তি বিস্তারিত করেছে, ওদের নিজের মতে আনবার চেষ্টা করেছে। ওরা তার কথা ভদ্র-ভাবে শুনে গেছে, তারপর বলেছে, 'কমিউনিস্টদের সাবাড় করে দিতেই হবে আমাদের।' শিল্পপতিরা নিজেদের মধ্যে দৃঢ় ঐক্যের দাবী জানিয়েছে। তারা দেসেরকে বলেছে, 'তুমি আমাদের সমিতির একজন সভ্য।' দেসের ভেবেছিল নিজের কারখানাগুলো দু-একদিনের জন্যে বন্ধ রাখবে। অবস্থাটা এইভাবে-সামলানো যেত, জোর-জবরদস্তি প্রয়োগেরও কোন দরকার হত না। কিন্তু তেসা

চেঁচাতে লাগল, 'বিশ্বাসঘাতকতা! একথা শুনে চেম্বার কি বলবে?' ইঞ্জিনীয়াররা গজ্‌রাতে লাগল, 'গভর্নমেণ্ট যদি কমিউনিস্টদের শায়েস্তা না করে তাহলে আমরাই প্রতিরোধ-সংগঠন গড়ে তুলব।' মতিনি ভীষণ গণ্ডগোল বাধাবে বলে শাসাল। সুতরাং দেসেরকে পথ ছেড়ে দিতে হল। সে রইল শুধুমাত্র একজন দর্শক হিসেবে। আর, এখন সে বসে রয়েছে তার টেবিলের সামনে, ক্লান্ত ভাবে অপেক্ষা করছে ঘটনার সংবাদের জন্যে।

লেগ্রের আশঙ্কা হচ্ছে, ধর্মঘট ভেঙে যাবে। মজুররা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, বিশ্বাসের জোরও হারিয়েছে। কিন্তু মালিকরা হুম্‌কি দেখানোয় তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল; চেঁচিয়ে বলল, 'ডরাই না তোমাদের!' এমন কি, হরতাল করবার বিরুদ্ধে ছিল যে সব মজুর, তাদেরও আর কিছু বলাব রইল না। ধূসর কুয়াশার মধ্যে লাল ঝাণ্ডা উড়তে লাগল। কারখানা-ঘরে আর মিলের আঙিনায় লড়াইয়ের জন্যে তৈরী হল শ্রমিকরা।

কারখানার আপিস কুঠিতে ইঞ্জিনীয়াররা সবাই পিয়েরকে ঘিরে ধরল; বলল, 'বক্তৃতাবাগীশ!', 'মস্কোর দালাল!' রাগে পাগল হয়ে পিয়েরও চিৎকার করে জবাব দিল, 'ফ্যাশিস্ট! নাৎসী!'

প্রায় ঘুষোঘুষি বাধে, এমন সময় দেসের ডেকে পাঠাল পিয়েরকে, বলল, 'বাড়ী যাও তুমি। ভারী বিশ্রী ব্যাপার। এটা ১৯৩৬ নয়। ওরা চেয়েছিল যাতে ধর্মঘটটা বাধে। আর তুমি শুধু শুধুই মাথা খুঁড়ছ। ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে ওরা তোমাকে পাকড়াও করবে। তখন আমি আর তোমাকে বাঁচাতে পারব না।'

'আপাতত আমি নিজের কথা ভাবছি না।'

'ভুল করছ। তোমার স্ত্রী-পুত্র আছে। আদর্শবাদের কথা যদি বল, ওসব ছাড়! তোমরা তো ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত করে নিয়েছ যে ভীইয়ারটা একটা বুড়ো সঙ। অন্যেরাও তাই। তোমায় এখন গায়ের চামড়া বাঁচাতে হবে।'

'তুমি তাই করছ বটে। হ্যাঁ, চামড়া বাঁচাবার চেষ্টাই করছ তোমরা। মিউনিকে তাই করেছিলে, এখানেও করছ। কিন্তু এবারে তোমরা আর পারবে না।'

পিয়ের যখন বাইরে এল, শ্রমিকদের মধ্যে থেকে হাজার হাজার বজ্রমুষ্টি উত্তোলিত হল: 'ইঞ্জিনীয়ার দ্যুবোয়া আমাদের সঙ্গে আছেন!' এই কর্কশ-স্বভাব, ক্রুদ্ধ লোকগুলোর আন্তরিক প্রীতি এসে পৌঁছল তার কাছে।

পুলিশের বড়কর্তা ভীড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে দেখা করতে এলেন দেসেরের সঙ্গে।

বিরক্তিতে কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে দেসের বলল, 'আমি একেবারেই অক্ষম। তোমাকেও পরামর্শ দিই, পীড়াপীড়ি একদম কোরো না।'

'দুর্ভাগ্যবশত, আমার ওপর হুকুম আছে।'

পুলিশ দেখে মজুররা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের মধ্যে কারও কারও হাতে ইঁট কিংবা লোহার ডাণ্ডা। পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ছাড়বার পাইপ বাগিয়ে ধরল। ফটকটার কাছে দাঁড়িয়েছিল লেগ্রে।

অদৃষ্ট আর একবার তার হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। মনের কথাটা এখনো সে জোসেৎ-এর কাছে ব্যক্ত করেনি। কিন্তু মাস খানেক আগে থেকে তার জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে। জোসেতের বাবার সঙ্গে পার্টি তহবিলের জন্যে সে দেখা করতে গিয়েছিল। চলে আসবার সময় জোসেৎ জিজ্ঞাসা করল, সে কোনদিকে যাবে। লেগ্রে বলল, সে যাবে সুরেনে-র দিকে। 'আমিও ওই দিকেই যাচ্ছি,' বলল জোসেৎ। সময়টা ছিল হেমন্তের এক বৃষ্টি-ভেজা বিকেল। ওরা দুজনে—যে জন্যেই হোক, নদীর কোল-ঘেঁষা ফাঁকা পথটা ধরে সাঁকো পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এল। শেষে জোসেৎ বলল, 'তুমি না এলে আমার মন বড় খারাপ করে।' লেগ্রে বলল, 'সত্যি?' তারপর বলল, 'আমার বয়স বড্ড বেশী তোমার পক্ষে। আমি—' জোসেৎ কথাটা শেষ করতে না দিয়ে চুমু খেয়েছিল তাকে। আর এখন বেধে গেল এই হরতাল। মনের আবেগকে প্রশ্রয় দেবার সময় নেই লেগ্রের। শুধু মাঝে মাঝে একটা চিন্তা তার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, 'জোসেৎ-এর কি হল কি জানি!'

ওপরের রসায়নাগার থেকে পিয়ের পুলিশকে ফটক ভেঙে ঢুকতে দেখল। ওরা ছুটে গিয়ে পড়ল লেগ্রের ওপর। লেগ্রে জোয়ান লোক, বাধাও দিল, কিন্তু ওরা ওকে পেড়ে ফেলল মাটিতে। জানলাগুলো থেকে এক ঝাঁক ইঁট উড়ে এসে পড়ল। পিয়ের ছুটে নেমে এল নীচে। হঠাৎ চোখে একটা ভয়ানক জ্বালা অনুভব করল সে। দরজাটা চেপে ধরল নিজেকে সামলাবার জন্যে। আঙিনায় লোকজন ছোটাছুটি করছে। কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গ্যাস!'

জানলায় দাঁড়িয়ে আছে দেসের। সমস্তই দেখল সে; বিষণ্ণভাবে নিজেকে শুধোল, 'এই কি ফ্রান্স?' এই কি তার দেশ, যে দেশকে সে ভালবাসে? সে দেশ আর নেই। সেই অমায়িক, খুশি-ভরা ফ্রান্সের দিন গেছে—যে-ফ্রান্সের শ্রমিকরা মালিকদের সহৃদয়ভাবে গাল পাড়ে আর সেই মালিকের গেলাশের সঙ্গে গেলাশ ঠেকিয়ে মদ খায়, যেখানে লোকে অগ্নিময়ী ভাষায় বক্তৃতা দেবার

পরেই ডিনার খেতে বসে, মাংসের তরকারীর চমৎকার আস্বাদ পেয়ে 'সমাজ-বিপ্লবের' সব কথা ভুলে যায়, যে দেশের সবাই ভালবাসে ফুল আর রসিকতা। এই কাল্পনিক অলীক ফ্রান্সকে সে বাঁচাতে চেয়েছিল। সে দেশ আজ স্মৃতি-মন্থনে পর্যবসিত; পুঁথির কাহিনীতে, রূপকথার রাজ্যে আজ সে দেশ আশ্রয় নিয়েছে। সেই ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করতে চায় সে—গ্যাস ছেড়ে! যা হয় ওরা করুক গে যাক! এখন আর সামলাবার কোন উপায় নেই। নিজেকে বাঁচাবার কথাটা তাকে ভাবতেই হবে, তামাক খাওয়াটা কমাতে হবে, শরীরের যত্ন নিতে হবে। জিনেৎকে ফোনে ডাকবে সে, এক্ষুনি বেরিয়ে পড়বে, চলে যাবে জাভায় কিংবা চিলি-তে।

পুলিশ প্রায় একশ জন মজুরকে ধরে নিয়ে গেল। যাদের গ্রেপ্তার করে আনা হল, তাদের নিয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে হাজতের কর্তৃপক্ষ মুস্কিলে পড়ল; আধ ঘণ্টা অন্তর দফায় দফায় লরিতে নতুন লোক এনে হাজির করা হচ্ছে।

পুলিশদের কথাবার্তা দেনিস আগ্রহের সঙ্গে শুনল। ওরা ভয়ানক রেগে আছে। তার মানে, ধর্মঘট সফল হয়েছে। মাঝে মাঝে ঘরে নতুন বন্দীদের এনে ঢোকানো হচ্ছে। একজন টেলিফোন-কর্মী বলল, সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে। হামলা চালাতে ভয় খেয়েছেন ওঁরা। সুড়ঙ্গ-রেলপথের একজন শ্রমিককে নিয়ে আসা হল; লোকটার মুখময় রক্ত। একটু জিরিয়ে নিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'কাপুরুষের দল!' সুড়ঙ্গ ট্রেন চলাচল করছে। সন্ধ্যার দিকে দেনিস জানতে পারল, শুধু বড় বড় কারখানাগুলোতেই হরতাল চলেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে, এমন সময় পুলিশ আরও তিনজন মজুরকে ঠেলে দিল ঘরের ভেতর। তারা বলল, 'সীন'-এ সবাই হরতাল করেছে। ওখানেই ছিল সবাই শেষ পর্যন্ত। পুলিশ গ্যাস ছেড়েছে।'

'গ্যাস' কথাটা শুনে সবাই শঙ্কিত হয়ে উঠল। টেলিফোনের মেয়েটি কাঁদতে শুরু করল! কিন্তু দেনিস দাঁড়িয়ে উঠে গান জুড়ে দিল। অন্যেরাও গলা মিলাল। পুলিশ মার লাগাবে বলে শাসানো সত্ত্বেও গেয়ে চলল ওরা। আশে পাশের জেল-কুঠরীতে যারা রয়েছে তাদের কানেও পৌঁছল সেই গান। জেলের স্যাঁতসেঁতে চামড়ার গন্ধে আর ইঁদুরদের গর্তে ভরা ভাঙাচোরা বারান্দা দিয়ে ভেসে চলল সেই গানের সুর। সেই গানে প্রকাশ পেল সাহস, ক্রোধ আর ভ্রাতৃত্বের আবেগ। 'সীন', 'নোম' আর 'রেনো' কারখানার শ্রমিকরা গলা মিলিয়ে গাইল সাইবেরিয়ার পার্টিসানদের গান।

সন্ধ্যাবেলায় দালাদিএ বেতারে এক বিবৃতি দিল। নিজের পাঠগৃহে একা মাইক্রোফোনের সামনে বসে বক্তৃতা দেবার সময় সে ফাঁকা ঘরে শূন্যচোখে তাকিয়ে রইল, তার কপালের শিরা ফুলে উঠল।

'গভর্নমেণ্ট জয়লাভ করেছে।'

মিউনিক থেকে এবং আরো অনেকবার পশ্চাদপসরণের পর সে এতদিনে 'জয়লাভ' এই মিষ্টি কথাটা ব্যবহার করতে সমর্থ হল।

বন্দীদের জেরা শুরু হল। 'দেনিস তেসা'—এই নামটা শুনে জেল-দারোগা হাসল :

'তুমি ওঁর কোন আত্মীয়া নও, আশা করি?'

তার ওপর যে কোন অত্যাচারই হোক না কেন, দেনিস ভেঙে পড়বার মেয়ে নয়। কিন্তু যে ব্যাপারটাকে সে সবচেয়ে ভয়ংকর বলে মনে করে, এই লোকটা ঠিক সেইখানেই তাকে ধরে ফেলেছে। প্রথমটায় চুপ করে রইল সে, তারপর ভাবল ব্যাপারটা গোপন করা আরো অপমানজনক।

'আমি আপনাদের মন্ত্রীর মেয়ে। কিন্তু এ ঘটনার সঙ্গে ও ব্যাপারের কোন সম্বন্ধ নেই। আমি কমিউনিস্ট। আপনার জেরা চালিয়ে যেতে পারেন...'

চোখ কুঁচকে মুখখানা বিকৃত করে জেল-দারোগা এল জেলের ছোটকর্তার কাছে। সে বড়কর্তাকে খবরটা দিল।

তেসা ঘুমোচ্ছিল। 'অত্যন্ত জরুরী' কাজের ঘণ্টাটা বেজে ওঠার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ভারী গরম গেছে সারা দিনটা। যখন যা রিপোর্ট এসেছে, তেসা সেক্রেটারীর কাছ থেকে সমস্ত জেনে নিয়েছে আর সর্বক্ষণ হাজতের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ রেখেছে। অনেক রাত না হওয়া পর্যন্ত সে দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তারপর রাত তিনটেয় স্নান করেছে। স্নানঘরের টালিগুলো ঝকঝকে শাদা, জলটা যেন নীল রঙের। নিজের সরু পায়ের দিকে তাকিয়ে সে 'রিগোলেত্তো' থেকে গুনগুনিয়ে একটা গানের তান ভাঁজতে শুরু করে দিল। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে ওদের, আর কখনো হরতাল করবে না! এখন শুধু দক্ষিণপন্থীরা যাতে ব্যাপারটাকে খুব বেশী ভাঙিয়ে বাহাদুরী নেবার চেষ্টা না করে, সেটা দেখতে হবে!

আধ-জাগা অবস্থায় সে টেলিফোনের কথাগুলো শুনে গেল : 'আপনার মেয়ে এর সঙ্গে জড়িত।' সঙ্গে সঙ্গে সে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিল। সে এখন পুলিশ-কর্তৃপক্ষের হাতের মুঠোয়! ব্রতৈল যে ব্যাপারটা জানতে পারবে না,

তার কি নিশ্চয়তা আছে? খবরের কাগজগুলোর পক্ষে তো মরশুম লেগে যাবে! কী সাংঘাতিক ডাইনী এই ক্ষুদে মেয়েটা!

জেলের বড়কর্তার পড়ার ঘরে পলেস্তারার তৈরী বিজয়া-দেবীর এক আবক্ষ প্রতিমূর্তির পাশে তেসা দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় দেনিসকে নিয়ে আসা হল। তার পোষাক ছেঁড়া খোঁড়া, চুল এলোমেলো, মুখখানা বিনিদ্র রাত্রি-যাপনের ফলে বিবর্ণ। এই কিনা তার মেয়ে—যার শরীরের কথা ভেবে সে এত উদ্বিগ্ন, স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্যে যাকে সে কতবার পাহাড়ে দেশে নিয়ে গেছে, আর সবচেয়ে ব্যয়সাধ্য চিকিৎসা করিয়েছে। তেসা ক্ষোভটা সামলাবার চেষ্টা করে সংযত স্বরে কথা বলল, কিন্তু গলাটা তার কেঁপে উঠল:

'দেনিস, আমি তোমায় খালাস করে নিয়ে যেতে এসেছি।'

সে নিজের একটা কার্যক্রম ঠিক করে রেখেছিল: পুলিশের বড়কর্তাকে সে বলবে—দেনিস জনগণের জীবন নিয়ে একটা উপন্যাস লিখছে, সেই জন্যেই সে সমস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে জেনে নেবার জন্যে একটা কারখানায় ঢুকেছিল। দেনিসকে সে সঙ্গে করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তার শূন্য গৃহ আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। কী আদরেই সে রাখবে ওকে!

দেনিস বলল, 'তাহলে, আমাদের সবাইকেই খালাস করে দিতে হবে তোমাদের।'

দেনিসের এই কথাগুলো, তার গলার স্বর আর এই অপ্রত্যাশিত 'তোমাদের' বহুবচন-সম্বোধনে তেসা হতবাক হয়ে গেল।

'দেনিস!'

চুপ করে রইল দেনিস। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে ভিন্ন জগতের একজন লোক। গতকাল সে তার অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

তেসা আত্মহারা হয়ে পড়ল। 'খালাস করে দিতে হবে ওই গুণ্ডাগুলোকে? কী বলছিস খেয়াল আছে?'

'গুণ্ডা কারা? জার্মানদের সঙ্গে তোমরা কাপুরুষের মত ব্যবহার করেছ। আমরা তৈরী ছিলাম না, সেই জন্যেই বোধহয় তোমাদের গ্যাস ছাড়ার দরকার পড়েছিল!'

'তোদের ওই কমিউনিস্টরা জার্মানদের দালালী করছে। কাল যখন তোরা হরতাল করছিলি, তখন ইতালিয়ানরা নীস্ আর করসিকার জন্যে দাবী পেশ করেছে। এই হচ্ছে ধর্মঘটের প্রথম ফল।'

'তোমরাই জার্মানদের দালালী করছ। বিমান-কারখানার কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল কারা? তোমরা যা করেছ, তা আর তোমাদের বলতে হবে না। ফুজের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্যে তোমরা বোম্বেটেদের লেলিয়ে দিয়েছিলে......'

'মিথ্যে কথা! একেবারে মিথ্যে! নির্বোধ তুই, যে যা বলে তাই বিশ্বাস করিস। তোরা ভেড়ার পাল!'

অনেকক্ষণ ধরে সে চিৎকার করে গালাগাল দিয়ে চলল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল, কি লাভ বলে? একটা বিদ্‌ঘুটে ধারণায় পেয়ে বসেছে ওকে। ওর চোখ খুলে দেওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা চাপা দিতে হবে।

তেসা বলল, 'তর্ক করব না আমরা। আমাদের উভয়েরই নিজস্ব নীতিতে বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার কথাটা তোমাকে বুঝে দেখতেই হবে। ব্যাপারটা যদি কাগজে বেরোয়, তাহলে আমাদের দু-পক্ষেরই সাধারণ শত্রু ওই ব্রতৈল আর তার ফ্যাশিস্ট দল ভারী খুশি হবে।'

'ব্রতৈলের চেয়ে তোমরা ভাল কিসে?'

'সব কিছুই তোমরা রাজনীতিতে এনে দাঁড় করাও। হৃদয় বলেও একটা জিনিস আছে। আর যাই হোক, তুমি আমার মেয়ে। তোমার পরলোকগত মাকে স্মরণ কর। কী সহৃদয়া ছিলেন তিনি! দেনিস, আমি তোকে মিনতি করছি, ঘরে ফিরে আয়! তোর মায়ের নামে অনুরোধ করছি!'

দেনিসের আর সহ্য হল না। চেঁচিয়ে উঠল সে:

'চুপ কর! অতি জঘন্য লোক তুমি!'

একথা বলার জন্যে পরে সে নিজেকে দোষ দিয়েছে: নিজের যন্ত্রণাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছিল সে।

কিছু না করতে পেরে তেসাকে ফিরে যেতে হল। জেল-কর্তার ওপর চাপ দিতে বাধ্য হল সে। দেনিসের গ্রেপ্তারের খবরটা কাগজে অপ্রকাশিত রইল, দণ্ডাজ্ঞার কথাটাও উল্লেখ করা হল না। 'নোম' কারখানার অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে তারও বিচার হল; সকলের ওপরেই আদেশ হল একমাস হাজতবাসের। খুশি হল দেনিস। আদালতের সভাপতি তার নামটা দ্রুত উচ্চারণে পড়ে গেলেন, এবং তার সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করলেন না। দেনিস সন্দেহও করল না,—এইটুকুর জন্যে তার বাবাকে কতখানি হাঙ্গামা পোয়াতে হয়েছে।

এর পর থেকে তেসার মনে কমিউনিস্টদের ওপর এক নিদারুণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ

জন্মে গেল। আগে তার কোন শত্রু ছিল না। মাঝে মাঝে অবশ্য ব্রতৈল বা ভীইয়ারের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেধেছে, কিন্তু তারা হচ্ছে রাজনীতির খেলায় অংশীদার। এমন কি, ফ্লুজের জন্যেও সে দুঃখিত, যদিও ওই দাড়িওলা গোঁয়ারটা তার গাযে কালি ছিটোবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্টরা দেনিসকে কেড়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে। শান্ত স্নেহময়ী একটি মেয়েকে ওরা করে তুলেছে নারীত্ব-বর্জিত রণরঙ্গিনী। ওই রকম স্ত্রীলোকেরাই ১৭৯৩-তে গিলোটিনের আশেপাশে নেচে বেড়িয়েছে। ওটা আবার একটা রাজনৈতিক দল হল কিসে? ওটা তো একটা আধ্যাত্মিক জাহান্নম। ওদের ধ্বংস না করতে পারলে ওরা চরম অত্যাচার চালাবে, ছোরা মারবে, গলা টিপে ধরবে। তেসাকে ওরা ছারপোকা বলে মনে করে। কিন্তু ফ্রান্স এখনো খাড়া আছে! হরতাল তো ভেঙে গেছে। তার মানে, আমরা বাঁচবই। এবার একটু বিশ্রামের জন্যে একবার পলেত্তের কাছে যাওয়া যেতে পারে।

২২

পিয়েরকে ছাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা দেসেরের ছিল না। নিজের অসহায় অবস্থাটাই তাকে বিরক্ত করে তুলেছে; মন্ত্রীরা এসে যার তোষামোদ করে গেছে সেই দেসেরকে আজ একদল ক্ষুদে-মালিকের উচ্চকিত নির্দেশ মাথা পেতে মেনে নিতে হবে—ভাবতেও পারা যায় না। কিন্তু সে যাই হোক, পিয়েরকে কারখানায় বাহাল রাখা সম্বন্ধেও সে মনস্থির করে উঠতে পারেনি—দক্ষিণপন্থী কাগজগুলো 'লাল ইঞ্জিনীয়ার'টির সব খবর ছাপিয়ে দিয়েছে। পিয়েরকে সে বলল, 'আমি তোমায় আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব, একটি বছর অপেক্ষা করতে হবে তোমায়।' পিয়ের রাজী হল না; এটা একটা মন-রাখা গোছের ব্যাপার বলে তার মনে হল।

বড় একটা কাফের বারান্দায় বসে তারা কথা বলছিল। অস্বাভাবিক রকমের শীতার্ত এই সন্ধ্যাটা, হিমাঙ্কের নীচে চার ডিগ্রি। খদ্দেররা গাল ফুলিয়ে হাওয়া ছেড়ে হাতে হাত ঘষতে ঘষতে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে পড়ছে এক গেলাশ মদ খেয়ে শরীরটা গরম করে নেবার জন্যে। খালি বারান্দাগুলোয় শুধু নীচু চিমনিওলা উনুনগুলোর লালচে আভাটুকু দেখতে পাওয়া যায়।

'অবশ্য আমার ওপরে তোমার অবিশ্বাসটুকু সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত,' দেসের বলল, 'কিন্তু ব্যাপারটা হল গিয়ে—আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সংস্কার আর পাঁচজনের মতামতের বাঁধনে বাঁধা। যেমন ধর, মজুরদের মধ্যে হয়ত এমন অনেক ভাল লোক আছে যারা হরতালের বিরুদ্ধে, কিন্তু কিছু করবার সাধ্য নেই তাদের। মতিনি মহোদয়ের মতামত বিবেচনা করে দেখতে আমি বাধ্য। তোমাদের ভাষায় ও ফ্যাশিস্ট; আমার ভাষায়, ও একটা গেঁয়ো বোকা। বিমান বাহিনীর অভাবে ওরা কৎ-কে দায়ী করে গালাগালি দিচ্ছে। কিন্তু তুমিই তো ইঞ্জিনীয়ারদের মধ্যে একজন, সুতরাং তোমাকে বরখাস্ত করতে আমি বাধ্য। ওরা বোমারুর কি ধার ধারে? ফ্রান্সের জন্যেই বা কি ধার ধারে?'

এক সময়ে অন্যের ওপর পিয়েরের অগাধ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু ইদানীং সে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ আর স্পষ্টবাদী হয়ে উঠেছে। তার মনে হল, দেসেরের অভিযোগগুলোর মধ্যে কপটতা আছে।

সে বলল, 'ওদের দোষ দিচ্ছ কেন? তুমিও তো মিউনিক চুক্তির পক্ষে ছিলে।'

'আমি চেয়েছিলাম সশস্ত্র শান্তি, পরস্পরের মধ্যে আলোচনা আর আপোষ-রফা। কিন্তু ওরা শুধু সাত তাড়াতাড়ি হিটলারের দয়ার ওপর নিজেদের ছেড়ে দিতে চায়। কি যে হচ্ছে আর কি যে হবে তা শুধু ওই বদ্‌মাইসগুলোই জানে, যা পায় তাই হাতিয়ে নেবার জন্যে ওরা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু খাঁটি লোক যারা তারাও চোখ বন্ধ করে আছে অন্ধের মত।'

পিয়ের বলল, 'কিন্তু আর পাঁচজনও তো আছে। লেগ্রের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিল কি? পুলিশের হাতে মার খেয়ে ও এখন হাসপাতালে। ওর মত আরো অনেকে আছে। মানুষের মনের ভাব আর চিন্তা হাজারো রকম—এগুলো একটা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে নেয়। এরই তাগিদে লোকে শিল্প সৃষ্টি করে, আরাম খোঁজে, পরিবার গড়ে তোলে। কমিউনিস্টদের কথা বলছি কেন? কারণ তারা একটা জিনিসের ওপর মনটাকে একাগ্র করে আনে। এটা অন্ধতা নয়, একটি লক্ষ্যে তাকাবার ক্ষমতা।'

দেসের বলল, 'ওই নীচু-চিম্‌নিওলা উনুনগুলো দেখছ? ওগুলো বেশ একটা উষ্ণতার মোহ সৃষ্টি করে—যেন গোটা রাস্তাটাই গরম করে তোলা যায়! হ্যাঁ, এর থেকে মনে পড়ে গেল, একেবারে জমে যাচ্ছি আমি। শেষবারের মত জিজ্ঞাসা করি—তুমি এখনো গররাজী?'

পিয়ের আশা করেছিল, আনে তার ওপর চটবে। এখন তো বেকার অবস্থায় দারিদ্র্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে, তার ওপর আছে দুদুর ভাবনা। কিন্তু আনে তৎক্ষণাৎ বলল, 'ঠিক করেছ তুমি।' রাজনীতির আলোচনায় পিয়েরের মতামতকে সে সমর্থন করে না, কিন্তু যখন আত্মসম্মান আর স্বাধীনতার প্রশ্ন ওঠে, তখন সে পিয়েরকে দেখে শ্রদ্ধার চোখে—বালিকা-বয়সে সে তার বাবাকে যে ভাবে দেখত।

তিন সপ্তাহ কেটে গেল। যে দারিদ্র্যকে অল্প কিছুদিন আগেও একটা অপচ্ছায়ার মত মনে হয়েছিল—আজ সেটা একেবারে বাস্তব হয়ে উঠল। বাসা-ভাড়া আর ডাক্তারের দক্ষিণা দিতেই আনের মাইনে ফুরিয়ে গেল - দুদুর জ্বর হয়েছিল। মাসের শেষে আর ওদের হাতে পয়সা রইল না। আগে আগে ওদের দুজনেই দারিদ্র্যকে জেনেছে—সে দারিদ্র্য সম্মান ক্ষুণ্ণ হবার মত কিছু নয়, কিন্তু এখন অত্যন্ত অসম্মানজনক দৈন্যের বিরুদ্ধে কোমর বেঁধে দাঁড়াতে হল।

পিয়েরকে অন্য কোন কারখানায় নেবে বলে মনে হল না। 'মালিক সমিতি' থেকে তার নাম অপরাধীদের তালিকাভুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। মিস্ত্রি হিসেবে, এমন কি গতর-খাটিয়ে মজুর হিসেবেও কোন কাজ পাবার জন্যে সে বৃথাই চেষ্টা করল আর সব জায়গাতেই প্রত্যাখ্যান পেল।

গয়লার দাম চুকিয়ে দেবার জন্যে ঘড়িটা বেচে দিতে হল। আনে নিজের শীতের কোটটা পুরনো কাপড়ের দোকানের লোকটার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এটা বড্ড বড় হয় আমার গায়ে'—আর, এক সপ্তাহ ধরে তারা একবেলা খেয়ে রইল। পিয়েরকে খানিকটা উৎসাহিত করার চেষ্টায় আনে বলল, ছুটির দিন কটার জন্যে ও কিছু উপরি মাইনে পেতে পারে। ভোরবেলা পিয়ের বেরিয়ে যায়, সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ছোটখাটো কারখানাগুলোয় ঢুঁ মারে আর ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিজ্ঞাপন পড়ে। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফিরে আনেকে বলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সে তাকে খাইয়েছে। পিয়ের ফিটফাট পোষাক পরে, প্রত্যেক দিন দাড়ি কামায়। এই ছিমছাম ধূসর-চুল স্বপ্নদর্শীটিকে দেখে কেউ ভিখিরী বলে ভাবতে পারবে না। কিন্তু কোন খাবারের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়ের চোখ ফিরিয়ে নেয়।

একদিন একটা বিজ্ঞাপন দেখল : যদি বরফ পড়ে, তাহলে রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্যে লোক দরকার হতে পারে ; ভোর পাঁচটায় এসে হাজিরা পেশ

করতে হবে। সন্ধ্যা থেকে ঘন তুষারবৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে; প্রথম দিকটায় বরফগুলো পথের ওপর গলে গেল, তারপর পুরু হয়ে জমে উঠে ঢেকে দিল রাস্তাটা। আনেকে জাগাবার ভয়ে রাত্রি চারটের সময় পিয়ের নিঃশব্দে কুঠরীর বাইরে বেরিয়ে এল। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরল তার, কিন্তু তবু যে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফিরে আনের হাতে কুড়ি ফ্রাঁ—চাই কি তিরিশ ফ্রাঁও হতে পারে—তুলে দিতে পারবে, একথা ভেবে খুশির হাসি হাসল। জায়গাটায় পৌছল পৌনে পাঁচটায়। শাদা তুষার অরণ্যের মধ্যে একটা বড় গ্যাসের বাতি জ্বলছে আর একটা লাল ইঁটের বাড়ীর সামনে লোকের ভীড় জমে উঠেছে। হরেক রকমের লোক: হাঘরে, ফালতু লোক, হরতালে যোগ দেবার অপরাধে বরখাস্ত ডাক-পেয়াদা, অনশন-ক্লিষ্ট জনৈক ছবি-আঁকিয়ে, জনকতক জার্মান আশ্রয়প্রার্থী, বুড়ো আর ছেলে ছোকরার দল। চল্লিশজন লোকের দরকার, কিন্তু এসে জুটেছে তিনশোর কম নয়। ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে রইল পিয়ের। শেষ পর্যন্ত ওরা হেঁকে বলল, 'আর না!' পিয়ের বাড়ীমুখো চলল ভারী পায়ে; শীত করছে, আর কেমন যেন দুর্বল মনে হচ্ছে ওর নিজেকে; পায়ে ফোস্কা পড়েছে, মাথাটা ঘুরছে।
হেঁটে চলল লে হালে-র পাশ দিয়ে। দৃশ্যটা জমজমাট: রেস্তোরাঁ-মালিক, কসাই, সবজিওলা আর খাবারের দোকানের মালিকরা নিজেদের পছন্দসই জিনিস বাছাইয়ের আগ্রহে ঠেলাঠেলি লাগিয়েছে। এমিল্ জোলার ভাষায় বলতে গেলে—পারীর আর সবই যেন বদলে গেছে, কেবল তার 'পেট'টি ছাড়া। ভিজে আর জল-চোঁয়ানো এইসব আহার্য-স্তূপের দিকে তাকিয়ে পিয়ের অস্পষ্ট-ভাবে স্মরণ করল সেই প্রায়-বিস্মৃত উপন্যাসটির কথা—ভোজনপুষ্ট অনুভূতিহীন ব্যবসাদারদের দলে এক ক্ষুধার্ত আর আইনের চোখে অপরাধী, আত্মগোপনকারী সেই স্বপ্নদ্রষ্টার কাহিনী যাতে আছে।
আঁক্‌শিতে ঝুলছে বিরাট মাংসপিণ্ডগুলো—গোলাপী, বেগুনে আর অসহ্য লাল। ভোজনপ্রিয় এই শহরের ক্ষুধাতৃপ্তির জন্যে কতগুলো করে গরু আর ভেড়া লাগে? কৃত্রিম উপায়ে পিলে ফোলানো কতগুলো রাজহাঁস? কতগুলো করে বহুবর্ণ ধানীমুরগী আর বুক-উঁচু বেলে-হাঁস?
মাছের বাজারে সাজানো রয়েছে ভূমধ্যসাগরের বিরাট শোল মাছ, দেখে মনে হয় ওরা যেন মোম দিয়ে তৈরী; উত্তর সমুদ্রের কোমল শরীর চাঁদা মাছ; পিঠে নীল-সবুজ ডোরা কাটা রূপোলী-বুক ম্যাকেরেল মাছ; শাদাটে, পিছল-শরীর কুচো-মাছ; চেপ্টা ইতালীয় শামুক-মাছ, পর্তুগীজ গল্‌দা চিংড়ি, সামুদ্রিক

কাঁকড়া, আর হরেক রকমের সামুদ্রিক উদ্ভিদ। গন্ধটা অসহ্য। মেছুনীদের হাতগুলো নোনা-জল লেগে লেগে লাল আর কর্কশ। পাথরের বেদীগুলোর ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আরো এগিয়ে সবজিওলাদের দোকান। হাল্কা সবুজ ধনে-শাক, গাজর, মুলো আর ঝুঁটিশাক। রুসিলঁ-অঞ্চল থেকে আনা লেটুস্‌গুলোর পাশেই সুদৃশ্য ছোট ছোট ঝুড়িতে সাজানো ব্যাঙের ছাতা। আরো ওদিকে সাজানো আছে শারঁৎ-এর মাখনের তাল, ছানা, ডিম, টিনের কৌটো ভর্তি ক্ষীর, মেসিনা আর জাফার কমলালেবু, আপেল, গ্রীষ্ম দেশের লোভ-জাগানো মিষ্টি গন্ধওলা কলার কাঁদি, খেজুর আর আনারস।

দোকানউলীরা পেঁয়াজের ঝোল খাচ্ছে আর আড়ষ্ট আঙুলগুলো বাটির গায়ে গরম করে নিচ্ছে। ফালতু লোকগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক, আর পড়ে পাওয়া আলুগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে। ভোজন-রসিকরা ছানার তালগুলো টিপে দেখে শুধোচ্ছে—মালটার দাম কত। কাঁচা কালির গন্ধওলা ধূসর রঙের খবরের কাগজ নিয়ে কাগজওলা ছেলেরা বাজারের রাস্তায় ঘুরছে। তারপরে মধ্যযুগীয় স্যাঁ যুস্‌টাশ্‌ গির্জার ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করল। রাঙা উর্দি-পরা কসাইরা মাংসগুলো কাটতে লাগল। মফস্বলের ব্যাপারীরা শাক-সবজি আর বাঁধাকপিতে বোঝাই তাদের পুরনো ঝরঝরে লরিগুলো খালি করে দিয়ে কফি-খানায় গিয়ে কনিয়াক্‌-মেশানো কফি খেতে লাগল। রাস্তার শানের ওপর রক্তের মত গড়িয়ে গেল লাল মদের স্রোত। বিরাট তোড়ায় বাঁধা লাল পিন্‌ক্‌ ফুল, বেগুনী লতাবাহার আর গোলাপের স্তূপ জমে উঠল। নীস্‌ আর গ্রাস্‌ থেকে ট্রেন-বোঝাই হয়ে এসেছে শ্বেতকরবী, হলদে দোপাটি, স্থলপদ্ম, লিলি অফ দি ভ্যালী, আর আজেলিয়া। পঞ্জিকার ঋতুর হিসাব পারী মানে না: সারা বছর ধরেই পারীর রাস্তায় ফেরীওলার ঠেলাগাড়ীতে হরেক ফুলের শোভা। তুষার-কণা নেমে আসছে আকাশ থেকে। যারা ভাগ্যবান, তারা রাস্তার বরফ সাফ করে চলেছে। কিন্তু ওদের দলে পিয়ের নেই। সে যেন দম-দেওয়া পুতুলের মত হেঁটে চলেছে; এমন কি, খিদেও অনুভব করছে না। গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠছে ওর। খাবারের পাহাড় যেন পিষে মারবে ওকে। খাবার জিনিসটা আর খুশির চিন্তা জাগায় না—ওরা যেন সংগ্রামের ঘোষণায় মুখর, একটা সমগ্র জীবনদর্শনের প্রতীক—ব্যাপারী, দালাল, দাঁড়িপাল্লা আর নোংরা হিসেবের খাতায় ভীড়াক্রান্ত এক শত্রুভাবাপন্ন জগত। আর ওই হাজার ফুলের

তোড়া। ভানেকের চোখের জল, ক্যাটালোনিয়ার দুঃখ, লেগ্রের কষ্ট, পিয়েরের খিদে—পারী এসবের কি ধার ধারে? পারী বেঁচে থাকতেই ব্যতিব্যস্ত। মাংসওলাটা আধমণ কিমা বিক্রী করে গুনগুনিয়ে গান ধরেছে 'পারী আজো সেই পারীই আছে।' জীবনের প্রতি এই বিশ্বাসটুকুর মধ্যে এমন একটা কাতরতা আছে যে, কথাটা ভাবতেই পিয়েরের মনটা শান্ত হয়ে উঠল। কাজের তাড়া আছে এমন একটা ভাব দেখিয়ে সে জোরে হেঁটে চলল, যদিও মনে মনে জানে কোথায়ও যাবার নেই। শীত করতে লাগল তার, তারপর হঠাৎ চলার গতিটা কমিয়ে ফেলল। ফিরে গিয়ে বুসি-অঞ্চলে ঢুকে সরু আঁকাবাঁকা পথগুলোয় ঘুরতে ঘুরতে বারবার মোড়ের মুখে এসে পড়ল—যেখানটায় ঠেলাগাড়ীর বুকে পিছল-শরীর চেপটা মাছগুলো ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে।

তারপরে খানিক বাদে একটা কুড়িয়ে-নেওয়া খবরের কাগজ পড়বার জন্যে পিয়ের একটা ভিজে বেঞ্চির ওপর বসে পড়ল: 'ইউরোপের সংকট খানিকটা কেটে গেছে……তেসার বক্তৃতা……শান্তির প্রতিশ্রুতি……' হঠাৎ পিয়ের সচেতন হয়ে উঠল: আলু ভাজার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বড় বড় কড়াইয়ে আলুগুলো সেদ্ধ করে নিয়ে কাগজের ঠোঙায় পুরে বিক্রি করছে আর দোকানউলীটা চেঁচাচ্ছে: 'গরমাগরম!……চার্-চার পয়সা……!' হ্যাঁ, চার পয়সায় একটা আশ্চর্য স্বপ্ন কিনে নিতে পারা যায়। পিয়ের হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দুমড়ানো কাগজখানা এগিয়ে ধরল একজন পথ-চলতি লোকের দিকে—লোকটা সরকারী চাকুরে গোছের, কাজে চলেছে। পিয়েরের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে লোকটা দ্রুত হেঁটে চলে গেল। ফিরে এসে আবার সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়ে পিয়ের নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন এমন করতে গেল? আর একবার সে ঝিম্ মেরে গেল। দূর থেকে ভেসে আসছে ছুটন্ত মোটর গাড়ীর আওয়াজ আর বাজারউলীদের চেঁচামেচি। একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একজন পুরুষ চলে গেল সামনে দিয়ে; মেয়েটি পিয়েরকে তাকিয়ে দেখে তার সঙ্গীটিকে কি যেন ফিসফিস করে বলল। একটা বুড়ো-গোছের কুকুর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে পিয়েরের বুট জোড়া শুঁকে দেখে পেছনের দু পায়ের ফাঁকে লেজ গুটিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চলে গেল, পিয়ের যে নিতান্ত সঙ্গতিহীন—একটা কুকুরও যেন তা বুঝতে পারে।

বাড়ী ফিরে দেখে—আরো বিপদ তার অপেক্ষায় রয়েছে। ঘরে ঢুকতেই আনে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল : 'বাবা এসেছেন।'

অন্য যে কোন সময়ে হলে তারা খুশি হয়ে উঠত। আনের বাবা থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের এক ছোট্ট শহরে, অনেকদিন ধরে বুড়ো একবার মেয়ের কাছে এসে কচি নাতিটাকে দেখে যাবার কথা ভাবছিল। মাঝে মাঝে সে তার মেয়েকে বড় বড় ছেলেমানুষি অক্ষরে ছোট ছোট চিঠি লেখে।

আনে প্রায়ই পিয়েরকে তার বাবার কথা বলত। লেজাঁদর্ একজন পুরনো কালের মিস্ত্রি। যুদ্ধের আগে যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার করার জন্যে সে দশ মাস জেল খেটেছে। বছর পাঁচেক আগে সে ভুগছিল। তখন কারখানা ছেড়ে চলে যায় দাক্‌স্-এ—সেখানে তার ছোট ভাই একটা ছোটখাটো মোটর কারখানা চালায়। সে তার ভাইকে মেরামতির কাজে সাহায্য করে, আর রান্নাঘরের আঙিনাটায় এটা সেটা করে বেড়ায়। চৌষট্টি বছর বয়স তার। পিয়ের ভেবেছিল শাদা চুলওলা বিরাট একটা মানুষ, কিন্তু এখন দেখল ছোটখাটো শুকনো একটা বুড়ো, মাথায় সদ্যজাত শিশুর মত কয়েক গোছা চুল।

পিয়ের তৎক্ষণাৎ বুঝল, আনে কেন তার বাবার আসার কথাটা এভাবে উদ্বিগ্ন স্বরে ফিস্‌ফিসিয়ে বলেছে। বৃদ্ধ ভেবেছে তার মেয়ে একজন ইঞ্জিনীয়ারকে বিয়ে করে বেশ সুখেই আছে, আর দুহ দরকার মত সব জিনিসই ঠিক পেয়ে যাচ্ছে। আর মেয়েকে দেখতে আসার বহুদিনের প্রতিশ্রুতি রাখতে সে এত সময় থাকতে ঠিক এই সময়েই এসে পড়েছে। যদি সত্যি কথাটা বলা যায়, বৃদ্ধ দুশ্চিন্তায় পড়বে। কিন্তু ওরা তাকে খাওয়াবে কি?

পিয়েরকে কৌতূহলের চোখে আগাগোড়া দেখে নিয়ে লেজাঁদর্ বলল, 'তোমার বুটজোড়াটা তো বেশ মজবুত।' পিয়েরের মনে পড়ল সেই কুকুরটা, খবরের কাগজ আর ভাজা আলুব কণা। লেজাঁদর ওদের কুঠরীর সব কিছু দেখে বেড়াল, রান্নাঘরে গেল, তারপরে তার অনুমোদন জানাল, সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। পিয়েরকে শুধোল, 'তোমার কাজকর্ম চলছে কেমন?' পিয়েরের মুখে নতুন ইঞ্জিনের বর্ণনাটা সে সাগ্রহ মনোযোগের সঙ্গে শুনল। তারপর তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হল রাজনীতি নিয়ে। লেজাঁদর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'একদম পিছিয়ে পড়েছি আমি। দাক্‌স্ শহরটাতে

ঘুমে ঝিমোচ্ছে। আমার ভাই ওসব রাজনীতি-টীতির ধার ধারে না। ও 'লে মার্ত্যাঁ' কাগজের গ্রাহক।' লেজ্ঁাদর্ মিউনিক-চুক্তির মানেটা বুঝে উঠতে পারল না, আর পিয়ের যখন স্পেনের কথা তুলল শুধু তখনই সে উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারপর সে চেঁচাতে লাগল, 'জিতবেই ওরা! ওরা জিততে বাধ্য!' আলোচনাটা অতীতের ঘটনার দিকে মোড় ফিরল। হরতাল আর মিছিলের কথা স্মরণ করে লেজ্ঁাদর্-এর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'উনিশ শো ছ-য়ে আমরা ঝাণ্ডা উড়িয়ে মিছিল করে গেছি রাস্তা দিয়ে।' জোরে-এর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলে ভারী গর্ব তার। বলল, 'সভায় বক্তৃতা দিতে উঠেই জোরে গলাবন্ধনীটা খুলে ফেলতেন। তখনকার দিনে শক্ত কাপড়ে তৈরী হত গলার বন্ধনী। ভয়ানক খাটতে হত কিনা ওঁকে। আর কী গলা ছিল ওঁর!'

পিয়ের চুপ মেরে গেল। এই প্রাণবন্ত বৃদ্ধের সংস্পর্শে সে নিজের অসহায় অবস্থা সম্বন্ধে তীব্রভাবে সচেতন হয়ে উঠেছে। লেজাঁদর্ নিজের মত করে তার জামাইয়ের নিঃশব্দতার অর্থ করে নিল। বোধ হয় সে ঠিক কথাটা বলেনি? ওকি তার নিজের শ্রেণীর মানুষ? পিয়েরের হাবভাব একটু যেন ঘাবড়ে দিয়েছে তাকে; আর যাই হোক, লোকটা ইঞ্জিনীয়ার তো! আনেব এখন ভিন্ন জগতে বাস, মজুর শ্রেণীর লোককে ও বেছে নেয়নি। অস্বস্তির সঙ্গে লেজাঁদর্ বলল, 'আমি বোধ হয় তোমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছি। আমি একবার দুয়াই-এর সঙ্গে দেখা করে আসি ততক্ষণ।'

আনে আর পিয়ের মুহূর্তের জন্যে পরস্পরের দিকে তাকাল। লেজাদর্‌কে আটকাতেই হবে; ইতিমধ্যে খাবার সময় হয়ে গেছে, কিন্তু খাওয়াবার মত কি আছে? দুদুর সুরুয়াটুকু? বলবে কি যে ওদের এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল? বৃদ্ধ হয়ত তাই শুনে ক্ষুব্ধ হবে। আনে বলল, 'এখনই যেও না। দাক্‌সের কথা সব বল, শুনি।' লেজাঁদর্ বলতে শুরু করল। গরমকালে অনেক লোক বেড়াতে গিয়েছিল ওখানে; ওর ভাই বেশ কিছু টাকা করে নিয়েছে। কিন্তু এখন জায়গাটা খুব চুপচাপ। যুদ্ধ হবে শুনে লোকে ভয় খাচ্ছে। ইদানীং কেউ আর নতুন ঘরবাড়ী তুলছে না, আর মোটর গাড়ীও বিশেষ কিনছে না, কারণ সামরিক বিভাগ থেকে ওগুলো দখল নিয়ে নেওয়া হবে বলে লোকে ঘাবড়াচ্ছে। লরির ব্যবসাটাই বিশেষভাবে খারাপ। ক্রমশই বেকারের দল বাড়ছে।

'পারীতে বেকার লোক কি খুব বেশী ?' জিজ্ঞাসা করল সে।

'অনেক। চাকরীর সমস্ত বিভাগেই। আজ দেখলাম—একদল লোক রাস্তা পরিষ্কার করতে এসেছে। একজন ছাপাখানার মুদ্রাকর, একজন খাবারের দোকানী, এমন কি একজন ছবি-আঁকিয়েও ছিল ওই দলে। দু ঘণ্টা ধরে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা।'

পিয়ের তৎক্ষণাৎ তার বাক্যপ্রমাদটুকু বুঝতে পারল। বৃদ্ধ কথাটা ধরতে পারবে না, কিন্তু আনে......আর সে কিনা আনেকে বলেছে, একটা কারখানা তাকে ইঞ্জিনীয়ার হিসেবে নেবে। আর সত্যিই, আনে তার দিকে এমন ভীতিবিহ্বল চোখে তাকাল যে সে নিজেদের সাংঘাতিক দুস্থতার কথাটা এই প্রথম উপলব্ধি করেছে বলে মনে হল। কিন্তু লেজাঁদ্র্-এর কান খাড়া ছিল। এক মুহূর্তে সমস্ত ব্যাপারটা সমঝে নিল: আনের বিব্রত অবস্থা, পিয়েরের নিঃশব্দতা আর ফাঁকা রান্নাঘরের মানেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল তার কাছে।

লেজাঁদ্র্ বলল, 'আমি এই একটু মোড়টা থেকে ঘুরে আসছি। দুয়াইকে একবার টেলিফোন করব ভাবছি।'

আধঘণ্টা বাদে সে জিনিসপত্র বোঝাই হয়ে ফিরল—এক বোতল মদ, সার্দিন মাছ, পাঁউরুটি, মাখন আর কফি, চিনি আনতে ভোলেনি। আনেকে ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'তোর একটা ছোট্ট খুকী হলে কেমন হয় ?' কোন প্রশ্ন তুলল না সে। খেতে খেতে পিয়ের হরতালের সমস্ত কথা বলল—গ্যাস ছাড়ার বৃত্তান্ত, দেসেরের সঙ্গে তার আলোচনা, আর অপরাধীদের তালিকায় তার নাম ওঠার কথা। পিয়ের যে তার আপন শ্রেণীর লোক—এ কথাটা ভেবে লেজাঁদ্র্-এর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অভাবের কথাই যদি ওঠে—ওদের বয়স কম, ওরা সব ঠিক করে নিতে পারবে।

তারপর পিয়েরের গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে সে বলল, 'বিজয়ের উদ্দেশ্যে।'

সব পরিষ্কার হয়ে গেছে তার কাছে—স্প্যানিয়ার্ডরা অল্প কিছুদিনের মধ্যেই গুঁড়িয়ে দেবে ফ্যাশিস্টদের, আর সর্বত্র শ্রমিকের অভ্যুত্থান হবে। হরতাল বাধবে আর শক্ত প্রতিরোধের ব্যূহমুখ তৈরী হবে দিকে দিকে।

খাবার আর মদ পেটে পড়ায় পিয়ের একটু নেশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। উষ্ণ একটা আরাম অনুভব করছে সে, কিন্তু তার মনমরা ভাবটা যেন কিছুতেই কাটছে না।—এই হল গিয়ে পুরনো যুগ। পরাজয় আর হতাশার জ্বালা ওরাও জেনেছে। কিন্তু এই বৃদ্ধটির মত বিশ্বাসের জোর, সরলতা ও প্রসন্নতা পিয়েরের নেই কেন ?

দুদুকে ঘুম পাড়িয়ে দিল ওরা। দুদুর মেজাজ খারাপ ছিল বলে শুতে যেতে চাচ্ছিল না, কিন্তু শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ঘুমে ঢলে পড়ল। লেজ্যাঁদ্র্ ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নীচু গলায় বলল, 'ওর জীবন কাটবে শান্তিতে, দেখিস, আমাদের মত নয়। যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে আমাদের। শাঁপাঞ্‌র জেলে থাকতে হয়েছে আমায়। সে কী দুর্ভোগ! কিন্তু আর যুদ্ধ হবে না। শ্রমিকেরা এখন একটু বেশী বুদ্ধি ধরে। তাছাড়া জার্মানরা যুদ্ধে নামবে না। ওদের দেশেও তো শ্রমিক আছে। ওরা যুদ্ধ হতে দেবে বলে ভাবিস নাকি?'

সকাল সকাল শুতে যাওয়া আর ভোর পাঁচটায় ওঠা তার অভ্যাস; চোখ দুটো স্থির আর দৃষ্টিহীন হয়ে উঠল; জেগে থাকবার জন্যে লড়াই করতে করতে দুদুর ছোট বিছানার ওপরেই ঢুলে পড়ল লেজাঁদ্র্। তার মুখখানা দেখাল ছোট ছেলের মুখের মত।

২৩

এবারকার এই শীতকালের মত সময়ের গতিকে এত মন্থর বলে আর কখনো মনে হয়নি। পারীর অবস্থাটা শান্ত কিন্তু বিভ্রান্তিকর। অতীত গৌরবের স্মৃতিস্তম্ভগুলি ডিসেম্বরের নীল গোধূলি-আলোয় ঢাকা পড়েছে। দোকানের জানলাগুলোয় হরেক রঙের পুতুল আর নানান রকমের খাবার শান্তিপূর্ণ বড়দিনের উৎসবের মোহ এখনো বজায় রেখেছে। দু-একজন উৎসবমত্ত লোক নির্জন রাস্তায় চিৎকার করে গান ধরছে, কিংবা কোন প্রমোদ-সঙ্গিনী শ্রমজীবিনীর পিছু ধাওয়া করছে। কিন্তু একটা অবসাদগ্রস্থ হাল ছেড়ে দেওয়ার ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে পারী নগরী।

প্রতিদিন সকালে মন্ত্রীরা কোন অবাধ্য টেলিগ্রাফ-কর্মচারী কিংবা কারখানা-শ্রমিকের বরখাস্তের নোটিশে নিয়মিত সই করছেন। মালিকরা সর্বত্রই শ্রমিকের বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে। হাজার হাজার বেকার পেটের জ্বালায় অস্থির; জাতীয়-আত্মরক্ষা-নীতির ওপর বক্তৃতা দিল দালাদিএ কিন্তু অস্ত্র-কারখানার যন্ত্রপাতি নিশ্চল রইল—যেন আড়ষ্ট হয়ে গেছে।

জোলিও তার কাগজের পাঠকদের পয়সায় একপ্রস্থ প্রসাধনের উপকরণ কিনে চেম্বারলেনের স্ত্রীকে উপহার দিয়েছে। বেঁটে মোটা লোকটা সগর্বে ফিসফিসিয়ে

বলল, 'বাজারের সেরা মাল এটি!' কিন্তু চেম্বারলেন যখন পারী পৌঁছল, রেল-স্টেশনে শ্রমিকরা জমায়েত হয়ে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি তুলল তার উদ্দেশ্যে। এইটাই জনতার শেষ প্রতিরোধ। সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল তারপর। জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদের কাজ চলল অবিরাম। মিস্ত্রী, পালিশওলা, ঢালাই-মজুর আর অন্যান্য শ্রমশিল্পীরা জেলখানায় বসে চকোলেট-বাক্স বার্নিশ করতে লাগল।

হাসপাতাল থেকে আদালতে আনা হল লেগ্রেকে। দুজন শান্ত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দু দিকে। সে আত্মপক্ষ সমর্থন শুরু করল, 'আমি দালাদিএকে অভিযুক্ত করি......' আদালতের সভাপতি শান্তভাবে বললেন, 'নিয়ে যাও একে।' তার পর পাঁচ মিনিট বাদেই তিনি ঘেণ্ডাতে থাকলেন, '১৯শে জুলাই-এর আইন অনুসারে......লেগ্রে জাক্-কে......সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হল......'

র‍্যাডিকাল দলের এক সভায় ফুজের বন্ধুরা গভর্নমেণ্টের পদত্যাগের দাবী জানিয়েছে। সূক্ষ্ম হাসি হেসে তেসা বলল, 'গভর্নমেণ্টের পদত্যাগের পরিণাম হচ্ছে আমাদের শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ।' একটা মানচিত্রের পর্য-বেক্ষণে একটা গোটা সন্ধ্যা কাটানোর পর জনৈক ডেপুটির সঙ্গে নৈশ-ভোজনে বসে ছানা আর ফলাহারের অন্তবর্তী গুরুগম্ভীর সময়টিতে সে বলল, 'দেখে নিও, জার্মানরা পূব দিকে যাবে! ওদিকে তেল আছে হে—আর তেল জিনিসটা কি তা জানো তো? এ যুগের রক্ত হচ্ছে ওই তেল।'

রিবেনট্রপ একবার এল পারীতে; সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পুলিশ রাস্তাগুলোয় লোক চলাচল বন্ধ করে দিল। অত্যন্ত অবাস্তব অসম্ভব এক দৃশ্যের সামনে উপস্থিত করা হল এই অতিথিটিকে: ফাঁকা প্লাস দ্য লা কঁকর্দ্-এর ওপর লাল শীতের সূর্য। ভদ্রভাবে রিবেনট্রপ বলল, 'এবার পারীতে এসে আমি বিশেষভাবে খুশি হয়েছি...'

ইতালীর ফৌজ এগিয়ে চলেছে বার্সেলোনার দিকে। ডেপুটিরা সভা করে সিনেটের সভ্য বেরার-কে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর কাছে পাঠাবার সিদ্ধান্ত করেছে। তেসা এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'ভুল বোঝাবুঝির পালা চুকিয়ে দেবার এই তো সময়!'

ভীইয়ার এক সভায় চেক নারীদের আর কাটালোনিয়ার শিশুদের দুর্ভাগ্যের জন্যে ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তৃতায় বলল, 'সরকার শ্রমিকশ্রেণীর ওপর অন্যায় আক্রমণ চালিয়েছে,' তারপর গলার স্বরে ফোঁপানির সুর মিশিয়ে ঘোষণা করল,

'দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী ইউরোপের বুকে আমাদের এই রিপাব্লিকই স্বাধীনতার শেষ দুর্গপ্রাচীর!' আধা-সমর্থনসূচক খানিকটা হাততালির সাড়া পাওয় গেল। তারপরে 'সীন' কারখানার দারোয়ান সেই বুড়ো হ্যুশেন সামনের সারির শ্রোতাদের মধ্যে থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এই দুর্গপ্রাচীর রক্ষা করবার জন্য মারা পড়বে কারা?—এক যারা সাধু-শহীদ আর যারা গোবেচারী উলুখড় শুধু তারাই। সাধু পুরুষরা তো স্বর্গে আর উলুখড়ের মরণ নেই কোনকালে।'

হ্যুশেনের টিপ্পনীটা শুনে তেসা হেসে বলল, 'যাই বলো না কেন, বড় রসিক এই ফরাসীজাত। হুকানেব ঘেঙানীতে ঘাবড়াই না আমি। আমরা তো আর চেক্ নই।'

তা যাই হোক্, তেসা মাঝে মাঝে হতাশার অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে লাগল। নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করল—কেন সে এই বোঝা চাপিয়েছ নিজের কাঁধে? কমিউনিস্টরা চেঁচাচ্ছে, 'পল তেসা মুর্দাবাদ!' গ্রঁদেল-সংক্রান্ত সেই চিঠির ব্যাপারটা নিয়ে হুকান বেশ গোল বাধিয়েছে; সেও চেঁচাচ্ছে, 'চেম্বারের মধ্যে কিনা জার্মানীর গুপ্তচর!' এমন কি, পার্লামেণ্টের বিভিন্ন কমিশনগুলোও অসন্তোষ প্রকাশ করে দাবী জানাচ্ছে জুলুম বন্ধ করার জন্যে।

শ্রমিক-সংক্রান্ত কমিশনের পক্ষ থেকে ভীইয়ার দেখা করতে এল তেসার সঙ্গে। বলল, 'কয়েকদিন আগে এক শ্রমিকসভায় আমি তোমাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। ওরা আমার বক্তৃতায় বাধা দিয়েছে, আমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছে, বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ তুমি। গভর্নমেণ্ট দিন দিন জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছে।'

তেসা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কিন্তু অপ্রিয় নয় কে? তুমি? ফ্লাঁদ্যা? ব্রতৈল? যত সব বাজে কথা! এদেশে জনপ্রিয় কে বলি শোন—হিটলার! ব্যক্তিগতভাবে, তোমার পদ অধিকার করে নেবার জন্যে আমি দুঃখিত। এখন সরকারবিরোধী দলে থাকাটা অনেক বেশী স্বস্তির। তোমরা তো বলে দিলে, 'জুলুম বন্ধ করো!' করতে পারলে আমিই খুশি হতাম সব চেয়ে। তোমরা কি ভেবেছ আমায়? একটা বুনো জানোয়ার? কিন্তু ওই কমিউনিস্টরা ওদের আন্দোলন থামাক আগে। শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্যে যথাসাধ্য ব্যবস্থা আমরা করছি, আর ওরা সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। কয়েক কোটি লোককে জবাই হতে পাঠানোর চেয়ে কয়েক হাজার লোককে জেলে পাঠানো ঢের

ভাল। ওরা যুদ্ধ-বন্ধ-করবার-জন্যে যুদ্ধ চায়, কিন্তু আমার ফন্দিটা হচ্ছে, হেঁ! হেঁ!—আমার ফন্দিটা হচ্ছে যুদ্ধ-বন্ধ-করবার-জন্যে গ্রেপ্তার!'

প্যাঁশ্‌নেটা চোখ থেকে নামিয়ে নিয়ে রুমাল দিয়ে কাচ দুটো পরিষ্কার করতে করতে ভীইয়ার তেসার দিকে নিরীহ ঝাপসা চোখে তাকিয়ে বলল, 'তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে শান্তি বজায় রাখা যাবে?'

'কি বলব বলো? জার্মানদের পূব দিকে যাবার একটা সম্ভাবনা আছে। সে ক্ষেত্রে আমরা কুড়ি বছরের মত নিরাপদ। হিসাবের ভুল হতে পারে। আমি নিজে জুয়ো খেলতে ভালবাসি, কিন্তু বর্তমানে আমরাই হলাম গিয়ে বাজির তাস; আমরা ফাটা হয়ে গেছি, বিলি হয়ে গেছি খেলুড়েদের হাতে। কী সাংঘাতিক পেশা আমাদের! বেকারগুলোকে হিংসে হয়, ওরা সাঁকোর তলায় শুয়ে থাকে, কোন ভাবনা-চিন্তা নেই। ওগুস্ত, আমাদের এই অস্তিত্বটাকে বেঁচে থাকা বলে না। কোন কিছুর ওপরে মনটাকে একাগ্র করে তোলবার সময় আমাদের নেই। আমালি যখন মারা গেল...'

গলাটা কেঁপে উঠল তার। দুটো মোমবাতি আর লিলিফুলগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। আর, ভীইয়ার অনুভব করল তেসার প্রতি তার মনোভাব যেন বদ্‌লে গেছে। তেসাকে তার কোন দিনই ভাল লাগেনি। চিরদিন একটা ব্যবসাদার লোক বলে সে দেখে এসেছে তাকে। এখন সে তেসার মধ্যে এমন একটি মানুষের সন্ধান পেল যে তার অন্তরের কাছাকাছি। তারা দুজনে একসঙ্গে লেখাপড়া করেছে, একই বই পড়ে বড় হয়ে উঠেছে। ছবির পছন্দও তাদের একই ধরনের। আর দুজনেই তারা নিরর্থক আত্মবলিদান দিয়েছে—পার্লামেণ্টের স্থূল কূটনীতির খেলায়, বিতর্কে আর ভোটাভুটিতে খুইয়ে বসেছে নিজেদের আত্মিক দীপ্তি। তেসার কাছে উঠে গিয়ে আন্তরিকভাবে তার করমর্দন করল ভীইয়ার। বলল:

'আমি বুঝি। আমিও বড় একা মানুষ।'

ভুলে গেল তারা কমিশনের ভোটের প্রসঙ্গ, ফ্রান্সের ভাগ্যের কথা। নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখের আলোচনায় মেতে গেল এই দুই বৃদ্ধ। ভীইয়ার অভিযোগ করল, 'সেকালে ধর্মাশ্রম ছিল—লোকে সেখানে আস্তানা গাড়ত, পড়াশোনা করত, বিশ্বরহস্য অনুধ্যান করত আর ফুলগাছের গোড়ায় জলসেচ করত। এযুগে কিন্তু কোথাও কোন নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই।'

কিন্তু তেসা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা বদলে নিল। ওই ধরনের বিষণ্ণ কথাবার্তায়

তার কি লাভ? ফূর্তির সঙ্গে সে বলে উঠল, 'ওকথা বোলো না; পরশু 'ফলি বেরজের্'-এ গিয়েছিলাম নাচ দেখতে। স্বীকার করতেই হবে, মেয়েরা বড় আশ্চর্য সৃষ্টি। অবশ্য, নৃত্যশিল্পের দিক থেকে ওদের নাচ বিচার করলে চলবে না। ওরা কেউ আনা পাভ্‌লোভা নয়...কিন্তু ওদের দেহবিক্ষেপ দেখে—মাইরি বলছি—সত্যিই বেঁচে আছি বলে মনে হল।'

২৪

তেসা ইদানীং দক্ষিণপন্থীদের সমর্থন পাবার চেষ্টায় আছে। ব্রতৈলকে দলে টানার চেষ্টায় ছিল সে, কিন্তু ব্রতৈল দিন দিন বেশীরকম স্পষ্টভাষী হয়ে উঠছে, মাদেল্‌-এর পদত্যাগ দাবী করে চাপ দিচ্ছে তার ওপর। কোন এক ক্রীড়ামোদীদের ক্লাবে নৈশভোজনের আসরে ব্রতৈল বক্তৃতা দিয়েছে, 'দুর্ভাগ্যের বিষয়, ওই ইহুদী মাদেলটা এখনো মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত! জার্মানীর সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়াই ওর চেষ্টা।' তেসা ছুটে এল মাদেলের কাছে আফ্‌সোস্‌ জানাতে: 'ওর কাছে আর কি আশা করা যায় বলো? ব্রতৈলটা একটা অন্ধ গোঁয়ার। ওর মনটাই প্রাচ্যদেশীয়—শুধু শুধুই তো ও লোরেন্‌-এ জন্মায়নি। কিন্তু আমরা হচ্ছি কার্তেসীয়। ও ধরনের ব্যাপার আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ।' ব্রতৈলকে বলল, 'হ্যাঁ, তা মাদেল-সম্বন্ধে যা বলেছ তার মধ্যে অনেকখানিই সত্যি। ইহুদীরা আমাদের বিরুদ্ধেই রয়ে গেল দেখছি।'

গ্রঁদেলের জন্যে তেসা ভারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। লোকটা সর্বত্র যায়, মন-কেড়ে-নেওয়া হাসি হাসে আর মৃদুস্বরে বলে, 'প্রিয় বন্ধু।' আর তেসা মনে মনে ভাবে, 'লোকটা আমাকেও ফাঁদে ফেলতে চায় বোধ হয়?' পারীর ড্রয়িংরুম মহলে গ্রঁদেল অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে। 'জার্মান-লাতিন জগত ও বলশেভিকবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম'—এই বিষয়ের ওপর সে 'লাঁবাসাদোর'-এর বক্তৃতাগৃহে শৌখীন একদল শ্রোতার কাছে বক্তৃতা দিয়েছে। সিনেমার সংবাদচিত্রের লোকরা তার ছবি তুলেছে।

গ্রঁদেল সর্বত্র হাসিমুখে যায় আর প্রসঙ্গক্রমে ইঙ্গিত দিয়ে বলে, 'ইউক্রেন জায়গাটা সম্বন্ধে সত্যিই অনেক কিছু জানবার শোনবার আছে, জানেন? কাল আমি মেজেপ্পার জীবনীটা পড়ছিলাম। জীবনীটা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি শিক্ষণীয়!' তেসা জানে না মেজেপ্পা কে, কিন্তু গ্রঁদেলের প্রত্যেকটি

কথাতেই তার সন্দেহ। মাঝে মাঝে সে কিলমানের চিঠিটা স্মরণ করে, কিন্তু আরো বেশী করে তার মনে পড়ে, 'মন্ত্রী হবার দিকে গ্রঁদেলের লক্ষ্য। ওর সম্বন্ধে আরো সাবধান হতে হবে আমায়!'

ব্রতৈল গ্রঁদেলের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছে। তাদের মধ্যে যে কোন রকম ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল একথা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না। এতদিন ফুজে যা বলে আসছিল, ইদানীং ডুকানও সেই সব কথা বলতে লেগেছে। গ্রঁদেল সম্বন্ধে সে সবাইকে সাবধান করে দিচ্ছে। কোন প্রমাণ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলে সে বলে, 'না! কিন্তু এটা আমার একটা অনুভূতি।' ব্রতৈলের সঙ্গে থেকে আর সময় নষ্ট না করে সে পার্টি ছেড়ে দিল। দক্ষিণদলের লোকরা তাকে আক্রমণ করে বলল, 'নীতিভ্রষ্ট', 'প্রতিশোধপরায়ণ', 'জাতীয় বলশেভিক।' কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে ডুকানের মধ্যে এমন একটি চারিত্রিক অখণ্ডতা ছিল, যার জন্যে সে একজন খাঁটি দেশভক্ত হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিল; এই সুনামটা সহজে নষ্ট হল না। ব্রতৈলেব বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ডুকানের সঙ্গে দেখাশোনা করতে লাগল; ফলে, এতদিন যে পার্টিতে শৃঙ্খলা বজায় ছিল সেই পার্টির মধ্যে ভাঙন ধরল।

ডুকানের আন্দোলনে সন্ত্রস্ত হয়ে জেনারেল পিকার্ ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, 'তোমার কাছে আমার গোপনীয় কিছু নেই। কিন্তু এই গ্রঁদেল লোকটা আমার কাছে এসে আমাদের সমরোপকরণ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তোলে—ওকে আমি বিশ্বাস করি কি করে?'

'গ্রঁদেল আমার সঙ্গে কাজ করছে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওর সম্বন্ধে কি বলাবলি হচ্ছে তা তুমি জান। আমাদের অবস্থা এখন আর ১৯৩৬-এর মত নয়—যখন ব্লুম ছিল ফ্রান্সের পুরোভাগে। যুদ্ধ যদি বাধে, তাহলে আমাদেরই সেজন্যে দায়ী হতে হবে।'

ব্রতৈল ঘাবড়ে গিয়ে টেবিলের ওপর বিছানো চাদরটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'ভারী জটিল এই খেলাটা। বিপজ্জনকও বটে; অস্বীকার করছি না তা। আমরা নিজেদের শক্তিতে জিততে অসমর্থ। এখন যদি আমরা এতটুকু পিছিয়ে যাই, তাহলেই আবার পপুলার ফ্রণ্ট কায়েম হবে। অবশ্য, পারলে পরে আমি অন্যান্য মিত্রশক্তি বেছে নিতাম। যাই বলো, শেষ পর্যন্ত আমি তো লোরেন-বাসী। কিন্তু বাছ-বিচারের কোন সুযোগ নেই আমাদের। ব্রিটিশরা হচ্ছে মৈনাক পর্বতের দেবতাদের মত; ওদের

খেলায় আমরা বড়ে মাত্র; আমাদেরই টিউনিসিয়া কিংবা ইন্দোচীনের মূল্যে ওরা নিজেদের দেনা শোধ করবে। তাছাড়া, ওদের পার্লামেন্টে তো মোটে একজন কমিউনিস্ট সভ্য, সুতরাং ওদের পক্ষে ত্রিদলীয় চুক্তির কথা বলা সহজ। হ্যাঁ, মোটে একজন! কিন্তু আমাদের অবস্থাটা একবার তাকিয়ে দেখ! আমি দেখছি জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। জার্মানরা আমাদের অবস্থার সুযোগ নিতে চায়—তার মানেটা বুঝে ওঠা কঠিন নয়। কিন্তু ফ্রান্সের একটা অখণ্ড সত্তা আছে, সেটা ভেঙেচুরে দেওয়া যায় না। ব্যাধির সংক্রমণটা এখনো মেরুদণ্ডে সঞ্চারিত হয়নি। সুতরাং ঠিক উল্টো ব্যাপারটাই ঘটবে; আমরাই জার্মানদের অবস্থার সুযোগ নেব, ওরা নয়। বুঝতে পারছ তো? যুদ্ধের আশঙ্কার সুযোগে আমরা কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করার একটা সুবিধা পাব। জনগণকে যারা শান্তির বার্তা শোনাবে, জয়লাভ হবে সেই পক্ষেরই। কিন্তু হিটলার লড়াই করতে সাহস পাবে না, আর যাই হোক আমাদের ফৌজের সঙ্গে খানিকটা তো যুঝতেই হবে। যাই হোক, ও সব ব্যাপার তুমি ভাল বোঝ আমার চেয়ে।'

'আমি আর কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। আমার ভয় হচ্ছে, আমাদের ফৌজ ঘা সইতে পারবে না। এটা সমরোপকরণের প্রশ্ন নয়—যদিও সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। আমাদের স্পেনের প্রতিনিধির সঙ্গে আমি এই মাত্র কথা বলছিলাম। জার্মান বিমান-বাহিনী সম্বন্ধে তার খুব উঁচু ধারণা। কিন্তু আমি আবার বলছি, প্রশ্নটা তা নিয়ে নয়। অভাব ঘটেছে নৈতিক সাহসের। অফিসাররা কেউ যুদ্ধে যেতে চায় না। ঘটনা যদি এমন দাঁড়ায় যে যুদ্ধে যেতেই হবে, তবু তারা যেতে চাইবে কিনা সন্দেহ। কোন একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত পিছু হটার নীতি তুমি স্বীকার করছ। কিন্তু ঠিক সেই পর্যন্ত এসেও আমরা রুখে দাঁড়াতে পারব বলে তো মনে হয় না। সামরিক বাহিনী একটা জীবন্ত, জৈবিক ব্যাপার।'

পিকার্ উত্তেজিত হয়ে উঠল; সামরিক বিভাগটিকে সে আন্তরিকভাবে ভালবাসে। কিন্তু ব্রতৈল তার কর্মপন্থা ব্যাখ্যা করার পর খুব শান্ত হয়ে গেছে। তার যা বলার ছিল সবই সে বলেছে। শুধু উল্লেখ করেনি কিলমানের সঙ্গে গ্রঁদেলের যোগাযোগের প্রশ্নটা। কিন্তু সেটা একটা খুঁটিনাটির ব্যাপার। খেলাটা জটিল অবশ্য। ব্রতৈল কতবার ইতস্তত করেছে; কিন্তু সে ঠিক থেকেছে তার ভগবদবিশ্বাসের জোরে আর নিয়তির নির্দেশে। ফ্রান্সকে রক্ষা

করবার জন্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর প্রেরিতা সেই লোরেন-নিবাসিনী মেষপালিকার কথা সে সর্বদাই স্মরণে রেখেছে। না, ফ্রান্সের বিনাশ নেই।

পিকারের সঙ্গে কথাবার্তার অল্পক্ষণ বাদেই সে তেসার সঙ্গে দেখা করে পীড়াপীড়ি করতে লাগল—গ্রঁদেল-সংক্রান্ত গুজব অস্বীকার করে যাতে তেসা একটা বিবৃতি দেয়। বলল, 'গ্রঁদেলের সম্মান-হানিকর এই সমস্ত গুজবেরই জের টানা যায় তুকানকে জড়িয়ে। ও লোকটা নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন। কিন্তু এই প্রসঙ্গে তোমার নামটা সর্বদাই উল্লেখ করা হচ্ছে। আবার সেই চিঠি জালের প্রশ্নটাকে খোলাখুলি টেনে আনা হয়েছে। ব্যাপারটা থামাতেই হবে তোমায়।'

তেসা গোঁয়ারের মত বলল, 'আমি তো সমর্থন করছি না কিছুই, কিন্তু কোন কিছু অস্বীকার করার উদ্দেশ্যও আমার নেই। আমার সঙ্গে এ ব্যাপারের সম্বন্ধ কি? তাছাড়া গ্রঁদেলের ওপর আমার কোন সহানুভূতি নেই। তোমাকে স্পষ্টই বলছি, ও লোকটা আমার মনে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জাগাতে পারেনি।'

'আর তুমি কি ভেবেছ আমি গ্রঁদেলকে খুব পছন্দ করি? ও একটা বেপরোয়া লোক, খালি টাকা বোঝে আর লাভের আশায় নিজেকে বিকিয়ে দিতে পারে। আমার মেয়ে থাকলে তাকে নিশ্চয়ই গ্রঁদেলের হাতে দিতাম না। কিন্তু এখানে আমাদের কারবার রাজনীতি নিয়ে, কি ভাল লাগে না লাগে তা নিয়ে নয়। গ্রঁদেলের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চালাচ্ছে কারা—তুকান, ফুজে; আর ওদের পেছনে আছে কমিউনিস্টরা। ওরা পপুলার ফ্রণ্টকে জীইয়ে তুলতে চায়। তুমি যদি এই নিন্দারটনাকে মিথ্যে প্রমাণ করো, তাহলে আমরা ওদের ফিকিরফন্দি বানচাল করে দেব।'

তেসা বলল, 'সেটা বেশ ভাল কথা; কিন্তু চিঠিটা যে জাল সে সম্বন্ধে আমি মোটেই নিঃসংশয় নই। নিজেদের মধ্যে বলছি, গ্রঁদেল একটা অত্যন্ত সন্দেহজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে।'

'অসম্ভব। কিন্তু তোমার হাতে কোন প্রমাণ আছে কি?'

'না।'

'তাহলেই দেখ। ওকে দল থেকে বের করে দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সে রকম ক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র করণীয় হচ্ছে ব্যাপারটা নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। তুমি যদি চুপ করে থাক,

তাহলে ওরা তোমায় সাবাড় করে দেবে। এবার এটা দেখ—এটা হচ্ছে দ্যুকানের অধুনাতন খেল্।'

ব্রতৈল একটা চিঠি দেখাল তেসাকে—গ্রঁদেলের রোজগারের উপায় সম্বন্ধে তদন্তের দাবী জানিয়ে দ্যুকান কয়েকজন দক্ষিণপন্থী ডেপুটির কাছে চিঠিখানা পাঠিয়েছে ; এই তদন্তের দাবীটা শুধু গ্রঁদেল সম্বন্ধেই নয়—'কিলমান-ঘটনা'র সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের সম্বন্ধেই, এবং এদের মধ্যে তেসাও আছে।

বিরক্তিতে কাশতে লাগল তেসা : 'হায় ভগবান! কী শয়তানী!'

এর পরে একটা সংক্ষিপ্ত এবং জোরালো অস্বীকৃতি-পত্রে তেসার সই পাওয়া ব্রতৈলের পক্ষে সহজ হয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় তেসা পলেৎকে বলল, 'ব্রতৈল আমাকে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। চূড়ান্ত শয়তান আর ঠগ ওই লোকটা! অবশ্য, আর একটা জয়লাভ হবে আমাদের। ব্যায়বরাদ্দ-কমিশন আমাদের সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ফুজের বন্ধুরাই তো আছে ওই কমিশনে, সুতরাং সেটা খুব আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমি ওদের অবাক করে দেবার মত একটা বিস্ময়-উপহার দিয়েছি—ফরাসী-জার্মান ঘোষণার আকারে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। কী ভয়ানক রকম সব জয়লাভ হচ্ছে আমাদের একে একে, একবার দেখ: মিউনিক, হরতাল-ভণ্ডুল, ফ্রাঙ্কোর কাছে বেরার্-এর মিশন, আর এখন এই ঘোষণা। সেকেলে লোকরা যেমন বলে—এমনধারা আর একটা জয়লাভ হলেই সব চলে যাবে জাহান্নমে।'

'কি চলে যাবে জাহান্নমে?'

'কি মানে? কেন, ফ্রান্স!'

রাজনীতিতে পলেতের কোন উৎসাহ নেই ; খবরের কাগজে সে পড়ে একমাত্র খুনের খবর আর ধারাবাহিক চিত্র-কাহিনীগুলো। কিন্তু সে যোয়ান অ আর্ক, নেপোলিয়ন, ভিক্টর হুগো আর ভের্দ্যঁর ঐতিহ্যের মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে। তেসার দিকে ভীতিবিহ্বল চোখে তাকাল সে। তেসা কিন্তু হাসির চোটে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'হাসছ কেন?'

'কান্নার চেয়ে ভাল, তাই,' তেসা নিরীহভাবে বলল, 'বড় ক্লান্ত আমি। একটু-আধটু আমোদ করার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। আচ্ছা রাগ কোরো না, লক্ষ্মীটি! এই একটু ঠাট্টা করছিলাম আর কি।

ফ্রান্সের বিনাশ অসম্ভব। পৃথিবী ধ্বংস হবার আগে ফ্রান্স ধ্বংস হতে পারে না।'

২৫

দালাদিএ আর তেসার নীতি প্রভাবান্বিত করার উদ্দেশ্যে স্প্যানিশ গভর্নমেণ্ট 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'কে সাহায্য করতে অস্বীকাব করল। সীমান্তের কাছে ক্যাটালোনিয়ার ছোট্ট এক গ্রামে 'পারী কমিউন' বাহিনী শ্রান্ত অবস্থায় অপেক্ষা করছে—তার লোকদের ফ্রান্সে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। চাষী বৌরা ছোট্ট নদীটায় কাপড় ধোয়া-কাচা করে নিয়ে যায় আর হালকা-সবুজ রঙের শীতের সব্‌জি সংগ্রহ করে ফেরে। জীবনকে শান্তিময় বলে মনে হয়। হঠাৎ, ঝড়ের আগে ধুলোর ঘূর্ণির মত, আশ্রয়প্রার্থীবা এসে জুটতে লাগল।

মূর ফৌজ শহরের দিকে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে বার্সেলোনার লোকরা পালাতে লাগল সবাই, খচ্চর আর ছাগলের পাল তাড়িয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলল চাষীরা, কেউ কেউ তাদের গরু ভেড়াগুলো মেরেও ফেলেছে। ছোট ছোট দেরাজ আর মুরগী-ভর্তি বাঁশের ঝুড়িগুলো ঝুলছে গাড়ীর দুদিকে আর মেয়েরা পাশে পাশে হেঁটে চলেছে বোঁচ্‌কাগুলো কাঁধে নিয়ে। তারপরে সৈন্যরা পালাতে শুরু করল। বন্দুক-বারুদের বাক্সগুলো পড়ে রইল পথের ধারে। গোলন্দাজরা হিঁচ্‌ড়ে টেনে নিয়ে চলল কামানগুলো। আর সমস্তক্ষণ ফ্যাশিস্ট বিমানবাহিনী বোমা ফেলল রাস্তার ওপর ; ছোট ছেলে-মেয়েরা বুকের ওপর নিজের নিজের পুতুলগুলো চেপে ধরে পাহাড়ের খোঁদলের আড়ালে বসে রইল—এই পুতুলগুলো কোনক্রমে তারা সঙ্গে আনতে পেরেছে।

আতঙ্কিত এই জনতার স্রোত এগিয়ে চলেছে আব্‌ছা-নীল ওই দূর পাহাড়ের দিকে, যার ওপারে ফ্রান্সদেশ। কিন্তু তেসা ফরাসী সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়েছে, 'আশ্রপ্রার্থীদের ঢুকতে দিতে পারি না আমরা। ভয় দেখিয়ে সুবিধা আদায় করাটা পছন্দ করি না আমি। আর আমাদের মনে করুণা জাগিয়ে তুলে কমিউনিস্টরা তো তাই করতে চায়।' সুতরাং সীমান্তের প্রবেশ-পথ বন্ধ করে দেওয়া হল।

দু-একজন সেনাপতি তবুও সামরিক-প্রতিরোধ সংগঠিত করার চেষ্টা করলেন।

সৈনিকদের ক্ষয়িষ্ণু মনের জোর জীইয়ে তুলবার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলেন তাঁরা, সীমান্ত থেকে পলাতক সৈনিকদের ধরে এনে সামরিক নিয়মে শাস্তি দিলেন। সাহস আর দৃঢ়তার আবেদন জানিয়ে ছোট ছোট খবরের কাগজ প্রকাশিত হল। সরকারী মন্ত্রীদের দপ্তর আর সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা যাযাবরের জীবন যাপন করতে লাগল, দৈনিক একটা সীমান্ত-গ্রাম থেকে আর একটা গ্রামে জায়গা বদল করতে হল তাদের। জঙ্গলের আড়ালে, ছাউনীর নীচে, খামার-ঘরে টাইপ-রাইটার কাজ করে চলল খট্ খট্ শব্দে। গণতান্ত্রিক গভর্ন-মেণ্টের শেষ ঘাঁটি ফিগ্যেরা শহর বোমা ফেলে উড়িয়ে দিল ইতালীয় বোমারুরা, গুঁড়িয়ে দিল তার পুরনো ধাঁচের বারান্দাওলা বাড়ীগুলো, হত্যা করল সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের। কাটাছেঁড়া বিকৃত দেহগুলো পড়ে রইল ধুলো আর ধ্বংসের স্তূপে।

স্পেনীয় পার্লামেণ্টের শেষ অধিবেশন হল মাটির নীচে এক ভাঁটি-ঘরে। দাড়ি-না-কামানো ক্লান্ত মুখ প্রতিনিধিদের সারা গায়ে ধুলো ঃ রাতজাগা নিদ্রাহীন চোখ-লাল। জনৈক বৃদ্ধ ভাঁটি-ঘরে নামবার সিঁড়িটার ওপর একটা কার্পেট বিছিয়ে দিল, ব্যাখ্যা করে বলল, 'যাই বলো, এটা আমাদের জাতীয় প্রতিনিধি সভার অধিবেশন তো।' নেগ্রিন তার বক্তৃতায় বলল স্পেনের জনতার ধর্ম-যুদ্ধের কথা, হিটলার-মুসোলিনীর বর্বরতা আর ফ্রান্সের হৃদয়হীনতার কথা—যে ফ্রান্স নারী আর আহতদের দেশে ঢুকতে দেয়নি। বলবার সময় কয়েকবার সে হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকল। আর সমস্তক্ষণ চতুর্দিকে বোমা লেগে জ্বলে-ওঠা গ্রামগুলো পুড়ে খাক্ হতে লাগল।

ফরাসী বাহিনীর আস্তানা যে গ্রামে সেখানে যখন গোলবর্ষণের আওয়াজ এসে পৌঁছল, মিশো বলল, 'ওই ওরা আসছে, ঠিক তাই! ওরা যেন আমাদের প্রাণ থাকতে ধরতে না পারে! দাঁড়িয়ে যাও!'

বেরিয়ে পড়ল তাদের বাহিনী। অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে সাহায্য করল তারা, শত্রুর একটা ট্যাঙ্ক-আক্রমণ প্রতিহত করল। ঘণ্টাখানেক ধরে বেশ জবরদস্ত একটা লড়াই হয়ে গেল—সত্যিকারের যুদ্ধ। মাদ্রিদ, তিরোল আর এব্রোর লড়াইয়ের উৎসাহে টিঁকে গেল তারা এবং শেষ কয়েক ঘণ্টার জন্যে আবার জয়ের আভাসটুকু দেখা দিল। কিন্তু রাত্রিবেলায় একটা মোটর গাড়ী এসে পৌঁছল ফোক্সের ছাউনীতে—গুলির ফুটোয় গাড়ীর ঢাকনিটা ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। গলার সঙ্গে ঝোলানো ব্যাণ্ডেজে বাঁধা হাত নিয়ে একজন বিবর্ণ এ্যাড্‌জুট্যাণ্ট্

গাড়ী থেকে নেমে সবাইকে ডেকে বলল, ‘আগামী কাল শেষ শে পেরপিঞাঁয় অতি অবশ্য সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে।’ । পুলিশ মিশো রাগের চোটে সত্যিই চিৎকার জুড়ে দিল ; তার মতে লড়াই সবেমাত্র শুরু হয়েছে। রাগ চেপে রেখে ফরাসীরা সবাই উত্তর-মুখো রওনা হল।

সীমান্ত অঞ্চলটা দেখাচ্ছে বিরাট একটা ছাউনীর মত। দু সপ্তাহ ধরে আশ্রয়-প্রার্থীরা প্রবেশপথ খোলা পাবার অপেক্ষায় রয়েছে। শেষ ভেড়াটাকে তারা জবাই করেছে ; দেরাজ, আলনা, কম্বল আর বাক্স-ভর্তি কাপড়চোপড় পুড়িয়ে উনুন জেলেছে। কেন তারা এত সব জিনিসপত্র আনতে গিয়েছিল সঙ্গে করে ? রাত্রে শীত পড়ে আর মেয়েরা আগুন জেলে চারপাশে বসে শরীর গরম করে। গাধাগুলো ডেকে ওঠে। নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা ফৌজী-শিঙা বেজে ওঠে মাঝে মাঝে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ দালাদিএকে জানাল—স্প্যানিয়ার্ডরা যদি একেবারে সীমান্ত পর্যন্ত সরে এসে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়, তাহলে ফরাসী সীমার মধ্যেও সহজেই যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। সুতরাং দালাদিএ সীমান্তের প্রবেশ-পথ খুলে দেবার হুকুম দিল। শান্ত্রী আর সৈন্যের দল—এদের মধ্যে বেশীর ভাগই সেনেগলের লোক—ঢুকে পড়ল আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে, খানাতল্লাসী করে কেড়ে নিল তাদের হাতিয়ার, গরু ভেড়া আর কিছু কিছু জিনিসপত্র। পেরপিঞাঁতে পুলিশ ‘আটক মাল’-এর ব্যবসায় বেশ দু পয়সা করে নিল—বিশেষত রিভলভার, টাইপ-রাইটার আর ঘড়িগুলো বিক্রি হল খুব।

‘পারী কমিউন’ বাহিনীকে দেখে মোটেই মনে হবে না যে ওরা একটা পরাজিত সেনাদল। উড়ন্ত ঝাণ্ডা তুলে ধরে, কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে কুচকাওয়াজ করে সৈনিকরা ঢুকল। শুধু ওদের মুখচোখে ফুটে উঠেছে পরাজয়-বোধের তীব্র জ্বালাটুকু। এভাবে দেশে ফিরতে হবে—একথা ওরা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। এ যেন দেশ থেকে নির্বাসিত হবার মত। ওদের অনেকেই বোমা-বিধ্বস্ত স্পেনের পোড়া জমিতে ফেলে আসা কামানশ্রেণী আর সংসারের জিনিসপত্রের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে চোখের জল অতি কষ্টে সামলেছে।

সেনেগলীরা পথ রুখে দাঁড়িয়েছিল—ফরাসীদের দিকে কি যেন চেঁচিয়ে বলল, ওরা বুঝে উঠতে পারল না। মিশো ওদের সেনা-নায়ক ; রোদে-পোড়া জলে-ভেজা বিবর্ণ পুরনো পতাকাকে সামরিক অভিবাদন জানাল ‘পারী কমিউন’ বাহিনী। বিব্রত বোধ করল সরকারী ফরাসী বাহিনীর সাধারণ সৈন্যরা, কিন্তু

সৈনিকদের ক্ষয়ি। ভাল মনেই আতারক্ত শাদা দাঁত বের করে খুশির হাসি তাঁরা, সী-

-একজন পুলিশ মিশোর বন্ধু জুল্-এর ব্যাণ্ডেজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে বলল, 'কিছু সোনাদানা ওখানে লুকিয়ে রেখেছ হয়ত।' টাট্‌কা ক্ষতচিহ্নটা দেখে দিব্যি গালল সে। ফরাসীদের ওরা নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে দিল এক ছাউনীতে; বলল, 'তোমাদের ব্যবস্থা পরে হবেখন। তোমরা সব সৈন্য-বাহিনী ছেড়ে পালিয়েছিলে।' এদের সঙ্গে আর সবাইকেও পুরে দেওয়া হল—স্প্যানিয়ার্ড আর সুইড, বৃটিশ আর সার্ব, সন্তানকে স্তন্যদানরত নারী, বার্সেলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, গ্রাম্য ছেলেমেয়ের দল, কবি আর রাখাল আর সাংঘাতিক রকম আহত লোক। যারা পিছিয়ে পড়েছিল, সেনেগলীরা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তাদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিল্।

কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে লোকের গাদাগাদি—খোঁয়াড়ে ভেড়ার পালের মত। ঠাণ্ডা উত্তুরে হাওয়ায় ধুলো-বালি উড়ে এসে পড়ছে মুখে চোখে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি শুরু হল। কোথাও কোন আশ্রয় নেই। কিছু রুটি তাদের দেওয়া হবে বলা হয়েছিল, কিন্তু কেউ দিয়ে গেল না। ছাউনীটা ঠিক সমুদ্রতীরের ওপরেই, সারারাত ধরে সগর্জনে ঢেউ ভেঙে পড়তে লাগল বালিয়াড়ির বুকে। মাঝে মাঝে দূরে গুলির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

তেসার বন্ধু ডেপুটি পিরু এসে পৌঁছল পারী থেকে। শুল্ক বিভাগের আপিসে সে সারাদিন বসে রইল স্প্যানিশ ফ্যাশিস্টদের আসার অপেক্ষায়। দূরবীন চোখে লাগিয়ে লাল আর হলদে রঙের পতাকাটা দেখতে পেয়ে খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখ। মিনিট পনের বাদে স্প্যানিশ জেনারেলের কাছে নিজের নামের কার্ড দিয়ে বলল, 'আপনাদের এই মহান জয়লাভে আমি অভিনন্দন জানাই।' জেনারেল মশাই উত্তরে অনুগ্রহের হাসি হাসলেন।

দিন কেটে যেতে লাগল। ছাউনীর বন্দীরা খিদের যন্ত্রণায় ভুগল; অগভীর কুয়োটা থেকে প্রস্রাবের গন্ধ উঠল; এসে পৌঁছতে লাগল ভ্রমণকারীর দল; স্প্যানিয়ার্ডদের দিকে তারা এমন ভাবে তাকাল যেন ওরা কোন চিড়িয়াখানার বন্য জন্তু; রক্ত-আমাশা আর নিউমোনিয়ায় যারা মারা পড়ল, তাদের মৃতদেহগুলো প্রতিরাত্রে গাড়ী বোঝাই হয়ে চালান হয়ে গেল।

পেরপিঞা। হাসি-খুশি দিল-খোলা গোছের শহর; এখানকার লোকে বাদামের বর্‌ফি খায়, কড়া পচাই মদ টানে, ময়দানে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে সামরিক বাজনা শোনে

আর পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে ভোট দেয়। এবার লোকের তল্লাশে পেরপিঞাঁয় তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। ইস্কুলগুলো গারদখানায় পরিণত হল। পুলিশ ফিরতে লাগল আত্মগোপনকারী স্প্যানিয়ার্ডদের সন্ধানে। স্প্যানিশ মেয়েদের খালি মাথায় ঘোরাফেরা অভ্যাস; বৃথাই তারা তাদের শেষ পয়সা পর্যন্ত খরচ করে এবারকার শীতেব ফ্যাশন অনুযায়ী ছোট ছোট টুপি কিনল: তাদের কান্না-ফোলা চোখেই ধরা পড়ে গেল তারা।

অনেক ফরাসী মেয়ে-পুরুষ স্প্যানিয়ার্ডদের গোপন আশ্রয় দিল তাদের চিলে কোঠায়, ভাঁড়ার ঘরে, পায়খানায় আর রাখালদের কুঠরীতে। হাজার হাজার শুভাকাঙ্খী পাহাড়ী উৎরাইয়েব অজানা বাঁক ঘুরে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল আশ্রয়প্রার্থীদের।

অত্যন্ত বিষণ্ণ এই সন্ধ্যাটা। ছাউনীব এক শান্ত্রী একজন স্প্যানিয়ার্ড্-এর মুখে ঘুষি মেরেছিল। এ অপমান সইতে না পেরে স্প্যানিয়ার্ড্‌টি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। বন্দীদের সকলেরই মনমরা ভাব। তার ওপর আবার রুটির দৈনিক বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তারা পাচ্ছে মোট সাড়ে চার তোলা। মিশো তার অংশটা ফার্নাণ্ডেজ্‌কে দিয়ে দিল; ফার্নাণ্ডেজ্ একজন স্পেনীয় শিল্প-শিক্ষক—যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের ঘাঁটির সন্ধান এনে দিত যারা, তাদের একটি দলের নেতৃত্ব করেছে সে।

মিশো বলল, 'নিদারুণ লজ্জার কথা! তুমি হয়ত ততোটা খারাপ ভাবে নিচ্ছ না; এর জন্যে তোমরা দায়ী নও। কিন্তু আমি তো ফরাসী।'

ফার্নাণ্ডেজ্ বোকার মত বলল, 'কি জানি! আমি এর আগে কখনো দেশের বাইরে যাইনি। এই প্রথম...'

'তুমি অন্যদের—আমাদের কমরেডদের—অবস্থা জান না, এই আমার দুঃখ। সত্যি বলছি তোমায়—অন্য ধরনের ফরাসীরাও আছে। কিন্তু কোথায় তারা? কতজনাই বা হবে? ফ্রান্স এক সময় অন্য রকম ছিল। আমাদের বাহিনীর নাম দিয়েছিলাম 'পারী কমিউন'। কী সুন্দর নামটা! ওরা তো কই ওদের বাহিনীর নাম দিতে যায় না 'মিউনিক বাহিনী'। আমাদের সমস্যাটা কি জান? ভারী সহজ আমাদের ফ্রান্সের এই জীবনযাত্রা। ১৯১৪-র যুদ্ধ লোকে ভুলে গেছে। নিজেদের মধ্যে ওরা বলাবলি করে, 'হাঙ্গামা চুকে গেছে; আর কিছু হবে না; আমাদের বুদ্ধিটা বেড়েছে।' যেন যুক্তি দিয়ে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচা যায়! বড় বেশী রকম ভালভাবে আছে ওরা। ওরা ভাল

খেতে পায়, মেয়েরা রূপসী, সমুদ্রতীর আছে, পাহাড় আছে, বাগান আর কাফে আছে সর্বত্র, আর আবহাওয়াটাও নাতিশীতোষ্ণ। সুতরাং ওরা যে কেবল বিপদের কথা ভাবতে ভয় পায় তাই নয়, বিপদকে অবজ্ঞা করে। কুড়ি বছর আগে ওরা রুশদের অবজ্ঞা করত—আমি তখন শিশু মাত্র, বেশ মনে আছে আমার—ওরা হাসাহাসি করে বলত, 'রুশরা তো নিজেরাই খাবার রুটি পায় না, পরবার পাৎলুন পায় না, ওরা আবার গোটা পৃথিবীটাই বদলে দিতে চায়।' এখন ওরা স্প্যানিয়ার্ডদের বিদ্রূপ করে বলে, 'ওরা তো খুব আত্মসম্ভ্রমের কথা বলত, কিছুতেই নাকি 'নতজানু' হবে না ওরা—এখন তো সেই আমাদের দোরে এসেই আশ্রয় চাইতে হল।' এদের সমস্ত জীবন-দর্শনটাই কী সংকীর্ণ! আর বিপদটা ওরা দেখতেই পাচ্ছে না। বন্ধুতা আর বিশ্বাসের সহজ অনুভূতির ওপর ওদের কোন ভরসা নেই। আমার মনে হয়, ফ্রান্সের মুক্তি আসবে একমাত্র চরম দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে—নিদারুণ সাংসারিক দুঃখ।'

ওদের মাথার ওপরে লক্ষ তারা জ্বলতে লাগল। ঢেউয়ের চাপা গর্জন ভেসে এল সমুদ্র থেকে। মার্চ মাসের ঝড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

২৬

ফোটোগ্রাফখানার দিকে তাকিয়ে জোলিও হাসল। তরুণী অভিনেত্রীটি এক গ্যাস-মুখোশ পরে নিজের ছবি তুলিয়েছে। বুক-কাটা পোষাকে তার নারী-সুলভ আকর্ষণী-শক্তিটা বেশ একটু দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর মুখোশ-পরা মুখখানা দেখাচ্ছে শুয়োরছানার খাঁদা শুঁড়ের মত। জোলিও তার সেক্রেটারীকে বলল, 'হংক্-হংক্ পরিহিতা চিত্রতারকা। এটা ছাপাব আমরা। প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে গেল, আজ 'বাসন্তী-মঙ্গলবারের' উৎসব দিবস।'

এক সময়ে এই 'বাসন্তী-মঙ্গলবার' ছিল ছুটির দিন। বুল্‌ভারে জনতার ভীড়, প্রমোদ শোভাযাত্রায় শাদা কোর্তা পরা সঙ্, আঁট-সাঁট পোষাক-পরা ভাঁড়; পথ-চল্‌তি যৌথনৃত্য, অদ্ভুত সব টুপি, জরী সুতো লাগানো কালো মখমলের মুখোশ আর রঙচঙে খাবার—এসব জোলিওর মনে আছে। পরে এই প্রমোদ-উৎসবটি ক্রমশ বন্ধ হয়ে আসে। তা হলেও, বাসন্তী-মঙ্গলবারের এই দিনটিতে আগেকার সেই সঙ্-যাত্রার খানিকটা আভাস এখনো বজায় আছে; বহুরূপীর

দল ঘুরছে ক্যাফেগুলোয়, নকল নাক আর দাড়ি লাগিয়ে মুখোশ-পরা ছোট ছেলেরা টহল দিচ্ছে পথে পথে। কিন্তু এ মুখোশগুলো আর আগেকার দিনের মুখোশ নয়—এবার ওরা পরেছে হংক্-হংক্ গ্যাস-মুখোশ। গুরুভার একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলল জোলিও—নিজের প্রত্যেকটি কাজেই সে একটা করুণ দুঃখের ছোঁয়াচ লাগায়—কিন্তু তাই নিয়ে কেউ তাকে ঠাট্টা করলে সে সর্বদা বলে, 'পারীর লোক যুক্তিটাই ব্যক্ত করে, মার্সাইএর লোক ব্যক্ত করে তার অনুভূতিকে!'

জোলিওর কাজকর্ম দিব্যি চলছে; গোপন সরকারী তহবিল থেকে মোটা টাকা পাচ্ছে সে। উপহারের বোঝায় স্ত্রীকে অভিভূত করে তুলেছে: একটা নীলার কণ্ঠহার, এক বাক্স গয়না—বিশেষজ্ঞদের মতে এটা নাকি মাদাম রেকামিএ-র সম্পত্তি ছিল, আর লণ্ডনের বিখ্যাত জহরতের দোকান 'ক্রাফ্ট'-এর প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়া একটা স্ফটিক-ভাস্কর্য। জোলিও রীতিমত একদল ফালতু লোকের ভরণপোষণ করে: নিষ্কর্মা সাংবাদিক, মার্সাইএর পদ্য-লিখিয়ে, ক্লিষ্ট-হৃদয় জোচ্চোরের দল—যারা কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিজেদের নাম দিয়েছে 'নৈরাজ্যবাদী'। আজকাল আর কেউ জোলিওকে মানহানির মামলায় অভিযুক্ত করতে সাহস পায় না। ডেপুটিরা তার খোসামোদ করে, বৈদেশিক রাষ্ট্রপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সে খানা খায় আর নিজের সেক্রেটারীকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, 'রুমানিয়া সম্বন্ধে একটা কথাও নয়! হাঙ্গেরিয়ানরা অনেক দরদী; তাছাড়া, ওদের দৃষ্টিভঙ্গীও ঢের উদার......'

জোলিওর এই সাফল্য সত্বেও, তাকে দেখে কেমন যেন বুড়োটে আর নির্জীব বলে মনে হয়। এমন কি, চুনির চোখ বসানো নীলমণির কাকাতুয়াওলা গলাবন্ধনীর ওই নতুন কাঁটাটাও যেন তার চেহারায় উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। তার পৃষ্ঠপোষকদের জটিল খেলায় সে ভারী উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। আপন মনে বলে, 'কি যে লিখি নিজেই বুঝি না।'

তেসা একদিন তাকে বলল, 'লাল-ফৌজের সামরিক দুর্বলতা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখো। ইতালীয় দূতাবাসের সামরিক পরামর্শদাতার বিবৃতির সঙ্গে মিল থাকা চাই লেখাটায়।'

দু দিন বাদেই তেসা আবার দাবী জানাল, 'রাশিয়ার সামরিক উপকরণ অফুরন্ত—এই কথাটার ওপর খুব জোর দিয়ে লেখা চাই।'

আজ সকালে তেসা আবার তাকে টেলিফোনে ডাকল: 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

গুরুতর হয়ে উঠছে। মার্চ মাসের মাঝামাঝি হতে চলল। উপনিবেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা আমাদের পক্ষে বিশেষ জরুরী। কিন্তু মধ্য আর পূর্ব ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের মাথা ঘামাবার কিছু নেই।'

জোলিও লেখাটা শুরু করল: 'শ্রীযুক্ত মারসেল্ দীত্ কথাটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—ডানজিগের জন্যে আমরা মরতে চাই না......' এর পরে কী লিখবে সে? তারপরে হঠাৎ তার ভাবের উৎস খুলে গেল, ডান চোখটা কুঁচকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে লিখে চলল, 'মরতে চাই না আমরা ওয়ারশর জন্যে, বেল্‌গ্রেডের জন্যে, বুখারেস্টের জন্যে......' অত্যন্ত ক্লান্ত দেহে নিজেকে এলিয়ে দিল সে। লেখাটা ঠিক মত পরিবেশন করাটাই আসল ব্যাপার। 'মৃত্যু' কথাটা বড় অক্ষরে ছাপতে হবে; আর, প্রবন্ধটার নীচে ওই হংকৃ-হংক্-এর ছবিটা।

'লা-রিপাব্লিক' পত্রিকার সম্পাদক গেজিএ-র সঙ্গে সে মধ্যাহ্ন-ভোজন খেল। চেরী ফলের টক-মদে ভেজানো মিষ্টি কেক খেতে খেতে খাবার মুখে গেজিয়ে কৌতুক করে বলল, 'স্রেফ যত সব বাজে কথা। চেম্বারলেন নাকি ইতালিয়ানদের টিউনিসিয়া দিয়ে দিতে চেয়েছে; আর বনে চেঁচাচ্ছে: 'আমরা বরং ওদের মাল্টা দিয়ে দোব!' দস্তুরমত বেশ্যাবাড়ীর ব্যাপার! কাল আমায় দালাদিএ বলল, 'যৌথ-নিরাপত্তা সম্বন্ধে একটা কথাও বলা চলবে না।' আগামীকাল আমরা ইহুদী-উপদ্রব সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ ছাপাচ্ছি। কথা-প্রসঙ্গে বলে রাখি, প্রবন্ধটা একজন ইহুদীর লেখা। ওই যা বললাম, রীতিমত বেশ্যাবাড়ী আর কি!'

•

খানিকটা আর্মাঞাক্ মদ খেল ওরা। গেজিএ-র তাড়াতাড়ি যাবার দরকার ছিল, জোলিও খানিকটা হাওয়া খাবার উদ্দেশ্যে হেঁটে ফিরল তার আপিসে; আপন মনে বলল 'গেজিএটা একটা বোকা শয়তান! এর সঙ্গে মাল্টার সম্বন্ধ কি? মাল্টা কি ইউরোপে?' প্লাস্ দ্য লে-তোয়াল পর্যন্ত সে বুলভার ভাগ্রাঁ ধরে হেঁটে এল। আবহাওয়াটা যখন তখন ভোল বদলাচ্ছে; যেই সূর্য ওঠে অমনি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চারদিক, বাদাম গাছের কুঁড়িগুলো পাঁপড়ি মেলে, সুন্দর দেখায় মেয়েদের মুখগুলো; তারপরেই ঠাণ্ডা হাওয়ায় ভারী মেঘ জমে ওঠে আর শীতের বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। স্কোয়ারটায় পৌঁছে জোলিও 'অজ্ঞাত সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভে'র কাছে থেমে গেল। সেই চিরাচরিত দৃশ্য—বিবর্ণ আলোর শিখা, ফুলের গুচ্ছ, মফস্বলের দর্শকদল। স্তম্ভের ওপর বিরাট খিলান। জায়গাটা জোলিওর মনে সর্বদাই

একটা আবেগের ভাব জাগায়। কখনো সে টুপি নামিয়ে নেয় মাথা থেকে, কখনো বা শিস দিয়ে 'লা-মার্সাই' গানের সুর ভাঁজে। তার বয়সের অধিকাংশ লোকের মতই সেও যুদ্ধের বছরগুলোকে তারুণ্যের আর আত্মিক পরিপূর্ণতার যুগ হিসেবে দেখে। এমন কি, একটা আবেগ-মেশানো স্নেহের সঙ্গেই সে স্মরণ করে—সার্জেণ্টের হেঁড়ে গলা, সেই খাটিয়াটি যার ওপর তাকে টাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়ে দু মাস পড়ে থাকতে হয়েছিল, কুচকাওয়াজ করে উৎরাই পার হবার আগে সেই বিশ্রী অসুস্থ অনুভূতি আর কন্‌কনে ঠাণ্ডা, আর সেই যখন ফৌজকে রম্‌-মেশানো কফি খেতে দেওয়া হয়েছিল আর তারা ব্যগ্রভাবে হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিল গরম টিনের পাত্রগুলো। প্রত্যেকটি কমরেডের কথা তার মনে আছে—বেঁটে মোটা দরনিএ, ক্ষীণদৃষ্টি দেভাল আর ফূর্তিবাজ ক্লেমঁ্যা—যুদ্ধে মারা পড়েছিল ও, বেচারী!

এই স্তম্ভের নীচে গোর দেওয়া হয়েছে কাদের?—ক্লেমঁ্যা? হতেও তো পারে। ক্লেমঁ্যা আজ ফুলের তোড়া উপহার পাচ্ছে, তাকে সামরিক সেলাম দিয়ে যাচ্ছে জেনারেলরা, বৈদেশিক রাজদূতরা আব তেসা। বেচারী ক্লেমঁ্যা—ইহুদীদের সঙ্গে তার কি কোন শত্রুতা থাকতে পারত! ও তো বিয়ে করতে চেয়েছিল মার্সাইএর এক মেয়েকে।

জোলিওর মনে পড়ল 'ডানজিগের জন্যে আমরা মরতে চাই না।' তাহলে ক্লেমঁ্যা মরল কিসের জন্যে? ওরা বলত, 'ফ্রান্সের জন্যে।' মার্সাইএর সেই মেয়েটির হয়ত আর কারুর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এমন কি মরেও যেতে পারে মেয়েটা—এক শতাব্দীর সিকিভাগ কেটে গেছে!

আপিসের চিরাচরিত কর্মব্যস্ততায় জোলিও সান্ত্বনা পেল; আর ভাবতে পারে না সে। মন্ত্রীদের দপ্তর থেকে একটা প্রবন্ধ পাঠানো হয়েছে; প্রবন্ধটার নাম, 'ইতালী: পূর্ব-ইউরোপে লাতিন-সংস্কৃতির প্রাচীরদুর্গ।' কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় হংক্‌-হংক্‌ মুখ ভেঙচাচ্ছে। বাইরে রাস্তায় কাগজউলী মেয়েরা আনুনাসিক তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচাচ্ছে, 'পঞ্চম সংস্করণ! আমরা মরতে চাই না।'

সেদিনের মত কাজ শেষ করে জোলিও এল এক প্রমোদ-জলসায়। এরা অনেক দিন থেকেই এখানে একবার আসবার জন্যে তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নিমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে। মুখে পুরু করে রঙের প্রলেপ লাগিয়ে একজন তরুণ গায়ক গান ধরেছে:

'আগামীকাল বাঁচিই যদি, তবে—
থোড়াই কেয়ার করি তারপরে কি হবে!'

শ্রোতার দল ধুয়ো ধরল : 'থোড়াই কেয়ার করি তারপরে কি হবে!' আজ যে 'বাসন্তী মঙ্গলবার' সে কথা মনে পড়ে যাওয়ায় জনৈক অভিনেতা একটা মুখোশ পরে মঞ্চের ওপর এল—লম্বা নাকওলা শাদা মুখোশটার দুই চোখের কাছে দুটো ফুটো। হল থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'মৃত্যু!' আরেকজন বলল, 'বাজে কথা! ও হল গিয়ে তেলা। ওই তো ওর নাক।'

এই অসম্ভব বাজে হাস্যকৌতুকে বিরক্ত হয়ে জোলিও বাড়ী চলে এল। খাবার ঘরে বসে তার স্ত্রী একটা খবরের কাগজ পড়ছে। নিজের কাজকর্মেই সে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, তাই জোলিওর কাজকর্ম সম্বন্ধে সে কথনো কোন প্রশ্ন তোলে না। দরজি, দোকানদার আর পোষাকের হাল-ফ্যাশান নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সম্প্রতি সে মনে মনে না ভেবে পারেনি, 'কী যে সব কাণ্ড! খবরের কাগজে কি বলতে চায় ওরা এ সব?' শেষ পর্যন্ত সাহস করে বলে ফেলল স্বামীকে, 'কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

জোলিও হাত দুটো নাড়ল : 'আমিও ছাই জানি না কি? কি যেন একটা ফন্দি আছে ওদের। কে জানে, হয়ত তাও নেই, শুধু ভান করছে। ওদের চালাকির উপর শ্রদ্ধা ছিল আমার, কিন্তু এখন আর কিছু বুঝে উঠতে পারি না। মাঝে মাঝে মনে হয়—ভয়ের চোটে ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।'

স্ত্রী একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল তার দিকে, তারপরে ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি জার্মানদের কাছ থেকে কিছু নিচ্ছ না তো? বড় দুর্ভাবনায় আছি আমি। ওরা এর জন্য গুলি করতে পারে লোককে।'

জোলিও চেঁচাতে লাগল, 'মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার! এমন ধারণা কি করে ঢুকল তোমার মাথায়? আমাকে পয়সা কড়ি দেয় কারা! নিজের দেশের লোক এই ফরাসীরা দেয়, দেয় গভর্নমেণ্ট!'

তারপরে হঠাৎ বিড়বিড় করে বলল, 'পারীর জন্যে মরা। বেচারী ক্লেম্যাঁ!'

শ্রীমতি জোলিও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারল না তার কথার মানে।

২৭

'কেমন আছেন ?'

'এই রকম। আপনি ?'

উত্তরটা না শুনেই দেসের এগিয়ে গেল। হঠাৎ তার মনে হল, সবাই যদি এই সব প্রশ্নের উত্তরে সত্যি কথাটা বলত, তাহলে কি রকম হত সেটা ? বিরামহীন শোক আর আতঙ্কের জবানবন্দী চলতেই থাকত। কিন্তু এটা একটা বাঁধাধরা বুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে—তেসার বক্তৃতা, গির্জায় প্রার্থনা কিংবা প্রণয়ীর শপথবাক্যের মতই। এ ধরনের উক্তির মধ্যে একটা সৌজন্য আছে—সব কিছুই যদি নগ্নরূপে প্রকাশ পেত তাহলে তো বাঁচাই হয়ে উঠত অসম্ভব।

দেসের যে ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাচ্ছে, একথাটা কেউ আন্দাজ করে উঠতে পারেনি। তার ব্যবসাগুলো ফেঁপে উঠছে ; শিকাগো আর লিভারপুল আগের মতই তার হুকুমের অপেক্ষায় থাকে। দালাদিএর সঙ্গে তার ঝগড়া আর হরতালের আগে তার সেই বক্তৃতা নিতান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মতিনির ধারণা, ওটা নেহাৎ দেসেরের 'মৌলিক কিছু করার চেষ্টা'। কথাটা শুনে তেসা মাথা নেড়ে তারিফ জানিয়ে বলেছে, 'ভারী চালাক লোকটা। সব তাল ও সামলাবে, দেখো। শয়তানের মত ওর চারদিকে চোখ...... !'

দেসের কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। খেলেই চলেছে সে, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী খেলুড়ের আসনটা শূন্য—একটা নকল প্রতিমূর্তির সঙ্গে সে খেলছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তার কাছে একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মত মনে হয়। ইদানীং রোজ রাত্রে সে বাইজান্টিয়মের এক বিরাট ইতিহাস পড়ে, আর পড়তে পড়তে তার হাসি আসে—কোথায় গোলমাল হয়েছে সেটা সবাই জানে, কিন্তু সর্বনাশকে রুখবার উপায়টা কারুর জানা নেই।

অবশ্য মিউনিকই ছিল আত্মরক্ষার একমাত্র পথ। যে কোন উপায়ে চুক্তিতে আসাটাও অবশ্য দরকারী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই উপায়টা কি ? আর চুক্তিটাই বা কার সঙ্গে ? উন্মত্ত ঝড়ের সঙ্গে ? ভেল্‌কিবাজী ! যত সব বুজরুকি !

পঞ্চাশ বছর বয়স হবার আগে পর্যন্ত দেসের কোন গুরুতর রোগে ভোগেনি। রীতিমত মদ খায় সে, অবিরাম পাইপ ফোঁকে, আর কোনদিনই যথেষ্ট ঘুম

হয় না তার। এখন হঠাৎ সে ভুগতে আরম্ভ করল। নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সে ভারী খুঁতখুঁতে হয়ে উঠেছে, ডাক্তারদের পরামর্শ খুব মন দিয়ে শোনে, কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্রের নির্দেশ মেনে চলতে তার ভারী বিরক্তি—আগেকার মতই বিশৃঙ্খল বেপরোয়া জীবনযাপন করে যেতে থাকল সে। এমন কি আগের চেয়েও বেশী করে মদ খেতে লাগল। মৃত্যুভয়টা বেড়ে গেল। রাত্রে স্পোর্টস্-মোটরগাড়ীটায় চেপে পারী থেকে বহু মাইল দূরে চলে যায়, তারপরে রাস্তার ধারে কোন ছোট্ট কাফের পাশে গাড়ী থামিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে আর হাল্‌কা মদ খেতে খেতে রেল-মজুরদের সঙ্গে গল্প করে, আলোচনা করে আবহাওয়া সম্বন্ধে। তার চিন্তায়, মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার আর ব্যবহারে যে একটা জড়তা আছে, সেটাই আরো অনেক লোকের মতই দেসেরকেও বাঁচিয়ে দিয়েছে। ব্যবসায়-সংক্রান্ত কাজকর্ম সে যথারীতি করে চলেছে, আরো দুটো নতুন কারখানা খুলেছে, রোমের সঙ্গে আলোচনার ব্যাপারে অংশগ্রহণ করেছে। এসব কাজে বিশেষ কোন উৎসাহ সে পায়নি, কিন্তু কাজের মধ্যে সে সান্ত্বনা পায়। বাইজান্‌টিয়মের শক্তি হ্রাস আর পতন, হৃদ্‌পিণ্ডের বাতরোগ, কিংবা নিজের একাকীত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার চেয়ে এসব অনেক সহজ।

এমন কি, কিছুক্ষণের জন্যে আত্মবিস্মরণের আশায় সে মাঝে মাঝে জিনেতের সঙ্গে গিয়েও সময় কাটায়। ওই 'মাথাপাগলা মেয়েটা'র সঙ্গে সে প্রেমে পড়েছে বলে স্বীকার করে না। জিনেতের সঙ্গে সন্ধ্যা কাটিয়ে আসার পর নিজেকে তার আরো বেশী একা বলে মনে হয়। বাড়ী ফেরার পথে মনে মনে ভাবে, 'তবু যেন ঠিক জিনিসটি হল না'—কিন্তু নিজেই জানে না কি সে চায়।

বেশ ঘন ঘন ওদের মধ্যে দেখা হয়। পারীর শহরতলীর ছোট ছোট কাফেগুলোয় দুজনে যায়। মাঝে মাঝে জিনেৎকে নিয়ে দেসের নির্জন জলে-ভেজা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় নব্বুই মাইল বেগে মোটর চালিয়ে দেয় আর দেসেরের গতি-চাঞ্চল্য জিনেতের মনেও সংক্রামিত হয়ে যায়। তারপরে আবার একই পথ ধরে ফিরে আসে, সাড়ম্বরে জিনেতের হাতে চুমু খেয়ে সেদিনের মত বিদায় নেয়। যখনই কোন ক্লান্তিকর টেলিগ্রাম আসে কিংবা স্তূপীকৃত কাজের চাপ তাকে লেখার টেবিলে আটকে রাখে, শুধু তখনই সে জিনেতের ভাবনা থেকে মুক্তি পেয়ে খানিকটা স্বস্তি বোধ করে। এমন কি দেসেরের আবেগগুলোও যেন প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলার মতই, মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে তা দমন করা যায় না।

সেদিন জিনেতের জন্যে সে স্টুডিওতে এসে হাজির হল। কোনদিন সে জিনেতের গলা রেডিওতে শোনেনি। কেমন যেন তার মনে হয়েছে—শোনাটা ঠিক নয়; কই, জিনেৎ তো তাকে ফাটকা বাজারের কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না! অপেক্ষা করতে বলা হল তাকে—এনে বসানো হল লাল রঙের ভারী পরদা-টাঙানো এক ফাঁকা ঘরে। জিনেতের গলা শুনতে পেল সে: কি একটা কবিতা আবৃত্তি করছে। দেসেরের মনে হল, কোন ইস্কুলপাঠ্য কবিতার বইয়ে যেন কবিতাটি সে দেখেছে:

'মৃত্যুও শাসন মানে তোমার প্রেমের,
উদ্বেল উচ্ছ্বাস তার পৃথিবীর সীমানা ছাড়ায়।
সংসারের খেয়াঘাটে খুঁজে নেব মোরা দুইজনে
স্মরণের পরপারে দূরযাত্রী স্বপ্নের জাহাজ
আলোঝরা সেই স্বর্গে আমাদের মুক্ত-অভিসার।'

—এর বেশী আর তার কানে গেল না। ঘন কুয়াশার মত বিষণ্ণতা নেমে এল তার মনের পটে।

জিনেৎ আসতে সে বলল, 'চমৎকার আবৃত্তি করছিলে তুমি।'

হেসে উঠল জিনেৎ: 'ওটা একটা বিজ্ঞাপন—চোখের জন্যে এক ধরনের সুর্মা।'

একসঙ্গে বেরোল তারা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়া শুরু হয়েছে। জিনেৎ জিজ্ঞাসা করল, 'যুদ্ধ সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?' স্টুডিওর কথাবার্তা মনে পড়েছে তার—দেসের জানতে পারে হয়তো। কিন্তু দেসের শুধু বলল, 'আমি তো আর ভবিষ্যদ্বক্তা নই।'

ছেঁড়াখোঁড়া একটা পুরনো ধাঁচের কোট গায়ে দিয়ে একটা মেয়ে ওদের দুজনের পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিল; হাতে নানান জিনিসের মোট আর থলি বয়ে নিয়ে যেতে যেতে মেয়েটি আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'ওর গলার নলিটা ফুটো করে দেব আঙুল দিয়ে। বেশ হবে তাহলে!' দেসের ফিসফিসিয়ে বলল, 'পাগলী!' অস্বস্তি বোধ করায় তারা তাড়াতাড়ি গিয়ে উঠল গাড়ীটায়। গাড়ী চালাবার চাবীটা টিপতে একটু দেরী করল দেসের—মুহূর্তের জন্যে বসে রইল আচ্ছন্নের মত। তারপর চলতে শুরু করল তারা। ভিজে জানলার কাঁচে লাল আর সবুজ আলোর ঝল্‌কানি খেলে যেতে লাগল। মোটর গাড়ীর সামনের আলো দুটো অন্ধকারের বুকে আলোর ঢেউ তুলেছে, আর সেই আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠছে বৃষ্টি-ভেজা গাছগুলো। দেসের জিনেৎকে নিয়ে এল শহরতলীতে

তার নিজের বাড়ীতে। জিনেৎ যেতে চায় কিনা, সে কথা সে জিজ্ঞাসা করেনি। সমস্ত পথটা সে একেবারে মুখ খোলেনি বললেই চলে।

বাড়ী পৌঁছে সে জিনেৎকে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এক ঢোঁক খেয়ে শরীরটা গরম করে নাও। তোমার আবৃত্তিটা চমৎকার হয়েছে, সত্যি। থিয়েটারে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। মনে আছে বোধহয়, একবার বলেছিলে—তোমার প্রযোজকের টাকা ছিল না; সেটা খুব সামান্য ব্যাপার।'

জিনেৎ মাথা নেড়ে বলল, 'না, আজকাল আর অভিনয় করতে পারি না আমি। আবৃত্তি করার সময় অভিনয়ের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করতে হবে তোমায়। যদি না করো, তাহলে শ্রোতার দলও তা বিশ্বাস করবে না। সে রকমটি হলে, নিঝুম নাটমহলে তোমার গলার স্বর হারিয়ে গেছে বলে মনে হবে। বুঝতে পারছ না? এই যেমন আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই আগের আমিকে। এক সময়ে আমার বিশ্বাস ছিল নিজের ওপর—তখন আমি একজন অভিনেতার সঙ্গে থাকতাম। লোকটা নাক ডাকিয়ে ঘুমুতো, আর আমি ওর পাশে শুয়ে রাসীন-এর 'ফেদ্‌র্‌' থেকে আবৃত্তি করতাম...'

বাইরে বাগানে চলে এল জিনেৎ। ভিজে পাতা আর মাটির সোঁদা গন্ধ উঠছে—খুব শিগগির বসন্ত এসে যাবে; বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্ শব্দটা তার দ্রুত পদধ্বনির মত মনে হল জিনেতের—আগ্রহভরে সে নিশ্বাসের সঙ্গে টেনে নিল তাজা হাওয়া। দেসের ডাক পাড়ল, 'ঠাণ্ডা লাগবে তোমার!' উত্তর দিল না সে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিবিড় একটা সুখ যেন নাগালের মধ্যে এসে গেছে বলে তার মনে হল, এবং আর একবার এই স্বপ্নকে সে বিশ্বাস করে বসল—ফ্ল্যারিতে যেমন করেছিল। ঘরে ফিরে এসে দেসেরের দিকে স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকিয়ে সে হাসল। বিব্রত বোধ করল দেসের, কিন্তু জিনেৎ বলল, 'না, ঠাণ্ডা লাগবে না আমার। বড় অভিশপ্ত জীবন আমার, দেসের, আমার মরণ নেই।'

বিষণ্ণ মনে আবেগের সঙ্গে দেসেরকে চুমু খেল সে—কিন্তু নিজেই বুঝে উঠতে পারল না—কেন সে এরকম করছে। দুঃখ আর অপমান ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু নেই; কিন্তু সেই রাত্রে বৃষ্টির রিম্‌ঝিম্ শব্দ শুনতে শুনতে জিনেৎ কবিতার কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করল,

> 'সোনাঝরা বসন্তের গান যেথা চির-মর্মরিত
> বেদনা-ভাবনা-মুক্ত শান্ত মগ্ন মন
> মৃত্তিকার রসস্নিগ্ধ শ্যামল সোনালী ফুলে ফলে

মাটির বুকের কাছে শিহরিত বেনুকুঞ্জবন
সেথায়, অথবা স্বর্গে পায়ে দলে ফুলঝরা পথ
পাশাপাশি মোরা কভু ভুলিব না প্রেমের শপথ।'

হঠাৎ দেসের জিজ্ঞাসা করল, 'জিনেৎ, এত বিষণ্ণতা কেন ?'

'এটা বিষণ্ণতা নয়। বিষণ্ণতা ছিল ফ্ল্যারিতে—আমাদের সেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে যেখানে; কিংবা হয়ত এই কবিতাটির মধ্যে। কিন্তু এটা হচ্ছে হতাশা। সেই পাগলীটাকে মনে পড়ছে ? তোমার জীবনটাও অভিশপ্ত, দেসের—এখন বুঝতে পারছি।'

একথা বলে জিনেৎ তাকে আবার চুমু খেল।

সকালে তারা ফিরে এল পারীতে। দেসেরকে নিয়ে খবরের কাগজগুলো কেন যে এত হৈচৈ করে জিনেৎ তা বুঝে উঠতে পারে না। ওরা যেন তাকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে; বলে—'মুকুটহীন সম্রাট'। আসলে ও কিন্তু অত্যন্ত দুস্থ, ওর মনটা ফাঁকা। আর, ও এসেছে জিনেতের কাছে—তার কাছে ও নাকি আত্মাব মুক্তি খুঁজে পাবে—কী অসম্ভব রকম উপহাস্য এই কথাটি! ওর ছেলেমানুষি দেখে দুঃখ হয় জিনেতের। দেসেরও দুঃখ পায় জিনেতের জন্যে। কিন্তু করুণার ভিত্তিতে প্রেমের সৌধ গড়ে তোলা যায় না। কাব্যের কথাই যদি ওঠে, তাহলে ওটা তো বিজ্ঞাপন মাত্র—মুখে মাখবার ক্রীম, ঘর পরিষ্কার করার যন্ত্র আর স্মরণের পরপারে স্বপ্নের স্বর্গ। ও কোনদিন অভিনেত্রী হতে পারবে না; কোনদিন বিয়েও করবে না তাকে।' দেসের এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করায় ও হেসে উঠেছিল—না, 'মুকুটহীন সম্রাজ্ঞী' হতে চায় না সে। দেসের তার নিজের কাজকর্ম নিয়ে নিজে থাকুক, সেই ভাল। এই যেমন, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে যেতে হবে কাজে—মজুররা যেমন যায়, গিয়ে বসতে হবে তাকে নিজের টেবিলটায় আর লাখের সংখ্যায় হিসেব গুণ্তি করতে হবে। জিনেৎ যে তার মতই দুস্থ, এ কথাটা দেসের বুঝতে চায় না কেন ? তার তো সবই লুঠ হয়ে গেছে—নিজের কিছুটা সে দিয়েছে ফিজেকে, বাকীটা লুসিয়ঁকে। এখন তার কিছু নেই আর। কালকের সেই কথাগুলো জিনেৎ বলেনি—ওগুলো বাদল-দিনের আপন কথা, কবি রঁসার্-এর কথা। একমাত্র আঁদ্রের সঙ্গেই জিনেৎ তার স্বাভাবিকতা ফিরে পায়, কৃত্রিমতা থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মকরুণা ভুলে যায়। আঁদ্রের জীবনযাত্রা জিনেতের মতই—একটা উদ্দেশ্যমুখীতা আছে ওর জীবনে। না, তা বললে ঠিক কথাটি বলা হয় না...

ও বলেছিল, 'এক ধরনের চারা গাছের মত যা মাঠ থেকে মাঠে ভেসে বেড়ায়।' শুধু তারাই দুজনে ভিন্ন লক্ষ্যে ভেসে চলেছে। জিনেৎ কোথায় যেন পড়েছিল—এক ধরনের লোক আছে যারা 'শিল্পের বিষক্রিয়ায় আচ্ছন্ন।' কিন্তু কেবল আঁদ্রের কথাই বা সে ভাবছে কেন? এর সহজ উত্তর এই যে, সে ভালবেসেছে আঁদ্রেকে।

এই প্রথম সে নিজের কাছে কথাটা স্বীকার করল; আর সঙ্গে সঙ্গে দেসেরের দিকে ফিরে বলল, 'আমি আর একজনকে ভালবাসি। তাতে কিছু আসে যায়না অবশ্য। ওর সঙ্গে আমার বড় একটা দেখাশোনা হয় না, আর কোনদিন দেখা হবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু কথাটা তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই।' শুকনো গলায় বলে গেল সে, প্রায় আনুষ্ঠানিক সরকারী উক্তির মত শোনাল কথাটা। গাড়ীটা থামিয়ে দেসের তার হাতে চুমু খেল। তারপর বলল:

'তুমি আমার মনকে নাড়া দিয়েছ, গভীরভাবে নাড়া দিয়েছ। তুমি থিয়েটারে যেতে চাও না—এটা খুব আফসোসের কথা। যাই হোক, সেটা এমন কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়।'

জিনেৎকে তার বাসায় পৌঁছে দিয়ে এল দেসের। সন্ধ্যায় আবার তাদের দেখা হবে—এ রকম একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তারা। ওদের দুজনের মধ্যে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন ওদের সম্পর্কটা খুব সহজ—বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে একটা চুক্তি করে নিয়েছে তারা।

টেলিগ্রামটা পড়ল দেসের: জার্মান-বাহিনী প্রাগে এসে গেছে। হঠাৎ সে জোর গলায় হেসে উঠল। তারপর বইয়ের তাকের পেছন থেকে বের করে নিল বোতলটা: এখন আর ডাক্তারের নির্দেশ মেনে চলায় কি লাভ? এক বছরের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। জিনেতের কি হবে? আর যাই হোক, ও আর একজনকে ভালবাসে। মেয়েটা ভাল, কিন্তু কেমন যেন ভয়ানক প্রকৃতির; ওর চোখ দুটো ঠিক সেই পাগলী বুড়িটার মত। কিন্তু একটা কথা সত্যি—মরণের পারযাত্রী সেই স্বপ্নের জাহাজটা তাদের দুজনকে এক সঙ্গেই খুঁজে নিতে হবে।

২৮

'ওখানে আমি তোমায় প্রায়ই যেন দেখতে পেতাম। লাল পাহাড়ী টিলা, কোথাও কোন ঝোপঝাড় নেই, ঘন ভারী বাতাস। আর কী ভয়ানক গরম। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন অনুভব করতাম তুমি রয়েছ আমার পাশেই—আর আমি জড়িয়ে রয়েছি তোমায় দুই হাতে। দেনিস, মনের কথাটি কইছি, দেনিস। ভালবাসার কথা বলছি! তুমি কি বোঝ না?'

দেনিস কোন কথা না বলে আরও নিবিড়ভাবে তাকে চুমু খেল।

'ভাবতাম মরণ বড় ভয়ংকর—তাইতো বলে সবাই। মোটেই না; অতি সহজ, এমন কি, বড় আশ্চর্য এই মৃত্যুর অনুভূতিটা—ঠিক যেন এই মুহূর্তের অনুভূতির মতই। সমস্তটা বুঝে ওঠা যায় না সহজে, কিন্তু সাংঘাতিক কিছু একটা নয়। সাংঘাতিক হচ্ছে এই পরাজয়টা—অসহ্য তীব্র এর অনুভূতিটা এমন, যে কারুর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে হবে না তোমার। কিন্তু মৃত্যু অন্য রকম—ওটা তোমার নিজের মধ্যেই একটা নিজস্ব ক্রিয়ার মত।'

দেনিস বলল, 'জেলখানায় ঘুমহীন চোখে সারারাত শুয়ে থাকতাম—গুলির শব্দ যেন কানে ভেসে আসত। আমি জানতাম ওরা তোমায় মারতে পারবে না—কথাটা খুব ছেলেমানুষি শোনাল, কিন্তু তবু কেমন যেন জানতাম আমি—কিছুতেই ওরা মারতে পারবে না তোমায়। মনে মনে আমি ছিলাম সব সময়ে তোমার পাশাপাশি।'

'দেনিস!'

'কি?'

'কিছু না।'

দেয়াল-মোড়া কাগজের গায়ে লাল অ্যাস্টার ফুল ছাপা। ওই ফুলগুলো নিশ্চয় এক শতাব্দী ধরে ফুটে রয়েছে এই দেয়ালের গায়ে, কিন্তু আজও একটুও শুকিয়ে যায়নি। দেয়ালের গায়ে ওই গোঁফওলা মার্শালের ছবিটা ঝুলছে কেন কে জানে! আর ঘর-গরম-করা উনুনের ওপরে ওই তাকটায় রয়েছে একটা পয়সা জমাবার হাত-বাক্স—লাল টুপি মাথায় এক বেঁটে বামনের মত ওই বাক্সের আকৃতিটা। এমনি কতকগুলো আসবাবে সাজানো এই ঘরটা একটা সাময়িক ডেরা মাত্র। অন্য কেউ হয়ত এই ঘরে আজীবন কাটিয়ে দিতে পারে—কিন্তু

এদের ছজনের পক্ষে এটা কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে একটা আস্তানা মাত্র—এক ঘণ্টার জন্যেই হোক বা এক হপ্তার জন্যেই হোক, একই কথা। কিন্তু এই অ্যাস্টার ফুলগুলো শুকোবে না কোনদিন; পাকা গোঁফ কামড়ে-ধরা মার্শালের ওই মুখখানা দেখাবে অদ্ভুত আর হিংসুটে—কোথায় কোন যুদ্ধ যে উনি জয় করেছিলেন সে কথাটা ইস্কুলে পড়া বইয়ের পাতাতেই বিস্মৃত হয়ে আছে। বেঁটে বামনটা শূন্যগর্ভ—ওর ছোট্ট পেটে একটা পয়সাও নেই, নাকটা টিপে ধরলেও ও কিছু মনে করবে না। এর পরের বার দেনিস যখন জেলে যাবে, তখন হয়ত তার মনে পড়বে এই বামনমূর্তিটাকে? দেয়ালগুলো বিবর্ণ শাদা; চুনকাম উঠে যাওয়া জায়গাগুলো দেখে কোথাও যেন মনে হবে গাছ, কোথাও বা মেঘ, কোনটা বা মানুষের বিকৃত মুখের মত। আর লড়াইয়ের মাঠে গড়-খাইয়ে বসে হঠাৎ হয়তো মিশোর চোখে পড়বে একটা লাল অ্যাস্টার ফুল—হাতটা বাড়িয়ে দেবে ফুলটা তুলে নেবার জন্যে, তারপরে একটা বুলেট ছুটে এসে...কিন্তু বুলেটটা নিশ্চয় মিশোর গাঁ-ঘেঁষে বেরিয়ে যাবে।

'মিশো, তুমি সত্যিই আমার কাছে আছো—যেন বিশ্বাস হয় না কথাটা!'

দেনিস গালের ওপর মিশোর নিশ্বাস অনুভব করছে, কিন্তু তার কথা শুনতে চায় সে। ওর কপালে আর রুক্ষ চুলে হাত বুলোতে বুলোতে দেনিস একান্ত ভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করল যে তারা সত্যিই আবার মিলিত হয়েছে।

তারপরে তারা ছজনে ঘরের এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল—ছোট ছেলেমেয়ে খেলার ছলে যেমন করে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, মিশো। নীচের তলার লোকে ভাববে কি! ও কী বেশে রাস্তায় যাচ্ছো? আয়নায় দেখো একবার নিজের চেহারাটা...'

বাধ্য ছেলের মত মিশো আয়নার দিকে তাকাল।

'কী হয়েছে?'

'তোমার চোখের দিকে তাকাও। দেখতে পাও না নাকি? পাগল কোথাকার!'

অবশেষে যেতে হল মিশোকে; নটার সময় সভা বসবার কথা আছে। নিজের চিন্তাগুলোকে মনে মনে গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় ভ্রূকুটি করল সে:

'পার্টির শক্তি বেড়ে গেছে। শুধু সহজ উপায়ে যারা বাজীমাৎ করতে চায় তারাই খসে পড়েছে। কিন্তু অন্যদিকে তেমনি অনেক নতুন লোক এসেছে পার্টিতে। ভীইয়ার কেন মৃত্যুর কথা লেখে সেটা এখন বুঝি, ওদের দৃষ্টিভঙ্গীটাই

ফাঁকা। গভর্নমেণ্টকে নিয়ে তো সবাই হাসাহাসি করছে। আজ বাসে একটা লোককে চেঁচিয়ে বলতে শুনলাম, 'ওই শয়তান দালাদিএটা! গুঁড়িয়ে দেব আমরা ওদের—দেখে নিও, গুঁড়িয়ে দেব, ঠিক তাই!'

'মিশো, সত্যিই তুমি কি?—বলো না?'

'লুক মিশো—আমি নিঃসন্দেহে বলে দিচ্ছি তোমায়। তোমায় গ্রেপ্তার করার খবর কোথায় শুনলাম জানো? পের্‌পিঞাঁয় থাকার সময়। তখন তুমি খালাস হয়ে গেছ, কিন্তু আমি তা জানতে পারিনি। প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। কোন বাঁদরমুখো পুলিশের গুপ্তচরের মাথা ফাটিয়ে দেবার ইচ্ছে হয়েছিল। গর্ব বোধ করেছিলাম তোমার জন্যে। কত চমৎকার সব লোক রয়েছে আমাদের! তোরে বলছে, পার্টিকে বেআইনী করে দেবে ওরা। তেসার উপযুক্ত কাজই বটে। কিন্তু গোপনে কাজকর্ম চালিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করা আছে আমাদের। ছোট যে সংগঠনটা করে রাখা হয়েছে, সেটা আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী। যোগাযোগের ব্যবস্থায় কোন গোলমাল ঘটতে না দেওয়াটাই আসল কথা। সমস্ত ব্যবস্থা করবাব জন্যে আমাকে স্যাঁ-এতিএন্‌-এ পাঠানো হচ্ছে…'

'কবে যাচ্ছ?'

'এখনও ঠিক জানি না। হয়তো কাল কিংবা শনিবারে।' ওভারকোটটা গায়ে দিয়ে টুপিটা পরে নিল সে—একটা কর্মব্যস্ততার ভাব ফুটিয়ে তুলল চেহারায়। শুধু চোখ দুটোয় তার সুখের অনুভূতিটা এখনো প্রকাশ পাচ্ছে। ওরা দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে সুড়ঙ্গ-রেলপথটা পর্যন্ত হেঁটে এল। লম্বা, প্রায়-অন্ধকার সুড়ঙ্গ-গুলোয় ভীড়ের ঠেলাঠেলি, ভ্যাপ্‌সা গরম বাতাস, প্রচণ্ড শব্দে দেওয়াল কাঁপিয়ে ট্রেনগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে। টালি-ছাওয়া দেওয়ালগুলোর মাথায় বিরাট আকারের রাজহাঁস, তাদের কোনটার মাথায় লম্বা কানাওলা মেয়েলী টুপি, কোনটার মাথায় আঁট করে বসানো ক্যাপ, কোনটার মাথায় ফেজ্‌ টুপি; নীচে লেখা—'কৃত্রিম উপায়ে পিলে-ফোলানো এই পাখী—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য।'

আগামী কাল আবার তারা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেবে। এখন আর কথা বলা সম্ভব নয়—চারপাশে বহু লোকের ভীড়। ভালবাসার কথা কিংবা গোপন রাজনৈতিক কাজের কথা এর মধ্যে বলা চলে না। সবই অত্যন্ত গোপনীয়। কিন্তু দেনিসের বুক ভরে উঠেছে মিশোর সাহসিকতায়, আগামী সংগ্রামের কথায় আর তার প্রেমের অনুভূতিতে। মিশো নিজেকে সামলাতে না পেরে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ঠিক তাই!'

ঠিক তাই—এই কথাটা হবে তাদের ইঙ্গিতবাক্য। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিল তারা। মিশো ট্রেনে চেপে চলে গেল—আরেকটা লাল আলোর চিহ্ন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে ফিরে চলল দেনিস—একবার নীচে নামল, তারপর ওপরে উঠল, আর একবার নীচে নামল। সুড়ঙ্গ-পথের এই গলিগুলো জটিল আর ক্লান্তিকর। চারদিকে কর্মব্যস্ততা, গোলমাল আর নির্বিকার ভাব। দেনিস মনে মনে ভাবল, 'একটা বিচ্ছেদ তো সয়ে গেছি আমরা, কিন্তু এরকম আরো কত সইতে হবে ভবিষ্যতে?' কী দুর্বিসহ সেই প্রতীক্ষা-কাতর জীবনের বোঝা! তারপরে লোকে হয়তো ওদের বলবে, 'সুখী হোয়ো তোমরা।' কিন্তু তখন হয়ত দেখা যাবে সময় বয়ে গেছে। না, সত্যি-সত্যি ওরকম কখনো হতেই পারে না, ওরা দুজনেই যৌবন-বয়সী। ওদের ইচ্ছাশক্তির ওপরেই নির্ভর করছে সব কিছু, প্রবল ইচ্ছার শক্তিতে কামনা করতে হবে যাতে তারা যা চায় তাই ঘটে: তাদের মিলন, বিপ্লব আর ভবিষ্যৎ সুখ। ভাবতে ভাবতে দেনিসের কামনার সঙ্গে সংযুক্ত হল তার ইচ্ছার রুদ্ধশক্তি। প্ল্যাটফর্মের জনতা, টিকিট কেনার যন্ত্র আর চারপাশের বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে দাঁড়িয়ে দেনিস অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'ঠিক তাই!' মিশো, মিশো......

২৯

আঁদ্রের স্টুডিওটা অস্বাভাবিক রকমের পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে। খালি বোতলগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে; ছেঁড়া পুরনো বুটজোড়াটা আড়াল হয়েছে দেওয়ালগিরিটার পেছনে। ক্যানভাসগুলো নিপুণভাবে সাজানো আছে দেয়ালের গায়ে। বিরাট ফাঁকা টেবিলটার ওপর রয়েছে শুধু একটা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তক আর একটা পোস্টকার্ড—বালিয়াড়ি আর শাদা মেঘ-আঁকা রুজেন-এর একটা দৃশ্য। এটা আঁদ্রেকে পাঠিয়েছে সেই জার্মানটি যে দৃশ্যচিত্রের অনুরাগী বটে, কিন্তু পড়াশোনা করছে মাছ সম্বন্ধে—লোকটার সঙ্গে আলাপ করার সময় ভারী মজা লেগেছিল আঁদ্রের। মৎসবিজ্ঞানবিদ্‌টি শুধু 'শুভেচ্ছা' কথাটা লিখে পাঠিয়েছে, কিন্তু পোস্টকার্ডটা দেখেই আঁদ্রের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল 'তামাকখোর কুকুর'-এ তার সঙ্গে পরিচয় হবার কথাটা। জার্মানটা তাকে বলেছিল, 'সময় থাকতে পারীকে দেখে নিয়েছি, এজন্যে আমি আনন্দিত।' দু বছরেরও বেশী

সময় কেটে গেছে, পারীও ঠিক তেমনিই খাড়া আছে ; কিন্তু আঁদ্রে কেমন যেন বদলে গেছে। জার্মানটি মাছ নিয়ে এখনও মাথা ঘামায় কিনা ভেবে ঠিক করতে পারল না সে। ছবি আঁকা আঁদ্রে ছেড়ে দিয়েছে, তার স্টুডিওয় ঢুকে আর তার্পিনের গন্ধ পাওয়া যায় না। একটা মর্চে-ধরা চায়ের পাত্রের পাশে দেরাজটার ওপর পড়ে আছে তার ইজেল্‌টা। স্টুডিওর এই কর্তাটি পর্যন্ত তার ঘরের এই পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হয়, অতিথির মত সন্তর্পণে পা ফেলে সে এই ঘরে চলাফেরা করে। বাড়ীর দারোয়ানটা একদিন অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল—ঘরটা সে ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে কিনা। না, আঁদ্রে যাবে না কোথাও। শোনা যায়, আসন্ন মৃত্যুর আগে লোকে তাদের ঘরদোর গুছিয়ে রাখে। কিন্তু আঁদ্রে বলিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান মানুষ, তিনজনের মত খাবার সে একলা খায়, সারাদিন ঘুরে বেড়ায়, আর বিছানায় এসে শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ে। তাই যদি হয়, তাহলে তার এই অস্বস্তির কারণটা কি ?

গ্রীষ্মকালটা সে পারীতেই কাটাল। যুদ্ধ যে বাধবেই—এই নিয়ে লোকে আর্তনাদ করছে বটে, কিন্তু তবু তারা যথারীতি ছুটি কাটাতে গেছে ঠিক গত বছরের মতই। আঁদ্রের এসব ভাল লাগে না ; এই দিন গুণে চলা, খবরের কাগজের নিরর্থক গলাবাজী আর খালি তর্কবিতর্ক—এসব তাকে ক্লান্ত করে তুলেছে। মৃত্যুযন্ত্রণাটা যেন হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের একটা অংশ। জীবনটা টুক্‌রো হয়ে ভেঙে পড়ল, তবু যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে এই জীবন-যাত্রা। এই মাত্র সে 'হৈমন্তিক চিত্রপ্রদর্শনী'র এক নিমন্ত্রণ-পত্র পেয়েছে 'সালোঁ' থেকে। কী অদ্ভুত সব লোক !

পুরো ছটি মাস নিতান্ত দুস্থ অবস্থায় কাটানোর পর পিয়ের এক ফাউণ্টেন পেনের কারখানায় কাজ পেয়েছে। একদিন আঁদ্রের সঙ্গে দেখা করতে এসে সে বলল, 'মনের জোর বজায় রাখা চাই !'—বলেই বিষণ্ণভাবে অন্যদিকে তাকাল। বুড়ো মানুষের মত তার হাত দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

বুলভারে একদিন হঠাৎ লুসিয়ঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আঁদ্রেকে দেখেই ও চেঁচাতে লাগল—সব জায়গায় জোচ্চোরের দল আর শুধু নিজের সুখের জন্যে বেঁচে থাকাটাই জীবনের একমাত্র সার্থকতা ; কিন্তু আঁদ্রে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে আশা করি, তুমি বেশ ভালই আছো ?' তখন লুসিয়ঁ গাল পেড়ে বলল, 'এ যেন পায়খানায় আছি হে, বুঝেছ !'

তারপর আর একবার আতঙ্ক রটল আর কাগজগুলো ফলাও করে শিরোনামা ছাপিয়ে আবার হুলস্থূল বাধিয়ে দিল। এবারকার উত্তেজনার বিষয়টা হচ্ছে ডানজিগ। আঁদ্রে কাগজ পড়ে না, রেডিও শোনে ক্কচিৎ কখনো। মাঝে মাঝে তার মনে পড়ে জিনেতের কথা, কিন্তু সমস্তটাই মনে হয় যেন বহুদিন আগেকার ঘটনা, আরেক জন্মের কাহিনী। এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যখন সে লালচে-নীল রঙের শহরটার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন তার কানে ভেসে এল—কতকগুলো ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের নামের ফাঁকে ফাঁকে একটা কবিতার স্তবক। রেডিওতে জিনেতের গলা :

> 'তুমি পাশে থাকো মোর, ভাঙিব না শপথ আমার
> সুখের পরশে মোর বিশ্বাসেরে জিয়াও আবার ;
> অতীতের সব দুঃখ সব ক্ষোভ হোক বিস্মরণ
> জীবনের প্রেরণায়—যে জীবন তোমারই জীবন।'

হাসিতে কুঁচকে গেল আঁদ্রের মুখ : চোখে আঁকবার কোন সুর্মা, ভারী ভাল জিনিস—সুন্দরী মেয়ের চোখের জলেও যে জিনিস ধুয়ে যায় না! শপথ তো ভেঙেছে সবাই : সে, জিনেৎ, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই। কারুর মধ্যেও জীবনের এতটুকু প্রেরণা নেই......

রান্নাঘরের গরমে ঘেমে-নেয়ে যোসেফিন শুধোয়, 'কেমন চলছে দোকান?' বোয়ালো বলে, 'এই এক রকম।' রূ শেরস্-মিদি এখনো তেমনি প্রাণবন্ত। কেবল সেই 'দস্যুর মত প্রেম'-এর গানটা গাইত যে মুচীটা, সে পিলে-ফোলা ব্যারামে মারা গেছে। উত্তরাধিকারসূত্রে তার ঘরে এসে ডেরা নিয়েছে আর একজন মুচী, লোকটার ত্রিশ বছর বয়স, সুন্দরী স্ত্রী আর একজোড়া ছেলেমেয়ে আছে। সেও বেশ আমুদে লোক, খদ্দেরদের বলে 'যুদ্ধ না বাধা পর্যন্ত এ জুতোর শুকতলা খোয়াতে পারবেন না।'

'তামাকখোর কুকুর'-এর সেই বুড়ো টেরিয়ার কুকুরটা এখনও তেমনি দাঁতে পাইপ কামড়ে ধরে এদিক ওদিক ভিখ মেগে বেড়ায়। একদিন আঁদ্রে সেই কুকুরটাকে উদ্দেশ করে বলল, 'তোমার চেহারাটা অনেকখানি তার্দ্যুর মত দেখতে। বন্ধু হে, তুমিও হয়ত কোনদিন ডানজিগ-এর কথা কইতে শুরু করবে।'

এবারকার গ্রীষ্মে মেয়েরা সবাই সুতো-বোনার কাজে মন দিয়েছে। ওতে নাকি স্নায়বিক উত্তেজনাটা অনেকটা কম থাকে। সীন নদীর বাঁধ-ঘেঁষা রাস্তার ওপর

এক বইয়ের দোকান থেকে আঁদ্রে পুরনো এক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যবই খুঁজে পেয়েছিল—সে সুতো বোনার কাজ জানে না, নক্ষত্রলোক হয়ে উঠেছে তার কাছে শাশ্বত আর অবিনশ্বর, পৃথিবী সরে গেছে তার পায়ের তলা থেকে। দু-চার পাতা পড়ার পর ভাবনার পাখায় ভর করে তার মন উধাও হয়ে যায়। অঙ্কের সংখ্যা, চিহ্নপাত আর বিচিত্র নামগুলো তার মনকে শান্ত করে তোলার কাজে সাহায্য করে।

আজ থেকে দু শতাব্দী আগে নিকাইয়া শহরে হিপারকাস সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব মেপেছিলেন। সে সময়েও ঠিক এই রকম রাজ্য রাজধানী ভেঙে পড়ছিল চুরমার হয়ে; তখনকার লোকে ঈশ্বরকে করে তুলেছিল মাটির পুতুল আর প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করত তাদের আগুনে পুড়িয়ে মারত, সৈনিকরা মরত আর তাদের বর্ম-অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায় প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠত বাতাস। তারই মধ্যে হিপারকাস্ নক্ষত্রমণ্ডলীর এক তালিকা তৈরী করার কাজে তাঁর সময় অতিবাহিত করেন।

আর একবার আঁদ্রের হিংসা জেগেছিল হার্শেলের ভাগ্যের ওপর। গরীব এক গায়কের এই ছেলেটি আকাশের দিকে তাকিয়েছিল সূর্য যখন হৈমন্তিক বিষুব-রেখা অতিক্রম করছে ঠিক সেই সময়। দূরবীন কেনার টাকা ছিল না তার, তাই সে নিজেই কাঁচ ঘসে লেন্স বানিয়ে নিয়েছিল। ইউরেনস গ্রহ সে আবিষ্কার করেছিল, অন্যলোকে যেমন সামনের বাড়ীর জানলায় কোন মেয়েকে আবিষ্কার করে। ইউরোপের বুকে বিপ্লবের ঝড় বয়ে চলেছে তখন। নেপোলিয়ন ইংলণ্ড-জয়ের হুমকি দেখাচ্ছে। পীট্ তখন মুক্তমন্ত্রীসভার জাল বুনে চলেছে মাকড়সার মত। কিন্তু হার্শেল তখন ব্যাখ্যা করে চলেছেন চলমান-নক্ষত্র আর নীহারিকাপুঞ্জের কথা।

জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল আঁদ্রে। কাগজওলা ছেলেরা চিৎকার করছে 'রোমের মধ্যস্থতার সম্ভাবনা। মস্কো-চুক্তিতে টালবাহানা! ডানজিগ! ডানজিগ!' আঁদ্রে তার প্রিয় বইটির কাছে ফিরে গেল। এক সময়ে ওই ডানজিগে বাস করতেন হেভেলিয়স—চাঁদের একটা মানচিত্র তৈরী করার কাজে তিনি নিবিষ্ট ছিলেন; হঠাৎ ঘরে আগুন ধরে যায় আর সেই আগুনে পুড়ে যায় তাঁর সমস্ত খাতাপত্র আর আঁকজোক। হেভেলিয়স্ তখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আবার তিনি নতুন করে তাঁর কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

আঁদ্রে মনে মনে বলল, 'আর আমি কিনা ভুলে বসে আছি আমার ছবি-

আঁকা, নিমকহারামী করেছি আমার তুলির সঙ্গে। পারীতেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আছেন সন্দেহ নাই, এবং তাঁরা তাঁদের গবেষণাও চালিয়ে যাচ্ছেন; মেজোঁ-স্ত-কুলতুর-এ যে পদার্থবিজ্ঞানীকে সে দেখেছিল, তিনিও হয়ত তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন; ডাক্তাররা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই চলেছেন; আঁদ্রের বাবা সংগ্রহ করে ফিরছেন মোমের মত মসৃণ, ফিকে রঙ-ধরা বছরের প্রথম আপেল ফলটি। বাবাকে দেখতে তার কি দেশে যাওয়া উচিত? না, এখান থেকে আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। গড়িয়ে চলা পাথরের মত আঁদ্রের অবস্থাটা। অনিশ্চিত মনের অবস্থায় রাস্তার কোণে মদের দোকানটায় এসে সে একপাত্র কড়া-তিতো কাল্‌ভাদো খেল, তারপরে রোদজ্বলা শহরের চোখ ধাঁধানো পথে পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

দিনটা ভয়ানক গরম। সকাল থেকে একটা ঝড়ের ইঙ্গিতে থমথমে হয়ে ছিল আকাশটা; তারপরে মেঘটা কেটে গেছে, কিন্তু বাতাসের গুমোট ভাবটা তখনো কাটেনি। আঁদ্রে সারাদিন স্টুডিওর চাপা গরমে কাটিয়েছে। নীচের তলার লোকেরা কি সব প্যাক্ করছিল; বাক্‌সগুলোয় কাঁটা ঠোকার নিরবচ্ছিন্ন খট্ খট্ শব্দে তার মাথার দু পাশের শিরা দপদপ করছিল। বিকেলের দিকে সে 'তামাকখোর কুকুর'-এ যাবে বলে বেরিয়েছিল—মাথাধরার ভোঁতা যন্ত্রণাটা একমাত্র মদ খেয়ে সারানো যেতে পারে। রাস্তার বেরিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল—একটা কোন দুর্বিপাক ঘটে গেছে। এক গোছা থেঁত্‌লানো গোলাপের ওপর ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি মাথা রেখে কাঁদছে। 'মারা পড়বে ওরা! সবাই মরবে!'—কাফেওলা আঁদ্রের আর নিজের জন্যে কাল্‌ভাদো ঢালতে ঢালতে বলল; তারপর তার গেলাশে গেলাশ ঠেকিয়ে বলল, 'আপনার উদ্দেশ্যে! যুদ্ধ তো শুরু হয়ে গেল! অনেকদিন সবুর করেছে ওরা—এবার ওরা মরুক!'

লোকে তর্ক করছে পরস্পরের মধ্যে—'এখনো যুদ্ধ বাধেনি। এতো শুধু সবাইকে সৈন্যদলভুক্ত করার ব্যবস্থা জারী হল।'

'না, এবার একেবারে যুদ্ধ। এর থেকে আর আমাদের পার নেই। জাহান্নমে যাক ওই হিটলারটা!'

'আরে না না, ওসব কিছু নয়। একটা চুক্তি হবেই হবে।'

আঁটো-টুপি মাথায় একটা মজুর টেরিয়ার কুকুরটাকে একটা চিনির ডেলা দিয়ে বলল, 'আয় তু-তু! এই বেলা শেষবারের মত ভিখ মেগে নে। গেল বছর

ওরা চুক্তি করতে গিয়েছিল কেন জানিস? খুব সোজা কারণ: ভয় পেয়েছিল ওরা। রাশিয়ানরা যে দিকে দাঁড়িয়েছে সে দিকে যেতে চায়নি ওরা। এখন ভিন্ জুতো জোড়ায় পা ঢোকাতে হয়েছে, তাই ডাক পেড়ে চেঁচাতে লেগেছে। মনে মনে ওরা হিটলারের পক্ষে। আমাদের সঙ্গে বেইমানী করবে ওরা—এটা তো জলের মত পরিষ্কার—আর লড়াইয়ে গিয়ে মরতে হবে কাদের? আমাদের। এই বেলা ভিখ মেগে নে, বাছা আমার, জুটিয়ে নে যা পারিস! আমিও তো দু নম্বর দফার সৈন্য...'

মুচীটা তার দোকানের দরজায় একটা নোটিশ মেরে দিল: 'বাৎসরিক সৈন্যদল-ভুক্তির জন্য দোকান বন্ধ।' লোকটা যুদ্ধ বাধার কথায় বিশ্বাস করল না, শুধু অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করতে লাগল, 'এর পর দেখা যাক কি হয়! অনেক জরুরী অর্ডার ছিল হাতে!' ফুলের দোকানউলী স্ত্রীলোকটি কেঁদেই চলল সমানে।

আর একবার পুরুষরা সবাই স্যুটকেশ আর ব্যাগ নিয়ে ভারী মন্থর পায়ে হেঁটে চলল রাস্তা দিয়ে। অন্ধকারে ছোট ছোট নীল বাতি জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল। বিদায় হার্শেল, বিদায় হে নীহারিকাপুঞ্জ! একটা উদাসীনতার ভাব নিয়ে আঁদ্রে তার বিরাট স্যুটকেসটায় জামা কাপড়, সাবান আর দাড়ি কামাবার টুকিটাকি ভরে নিল। অলসভাবে ভাবল, 'এবারও গেল-বারের মতই হবে ব্যাপারটা।' কিংবা হয়ত সত্যিই যুদ্ধে যেতে হচ্ছে তাদের? এ সম্বন্ধে আর বেশী ভাবল না সে—চিন্তাটা তার কাছে বিরক্তিকর। আগামী কাল তাকে যেতে হবে তুল্-এ—এতে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। তারপরে কি হবে—তাতে কি কিছু যায় আসে? আর যাই হোক, সে জীবনটা আর এই জীবনের সঙ্গে মিলবে না। গানও নেই, চিৎকারও নেই; গাল পাড়ছে না কেউ, শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে চেঁচাচ্ছে না কেউ, জয়ের উচ্চকিত ঘোষণা নেই কারুর মুখে। রাস্তার চঞ্চলতা খানিকটা বেড়েছে মাত্র; আর ফুলের দোকানউলীটা এখনো ফোঁপাচ্ছে। বাদাম গাছটার পাতার ফাঁকে একটা ছোট্ট আবছা আলোর আভাস। জিনেৎ—সেই তো আঁদ্রের নক্ষত্র! কিন্তু সে তাকে আবিষ্কার করতে পারেনি; মানচিত্রে তার স্থান নির্দিষ্ট করে উঠতে পারেনি সে। আলোর ঝিলিক তুলে জিনেৎ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেল সে—নক্ষত্র নয়, প্রাণবন্ত সেই মেয়েটি—যার হাত দুটি উষ্ণ কোমল, আর ভাগ্য যার কপালে সুখ লেখেনি? হয়ত সেও কাঁদছে ওই ফুলের দোকানের মেয়েটির মত?

বুলভারের পথ বেয়ে ভেসে এল একটা ফৌজী শিঙার বিষণ্ণ একঘেয়ে আওয়াজ,
আর মাতাল মুচীটা চেঁচিয়ে উঠল :
'কদম কদম এগিয়ে যান, ডাইনে গেলেই গোরস্থান !'

তৃতীয় খণ্ড

১
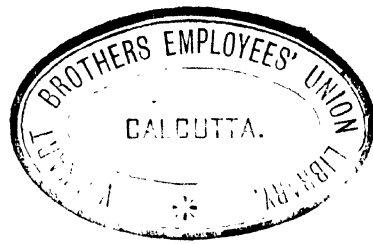
নিষ্প্রদীপ শহরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলেছে লুসিয়ঁ...অত্যন্ত অস্বাভাবিক চলার গতি, যেন কোন অপরিচিত পথ দিয়ে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে চলেছে। ঝির ঝির করে জল পড়ছে হালকাভাবে। প্লেন গাছের কালো কালো পাতার মাঝখানে রহস্যজনকভাবে আলো জ্বলছে...ছোট ছোট নীল আলো। লুসিয়ঁর মেজাজ মোটেই ভাল নেই। দু-একদিন আগে পর্যন্ত সে ভেবেছিল যে যুদ্ধ হবে না; একমাত্র তার বাবাই মন্ত্রিত্ব-সংকট ঘটানোর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন কী আশ্চর্য! গুজব রটে গেছে যে ম্যাজিনো লাইনের ধারে ইতিমধ্যেই গোলাগুলি চলছে। আগামীকাল বিকেলেই লুসিয়ঁকে সৈন্য-সংগ্রহ কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। কিন্তু কিসের জন্যে যুদ্ধ করতে যাবে সে? পোলাণ্ডের মসিয়ঁ বেকেব জন্যে? তার বাবার কথা মত 'মানবিক মর্যাদার' জন্যে? সে তো মরেও যেতে পারে। কিন্তু তার চেয়েও আরও মারাত্মক জিনিস আছে। ট্রেঞ্চ, কর্পোরালের ইতর ব্যবহাব আর একটানা চল্লিশ মাইল মার্চ...এসবেব চেয়ে অপ্রীতিকর আর কি হতে পারে?

তাছাড়া কী সাংঘাতিক বিরক্তিকর!

লুসিয়ঁ শব্দ করে হাই তুলল। একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'এ্যাই, ফূর্তি করবে নাকি একটু?' লুসিয়ঁ হাসল। ওরা কালক্ষেপ করছে না একটুও...গ্যাস-মুখোশ পরে দলবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সমস্ত রূপজীবীরা।

'তোমরা দেখছি যে যার কাজকর্মে লেগে গেছ ঠিকমত।' লুসিয়ঁ বলল। ওদের দলের মধ্যে থেকে একজন মেয়ে মুখ খুলে গালাগালি করল বিশ্রী রকম।

খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে মদের দোকানে গিয়ে ঢুকল লুসিয়ঁ। লোকগুলো একধার থেকে চিৎকার করছে আর মদ গিলছে। দোকানের কর্ত্রীর চোখে জল। সশব্দে গ্লাশগুলো সে তুলে দিচ্ছে খরিদ্দারদের হাতে।

'আপনার স্বামীর কী খবর?'

'আজ চলে গেছেন তিনি।'

একজন সব্‌জিওলা 'রাম্' খেতে খেতে চিৎকার করে উঠল, 'না, না, তোমায়

বলতে হবে না যে এই যুদ্ধের দরকার আছে কি নেই। জাহান্নমে যাক পোলরা!'

একসঙ্গে সবাই সায় দিল শব্দ করে।

'যদি ইংরেজরা যুদ্ধ করতে চায়, করুকগে তারা!'

'আর একথা তো সবাই জানে যে তেসা দশ লক্ষ ফ্রাঁ হাতিয়েছে।'

আলোচনার মধ্যে লুসিয়ঁ অংশ গ্রহণ করল না। মদ খেতে খেতে সে শুধু নিঃশব্দে গজরাতে লাগল। তারপর সে দেখা করতে গেল জেনীর সঙ্গে। তাকে বিদায় জানানো দরকার। আর দরকার কয়েক হাজার ফ্রাঁ। আগামীকাল সে সারাদিন মদ খাবে। তাছাড়া সৈন্য হলেও কিছু টাকা তার সঙ্গে থাকা দরকার। সৈনিকের সামান্য মাইনেতে তার চাহিদা মিটবে না।

জেনীকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখাল। তবু লুসিয়ঁকে অভ্যর্থনা জানাতে কার্পণ্য করল না সে। তার কাছে সমস্ত কিছু অদ্ভুত মনে হচ্ছে। স্বাধীনতা রক্ষা করতে যুদ্ধে যাচ্ছে লুসিয়ঁ কিন্তু এদিকে পারী ধ্বংস হয়ে যাবে; গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিলিয়ে যাবে লুভ্র্-এর অস্তিত্ব! লুসিয়ঁর গলা জড়িয়ে ধরে জেনী বলল, 'প্রত্যেককে কিছু না কিছু করতে হবেই। আমি তোমার জন্যে কতকগুলো গরম কাপড়জামা কিনে এনেছি...'

পশমের পটি দেওয়া জামা দেখে কিছুটা বিরক্ত হল লুসিয়ঁ, 'শ্রীমতী, এ হল একজন অফিসারের সাজপোষাক। আমি হলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর একজন সৈন্য মাত্র। তাছাড়া এতো কেবল সেপ্টেম্বর মাস। শীত আসতে আসতে শেষ হয়ে যাবে সমস্ত কিছু।'

'লুসিয়ঁ, তোমার গ্যাস-মুখোশ আছে তো? জার্মানরা আজ হয়ত পারীর ওপর হামলা করবে। আমি একটা আনতে গিয়েছিলাম কিন্তু বিদেশী বলে দিল না ওরা। ওষুধের দোকানী একরকম জিনিস দিয়েছে আমায়; গ্যাস আক্রমণ হলেই রুমালে ছিটিয়ে নিতে হবে সেই ওষুধ। এই সেই ওষুধ।'

'শিশিটা কিন্তু খুব চমৎকার। 'কোটি'র সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করলেই পারো? আমি বলি—দীর্ঘজীবী হোক এই সুগন্ধ। ট্রেঞ্চের মধ্যে উকুনরা খুব সুগন্ধ বিলোবে, কি বল?'

ভাঙা গলায় 'পারী আজো সেই পারীই আছে' গানটা গাইতে আরম্ভ করল লুসিয়ঁ। কানে আঙুল দিল জেনী; ক্রমে ক্রমে গম্ভীর হয়ে এল তার মুখের ভাব।

'লুসিয়ঁ, সত্যি করে বল, ভয় পেয়েছ তুমি ?'
'না, না, শুধু বিরক্তি লাগছে এই যা।'
'কিন্তু ন্যায় তো আমাদের দিকে ?'
দোকানে বসে শুধু শুধুই চার গেলাশ মদ টানেনি সে। এবার সে চিৎকার করে হেসে উঠল। তার স্বাভাবিক ম্লান মুখ লাল হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।
'ন্যায় ? এক মুহূর্ত অপেক্ষা করো, আমি সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমায়।'
বিছানা থেকে ঝালর দেওয়া চাদরটা তুলে নিয়ে নিজের কাঁধের ওপর চাপাল লুসিয়ঁ। তারপর জেনীর টুপিটা মাথায় দিয়ে, বুকের ওপর হাত রেখে বিড়বিড় করতে শুরু করল :
'বৎসগণ, ব-নে ও তেসার ঘাড়ে পবিত্র আত্মা এসে ভর করেছে। বীর শহীদ বেককে সাহায্য করতে চলেছি আমরা। পার্থিব জগতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সেই ব্যক্তিটি তেসেন-এ বসে বসে মেরীমাতাকে স্বপ্নে দেখেছেন! সাধু সেবাস্টিয়ান—যিনি এ জগতে মার্শাল গোয়েরিং নামে খ্যাত—তাঁর সঙ্গে তিনি বিয়ালোভেজ্স্কি বনে একসঙ্গে উপবাস করেছেন। কিন্তু এখন মহাপুরুষটি বেকের কাছ থেকে ডানজিগ কেড়ে নিতে চান। পাপীর দল, অনুতপ্ত হও! পল তেসা মানবপুত্রকে ত্রাণ করতে আসছেন। আমেন!'
জেনী কিছুই বুঝতে পারল না। বেক কে ? আর তেসেনই বা কোথায় ? জেনী কখনো দৈনিকপত্রিকা পড়ে না, আর রাজনীতি সম্পর্কেও কোন ধারণা নেই। কিন্তু সে এটুকু বুঝল যে লুসিয়ঁর এই ভাঁড়ামির মধ্যে একটা বিরাট দুঃখ লুকিয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে বসে বসে তারা কফি খেল। এক সময়ে ভয়ে ভয়ে জেনী জিজ্ঞাসা করল, 'তাহলে তুমি বিশ্বাস করো না যে এই যুদ্ধ স্বাধীনতার যুদ্ধ ?'
'কি স্বাধীনতা ?'
'জানি না। সাধারণত স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় তাই। ধরো খবরের কাগজে খুশিমত লেখা লিখতে পারা।'
লুসিয়ঁ হাই তুলল, 'গতকাল জোলিও ছিল 'লাল', আজ সে বরফের মত শাদা। কাল হয়ত দেখব সে ঘোর বেগুনী। কী বিরক্তিকর।'
খানিকটা চিন্তা করে জেনী বোকার মত বলল, 'তাহলে তো বিপ্লবের দরকার।'
রীতিমত চটে উঠল লুসিয়ঁ। এই কথাটার জন্যে সে কত হাঙ্গামাই না

সয়েছে। 'মেজোঁ দ্য কুলতুর'-এ যোগ দিয়েছে, প্রবন্ধ লিখেছে, বই ছাপিয়েছে আর বাবার সঙ্গে তর্ক করেছে। আর এখন এই বোকা মার্কিন মেয়েটা বিপ্লবের কথা বলতে আসছে তাকে।

'তোমরা নিজেরাই একটা বিপ্লব করো। আমরা চার চারবার বিপ্লব করেছি নিজেদের দেশে। আমি যা করবার তা করেছি। এখন যাও, তৈরী হও, শুতে যেতে চাই আমি।'

রাত্রে সাইরেনের কান্না শুনে ঘুম থেকে জেগে উঠল লুসিয়ঁ। জেনী ভয়ে থর থর করে কাঁপছে, ড্রেসিং গাউনের চওড়া আস্তিনের মধ্যে দিয়ে হাতগুলো গলাতে পারছে না পর্যন্ত। লুসিয়ঁ পাশ ফিরে শুলো। তার ভারী বয়ে গেছে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে! জেনী তাকে অনেকবার নীচের তলায় নিয়ে যাবার জন্যে ব্যর্থ চেষ্টা করল। শেষ পর্যন্ত কে একজন দরজায় ধাক্কা দিল, 'বেরিয়ে আসুন।'

'চুলোয় যাও!' লুসিয়ঁ জবাব দিল।

'আমি এয়ার রেড ওয়ার্ডেন।'

অবশেষে তারা নীচে নামল। নীচের ঘরে ডোরা-কাটা পায়জামা পরা উস্কোখুস্কো পুরুষ আর অর্ধ-নগ্ন স্ত্রীলোক...দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় যেন। দাড়ি-না-কামানো এয়ার রেড ওয়ার্ডেনটি বার বার চিৎকার করতে লাগল, 'চুপ! চুপ! যে যার গ্যাস-মুখোশ নিয়ে তৈরী থাকুন।' তার নির্দেশ পেয়ে ছোট্ট সহকারী ওয়ার্ডেনটি দেওয়ালে জল ছিটোতে লাগল। নিজের ছেলেমেয়েদের বুকের কাছে ঘনিষ্ঠ করে আনতে আনতে একটি স্ত্রীলোক টেনে টেনে নিশ্বাস নিল। গুজব রটল যে পাশের রাস্তায় বোমা ফেটেছে একটা। জেনী তার রহস্যজনক ওষুধ আর ঝালর দেওয়া রুমালটা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল। ভীড়ের মধ্যে একটি মেয়ের কাঁধ দুটো কী আশ্চর্য সুন্দর! লুসিয়ঁ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আর ভীড় ঠেলে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সরে গেল মেয়েটি।

'মাদাম, এ হল যুদ্ধের সময়।' লুসিয়ঁ ভীষণ চটে গেছে।

হিংসায়, ভয়ে আর লুসিয়ঁর সঙ্গ হারাবার দুঃখে চক্ চক্ করছে জেনীর চোখ দুটো। কিন্তু লুসিয়ঁ হাই তুলে চলেছে থেকে থেকে।

রাত্রের বিচিত্র ঘটনার জন্যে তার ভাল ঘুম হয়নি। সকালে লুসিয়ঁ অত্যন্ত ঘুম-ঘুম বোধ করছে, আর মেজাজটা চটে আছে। দরজায় দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে হল্লা করছে একটি স্ত্রীলোক। তার মদের দোকান আছে একটা। লোকে সেই দোকানটাকে বিমান-আক্রমণ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

'আমি নিজে গিয়ে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করব।' স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে চলেছে। 'ওরা বলছে ফ্রান্সকে মজবুত করে গড়ে তোলা দরকার। তাই যদি হবে তাহলে ব্যবসা বাণিজ্যে নাক ঢোকাতে আসবার কী দরকার? আমি দোকান খালি করব না, বুঝতে পারলে? মরে গেলেও না।'

লুসিয়ঁ তার কোঁচকানো টুপিটা তুলে দিতে লাগল।

'চমৎকার!' সে বলল, 'রাসীনের শ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনাদের সমতুল্য বটে! নাগরিকগণ, অস্ত্র ধারণ করো।'

কী পুতুল নাচের খেলাই না চলেছে!

২

প্রতি রাত্রে সাইরেনের চিৎকারে পারীর লোকরা ঘুম থেকে জেগে ওঠে। কেউ কেউ বলে তারা বোমা-বিধ্বস্ত বাড়ী পর্যন্ত দেখে এসেছে। কিন্তু তেসা হেসে বলেছে, 'এটা শুধু একটা সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা। জার্মানরা সীমান্ত ডিঙিয়ে উড়ে আসা মাত্র আমরা সংকেতধ্বনি দিই। এ থেকে পারী আত্মত্যাগের শিক্ষা নিতে পারে।' বহুলোক রাজধানী ছেড়ে যাওয়াই সমীচীন মনে করল। বড় লোকদের অঞ্চল একেবারে জনশূন্য; শুধু নরমাণ্ডি আর ব্রিটানির উপকূলস্থ স্বাস্থ্যনিবাসে লোকের ভীড়। 'সৈন্যরা' পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এদিকে বুর্জোয়ারা দলবেঁধে এগিয়ে চলেছে পশ্চিম মুখো।

মতিনি তার পরিবারকে ওভের্‌ঞ্‌-এ পাঠিয়ে দিল। 'কী চমৎকার জায়গা! একশো মাইলের মধ্যে একটা কলকারখানা নেই কোথাও।' সে বলল। নিজের সংসারের সমস্ত ব্যবস্থা করে সে মন দিল অন্য একটি আরো জটিল কাজে। নিজের সমস্ত পুঁজি আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে শুরু করল। খবরটা দুকানের কানে যেতেই 'একজন অসৎ ফরাসী' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ লিখে বসল সে। কিন্তু সেন্সারে আটক পড়ল সে প্রবন্ধ...সংবাদপত্রের দুটো শাদা কলমে ছেপে বেরুল শুধুমাত্র একজোড়া কাঁচির ছবি। দুকানের আক্রমণের কথা জানতে পেরে রাগে জ্বলে উঠল মতিনি; বলল, 'ও কি মনে করে

যে দার্তঁ হয়ে উঠেছে? আমার নিজের সম্পত্তি, যা শুধুমাত্র আমার ছাড়া আর কারও নয়, তা আমি বাঁচাতে চাই। আমি ধ্বংস হয়ে গেলে ফ্রান্সের কি কিছু লাভ হবে?'

পলেৎ স্থির করল সে মধ্য-ফ্রান্সে মরভাঁতে তার খুড়িমার কাছে চলে যাবে। গ্যাস-আক্রমণে তার ভীষণ ভয়। তেসা কিন্তু বিচলিত হয়ে পড়ল। এই দুর্দিনে কোন স্ত্রীলোকের ভালবাসার সান্ত্বনা থেকে বঞ্চিত হওয়া ভয়ানক কথা!

'তুমি আমায় একলা ফেলে চলে যেতে চাও?' তেসা প্রতিবাদ জানাল।

'পল, আমি বীরাঙ্গনা নই।'

'তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। ওরা এখানে উড়ে আসবে না। তলে তলে একটা বোঝাপড়া আছে। ওরা যদি পারী স্পর্শ করে, আমরা বার্লিনে বোমা ফেলব। এবং তাতে কোন সুবিধে হবে না ওদের।'

পলেৎ কেঁদে ফেলল, 'কেন, কেন তুমি এই যুদ্ধ ডেকে আনলে?'

'আমি?' বিরক্তিতে কেঁপে উঠল তেসার কণ্ঠস্বর। 'তুমি কী করে এ কথা বলছ? তুমি জানো আমি কেবলমাত্র একটা জিনিস চেয়েছিলাম এবং তা হল শান্তি। কিন্তু আমরা কি করব? উন্মত্ত হয়ে উঠেছে ওরা।'

পলেতের কাঁদুনি থামল না, 'লোকগুলোকে মরতে পাঠাচ্ছ কেন তাহলে?'

'কেউই মরতে যাচ্ছে না। একমাত্র পোলরাই যুদ্ধ করছে...এটা তাদের ব্যাপার। এ হল ডানজিগ, স্ট্রাস্‌বুর্গ নয়, বুঝলে? অবশ্য ম্যাজিনো লাইনে কয়েকজন দুর্ঘটনায় মারা যেতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখ শান্তির সময়েও তো কত লোক রাস্তায় মারা যায়! তোমার বোঝা উচিত যে সব কিছু বদলে গেছে আজকাল। পুরনো দৃষ্টিকোণ থেকে তাকালে চলবে না। আগে যুদ্ধ বলতে যা বুঝতাম সে অর্থে এটা যুদ্ধ নয়। আমাদের আছে ম্যাজিনো লাইন, আর সিগফ্রিড লাইন আছে ওদের। কোন পক্ষই একচুলও এগোতে পারবে না। সুতরাং দু পক্ষই পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আমার আমালি বলত, 'আলমারীর মধ্যে চিনেমাটির কুকুরের মত।' পোলরা আশ্চর্যরকম আত্মরক্ষা করছে। আমি চিরকালই বলেছি ওরা বীরের জাত। বসন্তকাল পর্যন্ত কিংবা আরো বেশী দিন ওরা যুঝতে পারবে। ইতিমধ্যে আমরা ভালভাবে প্রস্তুত হয়ে নেব। তারপর জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবেই। সুতরাং আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই, বুঝলে?'

'যাই হোক, ভয়ানক ব্যাপার কিন্তু! বিশেষ করে এই নিষ্প্রদীপের সময়ে। আর রাতের দিকে সাইরেন বাজে ককিয়ে ককিয়ে।'

পলেতের অশ্রুসজল চোখ দুটো তেসার কাছে অনেক বেশী সুন্দর মনে হল। তার ছোট্ট পাখীর মত মাথাটা চেপে ধরল পলেতের বুকের মধ্যে।

'চলে যেও না, লক্ষ্মীটি! আমি একেবারে ভেঙে পড়েছি। কী ভয়ানক কাজে জড়িয়ে পড়েছি, তা তুমি ভাবতেও পার না। আগামী কয়েকটি সপ্তাহের মধ্যেই সব কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।'

'কিন্তু তুমি তো বললে, কিছুই হবে না।'

তেসা হাসল, 'ছেলেমানুষি কোরো না। কিছু হবে না তো নিশ্চয়ই। ঘরোয়া ব্যাপারের কথা বলছি। চেম্বারের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা অবশ্য ঠিকই আছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করা কি ঝকমারি ব্যাপার জানো? কিন্তু এ সাধারণ পুলিশের কাজ নয়। একটা বড় রকমের আন্দোলন দরকার। আর দরকার নেপোলিয়ঁর মত একজন করিৎকর্মা লোক। আমরা অবশ্য ওদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবই শেষ পর্যন্ত।'

টান টান হয়ে উঠল তার মুখের রেখা। সে ভাবল, সে যেন তার নাগরিক কর্তব্য পালন করছে। কেউ কি জানে সে দেনিসকে কত গভীর ভাবে ভালবাসে? তবুও সে ফ্রান্সের শত্রুদের দলে যোগ দিয়েছে! তেসা তার সমস্ত অন্তর থেকে মুছে ফেলেছে তার পিতৃত্ববোধ।

হঠাৎ চাপা গলায় হেসে উঠল তেসা, 'একটা বড় মজার কথা বলছি শোন। ভাবতে পারো আগামীকাল আমি কি করব? তুমি কখনো বলতে পারবে না। সরকারী প্রতিনিধি হিসেবে একটা পবিত্র ধর্মোৎসবে যোগ দিতে হবে। আমায় কখনো হাঁটু গেড়ে বসতে দেখেছো! কী রকম মজার ব্যাপার, না!'

পলেৎ জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। ছোটবেলা থেকে তেসা গির্জার চৌকাট ডিঙোয়নি। ধর্ম সম্পর্কিত সব কিছুই সে ঘৃণা করে এসেছে। যখনই সে কাউকে ঠাট্টা করতে চায়, সে বলে—'লোকটার গা থেকে ধূপের গন্ধ বেরুচ্ছে।' পাদ্রীদের দেখে সে বলে 'দাঁড় কাক'। এমনিভাবে বহুবার সে আমালিকে মর্মাহত করেছে।

তার মতে একমাত্র বুড়ীদেরই গির্জায় যাওয়া উচিত কিন্তু যখন পুরুষদের এমন

কি সৈন্যদের পর্যন্ত সে উপাসনা করতে দেখল তখন সে ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেল। গির্জার ভেতরকার সেই আবছা অন্ধকার এবং ম্লান মোমবাতি দেখে আমালির কফিনের চারপাশের সেই দৃশ্যের কথা মনে পড়ল। হঠাৎ কেমন বিষণ্ণ দেখাল তেসাকে। গায়কদের মৃদু কণ্ঠস্বর এবং রঙিন জানলা থেকে চুঁইয়ে পড়া সূর্যের আলো তাকে 'হৃত স্বর্গের' কথা মনে করিয়ে দিল। তেসা বুঝতে পারল সেই ভাষা, তার আমালি, তার ছেলেমেয়ে, তার শান্তি সমস্ত কিছু হারিয়েছে সে। অবশ্য এই উৎসব একটা কুসংস্কার মাত্র। কিন্তু মাঝে মাঝে এই ক্ষুদ্র হানাহানি থেকে বেরিয়ে নিজেকে ভুলে থাকতে অনেক ভাল লাগে। স্ফীতকায় ধর্ম-যাজকের দিকে তাকিয়ে দেখল। লাল শিরাগুলো তার মুখের ওপর স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। চোখ দুটো কেমন বিষণ্ণ আর ধারালো। অন্য সবার মত ধর্ম-যাজককেরও ভাবনা চিন্তা থাকার কথা। তাকেও পোপ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের মন জুগিয়ে চলতে হয়। জীবন হল এক ধরনের রাজনীতি। কিন্তু তার সমাপ্তিতে সেই মোমবাতি।

একটা ছোট্ট ঘণ্টা বেজে উঠল। হাঁটু গেড়ে বসল প্রত্যেকে। তেসা মনে মনে হাসল। এ যেন অভিনয় করতে বসেছে তারা। কিন্তু অন্যান্য সকলের সঙ্গে বসে আবার তাদেরই সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

অনুষ্ঠান দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল, বার বার শব্দ করে করে হাই তুলতে লাগল। হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল তেসা...তারই পাশে দাঁড়িয়ে কালো পোষাক পরা একটি যুবতী। মেয়েটির কী চওড়া কপাল আর চকচকে পাতলা ঠোঁট! ঠিক যেন ব্রঁজিনোর ফ্লোরেনটাইন ছবির মত দেখতে। সেই জাতের মেয়ে যারা উচ্ছ্বাসপ্রবণ, ভয়ানক রকমের উচ্ছ্বাসপ্রবণ।

হঠাৎ চোখে পড়ল ব্রতৈল একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ভয়ে কেঁপে উঠে ঘন ঘন ঠোঁট নাড়তে লাগল, যেন প্রার্থনা করছে সে। বোকা লোকদের ধারণা যে ব্রতৈলের হার হয়েছে, কারণ সে জার্মানীর সঙ্গে একটা আপোষরফা চেয়েছিল। কিন্তু তেসার বিশ্বাস, ব্রতৈলের দিন আসছে। প্রত্যেকে অভিশাপ দিচ্ছে পপুলার ফ্রন্টকে। অর্থাৎ সরকারী পক্ষের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দক্ষিণপন্থীদের দিকে চলে যাবে। তাছাড়া যুদ্ধ চিরদিন চলবে না। হিটলারের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হলে ব্রতৈল ছাড়া সে কাজ আর কে পারবে? সত্যিই, গোঁড়া ব্রতৈলের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখাই বাঞ্ছনীয়।

অর্গানের সুর তেসাকে আবার বিষণ্ণ করে তুলল। কী চমৎকার অর্গান

বাজাতে পারে লোকটি! ১৯১৭ সালে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। জার্মান 'বিগ বার্থা' জাহাজ থেকে গোলা এসে লেগেছিল একটি গির্জায় এবং বহু লোক মারা গিয়েছিল। আজ এই মুহূর্তে যদি সেই রকম একটা বোমা এসে ফাটে? না, সে রকম কোন সম্ভাবনা নেই; ওরাই ভয় পাচ্ছে শুরু করতে। কেউই তো যুদ্ধ বাধাতে চায়নি। আসলে পোলরাই হল বন্য প্রকৃতির। জার্মানরা ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালাচ্ছে পোলাণ্ডের বিরুদ্ধে। কিন্তু ফরাসীদের শ্রদ্ধা করে তারা। অত্যন্ত লজ্জার কথা যে আজও তারা কোন মীমাংসায় আসতে পারেনি। মুসোলিনীই পারত সবাইকে সংঘবদ্ধ করতে। কিন্তু আতঙ্কিত হয়ে পড়ল লোকে। এবং তারপর শুরু হয়ে গেল পুরোদস্তুর যুদ্ধ। জঙ্গলে যুদ্ধ চালাবার একটা পরিকল্পনা ছিল গামল্যাঁর মাথায়। মাইন পাতা ছিল সে জঙ্গলে। অকারণে কতকগুলো প্রাণ নষ্ট করা! লুসিয়ঁও তো মারা যেতে পারে। অবশ্য তার জন্যে একটা কেরানীর কাজ সংগ্রহ করে দেওয়াও সম্ভব ছিল। কিন্তু কোথায় উধাও হয়ে গেল হতচ্ছাড়াটা; খুঁজে বের করা গেল না তাকে। বড় দুঃখের কথা! সত্যিই বড় দুঃখের কথা! আচ্ছা, অর্গান বাজানো কি ওরা বন্ধ করবে না কোনদিন?

জেনারেল ভিসেকে দেখতে পেল তেসা। ভক্তিভরে উপাসনা করছে সে। শোনা যায় সে নাকি কমিউনিস্ট ফ্রুজের বন্ধু। কী অদ্ভুত! একটা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক সে অথচ কেমন গ্রাম্য গণিকার মত উপাসনা করছে! কুমারী মেরীর গর্ভ-প্রবাসের কথা সে কি সত্যিই বিশ্বাস করে? করুক গে। ফ্রুজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার চেয়ে এতে বিশ্বাসী হওয়া অনেক ভাল।

অবশেষে উপাসনা শেষ হল। গির্জার আবছা আলোর পর শরতের ঝকমকে সূর্য এসে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। বাদাম গাছগুলো ঝলমল করছে এক পশলা সোনার মত। সাঁজ এলিজের ওপর টুকরো টুকরো সূর্যের আলো ঝিকমিক করছে বিক্ষুব্ধ স্রোতের মত। মেয়েগুলোকে আরো বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে যেন। বিমান আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সমস্ত বাড়ীর কাঁচের জানলায় কাগজের ফিতে লাগানোর ফলে কেমন অভিনব নক্‌শা সৃষ্টি হয়েছে। তেসা হাসল, ভাবল, 'আর এক রকম নতুন প্রসাধন সৃষ্টি হল তোমার জন্যে।'

৩

প্রচণ্ড বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে অক্টোবর মাস এল। তেসা রব তুলল পরিষদ ঘরের লবিতে, ‘আমি গোড়া থেকে বলে আসছি পোলরা এক মাসও ঠেকাতে পারবে না। ওরা চোর আর মাতালের জাত! কিন্তু আমরা কিছু হারাইনি। বরং পূব দিকে হিটলার জিতেছে বলে জার্মানরা শান্ত হয়েছে। এখন তারা ম্যাজিনো লাইনকে অন্য চোখে দেখবে। আগামী ১৪ই জুলাই আমরা সারা রাত রাস্তায় নাচবো গাইবো...আলো ঝলমল করবে সমস্ত রাস্তায়। তোমরা দেখে নিও।’

বোমার বদলে আকাশ থেকে ইস্তাহার পড়ল। ধীরে ধীরে জেগে উঠল অভিজাত পল্লীর মানুষরা। মতিনি তার পরিবারকে ফিরে আসবার জন্যে চিঠি দিল—গাঁয়ে পড়ে থেকে এই বৃষ্টিতে ভিজে কী লাভ! তার স্ত্রী কেমন বিরক্ত হয়ে পড়েছে খাবার-দাবার না পাওয়ায়।

‘ভগবানই জানেন এসব কি হচ্ছে!’ তার স্ত্রী বলে, ‘সরকারের কী দরকার লোকের রান্নাঘরে নাক ঢোকাতে আসবার? কখন কি খেতে পাবে তাই জানে না লোকে। সোমবার মাংসের কাটলেট পাওয়া দায়; মঙ্গলবার গরুর মাংস বিক্রী করা বেআইনী; বুধবার মিষ্টি খাবার তৈরী করবে না কেউ। এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে!’

কয়েকদিন ধরে কোথাও এক দানা কফি পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে পড়ল মতিনির স্ত্রী—‘সমস্ত দোকানে ঘুরে এলাম...এতটুকুও কফি নেই কোথাও। মনে হচ্ছে পোলদের জন্যেই আমাদের এই দুর্দশা। আমি জানি ইংরেজরা নিজেদের চা খাওয়া বন্ধ করেনি। তারা কোন কষ্ট স্বীকার করছে না। এ সব দালাদিএর দোষ। কোন কর্মের নয় লোকটা। একজন ইস্কুল মাস্টার বই তো না। প্রধান মন্ত্রী হলে কী হবে!’

আবার দোকানে কফি পাওয়া যেতে লাগল। মতিনির স্ত্রী থিতিয়ে গেল কিছুটা।

ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে উঠল। আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে মিতব্যয়ীরা দু হাতে খরচ করতে লাগল টাকা। রেস্তোরাঁগুলো ভরে উঠল লোকের ভীড়ে। ফেঁপে উঠল বড় বড় সৌখিন দোকানগুলো। মেয়েদের টুপিগুলো ফৌজী ঢঙে তৈরী

হতে লাগল। দোকানের জানলায় সাজানো ব্রোচ আর পিনের ওপর ট্যাঙ্ক আর ইউনিয়ন জ্যাকের প্রতিকৃতি ; মাদুলি আর রেশমের রুমালের গায়ে লেখা, 'সে ফ্রান্সের কোন এক জায়গায় রয়েছে।'

বিরক্তিকর 'ন' অক্ষরটার বদলে 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায়' কথাটা সবার মুখে মুখে ঘুরছে। দৈনিক পত্রিকায় একটা খবর বেরিয়েছে—'গতকাল ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় জেনারেল সিকরস্কি সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন করেন।' জানলার নীচে বড় রাস্তার গাইয়েরা নাকী সুরে গান গাইছে, 'ফ্রান্সের কোনও এক জায়গায় মনে কোরো, মনে কোরো আমার ভালবাসার কথা।'

বিদেশী সাংবাদিকদের এক ভোজসভায় তেসা বক্তৃতা দিল, 'সমস্ত পৃথিবীকে জানিয়ে দিন যে পারী ঠিক আগের মতই দিন কাটাচ্ছে। কামানের গর্জনের বদলে আমরা গান গাইছি, পারী আজও সেই পারীই আছে।'

লোকেরা বলতে লাগল, সৈন্যরা বিরক্ত হয়ে পড়েছে। তাদের জন্যে গ্রামোফোন রেকর্ড, ফুটবল, তাস, ডমিনো, ডিটেকটিভ গল্পের বই, সমস্ত কিছু সংগ্রহ করা হল। পতিপ্রাণা স্ত্রীরা তাদের স্বামীর জন্যে পাঠাল উটের লোমের কোট, নেপোলিয়ন ব্রাণ্ডি আর শহরের শ্রেষ্ঠ রাঁধুনীর তৈরী ফলের মোরব্বা।

ভয় হয়েছিল হয়ত যুদ্ধের ফলে অনেক দুঃখ কষ্ট আসবে। কিন্তু শরৎকাল অনেক নতুন বৈচিত্র্য নিয়ে এল—নৈশ উৎসব, অভ্যর্থনা সভা, প্রদর্শনী, সাধারণের সাহায্যের জন্যে মেলা আর নীলাম। ভাগ্যবান পুরুষ গ্রঁদেলের দেখা সব জায়গাতেই পাওয়া গেল। তাকে বাদ দিয়ে কোন অভ্যর্থনা সভাই সম্পূর্ণ হয় না।

লড়াইয়ের গোড়ার দিকে গ্রঁদেল যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে চেয়েছিল, 'আমি লড়াই করতে চাই।' তার সহকারী ডেপুটিরা প্রতিবাদ করল, 'এখানে তোমার থাকা আরও বেশী দরকার।' তার খ্যাতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছে যে দুকান হারানো দলিলের কথা তুলতে চাওয়ায় সবাই বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিল, 'ব্যক্তিগত বাদবিসম্বাদ তুলে জাতীয় ঐক্য নষ্ট কোরো না।'

গ্রঁদেল তার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একটা বোঝাপড়া করার ইচ্ছে গোপন রাখল না। সে বলল, 'পয়লা সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যা পর্যন্ত এই যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব ছিল। ব-নে টেলিফোনে সিয়ানোর সঙ্গে কথা বলেছিল। আমি চারজন প্রধান মন্ত্রীকেই একসঙ্গে মিলিত হবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আমাদের দলের ডেপুটিরাও আমাকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ঘটনাগুলো এত তাড়াতাড়ি

একটার মাথার ওপর দিয়ে আরেকটা ঘটে গেল! ইতিহাসই প্রমাণ করবে কে দোষী। কিন্তু এটা তর্ক করার সময় নয়। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, এখন জয়লাভ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের থামা চলবে না।'

যুদ্ধ গ্রঁদেলকে তার আগেকার সমস্ত জটিলতা থেকে মুক্তি দিল। নতুন করে সাজানো হল তাস। সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত। যখন সে যুদ্ধে জয়লাভের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে তখন তার গলায় একটা আন্তরিক আবেগ অনুভব করা যায়।

ডেপুটিরা গ্রঁদেলের দেশপ্রেম দেখে উৎসাহিত হল। মিলমালিকরা বলল, 'স্থিরচিত্ত'—অভিজাত মেয়েরা প্রেমে পড়ল তার। এমন সুপুরুষ আর সুবক্তা এই লোকটা যে ওকে দেখে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। মনে হবে তার সংযত স্বভাবের মধ্যে লুকিয়ে আছে আবেগের একটা উৎস।

এমন কি ব্রতৈলের সন্দেহ হল যে সে কোনও ফাঁদে পড়ছে না তো? লুসিয়ঁকে সে বিশ্বাস করত কারণ লুসিয়ঁ ছিল কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু গ্রঁদেলের ব্যবহার কেমন নির্দোষ!

ব্রতৈলের চোখে এই যুদ্ধ একটা নাটক। সে শেষ পর্যন্ত ভাবতে চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। মাঝে মাঝে সে মনে মনে বলেছে, 'আমাদের এ যুদ্ধ জিততেই হবে।' কিন্তু তারপরেই মনে মনে হেসেছে ব্রতৈল। এই এক দল অপদার্থ ডেপুটির হাতে কর্তৃত্ব থাকলে এ যুদ্ধ জেতা সম্ভব নয়। এই পার্লামেন্টকে রদ না করে এবং বাচালদের কারারুদ্ধ না করে কি করে এই যুদ্ধ জিতবে ফ্রান্স? হতে পারে শত্রুর ঘা খেয়ে ফ্রান্স আবার নতুনভাবে গড়ে উঠবে।'

গ্রঁদেলের রগ দুটো শাদা আর চোখ কেমন বিষণ্ণ হয়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে ব্রতৈল স্বগতোক্তি করল, 'আমার মত সেও উদ্বিগ্ন, চিন্তা-ভারাক্রান্ত।' যখন তারা দুজন ছাড়া আর কেউ রইল না, গ্রঁদেলের করমর্দন করে সে বলল, 'এস, অতীতের কথা ভুলে যাই আমরা।' ব্রতৈলের আর গ্রঁদেলের এক বছর ব্যাপী বিরোধের কথা কেউই জানত না। এখন তাদের মীমাংসার কথাও কেউ জানল না। সমস্ত ডেপুটিদের চোখে ও দেশের সামনে তারা চিরদিনই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ব্রতৈল যখন গ্রঁদেলকে যুদ্ধ-শিল্পের দায়িত্বশীল মন্ত্রীত্বের পদে নিয়োগ করার কথা বলল তখন এতটুকু আশ্চর্য হল না কেউ।

ব্রতৈলের মনে আছে তেসাকে দিয়ে গ্রঁদেলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করানো কী কষ্টকর

কাজ! এমন কি এখনো হয়ত তেসা তার বিরুদ্ধে যেতে পারে। কিন্তু অতীতকে টেনে তোলার ইচ্ছা তেসার বর্তমানে নেই। লুসিয়ঁর সেই দলিল চুরির ঘটনাটা তার কেমন নীরস আর পুরনো মনে হয়। কে সন্দেহ করেছিল গ্রঁদেলকে?—ফুজে আর দুকান। ফুজে তখন র‍্যাডিকাল পার্টি থেকে বহিষ্কৃত—মস্কো বোঝাপড়ার সময়ে চেম্বারলেনকে আক্রমণ করে ফুজে পারী আর লণ্ডনের মধ্যে একটা বিরোধ বাধিয়ে দিয়েছিল আর কি! দুকান তখন বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে। তার তোতলামি সত্ত্বেও তার ধারণা সে গামবেতা...অন্য সকলের শত্রুতাই তার প্রাপ্য। ভীইয়াব বলল, 'দুকান একটা পূতি-পড়া উগ্র জাতীয়তাবাদী!' ব্রতৈল তার বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দমা আনল। না, গ্রঁদেলের শত্রুরা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া সমস্ত কিছু অত্যন্ত সংযতভাবে দেখা দরকার। গ্রঁদেল কমিউনিস্টদের ঘৃণা করত...তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিন থেকে তাদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানত সে। জনসাধারণ ভাবত, গ্রঁদেল একজন 'বামপন্থী' কারণ ফ্রান্সেব 'দুশো পবিবারের' বিরুদ্ধে সে কথা বলত ..এবং মার্কিন ধনিকতন্ত্রের বিরুদ্ধে সে একটা পুস্তিকা লিখেছিল। আর যুদ্ধশিল্পের ক্ষেত্রে সমস্ত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করাই সমীচীন। সুতরাং গ্রঁদেল তাদেব একে একে গ্রেপ্তার করুক, মজুবদের কাজের সময় বাড়িয়ে দিয়ে তাদের মজুরি কমিয়ে দিক। যদি সে ঠিকভাবে কাজ করতে পারে তাহলে সমস্ত দায়িত্বই তার...তেসা এবং র‍্যাডিকালবা সম্পূর্ণ নির্দোষ থেকে যাবে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্রতৈল গ্রঁদেলেব মত লোকের সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দিতে রাজী ছিল না। এখন সে এবং তেসা দুজনেই সে কথা ভুলে গেল। যুদ্ধের সময়ে এই ক্ষুদ্র দলগত হীনতা থেকে ওপরে উঠতেই হবে। তেসা বলল, 'তোমার নির্বাচনকে আমি সমর্থন করি।'

দেসের বাদে সমস্ত বড় বড় শিল্পপতিবা গ্রঁদেলকে সমর্থন জানাল। মতিনি অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠ হয়ে বলল, 'অন্তত সে শান্তিরক্ষা করতে পারবে। ঘরের মধ্যে এই অরাজকতার ভেতর কী করে যুদ্ধ চালানো সম্ভব? মজুররা কোন রকম আত্মত্যাগ করতে রাজী নয়। কথা দিয়ে তুমি তাদের বোঝাতে পারবে না। কড়া হাতে শাসন করতে হবে তাদের।'

কর্মচারী সংঘের সভাপতি মিয়েজার গ্রঁদেলকে অভিনন্দন জানাল। একদিন দুকান ঘোষণা করল, 'মিয়েজার এখনো সুইজারল্যাণ্ড দিয়ে জার্মানদের বক্সাইট পাঠাচ্ছে। এটা নিছক কুৎসাপ্রচার। অবশ্য আমার নিজস্ব একটা

কর্মনীতি আছে।' তার কর্মনীতি অত্যন্ত সাধারণ। তার ধারণা, এই যুদ্ধ বার্লিনের বিরুদ্ধে নয় মস্কোর বিরুদ্ধে পরিচালিত করা উচিত। মিয়েজ্জারের কর্মনীতি হল 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'। যখন তেসা প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা জার্মানীর বিরুদ্ধেই লড়ছি।' মিয়েজ্জারও অত্যন্ত অর্থপূর্ণ উত্তর দিল, 'ধৈর্য ধরো। এ তো সবে প্রথম অঙ্ক চলছে।' যুদ্ধ শুরু হবার পর সে মাদ্রিদে রওনা হল...খবর রটল সে জার্মান দূতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে।

গ্রঁদেলকে নিয়োগ করার পর দেসের কিন্তু সত্যি সত্যিই চটল। সে বলল, 'এর জন্যে রাজনৈতিক চক্রান্তকারীর বদলে একজন যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ দরকার।' কিন্তু দেসেরের আগেকার প্রভাব এখন আর নেই। তার ব্যর্থ রাজনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ে ব্যবসায়ী মহলে কথাবার্তা চলে। ডেপুটিদের ধারণা, সে নিজেকে বোকা প্রমাণিত করেছে। পপুলার ফ্রন্টকে সমর্থন করে সে লীগ অব নেশনস্-এর শূন্যগর্ভ প্রস্তাবের সাহায্যে যুদ্ধ থামাতে চেয়েছিল। ব্রতৈল প্রায়ই ঠাট্টা করে, 'ও আতর দিয়ে আগুন নিবোয়।' এমন কি তেসার চোখেও দেসের একজন অপদার্থ।

এক মাস কেটে গেল। দেখা গেল, গ্রঁদেল সত্যিই একজন পরিশ্রমী কর্মী। রিপোর্ট তৈরী আর উপদেশ ও নির্দেশ নেওয়ার ব্যাপারে রোজই তার ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করা দরকার।

'এ হল দেসের আর কমিউনিস্টদের কীর্তি!' সে বলল, 'একটা নোংরা আস্তাবলের চেয়েও জঘন্য! কোন কিছু বিপদ ঘটবার আগেই আমাদের এই নোংরা পরিষ্কার করতে হবে।'

শুধু এক তৃতীয়াংশ মজুর 'সীন' কারখানাতেই বসে রইল। দেসের ভাবল একটা কৈফিয়ৎ নেওয়া দরকার। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সে গিয়ে ঢুকল গ্রঁদেলের পড়ার কামরায়। টুপিটা হাতে নিয়ে কথা বলতে বলতে ছড়িটা ঘোরাতে লাগল দেসের। হাসতে হাসতে গ্রঁদেল তার ডেস্কের ওপরকার কাগজগুলো উল্টে চলল। বড় মজা লাগছে তার—একদা শক্তিশালী দেসের, তার সামনে বসে রয়েছে দরখাস্তকারীর মত!

দেসের নিশ্বাস নিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠল। সে অসুস্থ; তার গুরুতর অসুস্থতার কথা তার নিজেরও অজানা নয়, যদিও কোন চিকিৎসা না করিয়ে সে মদ খেয়ে যাচ্ছে নির্বিবাদে। তার ব্যবসার মত তার ব্যক্তিগত জীবনও

অত্যন্ত উপেক্ষিত আর বিষণ্ণ। জিনেত্তের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাতের মধ্যেও কেমন করুণা আর দুশ্চিন্তার ছায়া। শহরের উপকণ্ঠে তার বাড়ীতে রাত কাটাতে কেমন একা একা মনে হয়......মনে হয় তার মনের মধ্যে যত রাজ্যের মৃত্যুর চিন্তা ঢেউ তুলছে। মরতে ভয় হয় দেসেরের। অনেকবার সে ভয়কে কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। সে দেখতে পাচ্ছে, দেশ কি ভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে নেমে চলেছে কিন্তু তার অক্ষমতায় সে নিজেই বিব্রত। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত সে নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে করেছিল। কিন্তু এখন সমস্ত খেলা থেকে বাদ পড়েছে সে। তার বক্তব্য ওরা সবাই শুনল কিন্তু কেউ একবাব তাব দিকে তাকালও না। বিধবা রাজমহিষীর মত তার অবস্থা......শেয়ার বাজারের পুঁথিগত সমজদার বা প্রাচীনকালের স্মৃতি-চিহ্নের মত অসহায় আব বিচিত্র! বাচাল মতিনি আর মিয়েজার যে কয়েক লক্ষ টাকার জন্যে নিজের মাকে পর্যন্ত বেচতে পারে, তাদের দিকেই নজর দিতে ব্যস্ত রইল লোকে। দেসেরের প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই তাদের।

এবার সে গ্রঁদেলকে বলল, 'আপনারা কী করে আশা করেন যে নভেম্বরের মধ্যে আমি আপনাদের মাল সরবরাহ করব? কোন মজুব নেই আমার হাতে। যুদ্ধ শুরু হল না কিন্তু এরি মধ্যে ভাল ভাল মজুররা লড়াইয়ের ময়দানে গিয়ে হাজির হয়েছে।'

'সত্যিই বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়, কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কী?' গ্রঁদেল বলল, 'আমরা মজুরদের বিশেষ কোন সুবিধা দিতে পারি না কারণ আমাদের দেশ হল কৃষিপ্রধান। তাহলে চাষীরা কী বলবে? মজুরদের দ্বিগুণ রোজগার করতে দিয়ে চাষীদের কি ময়দানে গিয়ে প্রাণ দিতে হবে? অত্যন্ত সহজ আর মৌলিক ন্যায়পরতা বাদ দিয়ে এ যুদ্ধে জেতা সম্ভব নয়।'

'চল্লিশ বছর বয়স যাদের তাদের সম্পর্কে কী করবেন? তারা তো যুদ্ধে যায়নি। মিস্ত্রিরা সকলে জানলা ধুচ্ছে ব্যারাকের।'

'মজুরদের মধ্যে আমরা বৈষম্যমূলক নীতি মানতে রাজী নই।'

'আমি জিজ্ঞাসা করি—আপনার ইঞ্জিনের দরকার আছে কি নেই? আমি দেখতে চাই আপনারা কি করে বিনা এরোপ্লেনে যুদ্ধ চালান। যদি ইঞ্জিনের দরকার থাকে আমাকে মজুরের ব্যবস্থা করে দিন। গতকাল আবার ওরা দুশোজন মজুরকে ধরে নিয়ে গিয়েছে 'সীন' কারখানা থেকে।'

'ঠাণ্ডা মলম দিয়ে একটা মড়ক দূর করা যায় না। আজ আমাদের পপুলার ফ্রণ্ট সরকারের দাম কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হচ্ছে।' গ্রঁদেল বলল।

'পপুলার ফ্রণ্টের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক?' দেসের ছড়িটা এমনভাবে নাড়াতে লাগল যেন গ্রঁদেলকে মারবার জন্যে তৈরী হচ্ছে সে, 'আর তাছাড়া আপনি নিজেও একজন পপুলার ফ্রণ্টের প্রতিনিধি।'

'আমার যতদূর মনে আছে মসিয়ঁ দেসের, পপুলার ফ্রণ্টের সাফল্যের জন্যে কোন টাকা খরচ করতে আপনি এতটুকুও পেছ-পা হন নি।'

গ্রঁদেলের সুকুমার ভুরুওলা সুন্দর মুখ, খোদাই করা নাক আর ভাবহীন প্রায়-অস্পষ্ট হাসির দিকে তাকিয়ে মনে মনে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল দেসের।

'আমারও মনে আছে। প্রত্যেকটা জিনিস আমার মনে আছে। সেই ফ্রুজে-দলিল......' দেসের বলল।

গ্রঁদেলের একটা মাংসপেশী পর্যন্ত নড়ল না। হাসতে হাসতে সে বলল, 'যুদ্ধের সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অচল, তাই আমি আপনাকে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে বলছি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে দেসেরের হাত থেকে টুপিটা পড়ে গেল, এক দমক কাশি এসে বিব্রত করে তুলল তাকে। গ্রঁদেল একটা রিপোর্ট পড়ার ভান করল।

সন্ধ্যার দিকে একটা ভোজ দিল গ্রঁদেল। নিমন্ত্রণ পত্রে লেখা, 'সৈনিকের আহার।' রূপদস্তার·প্লেটে করে অতিথিদের 'সালামিস ছ ফেঁজা' পরিবেশন করা হল...মগ থেকে তারা সবাই খেল সব চেয়ে সেরা পানীয় 'হস্‌পিস ছ বোন'।

মুশ্‌ অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল। লুসিয়ঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ হওয়ার পর সে অনেকদিন শারীরিক পীড়ায় ভুগছিল এবং আলপ্‌স্‌-এ গিয়েছিল শরীর সারাতে। এখনো অত্যন্ত সুন্দরী দেখায় তাকে কিন্তু ভাল করে দেখলে বোঝা যায় যে সে কেমন ম্লান হয়ে যাচ্ছে। মনের অসুখ আর তার যন্ত্রণা তার সমস্ত গতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে।

অতিথিরা চলে যাবার পর গ্রঁদেল তার ডিনার-জ্যাকেট আর ওয়েস্টকোট খুলে ফেলল। ঝকঝকে শাদা শার্টের ওপর চোখে পড়ল পাতলা কালো ফিতে দুটো। সে স্ত্রীকে বলল, 'কর্নেল মোরো তোমার প্রসাদ পাবার জন্যে দারুণ উৎসুক। লোকটা খুব নামজাদা, ও জেনারেল স্টাফের কর্তা হলেও আমি এতটুকু আশ্চর্য হব না।'

গ্রঁদেল হাই তুলল। সারাদিন অত্যন্ত পরিশ্রম গেছে। ধীরে ধীরে পায়জামাটা বদলে ফেলল সে। হঠাৎ বলল, 'যাই হোক আমরা জিতবই।'

মুশ্ ওর ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাতে আসে না। এমন কি সেই বিশ্রী চিঠিটার কথা পর্যন্ত ভুলে গেছে সে। লুসিয়ঁর সঙ্গে তার শেষ দেখা তাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে দিয়ে গেছে। যুদ্ধ, ম্যাজিনো লাইন আর বিমান আক্রমণের কথা ও স্বামীর ভবিষ্যৎ তার কাছে পরদায় আঁকা নক্শার মত মনে হয়। কিন্তু আজ সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা মানে কারা?'

সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল সে বোকার মত একটা কথা বলে ফেলেছে। তিরস্কৃত হবে বলে সে পেছন ফিরল। অত্যন্ত শান্ত হয়ে উত্তর দিল গ্রঁদেল, 'আমরা ফরাসীরা।'

গ্রঁদেল হল জুয়াড়ী। তার সারা জীবন সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মনে পড়ে সবুজ পরদার চারধারে ফিসফিসে কথা আর অস্ফুট চিৎকার। সেই ভয়ংকর কয়েকটা মাস ধরে সে এমনি নির্বোধের মতই কাজ করেছিল যার পর অনুতপ্ত হয়েছিল সে। আশি হাজার ফ্রাঁ সে হারিয়েছিল। তারপর ভের্নে তার সাহায্যে এল। কিলমানের সঙ্গে দেখা করিয়ে জার্মানদের জন্যে দলিল চুরির কাজে লাগিয়ে দিল। কিন্তু সে সব কথা মনে করে কী লাভ? এক বৃহত্তর ভবিষ্যতের পেছনে ছুটেছিল সে। গ্রঁদেল মনে মনে বলল, 'আমরা জিতবই।' কিন্তু সে মনে মনে জানে কোন্ জয়ের কথা বলছে সে। সে নিজেকে এবং মুশ্‌কে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'এ একটা নির্বোধ প্রশ্ন! নির্বোধরাই ভাগ্যের সঙ্গে তর্ক করতে চায়। এ ঠিক রুলেত্ খেলার মত, ওরা সবাই একই নম্বরের পেছনে ছোটে। কিন্তু মানুষের বদলানো উচিত, দেখা উচিত ভাগ্য কোন্ দিকে চলেছে এবং সেই পথ ধরে যাওয়া উচিত তার। এখানেই হল আসল কায়দা।'

৪

মতিনি পর্যন্ত ভীষণ বিরক্ত হল। 'কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা এক কথা আর বুড়ো লোকদের ধরে ধরে ব্যারাকে পাঠানো সম্পূর্ণ আরেক কথা। আমার হাতেও তেমন প্রচুর মজুর নেই।' গুপ্ত বিরোধী পক্ষের সমর্থনের ফলে যুদ্ধ-শিল্পের প্রসঙ্গ উত্থাপন চেম্বারে একটা 'রীতি' হয়ে দাঁড়াল।

দেসেরের সঙ্গে 'ন্যায়নীতি' সম্পর্কে আলোচনার সময়ে গ্রঁদেল ব্রতৈলের

কথা[illegible]াই বলেছে। ফরাসী কৃষকদের গ্রঁদেল ঘৃণা করে এবং ভয়ও করে। তার ধারণায় ওরা মানুষ নয়, কেমন একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব। অন্য দিকে ব্রতৈলের মত—শহর ও শিল্পের অত্যধিক প্রসারই ফ্রান্সের সমস্ত দুঃখ কষ্টের জন্যে দায়ী। গ্রাম্য-জীবন কেমন যেন ভোঁতা আর স্থূল! সেখানে কোন সিনেমা নেই; কাজকর্ম পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ এবং সেজন্যে দলে দলে শহরমুখো হচ্ছে যুবকরা। ফ্রান্সের কত গ্রামই তো জনশূন্য আর পরিত্যক্ত! চালাগুলো ভেঙে পড়ছে......ভেপসে উঠছে গোলাঘর......যত রাজ্যের জংলী আগাছা জন্মাচ্ছে ফলের বাগানে। এরই পরিণতি হল সাম্যবাদ, পপুলার ফ্রণ্ট, অধর্ম আর ভাঙন। ব্রতৈল ভেবেছিল, যুদ্ধের ফলে কৃষকরা পুরোভাগে এগিয়ে আসবে। তাই গ্রঁদেলকে পরামর্শ দিয়েছিল 'মজুরদের কোন রকম প্রশ্রয় দিও না।'

তবুও তাকে নামতে হল। অক্টোবরের শেষে সরকার সিদ্ধান্ত করল, পঁয়তাল্লিশ বছরের সমস্ত লোককে যুদ্ধ-শিল্পের জন্যে ছেড়ে দিতে হবে।

তাদের মধ্যে একজন হল লেগ্রে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে তাকে দক্ষিণে পাঠানো হয়েছিল। তার তাঁবু পড়েছিল তুলুজের কাছাকাছি। সেখানে একটা সাঁকো পাহারা দিতে হত তাকে, যে সাঁকোর ওপর দিয়ে বহুকাল আগে সরু লাইনের রেল যাতায়াত করত। এই শাখা লাইন বহুদিন হল পরিত্যক্ত হয়েছে......... সাঁকোর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হলদে ঝাড়। কিন্তু সেনা-কর্তৃপক্ষের তালিকায় এ লাইনের কথা লেখা আছে। গত দু মাস ধরে লেগ্রে তাকিয়ে আছে শুধু খোলা মাঠ আর রংচঙে গরুগুলোর দিকে।

তার হাতে চিন্তা করবার মত মুঠো মুঠো সময়। তার মনে পড়ল গত যুদ্ধের কথা......আরগন জঙ্গল, ট্রেঞ্চ আর হাসপাতালের কথা। অথচ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো তার মনে হয় কেমন অস্পষ্ট আর ভূতুড়ে যেন এই দুই যুদ্ধের মাঝখানে কেবলমাত্র একটি দিনের ব্যবধান। সে সময়ে ওরা ভাবত যে লোকেরা এবার অনেক চালাক হয়ে গেছে......আর হয়ত ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধ ডেকে আনবে না তারা। কেউ কেউ উইলসনের নীতিতে বিশ্বাস রাখত। কেউ কেউ বলত, 'লেনিন.........লেনিন।' আবার বিশ বছরের মধ্যে আর একটা যুদ্ধ বাধবে—এ কথা আগে থেকে জানিয়ে দিলে কী ক্ষতি হত তাদের?

জোসেতের কথা মনে হলে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে লেগ্রে। সে জীবনে হয়ত কখনো

সুখী হবে না! গ্রীষ্মকালে ফিরে এসে তারা বিয়ে করবে ঠিক করে নতুন ঘরের খোঁজে বেরিয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধ এসে সমস্ত কিছু ছত্রভঙ্গ করে দিল তাদের। জোসেতের বাবা ধরা পড়ল। জোসেৎ চলে গেল তার বোনের বাড়ী বেসাসেঁ। ছোট ছোট শোকার্ত চিঠি লেখে সে। রাত্রে দক্ষিণাকাশের হাজার হাজার তারার দিকে তাকিয়ে জোসেতের ভালবাসার কথা মনে পড়ে লেগ্রের। সে শুধু ক্লান্ত হয়ে হাই তোলে!

কারখানায় ফিরে এসে লেগ্রে তার পুরনো বন্ধুদের ফিরে পেল না। মিশো আর পিয়ের যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে সে পরিচিত লোকদের খোঁজে বেরুল। যে কাফেতে তার বন্ধুরা জড়ো হত সেখানে গেল, বন্ধ লাইব্রেরীর চার পাশে পায়চারি করল, তারপর মন্‌ত্রুজ ভিলজুইভে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু কারও সঙ্গে দেখা হল না। কতক লোক গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছে, বাকী যারা তারা গোপনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

অনেক নিঃসঙ্গ আর অস্থির মনে করল লেগ্রে নিজেকে। পার্টি কি করছে না করছে সে কিছুই জানে না এবং এই না জানাটা তার কাছে কেমন অন্ধতা বলে মনে হয়! সে বিরক্ত হয়ে সেই সব সংবাদপত্রগুলো পাশে ফেলে দিল যারা লিখেছে—কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক, রুশরা সিগফ্রিড লাইনের ধারে যুদ্ধ করছে এবং মোরিস তোরে জার্মানীতে পলাতক। তুলুজে সে শুনেছিল যে 'লুমানিতে' গোপনে ছাপা হয় এবং বিলি করা হয় কিন্তু সে কী করে তার সন্ধান পাবে? যে সব লোক তার সঙ্গে কাজ করত তারা এখন চিনতেই পারে না তাকে। তারা সন্দিগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকায় যেন গোয়েন্দা-বিভাগ থেকে চর করে পাঠিয়েছে তাকে।

একাকীত্ব ও অনিচ্ছাকৃত অলসতার মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। এই ভাবে চার দিন কাটল। পঞ্চম দিন গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তাকে।

একটা ছোট্ট হাজত ঘরে সমস্ত রাতটা কাটল, সব রকমের লোকের দেখা মিলল সেখানে—রাজনৈতিক বন্দী আর মেয়েদের দালাল, জার্মান আশ্রয়প্রার্থী আর পোলিশ ইহুদি, রসজ্ঞ লোক যাদের দালাদিএর মদ্য-পান ও তেসার দুঃসাহসিক প্রেমের গোপন খবর পুনরাবৃত্তি করার দরুণ গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সাধারণ নাগরিক যাদের দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শোনা গেছে 'এবার আর দুধ পাওয়া যাবে না' বা 'ওরা সতের বছরের ছেলেদের পর্যন্ত যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্যে একটা নতুন নিয়ম জারী করেছে।'

সকালে লেগ্রেকে জেরা করার জন্তে নিয়ে গেল। পুলিশ কমিশনার হ্ভিল গুপ্ত ইউরোপীয় তান্ত্রিক সমিতির সভ্য। সুতরাং সে খোলাখুলি বলল যে সে এদুয়ার দালাদিএর চেয়ে এদুয়ার এরিওকে বেশী পছন্দ করে। পুলিশ কর্মচারীর পক্ষে এই মত পোষণ করা স্বাধীন-চিন্তার পরিচায়ক। সে জানে যে লেগ্রে 'সীন' কারখানার কমিউনিস্ট সংগঠনের একজন নেতা; লেগ্রে যদি পার্টি ত্যাগ করে তাহলে জনসাধারণের মধ্যে তার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। সংবাদপত্রগুলো লিখবে, 'আবার একজনের চৈতন্যোদয় হল!' তেসা হ্ভিলের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করবে; একজন অনুতপ্ত লোক এক হাজার পাপীর সমান।

হ্ভিল অত্যন্ত অমায়িক ব্যবহার করল লেগ্রের সঙ্গে এবং একটা সিগারেট দিল।

'আমি একজন সরকারী কর্মচারী। সুতরাং ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ করার অধিকার আমার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ফ্যাশিস্ট নই। আমি সত্যিই পপুলার ফ্রন্টের সাফল্যে উল্লসিত হয়ে উঠেছিলাম, যে এবার একটা স্থায়ী শান্তি আসবে। কিন্তু দেখছি ঠিক তার উল্‌টো হয়েছে। যাই হোক, এটা কিন্তু দলগত সংগ্রামের সময় নয়। এখন সমস্ত ফরাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হবে। আপনি কমিউনিস্ট কিন্তু আপনি একজন ফরাসীও। আপনি যুদ্ধে আহত হয়েছিলেন। আমি আপনাকে দেশদ্রোহী বলে মনে করি না।'

লেগ্রে কি বলে তারই আপেক্ষায় রইল সে। কিন্তু লেগ্রে অত্যন্ত নিঃশব্দে তার ক্যাপটা ভাঁজ করতে লাগল আর তাকিয়ে রইল টেবিলের ইতস্তত নীল ফাইল-গুলোর দিকে।

'কথা বলছেন না যে?'

'সত্যিই বুঝতে পারছি না কি বলব? যা বলার তা তো আপনিই বলছেন। আমি কমিউনিস্ট ছিলাম এবং আজও আছি।'

'আপনার একগুঁয়েমি আমি বুঝতে পারি। অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের প্রভাবের ফল। আপনি আপনার কমরেডদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে চান না। কিন্তু বন্ধু, আজ আর দ্বিধা করার সময় নেই। আপনাকে অন্যের হাতের ঘুঁটি বানিয়েছে ওরা। ওরা আপনাকে ঠকিয়েছে। ওরা দেশপ্রেমের বুলি আওড়ে আপনাকে ফ্যাশিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলেছে। কিন্তু আসলে কি হয়েছে? মোরিস তোরে আজ পলাতক।'

'আমরা পলাতক নই। আপনি বরং এ প্রসঙ্গ বাদ দিন। আমি জানি না মোরিস তোরে বর্তমানে কোথায় আছেন। কিন্তু আপনাদের সংবাদপত্রের কথা

মত তিনি জার্মানীতে নেই এটা ঠিক। মনে হয় তিনি 'লুমানিতে' ছেপে বের করছেন। এই হল আসল কাজ। কিন্তু আসল পলাতকরা কোথায় আছে তা আমি জানি। মিউনিকের কথাও আমার মনে আছে। আর স্পেনকে নিয়েই বা কী ঘটল? আমাদের লোকেরা যখন ফ্যাশিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে তখন ব-নে সাহায্য করছে ফ্রান্সের শত্রুদের। ছোট ছোট ছেলেরা পর্যন্ত জানে এ কথা। আপনার কথা শুনে আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি ফ্যাশিস্টদের কথা বলছেন। আপনারা সব সময়ে তাদের ঢাল দিয়ে রক্ষা করে এসেছেন আর সে জন্যে ফ্যাশিস্টরা আজ ক্ষমতাশালী।'

হ্যভিল ভদ্র হাসি হাসল।

'তেতাল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আপনার কিন্তু এখনো যুবকের মত প্রাণশক্তি আছে দেখছি।' সে বলল, 'সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু একমাত্র দুঃখের বিষয়, আপনি আপনার ঠুলি খুলতে চান না। আপনার পার্টি আপনার সঙ্গে বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছে। জার্মানীর জয়ের জন্যে এখন আপ্রাণ পরিশ্রম করছে তারা!'

'ও কথা আমি বিশ্বাস করি না!'

'তাহলে কি করতে চায় তারা?'

লেগ্রে ভুরু কোঁচকাল। 'আমি জানি না বর্তমানে পার্টির কর্মনীতি কি,' সে বলল, 'এবং সে জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ! আপনারা 'লুমানিতের' কণ্ঠরোধ করেছেন এবং সমস্ত সাচ্চা লোককে গ্রেপ্তার করেছেন। আর এখন ধুলো দিতে চাইছেন আমার চোখে। কিন্তু অনেক কিছু খেলাই আমি বুঝতে পারছি। কারা কমিউনিস্টদের পিছু নিয়েছে? দালাদিএ, তেসা, ব্লুম, ভীইয়ার, ব্রতৈল, লাভাল—এক কথায় গোটা দল। না, কমিউনিস্টরা বিশ্বাসঘাতক নয়—বিশ্বাস-ঘাতক হল তাদের শত্রুরা। আজ যদি লাভাল 'সাবাস কমিউনিস্ট' বলে চিৎকার করতে শুরু করে, আমি সহজে বিশ্বাস করব না। কিন্তু, এখন আমরা জানি আমরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি।'

হ্যভিল সিগারেটটা ফেলে দিয়ে ঘণ্টা বাজাল।

'নিয়ে যাও ওকে।' নির্দেশ দিল হ্যভিল।

অন্যান্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে লেগ্রেকে বন্দী-শিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হল। বন্দী বোঝাই ট্রেনখানি নোয়াসি-ল-সেক জংশনে এক ঘণ্টারও ওপর থামল। পুলিশ দর্শকদের বন্দীদের কাছাকাছি আসতে দিল না—বলল ওরা দেশদ্রোহী। সৈনিক ও স্ত্রীলোকরা ট্রেনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি বিস্ফারিত করে বিড়বিড় করল,

'অপদার্থ! ওরা কেবল নিজেদের জন্যে অপর লোকদের মারতে জানে।' কেউ কেউ চিৎকার করে উঠল, 'কাপুরুষ!' এর পর লেগ্রে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শুরু করল। অবাক হয়ে শুনতে লাগল প্ল্যাটফর্মের লোকেরা। গাড়ী থেকে বন্দীরা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা দেশদ্রোহী নই। আমরা মজুর—আমরা কমিউনিস্ট।' 'ইণ্টারন্যাশনালের' পর ওরা 'মার্সাই' গাইল। প্ল্যাটফর্মের সৈনিকরা গুন গুন করে গেয়ে উঠল সেই সুর। ভীড় হটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল পুলিশ। জানলা থেকে ঝুঁকে পড়ে লেগ্রে বলে উঠল:

'গত যুদ্ধে আমার চোট লেগেছিল। মুখে এখনো পর্যন্ত তার দাগ রয়েছে। সে দাগ মুছতে পারবে না কেউ। বিমান কারখানা থেকে ওরা আমাকে ধরে এনেছে। পায়খানা পরিষ্কার করতে আমায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ব-নে, তেসা, ফ্লাঁন্ধা! ওরাই হল আসল বিশ্বাসঘাতক! ফ্রান্সের জন্যে আমরা আমাদের প্রাণ দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত।'

লেগ্রে বজ্রমুষ্টি তুলল,—সেই প্রায় ভুলে যাওয়া শাসনের ভঙ্গী, ১৯৩৬ সালের কথা মনে করিয়ে দেয়, যা পূর্ণ হবে না বলেই জানা ছিল। পুলিশ তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। ওদিকে ট্রেন চলবার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের ধার থেকে সৈনিক আর স্ত্রীলোকরা শত শত বজ্রমুষ্টি তুলল অভিবাদন জানিয়ে।

৫

তালিকা এবং কর্তৃপক্ষের খেয়ালখুশি অনুযায়ী ধরপাকড় হতে লাগল। কে একজন বজ্রমুষ্টি তুলেছে, কোন এক অপরাধীকে নাকি শিস দিয়ে 'ইণ্টারন্যাশনাল' গাইতে শোনা গেছে, তৃতীয় ব্যক্তি তার ঘরে ক্রেমলিনের একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছিল নাকি—এমনি সব অভিযোগ! পুলিশ-রিপোর্ট পড়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তেসা। বলল, 'কমিউনিস্টরা তাহলে সমস্ত জায়গায় গিয়েই বাসা বেঁধেছিল! নীভ্‌র্ এমেচার মৎস্যশিকারী সমিতি, ভার-বিভাগের দাবা চক্র, গ্রেনোব্‌ল্ পর্বত-অভিযাত্রী সংঘ—সবগুলোই নাকি কমিউনিস্ট পার্টির শাখা। তেসা মনে মনে বলল, 'হ্যাঁ, এতেই বোঝা যায় ওরা কত শক্তিশালী! এখন বুঝতে পারি ওরা কি ভাবে দেনিসকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বেচারী বোকা মেয়ে!'

সমস্ত কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গুলি করে মারা হোক—ব্রতৈল দাবী জানাল।

তেসা জবাব দিল, 'সাবধান বন্ধু! ওরা যাইই হোক, মনে রেখো জনসাধারণ ভোট দিয়ে পাঠিয়েছে ওদের।' তেসা আগে থেকে কিছু করতে রাজী নয়। যে সব ডেপুটিরা ধরা পড়েছে তাদের সম্বন্ধে তেসা অত্যন্ত দুঃখিত। তাদের বাঁচানো দরকার। তেসা তাদের বলল, 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের' সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করেছ এমনি একটা মুচলেখা সই করে দাও, তোমরা আবার চেম্বারের আসনে বসতে পারবে। কিন্তু ডেপুটিরা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় সে চিৎকার করে উঠল 'গোঁড়া রাজনীতিক! ওদের জন্যে যা করা সম্ভব তা আমি করেছি।'

ফ্রুজে আবার তার আক্রমণ আরম্ভ করল। মার্সাই-এর রাজনীতিক প্রচারকরা এই চঞ্চল জীবটিকে কোন মতেই ঠাণ্ডা করতে পারল না। সে জাহির করল, 'কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করার ফলে সৈন্যদের মনোবল ভেঙে পড়ছে।' তেসা বলল, 'তাহলে তুমি কি হিটলারের পক্ষে?' অন্যান্য ডেপুটিরা হাততালি দিয়ে তেসাকে প্রশংসা করল। নানা ঠাট্টা তামাসার মধ্যে মঞ্চ ছেড়ে চলে এল ফ্রুজে।

জীবনে কখনো এমনিভাবে পরিশ্রম করতে হয়নি তেসাকে। পলেতের সঙ্গে এক ঘণ্টা বসে আলাপ করবে এ অবকাশও তার নেই। এমন ক্লান্ত আর বিরক্ত বোধ করল নিজে যে সমস্ত কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করবে ভাবল। আত্মপ্রতারণা করে কী লাভ? অনেক বয়স হয়েছে তার! আর ক-দিনই বা বাঁচবে সে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে এ চিন্তা উড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কি ক্লেমসো ফ্রান্সকে রক্ষা করেনি? তেসা ভাবল, সে তো তারই উত্তরাধিকারী। তার মর্মরমূর্তি একদিন বড় বড় পার্কে শোভা পাবে। একবার সে পলেৎকে বলেছিল, 'লা রু তেসা—কথাগুলো নেহাৎ মন্দ শোনায় না।'

তেসাকে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে সমরবিদ্যা, অর্থনীতি, এমন কি ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কারবার করতে হয়—কথা বলতে হয় তুলো সরবরাহ, নতুন বোমারু বিমান এবং বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে। প্রত্যেকেই তার কাছে নানা রকম দাবী দাওয়া নিয়ে আসে, অব্যবস্থার জন্যে নালিশ জানায়। আগে তাকে ডেপুটি আর বড় বড় পুঁজিপতিদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হত। এখন তাকে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে হয়, যদিও কোন সামরিক পরিভাষা তার জানা নেই। তাদের কি প্রতিশ্রুতি দেবে এবং কিভাবে এড়াবে এ কৌশলও সে জানে না।

'সামরিক বিভাগটা সম্পূর্ণ আলাদা জগৎ,' সে চিৎকার করে উঠল, তারপর মনে মনে বলল, 'এবং নিকৃষ্ট জগৎ।'

জেনারেল দ্য ভিসে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে জেনে ভুরু কোঁচকাল তেসা। এই কুখ্যাত খুঁতখুঁতে লোকটির সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

জেনারেল দ্য ভিসে ১৯১৫ সালে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিতি পেয়েছে। তখন সে শেম্যাঁ-দে-দেম্-এ সৈন্য পরিচালনা করছিল। পায়ে চোট পেয়েও সে তার দায়িত্ব ছেড়ে যেতে রাজী হয়নি। চৌষট্টি বছর বয়সে এখনো তার প্রাণশক্তি আর উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ আছে। রোদ-ঝড়-লাগা গোলগাল মুখে আর রুক্ষ পীতাভ গোঁফে তাকে ঠিক ডালকুত্তার মত দেখায়। লোকটি অত্যন্ত দয়ালু কিন্তু বদরাগী। বৌয়ের ওপর তম্বি করে আর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের গালিগালাজ দেয়। ফৌজ আর বাগান—এ দুটোর ওপর ভারী ঝোঁক তার। অবসর সময়ে সে জলের ঝারি নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, গোলাপের ঝাড় বাঁধে, ডাল ছাঁটে আর কলম লাগায়।

সে কখনো রাজনীতি আলোচনা করে না; যখনই কোনও মন্ত্রী সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করা হয় সে উত্তর দেয়, 'সৈনিকরা এ ব্যাপারে একেবারে বোবা।' কেউ কেউ বলে সে একজন রাজতন্ত্রী—সিংহাসন দাবীদার-দের হয়ে যারা দালালী করে, তাদের সঙ্গে তার মেলামেশা আছে। এবং অন্যান্যরা বলে, দ্য ভিসে হল একজন কমিউনিস্ট। জেনারেল পিকারের মতও তাই। সে প্রতিবাদ না করে মনযোগ দিয়ে ফুজের কথা শোনে ও সোভিয়েট বিমান বাহিনীকে প্রশংসার চোখে দেখে। সেদিন দ্য ভিসেকে গির্জায় দেখতে পেয়ে রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তেসা: মনে মনে ভেবেছিল, 'এ সবের পরও সে ফুজের বন্ধু!'

সে কী জন্যে দেখা করতে আসছে তার সঙ্গে? বোধ হয় সৈন্যবাহিনীতে বামপন্থী সংবাদপত্র পড়া নিষিদ্ধ করায় সে পিকার্ সম্বন্ধে নালিশ করতে এসেছে? কিংবা হয়ত সৈন্যবাহিনীতে ধর্মযাজকের রীতি স্বীকার করানোর জন্যে আসছে সে। ভগবানই জানেন সে কি জন্যে আসছে!

জেনারেলকে অত্যন্ত আরামপ্রদ আর্ম-চেয়ারে বসতে দিয়ে তেসা তার দিকে এক বাক্স সিগার এগিয়ে দিল।

'পার্তাগাস সিগার। খুব ভাল অবস্থায় আছে কিন্তু। মনে হয় দ্বিতীয় চালান

আসতে অনেক সময় নেবে। জাহাজগুলো সব অন্য মালে ভর্তি। তারপর জেনারেল, আমার কাছে কী দরকার?'

গু ভিসে এই কথোপকথনের জন্যে অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। বাড়ীতে বসে সে দেশপ্রেম সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড ভূমিকা তৈরী করেছিল, তারপর গত যুদ্ধের শিক্ষা এবং সৈনিকের কর্তব্য। কিন্তু এখন সমস্ত কিছু ভুলে গেল সে। সে সিগারের শেষাংশ কামড়াল, থুথু ছিটোল এবং তারপর সোজাসুজি বলল, 'অবস্থা ভয়ানক সাংঘাতিক! সব জিনিসের রীতিমত অভাব! জানেন ব্যাটালিয়নে ক-টা মেসিনগান আছে? বিমান বহরের কথা বাদই দিলাম। মাত্র দশটা বোমারু বিমান আছে আমার হাতে। হ্যাঁ, ভুল কথা বলছি, না। মাত্র দশটা। আর না আছে জুতো, না আছে কম্বল। তাবপর শীত আসছে মাথার ওপর।'

দুঃখিত হয়ে মাথা নাড়ল তেসা, 'আমি জানি, সবই জানি। এ সমস্ত পপুলার ফ্রণ্টের পরিণাম, মাইনে সমেত ছুটি দেওয়ার ফল। কিন্তু অবস্থা শিগগিরই বদলাবে। আমেরিকা থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনব আমরা।'

'যত তাড়াতাড়ি পারেন কিনুন।'

'মনে হচ্ছে অর্থতত্ত্ববিদ নন আপনি, জেনারেল।' তেসা অনুগ্রহসূচক হাসি হাসল। 'আমেরিকা থেকে উড়োজাহাজ কেনা অত্যন্ত খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে যন্ত্রপাতি কেনা অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। তা ছাড়া ইঞ্জিনের খরচ বাঁচাতে হবে আমাদের। শিল্পপতিদের তো যুদ্ধং দেহী মনোভাব। মিয়েজারও আপত্তি জানিয়েছে—দেশীয় শিল্পের ক্ষতি করলে চলবে না। তবু আমি বলছি, আমেরিকা থেকে মাল আমরা কিনবই। ইতালিতেও আমরা কিছু অর্ডার দিয়েছি। ১৯৪১ সালের বসন্তকাল নাগাদ... '

'কিন্তু যদি তারা ১৯৪০ সালের বসন্তকালের মধ্যেই যুদ্ধ শুরু করে?' জেনারেল বাধা দিল।

'আমার চেয়ে আপনি ভালভাবেই জানেন যে ম্যাজিনো লাইন নেওয়া অসম্ভব ব্যাপার।'

'কিছুই অসম্ভব নয়। ওরা কত প্রাণ বলি দিতে তৈরী আছে তার ওপরই নির্ভর করবে ম্যাজিনো লাইনের ভবিষ্যৎ। তাছাড়া উত্তর দিকে? সেখানে তো ম্যাজিনো লাইন আমাদের রক্ষা করবে না।'

'কেন লীজ দুর্গ আর এ্যালবার্ট খাল রয়েছে ও দিকে। বেলজিয়ানরা যদি

একবার যুদ্ধে নামে তাহলে সিংহের মত লড়বে ওরা। রীতিমত বীরের জাত ওরা।'

'হতে পারে। কিন্তু পরের ওপর নির্ভর করলে আমাদের চলবে না। উত্তর সীমান্তে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেই হবে একটা।'

'অনেক বছর লাগবে তা করতে। আর তার ওপর আমাদের সমস্ত সংস্থান একসঙ্গে জড়ো করতে হবে। এবার যার হাতে সোনা আছে সেই জিতবে এই যুদ্ধে।'

অতিথির দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞের হাসি হাসল তেসা। মনে মনে বলল, 'ইস্ কী ছেলেমানুষ!' লাল হয়ে উঠল জেনারেলের মুখ। বুকের ওপর নড়ে উঠল তার রিবনগুলো।

'আমি একজন সামরিক কর্মচারী। আজ্ঞা পালন করাই আমার কাজ। কিন্তু আমি চুপ করে থাকতে পারি না। জেনারেল পিকারের মত : সিগফ্রিড লাইন দখল করার জন্যে ১৯৪২ সালে আমাদের হাতে প্রচুর কামান থাকা দরকার। কিন্তু পোলাণ্ডে কি ঘটেছিল তা আপনি দেখেছিলেন। জার্মানদের হাতে কী পরিমাণ যান্ত্রিক বাহিনী আছে তাও অজানা নয় আপনার। রণাঙ্গন ভেদ করে তারা কখন এক বৃত্তাংশে এসে হাজির হবে কেউ বলতে পারে না। তবু শুনলাম ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামানের উৎপাদন বাড়ানো তো হয়ইনি, বরং কমানো হয়েছে। কেন? কারণ সমস্ত শ্রমিককে বন্দী-শিবিরে পাঠানো হয়েছে। এ আমি নিজের চোখে দেখেছি। তারা থলে বানাচ্ছে। তবু ভাল, চকোলেটের বাক্স বানাচ্ছে না। গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করলাম। ও বলে, '১৯৪২ সালের আগে নয়।' মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এ ভয়ানক সাংঘাতিক অবস্থা। ভাল ভাল মজুরদের গ্রেপ্তার করে কি লাভ হবে?...'

ভয়ানক চটে উঠল তেসা, 'ফুজের কথা শোনা আপনার অন্যায়। কেবলমাত্র কমিউনিস্টদেরই বন্দী-শিবিরে পাঠানো হচ্ছে। সমরবিদ্যা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। আপনিও রাজনীতিতে মাথা গলাতে আসবেন না!'

'এর সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক? শুধু কামান আর বিমানবহরের কথা বলছি আমি।'

তেসা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরে এক পাক ঘুরে নিল। তারপর জুরীকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা দেওয়ার ভঙ্গীতে হাত উঁচু করে কর্কশ গলায় বলল, 'জেনারেল, সে দিন আপনাকে গির্জায় উপাসনা করতে দেখলাম। সত্যি বলছি, দেখে ভয়ানক

আশ্চর্য হয়েছিলাম। আমি নিজে একটি নাস্তিক পরিবারে মানুষ হয়েছি কিন্তু ধর্মকে আমি শ্রদ্ধা করি; একজন ধর্মাশ্রয়ীর আবেগকেও আমি গভীরভাবে অনুভব করি। বলুন, আপনি একজন ক্যাথলিক হয়েও কী করে কমিউনিস্টদের সহ্য করতে পারেন?'

'কমিউনিস্টদের সমর্থন করছি না আমি। সমস্ত সৈন্যবাহিনীর দায়িত্ব আমার কাঁধে। এর সঙ্গে ধর্মেরও কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু এর জন্যে দায়ী হবে কারা? আমরা সমরবিদরা। আমি জার্মানদের ঘৃণা করি। বুঝতে পারলেন? তারা এই পারীতে পর্যন্ত হামলা করতে পারে। সুতরাং, যদি যুদ্ধাস্ত্রের জন্যে কারখানা চালু রাখতে হয়, তবে শুধু কমিউনিস্ট কেন শয়তানকে পর্যন্ত বহাল করতে রাজী আছি।'

'অকারণে আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন,' তেসা বলল, 'ভুলে যাচ্ছেন যে এ যুদ্ধ অন্যান্য যুদ্ধের মত নয়। এ অনেকটা প্রায় 'সশস্ত্র শান্তির' মত। জানি না, গামলাঁ্যা কেন হ্বার্নট জঙ্গলে মিছিমিছি কতকগুলো লোকের জান খোয়াল। এমনিতে ফ্রান্সের জন্মের হার ভয়ানক নীচে। আমাদের দ্বিগুণ মিতব্যয়ী হতে হবে। জাঁকজমক দেখাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত বড় বেশী খরচ করে ফেলব আমরা। তাছাড়া যুদ্ধের ভাগ্য সম্পূর্ণ অন্যভাবে নির্ধারিত হবে। আমাদের একমাত্র অস্ত্র হল অবরোধ। তারপর বৃটিশরাই এর ঝুঁকি পোয়াবে। জার্মানরা দেখে দেখে বৃটিশদের জাহাজই ডুবিয়ে দিচ্ছে। এতো আমাদেরই সুবিধা। ইংলণ্ড অত্যন্ত ক্ষতবিক্ষত হয়ে স্বস্তি-সম্মেলনে এসে উপস্থিত হবে। অবরোধের ফলে রীতিমত চাপ পড়বে। আমরা আরও ইস্ক্রুপ কষবো। খুব বেশী নয় যদিও। জার্মানদের একেবারে মরিয়া করে তোলা ভুল হবে। তা করলে তারা হয়ত সত্যিই ম্যাজিনো লাইন আক্রমণ করে বসবে। তাদের একটু ভয় পাইয়ে দেওয়া দরকার, তারপরে আপনিই পথে আসবে। আমরা জার্মানীর সঙ্গে কেন লড়ছি? এ এক মারাত্মক রকম ভুল বোঝাবুঝির ফল। মাফ করবেন, চিরকালই আমি নিজের মনের কথা খুলে বলি। একেবারে পেছনে থাকবে সৈন্যবাহিনী। সেনাপতিরা নয়, কূটনীতিকরাই এই যুদ্ধ জিতিয়ে দেবে।'

এর পর যখনই সে মন্ত্রীর সঙ্গে তার কথোপকথনের কথা উল্লেখ করত, চিৎকার করে উঠত দ্য ভিসে, 'ও চাকরের মত ঘর থেকে বার করে দিল আমায়; বলল, ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার! ওরা আমেরিকা থেকে

অস্ত্রশস্ত্র কিনবে না। ওতে নাকি ভয়ানক খরচ। এখানেও কোন মাল তৈরী করবে না ওরা। মজুররা নাকি সব কমিউনিস্ট। এমন কি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির দরকার নেই ; সৈন্যরা বসে বসে ঝিমোবে। কী চায় ওরা? ওদের কাণ্ড কারখানা বোঝাই ভার।'

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা দেশের লোকদের উদ্দেশ্যে তেসা বেতার-বক্তৃতা দিল। মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে তার কেমন বিশ্রী লাগে! এখানে শ্রোতাদের সেই চাক্ষুষ উপস্থিতি কোথায়, উচ্ছ্বাসে যাদের চোখ জ্বলে ওঠে আর আর্দ্র হয়ে ওঠে বারবার। বেতারের একটি কর্মচারীকে দিয়ে সে তার পুরনো সংবাদবাহককে ডেকে পাঠাল।

'মোরিস, যতক্ষণ আমি বক্তৃতা দেব ততক্ষণ বসে থাক এখানে। সত্যিই তোমার মুখ দেখে অনুপ্রেরণা পাই আমি।'

মোরিস হাসল, তারপর একসময়ে বসল। সাড়ম্বর হাসি হেসে তার অভিভাষণ আরম্ভ করল তেসা :

''অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পেরিয়ে এবার আমরা সত্যিই অত্যন্ত গুরুতর কাজে হাত দিয়েছি। এ যুদ্ধ বিংশ শতাব্দীর এক বৃহত্তম অভিশাপ। শ্রেষ্ঠ নৈতিক সম্পদ ও খ্রীষ্টান মানবতাকে বাঁচানোর জন্যে আমরা অস্ত্র উঠিয়েছি ; বর্বর যান্ত্রিক শক্তিকে আমরা পোষ মানাবো। মারাত্মক অস্ত্র আছে আমাদের হাতে। যুদ্ধের কোন গোপন খবর প্রকাশ করে ফেলবার ভয় না রেখে আমি বলছি, এর আগে সত্যিই ফ্রান্সের আকাশ এত শক্তিশালী বিমানবহর দিয়ে ঢাকা ছিল না। এর আগে কোন দিন আমাদের দেশের মাটি এমনি বিরাটাকার জঙ্গী ট্যাঙ্ক-বাহিনীর গর্জনে কেঁপে ওঠেনি। ভারী ভারী অস্ত্রশস্ত্রের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে আমরা দিন রাত অবিশ্রাম পরিশ্রম করছি। এই কাজে সাহায্য করছে আমাদের মহানুভব বন্ধু বৃটিশরা এবং অ্যাটলান্টিক পারের গণতন্ত্রবাদীরা। কিন্তু আমাদের প্রকৃত শক্তি হল আমাদের মনোবল ও বন্ধুভাব যা আমাদের প্রত্যেকটি দল ও শ্রেণীর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে, আমাদের ঐক্য এবং ইচ্ছাশক্তি যা আমাদের জয়যুক্ত করবে। সভ্যতার অভিশপ্ত শত্রু যত দিন না ধ্বংস হচ্ছে ততদিন অস্ত্র কোষবদ্ধ করব না আমরা।'

মোরিস নড়তে চড়তে ভয় পাচ্ছিল।

সে কৃত্রিম হাসি হাসছিল চেয়ারের এক ধারে বসে...ছবি তোলানোর সময়ে যেমনি ভাবে হাসে লোকে।

৬

সৈন্যবাহিনীর হেড-কোয়ার্টার বসল অর্থশালী আলসেশিয়ান শিল্পপতির পল্লী-প্রাসাদে। সংগীত-ভবন আর বিলিয়ার্ড-ঘর শুদ্ধ প্রকাণ্ড বাড়ী; সন্ধ্যাবেলা সরকারী কর্মচারীরা এখানে চিত্তবিনোদন করতে আসত। এখন লাইব্রেরী-ঘরে অফিসাররা বসে বসে মানচিত্র অধ্যয়ন করছে। সম্পাদকদের কামরা যা কিছু দিন আগে পর্যন্ত শিশু-সদনের কাজে ব্যবহৃত হত, একাধিক টাইপ-রাইটারের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ঠিক মিকি-মাউসের ছবির নীচে বসে বসে কাজ করছে স্টেনোগ্রাফার-সম্পাদক লুসি। ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নেওয়ার খেয়াল হয়নি কারও। মেয়েটির মাথায় খড়ের রঙের চুল এবং বেগুনী রঙের টানা-টানা ভুরু। সেনাপতির প্রিয়পাত্র মেজর লেরয়ের চোখ আছে মেয়েটির ওপর।

বাড়ীর মালিকের খুঁটিনাটি জিনিসের ভয়ানক শখ। যে লেখবাব টেবিলে সেনাপতি লেরিদো কাজ করে সেখানকার কালির দোয়াতের আকৃতি ঠিক পিসা টাওয়ারের মত, কোপেনহেগেনের চিনেমাটির তৈরী পেঙ্গুইন পাখী, এবং দেওয়াল ঘড়ি যার ডায়ালে পারী, সান ফ্রান্সিসকো ও টোকিওর সময়ের নির্দেশ একই সঙ্গে মেলে। কাজ করতে বসে ভেঙে যাবার ভয়ে সেনাপতি প্রায়ই পেঙ্গুইন পাখীটাকে পাশে সরিয়ে রাখে। কোন কিছু নষ্ট হওয়ার দৃশ্য চোখের ওপর দেখতে পারে না সে। কাঠের নক্‌শা আঁকা মেঝের ওপর এক ফোঁটা কালি পড়তে দেখলে বা সৈন্যদের বুট দিয়ে মাড়াতে দেখলে সে ভীষণ চটে ওঠে।

কারও কারও মনে হতে পারে যে এমনি প্রকৃতির লোকের পক্ষে জীবনে অন্য পথ নেওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু আসলে লেরিদোর পরিবারের সমস্ত লোকই সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছে। ১৯১৪ সালে লেরিদো একটা রেজিমেণ্ট পরিচালনা করত। কৃতিত্ব দেখানোর ফলে তাকে সেনাপতির পদে তুলে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। শীর্ষস্থানীয় ও অধীনস্থ লোকদের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হয় এ সম্বন্ধে তার দক্ষতা অনস্বীকার্য। সে নিজে থেকে কখনো সামনের দিকে এগোত না। তার ধারণা, সে ফশের শিষ্য। সে প্রায়ই বলে, 'স্থিরতা ও মাত্রাজ্ঞান—এ দুটো গুণ আমাদের সব চেয়ে অপরিহার্য।' সব

সময়ে অমায়িক, পরিচ্ছন্নভাবে দাড়ি কামানো আর ও-ডি-কোলোনের গন্ধ সারা গায়ে। বলতেই হবে সেনাপতি হিসেবে সে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও পরিচিত। তার একমাত্র অসুবিধা যে সে ক্ষুদ্রাকার। সেজন্যে কেউ তার পাশে দাঁড়ালে সে কখনো ফটোগ্রাফারদের তার ছবি তুলতে দেয় না।

তার সাফল্যের জন্যে দায়ী তার কৌশল। ডেপুটিদের সে ঘৃণা করে কিন্তু কেউ তার উপস্থিতিতে রাজনীতি আলোচনা করলে সে উত্তর দেয়, 'দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ওপর আমার অবিচলিত আস্থা আছে।' ব্রতৈল, দুকান ও ভাইয়ার, সকলের সঙ্গেই তার সদ্ভাব। মার্নের সাফল্যের পেছনে পঁচাত্তর মিলিমিটার কামানের কীর্তি বা ক্লাশিকাল কবিতার সৌন্দর্য—এই নিয়ে তাদের সঙ্গে সে মনের আনন্দে কথা বলে। সাহিত্যের ওপর তার অগাধ আগ্রহ! রাসীন ও কর্নেই-এর রাজসংস্করণ কিনেছে সে। ত্রিশ বছর আগে সে এক প্রাদেশিক পত্রিকায় 'স্ত'ধালের কতকগুলো ভুলত্রুটি' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছিল। সমর-বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শাত্র্যাস্ দ্য পার্ম্ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছিল প্রবন্ধটিতে।

লেরিদো তার বৃত্তিকে ভালবাসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের অরাজকতা দেখে হতাশ হয়ে পড়ে সে। যুদ্ধের গোড়ার দিকে যা অত্যন্ত নিখুঁত বলে মনে হয়েছিল তা যেন হাজার রকম ঘটনার মধ্যে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আর গত তিন মাস থেকে সে যেন ক্রমশ কেমন রোগা আর বুড়ো হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে কেমন একটা যন্ত্রণা হয়, ডাক্তার বলে তার লিভার খারাপ। সত্যিই রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে লেরিদো। সব কিছুতে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে। ওই অতটুকু ছোট্ট তার লড়াইয়ের এলাকা—এর মধ্যে এত সৈন্যকে কী কাজে লাগাবে সে? সে ক্রমাগত নালিশ জানাতে লাগল, 'আসলে আমাদের বিপদ হল আমাদের সৈন্যের সংখ্যাধিক্য।' খোলা আকাশের নীচে কাতারে কাতারে শুয়ে রইল মানুষ এবং নভেম্বর মাস জুড়ে এল ইনফ্লুয়েঞ্জার হিড়িক। অফিসাররা তাদের সৈন্যদের পেট পুরে খাওয়াল কিন্তু কোন কাজের নির্দেশ দিল না। বিরক্ত হয়ে মদ খাওয়া ধরল সৈন্যরা। যখন লেরিদো শুনল যে গামর্ল্যা সিগফ্রিড লাইন আক্রমন করার জন্যে প্রচুর ভারী ভারী যুদ্ধাস্ত্র মজুত করছে, সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অফিসারদের হাতে একটা রিভলবার পর্যন্ত নেই।'

হেড কোয়ার্টারের প্রাত্যহিক রুটিনের ওপর লেরিদোর কড়া নজর। প্রত্যেকে ভোর ছটায় ওঠে। কর্নেল মোরো তাদের হাজিরা নেয়। লেরয় বসে বসে ক্লান্তিকর খবরের কাগজ পড়ে নয় তো সম্পাদকদের কামরায় গিয়ে উঁকি মারে—লুসি হয়ত তখন আঙুল চালাচ্ছে তার যন্ত্রের ওপর। মেজর জিসে কমিশেরিয়ট অফিসারদের উৎসাহ-বাক্য শোনায়। কর্নেল জাভৎ বসে বসে মানচিত্র দেখে। স্বপ্নপ্রবণ কেশহীন ক্যাপ্টেন সাঁজে পারীর কাফেগুলোর কথা মনে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর সেনাপতির কাছে খবর পাঠায়ঃ 'জুইন্‌কারে দুজন সৈন্য নিহত হয়েছে......ষোড়শ ডিভিশনের সামনের দিকে শত্রু-সৈন্য চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। জার্মানরা ১৮৬ তম রেজিমেণ্টকে ফ্রণ্টে পাঠিয়েছে।......গতকাল কোন শত্রু-বিমান লক্ষ্য করা যায়নি। তানভিলে একটা যৌন-ব্যাধি হাসপাতাল খোলা হয়েছে।' পেঙ্গুইন পাখীটা পাশে সরিয়ে রেখে সেনাপতি বিড়বিড় করে, 'তাইতো!' তারপর বারোটার সময় সবাই লাঞ্চ খেতে বসে।

সেদিন স্ট্রাসবুর্গের নতুন খাবার পরিবেশন করা হলঃ 'পাতে দ্য ফোয়া গ্রা।' কর্নেল মোরোর মতে এ হল স্থানীয় দেবতাদের উপহার। সেনাপতি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল; ডাক্তার তাকে পথ্য দিয়েছে। নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে সে বলল, 'তোমার জন্যে সব্‌জিই সব চেয়ে উৎকৃষ্ট খাবার। বয়স হলে মানুষ ঘাস-খেকো জন্তু হয়ে যায়। এটা প্রকৃতির আর একটা নিয়ম।'

ক্যাপ্টেন সাঁজে অপরাধীর মত এক টুকরো সুস্বাদু 'পাতে' মুখে পুরে দিল। বলল, 'সত্যি কথা।'

নিরামিষাশী হিটলার সম্পর্কে ওরা কথা বলল। সেনাপতি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলে চলল, 'তাইতো! বড় মজার ব্যাপার কিন্তু।' এর পর মেজর লেরয় সংবাদপত্রের মতামত জানাতে লাগল।

ফিনল্যাণ্ড তখনকার প্রধান আলোচনার বিষয়। প্রত্যেকে অবাক হয়ে দেখছে শেষ পর্যন্ত রুশরা কি করবে!

সেনাপতি হঠাৎ সজীব হয়ে উঠল, 'সত্যিই কী মজার ব্যাপার! ওরা হয়ত সাঁড়াশী আক্রমণ শুরু করবে; বথনিয়া উপসাগর দিয়ে এসে সুইডেন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেবে হেলসিঙ্কিকে। আবার মানারহাইম লাইনের ওপরও সোজাসুজি হামলা চালাতে পারে। আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে ওরা কি করে।' ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধ তার কাছে একটা

সামরিক সমস্যা। এক সময়ে সেনাপতি আবার পারীর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের মধ্যে ফিরে এল, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলল ম্লানমুখে: 'তারপর আমাদের দেশের কী খবর?'

'অত্যন্ত সামান্য। সেন্সার 'লেপোক্'-এর গলা টিপে ধরেছে।'

'ঠিক হয়েছে। এ নিশ্চয়ই কেরেলি বা তুকানের কোন প্রবন্ধ। বুঝি না কেন যে ওদের লিখতে দেওয়া হয়।'

কর্নেল মোরো জেনারেল পিকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং তারা দুজনেই তুকানকে ঘৃণা করে।

'পারী থেকে ওরা লিখেছে যে তুকান্ এখানে আসতে চায়,' কর্নেল বলল, 'যেন ও ছাড়া কাজ চালাতে পারছি না আমরা।'

ক্রুদ্ধ হলেই সেনাপতি সর্বদা জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটে। এখনো ঘন ঘন ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'কক্ষনো নয়! দালাদিএ এ ধরনের উপকার না করলেই ভাল করবে। তুকান সকলের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দিতে ওস্তাদ। আমি নিজে ওকে বলতে শুনেছি, 'জার্মানরা এই বসন্তকালেই প্রকাণ্ড হামলা শুরু করবে।'. ওসব লোকের কাছ থেকে তুমি কি আশা করতে পারো? এক সময়ে ও ছিল বৈমানিক কিন্তু সমরবিদ্যার ব্যাপারে ও এক আকাট মূর্খ। ও সময়ের অনেক পেছনে রয়েছে; কোন কিছু খতিয়ে দেখার ক্ষমতা ওর নেই। ওর ধারণায় ম্যাজিনো লাইন হল এইন বা সম নদীর ধারের দুর্গগুলির মত একটা কিছু।' অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে একটা পেয়ার ফল বাছাই করল; তার সর্বাঙ্গ হাত দিয়ে পরীক্ষা করে দেখল ফলটা বেশ রসালো কি না। তারপর ফলের ছুরি দিয়ে খোসা ছাড়াল; রসের ফোঁটাগুলো মুছে ফেলল হাত থেকে। 'দেখেছ, ছুরিটা কি ভাবে যাচ্ছে, যেন মাখন। পেয়ারটা নিশ্চয়ই খুব সুস্বাদু হবে......চেখে দেখবে নাকি, মেজর?' পেয়ারের আধখানা টুকরো সে সাঁজের হাতে তুলে দিল। 'তুকানের বুকুনির মধ্যে সোজাসজি জেনারেল দ্য গলের প্রভাব ধরা পড়ে। আমি নিজে দ্য গলের রিপোর্ট পড়েছি। গামর্ল্যার কথাই ঠিক, ও হল বিচিত্র লোক। কিছুতেই ও বুঝবে না যে জার্মানরা ধাপ্পা দিচ্ছে। পোলাণ্ড এবং স্পেন যেখানে এ্যানার্কিস্টরা সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, এবং আমাদের ফ্রন্ট......সব কিছু এক সঙ্গে জগাখিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে সে। যাই হোক, এটা অত্যন্ত খারাপ কথা যে জনসাধারণ সমর-বিজ্ঞানের বইগুলো

না পড়ে খবরের কাগজের উত্তেজনাপূর্ণ মালমশলা থেকে খোরাক সংগ্রহ করছে। ছ গলের ধারণা, ও নিজে একজন মস্ত বড় প্রতিভাবান লোক কিন্তু আসলে ও অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির। ওর মন পড়ে রয়েছে সিড্যান বা নেপোলিয়ঁ আমলের সমরবিদ্যার ওপর। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা ও ভুলে গেছে। ও কল্পনা করছে ইউরোপের মধ্যে ট্যাঙ্কের বৈদ্যুতিক অগ্রগতির কথা যেখানে একদিন দ্রুত অশ্বারোহী খুরের দাগ এঁকে গেছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক যুদ্ধের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আমরা বিলম্বিত অবরোধের কৌশল গ্রহণ করেছি। এ হল ট্রয়ের যুদ্ধের যুগ; তাই নয়?'

রীতিমত যত্নের সঙ্গে ন্যাপকিনটা পাট করে রিং-এর মধ্যে গলিয়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। ড্রয়িং-রুমে কফি পরিবেশন করা হয়েছে।

'সেনাপতি ম-নে আপনাকে টেলিফোনে ডাকছে।' কর্নেল মোরো বলল, 'ডাইভ বমিং সম্বন্ধে সৈন্যদের কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে ওরা কিছুটা কৃত্রিম যুদ্ধের আয়োজন করতে চায়।'

'কৃত্রিম যুদ্ধ' কথা দুটো লেরিদোকে শান্তির সময়ের কথা মনে করিয়ে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভুরু কোঁচকাল সে: বোধহয় আবার একটা গোলযোগ বাধাবার তালে আছে ম-নে। আসলে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে ও। প্রত্যেককে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার একটা কুৎসিত চেষ্টা ওর মধ্যে চোখে পড়ে।

'নগর-কর্তা কিন্তু এর একেবারে বিরুদ্ধে,' মোরো বলে চলল, 'কারণ মানস্টারের পর আর কোন লোকই গ্রাম ছেড়ে চলে যায়নি। তাছাড়া চাষীরা ভয় পাচ্ছে—ওদের আঙুর ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হবে।'

মাথা নাড়ল সেনাপতি। 'নগর-কর্তার সঙ্গে আমি একমত,' সে বলল, 'বিশেষ করে আলশেসিয়ানদের প্রতি আমাদের ভদ্র হওয়া উচিত। এ একটা পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ডাইভ বমারের আশঙ্কার কথা মানলাম, কিন্তু সে কোথায়? পোলাণ্ডে কিংবা স্পেনে, যেখানে একটিও বিমান-ধ্বংসী কামান নেই। জার্মানরা কোন বিষয়ে এতটুকু ইঙ্গিত দিলেই এই সব মূর্খ লোকেরা লাফালাফি শুরু করে দেয়। গুজব শুনলেই ভয়ে সারা। সেনাপতি ম-নে জেনে রাখুন যে সাধারণ কসরৎ করলেই চলবে, আর বেশী কিছু দরকার নেই। তাছাড়া লোকদের একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার।'

লাঞ্চ খাওয়ার পর জেনারেল ও ক্যাপ্টেন সাঁজে সামরিক ঘাঁটি পরিদর্শনে

বার হল। শিল্পপতি ম্যিয়েজারের ছেলে লেরিদোর গাড়ীচালক। ছেলেটি অত্যন্ত খেলোয়াড় মনোভাবাপন্ন। বাবার প্রভাবে খাস হেড-কোয়ার্টারে কাজ পেতে কষ্ট হয়নি। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মোটর এগিয়ে চলল। ম-নে ক্রমাগত মনে করিয়ে দিল, 'অত তাড়াতাড়ি নয়, বুঝলে বন্ধু, অত তাড়াতাড়ি চালিও না গাড়ী।'

গাড়ী-চালকের সঙ্গে কথা বলতে লেরিদো ভালবাসে। আশে পাশে কি ঘটছে না ঘটছে সে বিষয়ে সমস্ত কিছু জানে শোনে তরুণ ম্যিয়েজার।

'তারপর, আর কি খবর?'

'তেমন কিছু না, জেনারেল। মানস্টারের একজন উকিলের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। ও পেরিগো থেকে নিজের মালপত্তর নিতে এসেছিল। ও বলল, রসেৎ ঘটনায় ভয়ানক খারাপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে আলশেসিয়ানদের মনে।'

'আমি ঠিক যা মনে করেছিলাম তাই।' লেরিদো সাঁজের দিকে তাকাল, 'পারীতে ওরা একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি রসেতের সঙ্গে জার্মান গুপ্তচর বিভাগের যোগাযোগ থাকলেও তা এখন বাইরে জাহির করা উচিত হয়নি। এখন রাজনীতিক কলহ বাড়িয়ে কী লাভ হবে?'

জেনারেল গাড়ী-চালকের দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কর্নেলকে তুমি ঘাঁটিতে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'আমরা আরস্টিনে গিয়েছিলাম। মেজর লেসেজ নালিশ জানাল যে ওখানকার সৈন্যরা নাকি শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

ম্যিয়েজারের ইচ্ছা, লোকেরা কিভাবে মেজর লেসেজের সর্বাঙ্গে গোবর লেপে দিয়েছিল সে কাহিনী খুলে বলে, কিন্তু সে নিজেকে কোন মতে সংযত করল; গল্প শুনে হয়ত ক্ষেপে উঠবে জেনারেল। বেচারী লেসেজ—কি-ভাবে আর্তনাদ করে উঠেছিল সে কথা ভেবে মনে মনে রীতিমত হাসি পেল ম্যিয়েজারের।

'তুমি কি করতে পারো?' লেরিদো বলল, 'ওরা সত্যিই ভয়ানক বিরক্ত হয়ে উঠেছে। ওদের জন্যে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করতে হবে।'

স্ট্রাসবুর্গের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। সমস্ত শহরটা কেমন জনশূন্য। গত আগস্ট মাসের পুরনো খবরের কাগজগুলো এখনো ঝুলছে কিয়স্কের জানলার পেছনে। কাফেগুলোর মেঝের ওপর মার্বেল-টেবিল আর বেতের চেয়ারগুলো খদ্দেরের জন্যে অপেক্ষা করছে। গির্জার সামনের বারান্দায়

বালির বস্তার স্তূপ। পার্কের ঘড়িগুলোর প্রত্যেকটিতে আলাদা আলাদা রকম সময়। দোকানে লিলাক রঙের ড্রেসিং গাউন ঝুলতে দেখে হু হু করে উঠল জেনারেলের মন—সত্যিই সোফিরও এমনি ড্রেসিং গাউন ছিল একটা। চার বছর হল সে তার দ্বিতীয় বৌ-কে বিয়ে করেছে......আমি ডাক্তারের একটি যুবতী মেয়ে। ছাব্বিশ বছর বয়সে সোফি রীতিমত বিচক্ষণ হয়ে উঠেছে। লেরিদো বাড়ীতে থাকলে সকলে নিঃশব্দে চলাফেরা করে; সোফি স্বামীর জন্যে তার অত্যন্ত প্রিয় খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত থাকে......বাছুরের মাথা দিয়ে আ লা ভিনেগ্রেৎ। তার বৌ কর্সিকান চামেলীর সুগন্ধ ভালবাসে; আর ভালবাসে এক সঙ্গে অনেকটা সুগন্ধ ব্যবহার করতে।

উৎরাই-এর একধারে একটা চুড়োর ওপর পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র, গাছের ডালপালা দিয়ে ঢাকা। লেরিদো দুরবীণ দিয়ে দেখল, একটা বাক্সের কাছাকাছি কতকগুলো সৈন্য দাঁড়িয়ে আছে। স্বভাবতই সে ভাবল যে ওরা শত্রু। তারপর তার চোখে পড়ল একটা বিরাট দেওয়াল-পত্র, তাতে লেখা আছে, 'ফ্রান্সবাসীগণ, ইংলণ্ড তোমাদের দেশের শত্রু!' পাশে হিটলার ও জোয়ান অফ আর্কের ছবিতে লেখাটা ঢাকা পড়েছে। 'ইস্, কী অভদ্র!' ভ্রূভঙ্গী করে লেরিদো বলল। সামরিক কাজকর্মের বদলে ওরা প্রচার করতে নেমেছে। যেন যুদ্ধ একটা নির্বাচনী প্রোপাগাণ্ডা। আরও এগিয়ে তার চোখে পড়ল বাদামী চালাওলা ঘর, পুরু নীল ধোঁয়া আর আঙুর-ক্ষেত। সত্যিই অবর্ণনীয় দৃশ্য! এ এক আশ্চর্য রকম যুদ্ধ স্বীকার করতেই হবে। মনে মনে কল্পনা করা যায় যে সৈন্য-চলাচল শুরু হয়ে গেছে...... দূরের অশ্বারোহী বাহিনী নদী অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে। ১৯১৬ সালে সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল যুদ্ধের চেহারা। পেরনের বীভৎস ধ্বংসের কথা এখনো তার মনে আছে, মনে আছে পাথরের স্তূপ, খানা-খন্দ আর মৃত মানুষের অস্থি-কঙ্কালের দৃশ্য। এবার কিন্তু সে রকম কিছু ঘটবে না। সেবার আমরা যুদ্ধে গিয়েছিলাম গান গাইতে গাইতে, লাল পায়জামা পরে। এবার ম্যাজিনো লাইন আমাদের প্রতিরোধ-দুর্গ।

কর্দমাক্ত পথে হাঁটতে লাগল লেরিদো। মাটিতে কেমন একটা সোঁদা গন্ধ। মেঘের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে এল শীতকালের ম্লান সূর্য। হঠাৎ সংগীতের ঝংকার কানে এল...সুবার্টের সংগীত। সোফিও এই গৎ বাজাতে ভয়ানক ভালবাসত।

'কী ওটা ?' সে জিজ্ঞাসা করল।

রেজিমেণ্টাল কমাণ্ডার বলল, 'ওটা লাউড স্পীকার। সংগীত দিয়ে আমরা জার্মান প্রোপাগাণ্ডাকে ডুবিয়ে দিচ্ছি। শত্রুপক্ষও এই পরিচিত সংগীত শুনছে। আমরা ওদের দেখিয়ে দিচ্ছি যে জার্মানদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা নেই আমাদের।'

'সত্যিই, বড় চমৎকার পরিকল্পনা কিন্তু।' লেরিদো বলল।

'অনেকে প্রস্তাব করেছে যে এই সংগীতের মাঝখানে আমাদের জার্মান ভাষায় সংক্ষিপ্ত আবেদন জানানো উচিত। ২৭নং ডিভিসনে ওরা এমনি বক্তৃতা করছে। কিন্তু এ প্রস্তাব পছন্দ হল না আমার।'

'তুমি ঠিক কথাই বলেছ। যুদ্ধ যুদ্ধই। রাজনীতি নিয়ে রাজনীতিকরাই মাথা ঘামাক। এই কনসার্ট কি সারাদিন ধরে চলে ?'

'আজ সকালে কিছুটা কামান-যুদ্ধ হয়েছিল, সাতটা থেকে সাতটা চল্লিশ পর্যন্ত। ওদের কামানগুলো......'

'জানি, ও সব জানা আছে আমার। কেউ হতাহত হয়েছিল নাকি ?'

'তিনজন মারা গেছে, আর একজন সার্জেণ্ট মারাত্মক চোট পেয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ মনে হল। রাইনের ওপার থেকে ভেসে এল ফরাসী গান :

ওরা তোমায় বিক্রি করে
দিয়েছে যে আড়ালে আবডালে
ইংলণ্ড তার কামান পাঠায়
আর, ফ্রান্স তার বুকের রক্ত ঢালে।

২৭নং ডিভিশনের হেড-কোয়ার্টারের দিকে তারা অগ্রসর হল। ওরা রাজনীতিক প্রচারকার্য নিয়ে মাতামাতি করছে কিনা তা জানার জন্যে লেরিদো অত্যন্ত উৎসুক। সকালের দিকে আরস্টিনের কাছাকাছি একটা জার্মান জঙ্গী বিমান ভেঙে পড়েছে—একথা শুনে লাউড স্পীকারের কথা একেবারে ভুলে গেল সে। বিমানচালক মারা গিয়েছে এবং মৃতদেহের সঙ্গে যে দলিলপত্র পাওয়া গিয়েছে তাতে জানা যায় যে বিমানচালকটির নাম লেফটেনেণ্ট কার্ল ফন সিরাউ।

লেরিদো শবদেহ নিয়ে একটা জমকাল শোভাযাত্রা বার করার নির্দেশ দিল।

'এই হল আসল প্রচারকার্য !' সে বলল, 'আমরা দেখিয়ে দেব যে, শত্রুকে

কি করে সম্মান করতে হয় তা আমরা জানি। আমি গিয়েই কর্নেল মোরোকে পাঠিয়ে দেব।' এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লেরিদো, 'তুমি ফন সিরাউ বললে, না?......ফন......নিশ্চয়ই সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে ও। এর একটা দারুণ প্রতিক্রিয়া হবে জার্মানীতে। আমি নিজেও আসতে চেষ্টা করব।'

হাসপাতাল পরিদর্শন করে সে সৈন্য-ব্যারাকে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সৈন্যরা তাড়াতাড়ি কোট চাপা দিল তাদের ওপর।

'তারপর, কি হে তোমরা খুব বিশ্রাম নিচ্ছ, না?'

'হ্যাঁ, জেনারেল।'

আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে লেরিদো বেরিয়ে গেল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় তার কানে গেল, 'হাঁদারাম!' এর আগেও একবার পারীর রাস্তায় সে এমনি অপ্রীতিকর সম্বোধন শুনেছিল কিন্তু তার সামনে কেউ তাকে নিয়ে তামাসা করতে সাহসী হবে এ কথা কল্পনা করতেও পারেনি সে। নিশ্চয়ই লোকটা কমিউনিস্ট না হয়ে যায় না। লেরিদো তার ঠোঁটে জিভ ছোঁয়াল। মনের দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল ক্যাপ্টেন সাঁজে—একটু আগে সে তিন দিনের ছুটির জন্যে আর্জি জানাবে ভেবেছিল।

ফেরার সময় সারাটা পথ অপমানের কথা ভাবতে ভাবতে এল লেরিদো। শাতোর হলঘরে একটা আয়না। আয়নার কাছ দিয়ে যাবার সময় জেনারেল ফিরে দাঁড়াল, ডেকে পাঠাল কর্নেল মোরোকে।

'২৭নং ডিভিসন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। তাদের দেখে অত্যন্ত খারাপ ধারণা হল। লোকদের শিক্ষা দেওয়ার বদলে ম-নে প্রচারকার্যের পেছনে সময় নষ্ট করছে। জার্মানদের কাছে রাজনীতিক বক্তৃতা পাঠাচ্ছে ও। হয়ত আশ্রয়প্রার্থী বা কমিউনিস্টদের বক্তৃতা। প্রধান সেনাপতির কাছে এখনই একটা রিপোর্ট পাঠানো দরকার আর তার একটা অনুলিপি পাঠাতে হবে দালাদিএর কাছে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কর্নেল। ভেবেছিল একটু বিলিয়ার্ড খেলবে—ফিরতি-ম্যাচ দেবে মেজর জিসেৎকে......একশো একশো করে ছুটো খেলা।

'ও আবার ঠোঁট চাটছে। কে নাকি ওকে হাঁদারাম বলেছে। গতকাল আমি ভাবলাম, ও বুঝি পারীতে চলে যাবে। কী এক জীবন!'

ছটা বাজল। লুসি বাদে খালি হয়ে গেল সম্পাদকের কামরা। সে এখনো

কাজ করছে। এক সময়ে সে টাইপ করা বন্ধ করল : 'ছ্যাবোয়া পিয়ের, সার্জেণ্ট' কাগজগুলো সে মুড়ে রাখল, টাইপরাইটারের ওপর একট আচ্ছাদন টেনে দিল এবং তারপর অত্যন্ত সযত্নে নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে ওপর তলায় উঠে গেল। মেজর লেরয় অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

'শ্রীমতী, কল্পনা করো আমরা ভেনিসে নৌকোবিহারে বার হয়েছি!'

৭

ভোর থেকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি নেমেছে, শীতকালের একঘেয়ে কনকনে বৃষ্টি। পীতাভ ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেমন বিরক্ত লাগে। পিয়ের তার জলে-ভেজা বাদামী বুটজোড়ার দিকে তাকাল। আবার সে ঘন ঘন কোন একটা জিনিসের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, কি যেন একটা খুঁজছে সে। কিন্তু কিছুই নজরে পড়ল না তার। এমন কি সে নিজেও মনে মনে কিছু ভাবছে না। তার চারদিকের ঘূর্ণমান জগতটাকে কেমন অস্পষ্ট আর অবাস্তব মনে হল তার কাছে। নিজের গায়ে আঁচড় কেটে চিৎকার করে সে প্রমাণ করতে চাইল যে সে ঘুমিয়ে নেই, জেগে আছে। কোন কিছুই ঘটল না। উনচল্লিশ নম্বরের পল্টনের প্রাইভেট হিসেবে জলে ভিজে ভিজে সে লিস্‌ত্‌-এর মহাকাব্য বা সার্জেণ্টের গালিগালাজ শোনে— মাঝে মাঝে কামানের হুমকি এসে বাধা দেয়। সমস্ত কিছুর মধ্যে কেমন একটা বিভীষিকা রয়েছে, কিন্তু পিয়ের সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত।

গত আগস্টের এক গরম দিনে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কেমন আরামে আড়মোড়া ভেঙেছিল সে। আনে কফি তৈরী করতে ব্যস্ত ছিল; ছুছু খেলা করছিল মেঝের ওপর, তার ছোট্ট বাদামী ঘোড়াটা দোল খাচ্ছিল ঝলমলে রোদের আলোয়। আজ সে সব কিছু স্মৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর থেকে কেমন একটা কুড়েমির মধ্যে ডুবে গিয়েছে। নিজের ইচ্ছেয় চলাফেরা পর্যন্ত করতে পারে না সে; কদাচিৎ সে কথা বলে। কোলাহল-মুখর জীবনের আবেদন আছে তার প্রকৃতির কাছে।

তার নিজের দেশে বছরের এ সময়টা গরম; ডিসেম্বরের ফুলে রঙিন হয়ে ওঠে গোলাপ গাছগুলো, দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায় মাউণ্ট কানিগোর উলঙ্গ

বাদামী চূড়োগুলো। একবার চূড়ো পর্যন্ত উঠেছিল সে। এখানে কিন্তু সারা দিন বৃষ্টি, আজ, কাল, পরশু—বৃষ্টির পরিসমাপ্তি নেই যেন। তারপর আবার আকাশের লাউড-স্পীকার থেকে গান ভেসে আসবে অপ্সরীদের—নোংরা পেঁজা তুলোর মত বিষণ্ণ আকাশ।

বাড়ী ছাড়ার আগে ছন্নছাড়ার মত ঘুরে বেড়িয়েছিল পিয়ের। আনে বুঝতে পেরেছিল ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাবে পিয়ের। তাই পালাবার পথ খুঁজছিল সে।

'পিয়ের, চল আমরা কোথাও চলে যাই। আমেরিকাতেই চলো। সেখানে কাজ জুটিয়ে নেব আমরা।' সে বলেছিল।

পিয়ের মাথা নাড়িয়েছিল, 'না, তাতে কারও কোন ভাল হবে না। তুমি কি ভাবছ, নিজেকে বাঁচাতে চাই আমি? সে সব বিগত দিনগুলো আর ফিরিয়ে আনতে পারব না আমরা।'

পপুলার ফ্রন্টের কথা মনে মনে ভাবছিল সে।

অতীতে সে ভাবত যে সে নিজে ঘটনার মধ্যে অংশ গ্রহণ করছে এবং সাধারণ দায়িত্বের মধ্যে তারও অংশ রয়েছে। এমন কি ভীইয়ারের বিশ্বাসঘাতকতার পরও সে বলতে পারত, 'হ্যাঁ, আমি উড়োজাহাজ পাঠাচ্ছি।' কিন্তু এখন সে কাঠুরের কুড়ুলের ঘা খাওয়া গাছ। আজ তার মৃত্যুও ঘটনার স্রোতকে এতটুকু স্পর্শ করবে না।

তার আসার দিন আনের সঙ্গে প্রায় একটা ঝগড়া বাধিয়ে ফেলেছিল সে। আনে উদ্বিগ্ন হয়ে ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কিন্তু তুমি এই-ই তো চেয়েছিলে...'

সে রাগ করে উত্তর দিয়েছিল, 'এ যুদ্ধ নয়! এ আমাদের যুদ্ধ নয়......'

আনে তফাৎটা বুঝতে পারেনি। তার কাছে যুদ্ধ যুদ্ধই..... গোলাগুলি, কাদা, রক্ত আর মৃত্যু। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর থেকে ভিন্ন—এ বিচার কোন্ ভিত্তিতে করবে পিয়ের? তার এই প্রচেষ্টার ঘোর প্রতিবাদ জানাবে আনে, বলবে, 'এ কেবল কথার প্যাঁচ, রাজনীতি, বাজির খেলা।' কিন্তু পিয়েরের কাছে এ হল বাস্তব সত্য। যুদ্ধযাত্রী সৈনিকদের মার্চ করার শব্দ কেমন ভিন্ন, কেমন আলাদা। কারও গলায় গানের সুর নেই এতটুকু। ধ্বংসের পথে চলেছে—এমনি ক্লান্ত আর বিষণ্ণ তাদের মুখগুলি। এতে কিছুমাত্র স্বস্তি পায়নি পিয়ের।

পিয়ের এখন বুঝল কী তাকে মিশো থেকে আলাদা করে রেখেছে। তাদের

পুরনো তর্ক-বিতর্কগুলো কিছুমাত্র আকস্মিক নয়। মিশো সত্যিই একটা সরল চরিত্র। সে ভেঙে পড়তে পারে এবং যদি পড়েই তো গতকাল জুল যেভাবে পড়েছিল তেমনি ভাবে পড়বে। কিন্তু মিশোকে বেঁকাতে পারবে না কেউ; সে হাসবে, চিৎকার করবে—'ঠিক তাই' এবং তারপর আবার নতুন করে বেঁচে উঠবে আক্রমণের ভেতর থেকে। এখন সে কোথায়? অসহায়ভাবে পড়ে পড়ে জলে ভিজছে? বন্দীশালায় আটক পড়েছে? তার সঙ্গে এখন কথা বলতে পেলে কেমন উল্লসিত হয়ে উঠত পিয়ের! যদিও মিশো কোন কাজে আসবে না তার। মিশো বলবে, 'সামনে তাকিয়ে দেখ। ঘটনার অনিবার্য গতি.........'

নিঃসঙ্গতার বোঝা মনে মনে অনুভব করল পিয়ের। মনে করল ব্রেতঁর একদল ধর্মপরায়ণ ও ভীরু চাষীদের মধ্যে বসে আছে সে। তাদের বলা হয়েছে যে সে নাকি একজন বিধর্মী এ্যানার্কিস্ট, স্পেনের বহু গির্জায় সে আগুন লাগিয়েছে। ব্রতৈলের 'বর্মধারীদের' মধ্যে জেনারেল এস্তেরেল অত্যন্ত খর্বকায়। কবিতার ওপর তার দারুণ ভক্তি। তার মতে দারিদ্রের মধ্যে রোমান্স আছে এবং ফ্যাশিজমের মধ্যে একটা 'গূঢ় জ্ঞান' লুকিয়ে রয়েছে। তার নিজের লোকদের প্রতি তার রীতিমত অবজ্ঞা, গায়ে ঘামের গন্ধ, অত্যন্ত ভাঙা-ফুটো ফরাসী ভাষায় কথা বলে, কাঁধের চওড়া ফিতের ওপর স্যাঁ গোয়েনলের প্রতিকৃতি। পিয়েরকে ভয়ানক ভয় করে এই লোকটা। অন্যান্য অফিসারদের সতর্ক করে দিয়েছিল এই বলে, 'ওর মত লোক তোমাদের দাগা দিয়ে গুলি পর্যন্ত করতে পারে।' পিয়ের ইঞ্জিনিয়ার, পিয়ের 'আতেলিএ' থিয়েটারে গিয়ে এলুয়ার-এর কবিতা আবৃত্তি করে—এ সব কথা ভাবতেই কেমন বিরক্তি লাগে তার।

দলের মধ্যে জুল-এর সঙ্গেই সে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ওরা দুজনই পারীর লোক। সৈন্যদলে যোগ দেওয়ার আগে গ্যাস কারখানায় কাজ করত জুল। হাসি-তামাসা করতে পাকা ওস্তাদ সে। পিয়েরকে বলত, 'অতটা মন খারাপ করলে চলবে না, বুঝলে বন্ধু। তাতে কোন লাভ হবে না তোমার। ঠিক কথা, মোরিস তোরে বর্তমানে নিশ্চয়ই কিছু ভাবছে। কিন্তু আমি কিছু সরানোর তালে আছি। এখানে চারদিকে মুরগীর নোংরা পড়ে রয়েছে। কিন্তু বহুকাল এক টুকরো অমলেট পর্যন্ত জোটেনি আমার কপালে।' পিয়ের হাসত যখন সে বলত, 'আমি একজন আশাবাদী। শুয়োরের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঘটনা-স্রোতকে বিচার করে দেখা যাক না। যুদ্ধের আগে ওরা সপ্তাহে সাতদিন শুয়োর কাটত।

এখন সোমবার আর মঙ্গলবার শুয়োরের মাংস বিক্রী বন্ধ। এই গতিতে গেলে আর একশো বছরের মধ্যেই শুয়োররা অব্যাহতি পেয়ে যাবে। বুঝতে পারলে?' মুহূর্তের জন্যে পিয়ের তার বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসত, হাসত। আর এখন সেই জুল আর বেঁচে নেই।

পিয়েরের চিঠিগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে ভেবে পায় না আনেকে কি লিখবে। বৃষ্টির কথা? জুলের ঠাট্টা-তামাসা? বা জুল মরবার সময়ে বার বার কি ভাবে 'সালগম' কথাটা উচ্চারণ করছিল তার কথা? কিংবা লেঃ এস্তেরেল সম্পর্কে—যে ভালেরির কবিতা পড়ে আর পথ চলতে গিয়ে কোন সৈনিকের কোট ছুঁয়ে ফেলবে সেই ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকে? আনের চিঠিগুলি পিয়েরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন এবং হুহুর হুষ্টুমির গল্পে ভরা। তাদের প্রত্যেকেরই পরস্পরের কাছে অনেক বক্তব্য বলার আছে কিন্তু তারা দুজনেই বোবা। পিয়ের প্রায়ই আনের কথা ভাবে। আনে যেন একটা সোজা পথ, যে পথ দিয়ে জুলাইয়ের ঝলমলে রোদের আলোয় পৌঁছনো যায়। এই পথ দিয়ে গেলে সে কোথাও না কোথাও পৌঁছবে। কিন্তু এখন সে চৌমাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে। কোন্ পথটা ঠিক তা বেছে নিতে পারছে না। বিপথে যেতে বসেছে সে।

লেঃ এস্তেরেল তাকে ডেকে পাঠাল। বলল, 'এটা ক্যাপ্টেন জেমিএর কাছে নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞা।'

বইটা হাতে তুলে নিল পিয়ের। লেফটেনেন্টের উদ্দেশ্য, তাকে খেলো করা। সে একজন কমিউনিস্ট এবং বোধহয় কেবলমাত্র গণ-কবিতাই পড়ে সে, সুতরাং হেঁটে হেঁটে যাক সমস্ত পথটা। গোলন্দাজদের শিবির এখান থেকে চার মাইল। ক্যাপ্টেন জেমিএ সাহিত্য রসিক; পড়ার জন্যে তাই সে চেয়ে পাঠিয়েছিল কিছু। বসে বসে কুড়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে কবিতার অভিধান সম্পাদনা করছিল।

পিয়ের একটা চালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে বই খুলে বসল। কবিতার বই। কবিতাগুলির রচয়িতা কে তা সে দেখল না, শুধু হঠাৎ একটা পাতা খুলে দুটো লাইন পড়ল:

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে,
তবু তো সে বাঁচবে, নাইবা
উঠল ফুলের মত ফুটে।

পিয়ের শব্দ করে বন্ধ করে দিল বইটা। মনে হল আনে যেন দেখা করতে এসে তার ভিজে গাল দুটো হাত দিয়ে স্পর্শ করেছে। কেমন উষ্ণ ওর হাত, কিন্তু ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরছে তার মুখ থেকে।

আঙুর ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে সে এগিয়ে চলল। বাগানটা একটা বিরাট ঝোপের মধ্যে ঢাকা। ডান দিকে গির্জা, আবহাওয়া যন্ত্রটা কবে ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে গির্জার চুড়ো থেকে। গোলা পড়ে একটা গর্ত হয়েছে, পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে পিয়ের ভাবল, 'খুব কাছেই গোলাগুলি ছুঁড়ছে ওরা।' তারপর রাস্তাটা ঘুরে গেল পিয়ের।

লাজুক আর ক্ষীণদৃষ্টি ক্যাপ্টেনের হাতে পিয়ের বইটা তুলে দিল; গোলন্দাজদের সঙ্গে বসে বসে নতুন টক মদ খেল এক মগ, তারপর ফিরে এল। বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। রোজকার চেয়ে এক ঘণ্টা আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছে লাউড স্পীকারগুলো। উৎরাই থেকে কামানের শব্দ আসছে কিন্তু কেউ জবাব দিচ্ছে না তার। কেমন নিস্তব্ধ সমস্ত রণাঙ্গণ! পিয়ের নিষ্প্রাণ গলায় আবৃত্তি করে চলল :

আনন্দের এই স্পর্শটুকু
ভাগ্যে তারও হয়ত যাবে জুটে......

সন্ধ্যার দিকে আনের চিঠি আসবে। গোলাঘরের খড়ের মাচানে গিয়ে উঠে বসবে পিয়ের। জায়গাটা কেমন ভ্যাপ্‌সা গরম; লাল চুলওলা ইভ্ নাক ডাকাচ্ছে মনের আনন্দে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। প্রতিদিন দুবার করে এমনি শব্দ হয় কিন্তু পিয়ের এখনো নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারেনি। অকস্মাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সমস্ত পৃথিবী যেন বদলে যাচ্ছে। এখনই আমাদের লোকরা জবাব দেবে। পিয়ের রাস্তার দিকে এসে স্যাঁৎসেঁতে মাটির ওপর বসে পড়ল। এক ঘণ্টা এইখানে বসে কাটাতে হবে তাকে। তারপর সন্ধ্যার দিকে চিঠি আসবে আনের কাছ থেকে!

দ্বিতীয় বিস্ফোরণের কথা জানতেই পারল না পিয়ের। সে মাটিতে শুয়ে পড়ল—গোলার ভগ্নাংশ এসে বিঁধেছে তার কুঁচকিতে। আধ ঘণ্টা পরে কয়েকজন গোলন্দাজ এসে তুলে নিয়ে গেল তাকে।

পিয়ের চোখ খুলতেই অনাবৃত বাতির আলো তার চোখে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটো বন্ধ করে দিল সে। ধীরে ধীরে তার মনে পড়ল সেই বই,

গোলন্দাজ, মদ আর গোলার কথা। তাহলে সে নিশ্চয়ই আহত হয়েছে... হয়ত মরে যাবে সে! না, সে ঘুমুচ্ছে না তো? ডান দিকে পাশ ফিরতে চাইল সে। এইভাবে শোওয়াই তার অভ্যাস। কিন্তু যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। তাহলে নিশ্চয়ই সে মরে যাবে। অনেকগুলি জরুরী কথা আছে যা তার মনে পড়া উচিত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও কিছু মনে করতে পারল না। সে আনেকে দেখতে চাইল ঠিক যেমন একদিন সে দেখেছিল একটা চালার নীচে, কিন্তু চোখের সামনে কোন মুখ ভেসে উঠল না। বারবার ওর নাম উচ্চারণ করে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে চাইল শুধু। নার্স এসে তার বালিশটা সোজা করে দিয়ে গেল। সরল রেখার মত মেয়েটির লম্বাটে মুখ। সে মনে মনে বলল, 'ও আমাদের কেউ নয়।' একটা চকচকে খেলনা সে দেখতে পেল বিছানার চাদরের ওপর। ঝলমলে সবুজ ডোরা-কাটা লাল বালির বাক্স। একটা বালির ঢিবির ওপর বসে আছে সে। মিষ্টি খাবার বেরিয়ে আসছে বাক্স থেকে। না, না, মাছ। কিংবা লম্বা-লম্বা দাড়িওলা একটা বামন।...বালিগুলো কেমন শুকনো। ধীরে ধীরে সমস্ত আকৃতি মুছে গেল চোখের সামনে থেকে। সে আর্তনাদ করে উঠল, 'এত শুকনো কেন?' নার্স ভিজে তোয়ালে এনে পিয়েরের কপালে চাপিয়ে দিল। কিছু অনুভব করতে পারল না সে, আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল একেবারে।

বাইরে থেকে ব্যাণ্ডের সংগীত ভেসে আসছে, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন অভিবাদন জানাচ্ছে মৃত জার্মান বৈমানিকের উদ্দেশ্যে। জেনারেল লেরিদো বক্তৃতা দিতে উঠল, 'বীর যোদ্ধার শবদেহকে আমরা গভীর শ্রদ্ধা অর্পণ করছি। নিজের মাতৃভূমির জন্যে দেশপ্রেম...কর্তব্যের প্রতি আবেগভরা নিষ্ঠা...'

তারপর গত দিনের চেয়েও প্রবল বেগে বৃষ্টি নামল যেন হারানো সময়টুকুর ক্ষতিপূরণ করতে চাইছে।

সন্ধ্যার সময়ে পিয়েরের প্রত্যাশিত চিঠি এল আনের কাছ থেকে। তিন দিন আপিসে প:ড় রইল চিঠিটা। তারপর 'চিঠির মালিক মৃত' লিখে চিঠিটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিল তারা।

৮

সেন্সার ব্যবস্থা 'আণ্ট আনাস্তাশিয়া' নামে পরিচিত। জোলিও নালিশ করল যে এই সেন্সর ব্যবস্থা গোরস্থানে পাঠাচ্ছে তাকে। 'লা ভোয়া নুভেল্' তার সর্বাঙ্গে শাদা শাদা ক্ষত নিয়ে বেরিয়ে এল। ভস্জ-এ ভীষণ শীত বা জার্মান রাজদূতের প্রতি ইটালিয়ানদের সানন্দ অভিনন্দন কিংবা চীনা সরকার কর্তৃক স্পেনের নিরাশ্রিতদের আশ্রয়দান—এমনি সমস্ত রকম খবর ছাপা বেআইনী। জোলিও তার হাত নাড়িয়ে চিৎকার করে উঠল, 'কাগজে একটিমাত্র সংবাদ পাওয়া যাবে এবং তা হল ব্রোমাইড।'

গুজব রটেছে স্ত্রীদের কথা মন থেকে ম্লান করে দেওয়ার জন্যে কর্তৃপক্ষ নাকি সৈনিকদের কফিতে ব্রোমাইড মেশাচ্ছে। জোলিও তার কাগজে একটা দু-লাইনের ছড়া ছেপে বের করল :

সখী, তোমার ঘরের পাশে ধৈর্য ধরে আছি প্রতীক্ষায়
মনেও তুমি ঠাঁই দিও না ঘায়েল আমি ব্রোমাইডের ঘায়।

দেশের রাহুগ্রস্ত হওয়ার পর জোলিও নতুন পৃষ্ঠপোষকের তল্লাশে বার হল। ব্রতৈল তাকে আলাপ করিয়ে দিল মতিনির সঙ্গে। এই প্রথম 'লা ভোয়া নুভেল্' তার নীতি পরিবর্তন করল, কিন্তু জোলিও তার জন্যে রীতিমত দুঃখিত। কি ভাবে বাঁচতে হয় দেসের জানে, মনোমালিন্যের মেঘ ঠাট্টা-তামাসার মধ্যে উড়িয়ে দিতে পারে সে, ঠিক সিগারেটের মত হাতের মধ্যে তুলে দিতে পারে চেকটা। কিন্তু মতিনি হম্বিতম্বি করে তার ওপর যেন সে তার বেয়ারা। কাগজ সম্পাদনার ব্যাপারে সে পুরোমাত্রায় হস্তক্ষেপ করে এবং জোলিও যদি কোন র‍্যাডিকাল বা সমাজতন্ত্রীর বিয়ের খবর ছাপে তাহলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে মতিনি। কিন্তু জোলিও সবার সঙ্গে শত্রুতা করবে কিসের জোরে? হাজার হোক, মতিনি তো চিরকাল থাকবে না।

কোন একটি লেখক তার প্রবন্ধে 'বশ্' কথা ব্যবহার করায় মতিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'অসহ্য! তুমি মানুষের জঘন্য প্রবৃত্তির খোরাক যোগাচ্ছ। জার্মানীর সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করছি বটে কিন্তু তা হল বীরত্বের লড়াই। বলতে পার—এ একটা ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডি। আসলে হিটলার একটা মস্ত বড় রাজনীতিজ্ঞ!'

তরাং জার্মান বৈমানিকের সাড়ম্বর শবযাত্রার খবর শুনে যে জোলিও উৎফুল্ল য়ে উঠবে এটা কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। সমস্ত স্তম্ভ জুড়ে সে শবযাত্রার মার লেরিদোর বক্তৃতার বিবরণ ছাপল। কিন্তু পরের দিন কি লিখবে এই নিয়ে আবার মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল জোলিও। গত চার মাস ধরে যুদ্ধ চলছে কিন্তু এখনো কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই তার। এ একটা নকল যুদ্ধ। ইনফ্লুয়েঞ্জায় মারা যাচ্ছে সৈন্যরা। গতকাল চেম্বারে ওরা জার্মানীর সঙ্গে রাইনের রেলপথ সম্পর্কে চুক্তির কথা উল্লেখ করেছে। ভোটে দেবার সময়ে কে একজন বলল যে বিলটি গ্রীষ্মকালে প্রথম তোলা হয়েছিল এবং ইতিমধ্যে রাইনের সাঁকোটিকে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এই যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'নকল যুদ্ধ'। লোকেরা দেখা হলে জিজ্ঞাসা করে, 'কি হে, নকল যুদ্ধটা কেমন লাগছে?' প্রত্যেকের ভাল লাগছে সন্দেহ নেই। একমাত্র কাগজে কোন খবর নেই সে সম্পর্কে।

দেখে মনে হয় শত্রুর নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। জার্মান বৈমানিকরা ইস্তাহার ফেলছে এবং লোকে সেইগুলি হাতে নিয়ে বলছে, 'বাঃ কী চমৎকার ছাপা!' স্টাটগার্ট থেকে ফরাসী ভাষায় বেতার বক্তৃতা শুনছে তারা। বক্তা একজন ফরাসী! জোলিও তার নাম দিল 'স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক।' লোকের মনে রল এই নামটা; 'স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক' অত্যন্ত জনপ্রিয় চরিত্র হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। ডেপুটিরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল 'কি হে, চেম্বারের গোপন অধিবেশন সম্পর্কে স্টাটগার্ট বিশ্বাসঘাতক কী বলল?'

তারপর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একদিন বিকেলে মতিনি ডেকে পাঠাল জোলিওকে। মতিনি কেমন উৎফুল্ল এমন কি অনেক বিনীত ব্যবহার করল। জোলিও যা যা দাবী করেছিল সবগুলিই দিল তাকে। তারপর অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়ে বলল, 'রাজনৈতিক দিকটা ব্রতৈলের হাতে ছেড়ে দাও। আরও সামরিক গালগল্প, বীরত্ব ও কৃতিত্বের কাহিনী ছাপা হোক। ভাল ভাল যুদ্ধ-সংবাদদাতা পাঠানোর ব্যবস্থা হোক।'

শেষ পর্যন্ত শত্রুর সন্ধান মিলল। দুদিন পরে যুদ্ধ-সংবাদদাতারা রওনা হল হেলসিঙ্কির উদ্দেশ্যে।

ইতালীর রাজদূতকে লাঞ্চে ডাকল তেসা। ইতালিয়ান রান্না, পিয়েডমন্টের মদ, ভেরোনার শিল্প এবং মুসোলিনীর মত রাজনীতিজ্ঞ—সমস্ত কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করল সে।

সে বলল, 'মুসোলিনীর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও এই যুদ্ধ বাধল—এতে যে কত দুঃখ পেয়েছি আমি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। গত কয়েক মাস আমি দুঃস্বপ্নের মত কাটিয়েছি। সমস্ত সংস্কৃতিবান ইউরোপীয়দেরই এমনি অবস্থা। কিন্তু একটা আলোও দেখতে পাচ্ছি। ফিনল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে মস্কোর যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হচ্ছে যে, না একেবারে হাল ছাড়ার কিছু নেই। বিশেষ করে আমি ইতালীর কথা ভেবে আশ্বস্ত হচ্ছি। আমি বরাবর ল্যাটিন দেশগুলির ঐক্যের কথাই বলে এসেছি। আমরা রোমের সুহৃদ। একটা বিরাট সভ্যতার ভাগ্যের তুলনায় ডানজিগ ও পোলাণ্ডের তাৎপর্য কতটুকু? খোলাখুলিই বলা যাক, আমাদের সকলের সাধারণ শত্রু হল মস্কো। কেরিলিয়ান যোজকের যুদ্ধের ওপরই নির্ভর করছে পারী, রোম ও বার্লিনের ভাগ্য।'
প্রত্যেকেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। মাদাম মতিনি 'উত্তরাঞ্চলীয় মঙ্গলবার পর্ব' উদ্‌যাপনের আয়োজন করল; অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের জন্যে মোজা আর গলা-বন্ধ বুনল প্রাণপাত পরিশ্রম করে; মিয়েজার পনের লক্ষ ফ্রাঁ দান করল ম্যানারহাইমের উদ্দেশ্যে এবং সেই চেকটা অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে তুলে দিল ফিনিশ প্রধান সেনাপতির মেয়ের হাতে। মার্সাইয়ের প্রতারক বিলে দাবী করল রু মস্কো রাজপথটার নাম বদলিয়ে রু হেলসিংফোর্স রাখা হোক।
মাদলেনে ফিনল্যাণ্ডের বিজয় কামনা করে প্রার্থনা সভা বসল। ধর্মনিষ্ঠ হয়ে প্রার্থনা জানাল ব্রতৈল। তারপর গির্জা থেকে বেরিয়ে সোজা রওনা হল 'লা ভোয়া নূভেল্'-এর আপিসে। 'এক্ষুনি ভীইয়ারের কাছে যাও একবার। ফিনল্যাণ্ডের ওপর কয়েকটা প্রবন্ধ লিখতে বল তাকে।' এই কথা শুনে জোলিও রীতিমত আশ্চর্য হল, যদিও সে কদাচিৎ আশ্চর্য হয়।
ভীইয়ারের ওপর মতিনির ঘৃণা অপরিসীম। সে প্রায়ই চিৎকার করে বলে, 'ঐ লোকটাই তো মজুরদের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকিয়েছে, বলেছে—যাও তোমরা সমুদ্রতীরে ফূর্তি করে এস!' নতুন পৃষ্ঠপোষকের খেয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা না দেখিয়ে উপায় নেই, সুতরাং ভীইয়ারকে এড়িয়ে চলত জোলিও। একবার প্যালে বুরবঁর কাছে মারিয়ুস রেস্তোরাঁয় দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। ভীইয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি তো আমাকে ভুলেই গিয়েছ।'
'তুমি কি দেবতা পেয়েছ আমাকে?' জোলিও প্রতিবাদ করল, 'আমি দেবতাদের দূত মাত্র। একজন সংবাদবাহক। তুমি নিজেই জান মতিনি কী রকম খচ্চর লোক। এটা শুধু আমার পক্ষেই নয় সমস্ত দেশের পক্ষে একটা দুর্ভাগ্য যে

দেসেরকে হারাতে হল। এখন আমায় ব্রতৈলের নির্দেশ মত লিখতে হচ্ছে। ও ভয়ানক একগুঁয়ে এবং জংলী বেড়ালের মত বর্বর। মার্সাইএ ওর জুড়ি মেলা ভার। গ্যালিক্ মোরগ আর জার্মান শিকারী কুকুর-এর একটা দো-আঁস্‌লা জীব ও। আমি তাকে অনেকবার বলেছি—ভীইয়ারের কী খবর? সত্যিই, জাতীয় ঐক্যটা একটা মুখের কথা। ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করি এবং সবচেয়ে বড় কথা আপনাকে ভাল লাগে আমার।'

ভীইয়ার ম্লান হেসে একটা নিরিবিলি কোণে এসে বসল। ডাক্তারের নির্দেশ মত লাঞ্চের অর্ডার দেওয়া রীতিমত কষ্টকর ব্যাপার তার পক্ষে। নিষিদ্ধ খাদ্যের তালিকা সর্বদা তার কাছেই থাকে এবং তা মিলিয়ে দেখতে হয়। 'পালং শাক? না। টম্যাটো? না। গাজর? ওটা চলবে।'

আর এখন ব্রতৈল জোলিওকে সেই ভীইয়ারের কাছেই পাঠাচ্ছে। গোলগাল স্পাদকটি ঘাবড়ে গেল রীতিমত, সারাটা পথ সে বিড়বিড় করল নিজের মনে। কী দুঃসময়! কোন কিছুই দুদিন স্থায়ী হচ্ছে না। মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। কোন মানুষ জানে না এর পরমুহূর্তে সে হাসবে না মাথায় হাত দিয়ে বসবে!

বই আর ছবির মধ্যে ডুবে থেকে এখন অবসর যাপন করছে ভীইয়ার। প্রেক্ষা-গৃহের অনিচ্ছুক দর্শকের মত প্রচণ্ড বিরক্তিভরে সে সমস্ত ঘট প্রবাহকে লক্ষ্য করছে। সে বলল, 'আমি এর কোন অর্থ বুঝি না।' তারপর আত্মসন্তুষ্ট হয়ে মনে মনে বলল, 'যাই হোক আমি ভাগ্যবান। ভাল সময়েই তেসা আমার কাছ থেকে দায়িত্বটা নিয়েছে। এখন ওরাই একটা গণ্ডগোল পাকিয়েছে। এই গণ্ডগোল মেটানোর দায়িত্বও ওদের।' অবশ্য চেম্বারে ভীইয়ার গভর্নমেণ্টের পক্ষেই ভোট দিয়ে আসছে এবং দুবার দেশপ্রেমের বক্তৃতাও দিয়েছে কিন্তু তার গলার স্বর কেমন ভোঁতা—যেন নীরস উদ্ধৃতি আবৃত্তি করছে সে। এই নকল যুদ্ধ তার কাছে একটা অকারণ হৈ-চৈ। চীনে তো অপর্যাপ্ত নরহত্যা হচ্ছে! ওরা কমিউনিস্টদের আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীইয়ার চাঙ্গা হয়ে উঠল একটু। তার পুরনো অসন্তোষগুলো আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। তার বিশ্বাস, তার পরাজয়ের জন্যে কমিউনিস্টরাই দায়ী। তারাই তো ষড়যন্ত্র করে কারখানা দখল করিয়েছে, দোকানদারদের ছিন্নমূল করে দিয়েছে, দালাদিএকে ঠেলে দিয়েছে ব্রতৈলের দলে। দেশপ্রেমের নামে গলাবাজি করতে তারা ওস্তাদ, মিউনিক কলঙ্কের কথা বলতে গিয়ে তারা ভীমরুলের মত গুঞ্জন তোলে কিন্তু যুদ্ধের কথা

এলেই পিছলে বেরিয়ে যায়। এখন শ্রমিকরা বলছে যে কমিউনিস্টরাই একমাত্র যুদ্ধবিরোধী ছিল। ভীইয়ারের ধারণা এ হল নির্বাচনী চাল। মনে মনে বলল, 'এই করে লক্ষ লক্ষ ভোট কুড়িয়ে নেবে ওরা!' অবশ্য কমিউনিস্ট ডেপুটিদের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা সে সমর্থন করল। বলল, 'এতে আপত্তি জানানো অসম্ভব। এই-ই তো যথার্থ ব্যবস্থা।' যখন সে শুনল যে পরিষদের সভ্য কার্শ্যা এখনও ধরা পড়ে নি, তখন মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করল। কার্শ্যাকে সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে। একদিন তারা একই পার্টিতে ছিল এবং একই সঙ্গে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিত। তরুণ কমিউনিস্টদের সম্পর্কে তার মতামত এই যে তারা অন্য জগতের জীব এবং কার্শ্যা দলত্যাগী। কোন সংস্কৃতিবান বিশ্বপ্রেমিক ও গণতন্ত্রবাদীর পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতেই শিউরে ওঠে ভীইয়ার।

প্রতিদিন শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কতকগুলি প্রদেশে সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত বাদ পড়ছে না। ভীইয়ার সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। এই তো প্রতিক্রিয়ার স্থচিমুখ! সে ভাবল, সে-ই তো ঐতিহ্যের অভিভাবক—শ্রদ্ধেয় এবং শ্রেষ্ঠ পুরোহিত। এই ব্যাপারে কোন প্রতিবাদ জানাবে কিনা—মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ভীইয়ার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ভাবনাটা নাকচ করে দিল কারণ এর ফলে কমিউনিস্টরা লাভবান হবে।

ভীইয়ার আবার তার নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে ফিরে এল। সম্প্রতি সেজানের একটা 'স্টিল-লাইফ' সংগ্রহ করেছে সে: গালার থালায় দুটো আপেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এই ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দেয়। আপেলগুলো নিজেরাই স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ—সম্পূর্ণ এবং ভারী—যেন বস্তুর সার ভাগ।

ভীইয়ার ভাবত যে কোন কিছুই তার মধ্যে সাড়া জাগাতে পারছে না। আজ কাল কিন্তু নিজেকে বুঝে উঠতে পারে না সে। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় আবার সে তার যৌবন ফিরে পেয়েছে। চেম্বারে সে একটা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিল—তার প্যাশনে বারবার দুলে উঠল ঠিক যেমন বিশ বছর আগে হত। যুদ্ধটা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠল। ভীইয়ার বলল, 'এই কমিউ-নিস্টরা—এরাই হল রুশ সাম্রাজ্যবাদের গুপ্ত সৈন্যবাহিনী।'

জোলিও ব্রতৈলের অনুরোধের কথা বলাতে ভীইয়ার উত্তর দিল, 'খুশি হয়ে, অত্যন্ত খুশি হয়েই লিখব। বয়স এবং অসুস্থতা প্রতিবন্ধক হওয়া সত্ত্বেও। কাজ করতে ডাক্তার নিষেধ করেছে। কিন্তু যখন দুর্বলকে সাহায্য করার কথা ওঠে

তখন আমি প্রস্তুত। খুব ভাল কথা যে ব্রতৈল দলাদলির কথা ভুলে গিয়েছে। এখন আমরা কথায় নয় কাজে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারি।'

প্রথম প্রবন্ধটা অত্যন্ত কাঁপা ও আবেগভরা গলায় বলে গেল ভীইয়ার। 'ক্রোধে ও ঘৃণায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছি আমি। এক সময়ে ভন গল্‌ৎস্‌-এর সৈন্যবাহিনী ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রাম করেছিল। আজ মার্শাল ম্যানারহাইমও যুদ্ধ করছে এমনি ন্যায়ের হয়ে।'

পরে সে জোলিওকে বলল, 'আমাদের অত্যন্ত শক্তিশালী বন্ধু আছে এবং সে হল জেনারেল ফ্রস্ট।'

জোলিও হাত বাড়িয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, পৃথিবীর মধ্যে ফিন-ল্যাণ্ড দেশটা কোন্‌খানে তা আমার নিজের জানা নেই। শুনতে পাই ওখানে নাকি ভীষণ শীত। আমাদের লোকরা ও দেশে গেলে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে প্রাণ হারাবে। এ আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি। কিন্তু ইতালী সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আমি একজন মার্সাইয়ের দেশপ্রেমিক। ওরা যদি মার্সাই আক্রমণ করে!'

'কক্ষনো না। ওরা আমাদের মতই মস্কোর ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে আছে। ইতালীয়ান ভীতির অস্তিত্ব আজ আর নেই।'

পরের দিন ভীইয়ারের মেয়ে লুই বাবার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার স্বামী যুদ্ধে গিয়েছে।

'গ্যাস্ত চিঠি দিয়েছে যে সৈন্যবাহিনীতে নাকি ভয়ানক বিশৃঙ্খলা। ওখানে নাকি একটাও ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান নেই। সৈন্যরা সব বিনা বুটে হেঁটে বেড়াচ্ছে। ভয়ানক চড়ে আছে ওদের মেজাজ। গ্যাস্ত ওদের কাছে কিছু বলতে ভয় পায়। আচ্ছা বাবা, ফ্রান্সের কী হবে বলতে পারো?' মেয়েটি বলল।

অন্যমনস্কভাবে কথাগুলো শুনল ভীইয়ার,তারপর বলল, 'ভয়ংকর। আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে এই যুদ্ধ কোন কিছু মীমাংসা করতে পারবে না। এর মধ্যে কিছুমাত্র অর্থ নেই। অবশ্য ফিনল্যাণ্ডের কথা আলাদা।'

কেরিলিয়া, স্কি-বাহিনী ও ম্যানারহাইমের জন্যে অর্থ সংগ্রহ সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথা বলল সে। লুই বাধা দিল, 'আজকাল আমার রাত চারটে পাঁচটা পর্যন্ত ঘুমই আসে না। ভাবি, কেবল ভাবি......সত্যিই জার্মানরা যদি জেতে তাহলে দেশের কী হবে!'

'ওরাই হয়ত জিতবে।'

এত সহজভাবে কথাটা বলল ভীইয়ার যে রীতিমত অবাক হয়ে গেল লুই।
'বাবা! কী বলছ তুমি?' মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল।
ভীইয়ার দেখল মেয়ের ঠোঁট দুটো কাঁপছে—হয়ত এখনই কেঁদে ফেলবে ঝর ঝর করে। সে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, 'ভয় পেও না, আমাদের ম্যাজিনো লাইন আছে।'
যখন খবরের কাগজগুলো দিয়ে গেল, ভীইয়ায় দেখল, 'লা ভোয়া নূভেল্'-এ তার প্রবন্ধটা ছেপে বেরিয়েছে। অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সমস্তটা পড়তে পড়তে সে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে তার নিজের কথায়ই সায় দিল। তারপর একটা ছবির ওপর নজর পড়ল। বরফের স্তূপাকার—তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মৃত সৈনিক, জমে গিয়ে কাঠিন্য এসেছে তাদের সর্বাঙ্গে। তাদের হাতে রাইফেল—যেন যুদ্ধে চলেছে, মৃত্যুর মধ্যে জীবনকে ফিরে পেতে চাইছে। ভীইয়ারের কাছে কেমন বীভৎস মনে হল ছবিটা: তার মধ্যে তোষণ-নীতি বা অন্য কোন রকম পথ নেই বাইরে বেরুবার।
লুই চলে গেল। আর্ম-চেয়ারে বসে বসে বিশ্রাম নেওয়ার আনন্দে গা ঢেলে দিল ভীইয়ার। এখন মনে মনে ভাবল: যুদ্ধে কে জিতল আর কে হারল তাতে তার কিছু যায় আসে না। এমন কি ফিনল্যাণ্ডও। ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গেই বা কি সম্পর্ক? কিছু লোক দৌড়চ্ছে, পড়ছে এবং জমে যাচ্ছে। এই-ই তো জীবন। কিন্তু সে এ সবের ঊর্ধ্বে। আপেলের মত সে নিজেই নিজের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ। অনেক উত্তেজনা, বাক্যালাপ আর দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে সে পার হয়ে এসেছে; এখন তার বিশ্রাম নেওয়া দরকার।
'লা ভোয়া নূভেল্'-এর ফটোগ্রাফার এসে তাকে বিরক্ত করল—লোকটা জোলিওর মতই শহুরে, আর ছটফটে এবং কেমন একটু করুণা হয় লোকটিকে দেখে।
'অনুমতি না নিয়ে ঢুকেছি বলে মাফ করবেন আমায়। ফিনল্যাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে প্রথম পাতায় আপনার একটা ছবি ছাপানো বিশেষ দরকার। শিরোনামা দেওয়া হবে—স্বাধীনতা ও সত্যের অক্লান্ত যোদ্ধা।' লোকটি বলল।
ভীইয়ার তার প্যাঁশনে ঠিক করে নিয়ে মুখে একটা কঠিন বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী আনবার চেষ্টা করল।

৯

সৌখিন পোষাকের দোকানে, যেখানে রীতিপ্রিয় মেয়েদের নতুন নতুন পোষাক সরবরাহ করা হয়ে থাকে, সেখানে নিজের মেয়েকে কাজ করতে দেখে তেসা চিনতে পারত কিনা সন্দেহ। চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা আর ঢেউ তোলা, ঠোঁট দুটো টকটকে লাল, রাঁধুনীদের টুপির চেয়েও ছোট একটা টুপি এবং হাতে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বেগুনী রঙের ফিতে দিয়ে বাঁধা।
দেনিস বুলভার মালএরব-এ একটা দরজীর দোকানে কাজ নিয়েছে। মেয়েরা এখানে মডেল দেখে সান্ধ্য-পোষাক তৈরী করায়। শো-রুমে লম্বা লম্বা আয়না সাজানো। খরিদ্দারের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। তাই মালিক সর্বদাই নালিশ জানাচ্ছে—ব্যবসা মন্দা। মধ্যবয়সী লোকটির গোঁফজোড়া কেমন সংক্ষিপ্ত আর পাঁশুটে, চোখ দুটো কেমন শোকাচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে সে 'ল জারদ্যাঁ দে মোদ্' বা 'ভোগ'-এর পাতা ওলটাচ্ছে। আবছা আলোয় মডেলগুলো দেখে খরিদ্দার বলে ভুল হয়। সেলাইয়ের কলগুলো গুন গুন করছে অবিশ্রান্ত, ইলেকট্রিক ইস্ত্রিগুলো নিয়মিতভাবে এদিক ওদিক যাতায়াত করছে এবং রেশমের কাপড়ে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে আঙুলের নখগুলো। কিন্তু পেছনকার ঘরে ওজেন নামে একটি খোঁড়া লোক একটি ছাপার মেশিনে কাগজ লাগাচ্ছে। এই জায়গাটি হল কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনী ছাপাখানা। ফ্যাশন সম্পর্কে মালিকের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই বললেই চলে। সে রাজনৈতিক ইস্তাহার লেখে এবং দেনিস সেগুলি চমৎকার কাডবোর্ডের বাক্সে ভর্তি করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিলি করতে বেরিয়ে যায়।
আজ দেনিসের ছুটির দিন। বেলভিলে চলেছে সে। ঠিকানাটা সংগ্রহ করতে পেরেছে। সেখানে মিশোর সঙ্গে দেখা হবে। চার মাসের বিচ্ছেদের পর এই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ।
মিশোকে প্রথমে ব্রেস্টে পাঠিয়েছিল কারণ সে ছিল নৌ-বাহিনীর রিজার্ভে। কিন্তু তার চাকরির কাগজপত্র ঘেঁটে রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়ল হেড-কোয়ার্টার—কি করে এই 'আগুনে' লোকটাকে বিদেয় করা যায়! দু সপ্তাহ পরে আরাসে এক পদাতিক বাহিনীতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাকে। তার কাজ হল সৈন্য-ব্যারাকের মেঝে ধোয়া। ব্যাটালিয়ান কমাণ্ডার মেজর ফেবর লোকটা ফূর্তিবাজ আর মাতাল; রাজনীতির ধার

ধারে না, কর্তৃপক্ষের ওপরও আস্থা নেই। ওর প্রিয় প্রবাদ হল, 'জীবনে দুটি চমৎকার অদ্ভুত ব্যাপার আছে—একটি ট্যাক্সি অন্যটি ক্যাকটাস্।' গোড়ার দিকে সে মিশোকে চোর বলে মনে করত কিন্তু যখন আবিষ্কার করল যে 'অপরাধী লোকটা' স্পেনে যুদ্ধ করেছিল তখন 'ডন কুইক্সোট' আখ্যা দিল; তাকে সুনজরে দেখতে চেষ্টা করল। এখন মিশো পারীতে দিন দুই কাটাবার ছুটি পেয়েছে।

দেনিস উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। সরু অন্ধকার রাস্তাটা খুঁজে বের করতে রীতিমত কষ্ট হয়েছে। এই রাস্তাটা এমনি একাধিক রাস্তা থেকে আলাদা করে চিনবার মত কোন উপায় নেই। একটি বৃদ্ধা এসে দরজা খুলে দিলেন। তখনো মিশো এসে পৌঁছয়নি।

'বসো বাছা, কফি করে দিচ্ছি তোমায়। ঠাণ্ডায় জমে গেছ, না? মিশো এক্ষুনি এল বলে।'

কিন্তু মিশোর অনেক দেরী হচ্ছে। বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আমার জিনোকে কখনো দেখোনি, না? কারখানায় ফ্যাশিস্টরা খুন করেছিল ওকে।'

ক্ল্যমাঁস সম্পর্কে মিশোর গল্পগুলো মনে পড়ল দেনিসের:

'আপনিই নাকি?' দেনিস চিৎকার করে উঠল।

কাপড় দিয়ে চোখ মুছলেন ক্ল্যমাঁস। জিনো! ঘরের জিনিসপত্রের অর্থ এবার স্বচ্ছ হয়ে এল দেনিসের কাছে। বড় কানওলা একটা ছেলের ছবি ঝুলছে দেওয়ালের ওপর। দেরাজগুলো ভর্তি বই-খাতায়। পেরেকের ওপর পুরনো ক্যাপ ঝুলছে একটা। তাঁর ছেলের স্মৃতি-চিহ্নগুলো ত্যাগ করতে ক্ল্যমাঁস রাজী নন। তিনি জিনোর কমরেডদের দেখাশোনা করেন, খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, আবার টুকিটাকি বোতামও সেলাই করে দেন। যুদ্ধ যখন বাধল তখন সমস্ত সন্ধ্যা একা বসে বসে তিনি কাঁদতেন। একে একে সবাইকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে ওরা! কিন্তু নভেম্বরে একজন নতুন লোক এল তাঁর কাছে।

লোকটি বলল, 'মিশোর কাছ থেকে আসছি। রাতটা এখানে কাটাতে পারব কি? পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি...'

এখন কমিউনিস্টদের আশ্রয় দিচ্ছেন ক্ল্যমাঁস। তিনি কখনো কারও নাম বা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন না। বিছানা আর আহার তৈরী করে দেন। তারা নানা ঘটনার কথা বলে তাঁকে। তাঁর সম্বন্ধে তাদের আস্থার গভীরতার কথা ভেবে তিনি গর্বিত হন।

'ফিনল্যাণ্ড সম্বন্ধে বড় বড় খবর দিয়ে কাগজওলারা লোকদের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে চায়।' তিনি দেনিসকে বললেন।

তারপর দেনিসের দিকে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে ক্ল্যমাঁস হাসলেন, 'আমি মিশোকে গোড়া থেকে বলে আসছি যে তার পক্ষে একা থাকা ঠিক নয়। ভাল কথা যে, তুমি তার দিকে নজর দিয়েছ। ও ভয়ানক লাজুক, কিন্তু মনটা অত্যন্ত ভাল। ছেলেটা আবার চালাকও আছে। খুব তাড়াতাড়ি মোরিস তোরে হয়ে উঠবে ও। শুধু একজন স্ত্রীলোক থাকা দরকার তার পেছনে। জিনো যেমন পেয়েছিল আমায়।'

যদিও দেনিস এমনিতে স্বল্পভাষী, সে কিছুমাত্র বিব্রত বোধ করল না। এ যেন তার একজন আত্মীয়া কথা বলছেন তার সঙ্গে।

অবশেষে মিশো এল। সামরিক বেশে কেমন অদ্ভুত দেখায় তাকে!

'তুমি!'

ক্ল্যমাঁসকে আলিঙ্গন করল মিশো। তারপর ক্ল্যমাঁস কফি নিয়ে এলেন।

তিনি বললেন, 'আমায় এখন কাজে যেতে হবে। তুমি যদি আমার আসার আগে বাইরে যাও তাহলে দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা মাদুরের নীচে রেখে যেও। কিন্তু সাবধান মিশো, ওরা যেন না খুন করতে পারে তোমায়। ওরা বলে এখনো যুদ্ধ বাধেনি কিন্তু মানুষ-মারা ঠিকই চলেছে। পরে তোমাকে দরকার লাগবে। আমি ওকে বলছিলাম যে তুমি একদিন মোরিস তোরে হয়ে উঠবে।'

তিনি চলে গেলে মিশো জড়িয়ে ধরল দেনিসকে। তারপর ফিসফিস করে বলল 'তোমাকে দেখবার জন্যে উদ্গ্রীব হয়েছিলাম এতদিন। নিশ্চয়ই ছিলাম, ঠিক তাই!'

জানুয়ারীর সংক্ষিপ্ত দিন ধীরে ধীরে গড়িয়ে এল। ঘরের মধ্যে কাকজ্যোৎস্নাকে মনে হল নীল কুয়াশা। ক্ল্যমাঁস খুব শিগগিরই ফিরবেন কিন্তু এখনো বহু কথা পরস্পরকে বলা হয়নি তাদের।

'সমস্ত কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে আছে। আমাদের বেলজিয়ান সীমান্তে রাখা হয়েছে। প্রথমে ঘাঁটি তৈরী করতে চেয়েছিল কিন্তু পরে মত বদলাল। কর্নেলকে একদিন চিৎকার করতে শুনলাম, 'কেবলমাত্র হতাশাবাদীরাই বলে যে জার্মানরা এখানে আসবে!' এ হল তাদের অত্যন্ত প্রিয় কথা। কিন্তু কারা হতাশাবাদী? তারা নিজেরা। জার্মানরা যাতে আমাদের গুঁড়িয়ে

দিতে পারে তারই তোড়জোড় করছে ওরা। অবশ্য যদি নতুন গভর্নমেন্ট আসে তাহলে ব্যাপারটা বদলাবে। সম্মুখ যুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারব আমরা। আমার ভয় হয় যে শুরুতে মার খাবো আমরা কিন্তু পরে আমাদেরই অবস্থা শোধরাতে বলা হবে। লোকে কমিউনিস্টদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। একদিন কয়েকটা ইস্তাহার পেয়েছিলাম, ওরা সবাই ধেয়ে এল আমার কাছে। অফিসাররা সবাই ফ্যাশিস্ট। নাৎসীপন্থী তারা। একমাত্র আমার লোকটা অন্য রকম, ও ক্যাকটাস নিয়ে পাগল। কিন্তু বাকী সবাই বলছে যে এর জন্য দায়ী পপুলার ফ্রন্ট আর কমিউনিস্টদের বিশ্বাসঘাতকতা। লোকদের ওপর তাদের ভয়ানক ভয়। এদিকে লোকে অপেক্ষা করছে। কেন তারা নিজেই জানে না। বারুদের অভাব নেই কিন্তু তাতে আগুন দেবার জিনিসেরই অভাব। পারীতে যদি একবার শুরু হয় তাহলে ওরা এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

'এখানে ঠিক একই অবস্থা।' দেনিস বলল। 'কারখানার লোকেরা ক্ষেপে আগুন হয়ে আছে কিন্তু কিছু বলে না। একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের ব্যাপারে একটা নাড়া খেয়েছে তারা। তারা বলেছে, ফিনিশ ফ্যাশিস্টদের জন্যে তারা কোন বিমান তৈরী করতে পারবে না। তারা হয়ত ধর্মঘট করবে। তারপরই বেশ জমকালো হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত ব্যাপারটা।'

বিদেশের খবরাখবর জিজ্ঞাসা করল মিশো। মস্কো থেকে নতুন কি খবর এসেছে? দেনিস সব কথা বলল।

হাসল মিশো। 'সত্যিই কত বড় একটা লোক হয়ে গিয়েছ তুমি! মনে পড়ে, কিভাবে প্রথম মিটিঙে নিয়ে গিয়েছিলাম তোমায়?'

ওদের প্রেমের প্রথম দিনগুলির কথা পড়ছে......দ্বিধা আর ব্যাকুলতা। ওদের ঠোঁট, হাত, এমন কি চোখ পর্যন্ত ওদের হৃদয়াবেগের গভীরতাকে ব্যক্ত করতে পারছে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে ওদের।

'খবরের কাগজে ইংরেজ ক্যাপ্টেনের বিষয় পড়ছিলাম।' দেনিস বলল। 'ঠিক নতুন বছরের সময়। তারা ডিনার খেতে বসেছে। হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হল। একটা জার্মান সাবমেরিণ। লোকটির সঙ্গে ছিল তার তরুণী স্ত্রী। স্ত্রীকে লাইফ-বেল্ট বেঁধে জাহাজের একধারে টেনে আনল। মেয়েটি নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। ভাবল, পাগল হয়ে গিয়েছে তার স্বামী। তারপর স্ত্রীকে জলের মধ্যে ফেলে দিল। বেঁচে গেল মেয়েটি।

কী আত্ম-সংযম! কী সবল বোধশক্তি! মিশো, আজ আমাদের দরকার বাঁচবার সাহস। তুমিও আমাকে এই কথাই বলো, চিৎকার করে ওঠো যাতে আমি সবল হয়ে উঠতে পারি। বিপদের কথা বলছি না, ভয় পাইনি আমি। কিন্তু যখন আমরা বিদায় নিই, তখন আমার মনে হয় এই বোধ হয় আমাদের শেষ দেখা।'

'আমরা সবাই ভেলার ওপর ভাসছি। জাহাজ ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা। কিন্তু আমরা ঠেকাবই। তারপর সেইখানে পৌঁছব, দেনিস। তুমি দেখে নিও।'

রাত্রের সমুদ্রের মত বিস্তৃত ও নিস্তব্ধ দুটো অন্ধকার রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা বিদায় নিল। মিশোর জ্যাকেটের নীচে গোঁজা এক বাণ্ডিল ইস্তাহার ও দু কপি 'লুমানিতে'। এখনো ট্রেন ছাড়তে তিন ঘণ্টা বাকী। সে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগোল। নিষ্প্রদীপ পারীকে মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য নতুন শহর। মাঝে মাঝে গাছের উলঙ্গ শাখাগুলো ঝুলো বাড়িয়ে আছে অন্ধকারে। কিন্তু বাড়ীগুলো দেখা যায় না; সুদূর পাহাড়ের মত তাদের আবছা অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মায়। হঠাৎ একটা শিশু হেসে উঠল। একজন স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার দস্তানাটা পড়ে গিয়েছে!' যেতে যেতে গর্জন করে উঠল বাসের হর্ন। লাল হয়ে উঠল সিগারেটের শিখা।......অন্ধকারে কেমন একটা ভিজে-ভিজে-নীল কুয়াশা আর শহরের অস্পষ্ট গুঞ্জন......উত্তাল সমুদ্রের গোঙানি বলে মনে হয়।

দেনিস আর তাদের ত্বরিৎ বিদায়ের কথা মনে পড়ল মিশোর—তাদের বেদনার কথা তারা পরস্পরের কাছে খুলে বলতে পারেনি। দেনিস বলেছে, 'তোমার পকেটে কতকগুলো সিগারেট রেখেছি আমি। সে বলেছে, 'গলাটা ঢেকে রেখো, ঠাণ্ডা লাগবে।' আবার কখন তারা পরস্পরে মিলিত হবে? সত্যিই কি কোনদিন দেখা হবে তাদের মধ্যে?

চওড়া রাস্তাগুলো নদীর মত নেমে গিয়েছে। কে যেন একটা টর্চ নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে। অন্ধকারের মধ্যে কত জোরালো দেখাচ্ছে ক্ষীণ আলোটুকু। পথ, ঘাট, গাছের চারপাশের রেলিং আর সেই মানুষটির পা দুটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোয়। লোকটি মোড় ফিরতেই আলোটা অদৃশ্য হয়ে গেল। নিষ্প্রদীপ রাত্রে টর্চের আলোর মত এই অন্ধকারাচ্ছন্ন বছরগুলির মধ্যে দিয়ে প্রেমকে বহন করে নিয়ে যেতে সত্যিই কেমন অবাক লাগে।

১০

আঁদ্রেকে পোয়াতিএর-এ পাঠানো হয়েছে। প্রতিদিন গুজব উঠছে যে এই রেজিমেণ্টকে ম্যাজিনো লাইনে পাঠানো হবে কিন্তু তার পক্ষে কোন সরকারী সমর্থন নেই। চার মাস কেটে গিয়েছে। মারকিস্ দ্য নিওর-এর বসবার ঘরে কর্নেল প্রতিদিন গিয়ে উপস্থিত হয়। বাকুতে পুরনো সেনাপতি গ্রঁদমেজোঁর সঙ্গে কাজ করেছে সে। স্থানীয় প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাকে প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করত, পোয়াতিএর-এর বিমান-আক্রান্ত হবার আশঙ্কা আছে কি না। অফিসাররা তাদের স্ত্রীদের শহরের কাছে দিয়েছে। প্রত্যেকটি বার-এ সৈনিকরা দেনা করেছে, বেশ্যাপল্লীর কোন ঘরে যেতে বাদ রাখেনি তারা। সন্ধ্যায় দুধের দোকানে বসে বসে দিনটা কাটিয়ে দেয় আঁদ্রে।

তার বন্ধু লুরিএ বলে, 'আজকের দিনটা আমরা হারালাম না জিতলাম তা খতিয়ে দেখলে মন্দ হয় না।'

জেলখানার মতই জীবনটা কেমন ভোঁতা আর একঘেয়ে। তারা রুট-মার্চে বার হয়, উঠোন ঝাঁট দেয়, সালগমের ঝোল খায়। তারপর শহরে ঘোরে, দোকানের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমায়, সিনেমায় বসে পুরনো ছবি দেখে আর ক্ষুদা-উদ্রেককারী মদ খায়। তারপর ব্যারাকে ফেরে আর লোহার স্টোভের সামনে বসে বসে হাই তোলে, ঝিমোয়। আঁদ্রে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তাদের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা আর শঠতার ভাব কেটে যায়, ল্যাণ্ডস্কেপের কথা মনে পড়ে আঁদ্রের। মাঝে মাঝে ভাবে, মানুষের সঙ্গে মাটির সাদৃশ্যের কথা, কুজ্ঝাটির সঙ্গে মাটির সম্বন্ধের কথা। এমনি মুহূর্তে আঁদ্রে কাজের প্রেরণা পায়। নিজেকে নিয়ে তামাসা করে, 'যখন পারীতে ছিলাম তখন আঁকতে ইচ্ছে করত না, এখন বারবার রঙের জন্যে মন উশখুশ করে।' লরিএ বলে, 'দাঁড়াও না, এক সপ্তাহের মধ্যেই আমরা ফ্রণ্টে যাব।' আঁদ্রে স্বপ্ন দেখে···ধোঁয়ার স্তম্ভ, শীতের সকাল, কাঁটাতার, বিবর্ণ অর্থহীন মৃত্যু, ঠিক সূর্যহীন অসহ্য ঝলসানো দিনের মত যখন বস্তুর আকার আর রং ধীরে ধীরে মুছে যায়।

আঁদ্রে খুব সহজে লোকের সঙ্গে আলাপ করতে পারে। পারীতে সে একা তার ক্যানভাস নিয়ে ডুবে থাকত। কিন্তু এখানে সে মানুষের মধ্যে বাস করছে···সেই সব মানুষ যারা হাসছে, গল্প বলছে, ঠাট্টা-তামাসা করছে।

বিশেষ করে লরিএর সঙ্গেই সে আড্ডা মারে। লরিএ হল আভিঞঁর এক কাফের বাজিয়ে, কেমন উৎকণ্ঠাহীন ছেলেমানুষ, দক্ষিণাঞ্চলীয় লোক। এই সে গায় 'তুত ভা বিয়ঁ, মাদাম লা মারকিস্' পরমুহূর্তেই বলে, 'এই যুদ্ধ একশো বছর চলবে। তারপর হেসে বলে, 'কর্নেল আগে থেকেই কুমারী মেরীকে মোমের হাত-পা উপহার দিয়েছে যাতে সে নিজে আহত না হয়।'

ব্রেতঁবাসী ইভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'এখানকার মাটি খুব ভাল। পাঁঠাও আছে প্রচুর। আমরা যেখান থেকে আসছি সেখানে পাঁঠা মেলে না। যাই হোক যুদ্ধে যাবার পরিকল্পনাটা প্রথমে কার মাথায় এল?' প্রত্যেকটি গাছের কাছে সে থামে যেন কোন গাঁয়ের লোকের সাক্ষাৎ মিলেছে। আঁদ্রের সঙ্গে সার আর রাই সম্পর্কে দীর্ঘ আলাপ হয়েছে। কখনো কখনো রাত্রে সে নিজের মনেই চিৎকার করে ওঠে। তার বৌ-ছেলেমেয়ে আর বাড়ীর জন্যে মন কেমন করে।

নিভেল্ কোন একটা কাফেতে ওয়েটারের কাজ করত। সম্পূর্ণ কার্যক্ষম হবার আগে সে দু মাস হাসপাতালে কাটিয়েছে। তার বৌ তাকে জেরেনিয়ম ফুল এনে দিয়েছিল। শুনেছিল জেরেনিয়ম ফুলের ঘ্রাণ নিলে নাকি হৃদয় দুর্বল হয়। অতএব সৈন্যবাহিনী থেকে মুক্তি পেতে অসুবিধা হবে না। আসলে কিন্তু কিছুই ঘটল না। 'ওরা আমায় এখানে আটকে রেখেছে কেন?' সে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি প্রত্যেক দিন আশি ফ্রাঁ কামাচ্ছিলাম। তাকে ত্রিশ দিয়ে গুণ করো। আর এখন ব্যবসার অবস্থা অনেক ভাল। গতকাল কাফে দ্য পারীর ওয়েটারটা বলছিল, আগের চেয়ে এখন সে ডবল রোজগার করছে। নিজেই হিসেব করে দেখ, দু হাজার চারশোকে দুই দিয়ে গুণ করো। আমি জানি ওরা আমার ব্যবসা নিয়ে মাথা মাথায় না; আমারও ভারী মাথাব্যথা পড়েছে ওদের জন্যে। আমার মত লোকের সংখ্যা কি কম? অন্তত ত্রিশ লক্ষ। হিসেব করো—চার হাজার আটশোকে গুণ করো ত্রিশ লক্ষ দিয়ে।' দাঁতে-কাটা পেন্সিলের একটা অবশিষ্টাংশ টেনে বের করল সে। 'হিসেবটা দাঁড়াচ্ছে—এক কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ। এবার বারো দিয়ে গুণ দাও।'

হিসেব-রক্ষক লাবোন-এর বিমান সম্পর্কে ভয়ানক ভয়। 'সাধারণ গুলিগোলাকে ভয় পাই না।' সে বলল, 'কিন্তু যখন আকাশ থেকে বোমা পড়ার কথা ওঠে তখন তুমিই বল ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায়!' তার বৌ দূরে আছে এই বলে নিজের মনকে প্রবোধ দিল সে। সে সর্বদা বেশ্যাপল্লীতে কাটায়। সে বলল,

'যাই হোক, আমি তো মরবই। তার আগে যতটা পারি স্বাধীন জীবন কাটিয়ে নিই।'

তারপর হল জিভের। লোকটা কেমন ছেলেমানুষ আর দুর্বলচিত্ত। কেবল কবিতা লেখে। বিষয়বস্তু হল রাত্রির অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজপথ আর একটা উন্মাদ অর্গান-বাজিয়ে।

এই সমস্ত লোক একই সঙ্গে থাকে, একঘেয়েমিকে সমানভাবে ভাগ করে নেয় আর মদ গেলে। একদিন হঠাৎ কেউ দৌড়ে এসে চিৎকার করে ওঠে, 'কাল চলে যেতে হবে আমাদের।' লোকেরা বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসে আর স্থানীয় মেয়েদের আলিঙ্গন করে। তারপর ঘোষণা করা হয়, 'মিথ্যা খবর'। ইভ্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করে ওঠে: 'কী হয় এই সব করে?'

একদিন আঁদ্রে লরিএকে বলল 'বুঝতে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এ একটা জগাখিচুড়ি! তুমি নিজেই জানো কে কার শত্রু। এ যেন ভীড়ের মধ্যে ধরা পড়ে যাওয়া...কেউ এতটুকু নড়বে না সেই জায়গা থেকে। ওরা কি বলছে তা শুনে কী লাভ? সত্যি কথাটা মুখ থেকে বের করবে না কেউ। একে অপরকে ঠকাতে আর হারাতে ওরা ব্যস্ত। এ যেন আমি আঁকতে বসে টিউব থেকে রং বের করছি। তুমি লালটা টেপো, কালো বেরিয়ে আসছে। আবার শাদা টিপলে লাল রং বেরোচ্ছে। না, এর চেয়ে না ভাবাই ভাল!'

রেডিওর নৃত্যগীত থেমে গিয়ে সংবাদ-ঘোষণা শুরু হতেই প্রত্যেকে চিৎকার করে উঠল, 'মুখ বন্ধ করে দাও শালার!' দালাদিএর সংস্কৃতি রক্ষার প্রচেষ্টা, রণাঙ্গনে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা না ঘটা, জার্মান কর্তৃক আরেকটি সতের হাজার টনের জাহাজ জলমগ্ন হওয়া—প্রতিদিনকার এই খবরগুলি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে তাদের।

শহরে যুদ্ধের কথা সবাই ভুলে গিয়েছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সৈন্য-সমাবেশে আলোড়িত হয়ে উঠেছিল সমস্ত শহর—কিন্তু আবার সমস্ত কিছু ফিরে পেল পুরনো জীবন। নাপিত শারদোনে দু লক্ষ ফ্রাঁ লটারী জিতল। 'প্রত্নতত্ত্ব পত্রিকা'র চলতি সংখ্যায় ছেপে বের হল আফগানিস্থানের এক খননকার্যের বিস্তৃত বিবরণ। মারকিস্ দ্য নিওর নালিশ জানালেন যে, জীবিকার খরচ বেড়ে চলেছে, সুতরাং মালীকে তাড়িয়ে দিয়ে মোটরচালককে মালীর কাজ করতে বলতে হয়েছে। মালীটিও মারকিসের সোনার ঘড়ি আর পরিবারের পুরনো একখানি রেকাবী চুরি করে তার প্রতিশোধ নিয়েছে।

তারপর সে ধরা পড়েছে বেশ্যালয়ে। স্থানীয় খবরের কাগজগুলো উরুগুয়ে উপকূলের নৌ-যুদ্ধের চেয়ে এই ব্যাপারে বেশী উৎকণ্ঠিত। বড় স্কোয়ারে এসে সার্কাসওলা তার তাঁবু গাড়লো। তিনটি বিরক্ত চিতাবাঘ একটা আর্ম-চেয়ার থেকে আরেকটা আর্ম-চেয়ারে লাফিয়ে লাফিয়ে চলল অক্লান্তভাবে।

জানুয়ারী মাসে একদিন ইভ্-এর ওপর ফেটে পরল কর্নেল, 'সৈনিক হবার উপযুক্ত নও তুমি, গেঁয়ো ফায়ারম্যান কোথাকার।' ব্যারাকগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হল, তে-রঙা নিশান ওড়ানো হল প্রধান প্রধান রাস্তায়। পোয়াতিএর-এর ডেপুটি—বর্তমানে মন্ত্রী—পদার্পণ করবে বলে সমস্ত কিছু তৈরী। নগরকর্তা অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তৃতা দিল, ক্লেমসো ও অন্যান্য পুরনো পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা করল তেসার। তেসা নম্রভাবে মাথা নাড়িয়ে গেল। নগরকর্তার বক্তৃতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল তেসা, বলল, 'ভাবলাম, যে শহর আমায় আস্থা জানিয়ে সম্মানিত করেছে, এই ঐতিহাসিক দিনে সেই শহর পরিদর্শন করে আমি আনন্দ পাব। আমি জানি পোয়াতিএর-এর সন্তানদের বুকে আজও পবিত্র আগুন জ্বলছে। প্রাচীন কালে সমাজপালক ঋষি স্যাঁইলারিওঁকেও এই উদ্দীপনা প্রেরণা দিয়েছিল। আজ এর থেকে অনুপ্রেরণা পাচ্ছে ম্যাজিনো লাইনের রক্ষীরা। আমাদের ভাবনাচিন্তা আজ একটিমাত্র জিনিসে কেন্দ্রীভূত এবং তা হল সাফল্য।

তেসা ভিয়েনে কিছু জায়গা-জমি কিনতে চলে এসেছে। অতীতে সে যা উপায় করেছিল সবই খরচ করে ফেলেছে। কিন্তু এখন পয়সা নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না। বিভিন্ন কোম্পানী যাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে তারা সবাই ফেঁপে ফুলে উঠছে। অবশ্য টাকাগুলো সে আমেরিকায় পাঠিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাতে টাকা টাকাই থাকবে। তাছাড়া, সে সম্বন্ধেও কেউ নিশ্চিত হতে পারে না। শেয়ার কিংবা ডলার—কোনটার ওপরই আজকাল আস্থা নেই তেসার। জমিই একমাত্র জিনিস যা বদলায় না। একটা চমৎকার বাগান-বাড়ী কেনা কত ভাল! তাহলে ইস্টারের সময় সেখানে পলেৎকে আনা যেতে পারে, ফুলের অরণ্যে বেড়াতে বেড়াতে ভুলে যাওয়া চলে, ব্রতৈল, সেনাপতি ও যুদ্ধের কথা। সম্প্রতি সে লাভালকে নিয়ে তামাসা করছিল, 'ও লোকটা একটা কঞ্জুস। জমি কেনা ছাড়া দুনিয়াতে আর কিছু ও জানে না।' সলিসিটরের আপিসে গিয়ে তেসা অনেকগুলি প্ল্যান আর ফটোগ্রাফ পরীক্ষা করল। একটা বাড়ী ভয়ানক ভাল লাগল তার। বাড়ীর মুখটা আঠারো শতকের বাড়ীর

মত দেখতে, বাগানটা পেতি ত্রিয়ানঁর মত সাজানো, ভেতরে সমস্ত রকম আধুনিক সাজসরঞ্জাম লাগানো আছে!

পরদিন মোটরে করে প্রী-দে-দ্যাঁ এস্টেটএ রওনা হল তেসা। যাবার আগে ভেতরে গরম জামা আর দুটো বোনা ওয়েস্ট-কোট পরে নিতে ভুলল না—যা ঠাণ্ডা আবহাওয়া! লুসিয়ঁ কী করছে? ঠাণ্ডায় জমে মরে যায়নি তো? মনে মনে ছেলের মৃত্যুর ছবি আঁকল তেসা।

'ফিনল্যাণ্ডের মতই ভীষণ শীত। আচ্ছা, আজকের খবরের কাগজ পড়েছ? জার্মান নামওলা মার্শালটা কিন্তু ভয়ানক চমৎকার লোক! আমার বিশ্বাস ও জিতবেই।' তেসা সলিসিটরকে বলল।

বাড়ীর সামনে একটা উলঙ্গ পরীর মূর্তি ব্রোঞ্জের পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চক্রের ওপর ঝুলছে বরফের লম্বা লম্বা ফোঁটা। মনে হচ্ছে পরীটিও যেন ঠাণ্ডায় জমে গেছে।

তেসা বলল, 'বড় চমৎকার বাড়ী। সামন্ত যুগের পঞ্চদশ লুই আমলের সিলিং-এর সঙ্গে বর্তমান ফায়ারপ্লেস—এই সমন্বয় বড় ভাল লাগে আমার।'

সন্ধ্যার দিকে সে শহরে ফিরে গেল। মনে পড়ল দেনিসের জন্যে এক বাক্স চকোলেট কিনে আনত সে। এই কথা মনে হতেই কেমন বিষণ্ণ বোধ হল। প্রায় চার বছর আগেকার কথা। যদি যুদ্ধ না বাধত তাহলে আবার ভোটদাতাদের সামনে গিয়ে উপস্থিত হতে হত তাকে। কিন্তু এখন মাথায় অন্য চিন্তা। কত অদ্ভুত ছিল সে সময়টা! সে ছিল একমাত্র প্রার্থী। অন্য সবাই মাথা নুইয়ে বিদায় নিয়েছিল তার কাছে। আমালি আর ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে প্রতীক্ষা করছিল তার জন্যে। দেনিস হাসছিল; এমন কি, লুসিয়ঁও চেষ্টা করেছিল বাবার কাছে ভালমানুষ সাজতে। সে প্রে-দে-দ্যাঁ কিনছে শুনে কত উল্লসিত হয়ে উঠত আমালি। পল্লী-জীবন, মুরগী, শাক, সবজি—এ সমস্ত ভালবাসত সে। আর এখন এই সম্পত্তি কার জন্যে কিনছে সে? পলেতের জন্যে? কিন্তু ও তো মিয়োজারের ছেলের মত কোন পয়সাওলা নবাবপুত্তুরের খোঁজ পেলেই খেদিয়ে দেবে তাকে। না, ঐ জমিটা তার নিজের জন্যেই, একমাত্র তার নিজের জন্যেই। পির লাশেস্-এর গোরস্থানে ঠিক আমালির কবরের পাশেই যে জমিটা, তার কথা মনে পড়ল তেসার। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলছিল সে কিন্তু সৌভাগ্যবশত সন্ধ্যাবেলায় মারকিস্ দ্য নিওর বাড়ীতে তার সম্বর্ধনা সভার কথা মনে হতেই নিজেকে প্রবোধ দিল।

তাকে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়ে উৎসাহে কলকল করে উঠল মার্‌কিস্ :
'প্রতিবেশী হিসেবে আপনাকে স্বাগত জানাতে আমরা আনন্দিত হয়ে উঠছি। পোয়াটু নির্বাচন করে সত্যিই খুব ভাল কাজ করেছেন আপনি।'
সালোঁয় গিয়ে তেসা স্থানীয় অভিজাত, প্রত্নতাত্ত্বিক, কয়েকজন উচ্চপদস্থ সেনা কর্মচারী এবং তার পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রাঁদমেজোঁর দেখা পেল। গ্রাঁদমেজো চিৎকার করছে 'ওদের শিক্ষা দিতে হবে! ইংরেজদের দ্বিধান্বিত হবার কোন অর্থ বুঝি না আমি। কৃষ্ণসাগরে গিয়ে এর হেস্তনেস্ত করো একটা।'
দর্শকরা তেসাকে ঘিরে ধরল। ফিকে চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে বোঝাতে লাগল, 'সমস্ত কিছু প্ল্যান অনুযায়ী করা হচ্ছে। জার্মানদের মধ্যে সম্পূর্ণ একতা বজায় আছে এ কথা বিশ্বাস করা ভুল। এই শীতকালে মস্ত একটা শিক্ষা পেয়েছে ওরা। সামরিক সাফল্যের চেয়েও থাইসেন বিমান পর্যবেক্ষণের একটা গুরুত্ব আছে। রাইখওয়ের ক্ষেপে আগুন। জার্মানদের সঙ্গে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হবার সম্ভাবনা আমি তো দেখছি। গোয়েরিং-এর মত লোক অবস্থার গুরুত্ব পুরোপুরি বোঝে। হেসের মত লোক!'
নির্বাচনের সময়কার প্রতিদ্বন্দ্বীদের খবরাখবর নিল তেসা। ব্রতৈলের অনুগত ছ্যুগারকে ডেকে এনে পেট্রল সরবরাহের দায়িত্বে বহাল করা হয়েছে। তালা-কারিগর দিদিএকে পাঠানো হয়েছে রে দ্বীপের বন্দীশালায়। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিৎকার করে উঠল সে, 'এ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হওয়া ভয়ংকর কথা। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই : শত্রু এসে পৌঁচেছে ফ্রান্সের দোরগোড়ায়।
পরদিন সকালে তেসা মোটরে পারী রওনা হল। তাকে গার্ড অব অনার দিল ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা। আঁদ্রে বহুবার লুসিয়ঁকে তার বাবার সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছে কিন্তু তাকে কখনো রক্তমাংসে দেখেনি। এখন তাকে দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেল আঁদ্রে, ঠিক ছোট্ট পাখীর মত দেখতে। গার্ড অব অনার পরিদর্শন করে তেসা তার চামড়ার দস্তানা দিয়ে লম্বা নাকটা মুছল। শীতার্ত বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে 'মার্সাই'-এর সুর।
তেসাকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হল সৈনিকদের মধ্যে। তারা সবাই জানে যে তেসা একটা জমিদারী কিনেছে। ইভ্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'কুত্তার বাচ্চাটা এধারে নাক ঢোকাচ্ছে এসেছে। নাক ডুবিয়ে দেখল জমিটা খাসা, তাই পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য করেনি। শুনছি আশেপাশের জমির দর নাকি তিন ফ্রাঁ থেকে বারো ফ্রাঁয় উঠে গেছে।'

।লভেল্ [illegible] করে উঠল, 'এতে ওর কি যায় আসে? সব তাতেই ও কিছু না কিছু করবে। যেমন আমি বিয়ারের গ্লাশ নিয়ে করতাম। কিন্তু তবুও আমাকে নিষ্কৃতি দিতে চাইবে না ও।'

'কেমন গুরুগম্ভীর মুখখানা ওর।' লরিএ বলল, 'ঐ রকম মুখ নিয়ে ওরা একমাত্র শবযাত্রায় যায়। তবু ও গলা ফাটিয়ে বলবে—যুদ্ধজয়! চল, সার্কাসে যাওয়া যাক। যাবে নাকি?'

সার্কাসে পাউডার ও জন্তুর প্রস্রাবের গন্ধ। অশ্বারোহী মেয়েটির স্কার্টে ঝলমল করছে কাঁচের মালা। অভিনয়রত বাঁদরটা হাঁচছে আর বিরাট অর্গানটা গর্জন করে চলেছে একটানা। ১৪ই জুলাইয়ের কথা মনে পড়ল আঁদ্রের—সেই নাগরদোলা আর চকচকে নীল হাতী। জিনেৎ এখন কোথায়? আজও কি সে ওষুধের বিজ্ঞাপন ঘোষণা করছে? কাঁদছে? কারও ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। সে ভাবত, সে ভাগ্যহীন। আজ সে বুঝেছে সবার ভাগ্যই এক। লরিএ ঠিক কথাই বলেছে: জীবনে শান্তির মুখ দেখে যেতে পারবে না তারা। এমন কি চুক্তি যদি হয়ও তো বড় জোর এক বছর দু বছর টিঁকবে, তারপর আবার শুরু হবে গণ্ডগোল।

ইভের তার নিজস্ব ভাবনা আছে। সে মনে মনে বলল, 'বড় চমৎকার এখানকার জমি। কিন্তু চাষীরা ভয়ানক চতুর। গমের সঙ্গে ডাল মিলিয়ে ফেলেছে যাতে শস্য হাতছাড়া না হয়। গরু বাছুর জবাই করছে ওরা। ওরা বলে, আমাদের কাছে কাগজের টাকার কী দাম। ওরা কাউকে বিশ্বাস করে না। আর দেখ, জমির দর কি ভাবে চড়ে গেছে! কে আছে এ সবের পেছনে?'

উজ্জ্বল আলোয় চোখ মিটমিট করল চিতাবাঘগুলো, কান দুটো নামিয়ে নিল। বেগুনী ফ্রককোট পরা ছোট্ট বেঁটে সার্কাসের লোকটি চাবুক আছড়ে চলেছে অক্লান্তভাবে।

জিভের বলল, 'ওদের পক্ষে আর্ম-চেয়ারগুলো ভয়ানক ছোট।'

আবার আর্তনাদ করে উঠল বিরাট অর্গানটা।

আঁদ্রে লরিএর সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বলল, 'সব চেয়ে কদর্য জিনিস হল ওদের নির্লিপ্ততা। ওরা সার্কাসে যায়, কাফেতে গিয়ে ভীড় করে। এদিকে তেসা জমি কিনছে। গম লুকিয়ে রাখছে চাষীরা। কিন্তু কাল কী হবে? গত বছর অন্য রকম ছিল অবস্থা। হয়ত হাস্যকর, কিন্তু অনেক মানবিক। ওরা চিৎকার করত, 'বার্লিন চলো' তারপর জার্মানদের দোকান লুট করত আর

ঘৃণা করত 'বশ্‌দের'। তারপর যুদ্ধ করত। ওদের উদ্দীপনা ছিল অপরিসীম। ক্লেমসো তাঁর শিরদাড়া সোজা করে বলেছিলেন—পারীর সামনে, পারীতে এবং পারী ছাড়িয়েও জোর প্রতিরোধ করব আমরা। তারপর ঘোষণা শোনা যেত—লেনিন বলেছেন...ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং টগবগ করে উঠত সমস্ত কিছু। কিন্তু এখন সব কিছু এত নিরুপদ্রব এত শান্ত যে তোমার চিৎকার করতে ইচ্ছে করবে। চিতাবাঘের মত মনে হচ্ছে নিজেকে। বলা হয় ওরা বন্য হিংস্র জন্তু। আসলে কিন্তু ঘেয়ো বুড়ো বেড়ালের চেয়ে বেশী হিংস্র নয় ওরা। এ সব আমার ভাল লাগে না, লরিএ।'

'আমারও না।' লরিএ বলল।

১১

লোকে ঠাট্টা করে লুসিয়ঁকে জিজ্ঞাসা করল, সে তেসার কোন রকম আত্মীয় হয় কিনা। লুসিয়ঁ বলল, 'শুধু নামটুকুই।' তবু নামের মূল্য কম নয়। সাবধানী মেজর হাসপাতালের বেয়ারার কাজে নিযুক্ত করল লুসিয়ঁকে যাতে বুলেটের ছিটেফোঁটা লাগার সম্ভাবনাও তার না থাকে।

পুরনো মঠ-বাড়ী উন্মাদ হাসপাতালে রূপান্তরিত হয়েছে। লুসিয়ঁর কাজ হল পাগলদের শাসনে রাখা এবং বিমর্ষ পাগলদের রবারের টিউবের সাহায্যে নাক দিয়ে খাওয়ানো। একটা সার্জেণ্ট বাঁধা অবস্থায় শুয়ে আছে; লোকদের ওপর বেয়নেট চার্জ করার আগ্রহ তার অপরিসীম। বেরাঁ নামে একটি তরুণ সৈনিক চিৎকার করছে গলা ফাটিয়ে—সামান্য বুরুশ, পিকদানি বা ডাক্তারের চশমা, কিছু দেখলেই আঁতকে ওঠে সে। অন্য একটি রোগী—সে কেবল মেয়েদের স্তন-যুক্ত উলঙ্গ সৈনিকদের ছবি আঁকে; আরেকটি পাগল এসেছে মার্সাই থেকে—সে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যুদ্ধ-সংবাদের ফরমূলা আওড়ায়, 'উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি...উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি।'

আরেকটি পাগল লুসিয়ঁকে খোলাখুলি বলল, 'আমি ইচ্ছে করে পাগল সেজেছি। প্রথমে ভেবেছিলাম লিভারের গোলমালেই কাজ ফতে হয়ে যাবে। লিমোজে-এ একসঙ্গে পনেরটা ডিম গিলে ফেললাম। ভাবতেই পারা যায় না ব্যাপারটা! কিন্তু কিচ্ছু হল না। ওরা ফ্রন্টে পাঠিয়ে দিল আমায়। তারপর ঠিক করলাম গরুর মত হামলাতে আরম্ভ করব। কিন্তু কারও কাছে এ কথাটা বলবেন না যেন।'

লুসিয়ঁ ঘাড় নাড়িয়ে বলল, 'আমার ভারী বয়ে গেছে। যত ইচ্ছে হামলাও না কেন আটকাতে যাবো না আমি।'

বেয়ারারা তাস খেলে আর মহোৎসাহে বেশ্যাবাড়ী যায়। হাসপাতালের কোয়ার্টারের ঘুলঘুলি, যেখানে এক সময়ে মুনি-ঋষিদের মূর্তি থাকত, এখন মদের বোতলে ঢেকে গিয়েছে। আগুনের ধারে বসতে লুসিয়ঁর ভাল লাগে। এই তার একমাত্র আনন্দ। সে মনে মনে বলল, 'অগ্নি-উপাসকদের আমি বুঝতে পারি।' আগুন থেকে নতুন প্রেরণা পেল লুসিয়ঁ। কেমন মরে গিয়েছিল সমস্ত আগুন কিন্তু হঠাৎ আবার জ্বলে উঠে সমস্ত কাঠকে লেহন করে নিল। লুসিয়ঁর চুলগুলোকে দেখাল আগুনের শিখার মত।

জেনী লিখেছে, সে আমেরিকায় ফিরে যাচ্ছে! আমেরিকান কনসাল নাকি তাকে ফিরে যেতে জেদ করেছে। সে লিখেছে, আবার তারা পারী কিংবা নিউইয়র্কে মিলিত হবে। আগুনের মধ্যে চিঠিটা ছুঁড়ে দিল লুসিয়ঁ। এখন গভীরভাবে বুঝল যে সে কত ভালবাসত জিনেৎকে। লোকে বলে, সময় মানুষের শত্রু। এ কথা সত্যি নয়। সময় ওপরকার আবরণকে ক্ষয়ে ফেলে, কপট শোক ও কৃত্রিম হৃদয়বৃত্তি মুছে যায় কিন্তু সত্যিকার আবেগ বেঁচে থাকে। জেনীর কাছে সে বিদেশী এবং তার কাছেও জেনী ঠিক তাই। এ যেন ঠিক 'জিগ্-স' ধাঁধার মত। সমস্ত ছবিটাকে একসঙ্গে সাজাতে হবে কিন্তু কোন একটা টুকরো আরেকটা টুকরোর সঙ্গে মিশ খাবে না।

রেডিও ডেকে উঠল, 'ফ্রণ্টে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।' সঙ্গে সঙ্গে মার্সাইএর লোকটাও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি।'

নতুন বছরের পর লুসিয়ঁ ফ্রণ্টে যাবে বলে আবেদন জানাল। ভাবল, মৃত্যুর সান্নিধ্য তার পরিশ্রান্ত চিত্তবৃত্তিকে সজীব করে তুলবে। কিন্তু ফ্রণ্টের জীবন তার কাছে কেমন আদিম, প্রাণহীন ও অভিশপ্ত মনে হল। গোলাগুলি লেগে কেউ না কেউ মারা যাচ্ছে। কিন্তু সৈনিকরা কেমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে এ সবে। তারা হাই তুলে বলে, 'এ হল একটা লটারী।'

লুসিয়ঁ কথা বলার সঙ্গী পেল একজন—লোকটা নরমাণ্ডির অধিবাসী, কেমন ঘোড়ার মত চোয়াল আর চকচকে চোখ। লোকটা পেশাদারী প্রত্নতাত্ত্বিক। নাম আলফ্রে। লুসিয়ঁর কাছে সাহারা-খননকার্য ও প্রাচীন পৃথিবীর চিহ্ন সম্পর্কে গল্প করল সে। লুসিয়ঁর মনে পড়ল বরফ আর পেঙ্গুইন পাখীর কথা।

একদিন তারা যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করল। আলফ্রের চোখে দালাদিএ স্বাধীনতার প্রতীক; তার বিশ্বাস—যুদ্ধজয়ের পর শিল্পকলা আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে, নতুন এথেন্স ও নতুন জাগৃতি সৃষ্টি হবে সেখানে। লুসিয়ঁ তার মোহ ভাঙতে চাইল না। কেবল মাঝে মাঝে বাধা দিয়ে বলল, 'ভাল কথা যে লোকটাকে তুমি নিজে জান না।'

তুষারাহত পা নিয়ে স্থানান্তরিত হয়ে গেল একটি সৈনিক। গরম মোজা পাওয়া যেন একটা অনধিগম্য স্বপ্ন। গুজব রটল, সৈন্যবাহিনীকে ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হবে।

সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা শাদা মাঠ, কেবল তার মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে লাল সূর্য—ফেব্রুয়ারীর এমনি একটা ঠাণ্ডা সকালে পিকার্ সমভিব্যাহারে পার্লামেণ্টারী দল ঘাঁটি পরিদর্শনে এল।

সম্প্রতি একটা খবর রটেছিল যে পিকার্‌কে সিরিয়া পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ওয়েগাঁ বলেছে যে সে একজন 'অগ্নিনির্বাপক' এবং নিকট প্রাচ্যের আগুন নিবোনোর দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। পিকার্ আপত্তি জানিয়েছে, 'যুদ্ধে হোসের চেয়ে আগুনে-বোমা অনেক বেশী জরুরী।'

পিকার্ কর্মপন্থার সমস্ত খসড়া তৈরী করে ফেলেছিল। সিরিয়ার সৈন্যবাহিনীকে সে বলত 'বাকু সৈন্যবাহিনী' কিন্তু ফিনল্যাণ্ডের ঘটনায় সে উত্তর দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য হল। তেসাকে বলল, 'একটা শক্তিশালী অভিযাত্রী বাহিনী পাঠাতে হবে এখান থেকে। জার্মানদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করতে পারি না। তাছাড়া চাইও না। এদিকে সৈন্যদের বেকার বসিয়ে রাখাও বিপজ্জনক। কমিউনিস্টরা উঠে পড়ে লেগেছে। এই বসন্তেই গণ্ডগোল বাধাবে একটা। একমাত্র ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে চরম সাফল্য হলে এই সমস্যা কেটে বেরিয়ে আসতে পারব আমরা।'

ল্যাপল্যাণ্ডের লোহার খনি, 'মাটির পা-ওলা বিরাট মূর্তি' এবং রোমের সহানুভূতি—এই নিয়ে জোর আলোচনা চলল পার্লামেণ্টের লবিমহলে। ম্যাজিনো লাইনের দৃঢ়তা সম্পর্কে নিজেরা আশ্বস্ত হবার জন্যে ডেপুটিরা এসে ঘুরে যেতে লাগল। একটা গুরুত্বপূর্ণ অভিযানকে সমর্থন করার আগে দেখে নেওয়া দরকার সমস্ত প্রবেশপথগুলো ঠিকমত বন্ধ আছে কিনা। প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনজন র‍্যাডিকাল, দুজন দক্ষিণপন্থী এবং একজন সমাজতন্ত্রী। ব্রতৈল ছাড়া সমরনীতি সম্বন্ধে তাদের কারও রতিমাত্র জ্ঞান

নেই। তারা যেন একদল দর্শক যাদের হঠাৎ রঙ্গমঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। মনে মনে তারা নিজেদের টুপি ও ট্রাউজারের কথা ভেবে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইল। তাদের মধ্যে একজন হাসিখুশি মোটা-সোটা লোক নিজের মাথা বাঁচাবার জন্যে একটা টিনের টুপি চেয়ে বসল।

ঘাঁটি পরিদর্শন করতে করতে বোকার মত নানা রকম প্রশ্ন করল তারা; মধ্যযুগীয় প্রাসাদ-দর্শনার্থী টহলদারদের মত মন্তব্য করল 'ওঃ', 'আঃ'।

জেনারেল পিকার্ ব্রতৈলের সঙ্গে সঙ্গে চলল। উত্তরমুখী অভিযানের ভালমন্দ বিচার করল তারা। কেমন তেজালো দেখাল ব্রতৈলকে।

সে বলল, 'আমরা মোড়ের মাথায় এসে পৌঁচেছি। ভয় ছিল যে সমাজতন্ত্রীরা বাধা দেবে কিন্তু ব্লুম চুপ করে আছে আর ভীইয়ার ছোটাছুটি করছে ফ্রন্টে। শাস্তর আলপিন-এ পাঠানোর প্রশ্ন দু-একদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।'

একটা সামরিক ঘাঁটি পার হয়ে অগ্রসর হল তারা। লুসিয়ঁ অভিবাদন জানাল। ব্রতৈল তাকে চিনবে কিনা এই ভেবে কয়েকটা অস্থির মুহূর্ত কাটিয়েছে লুসিয়ঁ। কিন্তু গভীর আলোচনায় ডুবে আছে ব্রতৈল আর তাছাড়া প্রাইভেটদের দিকে নজর দেওয়ার অভ্যাসও তার বড় একটা নেই।

অতীতের পুরনো স্মৃতি লুসিয়ঁর মনে জাগল। এমন কি, বুলেট তাদের মাথার ওপর দিয়ে যাতায়াত করছে এই ভয়ে ডেপুটিদের কুঁজো হয়ে চলার ভঙ্গীও তাকে এতটুকু আনন্দিত করে তুলল না। লজ্জায় মরে যাওয়া কি জিনিস তা ভালভাবে বুঝল লুসিয়ঁ। হ্যাঁ, তার অতীত সত্যিই লজ্জাকর। এই নিষ্ঠুর লোকটার ওপর কি করে একদিন আস্থা রেখেছিল সে? পিকারের সঙ্গে ব্রতৈল কি কথা বলছে তা অনায়াসে বলা যায়: ফ্রান্সকে নতজানু করবার মতলব আঁটছে ওরা। ১৯৩৬ সালের প্রতিশোধ। সিরিয়া আর ফিনল্যাণ্ডের যে কোন জায়গায় সৈন্য পাঠাতে ওরা তৈরী। হিটলারকে পথ করে দিতে চায় ওরা। লুসিয়ঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ধর্মঘট সম্পর্কে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলে তার বাবা প্রায়ই বলত, 'এর চেয়ে জার্মানদের আসা অনেক ভাল!' ওরা সব এক জাতের মানুষ। বোধহয় ওদের মধ্যে গ্রঁদেলই একমাত্র কম ক্ষতিকর। কিন্তু ইতিমধ্যে মানুষ তো মারা পড়ছে। গতকাল শার্ল প্রাণ দিয়েছে। সে ছিল পাহাড়ে-রাখাল, ব্যাগপাইপ বাজাত। তাকে কেন মৃত্যুর মুখে পাঠাল ওরা? বিশ্বাসঘাতক!

সন্ধ্যার দিকে লুসিয়ঁ আর আলফ্রে 'ক্যাম্প ফায়ার'-এর ধারে বসল। ঠাণ্ডায় জমে গিয়েছে দুজনে, মুখ দিয়ে কারও কথা বেরোচ্ছে না। একসময়ে আলফ্রেই কথা বলল, 'লীগ অফ নেশনস্‌-এর প্রস্তাবাবলীর পর—'

লুসিয়ঁ বাধা দিয়ে বলল, 'চুলোয় যাক! ও সব হল বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ঘৃণা ঢেকে রাখার জন্যে বড় বড় কথার জাল। ব্রতৈলকে দেখেছ? ও হল নিষ্পাপ লোক। স্বর্গে যাবার চেষ্টায় আছে। বলা বাহুল্য ও একজন 'দেশপ্রেমিক'ও। ও যখন লোরেন্‌ সম্বন্ধে কথা বলে তখন কান্নার সুর শুনতে পাবে ওর গলায়। কিন্তু গ্রঁদেল যে জার্মান গুপ্তচর এ কথা সর্বদা মনে আছে ওর। তাকে বাঁচিয়ে আসছে প্রথম থেকে। তুমি কি মনে কর পিকার্‌ যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে? কক্ষনো না। ও অন্য একটা কিছু নিয়ে লেগে আছে। ফ্যাশিস্ট বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করছে ও। মেশিনগানগুলো এল কোত্থেকে? ড্যুসেলডর্ফ থেকে। এবং পয়সার ব্যবস্থা করল কে? কিলমান নামে এক জার্মান। সমস্তটা মিলিয়ে হীন চক্রান্ত একটা! লীগ অফ নেশনস্‌-এর নাম উচ্চারণ কোরো না আমার কাছে। তুমি বরং শার্ল কেন মারা গেল—এর কারণ খুলে বল আমায়।'

অনেকক্ষণ ধরে লুসিয়ঁ ব্রতৈলের 'মন্ত্রশিষ্য', মতিনির বাড়ীর সভা আর দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে কথা বলল। একমাত্র কিলমানের চিঠি কি করে তার হস্তগত হল, এ কথা বলা প্রয়োজন মনে করল না সে। সে যে তেসার ছেলে এ কথা স্বীকার করতে চাইল না। তা যেন আরো অনেক বেশী লজ্জাজনক। আলফ্রে মুখে একটা গভীর হতাশার ভাব নিয়ে বসে রইল। সে বারবার বলতে চাইল, 'কিন্তু...' কিন্তু অগ্রসর হতে পারল না। অবশেষে সে কথা খুঁজে পেল, 'কিন্তু এই যদি হয় তাহলে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া উচিত এর ভেতরকার কথা। লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ওদের। ফ্রান্সকে আমরা বাঁচাবই।'

লুসিয়ঁ শ্লেষ করে হাসল। বলল, 'ঠিক জেনীর মত! মেয়েটি আমেরিকান। আমি তার সঙ্গে থাকতাম, বরং তার ডলারের সঙ্গে থাকতাম বললেই ঠিক হবে। সেও ঠিক এই কথাই বলত: তাহলে তো তোমাদের বিপ্লব দরকার। অনেক দেরী হয়ে গেছে, বুঝলে খোকা। আমরা ১৯৩৬এ কী করছিলাম? এখন আর চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। ওরা আমাদের পিষে মারবে

আর ব্রতৈল হয়ে উঠবে গাউলাইতর। কিংবা সব কিছুকে জাহান্নমে পাঠাবে ওরা। তোমাকে আমাকে বাদ দেবে না। ব্যাপারটা দাঁড়াবে ঠিক তোমার খননকার্যের মত। বিংশ শতাব্দীতে মাটি খুঁড়ে ওরা একটা ডানহিল লাইটার, একটা মেসার্শমিট ইঞ্জিন ও মহদাশয় ভীইয়ারের খুলি বের করে চিৎকার করে উঠবে—কী অদ্ভুত সভ্যতা! একটা সান্ত্বনা যে, এ কথা বলার জন্যে আমরা তখন বেঁচে থাকব না। উঃ! কী ভয়ানক শীত! সত্যি কথা বলতে কি, রীতিমত একঘেয়ে লাগছে এ সব।'

১২

জোলিও তার স্ত্রী আর তার স্ত্রীর ভাই আলফ্রেকে নিয়ে এক সঙ্গে নতুন বছরের উৎসব উপভোগ করল। আলফ্রে সামরিক ডাক্তার, তিন দিনের ছুটিতে বাড়ী এসেছে। তারা রেস্তোরাঁয় গিয়ে দু বোতল শ্যাম্পেন খেল। কতকগুলি মেয়ে গোলাপী আর নীল কাগজের গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল তাদের দিকে। আলফ্রে লজ্জায় চোখ মিট মিট করে বলল, 'এগুলো বোমা।'

জোলিও ঘোষণা করল, 'আমাদের জয় হোক! আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সৈন্যরা বার্লিনে বসে নতুন বছরের অভিবাদন জানাচ্ছে।'

তারপর হঠাৎ কুসংস্কার বশে সে টেবিলের ধারের কাঠে হাত ছোঁয়াল। মুখ ফিরিয়ে নিল আলফ্রে। জোলিওর বিস্তারশীল আচরণে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করে সে। কিন্তু মারি তার ভাইয়ের দিকে মমতাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'যদি তুমি মারা যাও!'

জোলিও কৈফিয়ৎ দিতে শুরু করল, 'এ একেবারে ন্যায়সঙ্গত। এ বছরের শেষে, জার্মানদের একটা কামান পিছু আমাদের পাঁচটি করে কামান থাকবে।'

'জানি না। ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না আমি।' আলফ্রে বলল, 'কিন্তু সীরাম নেই আমাদের। ভয় হয় একদিন আচমকা বিপদে পড়ে যাব আমরা। গত যুদ্ধে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল...'

জোলিও মাঝ পথে বাধা দিল। রোগ আর মৃত্যু সম্পর্কে কোন খবর সহ্য করতে পারে না সে।

পরদিন আলফ্রে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোলিও ভুলে গেল তার কথা। ওর ধারণা ছেলেটা খুব ভাল কিন্তু কেমন ভোঁতা। মারি প্রায়ই চোখের জল ফেলে।

ভয় হয় তার ভাই হয়ত যুদ্ধে মারা যাবে। জোলিও বৃথাই আশ্বাস দেয় যে, ডাক্তাররা সব সময়ে পেছন দিকে থাকে, সুতরাং বিপদ থেকে তারা অনেক দূরে। স্ত্রী তবু প্রায়ই বলে, 'যদি হঠাৎ কিছু ঘটে?'

জোলিওর জীবন কর্মব্যস্ততায় পরিপূর্ণ। বর্তমানে ফিনদেশীয় খটমট নামগুলি তার মাথায় বোঝাই হয়ে আছে। রাত্রে অস্থিরভাবে ঘুমোতে ঘুমোতে আকাশ থেকে ঝুরির মত ঝুলন্ত শীতার্ত মানুষের অদ্ভুত স্বপ্ন জোলিওর মনে এসে উঁকি মারে। কেমন শীত শীত করে; ধীরে ধীরে মাথার ওপর কম্বলটা টেনে নেয় সে।

জোলিও লোকটা লোভী নয়; সে চায় সবাইই কিছু কিছু ভাগ নিক। তার জন বারো বন্ধুকে সে ফিনল্যাণ্ড আর স্টকহোমে পাঠিয়ে দিল। তার ভাই মারিয়ুস ভাল জাতীয় সংগীত গাইতে পারে, তাকে সে বলল, 'একটা জমকালো গানের জলসার ব্যবস্থা করো। ম্যানারহাইম সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলবে। টাকাটা ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে দিতে পার। অনেক টাকা উঠবে কিন্তু।'

দু সপ্তাহ পরে মারিয়ুস অভিজাত দর্শকদের সামনে উপস্থিত হল, যোসেফিন মতিনির ওপর চোখ রেখে বাঁশী বাজিয়ে চলল সে, 'একদিন এক গাছের নীচে বসে আছে মার্শাল। তখন সবেমাত্র ভয়ানক বিপ্লব শুরু হয়েছে। এক অভদ্র শতছিন্ন কাপড় পরা এক সৈন্য এসে হাজির, লোকটা বলশেভিক—আগুন চাইল সে। বলতে ভুলে গেছি যে মার্শালটি সিগার খাচ্ছিলেন। তিনি বিরক্ত হয়ে সৈনিকটির দিকে তাকালেন এবং জীবন বিপন্ন করে উত্তর দিলেন, জলন্ত সিগারটা এক্ষুনি গিলে ফেলব আমি।'

মহিলারা ঘন ঘন হাততালি দিল। অবশ্য সমস্ত টাকাই মারিয়ুসের পকেটে গেল—ফিনল্যাণ্ডের সাহায্যে গেল না।

জোলিও অনেকবার ভেবেছে মুদ্রাকর পোয়ারিএর উপকারে আসবে সে। কস্মিনকালেও সে টাকার জন্যে তাগাদা করে না। এবার সুযোগ পাওয়া গেল। সৈন্যাধ্যক্ষের আপিসে একটা মানচিত্র দরকার। জোলিও পোয়ারিএর নাম সুপারিশ করল। টেলিফোন করে বলল, 'ওহে, এ একেবারে রাস্তা থেকে চারশো হাজার ফ্রাঁ কুড়িয়ে পাওয়ার সামিল। মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে দেখবার দরকার নেই। তা হলে মাথাটা ঘুরে যাবে একেবারে। আমি যখন ফিনল্যাণ্ডের খটমট নামগুলো উচ্চারণ করবার চেষ্টা করি, মনে হয় জিভে কি একটা আটকেছে যেন।'

কাগজ থেকে ফলাও আয় হচ্ছে কিন্তু দিন দিন কেমন দমে যাচ্ছে জোলিও। কি একটা ভয় করছে সে, কী ভয় সে নিজেই জানে না। দিনে দু বার করে ফ্রন্ট থেকে সংবাদ আসছে 'উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি...' দিন দিন সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে পারী আর আনন্দে মেতে উঠছে।

'একবার ব্যাপারখানা দেখ, ওরা রেশমের পরদার মত বাড়ী আর গাড়ী কিনছে।' জোলিও বলল।

লা ভোয়া নূভেল্-এ ফিনিশ সৈন্যদের পাশাপাশি শামনি ও অন্যান্য শীতকালীন ক্রীড়াকেন্দ্রের স্কিয়িং প্রতিযোগিতার ছবি ছেপে বার হল; পারীর অভিজাত মহিলারা ফিনিশ সৈন্যদের থেকে পিছিয়ে থাকতে চাইছে না। কিন্তু সুন্দরী স্কিয়ার বা সরকারী সংবাদ—কারও ওপরই আস্থা নেই জোলিওর। পৃথিবীতে একটা ভয়ানক কিছু ঘটেছে। এমন ঠাণ্ডা আর আগে কখনো পড়েনি। সেভিল-এ বরফ পড়ছে, সর্দিগর্মি হয়ে শত শত লোক মারা যাচ্ছে আর্জেন্টিনে। তুর্কিতে ভূমিকম্প হয়েছে। এসব থেকে মনে হচ্ছে কোথায় যেন গণ্ডগোল বেধেছে একটা। জোলিও আরো বেশী কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, সর্বদা একটা কাঠের টুকরো নিয়ে ঘুরতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। রাত্রে অবাক হয়ে ভাবতে থাকে সারা দিন সে মইয়ের নীচ দিয়ে যাতায়াত করেছে নাকি! মারি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'অনেক দিন হল আলফ্রের কোন চিঠিপত্র আসেনি।' জোলিও উত্তর দিল, 'কোথাও গিয়ে ফূর্তি করছে হয়ত।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিপদের আশঙ্কায় পকেটের ভেতরকার কাঠের টুকরোটা চেপে ধরল প্রবলভাবে।

রুরের ধনকুবের থাইসেন পারীতে এসে উপস্থিত হল। ফটোগ্রাফাররা ঘিরে ধরল তাকে, সুন্দরী মেয়েরা তাকিয়ে দেখল তার দিকে। থাইসেনের ছোট্ট কুকুরটার ছবি 'লা ভোয়া নূভেল্'-এ ছেপে বেরুল। জোলিও জানে, ব্রতৈল দহরম মহরম করছে লোকটার সঙ্গে।

ফটোগ্রাফের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে গেল না। ব্রতৈল ফোন করল: কাগজে থাইসেনের স্মৃতিকথা বের করতে হবে।

'ঠিক এই জিনিসই আমরা চাই। পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথ তৈরী হবে এর থেকে।'

জোলিও ক্রিলোঁ রওনা হল। ওখানে থাইসেন নেমেছে। অলঙ্কারবহুল কোচে বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল সে। তারপর একটি দাম্ভিক প্রকৃতির লোক বাইরে বেরিয়ে এল। জোলিও সাড়ম্বরে অভিনন্দন জানিয়ে হাসল,

তারপর স্বাধীনতা ও জাতিগুলির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সম্পর্কে আলোচনা করল। থাইসেন নীরসভাবে উত্তর দিল, 'ক্ষমা করবেন। এখন ভয়ানক ব্যস্ত আমি।'

পাণ্ডুলিপিটা জোলিওর হাতে দিয়ে উঠে গেল সে। লেখাটার দিকে তাকিয়ে সে পড়ল, 'সেই বসন্তকালে হিটলারের সঙ্গে আমি একসঙ্গে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরিকল্পনা নিলাম...'

পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরে এল জোলিও। মারিকে কাঁদতে দেখে সে বলল, 'আলফ্রের জন্যে ভাবনা কোরো না। ওখানে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না আর হবেও না কোন দিন। ঐ জার্মান লোকটাকে তোমার দেখা উচিত একবার। ঐ লোকটার উপযুক্ত জায়গা হল বন্দীশালা। কিন্তু এক্ষুনি ও তেসার সঙ্গে দেখা করতে গেছে, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। কাল তার স্মৃতিকথা ছেপে বার করছি আমরা। মতিনি বলল, 'যোগাযোগ স্থাপন করছি আমরা।' এর অর্থ বুঝতে পারলে? কেঁদো না, মারি লক্ষীটি। কোন অমঙ্গল হবে না আলফ্রের। ফিনল্যাণ্ড বাদে আর কোথাও যুদ্ধ হচ্ছে না।'

মুখের ওপর থেকে রুমালটা সরিয়ে নিল জোলিওর স্ত্রী, তারপর মৃদুভাবে বলল, 'মারা গেছে আলফ্রে।'

এবার টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে খামের ওপর নজর পড়ল জোলিওর।

১৩

মিশোর পল্টনকে লা হেভ্‌র্‌এ পাঠানো হয়েছে। রীতিমত ভীত হয়ে উঠেছে মিশো; ভাবছে তাদের ফিনল্যাণ্ডে পাঠানো হবে এবার। তার জীবন যে ব্যর্থ নয় এবং সুখ যে শূন্যগর্ভ নয় তার প্রতিভূ হিসেবে সে তাকিয়ে আছে মস্কোর দিকে। মস্কোতে যা কিছু ঘটছে সমস্তই রহস্য লাগে তার কাছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয় যে, এ সবের সঙ্গে সে পরিচিত ও অঙ্গীভূত। যখন সে রেডিওতে আবখাসিয়ার লেবু বনের গল্প শোনে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এক আনন্দময় হাসিতে। মস্কোর ভূগর্ভ রেলপথ নির্মাণের খুঁটিনাটি খবর সে মন দিয়ে শোনে যেন তারা ওর নিজের বাড়ী তৈরী করছে। 'ব্রাসেলস্-এ

আমাদের পিয়ানো-বাজিয়েরা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছে,' সে বলল। আমাদের—কথাটা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই মনে এল তার। একবার সে দেনিসকে বলেছিল, 'এমন কি এই ফুলগুলো পর্যন্ত আমাদের পক্ষে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সাধারণ ফুলগুলো—ডেজি আর বাটারকাপ।' যখন এই কথা মনে পড়ে আর সইতে পারে না মিশো: সে সোভিয়েট ইউনিয়নের মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে, তার অপর্যাপ্ত সবুজাভ বিস্তৃতিতে খুশি হয়ে ওঠে। এমন কি দেনিসের সঙ্গে গত সাক্ষাতের সময় সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'মস্কোর প্রদর্শনী কেমন চলছে?' কল্পনায় সুদূর শহরটিকে দেখতে পায় সে, যেন কত বছরই না থেকেছে সেখানে। এর জন্যে সে মরতেও তৈরী এবং সে একাই নয়। তার মত শত শত সৈনিক এই মতাবলম্বী—এই বিশ্বাস বাঁচিয়ে রেখেছে তাকে। এবং অন্যান্য পল্টনেও তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে একটা গোপন ভ্রাতৃত্ববোধ।

আর এখন লা হেভ্‌র্‌-এর বিস্তৃত পথ দিয়ে হু হু করে ছুটে চলেছে বাতাস—পরদা ছিঁড়ে পড়ছে, কাত হয়ে পড়ছে বিজ্ঞাপনের বোর্ডগুলো, পথচারীরা ঘুরপাক খাচ্ছে ঘূর্ণির মধ্যে। বন্দরের বাঁশীগুলো আর্তনাদ করে উঠছে, দাঁত কড়মড় করছে কপিকলগুলো। দিন রাত কাজ হচ্ছে। অভিযাত্রী বাহিনীর কথা বলাবলি করছে লোকে।

মিশো এক-এক করে সৈন্যদের সঙ্গে আলাপ করছে। সে জানে না, কে কমিউনিস্ট আর কে নয়, কিন্তু অনেক সময় আভাসে বোঝা যায়! কেউ হয়ত বলে যে 'লুমানিতের' সংখ্যাটা তার হস্তগত হয়নি, আবার কেউ কেউ হয়ত ভীইয়ারের মহানুভব মনের প্রতি কটাক্ষ করে বা তোরে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে 'আমাদের মোরিস।' মিশো ফিস ফিস করে বলল, 'ওরা যদি আমাদের রুশদের বিরুদ্ধে লড়তে পাঠায়, আমরা নিশ্চয়ই অস্বীকার করব। ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারবে না ওরা। সারা পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে যাবে এই কথা।'

উত্তর এল, 'জানি না। অন্যেরা কী বলছে? তোমার মনে রাখা উচিত এটা নির্বাচন নয়। তোমাকে গুলি করে মারতে পারে ওরা।'

মিশোর কুণ্ঠাহীন ভাষা আর হাসিখুশি ভাব পছন্দ করে লোকে। সার্জেণ্টকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করলে লোকে বাহবা দেয় তাকে। কিন্তু বিদ্রোহ করা সম্পূর্ণ আলাদা একটা জিনিস। মিশো অনুপ্রাণিত হয়ে লেনিনগ্রাদের গল্প করল যেখানে

রাশিয়ানরা প্রাণপণে প্রতিরোধ করছে। ওখানে মস্ত বড় নদী আছে একটা; প্রাসাদের মধ্যে বাস করে ওখানকার মজুররা। লেনিন ওখানে থাকতেন। যারা ফ্রণ্টকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখতে চায় তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে আখ্যা দিল মিশো। উত্তেজিত ও ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে বিভিন্নভাবে কথা বলল সে, যেন আগামীকালই পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে ওদের।

অভিযাত্রী বাহিনীতে এই পল্টনও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শুনে ঘুমোতে পারল না কর্নেল কুরিএ। রাতগুলো তাস খেলে কাটাতে লাগল। লোকটার মেজাজ চড়া আর চরিত্র দুর্বল। গত যুদ্ধে সে তার সাহসের পরিচয় দিয়েছে এবং সেজন্যে অলংকৃত হয়েছে দু বার। মৃত্যু সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত কিন্তু জীবন, কর্তৃপক্ষ, রাজনীতির চতুর জাল, নিন্দাবাদ আর মিছিলকে সে রীতিমত ভয় করে চলে।

সারা শীতকাল পিকার্ডিতে ছিল পল্টন। প্রতিরোধ-দুর্গ তৈরী করার কাজে বেকার লোকদের নিযুক্ত রাখবে বলে ভেবেছিল কুরিএ। কিন্তু পিকার ধমক দিল, 'আতঙ্ক সৃষ্টি করতে কে বলল আপনাকে? এখানে ওদের আসার কোন সম্ভাবনা নেই। হতাশাবাদীদের কথায় কান দিচ্ছেন আপনি।'

রীতিমত ত্রস্ত হয়ে উঠল কুরিএ। ওদের বোঝে কার সাধ্যি? এ হল রাজনীতির ব্যাপার। কাজ থামাবার নির্দেশ দিয়ে সে ঘোষণা করল, 'প্রতিরোধ-দুর্গ বানিয়ে কোন লাভ নেই। কেবল হতাশাবাদীরাই এর প্রয়োজনে বিশ্বাস করে। জার্মানরা এদিকে আসবে না।'

এখন তারা ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করছে। কেউ জানে না সৈন্যরা কি মতামত পোষণ করে। কিন্তু ওখানে গিয়ে রুশদের সঙ্গে তো বন্ধুত্ব পাতাতে পারে ওরা। যাই হোক, কার মাথায় ঢুকল এই পরিকল্পনাটা? কথায় বলে দুটোর চাইতে একটা শত্রু শ্রেয়। কী করে রাশিয়া জয় করা যায়? এমন কি নেপোলিয় পর্যন্ত আটকে পড়েছিল ওখানে। গামলাঁ কি সত্যি সত্যিই এ ব্যাপারটা ঘটতে দেবে? কিন্তু গামলাঁ পর্যন্ত শক্তিহীন; রাজনীতিজ্ঞরাই সব কিছুর ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

হতাশায় কর্নেল তাসগুলো ফেটিয়ে নিল; তবু মনের মত তাস মিলল না। দুটো গোলাম দরকার তার। এই নিয়ে ছয়বার গোলাম পেল না সে! যাক—আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে।

মিশো তার কমরেডদের বলছে, 'সীমান্ত দেখছ? লোকদের হটিয়ে নিচ্ছে ওরা। রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়। তারপর হিটলারের সৈন্য আসুক এখানে! এই ওদের ফন্দি!'

ম্লান প্রদীপের আবছা আলো লোকদের মুখে ঠিকরে পড়েছে। চুনকাম করা দেওয়ালে দপ্‌দপ্‌ করছে বিলম্বিত ছায়াগুলো। নানা রকম লোক এসে জমেছে। আসনিএর থেকে তালা-কারিগর এসেছে একজন; মনে হয় লোকটা কমিউনিস্ট। আরেকটি লোক, সে কৃষক—ফেলে-আসা বাড়ীর কথা বলছে সে। তৃতীয় লোকটি টহলদার ব্যবসায়ী, সেলাইএর কল বিক্রি করে সে। তাদের মধ্যে একজন কুলি, কসাই ও ডাকপিয়নও আছে। কী ভাবছে ওরা?

রহস্যটা জানাজানি হয়ে গেল হঠাৎ। পিকার্ সৈন্য পরিদর্শনে এল। বাছাই করা হল দুটো পল্টন। কুরিএ মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল, কেমন উদ্‌ভ্রান্ত ভাব, লোকগুলোর দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। হঠাৎ তার পেছনে কতকগুলি লোক চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের?'

লাল হয়ে উঠল কর্নেলের মুখ। রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বলল, 'কে চিৎকার করছে?'

উত্তর এল, 'আমরা সবাই!'

কি করবে ভেবে পেল না কুরিএ। ভয় দেখাবার বা বোঝাবার চেষ্টা করল না। শুধু লোকগুলোর কাছ থেকে বন্দুকগুলো নিয়ে নেওয়া হল। গুজব রটল সামরিক আদালতে বিচার হবে তাদের। রাত্রে লোকদের ঘুম এল না। তাদের শৈশব, তাদের শান্তিকালীন জীবন ও পরিবারের কথা মনে পড়ল একে একে।

তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাদের সর্দার কে?' প্রত্যেকের মনে মিশোর ছবি ভেসে উঠল কিন্তু কেউ তার নাম বলল না। এবং চৈতালী ঝড় সারাক্ষণ তোলপাড় করে তুলল শহরটাকে।

পরদিন পিকার্ কর্নেলকে বলল, 'ওদের মধ্যে তিন-চারজনকে গুলি করে মারতে হবে যাতে ব্যাপারটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে ওদের মধ্যে।'

কুরিএ চিৎকার করতে শুরু করল, 'তারপর এর ফলটা কি হবে ভাবতে পারছেন? ওরা আমাদের খুন করবে।'

তৎক্ষণাৎ নিজের ভুল বুঝতে পেরে মাথা নীচু করল সে। সে সামরিক আদালতে একটা বিচার চেয়েছিল—এখন মনে হল সে-ই ওদের সর্দার।

পিকার্ পাশ ফিরে নোংরা জানলার কাঁচে আঙুল বাজাতে লাগল। ভুলে গেল একজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী দাঁড়িয়ে আছে তার পাশে। নিজের মনে মনে আবৃত্তি করল, 'মার্ন, ভের্দঁ্য...সে সমস্ত অতীতের কথা। একে ফৌজ বলবে কেউ? যত সব জংলী, ছোটলোকদের দল।' ভাবল, কতবার না সে ব্রতৈলকে বলেছে, 'সাবধান। এর কর্মফল ভোগ করতে হতে পাবে আমাদের।' অবশ্য ফিনল্যাণ্ডে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারলে লোকের মনোবল দৃঢ় হবে। কিন্তু র‍্যাডিকালরা স্বভাবতই দ্বিধাগ্রস্ত।, আব সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও অনেক কমিউনিস্ট আছে। কী হবে? অফিসাররা অবশ্য জার্মানদের বিরুদ্ধে যাবে না। এর চাইতে 'আত্মসমর্পণ করছি' কথাটা বলা অনেক ভাল। খেলার ঘুঁটিগুলো এখনো নিরাপদ আছে, শুধু খেলাটা ডুবে গেছে একেবারে।'

পিকাব্ জানলার বাইবে তাকিয়ে দেখল। এক খববের কাগজের হকারকে ঘিরে ধরেছে লোকে। হাওয়ায় কাগজগুলো এলোমেলো ছড়িয়ে পড়েছে চওড়া রাস্তার ওপর।

'লা ভোয়া নৃভেল্! তাজা খবব! হেলসিঙ্কি ও মস্কোব মধ্যে আপোষরফার গুজব।'

১৪

যখন টেলিগ্রামটা হাতে এল, সেদ্ধ ডিম খাচ্ছিল তেসা। 'শান্তি প্রস্তাব—স্টকহোম—ফিনিস প্রতিনিধিদল' কথাগুলো নেচে উঠল তার চোখের সামনে। ভ্রূভঙ্গী কবল তেসা যেন শাবীবিক যন্ত্রণা অনুভব কবছে সে। সুস্থ বোধ করার পর দালাদিএকে ফোন করল।

বলল, 'কী দুর্ভাগ্য!'

উত্তবে দালাদিএ বলল যে সে বেতাবে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছে একটা। সে ফিনদের বলবে যে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাক, তাদের সাহায্যে যাবে বলে অভিযাত্রী বাহিনী প্রস্তুত হয়েই আছে।

তেসা মাথা নাড়ল। 'বড় দেরী হয়ে গেছে, বন্ধু। ওরা তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। অন্য কোন একটা পথের চিন্তা করতে হবে ওদের।'

'ছোট ছোট জাতিগুলির মর্মান্তিক পরিণতি'র কথা বলতে শুরু করল দালাদিএ। বিরক্ত হয়ে তেসা বাধা দিল: ট্রাজেডি এ কথা ঠিকই। কিন্তু শুধু ওদের

বেলাতেই নয়। ইচ্ছে হলে আমার অনুমানে আস্থা রাখতে পার যে এই মন্ত্রিসভা এক সপ্তাহও টিকবে না।'

ভোটগুলো শুনতে লাগল তেসা। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিপক্ষেই যাবে। ন্যায় বলে কোন কিছু নেই পৃথিবীতে। ম্যানারহাইম—ঐ লোকটার ভুলের জন্যেই শাস্তিভোগ করতে হবে তাদের। ফিনদের অভিশাপ দিল তেসা। জংলী মানুষ ওরা!

ঠিক যা অনুমান করেছিল তাই হলঃ সামান্য লোকই ভোট দিল গভর্নমেণ্টের পক্ষে। একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল রেনো। লোকটাকে তেসা ঘৃণা করে, কেমন বামনের মত চেহারা, অত্যাশ্চর্য কিম্ভূতকিমাকার জীব, একটা বাঁদর যেন! তেসাকে তার মন্ত্রীপদ না ছাড়তে প্রস্তাব করল রেনো।

তেসা বলল, 'আমি ভেবে দেখব। বন্ধুদের সঙ্গেও পরামর্শ করে দেখি একবার।'

তৎক্ষণাৎ দালাদিএর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল তেসা। দালাদিএ বসে বসে ক্ষুধা-উদ্রেককারী মদ খাচ্ছে। সে তার ভ্রূ-জোড়ার নীচ দিয়ে তাকিয়ে দেখে বলল, 'সর্বনাশা লোক ঐ রেনো। কিন্তু আমি নিজের জায়গা ছাড়ব না ঠিক করেছি। একেবারে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখব।'

দালাদিএর কাছে কোন সুবিধা হবে না ভেবে ব্রতৈলের কাছে যাওয়াই স্থির করল তেসা। উঠতি লোক ও। ব্রতৈল যদি তাকে বিপক্ষে যেতে বলে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দেবে সে। অপেক্ষা করার আর নাগরিক শৌর্য দেখানোর কায়দাটা জানতে হবে তাকে।

ব্রতৈলের পড়ার ঘরে এক দীর্ঘ, নীলচক্ষু লোকের সঙ্গে দেখা হল তেসার। সে বলল, 'মার্সাই সম্মেলনের ঠিক আগেই আপনার সঙ্গে আলাপ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।'

তেসার আবছা মনে পড়ল লোকটা কোলমারের প্রতিনিধি, ফুজেকে বক্তৃতা দিতে যে বাধা দিয়েছিল। 'নিশ্চয়ই, মনে আছে বৈকি,' বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে তেসা বলল।

বাইস চলে যাবার পর ব্রতৈল তেসাকে বলল, 'র‍্যাডিকালদের আমার কাছে আসতে দেখে অবাক হয়ে যেও না। জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলছি আমরা। বাইস গ্রঁদেলের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করে। সাধারণত আমার ধারণা, কাজগুলো নেহাৎ মন্দ এগুচ্ছে না।'

ব্রতৈলের স্পষ্টবাদীতায় ধাঁধা লাগল তেসার। বলল,'আমার মতে সমস্ত ব্যাপারটা রীতিমত ঘোরালো। ফিনরা ডুবিয়ে দিয়েছে আমাদের। আর রেনো...ও লোকটা সব কিছু করতে পারে।'

'আমি ওর প্রশংসাকারী নই কিন্তু।' ব্রতৈল বলল, 'ও তো ইংলণ্ডের হাতের পুতুল। ও ডোমিনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে চায় আমাদের। কিন্তু লোকটা আসলে প্রজাপতি। গ্রীষ্মকাল পর্যন্তও টিঁকতে পারবে না। ইতিমধ্যে ওকে আমাদের কাজে লাগাতে পারি আমরা। গামর্ল্যাকে হটিয়ে দেবে ও, তাতে সুবিধা হবে আমাদের। আমরা পিকারকে তুলে ধরব। তাছাড়া, বামনটা অনেকটা উঁচুতে উঠেছে। লোককে দেখাবার মত একটা কিছু করতে হবে ওকে। এবং প্রথম লাফেই নীচে নেমে আসবে ও।'

'আমাকে মন্ত্রীপদ দিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করতে চাই আমি।'

'কোন মতেই না! দেশের স্বার্থের কথা ভাবতে হবে তোমাকে। মন্ত্রিসভায় আমাদের একজন লোক রাখতে হবে বৈকি।'

তেসাকে রাজী করানোর দরকার হল না। ভাল কথা, রেনোর সঙ্গেই কাজ করবে সে! বামপন্থীরা এই জন্যে তাকে অনেকাংশে মাফ করবে। দক্ষিণ-পন্থীদের সম্বন্ধে ভয় ছিল তার। কিন্তু ব্রতৈল তো নিজেই আশীর্বাদ করল। হ্যাঁ নিশ্চয়ই, মন্ত্রিসভায় যাবে বৈকি! মন্ত্রী হওয়া বড় চমৎকার কিন্তু। তার চেয়েও সম্মানের হল যে, ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করবে যে যুদ্ধের সময়ে তেসা তার দায়িত্ব ফেলে পালায়নি।

নতুন গভর্নমেন্টের মন্ত্রীদের তালিকা যখন জোলিওর হস্তগত হল, চিৎকার জুড়ে দিল সে, 'ভাব দেখি একবার কী কাণ্ড! ত্রিশজন মন্ত্রীর মধ্যে ষোলজন হল আইনজ্ঞ। এই বুঝি যুদ্ধ-মন্ত্রীসভা!'

সংবাদদাতাদের তার এল। বিবর্ণ হয়ে উঠল জোলিও। আর্তনাদ করে উঠল, 'দুর্লক্ষণ! এট্‌না আবার আগুন ওগরাতে শুরু করেছে। অশুভ চিহ্ন ওটা! ওরা নালিশ জানাচ্ছে যে ফিনল্যাণ্ডে সুযোগ হারিয়েছে। কিন্তু এদিকে আমি ভয় পাচ্ছি মুররা মার্সাইএ এসে পড়বে।'

সেনা-কর্তৃপক্ষ মুদ্রাকর পোয়ারিএর কাছ থেকে মানচিত্র পেয়ে অবাক হয়ে গেল। জিজ্ঞাসা করল, 'ফিনল্যাণ্ডের মানচিত্র আমাদের কী দরকার?'

অবশ্য মানচিত্রের দাম দিয়ে দিল সঙ্গে সঙ্গে।

তিন সপ্তাহ কাটল। একদিন ভোরবেলা জোলিও শুনল নরওয়ে উপকূলে মাইন পাতা হচ্ছে। তৎক্ষণাৎ পোয়ারিএকে ডাকল টেলিফোনে: 'আরেকটা অর্ডার পাওয়ায় অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। মেরু দেশের ভাল্লুকদের সঙ্গে আলাপ করতে চায় রেনো। এখন নরওয়ের মানচিত্রের দরকার পড়বে ওদের, দেখে নিও। তোমার দামটা কমিও না কিন্তু।'

মতিনি জমকালো একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করল—দক্ষিণপন্থীদের তরফ থেকে তেসাকে এই প্রথম সম্বর্ধনাজ্ঞাপন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ব্রতৈল, লাভাল, ফ্লাঁস্তা, গ্রঁদেল, মিয়েজার ও জেনারেল পিকার্—সবাই এসেছে।

মহিলারা ছুটিতে বেড়াতে যাবার পক্ষে কোন্ জায়গাটা ভাল তাই নিয়ে আলোচনা করছে। মাদাম পিকার্ ব্রিয়াঁশঁর পক্ষে।

'জানি, জায়গাটা ইতালীয়ান সীমান্তের কাছে।' সে বলল, 'কিন্তু আমার স্বামী বলেন, মুসোলিনী কোন মতে যুদ্ধ ঘোষণা করবে না। এই ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে বিশ্রাম নিতে চাই আমি। ও যায়গাটা সত্যিই বেশ নিরিবিলি আর শান্ত।'

মাদাম মিয়েজার বলল, সে বিয়ারিৎস-এ কয়েক সপ্তাহ কাটাতে চায়। সব সময়ে ভাল ভাল লোকের সাক্ষাৎ মেলে ওখানে। তাছাড়া অ্যাটলাণ্টিককে মনেপ্রাণে ভালবাসে সে।

মুশ্ কোথায় যাবে জিজ্ঞাসা করল সবাই। সে বলল, 'উনি তো চান আমি সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে বিশ্রাম নিই। কিন্তু জানি না...' পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুইস হোটেল, টহলদারদের উচ্চহাসি, কিলমানের ঘাড়, গরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি আর তারপর সমস্ত ঘটনা—লুসিয়ঁর বন্য আচরণ ও ক্রুদ্ধ মুখ, একে একে মুশের মনে পড়ল।

অবিশ্বাস্য রকম খাটো পরিচ্ছদ থেকে বেরিয়ে থাকা নগ্ন কাঁধ দুটোয় পাউডারের পুরু প্রলেপ দিয়ে মাদাম মতিনি অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে, 'মঙ্গলবার একটা ভয়ানক দিন—মাংস নেই, মিষ্টি কেক নেই, মদ নেই। ভাগ্যিস, ফরাসীরা অত খুঁতখুঁতে নয়। জেনারেল, এই আর্মাঞাক্‌টা সুপারিশ করছি আপনাকে। আমার ভাইয়ের ভাঁটিখানার মদ। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে আপনাকে, না?

'না, না, কিছু নয়। হ্যাঁ, এই আর্মাঞাক্‌টা খাসা।'

'কোন খবর আছে?'

'ভাল রকম কিছু নয়। মানে যুদ্ধের ভাল খবর কিছু নেই।' জেনারেল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, 'ওরা বলছে, ওরা বার্জেন অস্‌লো রোড প্রতিরোধ করবে।

কিন্তু জার্মানরা সমস্ত কিছু ঝেঁটিয়ে সাফ করে ফেলছে। উত্তরাঞ্চল বাদে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। অবস্থা......'

শেষ কথাটা কানে গিয়েছিল তেসার, সে তৎক্ষণাৎ সায় দিল, 'অবস্থা নিঃসন্দেহে উন্নত হয়েছে বৈকি। আমি বড় রকমের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আশা করেছিলাম কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, চেম্বারের সর্বসম্মত ভোট আমাকে অবাক করে দিয়েছে। কী রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি! আজ আমরা সারা ফ্রান্সের প্রতিনিধি। তাই নয় কি, জেনারেল?'

বার্জেন আর পাহাড়ী খালের কথা বলতে শুরু করল পিকার্। সাড়ম্বরে হাত নাড়ল তেসা। বলল, 'ও হল সামান্য খুঁটিনাটি।'

পিকার্কে দেখেই তেসা বিরক্ত হয়ঃ লোকটার মধ্যে কেমন একটা সৈনিক-সুলভ অন্ধতা আছে। জার্মানরা কোথায় গিয়েছে? একটা বন্য দারিদ্র্যপীড়িত দেশে। পাহাড়ী খাল দেখতে গিয়ে মধ্যরাত্রির সূর্যকে তারিফ করাটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত খেয়ালখুশির ব্যাপার। সুখের বিষয় যে জার্মানরা টোপ গিলেছে। ফলে ফ্রান্সের সীমান্ত থেকে বহুদূরে সরে যেতে হয়েছে তাদের।

'বৃটিশরাই কেবল নরওয়েতে একটা চাল মারবার তালে আছে। তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। অ্যাডমিরাল দার্ল্যাঁ ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছে। ও বলছে, এর চেয়ে হিটলার আসা অনেক ভাল।'

অবজ্ঞার হাসি হাসল ব্রতৈল। বলল, 'বৃটিশরা, হেঃ! ১৯১৬ সালে সম্-এ দেখেছিলাম তাদের। প্রতিদিন সকালে ট্রেঞ্চে বসে বসে দাড়ি কামাত। উত্তর দিকের বন্য তুন্দ্রা অঞ্চলে ওরা কি করে একবার দেখতে চাই।'

অতিথিরা একসঙ্গে সায় দিল। 'বসে বসে ওরা ওদের প্রিয় কড মাছ খাবে।' 'কিংবা কড মাছ ওদের খাবে।' 'রেনোটা কী ভয়ই না পেয়েছিল!' 'সত্যি ক্ষুদে ভাল্লুকটার সময় আরামে কাটছে না। আমার ধারণা, অস্ট্রেলিয়' গভর্নমেণ্ট সব চেয়েও বেশী স্বাধীনতা ভোগ করে।' 'হাঃ, হাঃ, আমাে অবস্থাটা ঠিক ক্যাঙারুর মত।'

গভর্নমেণ্টকে রক্ষা করা নিজের কর্তব্য বলে মনে করল তেসা। বলল, ' কথা, রেনো লোকটা ইংলণ্ড-ভক্ত আর উঁচকপালে। কিন্তু কাউণ্টেস ে দ্য পর্ত অত্যন্ত চতুর মহিলা। উনি পুরুষমানুষের কাছে প্রেরণা ও সহ' প্রতীক। আমি অবশ্য কাউণ্টেসের বন্ধু বোদুয়ার মারফৎ কাজকর্ম করি।'

কে একজন ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল, 'পরস্ত্রীর প্রেমিক !'

তেসা বলে চলল, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে ব্রতৈল ও লাভাল মন্ত্রিসভায় নেই। আমরা নরওয়েতে দুঃসাহসিক অভিযানে বার হচ্ছি না এ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চিত থাকুন। আমিই প্রথম ফিনল্যাণ্ডকে সাহায্য পাঠানোর কথা বলি। দুর্বলকে সাহায্য করতে ফ্রান্স সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু নরওয়ের ভাগ্যে আমরা কিছুমাত্র চিন্তিত নই। ওটা জার্মান আর ইংরেজদের মধ্যে একটা ঝগড়ার ব্যাপার। চার্চিল গিয়ে গণ্ডগোলটা মেটাক। আমাদের দেশের কথা বলতে গেলে, আমরা যে-কোন রকম আকস্মিক আক্রমণের জন্যে তৈরী। হল্যাণ্ডের পথ দিয়ে জার্মানরা অগ্রসর হতে পারবে না কারণ ডাচরা বাঁধগুলো খুলে দেবে! ওরা পরীক্ষা করেছিল, চমৎকার উৎরেছে পরীক্ষাটা। আর বেলজিয়ান প্রতিরোধ ব্যবস্থা তো ম্যাজিনো লাইনের মতই মজবুত। অবশ্য জার্মানদের কতকগুলো ভাল ভাল বিমান ও ট্যাঙ্ক আছে, কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। জেনারেল লেরিদো বলে যে জবরদস্ত আক্রমণ করতে হলে আমাদের একটা বন্দুকের মুখোমুখি জার্মানদের ছটা করে বন্দুক খাড়া করতে হবে। সুতরাং, বোঝা যাচ্ছে যে ওদের কোন আশা নেই।'

'আসলে বিপদটা দেশের ভেতরেই,' মিয়েজার বলল, 'কমিউনিস্টরা আবার মাথা তুলছে। কুরন্তভের ধর্মঘটটা ছড়াতে পারে। ওদের ইস্তাহারগুলো পড়ে দেখুন। এই যে, পড়ে দেখুন এগুলো।'

'অসহ্য !'

'ডেপুটিদের গুলি করে মারাই ভাল ছিল।'

'ওদের কিন্তু বেশ খেলো করা হয়েছে। বিচারের সময়ে গ্রঁজের বক্তৃতা নিয়ে আলোচনা করছে প্রত্যেকে।'

'সমস্ত বিচারটাই একটা মস্ত বড় ভুল। আমি দালাদিএকে এ কথা বলেছিলাম। দেশদ্রোহিতার অপরাধে ওদের বিনা বিচারে আটক রাখা উচিত ছিল।'

তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আইন দিয়ে আমাদের হাত-পা বাঁধা। কথাগুলো মনে করে দেখো: দু বা তিন বছরের কারাবাস। কার সাধ্য তা আটকায়! রেনোটা বোকা। আর মাদেল অন্ধ হিটলার-বিরোধী—আর ভয়ানক বিপজ্জনক বক্তা ও। কমিউনের প্রতিনিধি হবার তালে ঘুরছে। আমি সেরলের সহযোগিতা পাব আশা করছি। লোকটা সমাজতন্ত্রী কিন্তু খাসা লোক। ভাগ্যিস,

আইন বিভাগের মন্ত্রীপদ পেয়েছে ও। লোকটা খোলাখুলি বলে যে মস্কোর মড়ককে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে হবে।'

এক গ্লাশ আর্মাঞ্যাক্ খেয়েও বিষণ্ণ বোধ করছে তেসা। ভাবছে দেনিসকে ওরা তো গুলিও করতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে আবাব একগুঁয়ে আর সাহসী হয়ে উঠল। অতিথিরা তাদের সমর্থনসূচক কথোপকথনে চাঙ্গা করে তুলল তাকে। চিনির ডেলা তুলবাব চিমটে হাতে নিয়ে গোল টেবিলের ধারে বসে রইল তেসা। ভাবল, রাষ্ট্রের হাল ধরে বসে আছে সে।

তারপর পিকার্ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল। জেনাবেল গর্ সম্পর্কে নানা রকম মজার গল্প বলছে সে।

যোসেফিন মতিনি তেসার কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'লুসিয়ঁ কোথায়?'

বিব্রত বোধ করল তেসা। এই প্রথম কেউ তাকে তার ছেলের খবর জিজ্ঞাসা করছে। কোন চিন্তা না কবেই সে উত্তর দিল, 'ও নিরুদ্দেশ হয়েছে।' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝল যে উত্তরটা তেমন স্পষ্ট হয়নি, তাই নিজেকে শুধরে নিল, 'হয়ত মাবাই গেছে। বেচাবী লুসিয়ঁ।' তেসার গলা কেঁপে উঠল।

যোসেফিন মতিনি এত বিচলিত হল যে কেঁদে ফেলল ঝর ঝর করে। তেসাও বুঝল তার চোখে জল জমছে, তাই আঙুল দিয়ে চোখ মুছল আর পাখীর মত নাক ঝাড়ল।

মতিনি আরো কাছে এসে দাঁড়াল। প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল তেসা: এই ভাবে ভেঙে পড়া ঠিক নয়। ক্লেমসোর মত দৃঢ় হতে হবে তাকে।

সে বলল, 'হিটলার আর একটা ভুল করেছে। জল-গণ্ডারদের সঙ্গে লড়তে চলেছে ও। ইতিমধ্যে আমরা নিজেদের কাজ করে যাব। দালাদিএ ফৌজ থেকে পাঁচ লক্ষ কৃষককে রেহাই দেবে বলে স্থির করেছে। চাষবাস করতে হবে আমাদের। রুটি না খেয়ে বাঁচতে পারি না আমরা। তুকান আর ফ্রুজে মূর্ছা গেলে আমাদের ক্ষতি নেই। পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দেব যে ফরাসীদের সহ্যশক্তি কতখানি।'

মতিনি মাথা নাড়িয়ে সায় দিল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিক বটে। তারপর তেসাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল যাতে সবাই শুনতে পায়, 'পোয়াটুতে জমি কিনে কাজের কাজ করেছেন আপনি। জায়গাটা সীমান্ত থেকে অনেক

দূরে, ফ্রান্সের নাভিসূত্র বলা চলে। আমার জমিটা সাভয়তে। আর সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভয় পাচ্ছি। ইতালীয়ানরা একটা অদ্ভুত জাত, বুঝলেন! কিন্তু এখানে আপনি শান্তিতে ঘুমোতে পারেন। পোয়াটুতে কেউ বিরক্ত করতে আসবে না আপনাকে। আমি ব্রতৈলকে সব সময়ে বলে আসছি যে আপনার মন খাঁটি রাজনীতিজ্ঞের মন।'

১৫

দালাদিএর গদি রেনো পেয়েছে, খবরটা পেয়ে ম্যিয়েজার গ্রঁদেলকে বলল, 'পয়লা মে একশো আশিটা বোমারু বিমান ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল আমার। কিন্তু অবস্থা বদলেছে এখন। মন্ত্রীমশাইকে বলবেন, বোমারু-গুলো আরো ভালভাবে পরীক্ষা করা দরকার।'

গ্রঁদেল হেসে উত্তর দিল, 'জানি, রেনো লোকটা দুঃসাহসিক। সত্যিকার যুদ্ধ পর্যন্ত বাধিয়ে বসতে পারে ও। শাস্তর আলপিনকে নারভিকএ পাঠাবার কি দরকার পড়ল? মনে হয় শিগগিরই ভাগিয়ে দেওয়া হবে ওকে। একবার হারলেই যথেষ্ট। জার্মানরা উঠে পড়ে লেগেছে। গুজব উঠেছে ও নাকি দেসেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। খুব ভাল লক্ষণ: দেসেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে কোন সুবিধা হবে না ওর।'

দেসের, যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সর্বশক্তিমান ছিল, সম্প্রতি হাসির পাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যঙ্গ-চিত্রকররা তার ছবি এঁকে বেশ দু পয়সা কামাচ্ছে। ব্রতৈল জোলিওকে নির্দেশ দিয়েছে, 'ও যে একটা আন্তর্জাতিক বণিক, কামান ব্যবসায়ী আর ধনতন্ত্রবাদী একথা প্রচার করতে থাক। অবশ্য যুদ্ধে জয় হোক তা ও চায়। তুমি যত ইচ্ছে ওর দুর্নাম রটাতে পার। তেসা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সেন্সার তাতে মাথা গলাতে আসবে না।'

মতিনিও জোলিওকে দেসেরের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করতে বলল।

প্রতিবাদ জানাল ক্ষুদে সম্পাদকটি, 'রাজনৈতিক ধারার গতি পরিবর্তন করা যেতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু দেসের আমাকে অসময়ে সাহায্য করেছে। একজন পুরনো বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা কি জিনিস তা কি আপনি জানেন? আর তা ছাড়া লোকটা সাধু। অবশ্য ও মার্সাই-এর লোক নয়, কিন্তু মার্সাইকে ভালবাসে মনেপ্রাণে।

ও জেলেদের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলে তা আমি শুনেছি। লোকটা খাঁটি ফরাসী। এখন আমায় লিখতে হবে ও একজন অস্ট্রেলিয়ান ইহুদি, আমেরিকানদের দালাল।'

অতীতে শীর্ষস্থানীয় লোক ছিল দেসের। টলটলায়মান অবস্থা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোকেব ধারণা হল ও ডুবে যাচ্ছে। লোকে বলতে লাগল, 'একেবারে ডুবে গেছে ও,' যদিও তখনো সমস্ত কারখানা ও শেয়ার সম্পত্তি তার হাতে। তার কাজকর্ম কেমন চলছে একবার খুঁটিয়েও দেখল না কেউ। 'সীন' কারখানার ইঞ্জিনিয়াররা বলল, 'বার্ষিক সভা বসার আগে পর্যন্ত ও কোনরকমে টেনে হিঁচড়ে চালিয়ে নেবে।' এমন কি, বাগানের পুরনো মালীটাও মনিবের ধনসম্পন্নতার ওপর সন্দেহ হওয়ায় মাইনেটা আগাম চেয়ে নিল।

ক্রমে ক্রমে মদের মধ্যে ডুবে গেল দেসের। জনসাধারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখল নিজেকে, বুকের ব্যথার কথাটা চেপে রাখল জিনেতের কাছ থেকে। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সে ঠাট্টা করে বলে, 'এস, আমার নিজেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই একবার—একজন অস্ট্রিয়ান ইহুদি বণিক যার মালী মাইনে আগাম না পেলে কাজ করে না।' যাদের সঙ্গেই কথা বলে সে, মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা; কেমন ভয় লাগে দেসেরেব দিকে তাকাতে। রোগে এবং চিন্তায় কুৎসিত হয়ে আসছিল তার মুখ। তারপর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মুখটা কেমন থলথলে আর কদাকাব হয়ে এল।

জিনেতের তীব্র ও অসহ্য করুণা হল দেসেরের ওপর। এই মনোভাব তাদের দুজনের কাছেই অপমানজনক, একাধিকবার জিনেৎ জোর করে ক্রুদ্ধ হওয়াব চেষ্টা করল, দেসেরকে কড়া কড়া কথা বলল যাতে সে ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে ওঠে। কিন্তু দেসের শুধু ঘাড় তুলে বুড়ো কুকুরের মত ম্লান চোখে তাকাল। জিনেৎ দেসেরের গলায় হাত রেখে নানা রকম প্রেম-সম্ভাষণ করল। মন্ত্রোচ্চারণের মত ফিসফিস করে দেসের বলল, 'জিনেৎ' যেন সে-ই একমাত্র তাকে রক্ষা করতে পারে। সে জানে, জিনেৎই তাকে জীবনের গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছে। মৃত্যুকে সে অত্যন্ত ভয় করে—তার যন্ত্রণাকে নয়, তার শূন্যতাকে। মৃত্যুতে ভাল মন্দ কোন কিছুই নেই তবু তার সামান্যতম চিন্তায় মানুষ আর্তনাদ করে ওঠে। অনেক সময় দেসেরের মনে হয় যে, সে জিনেতের

সর্বনাশ করছে। স্থির করল, জিনেতের কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে সে এবং সেই প্রতিজ্ঞা টি কিয়ে রাখল কয়েক সপ্তাহ। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে টেলিফোন করল জিনেৎকে, উদভ্রান্তের মত গিয়ে পৌঁছল তার কাছে। জিজ্ঞাসা করল, 'আসতে পারি ?' জিনেৎ তার রুক্ষ শাদা চুলে হাত বুলিয়ে দিল, তার অশ্রুসজল বড় বড় আতঙ্কগ্রস্ত চোখ ছাপিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল গালের ওপর।

পয়লা মে কার্লর্ত বার-এ ঢুকতে গিয়ে মিয়েজারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দেসেরের।

মিয়েজার বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি অসুস্থ ?'

'না, না, বেশ সুস্থ আছি আমি।'

'আসল কথা হল স্বাস্থ্য, বিশেষ করে আমাদের বয়সে। জান আজকের দিনটা কি ? আজ পয়লা মে। কিন্তু কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না দিনটা নিয়ে। মনে আছে গত বছর কী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই না আমরা কাটিয়েছিলাম ! ভয় ছিল ধর্মঘট হবে, মিছিল বার হবে। কিন্তু এখন দিনটা সপ্তাহের অন্য যে কোন দিনের মতই। মন্দ না হলে কোন ভাল হয় না। ঠিক না ?' দেসেরকে 'কমিউনিস্ট' বলে বলে মিয়েজার এত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে সে নিজে পর্যন্ত এই কুহকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। কিন্তু দেসের অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'সত্যি, চারদিক বেশ শান্ত। মনে হচ্ছে আমি নিজেও বেশ থিতিয়ে গেছি।' রাস্তায় একটি মেয়ে ফুল বিক্রী করতে করতে তার কাছে থামল। বলল, 'লিলি অফ দি ভ্যালি কিনুন। আনা দশেক দাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে আপনার।'

ইঁদুরের মত মেয়েটির দাঁত, শিকারীর মত চোখের দৃষ্টি। দেসের এক গোছা আধ-ফোটা ফুল কিনল। ফুলগুলি কি তার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে ? না, তা নয় ! মিয়েজারের হাসি, ফুলউলী মেয়ের চোখ আর জিনেৎ ভেসে উঠল তার মনে। এর থেকে কোন নিষ্কৃতি নেই। তারা সবাই মরে যাবে। কে ? জিনেৎ, সে নিজে, আর প্রত্যেকে...কাছাকাছি একটা বার-এ গিয়ে অধৈর্য হয়ে কোনিয়াক খেল সে। রেডিওটা চিৎকার করে চলেছে :

> 'এই নদীটির ধারে কোথাও সুখ হয়ত আছে
> কিন্তু সে সুখ যায় ভেসে যায় চঞ্চল তার স্রোতে।'

এক সপ্তাহ পরে জিনেতের সঙ্গে দেখা হল দেসেরের। জিনেৎ তাকে না দেখার ভান করে চলে যাচ্ছিল, যেতে যেতে হাসছিল জিনেৎ। দেসের বুঝল তাকে

ছাড়াই জিনেৎ কেমন জীবন্ত হয়ে উঠছে। এখনি এর একটা মীমাংসা হওয়া উচিত!

বহুবার সে তাকে তার বাসা পরিবর্তন করতে বলেছে কিন্তু সে রাজী হয়নি। জিনেৎ এখনো রু বোনাপার্তের ছোট্ট পুরনো হোটেলটায় বাস করছে। দেসের সেই মোটামত পাউডার-মাখা বাড়ীউলীকে জানে আর জানে জিনেৎ কেমন করে অন্ধকার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠে—প্রতি মুহূর্তে হাঁপায় আর সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। যাতায়াতের পথে পায়খানা, শস্তা সুগন্ধী আর রান্নার গন্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে তাকের ওপর দাফ্‌নিস-এর একটা নোংরা ব্রোঞ্জ মূর্তি ক্লো-কে চুমু দিচ্ছে। কারা থাকত আগে ওখানে? প্রাচীন গৌরবের স্বপ্নে বিভোর এক শিল্পী? ফোলি বের্জেরের এক সুন্দরীর প্রেমে পাগল এক হিসেব-রক্ষক? চুলে মলম দেওয়া আর জমকালো টাই-পরা কোন এক কুৎসিত লোক? কিংবা অনুমতিপত্রহীন কোন এক জার্মান আশ্রয়প্রার্থী? ঐ গুমোট আর বিশ্রী ঘরে নিঃসঙ্গতা এসে চেপে বসে মনের ওপর।

দেসের শান্তভাবে জিনেৎকে বলল, 'আমাদের মধ্যে আর দেখা সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয়।' এই সমস্ত কথা ভেবে চিন্তে এসেছিল দেসের। ভয় ছিল, জিনেৎ হয়ত জিজ্ঞাসা করবে, 'কেন?' কিংবা তার দিকে এমনভাবে তাকাবে যে, সে তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু জিনেৎ দূরে সরে বলল, 'হ্যাঁ।' মনে মনে ভাবল, 'আর কিছু অবশিষ্ট রইল না, এমন কি প্রতারণা পর্যন্ত না।' ভালই হল। দেসের নিজের স্থিরতায় নিজেই অবাক হয়ে গেল: এই তো মৃত্যু, কিন্তু যতটা ভয়াবহ মনে করছিল ততটা নয়।

মে মাসের উষ্ণ রাত্রি। অন্ধকার শহরের ওপর ঝিকমিক করছে তারাগুলো। বাদাম গাছের পাতাগুলো মর্মরিত হয়ে উঠছে থেকে থেকে। প্রতি পনের মিনিট অন্তর গির্জার ঘড়িতে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে।

'প্রেমিকদের উপযুক্ত এই রাত,' দেসের হাসল। জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে সে।

'আজ আর প্রেমিক নেই। আছে শুধু গ্রহ, গাছপালা, কবিতা। দেসের, তুমি আর আমি দুজনেই বুড়িয়ে গেছি।' জিনেৎ বলল।

'তুমি আজও জীবনে পল্লবিত হয়ে উঠতে পারনি। পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি। তোমাকে বাধা দেব না আর। তোমার পথের কাঁটা হব না—আর বাঁচতে চাই না আমি...'

তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষের কথাগুলি মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। নিজের ওপর

চটে উঠল সে : এবার জিনেৎ করুণা করবে তাকে। ভাববে, অনুনয়-বিনয় করছে সে। দেসের ভাল করেই জানে, পয়সা দিয়ে ভালবাসা কেনা যায় না এবং চোখের জলে গলবার পাত্রীও জিনেৎ নয়। তার উচ্ছ্বাসকে লক্ষ্য না করে জিনেৎ বলল, 'আমিও বাঁচতে চাই না। এক সময়ে বাঁচতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হতে পারিনি। তোমার ব্যাপারটা কি?'

'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। অর্থাৎ মৃত্যু কি জিনিস আমি জানি না।'

দেসের চলে যাচ্ছে এমন সময় বিমান-বিধ্বংসী কামান গর্জে উঠল। এ যেন এক পাল শিকারী কুকুর বন্ধনমুক্ত হয়ে ঘেউ ঘেউ করে চলেছে প্রাণপণে। কোমল মখমলের মত আকাশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সার্চলাইটের আলোয়। সাইরেনগুলোর উন্মত্ত আর্তনাদে কেমন একটা জীবন্ত ও বন্য আকুতি।

'এ আবার কি?' জিনেৎ জিজ্ঞাসা করল।

'খুব সম্ভবত শুরু হল। এটা বসন্তকাল। তোমাকে আগেই বলেছি এ হল প্রেমিকদের উপযুক্ত রাত। ওরা ভেবেছিল জার্মানরা বসে বসে অপেক্ষা করবে। মিয়েজার খুশি হয়েই আমাকে বলল, দেখেছ, কেমন শান্ত! যত সব অপদার্থ! না, তারও অধম। ওরা বিশ্বাসঘাতক। যাই হোক, তাতেই বা কি?.........

জিনেৎ, তুমি কি বলতে চাও তুমি মৃত্যুকে একেবারেই ভয় পাও না?'

'না, একেবারেই না।' নীরস অথচ দৃঢ় গলায় উত্তর দিল জিনেৎ।

কামানগুলো অক্লান্তভাবে গর্জে চলেছে।

এক সময় বিমান-আক্রমণ ধ্বনি শেষ হল। জানলার ধারে একটা আর্ম-চেয়ারে এসে বসেছে দেসের; জিনেৎকে জিজ্ঞাসা করে নিয়েছে সকাল না হওয়া পর্যন্ত সে এখানে থাকবে কিনা। সহজ ছোট ছোট শব্দে পাখীরা ডাকতে শুরু করেছে, তেরছাভাবে এসে পড়েছে সূর্যের আলো, ছায়াগুলো কেমন লম্বা। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ। সবজি-বোঝাই গাড়ীগুলো বাজার-মুখো চলেছে। এক দুধ-উলী চলে গেল সামনে দিয়ে। দেসেরের মনে হল যেন কোথাও কিছু হয়নি,—রাত্রের বিমান-আক্রমণের সংকেতধ্বনি, পারস্পরিক বোঝাপড়া, যেন সমস্ত কিছুই মিথ্যে। দেসের জিনেতের দিকে তাকাল। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখে কেমন একটা শান্ত আর নির্লিপ্ত ভাব। ভাবল, ঘুমোলে জিনেৎকে অন্য যে কোন মেয়ের মতই দেখায়। মনে হল, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে দেসেরের চিন্তাকে ধরতে পেরেছে। জেগে উঠেই একবার তার দিকে তাকিয়ে দেখল। দেসের মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।

'সুপ্রভাত, দেসের।' জিনেৎ আনন্দিত হয়ে বলল।

হয়ত সেও সব কিছু ভুলে গিয়েছে। স্কুলযাত্রী ছেলেমেয়েদের হাসির শব্দ আসছে রাস্তা থেকে।

'যদি বেহেমথ তম্বি করে তাহলে নির্ঘাত গণ্ডগোল বেধে যাবে একটা।' একজন বলল। 'চৌবাচ্চাব সমস্যা নিয়ে আমি বড় মুশ্‌কিলে পড়েছি।' আবেকজন বলল, 'একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম আমরা—মৃত্যুর চুম্বন।'

তারপব রেডিওতে সংবাদ-ঘোষকের নাকী সুর বেরিয়ে এল, 'তৃতীয় ঘা পড়লেই ঠিক সাতটা বেজে এক মিনিট হবে। এবার আমরা সকালের খবর বলব। গত রাত্রে জার্মান সৈন্যবাহিনী হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়ামে প্রবেশ করেছে.........'

জিনেৎ চিৎকাব করে জানলায় ছুটে গেল। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খবব শুনছিল: 'ডাচ্ অঞ্চলে প্যারাস্যুট বাহিনী নেমেছে ......'

স্ত্রীলোকটির হাতের ঝুড়িটা পড়ে গিয়ে ম্লান গোলাপী স্ট্রবেরীগুলো রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছে।

জিনেতের দিকে তাকাল দেসের। বলল, 'আগেই বলেছি, এ তো সবেমাত্র শুরু।'

রাস্তায় খবরের কাগজের কিয়স্কে জনতা এসে ভীড় করেছে—শ্রমিক, দোকানদার, স্ত্রীলোক—সবাই আলোচনা করছে খবরটা নিয়ে।

'ঠিক সেই ১৯১৪ সালের অবস্থা...ওরা এখানেও ধাওয়া করতে পারে ...'

'ওখানেই ওরা আটক পড়বে। ধরো, এমন কি হল্যাণ্ড পর্যন্ত ওরা নিয়ে নিল। কিন্তু তারপর ?'

'ওতে তো আমাদেরই সুবিধা।'

'খবরের কাগজে তো খুব লম্বা চওড়া লিখেছিল, ডাচরা নাকি জলে ডুবিয়ে দেবে সব কিছু ...'

'ওরা খবরের কাগজে যা লেখে সব ফাঁকা! লেখবার জন্যে পয়সা পায় ওরা। কিন্তু জার্মানরা প্যারাস্যুটে করে একেবারে সাঁজ-দ্য-মার-এ নামতে পারে ...'

দেসের শব্দ করে জানলাটা বন্ধ করে দিল। 'এমনি কত লোককেই না প্রতারিত করেছে ওরা!' সে আর্ম-চেয়ারে এসে বসল। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে তার, হাত আর কাঁধ দুটো কেমন ব্যথা-ব্যথা করছে। 'জিনেৎ, একবার তাকিয়ে দেখ আমার দিকে। তোমার চোখ দেখে ভয় পাই আমি ... নজর দাও! ভাল করে নজর দাও! আমিও প্রতারণা করছি। হয়ত অন্যের চেয়ে

বেশী। আমি রক্ষা করতে চেয়েছিলাম...কাকে? তেসাকে? এই তার শাস্তি। জানি না আমাদের ভাগ্যে কি ঘটবে। হিটলার আসবে। তারপর লোপ পাবে ফ্রান্সের অস্তিত্ব। পিয়েরই ঠিক। সে বলেছিল—চুকিয়ে দাও সব জঞ্জাল। আমি মরে গেছি। ওরা কিন্তু আমার বদলে পিয়েরকেই মারল। জিনেৎ, তেসাকে না মারলেই বাঁচি! আচ্ছা, বিদায়! দেখেছ, আমাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কি জিনিস এসে মিলেছে! রঙ্গমঞ্চের মতই এর তাৎপর্য কিন্তু আসলে ব্যাপারটা অত্যন্ত সাধারণ...আর ভয়াবহ।'

থেমে থেমে কেমন নির্লিপ্তভাবে কথা বলল দেসের। তারপর টুপিটা মাথায় দিয়ে দরজার কাছে ঝুঁকে পড়ে হঠাৎ চুমু খেল জিনেতের হাতে। চুম্বন, কুব্জ পিঠ আর হাতের কাঁপুনির মধ্যে প্রবাহিত হল তার আবেগময় চিন্তাশক্তি, অসুস্থতা ও হতাশা।

'জিনেৎ, তোমার জন্যে আমি একটা পাশপোর্ট আর ভিসা সংগ্রহ করব। এখান থেকে সোজা বেরিয়ে পড়! আমেরিকা চলে যাও।'

জিনেৎ মাথা নাড়ল। না, ও বড় ক্লান্ত। কেমন একটা করুণার বিশাল ঢেউ এসে আঘাত করল ওকে যা সত্যিই অসহ্য। ওলন্দাজ, রাস্তার কলরব-মুখর মানুষ আর দেসের—প্রত্যেকের জন্যে ও দুঃখিত। বিশেষ করে দেসেরের জন্যে ও অনেক বেশী দুঃখিত। লোকের ধারণা, দেসের সব কিছু করতে পারে কিন্তু ও জানে দেসের ওর চেয়েও বেশী হতভাগ্য। ও একটা গোলাম, একটা পুতুল, একটা ছায়া মাত্র। এবং এই প্রথমবার ও দেসেরকে তুই বলে সম্বোধন করল।

'ভাবনা চিন্তা করে বুড়িয়ে যাসনি। এ সমস্ত কিছুর একদিন অবসান ঘটবে। লক্ষ্মীটি দেসের, বিদায়!'

১৬

মেজর লেরয়ের মুখ কালো হয়ে উঠেছে ধমক খেয়ে। স্বগতোক্তিতে তার চোয়াল কেঁপে কেঁপে উঠছে।

'আমি বুঝে উঠতে পারি না এর সঙ্গে সাঁকোর কি সম্পর্ক?' জেনারেল লেরিদো বলল।

'জেনারেল মোকে তো তাই বলেন...আমি টেলিফোনে কথা বলেছিলাম।'

'এই ধরনের কথাবার্তার জন্যে সামরিক আদালতে জেনারেল মোকের বিচার হওয়া উচিত। দুশমন তো সাঁকো থেকে ষাট মাইল দূরে। আমি জানি, আমাদের সৈন্যবাহিনী কাতো-ভেরভঁ্যার দিক দিয়ে বেলজিয়মে ঢুকেছে বলে এ একটা ওদের আক্রমণ করার ছল। ধরুন যদি বিপজ্জনক একটা কিছু ঘটেই—মানে আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু হয়, তাহলে মার্শ-এ পৌছুতে জার্মানদের অন্তত চার সপ্তাহ লাগবে, যদি খুব দ্রুত গতিতেও অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের পাল্টা-আক্রমণ সম্পর্কে কি মনে করছেন? সপ্তম সৈন্যবাহিনী তো অ্যান্টওয়ার্প পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এটা আত্মরক্ষা না আক্রমণ—কী মনে হয় আপনার? যখন সমস্ত সামরিক ক্রিয়াকলাপ আক্রমণের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তখন একমাত্র নির্বোধরাই সাঁকো উড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। বুঝতে পারলেন আমার কথা? এবার নিজের মনে মনে বিড়বিড় করা বন্ধ করুন।'

'কিন্তু আমি...'

'আপনি? স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে গত যুদ্ধে আপনি সমস্ত সময় পারীতে বসে বসে কাটিয়েছেন। প্রথম কথা হল স্থৈর্য। যুদ্ধ এখন তীব্রতর হয়ে উঠেছে। হবারই কথা। কিন্তু আগের মতই আমাদের কাজ করে যেতে হবে। এই হল যুদ্ধ জেতার রহস্য। যাক, এখন আজকের কাগজে কি কি খবর আছে বলুন দিকি?'

লেরয় নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করল। বলল, 'ল ফিগারোর সামরিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন নামুর-অ্যান্টওয়ার্প রণাঙ্গনেই দুশমনকে বাধা দেওয়া চলতে পারে।'...আবার কাঁপতে শুরু করেছে তার চোয়াল। 'জেনারেল, জার্মানরা কিন্তু চল্লিশ মাইল দূরে আছে, ষাট মাইল দূরে নয়। ওরা মার্শ অধিকার করে বসেছে।'

'আপনার কথা শুনে যে কোন লোকের ধারণা হবে যে, আপনি একজন অফিসার নন, সামান্য একজন সহকারী মাত্র। প্রথমত, আপনার রিপোর্ট সমর্থিত নয়। দ্বিতীয়ত, দুশমনরা যদি মার্শ পর্যন্ত এসেও থাকে, তাতেই বা কি এল গেল? আপনি যান। কর্নেলকে একবার পাঠিয়ে দিন।'

লেরিদো একটা বড় মানচিত্র খুলে বসেছে। মোরো তার স্বাভাবিক উদাসীন ভঙ্গীতে এসে ঢুকল। বলল, 'কী চমৎকার দিন! এই মাত্র ট্যাঙ্ক পরিদর্শন করে ফিরছি। সত্যিই, অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা: জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়!'

লেরিদো গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। সে উত্তর দিল, 'সমস্ত অঞ্চলটা খুব দৃঢ়ভাবে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। সুতরাং ভয় পাওয়া বোকামি। এইখানে দেখুন—নীল পেন্সিল দিয়ে ফ্রন্টকে চিহ্নিত করেছি। আপনার খবরের সঙ্গে কি মিলছে?'

বেঁটে লেরিদোর পাশে কর্নেলকে দেখাচ্ছে বিরাট দৈত্যের মত। জেনারেলের প্রতি বিনয় প্রকাশ করল সে। বলল, 'ওটা কিন্তু ফ্রন্ট নয়। আপনি মার্শ লিব্রার্ম-এ দাগ কাটছেন। কিন্তু সে ছিল সকালে, এখন হল বিকেল চারটে।

'আপনি বলতে চান ওরা অগ্রসর হয়ে আসছে?'

'বেমালুম এগিয়ে আসছে ওরা।'

মুহূর্তের জন্যে বিমূঢ় হয়ে চোখ বন্ধ করল লেরিদো। তার গাল দুটো বেশ রক্তাভ আর মাংসল। সঙ্গে সঙ্গে সে তার স্থৈর্য ফিরিয়ে এনে বলল, 'আরও সাংঘাতিক হবে ওদের অবস্থা। চক্রটা অবশ্য বেড়ে যাচ্ছে কিন্তু দু দিকেই সৈন্য আছে আমাদের। এখন ওদের দুর্বল জায়গাটা খুঁজে বার করতে হবে। জেনারেল পিকারের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। ভালই হল, আপনি আমার সঙ্গে আছেন। এদিকে একেবারে হতাশ হয়ে পড়েছেন আমাদের মেজর। মোকেরও সেই অবস্থা। অবশ্য অবস্থাটা ভয় পাওয়ার মত কিছু নয়। কর্নেল, আপনি কি মনে করেন?'

'জেনারেল পিকার রিজার্ভ-ফৌজ দিতে চাইবেন কি না সন্দেহ। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব আপনার অজানা নয়।'

'হ্যাঁ, অবস্থাটা কিন্তু এখন বদলে গেছে। ওরা এগিয়ে আসছে। আমাদের সক্রিয় না হয়ে উপায় নেই।'

'আমার মনে হয় আমাদের কিছু করবার নেই। ওরা কমসে কম সাতশো ট্যাঙ্ক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এদিকে আমাদের আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা দুর্বল। সাতচল্লিশ মিলিমিটার কামানের উপযুক্ত গোলা আমাদের নেই।'

'ও সব খুঁটিনাটির ব্যাপার। আমাদের সৈন্যরা ফিল্ড্‌কামান ব্যবহার করলেই পারবে। আপনি দেখছি মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন। ১৯১৪ সালের আগস্টের কথা মনে করুন। তখন এর চেয়েও শোচনীয় অবস্থা। শার্লরোয়া থেকে মেওতে পালানোর কথা আমার মনে থাকবে চিরদিন। গোলন্দাজরা কামান ছেড়ে ঘোড়ার ওপর উঠে বসল। কিন্তু সপ্তাহ দুই পরেই জার্মানদের আমরা আইনে পর্যন্ত হটিয়ে দিয়ে এলাম। ফন ক্লুক তার দক্ষিণদিকটা শক্তিশালী করতে পারেনি বলে ক্ষতি স্বীকার করল। এবার ওরা কিন্তু অত্যন্ত অল্প

সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। এ স্রেফ পাগলামি! যাতায়াতের পথে যে কোন সময় হামলা করতে পারি আমরা।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে সমরবিদ্যার বিধি, সামরিক ভাগ্য ও ফরাসী পদাতিক বাহিনীর গুণাগুণ সম্পর্কে বলে চলল। কর্নেল তাকিয়ে রইল জানলার দিকে—ঢালু পাহাড়গুলো কেমন ছককাটা মাঠ বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে। তার মুখে একটা বিমূঢ় হাসি। পরে সে বিমান-বিধ্বংসী কামানের ঘাঁটি পরিদর্শনে বেরুল। একা পড়ে রইল লেরিদো। রুমাল দিয়ে ভুরু মুছে সে ভাববার চেষ্টা করল। মোরো লোকটা কেমন স্থিরবুদ্ধি। সে যদি ভয় পায় তাহলে বুঝতে হবে লক্ষণ সুবিধার নয়। স্বীকার না করে উপায় নেই যে শত্রু বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে। হয় জার্মানরা মাথা-খারাপ নয় দানবের মত শক্তিশালী। পরিকল্পনা মাফিক সামরিক ক্রিয়াকলাপের বদলে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। কার সাধ্যি এ সব নিয়ন্ত্রণ করে? ম্যাজিনো লাইনের অবস্থা এর চেয়ে অনেক শান্ত। কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। এরই নাম আধুনিক যুদ্ধ? সমস্তটা একটা গুণ্ডামী ছাড়া কিছু নয়।

এপ্রিল মাসে অনেক অদল-বদল হল। সে সময় সেড্যান অঞ্চল একেবারে পেছনে—শান্তিপূর্ণ এলাকার মধ্যে। সৈন্যরাও বেশ খোশ-মেজাজে—মনের আনন্দে নিষিদ্ধ বেলজিয়ান তামাকের ধোঁয়া টানছে। কিন্তু লেরিদো একঘেয়েমিতে বিরক্ত হয়ে উঠল। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জার্মানরা বেলজিয়মের মধ্যে ঢুকবে না। সে বলল, 'উইলহেল্‌ম্‌-এর ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে যাবে কেন ওরা?' সে খুব মনোযোগ দিয়ে নরওয়ের ব্যাপারগুলো অনুধাবন করতে চেষ্টা করল আর গাল দিল বৃটিশদের: ওরা যোদ্ধা নয়, খাঁটি বেনিয়া! সন্ধ্যাবেলা সে হয় কর্নেলের সঙ্গে বসে বসে দাবাবড়ে খেলে, নয় সে দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসে সোফিকে:

গায়িকা লক্ষ্মীটি,

গত তিনদিন হল তোমার চিঠিটা পেয়েছি। একেবারে দিশেহারা হয়ে গেছি ভাবনা চিন্তায়। সাঁজে বলছিল, পারীতে নাকি ভয়ানক পেটের ব্যারাম হচ্ছে। কাঁচা ফল আর সালাড কিন্তু কক্ষনো খেও না, লক্ষ্মীটি। আমি খুব সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ আছি যদিও গত কয়েক দিন ভয়ংকর পরিশ্রম গেছে। খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখেছ যে, শত্রুপক্ষ বড় রকমের হামলা শুরু করেছে। ওরা কিন্তু বেশী দিন যুঝতে পারবে না। গতকাল মেজর দ্য গ্রাভ্‌ দেখা করতে

এসেছিল, জেনারেল পিকারের সহকারী। ছোকরার সংগীতের ওপর দখল আছে। ও আমাদের গ্রেগ বাজিয়ে শোনাল। অভিনন্দন না জানিয়ে পারলাম না, কিন্তু মনে মনে ভাবলাম আমার সোফির চেয়ে অনেক নীচু স্তরের গাইয়ে ও। লক্ষ্মীটি, তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছে করে! আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখছি যেদিন তোমার ছোট ছোট হাত দুটো গাংচিলের মত পিয়ানোর ওপর ডানা ঝাপটিয়ে উঠবে। স্তঁধাল ঠিক কথাই বলেছিলেন যে, সত্যিকার ভালবাসা...

বিস্ফোরণের শব্দে লাফিয়ে উঠল লেরিদো। খানিকটা কালি পড়ে গেল কাগজের ওপর। ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল রাগে। জানানি না দিয়েই মোরো এসে ঢুকল ঘরের মধ্যে।

বলল, 'আমাদের একেবারে নীচে চলে যাওয়া দরকার।'

তলঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। তাকের ধূলি-ধূসর বোতলগুলো ঝকমক করছে রহস্যজনকভাবে। মদের গন্ধ। অফিসাররা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙল। মোরো একটা মদের পিপের ওপর বসে হেসে উঠল। চিঠিটা শেষ না করতে পারায় জেনারেলের মনটা কেমন খিঁচড়ে গেছে, তাকে একটা টুল এনে দিল ওরা।

'ওরা এইখানে লক্ষ্য ঠিক করেছে।' আধো আধো গলায় বলল লেরয়।

মোরো মাথা নাড়ল। 'ওদের গুপ্তচরবৃত্তি ভয়ানক জোরালো। আমরা কোন এক জায়গায় বাসা বাঁধতে না বাঁধতেই ওরা গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে অভিনন্দন জানাতে কার্পণ্য করে না। সকালে আমাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কিন্তু নতুন জায়গায় কিছুতেই ঘুম হয় না আমার।'

'কোন উপায় নেই।' জেনারেল উত্তর দিল, 'এটা একটা যুদ্ধ, ছল করা সৈন্য-সঞ্চালন নয়। কিন্তু আমি বলি মানুষ বন্য হয়ে গেছে। গত যুদ্ধে সেনা-কর্তৃপক্ষের গায়ে হাত দিত না কেউ। পারস্পরিক শ্রদ্ধা থাকা উচিত একটা। কিন্তু এখন ওরা আমাদের সাধারণ ফৌজ পেয়েছে। সমস্ত শৌর্য হারিয়ে ফেলেছি আমরা। এখন ওরা সব কিছু করতে পারে। কর্নেল, পম্পের কথা মনে আছে আপনার? কর্নেই-এর এ একটা মহৎ সৃষ্টি—বিশেষ করে সেই দৃশ্যটা যেখানে কর্নেলিয়া পম্পের জন্যে অনুতাপ করতে করতে তার চক্রান্তের কথা জানতে পারল। সে সীজারকে বলছে, 'তুমি আমার শত্রু। আমার দেশের ওপর তুমি কালছায়া ফেলেছ। এখন দাসরা তোমার পতন

ঘটানোর জন্যে চক্রান্ত করেছে। কিন্তু আমি দাসদের সাহায্য নেব না।' এই তো চরিত্র! কী মহৎ লাইনগুলো!'

বিস্ফোরণের প্রতি কোন দৃষ্টি না দিয়ে সে কর্নেলিয়ার বক্তৃতার বর্ণনা দিয়ে চলল। তারপর ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেল। হাই তুলতে লাগল। মেজরের একটা সিগারেট ধরানো দরকার! ঠোঁটের কাছে নিয়ে যেতে যেতে হাতটা কেঁপে উঠল। কিন্তু সাঁজে শিস দিয়ে চলেছে: তুত ভা বিয়ঁ, মাদাম লা মারকিস।

'থামুন!' মেজর চিৎকার করল।

'আমি দুঃখিত। এই পরিবেশ—বোতল, পিপে আর কবিতাই এর জন্যে দায়ী। মনে হচ্ছিল, আমি যেন মঁমার্ত-এর ক্যাবেরেতে বসে আছি।'

বোমাবর্ষণ শেষ হওয়ার পর লেরিদো তার অসমাপ্ত চিঠিটা শেষ করতে চাইল। কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হল আবার। মোরো এসে ঘরে ঢুকল।

'ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই থামেনি। জার্মান ট্যাঙ্ক পালিজেল-এ এসে পৌঁচেছে।' সে বলল।

একবার মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে লেরিদো পায়চারি করতে শুরু করল। অত্যন্ত চিন্তিত সে; কিন্তু সে যে ভুল করেছে একথা জানতে দিতে চায় না মোরোকে।

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি, এ নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। ওদের চক্রটা বাড়াবার চেষ্টা পর্যন্ত ওরা করছে না।' কয়েক মুহূর্ত সে চুপ করে রইল। তারপর আবার বলল, 'যাই হোক, আমার মনে হয় নঁভেরন্ আর নুজোঁর মাঝামাঝি সমস্ত সাঁকো উড়িয়ে দেওয়া উচিত। মোকের সঙ্গে যোগাযোগটা ঠিক আছে তো?'

'সকালে ঠিকই ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে নুজোঁ থেকে সরে গেছে ওরা।'

'তাহলে ক্যাপ্টেন সাঁজেকে পাঠিয়ে দিন। আর হাতের কাছে 'স্যাপারদের' যদি না পাওয়া যায় তাহলে বোমা ফেলে উড়িয়ে দিন সাঁকোগুলো।'

অবশেষে তার লেখা শেষ হল:

> 'পরিস্থিতিটা অত্যন্ত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু আশা করছি তোমার সঙ্গে আগামী মে মাসে দেখা হবে। এত পেট্রল আর মানুষ খুইয়ে থামতে বাধ্য হবে ওরা। নিজের ওপর যত্ন নিতে ভুলো না কিন্তু।'

সাঁজে কফির কাপে কিছুটা ব্র্যাণ্ডি ঢেলে গিলে ফেলল, তারপর বিদায় জানাল লেরিদাকে।

'ভ্রমণটা কিন্তু সুখের হবে না, কি বলেন ?' সাঁজে বলল।

এক ঘণ্টা পরে মেজরের কাছে খবর এল যে সাঁজে আর তার মোটরচালক এখান থেকে বেরিয়েই গুলি খেয়ে মারা গেছে। চাষীরা চিৎকার করতে করতে ছুটে এল: 'ঐ জার্মানদেরই কাণ্ড!'

লেরিদো চেঁচিয়ে উঠল, 'তোমাদের মাথা! আমি নিজে গিয়েই দেখছি ব্যাপারটা।'

সাঁজেকে কে খুন করেছে—ব্যাপারটা রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। গাড়ীর মধ্যে মৃতদেহ দেখে সে অভিবাদন জানাল। কেমন শান্ত দেখাচ্ছে লেরিদোকে।

'আপনি কি যেতে বলেন আমাকে ?' কর্নেল মোরো জিজ্ঞাসা করল।

'না।'

লেরিদো কাকে পাঠায় তা দেখবার জন্যে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে উঠে লেরিদো বলল, 'কারও যাওয়ার দরকার নেই। হাজার হোক, মোকে তো আর ছেলেমানুষ নয়। আকাশ থেকে বোমা ফেলে ও নিজে থেকেই সাঁকোগুলো উড়িয়ে দেবে। আপনি ভেতরে আসুন, কর্নেল।'

আমরা কি ফিরে যাচ্ছি ?'

'না! রেভেল-এ যাচ্ছি আমরা। জীবন বিপন্ন করবার অধিকার আমাদের নেই। এ তো অ-আ-ক-খর মত সোজা কথা।' মৃত ক্যাপ্টেনের হাঁ-করা মুখ মনে পড়তেই সে ঠোঁট চাটল। 'আমি জোর গলায় বলতে পারি, আমাদের পেছনদিকের অবস্থাও খুব ভাল নয়।'

আস্তে আস্তে গাড়ীটা এগিয়ে চলল; রাস্তাগুলো ট্যাঙ্ক, লরি আর ঘোড়ায় ভরতি—ওরা সব এগিয়ে আসছে। লেরিদো খানিকটা শান্ত বোধ করল। বলল, 'যাক নতুন সৈন্য না বাড়ালে যে অগ্রগতি ঠেকানো যাবে না তা বুঝতে পেরেছে।'

শার্লভিলের কাছাকাছি আসতেই কয়েকজন সৈনিক চিৎকার করে গাড়ী থামাল। জেনারেলকে দেখতে পেয়ে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না তাদের।

'কী হয়েছে ?' লেরিদো জিজ্ঞাসা করল।

পেছন থেকে কে একজন বলল, 'জার্মানরা!'

তারপর একসঙ্গে তারা রব তুলল: 'প্যারাস্যুটে করে নেমেছে...........স্টেশন মাস্টারকে খুন করেছে ওরা!......প্যারাস্যুট!......গুলি করেছে দুজন অফিসারকে......'

লেরিদো সামনের দিকে ঝুঁকে মুখিয়ে উঠল, 'চুপ! তোমরা এদিকে কোথায় চললে?'

সৈনিকরা নিরুত্তর রইল।

মোরো হেসে বলল, 'সহজ কথা—সব ছেড়ে ছুড়ে পালাচ্ছে ওরা!'

কথা শুনে পেছন থেকে কার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'হে হে, পালিয়ে যাচ্ছ নাকি, জেনারেল?'

লেরিদো সংযম হারাল না। বলল, 'চুপ!' যে লোকটি তাকে অপমান করেছে তার দিকে তাকিয়ে দেখল একবার: আহত সৈনিক সে। তার চারদিকে সমস্ত মাটি রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। লেরিদো তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিল। মোটরচালককে বলল, 'মিয়েজার, এ্যাম্বুলেন্স-স্টেশনে নিয়ে চল লোকটাকে।'

আহত লোকটিকে ওরা মোটরচালকের পাশের সিটে তুলে দিল। লোকটি কোন কথা বলল না, বন্ধ হয়ে এল তার চোখ দুটো।

হতাশ হয়ে মিয়েজার হর্ন বাজিয়ে চলেছে। রাস্তায় দলে দলে ভীড় করেছে আশ্রয়প্রার্থীরা। অনেকে আবার তাদের গরুবাছুর পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে চলেছে। এ সবের মধ্য দিয়ে পথ করে যেতে হচ্ছে গাড়ীটাকে। দুটো সার বেঁধে চাষীদের গরুর গাড়ীগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করতে করতে চলেছে।

লেরিদোর ধৈর্যচ্যুতি ঘটল: 'এইভাবে আমরা কখনো পেরে উঠব না! স্রেফ আতঙ্ক! তা ছাড়া আর কিছু নয়!'

মিয়েজার গাড়ী থামিয়ে শুনল। জেনারেল জানলা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখল। মাথার উপর বোমারু উড়ছে। আশ্রয়প্রার্থীরা আর সৈনিকরা মাঠজঙ্গলের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। আর একটুও এগোনো সম্ভব নয়। গাড়ী আর গরুবাছুরে সমস্ত পথটা আটকে গেছে। জেনারেলের গাড়ীটাকে একপাশে সরিয়ে রাখা হল। কর্নেল একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়েছে, মিয়েজারও তার পথ অনুসরণ করল। লেরিদোর পক্ষে ব্যাপারটা কিন্তু খুব লজ্জাকর। সে দাঁড়িয়ে রইল—বেঁটে কিন্তু সৌম্যদর্শন, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সে। মাথার ওপর নটা উড়োজাহাজ উড়ছে।

লেরিদো বলল, 'বেশ দল বেঁধে উড়ছে কিন্তু ওরা।' কাছাকাছি একটা ছোট জঙ্গলে একটা বোমা পড়েছে। যখন তারা গাড়ীতে ফিরে এল, স্ট্রেচারের ওপর ছ-সাত বছরের একটা মেয়ে নজরে পড়ল জেনারেলের; বোমার

স্‌প্লিণ্টার লেগে উড়ে গেছে তার পা দুটো। লেরিদো নাক ঝেড়ে মৃদুস্বরে কর্নেলকে বলল, 'দেখেছ, কী ভয়ানক!'

তারপর আহত সৈনিকটির দিকে দেখল। বলল, 'বীর পুরুষটির কি খবর?'

সৈনিকটি কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ পরে মিয়েজার বলল, 'অনুমতি দেন তো লোকটাকে বাইরে ফেলে দিই! বারবার ঢলে পড়ছে আমার দিকে। অসুবিধা হচ্ছে।'

'তুমি একটি পাগল! আহত লোককে ফেলবে কেন?'

'মারা গেছে ও। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

সৈনিকটির শরীর দোল খেতে লাগল, পেছন থেকে মনে হল সে ঢুলছে। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে তারা থামল—রেডিয়েটারে জল নেবে মিয়েজার। প্ল্যাটফর্মটা গোলাবারুদে বোঝাই। লেরিদো গাড়ী থেকে নেমে সেগুলো দেখতে গেল। বলল, '৪৭নম্বর মিলিমিটার কামানের গোলা! আপনি বলছিলেন এ জিনিস নাকি একটাও নেই। এ সব এখানে পড়ে কেন? এমনি অব্যবস্থার কথা কস্মিনকালেও শোনেনি কেউ।'

সমস্ত স্টেশনটা ঘুরে একটা জনপ্রাণীরও সাক্ষাৎ মিলল না। টেলিগ্রাফ আপিসের মেঝের ওপর বসে বসে খোলা পায়ে একটা প্রাইভেট কি যেন চিবোচ্ছে। জেনারেলকে দেখে ভীত হয়ে তাড়াতাড়ি বুট জোড়া পায়ে দিতে লাগল।

লেরিদো জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার রেজিমেণ্টের নম্বর কত?'

'১৭৩ নম্বর। পায়ে ফোস্কা হয়ে অকেজো হয়ে গেছি।'

'তোমার বন্দুক কোথায়?'

প্রাইভেটটি উত্তর দিল না।

'স্টেশনমাস্টার কোথায়?'

'ওরা সবাই পালিয়ে গেছে। লোকে বলছে, জার্মানরা নাকি কাছাকাছি এসে পড়েছে। মোটর সাইকেল করে আসছে ওরা। সাংঘাতিক কথা!'

লোকটা ছোট ছেলের মত ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। ঘেন্নায় ভুরু কোঁচকাল লেরিদো।

জল ভরে আবার তারা রওনা দিল। জেনারেলের মুখে একটাও কথা নেই। কেবল রেতেল-এ ঢোকবার মুখে সে হঠাৎ মোরোকে বলল, 'যুদ্ধজয়ের আর কোন আশা নেই! ডেপুটিরা কি ভাবছে জানি না। এক পাল দুঃসাহসী আর

মূর্খের সর্দার হয়ে বসেছে রেনোটা। কিন্তু এখন আমরা আমাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারি। আমাদের যা সাধ্য আমরা করেছি। রোমানরা যেমন বলত : অন্যে এসে ভাল করুক যদি পারে।'

১৭

কর্মব্যস্ত পৃথিবীর অনেক দূরে এক গ্রামে এসে সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি করেছে। এখানকার চাষীরা ঝাউগাছের ডালপালা দিয়ে আগুন জ্বালায়, চিমনির ধোঁয়ায় শুয়োরের মাংস সেদ্ধ করে। মোটাসোটা গরুগুলো প্রাচীন দেবতাদের মত তাকিয়ে থাকে সামরিক লরিগুলোর দিকে। মাঠে মাঠে ঘাস-গাছ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে, ধূসর-রঙা ক্রোকাস ফুল ফুটে উঠেছে গাছের গুঁড়ির নীচে।
সংবাদপত্র এলেই সৈন্যরা পেছনকার পাতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। জার্মানরা কত টন জাহাজ ডোবাল বা ট্রনডিএম-এর যুদ্ধে কি হল, সে খবরে আগ্রহ নেই তাদের। পারীতে কি কি ঘটছে সে সব খবর তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে, বিজ্ঞাপনগুলো গেলে। বহুদূরে ফেলে এসেছে তারা রঙ্গমঞ্চ, কাফে আর মেয়েদের। কত ঝলমলে ফিটফাট সব মেয়ে!
পারীর কথা ভেবে আঁদ্রের মন কেমন করে না। নরমাণ্ডির এক চাষীর ছেলে সে, গ্রামের ধীরগতি একটানা জীবনের সঙ্গে সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এমন কি তার অতীতের স্মৃতিগুলো পর্যন্ত তার কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট, ভৌতিক ছায়া বলে মনে হয় : জিনেতের হাসি, কিংবা সেই ক্যানভাস যেগুলি সে এঁকে শেষ করতে পারেনি—ছাই-রঙা বাড়ীঘর কিংবা ঘুঘু-রঙা সীন নদী।
সৈন্যরা ঘাঁটি গেড়ে চাষীদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে বসল। জিভের কবিতা লিখে চলল এক বিকৃতচক্ষু গণিকার উদ্দেশ্যে, মেয়েটিকে ভৈরবীর সঙ্গে তুলনা করে সে। লরিএ একটা বাঁশি জুটিয়ে নিয়ে বিবাহ-উৎসবে বাঁশি বাজানো আরম্ভ করল। নিভেল বিজ্ঞের মত স্থানীয় এক কাফের মালিককে বুঝিয়ে ছাড়ল যে, 'ক্রুসিফিক্স্' ভারমূথ বিক্রী করার চেয়ে 'সিনৎসানো' বিক্রী করা অনেক লাভজনক। ইভ্ বলে, 'মাইরি, এখানকার মাটিটা বেশ খাসা।' সে এই ভেবে অবাক হয় যে, মাটি সব জায়গায় একই রকম ভাল। আঁদ্রে সকলেরই প্রিয়পাত্র। তেমনি অদ্ভুত হাসি হেসে সে শেষ খাম্‌চি তামাকটা ইভের হাতে তুলে দেয়, জিভেরের একটা ছবি এঁকে দেয় 'তার ভালবাসার পাত্রীর জন্যে'।

শান্তির সময়ে কোম্পানী-কমাণ্ডার লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে ছিল ফটোগ্রাফার; বিবাহিত যুবক-যুবতী, সন্তভূমিষ্ঠ শিশু ও স্থানীয় গণ্যমান্যদের ছবি তুলে বেড়াত। লোকটা বেশ স্বচ্ছন্দ কিন্তু খুঁতখুঁতে আর একটু বেশী রকম স্পর্শপ্রবণ। লোককে ভের্দাঁর গল্প বলতে বড় ভালবাসে সে। বলে, 'তখন লোকগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। বোকা হলেও অনেক বেশী ভদ্র ছিল তারা।' সৈনিকরা অমায়িকভাবে হাসে। বীরত্বে তারা বিশ্বাস করে না, কীর্তি-স্থাপনে তাদের আস্থা নেই। এই যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়াতে পারেনি তারা কারণ এই যুদ্ধকে তারা বোঝে না—নিজেদের বলেও মনে করতে পারে না। ফ্রেসিনে রাত্রে বসে বসে ভাবে, 'এ কি একটা ফৌজ? ওরা গুঁড়িয়ে ছাতু করে দেবে আমাদের। কিন্তু দালাদিএটা কিছু বুঝতে পারে না।'

গম-গাছগুলো ফেঁপে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। বাছুরগুলোরও কেমন একটা ফূর্তিহীন ভাব, কেমন একটা অকাল বিষণ্ণতার ছাপ তাদের চোখে। গ্রীষ্মের দিন আসছে এবার। কাফেতে বসে সৈনিকরা গ্রগ-এর বদলে বিয়ার দিতে বলল। গ্রামোফন রেকর্ড বাজিয়ে চলল মনের আনন্দে। মাত্র কয়েকটা রেকর্ড বৈ তো নয়, তার মধ্যে নাকী সুরের রেকর্ডটা বিলাপ করে চলেছে, 'না, না, তুমি তো জানই এর শেষ নেই।' ঐক্যতানে প্রত্যেকটি সৈনিক যোগ দিচ্ছে। ব্রিটানির ছোট্ট শাদা বাড়ীটার কথা মনে পড়ল ইভের। আঁদ্রে তাকিয়ে রইল তারাভরা আকাশের দিকে—হের্শেলের নেবুলার কথা মনে পড়ছে।

কিন্তু হঠাৎ, কর্তৃপক্ষ ও সাধারণ মানুষ—সবাইকে যুদ্ধ একটা আচমকা ঘা দিল। ১৯৩৮এর শরৎকালে সৈন্যরা যুদ্ধ এবং মৃত্যুর জন্যে অনেক বেশী তৈরী হয়েছিল কিন্তু এতদিন নিষ্ক্রিয় থেকে সমস্ত শক্তি ক্ষয়ে গিয়েছে। লরিএ যখন ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে উঠল, 'শুরু হয়ে গেছে,' কেউ তাকে বিশ্বাস করল না। ইভ্ খানিকটা গালাগালি দিয়ে তাসটা ভাল করে ফেটিয়ে নিল। নিভেল বলল, 'বালোনি, শয়তানই জানে তুই শালা কেমন তাস দিয়েছিস এবার!'

চার দিন কেটে গেল। যেমন ছিল ঠিক তেমনটি থাকল সব কিছু। রেডিও ঘোষণা করল যে ফরাসী সৈন্যবাহিনী হল্যাণ্ডের সীমান্তে গিয়ে পৌঁচেছে; জার্মান আক্রমণে খাপ্পা হয়ে উঠেছেন রুজভেল্ট্; বেলজিয়াম সম্রাট ওরফে 'ল রোয়া শেভালিএ' লিএজের বীর প্রতিরোধকারীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু পঞ্চম দিন ভোর থেকে মোটর গাড়ী আর মোটর-সাইকেলের দ্রুত যাতায়াত

আরম্ভ হল। সবুজাভ সকালের প্রশান্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল দূরাগত কামানের গর্জনে। ফ্রেসিনে মুখ কালো করে বলল, 'হল্যাণ্ডে তো জিতছি আমরা!'
দুপুরবেলা জার্মান বোমারু আকাশ থেকে বোমা ফেলল গির্জা ও আরো কতকগুলো বাড়ীর ওপর। একটি স্ত্রীলোক মারা গেল। সংকীর্ণ মেঠো পথে আশ্রয়-প্রার্থীদের ভীড়। তারা উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করছে, 'জার্মানরা মেরে ফেলছে লোকদের।' গ্রামবাসীরা বোমায় ভয় পায়নি কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের দেখে তারা কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। আর্তনাদ করে উঠল মেয়েরা, তারপর ক্যাঁচকেঁচে গরুর গাড়ীতে যথাসর্বস্ব বোঝাই করল; শুয়োরছানাগুলোকে মেরে, গরুবাছুর তাড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলল পুরুষরা। একজন চাষী আগুন ধরিয়ে দিল তার ঘরে, আর সেই আগুন নিবুতেই ঠিমসিম খেয়ে গেল সৈনিকরা। সবাইকে শান্ত করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করল ফ্রেসিনে। জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় চললে তোমরা? রাস্তাতেই মারা পড়বে।' কিন্তু কেউ তার কথায় কান দিল না। তারা নিষ্প্রভ বিমূঢ় চোখে তাকিয়ে রইল ফ্রেসিনের দিকে। সন্ধ্যাবেলা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল সবাই। আঁদ্রে একটা ঘরে ঢুকল: সে ঘরে স্টোভটা তখনো গরম আছে আর এক হাঁড়ি স্টু চাপানো আছে তার ওপর।
আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে সৈনিকরাও মিশে আছে, সেই সব সৈনিক যারা নিজেদের বন্দুক ছেড়েছুড়ে পালাচ্ছে। লোকে বলছে, জার্মানরা নাকি মাত্র পাঁচ মাইল দূরে এসে পৌঁচেছে।
'ট্যাঙ্কও আসছে।' লোকে বলাবলি করল।
'আমাদের লোকরা গুলি ছুঁড়ছে না কেন?'
'গুলি ঠিকই ছুঁড়ছে কিন্তু গোলাগুলো সুবিধার নয়। জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো কিন্তু পাহাড়ের মত বড় বড়।'
নিভেল তার সঙ্গীদের লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'আমরাও যাবো নাকি?'
চটে গিয়ে থুথু ছিটোল ইভ্। বলল, 'যে চুলোয় যেতে হয় যাও।'
নিভেল রাগে ফুঁসে উঠল। উত্তর দিল, 'আমায় ভীতু ভাবলে নাকি? তুমি যদি থাকতে রাজী হও, আমিও আছি।'
আঁদ্রে ইভের দিকে সবিস্ময়ে তাকাল। কে আর এমনি চিন্তা করবে? এই লোকটাই শুধু বলতে পারে: 'মাইরি, এখানকার মাটিটা বেশ খাসা।' আঁদ্রে এখন বুঝল এই পরিত্যক্ত গ্রাম আর জমির প্রতি তার যোগ কত গভীর। এক ঘণ্টা আগে পর্যন্তও সে ভেবেছিল যে এই যুদ্ধের সঙ্গে তার

কোন যোগ নেই, যুদ্ধটা কেবল ছোট ছোট নিশান-চিহ্নিত মানচিত্র আর তেসার নীতি। কিন্তু এখন একেবারে যুদ্ধের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে সে। চিন্তা বা তর্ক করার এতটুকু ইচ্ছা তার নেই। অনাবৃত পাহাড়ের ওপর শুয়ে শুয়ে সে অপেক্ষা করে রইল। মাঠ, পপ্‌লার-ঢাকা পথ আর পাহাড়ের নীচে ছোট ছোট ঘর—এই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে তাকে? কক্ষনো না। তার সমস্ত ভাবনা চিন্তা মুছে গেল, কেবল একটা অস্পষ্ট চাপা আবেগ জ্বলে জ্বলে উঠল, 'আমি কক্ষনো যাব না।' তার পাশেই জিভের শুয়ে—রোগা ছেলেটা অনেক দিন কঠিন কণ্ঠনালী-প্রদাহে ভুগছে, বসে বসে ভৈরবীকে নিয়ে কবিতা লেখে। ইভের মত সেও বলল, 'আমরা এক পাও নড়ব না...' লরিএ রসিকতা করতে চেষ্টা করল, 'চুপ কর ইভ্! ট্যাঙ্কগুলো ভয় পেয়ে যাবে তোমার কথা শুনে। ভাববে ফাঁদে পড়ল বুঝি!' ইভ্ কিন্তু সেখানেই মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লেফটেনেণ্ট ফ্রেসিনে বিষণ্ণভাবে বলল, 'দুয়ার্মি-র অবস্থা এর চেয়েও খারাপ ছিল। তবে হ্যাঁ, মানুষগুলো ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম।'

'আমাদের কথা বলছেন?' আঁদ্রে প্রশ্ন করল।

'না, কিন্তু পারী......' ফ্রেসিনে তার হাত ঝাঁকাল।

রাত হয়ে এল। সমস্ত গ্রামে একই রকম অবস্থা: কুকুর ডাকছে, বুড়োরা নাক ডাকছে ঘরের কোণে, শিশুরা কাঁদছে। কিন্তু এই গ্রামে কোন কুকুর, শিশু বা বুড়ো-বুড়ী নেই। সারা গ্রামটা কেমন নির্জীব হয়ে গেছে। সৈনিকরা বোবার মত জমিতে গড়াগড়ি দিল। রাতটা সংক্ষিপ্ত। ভোর হল চারটের সময়; সূর্যের প্রথম কিরণ বিচ্ছুরিত হবার আগেই উড়োজাহাজ দেখা দিল আকাশে। ব্যাটালিয়নের ১০৯ জন লোকের প্রাণ গেল।

সৈনিকরা আবার পেছন দিকে ছুটতে শুরু করেছে। চিৎকার করছে, 'গোলা নেই! গত বৃহস্পতিবার থেকে গোলাবারুদ পাঠাচ্ছে না। ওরা বলছে, পেট্রল নাকি ফুরিয়ে গেছে......কী ভাবে ওরা? ঘুষ পেয়ে দাগা দিয়েছে আমাদের!'

নিভেল ভাবল, সে চলে যাবে কিন্তু একা যেতে চাইল না। নইলে সবাই হাত ঝাঁকিয়ে বলবে, 'যেতে হয় যে চুলোয় ইচ্ছে যাও!' নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে হিসেব করতে শুরু করল সে: ক্ষতি কম হয়নি, মোট শক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ খোয়া গিয়েছে। অর্থাৎ ১৬৬ জনের মধ্যে ৬৭

জন······আর তিনজন আহতের মধ্যে একজন নিহত। তার মানে শত্রুকরা সতেরজন নিহত। বাঁচা সম্ভব······

রেল স্টেশনের ইঁটের পাঁজার ধার দিয়ে জার্মান ট্যাঙ্কবাহিনী হুড়মুড় করে এগিয়ে আসছে। পাহাড় ঘুরে আসছে ওরা। এবার চারদিকে গুলির শব্দ শোনা গেল। তারা পাহাড়ে বসে বসে কী করছে? সামনে পেছনে, জার্মানরা ঘিরে ফেলেছে তাদের। বাঁ দিকের কী খবর? বাঁ দিকে কি হচ্ছে কে জানে। ওরা তো আমাদের নিজেদের লোক, তৃতীয় ব্যাটালিয়ন। কিন্তু বাঁ দিকেও তো সবাই পালাচ্ছে······পালিয়ে গেলে কেমন হয়? না। এই পাহাড়টাকে কেমন আপন বলে মনে হচ্ছে, অপরিচিত নয়, খবরের কাগজে বর্ণিত 'ঘাঁটি' নয়, জীবনের অবশিষ্ট আশাভরসার প্রতীক। আঁদ্রের মনে হল যেখানে সে শুয়ে আছে ঠিক সেই জায়গাতেই মেশিনগানের পাশে সে জন্মেছে। সবাই ঠিক আঁদ্রের মতই নিজেদের সম্বন্ধে ভাবল। জিভের কি যেন বিড়বিড় করছে ধীরে ধীরে; কবিতা নয়, অভিশাপ। ফুঁসে ফুঁসে উঠছে সে।

আবার বোমারুগুলো এগিয়ে এল। নিভেল নিহত হল এবার। সেই হাসি-খুশি ওয়েটারটা আর বেঁচে নেই! এবার আর কেউ তিক্ত-মধুর ক্ষুধা-উদ্রেককারী মদ সম্পর্কে আলোচনা করবে না। কেউ প্রশ্ন করবে না: 'তারার সংখ্যা কত জান? কোথায় যেন পড়ছিলাম আঠার হাজার তারার নাম দেওয়া হয়েছে। তাকে একশো দিয়ে গুণ কর············'

নামওলা আর নামহীন তারার সমারোহ নিয়ে আরেকটি রাত্রি এল। শুকনো বিস্কুট চিবিয়ে খেল লোকে। ক্লান্ত আর ভগ্নোৎসাহ হয়ে তারা অপেক্ষা করে রইল সকালের জন্যে······যুদ্ধ আর মৃত্যু একটা বিস্তার নিয়ে আসবে তাদের জীবনে।

সাড়ে চারটের সময় ফ্রেসিনে নির্দেশ দিল, 'মেশিনগান চালাও!'

লরিএ দেখল রাস্তার পেছনে হালকা রূপোলী কুয়াশাটা কেঁপে উঠে নড়তে শুরু করেছে।

'মেশিনগান নং ১, ফিল্ড নং ৯৭!'

'গুলি চালাও!'

জার্মানরা ভেবেছিল কোন বাধা পাবে না, ফরাসীরা অনেক আগেই পালিয়ে গিয়েছে। আঁদ্রে মনে মনে অদ্ভুত আনন্দ বোধ করল। চিন্তাটা মদের মত উঠে

গেল মাথায়। পাশ থেকে ইভ্ চিৎকার করে উঠল, 'লেজ তুলে পালাচ্ছে ওরা!'

রাস্তার ধারে এক থানার মধ্যে জার্মানরা আশ্রয় নিয়েছে। মিনিট বিশেক পরে কামানের গুলি ছোঁড়া শুরু হল পাহাড়ের চুড়োর উদ্দেশ্যে। প্রথম প্রথম গুলিগুলো পাহাড় টপকে চলে গেল।

'একেবারে গ্রামের মাঝখানে গিয়ে পড়ছে। নিজেদের লোকদের ওপরই গুলি চালাচ্ছে ওরা।'

তারপর গোলাগুলি পাহাড়ের ওপর এসে পড়ল। মাটির ঝড় উঠল আকাশে! দুটো বিস্ফোরণের মাঝখানে আর্তনাদ করে উঠতে লাগল মানুষ। কেমন অবাস্তব শোনাল মরিয়া মানুষের আর্তনাদ, তাদের চোখগুলো ঝলসে উঠল সূর্যের আলোয়; একমাত্র চিন্তা, তারা পিছু হটবে না; মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকবে তারা, তারপর কম্পমান মাটির ঝড়ের সঙ্গে উড়ে যাবে, তবু পরাজয় স্বীকার করবে না।

তারপর সমস্ত কিছু নিস্তব্ধ হয়ে এল। মনে হল কেউ কোথাও নেই। তাকাতে গিয়ে জিভেরকে দেখে অবাক হয়ে গেল আঁদ্রে, সে চোখ মিটমিট করছে। তাহলে সে বেঁচে আছে। লরিএ হাসছে। ঘাসের ওপর বসে আপন মনে ডাকছে একটা বোকা পাখী। ফ্রেসিনে ধূমপান করছে। কিন্তু ইভ্ কোথায়? হয়ত মারা গেছে। সমস্ত চিন্তাগুলি তার মনকে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে অতিক্রম করে গেল এবং করুণা বা ভয় কিছুই বোধ করল না সে। ভাবল, 'এখনি হয়ত আমি মারা যাব। তাতে কীই বা যায় আসে? শুধু একটিমাত্র কথা—জার্মানদের কাছে আসতে দেবে না তারা। মেশিনগানকে সে এখন যতটা আবেগভরে ভালবাসছে তেমন আর কখনো ভালবাসেনি অন্য কাউকে।

'ছশো পঞ্চাশ।'

আবার উড়োজাহাজ দেখা দিয়েছে। পাথরের মত বোমাবৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে।

হাঁটুর ওপর একটা ব্যথা অনুভব করল আঁদ্রে। কি হয়েছে একবার দেখবে মনে করল। বহুক্ষণ ধরে চোখ রগড়াল: ঘুম পাচ্ছে তার। ঘুম থেকে উঠেই সে লরিএকে দেখল। রক্তে ভেসে গেছে তার সমস্ত মুখ। কুছ পরোয়া নেই। ওদের কিন্তু কাছে আসতে দেওয়া হবে না।

তাকে টেনে পাশে সরিয়ে দেওয়া হল। 'জিভের, তুমি কর্ণোর জায়গায় যাও!

কাঁটাওলা ঘাসের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে শুয়ে রইল আঁদ্রে। আবার আক্রমণ চালিয়েছে জার্মানরা।

অর্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে শুয়ে মেশিনগানের গর্জন শুনল আঁদ্রে। অবস্থা-ঘটিত কাহিনীর কথা মনে করে সে অনেক শান্ত বোধ করল। আচমকা মেশিন-গানের গর্জন থেমে গেল। জিভের চিৎকার করে উঠল, 'ড্রাম বাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে।'

আঁদ্রে শক্তি সঞ্চয় করে বন্দুকের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার চেষ্টা করল। কথা বলতে চাইল, প্রকাশ করতে চাইল নিজেকে কিন্তু অবাধ্য জিভ কথা শুনল না। হাত তুলে সে প্রাণপণ চেষ্টায় হাতের তালু দিলে ড্রামের ওপর আঘাত করল। 'ঐ!' কথা বলেই হাঁপাতে লাগল আঁদ্রে। মাটির ওপর পড়ে গেল মাথাটা।

যখন ঘুম থেকে উঠল তখন রাত হয়েছে। তার চারদিকে সমস্তই খড় আর খড়। প্রথমে তার মনে হল, মাঠের মাঝখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। তার বাবাকে বলছিল, 'এত তাড়াতাড়ি ফসল তুলছ কেন?' তারপর তার মনে পড়ল যে সে আহত হয়েছিল। লরিএ শুয়ে আছে তার পাশে। সে মুখটা দেখতে পেল না কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনল, 'তুমি নাকি?'

'হ্যাঁ আমি।'

বেদনায় আঁদ্রে ভুরু কোঁচকাল। কত কথাই না তার বলার আছে।

'লরিএ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মেশিনগান আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তেসার ঐ নোংরা নাকটার কথা মনে আছে তোমার? ও বেটা জমি কিনে বেড়াচ্ছে। আমার তো ভয় হচ্ছে, ওরা মেরে ফেলেছে ইভ্‌কে—মাইরি, এখানকার জমিটা বেশ খাসা। সত্যিই, মজার ব্যাপার, কি বল? না, না, এ কিন্তু এখানে কক্ষনো থামবে না, দেখে নিও।'

'কক্ষনো থামবে না!' মৃদু গলায় বলল লরিএ।

এবার যখন আঁদ্রের ঘুম ভাঙল তখন সে বিছানায় শুয়ে। কে যেন তার পাশে এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে মাথা ফেরাল সে।

'ইভ্! আমি ভেবেছিলাম তোমাকে মেরে ফেলেছে ওরা!'

'আমাকে?' ইভ্ বিরক্ত হল। 'চুলোয় যাক ও সব কথা! তোমার এখন কথা বলা উচিত নয়—নার্স বলল। আমাকে তো ঢুকতেই দিচ্ছিল না ও।'

'বাজে কথা রাখ! ইভ্, জার্মানরা ঠেকাতে পেরেছিল?'

'পেরেছিল। কিন্তু আমাদের ট্যাঙ্ক গ্রামটা পুনরধিকার করেছে। মাত্র চারটে

ট্যাঙ্ক। ঠিক সাতটার সময়। তারপর এক পত্রবাহক এল হেড-কোয়ার্টার থেকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ নিয়ে।'

'কী বলছ?'

'হ্যাঁ, জেনারেল পিকার্ অর্ডারটা দিয়েছে। ফ্রেসিনে হুকুমনামাটা পড়েই রিভলবারটা টেনে বার করল, তারপর দম্! ঠিক মগজের মাঝখানে গিয়ে বিঁধল গুলিটা! সত্যি বলছি, রীতিমত ভাল ছিল লোকটা, একটু দুর্বল—এই যা! ওর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোমবাতি জ্বালাব আমি। নিভেলের জন্যেও জ্বালাব একটা। পাহাড়টা ছেড়ে আসাতে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে।'

আঁদ্রেও দুঃখিত হয়েছে। পপলার-ঢাকা পথ, পাহাড়ের পাদদেশে ছোট ছোট ঘর আর কাঁটাওলা ঘাসের কথা মনে পড়ল তার। মাইরি এখানকার মাটি বেশ খাসা! মাটি, জিনেৎ...

'ইভ্, ছেড়ে যেও না। কক্ষনো না। আমায় শুনতে পাচ্ছ? কক্ষনো ছেড়ে যেও না কিন্তু।'

১৮

সংবাদপত্রওলারা বলল যে, জার্মানরা সময় নিচ্ছে। কিন্তু পরাজিত নবম সৈন্যবাহিনীর লোকরা পারীর পূর্ব উপকণ্ঠে এসে পৌছতে লাগল। মতিনি তার পরিবারকে পাঠিয়ে দিল বিয়ারিৎস-এ। কাদিলাক, হিসপানো-সুইজা, বুইক, সৌখিন মোটর গাড়ীগুলো শহর ছেড়ে চলে যেতে আরম্ভ করল। ট্রেঞ্চ কাটা হল বোয়া দ্য বুলোঞ্‌-এ। রহস্যজনক প্যারাস্যুটিস্ট আর পঞ্চম বাহিনী সম্পর্কে কথা বলাবলি করতে লাগল লোকে। ব্রতৈল বলল, বিদেশী লোক আর আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়েই পঞ্চম বাহিনী। তার নির্দেশ মত পুলিশ কয়েক হাজার জার্মান ইহুদী, ফ্যাশিস্ট ইতালী হতে পলাতক মজুর আর স্প্যানিশ রিপাব্লিকানদের গ্রেপ্তার করল। পুলিশদের হাতে রাইফেল তুলে দেওয়া হল, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল তারা। বৃহৎ শহরের দৈনন্দিন জীবন আগেকার মতই প্রবাহিত হতে থাকল। কাফেতে লোকদের প্রচণ্ড ভীড়, দোকানগুলোয় ফলাও ব্যবসা; মারি আঁতোয়ানেৎ-এর অটোগ্রাফ আর দিরেক্তোয়ার আসবাবপত্র নীলামে বিক্রীর জন্যে এল। আসন্ন শীত ঋতুর জন্যে প্রস্তুতি করতে লাগল ফ্যাশন-হাউসগুলো। বিশেষ করে শেয়ার বাজার

ভয়ানক তেজী। এ সব সত্বেও, প্রত্যেকটি শেয়ারের কয়েক পয়েণ্ট করে দাম বেড়ে গেছে। মিলিটারি থেকে নিয়ে নেওয়ার ফলে বাসগুলো রাস্তা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাস উঠে যাওয়ায় কেমন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পারীবাসীরা। মার্ন-যুদ্ধের আগেকার দিনগুলির কথা মনে পড়ল তাদের, যখন জেনারেল গালিএনি ট্যাক্সির সাহায্যে জার্মান বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল।

১৬ই মের সকালবেলা তেসার সেক্রেটারী তাকে খবর দিল যে জার্মান ট্যাঙ্ক লাওঁ পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে! তারপর অর্থপূর্ণভাবে বলল, 'পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ এগিয়েছে ওরা। এখন লাওঁ থেকে পারীর দূরত্ব হল মাত্র একশো ত্রিশ কিলোমিটার।'

তেসা ক্ষেপে আগুন। চিৎকার করে বলল, 'কী সাহসে এই সব গুজব ছড়াচ্ছ তুমি? আমাকে তাহলে কড়া ব্যবস্থাই নিতে হবে!'

সেক্রেটারী চলে যাওয়ার পর রেনোকে টেলিফোনে ডাকল তেসা, 'শুনুন, জার্মানদের সম্পর্কে যা শুনছি মনে হচ্ছে সবই বাজে কথা, কি বলেন?'

'ওরা লাওঁর কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে।'

'তাহলে আপনি বলতে চান পারীতে আসবার আঁটঘাট বাঁধছে ওরা।'

'সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নেই।'

'তাহলে তো এখানে পৌছতে বড় জোর চার দিন সময় লাগবে ওদের। দিনে ত্রিশ কিলোমিটার এগোচ্ছে ওরা। আমি হিসেব করে দেখেছি।'

'গামল্যাঁ তো বলছে ওরা আজ সন্ধ্যা নাগাদ পারীর উপকণ্ঠে এসে পৌঁছবে। আমি সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি। শহর ছেড়ে যাবার প্রস্তুতি করে রাখা উচিত। এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ফোন করব আপনাকে।'

তেসা সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল, বলল, 'একটু কড়া কথা বলে ফেলেছি খানিক আগে। কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছ খবরটা যে কোন লোকের মাথা ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য আমি নিজে একটুও বিচলিত হইনি। কিন্তু যে কোন ঘটনার জন্যে তৈরী থাকতে হবে আমাদের। প্রথমে, সরকারী দপ্তরগুলো পুড়িয়ে ফেল। দ্বিতীয়, যে সব সরকারী কর্মচারীদের শহর ত্যাগ করা দরকার তার একটা তালিকা তৈরী কর। আমার সোফারটাকে বল গাড়ী তৈরী রাখতে। এক মুহূর্তের জন্যেও যেন গাড়ী ছেড়ে না যায়। হয়ত লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে পড়ব আমি।'

পলেতের কথা মনে পড়ল। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। লোকে ক্ষেপে আছে। পলেতের কথা কারও অজানা নয়। হয়ত বিশ্রী ঘটনা ঘটতে পারে। সমাজতন্ত্রীরা ব্যাপারটা নিয়ে তিলকে তাল করবে। কিন্তু পলেৎকে কি করে বলা যায় কথাটা? ও এ জগতের মানুষ নয়। ও হয়ত কেঁদে ভাসাবে। তার চেয়ে কথাটা ফোনে বলা অনেক ভাল:

'লক্ষ্মীটি, এখান থেকে তুমি এক্ষুনি চলে যাও......তোমায় বলতে পারছি না... খবরটা এত ভয়াবহ...সন্ধ্যাবেলা ওরা এখানে এসে পৌছবে। কোন সন্দেহ নেই তাতে। লোকে কিন্তু এ সম্পর্কে এখনো কিছু জানে না। তুমি কিন্তু একটা কথাও কাউকে বোলো না। আতঙ্ক সৃষ্টি করে কি লাভ? গার্ দ্য লিয়ঁতে গিয়ে প্রথম ট্রেনটা ধর···আমি? না, না, আমি যেতে পারি না। শেষ পর্যন্ত আমাকে আমার জায়গায় থাকতেই হবে। আমাদের বলতে হয় না, আমাদের নিজে থেকে বীর হতে হয়...আচ্ছা বিদায়, লক্ষ্মীটি!'

রিসিভারটা নামিয়ে হঠাৎ টেবিলের ওপর কপাল রেখে কাঁদতে লাগল তেসা। কী শোচনীয় দুর্ভাগ্য! এক সপ্তাহ আগে সমস্ত কিছু শান্ত আর সুন্দর ছিল। ভাবতেই কেমন আশ্চর্য লাগে! তারা নরওয়ের সামরিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে আলোচনা করছিল। তেসা ভাবছিল পলেৎকে নিয়ে একবার প্রে-দে দ্যাঁ-এ ঘুরে এলে কেমন হয়? পাঁচ দিনে একশো চল্লিশ কিলোমিটার। কী অদ্ভুত কাণ্ড! নিশ্চয়ই সেনাবাহিনী ছুটতে ছুটতে এসেছে সারাটা পথ! হয়ত দোষটা তাদের নয়। মিছিমিছি কে প্রাণ দিতে চায়? বেচারী ফ্রান্স!

শিউরে উঠে তাড়াতাড়ি ঘড়ির দিকে তাকাল তেসা। বেনো এখনো ফোন করল না? তারা কি সবাই পালিয়ে গেছে, একেবারে ভুলে গেছে তার কথা।

তেসা ঘণ্টা টিপে সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল। 'বের্থারকে গাড়ী তৈরী রাখতে বল। আর হ্যাঁ, পেট্রলের কয়েকটা বাড়তি টিন নিয়ে রাখতে বল সঙ্গে। রাস্তায় কি অবস্থা হবে তা কেউই বলতে পারে না।'

সেক্রেটারী মাথা নাড়ল। বলল, 'ক্ষমা করবেন, মসিয় দেসের বিশেষ দরকারে দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'দেসের?...কী অদ্ভুত লোক! এখন কি দরকার পড়ল তার? আচ্ছা আসতে বল তাকে।'

দুজনে নীরবে করমর্দন করল, পরস্পরে যাতে চোখাচোখি না হয় তার চেষ্টা করল

দুজনে। তেসার চোখ দুটো জবাফুলের মত লাল। দেসের বুড়িয়ে গেছে; তার ম্লান চোখের তারাগুলো ধূসর-রঙা ঝাঁকড়া ভুরুর মধ্যে ভাল করে চোখেই পড়ছে না। দস্তানার ভাঁজ ঠিক করে সিগারেটের বাক্স বার করল পকেট থেকে কিন্তু সিগারেট ধরাল না।

কাগজ-চাপাটা একবার সামনে আর একবার পেছনে নাড়াতে থাকল দেসের। তেসার কাছে অসহ্য মনে হল এই মৌন।

'জুল, কী বলতে চাও তুমি?' সে জিজ্ঞাসা করল।

দেসের সোজা তার দিকে তাকাল। সে নিজেই জানে না কেন সে তেসার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, পাগলের মত ছুটোছুটি করছে সর্বত্র। সেনা-কর্তৃপক্ষ আর মন্ত্রীদেব সকলের কাছে সে হয়ে এসেছে। রেনো, মাদেল, জেনারেল জর্জ—এদের সে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, ভয় দেখিয়েছে, প্রমাণ উপস্থিত করেছে। কিন্তু অত্যন্ত অমায়িকভাবে বাইরে বেরুবার পথটা দেখিয়ে দিয়েছে এরা।

শেষ পর্যন্ত সে কথা বলা শুরু করল, 'জার্মানরা কালই হয়ত পারী অধিকার করে বসবে। কয়েকটা মুহূর্ত শুধু অবশিষ্ট আছে। সরে দাঁড়াও! নয়ত বল শিরদাঁড়া উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াবে তোমরা। যা বলবে মন সাফ করে বলবে কিন্তু। চারদিকে গুপ্তচর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেব ধরে ধরে গুলি করে মারো। মজুরদেব নয়—ঐ লাভাল, গ্রঁদেল, ব্রতৈল আর পিকারকে।'

'যা বলছ ভেবে দেখেছ তাব গুরুত্বটা? অবশ্য আমবা দুজন পুরনো বন্ধু, কিন্তু দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত আছি আমি। আমি একজন মন্ত্রী আর তুমি রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'আমি বলছি তুমি বিদেয় হও। নয় যুদ্ধ করো। এক-একটা রাস্তা ধরে পারীকে রক্ষা করতে পারি আমবা।'

'ধন্যবাদ! তাহলে মজুর মহোদয়দের কমিউন প্রতিষ্ঠা করতে খুব সুবিধা হয়, তাই না? না, নিজের সম্মান বাঁচানোর পথই বেছে নিয়েছি আমি।'

'কিন্তু ফ্রান্স ......'

'১৮৭১-এর ধাক্কার পরও ফ্রান্স উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবারও দাঁড়াবে।'

'সে সময়ে বেলফর রুখে দাঁড়িয়েছিল আর ওরা যুদ্ধ করেছিল লয়ারের

ধারে। গ্যামবেতা নিজে সৈন্যবাহিনী তৈরী করেছিল, পারী প্রতিরোধ করেছিল আর ছিল গোরিলা বাহিনী। কিন্তু এখন জার্মানদের দেখেই পথ ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসছে প্রত্যেকে।'

'তুমি কী করতে চাও?'

'প্রতিরোধ করতে চাই। যদি পারীকে ঠেকানো না যায়, এস লয়ার-এ গিয়ে রুখে দাঁড়াই আমরা। তাও যদি ভেঙে ফেলে, আমরা আলজিএর-এ গিয়ে প্রতিরোধ করব। আমি যথাসর্বস্ব ত্যাগ করতে রাজী আছি, শুধু অর্থ নয় প্রাণ পর্যন্ত দিতে তৈরী। আর আমার মত আরও বহু লোক আছে। তোমার জানা উচিত তোমাদের মন্ত্রীদের আর এতটুকুও বিশ্বাস করে না কেউ।'

তেসা উষ্মা প্রকাশ করল। বলল, 'তোমার আত্মবিশ্বাসে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের পেছনে সমস্ত চেম্বারের অর্থাৎ দেশের লোকের সমর্থন রয়েছে। কাল হয়ত তুমি বলে বসবে ম্যাদাগাস্কারে যাওয়া উচিত আমাদের।'

দেসের বুঝল তেসা কতদূর গিয়েছে। এতক্ষণ সে অনুরোধ জানিয়েছে, এবার সে গলার স্বর পালটাল।

বলল, 'পল, তুমি নিজেই ভেবে দেখ! যদি জার্মানরা জেতে তাহলে পার্লামেন্টের অস্তিত্ব পর্যন্ত থাকবে না। এখানেও ওরা গাউলাইতর খাড়া করবে —ব্রতৈল বা লাভাল। এমনিতে যথেষ্ট আপোষরফা করেছ। কী করতে চাও এখন?'

'যে করে হোক চালিয়ে নেব। কমিউন প্রতিষ্ঠা হবার চেয়ে ব্রতৈলের শাসন অনেক ভাল। তুমি বদ পরামর্শদাতা। আমি গোঁড়া নই, তের নম্বরটা আমার কাছে শুভ। চৌদ্দ তারিখে আমালি মারা গিয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকেরই নিজস্ব কতকগুলো গোঁড়ামি আছে। আমি দেখেছি তুমি সব সময়ে দূরদৃষ্ট নিয়ে আস। ঠিক বৃটিশদের মত। তুমি ব্রতৈলকে সমর্থন করেছিলে, ফলে পপুলার ফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। ভীইয়ারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হল লোকটার। তুমি প্রতিরোধ করতে বলছ তার মানে নির্ঘাত আত্মসমর্পণ আছে আমাদের কপালে।'

দেসের উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে অগ্রসর হল। তেসার দুঃখ হল লোকটার

ওপর। বলল, 'জুল, তুমি আমেরিকা চলে গেলেই পার। প্রচুর পয়সা আছে তোমার। আমেরিকা দেশটা একটা স্বর্গ। আমি যেতে পারছি না কারণ এখানে জড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, আর একটা কথা, অবশ্য তা তোমার জন্যেই... ....একটু অপেক্ষা কর, এটা ঝগড়া করার সময় নয়। আমার কথা শোন—যেখানে হোক এক জায়গায় চলে যাও।'

দেসের প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এল। চক চক করে উঠল চোখ দুটো, হাসল সে। বলল, 'চলে যাব? জানি, আমি একজন অপদার্থ ফরাসী। রাস্তায় চলতে গিয়ে প্রথম লোকটাই যদি আমাকে অপমান করে তাতেও আমি আশ্চর্য হব না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের নাম নিয়ে বলছি যে এসব সত্ত্বেও আমি একজন ফরাসী।'

তেসা কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে দরজাটা দেসেরের পিঠের ওপর বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল সমস্ত কথা। নিজের সঙ্গে কি কি জিনিস নিয়ে যাবে তার একটা ফর্দ বানিয়ে ফেলল: একটা সামরিক মানচিত্র, ডাকঘরের ফর্ম, এক কপি লা রেভ্যু দে ড্যু মনদ্, যকৃতের নির্যাস, এক বোতল পুরনো আর্মাঞাক্ মদ আর এক কপি রাস্তার বিবরণ-দেওয়া বই। ঠিক বেরুতে যাবে এমনি সময়ে রেনোর টেলিফোন এল:

'লাওঁ জেলার অবস্থা অনেকটা উন্নত হয়েছে,' রেনো বলল, 'প্রথম সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রধানত আক্রমণ চলছে। তার মানে স্যাঁ কাঁতাঁ পেরন অঞ্চলে। বুঝতেই পাচ্ছেন প্রতিরোধ ভেঙে তীরে পৌছবার ফিকিরে আছে ওরা। আমি আজই চেম্বারে একটা বক্তৃতা দিচ্ছি।'

খুশিতে উপচে উঠল তেসা। আত্মসন্তুষ্টির হাসি হেসে তেসা তার সেক্রেটারীকে ডেকে পাঠাল, 'আমি বলেছিলাম আতঙ্কিত হবার কিছু নেই! বুড়ো হলেও সাহসিকতার শিক্ষা আমাকেই দিতে হচ্ছে যদিও ওটা তরুণদেরই ধর্ম।'

পলেৎকে ফোন করল তেসা। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে: ইতিমধ্যে সে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছে। তারপর জোলিওকে ডেকে দেখা করতে বলল। উদ্‌ভ্রান্তের মত উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত হল ছোট্ট খর্বকায় সম্পাদকটি। তারপর একেবারে ফেটে পড়ল, 'সমস্ত শহরে একটা আতঙ্ক। মতিনিটা কেটে পড়েছে। আমার ক্যাশ-বাক্সে মোট একশো ফ্রাঁ আছে। সব কটা কাগজই পারী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিন্তু আমি যাই কোন্ চুলোয়?

মার্সাই-এ? কিন্তু রোম কি বলছে তা আমি নিজে শুনেছি। আমার ধারণা, আগামীকাল ইতালিয়ানরা আমাদের আক্রমণ করবে।'

'অর্থ-সমস্যার একটা ব্যবস্থা করছি আমরা।' তেসা বলল, 'বুঝছি না এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন। বহুদিন থেকেই তো অবস্থাটা খুব শান্ত নয়। তুমি ভাবছ জার্মানরা পারীতে আসছে? মোটেও না! লণ্ডনে যাচ্ছে ওরা।' তেসা সন্তোষের হাসি হাসল।

জোলিও আপত্তি জানিয়ে বলল, 'ওরা খুব ভাল করেই জানে, এখানে কি ঘটছে না ঘটছে। তাছাড়া ওরা কি মতলব এঁটেছে, তাই বা কে জানে?'

যাই হোক তেসা যখন বলল যে সে তার গুপ্ত অর্থ-ভাণ্ডার থেকে তিন লক্ষ ফ্রাঁ তাকে সাহায্য করবে তখন একেবারে থিতিয়ে গেল জোলিও। কাগজের আপিসে ফিরে সম্পাদকীয় লিখতে আরম্ভ করল: 'শত্রুর গতিবিধি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মিত্রপক্ষের ফ্রন্টে যা সব চেয়ে দুর্বল জায়গা—সেই গ্রেট বৃটেনকে দখল করতে চায় জার্মানরা। আমরা অবশ্য নিশ্চিন্ত যে আমাদের চ্যানেল পারের বন্ধুরা এ সম্পর্কে অবহিত আছেন।' বাড়ী ফিরে সে স্ত্রীর ওপর ফেটে পড়ল, 'মালপত্র সব খুলে ফেল। জার্মানরা ইংলণ্ড যাবে বলে মোড় ফিরেছে। তেসা তিন লক্ষ ফ্রাঁ দিয়েছে আমায়। ইংলণ্ডের কি অবস্থা তা এখান থেকে অনুমান করতে পাচ্ছি! ওরা আমাদের এক মাস সময় দিয়েছে, এর জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওদের কাছে।'

জোলিওর প্রবন্ধ পড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল পারীবাসীরা। খবরের কাগজে দুটি সরকারী নির্দেশ ছেপে বার হল। আগামীকাল নৎর্ দাম-এর গির্জায় প্রার্থনা সভা হবে—আর সেখানে স্বয়ং রেনো উপস্থিত থাকবে। আর পারীর সমস্ত কমিউনিস্ট সংগঠনগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্যে স্বরাষ্ট্র আর আইন মন্ত্রীদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। আটজন মজুরের হাতে 'লুমানিতে' কাগজ পাওয়ায় তাদের পাঁচ বছর কারাবাসের হুকুম দেওয়া হল। সংবাদপত্রে জানা গেল যে বেলজিয়মে জার্মান সৈন্যরা প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করছে এবং কতকগুলি ইউনিট যুদ্ধ করতেই চাইছে না। শেয়ার বাজারের কাজকর্ম কেঁপে উঠতে লাগল।

সাহস আর দৃঢ়তার সঙ্গে রেনো চেম্বারে বক্তৃতা দিল। বক্তৃতা শেষ হলে অভিনন্দন জানাল তেসা, 'আজ আপনার বক্তৃতাটা চমৎকার হয়েছে। ভাগ্যিস,

সকালে গভর্নমেন্টের পতন হয়নি। যখন আপনি বললেন যে জার্মানরা ইংলণ্ডের দিকে যাচ্ছে .....'

অবাক হয়ে রেনো ভুরু কোঁচকাল, 'ইংলণ্ডের দিকে যাচ্ছে? আমি তো বলেছিলাম তীরের প্রতিরোধ ভেঙে এগোতে চাইছে ওরা। আমাদের সৈন্য-বাহিনীকে ঘেরাও করার জন্যে আমিএঁ যাচ্ছে। বুঝলেন?'

তেসা মাথা নাড়ল কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করল না। মিনিট পাঁচেক পরে ব্রৈতলকে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, 'রেনো তার প্রভুর জন্যে চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ওর কাছ থেকে আর কি আশা করতে পারা যায়? আসলে ও ইংরেজদের সচিস। কিন্তু এখন ও শেষ অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। জার্মানরা যদি আমিএঁ পর্যন্ত পৌঁছয় তাহলে রেনোর পতন অনিবার্য। আর যত তাড়াতাড়ি তা হয় ফ্রান্সের পক্ষে ততই ভাল।'

১৯

কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ভাঙা কণ্ঠস্বরটা কিছুতেই ধরতে পাচ্ছে না জেনারেল। দ্য ভিসে চিৎকার করে উঠল, 'কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' কলরবের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে তার কথা। হঠাৎ শান্ত হল কলরব, পিকারের গলাটা গম গম করে উঠল যেন পাশের ঘর থেকে কথাটা আসছে: 'শত্রু লাওঁ-এর ওপর চড়াও হয়েছে। ফলে রাজধানী বিপন্ন হয়ে উঠবার সম্ভাবনা আছে।'

দ্য ভিসে চটে উঠল, 'বাজে কথা! ওরা লাওঁ আক্রমণ করার ভান করছে মাত্র। আসলে আক্রমণটা আমিএঁর দিকে। আপনি যদি আরো সৈন্য পাঠান তাহলে এখানকার অবস্থাটা গুছিয়ে আনতে পারব। দ্য গলের ট্যাঙ্ক বাহিনী পাঠিয়ে দিন এখানে......শুনলেন কথাটা?'

আবার চিৎকার শুরু হয়েছে। একটি স্ত্রীলোক ক্লান্ত বিষণ্ণ গলায় বিড় বিড় করে চলেছে, 'পারী ..পারী...' অবশেষে দ্য ভিসে শুনতে পেল: 'ট্যাঙ্ক বাহিনী... পাঠানো......হবে না।'

ঘরের মধ্যে কী অসহ্য গরম! উত্তপ্ত টেলিফোন রিসিভারটা থেকে কেমন একটা অপ্রীতিকর গন্ধ বেরুচ্ছে। দ্য ভিসে কলারটা ঢিলে করে এক গ্লাশ গরম জল খেল। তার না-কামানো মুখ বেয়ে নেমে এল ঘামের ধারা। তার রক্তাক্ত চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসছে যেন। গত তিন রাত্রি চোখের পাতা ফেলেনি সে।

সামরিক দপ্তরের কর্তা এসে ঢুকল, 'জেনারেল গর এইমাত্র খবর পাঠিয়েছেন যে ওরা সকাল ছয়টায় হামলা করবে।'

'১১নং ডিভিশনের খোঁজ পেয়েছেন?'

'জেনারেল ভিঞ্জম বিমূঢ় হয়ে বসে আছেন। তিনি বললেন ডিভিশনটাকে একেবারে লাইন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাঁ দিকে আক্রমণ ঠেকাবার দরকার হয়ে পড়েছিল।'

'ট্যাঙ্ক-আক্রমণ?'

'না, পদাতিক বাহিনী। মোটর-লরি করে আসছিল ওরা।'

'ও,' জেনারেল ক্রুদ্ধ হয়ে আরেক গ্লাশ জল খেল।

'কী বিশৃঙ্খলা! কিন্তু এসব সত্ত্বেও, বৃটিশকে আমাদের সাহায্য করতে হবে। একটা সিদ্ধান্ত করার আগে জেনারেল গর আমার সঙ্গে পরামর্শ করলে পারতেন। ১১নং ডিভিশনের দপ্তর এখন কোথায়?'

'গ্রাঁজে-এ।'

'জায়গাটা কত দূর এখান থেকে?'

'সতের কিলোমিটার। জানি না ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে কি না। শত্রুপক্ষ এখন কোথায় আছে না আছে তা ঠিক করে বলা যায় না। এ ঠিক নেপোলিটান আইসক্রীমের মত: আমরা, ওরা, আমরা, ওরা।

রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেছে। ট্যাঙ্ক এসে আটকে আছে একটা। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছাগল তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। সারাটা রাস্তায় ভাঙাচোরা গাড়ী এলোমেলো ছড়ানো। আশ্রয়প্রার্থীরা, বেশীর ভাগই বেলজিয়ান, বিধ্বস্ত বাড়ীগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে ভীরু চোখে।

জেনারেলের গাড়ী আধ ঘণ্টার জন্যে আটকে গেল। একটা চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেছে, সঙ্গে বাড়তি চাকা নেই। চাষী পরিবারের এক বুড়ী এসে দাঁড়াল জেনারেলের কাছে। তার ঘন বাদামী কোঁচকান মুখটা দেখাচ্ছে ফাটা জমির মত। কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছছে।

'সৈন্যরা কেন যাচ্ছে? আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে নাকি ওরা?' বুড়ী জিজ্ঞাসা করল।

ভু ভিসে উত্তর দিল, 'ঠাণ্ডা হও। আমি নিজে একজন বুড়ো লোক আর বুড়ো সৈনিক। আমি তোমাকে মিথ্যে কথা বলব না। জায়গাটা আমরা ছেড়ে যাব না। এদিকে তোমরাও ছেড়ে যেও না।'

গ্রাঁজে পৌঁছবার ঠিক আগে সোফারকে গাড়ী থামাতে বলল জেনারেল। তারপর জানলা দিয়ে বাইবে মুখ বার করল।

'কি হে, প্রেফে মশাই, কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

বোতাম-ঘরে লাল গোলাপ লাগানো সুন্দর স্যুট-পরা লম্বা লোকটা ঘাবড়ে গেল। গাড়ী থেকে নামতে গিয়ে নীচে পড়ে গেল একটা দস্তানা। গাড়ীব মধ্যে একটি তরুণী—মালপত্র আর কার্ড-বোর্ডের বাক্স পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে: প্রেফে শহর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ছাড়িয়ে একেবারে আগে থাকবাব চেষ্টা।

'আমি......' তোতলাতে লাগল সে।

ভিসে চিৎকার কবে উঠল, 'তোমাব সম্পর্কে স্পষ্ট কবে একটা কথা বলছি। তুমি কাপুরুষ!'

মাটি থেকে দস্তানা কুড়িয়ে নিল প্রেফে। শান্ত আব নির্লিপ্ত হবার ভান করে বলল, 'স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর নির্দেশ মতই কাজ কবছি। তোমার গৌরবময় অতীতেব কথাটা ভেবে তোমার অপমানটা.........'

কথাটা শেষ হবার আগেই দ্য ভিসে একটা চড় মাবল প্রেফের মুখে। গাড়ীর ভেতর থেকে মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল, 'গাস্ত!' তারপব জেনারেলেব দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'কসাই!'

অপ্রীতিকর ঘটনার কথাটা তৎক্ষণাৎ ভুলে গিয়ে আগামী কাল সামরিক গতিবিধি কি হবে-তাই নিয়ে চিন্তা করতে বসল দ্য ভিসে। জার্মানদেব পক্ষে ব্যাপাবটা অনেক সহজ—কারণ ওরা একজনের কর্তৃত্বাধীন। জেনারেল গর তাব পবামর্শ নিল না কেন? বেলজিয়ানরাও নাকি নিজেদের খুশিমত কাজ কবছে। বিশৃঙ্খলার চূড়ান্ত! কিন্তু এ ছাড়া পথ নেই। বৃটিশরা অন্ততপক্ষে আট ডিভিশন সৈন্য সরিয়ে নেবে। বিমানবহর ঠিক মত কাজ সারতে পারলেই হল!

সমস্ত আক্রমণ-পরিকল্পনাটা জেনারেল ভিএঅকে বোঝাল দ্য ভিসে; সেও নিরুত্তব থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝল। দ্য ভিসে ভাবল তাকে একবার নাড়া দেওয়া দরকার। বলল, 'মোট কথা, পারীর ওপর দৃষ্টি দিও না। ওরা গোলযোগ বাধিয়ে বসেছে। ওরা ভেবেছিল যুদ্ধটা কেবল বিতর্ক—হিটলারের তিনটে বক্তৃতা আর দালাদিএর দুটো অভিভাষণ—এই নিয়ে যুদ্ধ। ওরা যা কিছু করেছে সমস্তই বোকামি। হল্যাণ্ডের ব্যাপারটাই ধরুন না কেন......জার্মানরা ভাল করেই জানত যে আমাদের দুর্বল জায়গাটা হল নবম সৈন্যবাহিনী। লেরিদোর

কথা ছেড়ে দিন। ও একটা অপদার্থ জেনারেল। কিন্তু পরিবর্তনের কিছু কিছু আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। রাজকীয় বিমানবহর খাসা কাজ করছে। জেলখানার বন্দীরা বলছে জার্মানদের ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। আরাস অঞ্চলে পদাতিক বাহিনী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী। আশা করছি ওরা দ্য গল ব্রিগেড পাঠাবে এখানে। আগামীকাল কি হয় তার ওপর নির্ভর করছে সব কিছু। আমরা তো......'

ভিঞস্ বাধা দিল। বুড়োর চেহারাটা বেশ খাসা, লালচে মেয়েলি মুখ, পরিচ্ছন্ন শাদা গোঁফ। বলল, 'জেনারেল রামিএকে বলেছি আরো সৈন্য না পাঠালে আমার ডিভিশনের পক্ষে আত্মরক্ষা করা পর্যন্ত সম্ভব হবে না। গত তিন দিন ধরে আমাদের বিমান বহরের তো পাত্তাই নেই। আপনি বলছেন জার্মানদের ট্যাঙ্কবাহিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কি হয়েছে? আমাদের গুলি লেগে ওদের সাঁজোয়া গাড়ীর প্লেট পর্যন্ত ছেঁদা হয় না। আপনার আমার কারও অজানা নয় এ কথাটা। গত কাল আমাদের তিন হাজার দুশো লোক প্রাণ হারিয়েছে। মনোবল ভেঙে পড়েছে আমাদের লোকদের। অফিসাররা নির্দেশ পালন করে না। আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন যে জার্মানরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে......'

দ্য ভিসে টেবিলের ওপর সজোরে একটা ঘুষি মারল। গড়াতে গড়াতে মেঝের ওপর পড়ে গেল ছাইদানিটা।

'মুখোমুখি অবস্থায় এসে পৌঁচেছি আমরা,' দ্য ভিসে গর্জন করে উঠল, 'এ সব কি কথা বলছেন আপনি? ওরা এগোচ্ছে.........হ্যাঁ নিশ্চয়ই, না বাধা দিলে ওরা তো এগিয়েই আসবে। আপনি বলছেন অফিসাররা নির্দেশ পালন করছে না! এ তো সোজা কথা। ওদের কাছে দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে কে! আপনি নিজে। আক্রমণের পরিকল্পনাটা আপনাকে দেখালাম আর নাকী-কান্না শুরু করলেন আপনি। সামরিক আদালতে আপনার বিচার হওয়া উচিত। লজ্জার কথা, আপনার মত একজন অভিজ্ঞ লোক কচি খোকার মত ব্যবহার করছে।'

একাদশ সৈন্যবাহিনীর কর্তব্য সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে গেল দ্য ভিসে। জেনারেল ভিঞস্ তার সহকারীকে বলল, 'আমাদের দ্বারা আক্রমণ সম্ভব নয়। সামরিক আদালতে কার বিচার হয় একবার দেখতে চাই আমি।'

একাদশ সৈন্যবাহিনীর লোকজন এক বিরাট খামারে এসে তাঁবু ফেলেছে। সব ছেড়েছুড়ে চলে গিয়েছে খামারের মালিক। মুরগীগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে খুদের

সন্ধানে। চশমা-পরা তরুণ লেফ্‌টেনেণ্টটি মুরগীগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভ্য ভিসেকে দেখেই সে অভিনন্দন জানিয়ে দ্রুত গতিতে কথা বলা শুরু করল, 'জেনারেল, আক্রমণ করার নির্দেশ দিন। নইলে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে লোকগুলো।' ভ্য ভিসে মাথা নাড়িয়ে পেছন ফিরল। মনে হল ভয়ানক বিচলিত হয়েছে সে। ৪২ নং ডিভিশনের ঘাঁটিতে যাবার জন্যে নির্দেশ দিল সোফারকে।

পেরনের রাস্তা ধরে তারা চলেছে। রেডিওটা খুলে দিল জেনারেল। পারীতে ফক্‌স্‌-ট্রট হচ্ছে। ফরাসী স্টেশন ডিঙিয়ে স্টাটগার্ট ধরল ভ্য ভিসে: 'ডাচ সৈন্যবাহিনীর একটি অংশ যা এতদিন ধরে প্রতিরোধ করছিল তা গতকাল আত্মসমর্পণ করেছে। আমাদের সৈন্যবাহিনী স্যাঁ ক্যাঁতাঁ শহর অধিকার করেছে এবং লিল ও পেরনের মাঝখান দিয়ে প্রশস্ত ফ্রণ্ট জুড়ে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির শুরু থেকে এ পর্যন্ত ডাচদের বাদ দিয়েই আমরা মোট এক লক্ষ দশ হাজার সৈন্যকে বন্দী করেছি এবং অনেক গোলা বারুদও আমাদের হাতে এসেছে। সুইস সাংবাদিকদের সংবাদে প্রকাশ, পারী আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। বহু মন্ত্রী ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। চুক্তি সম্পাদনের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে কাউণ্ট সিয়ানো বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন: ইতালী আর দর্শকের মত পাশে সরে থাকতে পারে না।'

ভ্য ভিসে ভাবতে আরম্ভ করল। হয়ত জার্মানরা কালই পেরনে এসে উপস্থিত হবে। শেষ অঙ্কের অভিনয় আসন্ন। ওয়েগাঁ কি গামলাঁর চেয়ে উপযুক্ত? ওরা দুজনে আলাদা জাতের মানুষ কিন্তু গড়নটা এক রকম; দুজনেই অতীতকে আঁকড়ে আছে, কিছুতেই বুঝবে না যে সময়ের পরিবর্তন ঘটেছে। আর একদল মূর্খ আর অপদার্থের হাতে পড়েছে দেশের শাসনভার। তেসার কথাগুলো তার মনে আছে, 'সৈন্যবাহিনী থাকবে একেবারে পেছন দিকে।' জার্মানরা ইতিমধ্যে পারীও দখল করতে পারে। ফ্রান্সের জীবন্ত প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করাই তার উদ্দেশ্য। আগামী কালের সামরিক কার্যকলাপের ফলাফল সম্পর্কে ভ্য ভিসের সন্দেহ হল। প্রত্যেক জায়গায়ই ভিঞঅর মত কাপুরুষ ছড়িয়ে আছে—আর তার মধ্যে বিশ্বাসঘাতকের সংখ্যা কত তাই বা কে জানে?

রেডিওর সুইচটা আবার পারীর দিকে ঘোরাল। ঘোষকের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল: 'আজ চার্চিল এক বিবৃতিতে বলেছেন—ফ্রান্সের শাসকরা আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যত অঘটনই ঘটুক না কেন ফ্রান্স শেষ পর্যন্ত লড়বে।' ভ্য ভিসে হাসল। চার্চিলকে এই প্রতিশ্রুতিটা দিল কে? তেসা বোধ হয়?

নিশ্চয়ই। 'আমরা শেষ পর্যন্ত লড়ব' কথাটা তেসাই বলেছে। কিন্তু তার প্রণয়িনীকে নিয়ে সে নিজেই প্রেফের মত কেটে পড়েছে। অবশ্য একটা কথা ঠিক : সৈন্যদের শেষ পর্যন্তই লড়তে হবে। কিন্তু তারা কেউ লড়তে চাইছে না। পিকার্ আর ভিঞঅ কিসের স্বপ্ন দেখছে? আত্মসমর্পণ! নিজের জায়গায় টি'কে থেকে প্রাণের বিনিময়ে দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়া প্রয়োজন। তাহলে উত্তর পুরুষরা জানবে যে এই ভীষণতম যুদ্ধেও কতকগুলো খাঁটি ফরাসী অংশ গ্রহণ করেছিল। তরুণ চশমা-পরা লেফটেনেণ্টের কথা মনে পড়ে গলায় কি যেন একটা দলা পাকিয়ে গেল দ্য ভিসের। তার উপযুক্ত মৃত্যু কামনা করল সে। স্বভাবতই সে প্রার্থনা করতে শুরু করল, যেমন ছোট ছেলেরা পরীক্ষায় বসার আগে ভগবানের নাম জপ করে। সে লক্ষ্য করল না যে তারা পেরনে পৌঁছে গেছে।

সহকারী গাড়ী থেকে নীচে নামল। কয়েক মুহূর্ত পরে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ফিরে এল সে, বলল, 'অদ্ভুত কাণ্ড! ওরা বলেছিল হেড-কোয়ার্টারটা স্কুল ঘরে করেছে।'

কাউকে জিজ্ঞাসা করার উপায় নেই—সমস্ত শহরটা একেবারে জনশূন্য হয়ে গিয়েছে। লোকেরা বোধহয় বোমার ভয় পেয়েছিল। বিক্ষিপ্ত থানা-ডোবা, ভাঙাচোরা আসবাবপত্র আর বিধ্বস্ত ঘর-বাড়ী, এ সবের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়াই অসম্ভব। জেনারেল নীচে নেমে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। একটা দরজা দিয়ে একজন বুড়ী বেরিয়ে আসছে।

'আচ্ছা বুড়ী-মা, এখানে মিলিটারি কোথায় থাকে বলতে পার?'

টাউন হলের দিকে আঙুল দেখিয়ে কাঁদতে লাগল বুড়ী। দ্য ভিসে খালি ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করল। কাগজপত্র, টিনের টুপি আর রসদের ঝুলিতে মেঝেটা ভর্তি হয়ে গেছে। সহকারীকে খবরাখবর নিতে পাঠিয়ে একটা বড় টেবিলের ওপর বসে অপেক্ষা করতে লাগল দ্য ভিসে। তার সামনের একটা কাগজের দিকে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে তাকিয়ে থাকল সে। কাগজটা কার জন্মের নিদর্শন-পত্র। চিন্তা এসে আবার ভীড় করল তার মনে—ভার্লেঁদ-এ তার বাড়ীর কথা মনে পড়ল। তার আদুরে নাতনীটা হয়ত বেড়াল-ছানার সঙ্গে খেলা করছে। তাদের কারও সঙ্গেই আর দেখা হবে না তার......বীরের মত মৃত্যুবরণ করাই এখন একমাত্র করণীয় কাজ।

চোখ খুলতেও কেমন কষ্ট হচ্ছে দ্য ভিসের.........এত পরিশ্রান্ত যে চোখ দুটো

ঘুমে ঢুলে আসছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে একজন জার্মান অফিসার আর কয়েকজন সৈন্য। অফিসারটার গালে একটা ক্ষতচিহ্ন। তার এক চক্ষু চশমাটা ঝলক দিয়ে উঠল। অভদ্রের মত দাঁত বের করে ভাঙা ভাঙা ফরাসীতে সে বলল, 'আপনিই জেনারেল দ্য ভিসে, না? আপনাকে গভীর শ্রদ্ধা জানাতে পেরে সৌভাগ্যবান মনে করছি নিজেকে.........'

২০

'দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে.........এবং এই অপরাধের জন্যে প্রাণদণ্ডও উপযুক্ত শাস্তি নয়। মনে রাখবেন, আমাদের সৈনিকরা লড়াইয়ের ময়দানে প্রাণ দিচ্ছে। কাপুরুষ আর বিশ্বাসঘাতকদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলব আমরা! ফ্রান্সকে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে একমাত্র অলৌকিক শক্তি এবং সেই শক্তিতে আমি বিশ্বাস করি!'

রেনোর বক্তৃতা শেষ হবার পর ভদ্রভাবে হাততালি দিল সেনেটররা। পুরনো ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ তারা। তারা জানে শিগগিরই মন্ত্রী সভার পতন ঘটবে। ডেপুটিদের গ্যালারিতে বসে বসে ফুজে কাঁদছে। দাড়িওলা স্বপ্ন-বিলাসীকে ছিটের রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে দেখে হেসে উঠল সাংবাদিকরা।

তেসা যেই গাড়ীতে উঠে বসেছে ওমনি গিয়ে তার হাত ধরল ফুজে। বলল, 'এক্ষুনি তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। রেনো ঠিক কথাই বলেছে যে, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। বেশ নির্ভীক ও অকপট উক্তি, চাবুকের মত ধারালো! এখন আমাদের কাজ করা দরকার.........'

গত কয়েকদিন ধরে কেমন অসোয়াস্তির মধ্যে কাটিয়েছে তেসা, ঔদাসীন্য আর হতাশার মধ্যে দোল খেয়েছে। পরস্পরবিরোধী সংবাদ আসছে। কতকগুলি সংবাদে প্রতি-আক্রমণের সাফল্য, আবার কতকগুলিতে পারীর পতনের পূর্বাভাস। পেতঁ্যা ঘোষণা করেছে যে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনী বলে কোন কিছু নেই। যা অবশিষ্ট আছে তা হল কতকগুলো বিচ্ছিন্ন সৈন্য-দল। মাদেল প্রমাণ করছে যে প্রতিরোধ করা সম্ভব। মন্ত্রীরা একবার ঠিক করছে, পারী ত্যাগ করাই শ্রেয়, আবার ঘোষণা করছে রাজধানীতে কোন আশঙ্কা নেই। তেসার আহার-নিদ্রা বন্ধ। তার ধারণা সে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। ভীত হয়ে সে ফুজের দিকে তাকাল—লোকটার মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চায় না তেসা।

কিন্তু ফ্রুজে গাড়ীর মধ্যে উঠে বসে চেঁচাতে শুরু করল, 'গণবাহিনী গঠন করব আমরা !'

ক্লান্তভাবে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তেসা বলল, 'অনেক দেরী হয়ে গেছে, আর সম্ভব নয়। আমি তান্ত্রিক নই, দৈব-ক্রিয়ায় বিশ্বাস করি না আমি। গতকাল জার্মানরা আরাস আর আমিএঁ দখল করেছে। আজ সমুদ্রতীরে পৌঁছে গেছে ওরা। ঘিরে ফেলেছে আমাদের সৈন্যদের।'

'ওখানে আমাদের চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য আছে। ওদের ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব।'

'কারা ভেদ করবে? বেলজিয়ানদের ওপর ভরসা কোরো না। প্রত্যেকেই জানে রাজা লিওপোল্ড জার্মানদের পক্ষে। বৃটিশরা আজ দু ডিভিশন সৈন্য বাপোম থেকে ডানকার্কে সরিয়ে নিয়ে গেছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে জেনারেল গরের মুখোমুখি হতে চায় না ওয়েগ্যাঁ। এক কথায় এ তড়পানো ছাড়া কিছু নয়।'

'এ সব কথা বলছ তুমি? একটু আগে রেনো বলল—কাপুরুষদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে। তাহলে তো তোমাকেই প্রথমে গুলি করে মারা উচিত!'

চিৎকার করে উঠল ফ্রুজে, তেসার সর্বাঙ্গে থুথু ছিটোল; তার দাড়ি দুলে দুলে উঠল বারবার।

'গলাবাজি করে কোন লাভ হবে না।' তেসা শান্ত হয়ে উত্তর দিল, 'রেনো জনসাধারণের ভালর জন্যেই কথাটা বলেছে। কথাটা তোমার শোনা উচিত··· তুমি সরল কিন্তু স্বপ্নবিলাসী। তুমি ভাল করেই জান যে তুমি ঘৃণা কর আমায়। কিন্তু তুমি ভুল করেছ। তোমায় যখন মার্সাই-এ আক্রমণ করে তখন ভয়ানক ব্যথা পেয়েছিলাম আমি।'

ফ্রুজে বলল, 'তুমি কী ভাবছ বল দিকি? হাত জোড় করছি ছোটখাটো রাজনৈতিক বাদ-বিসম্বাদের কথা ভুলে যাও। ফ্রান্স মরতে বসেছে। গোষ্ঠী বা দলের ওপরে উঠতে চেষ্টা কর।'

'স্বপ্নবিলাসী! তার চেয়েও বেশী—অতীত যুগের মানুষ তুমি। সত্তর টনের এক-একটা ট্যাঙ্ক। আর তাদের বিরুদ্ধে কে দাঁড়িয়েছে? না, নাগরিক ফ্রুজে। হয়ত তুমি 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকার' ঘোষণা করেই জেনারেল ফন ক্লিস্ট্‌কে কাত করতে পারবে, কি বল?'

'তামাসা করার সময় নয় এটা।'

'তামাসা করছি না। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আর কখনো কথা বলিনি আমি। আমাদের যুগ কেটে গেছে, বুঝতে পারলে? হয়ত ব্রতৈল টিঁকে থাকবে। কিন্তু ও লোকটাও প্রাচীন-পন্থী। গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে ও। গ্রঁদেল, লাভাল, মিয়েজ্ঞাব—ওরা সবাই টিকে থাকবে। তুমি ভাবছ আমি শয়তান, যদিও আমরা দুজনেই র‍্যাডিকাল। তুমি দুকানকে শ্রদ্ধা কর। কার্শ্যাকেও। আমি বলব ওরাও বিগত যুগের বীর। অন্যান্য দেশে গত যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই উনিশ শতকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু ফ্রান্সে এখনো বেঁচে আছে। আমাদের বুড়ো লোকগুলোর মরবার তাড়া নেই। পেতাঁার বয়স তো আশির ওপর। কিন্তু ওর কথা শোনা উচিত তোমার, নানা রকম পরিকল্পনা আর উচ্চাশায় ঠাসা ওর মাথা। যা বলছিলাম, গত যুগ শেষ হয়ে গেছে। ঠিক তোমার ঐ দেসেরটার মত। ভাল কথা, ও দেখা করতে এসেছিল আমার সঙ্গে। কী পরামর্শ দিয়ে গেছে আঁচ করতে পার? আমাদের প্যারী প্রতিরোধ করা উচিত।'

'ঠিক কথাই বলেছে। ওরা বলেছিল মাদ্রিদ দু-দিনও প্রতিরোধ করতে পারবে না। কিন্তু দু-বছর ঠেকিয়ে রেখেছিল মাদ্রিদ। মজুরদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দাও, তখন দেখবে কী কাণ্ড করে ওরা!'

তেসা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা বলাই দায়। অতীত যুগে পড়ে আছ তুমি। তুমি কি ভাবছ সত্তর ডিভিশন সৈন্য আর তিন হাজার ট্যাঙ্ককে ব্যারিকেড দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবে? আর তা ছাড়া কমিউনিস্টদের হাতে রাইফেল দেওয়া নিছক পাগলামি। অবশ্য তুমি তাতে খুশি হবে। কিন্তু তুমি একটা ব্যতিক্রম। সমাজতন্ত্রীদের কথা বাদ দিলেও র‍্যাডিকালরা ভয়ানক সোরগোল তুলবে। দক্ষিণপন্থীদের কথা যদি বল তাহলে পিকার্ তো একবার আমায় বলেইছিল যে শ্রমিকেরা যদি ক্ষমতা নেবার জন্যে প্রস্তুত হয় সমস্ত ফ্রন্টের মুখ খুলে দিয়ে চলে আসবে সে।'

'ওকে তোমাদের গ্রেপ্তার করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ব্রতৈলকেও। রেনো বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্ক কি বলেছে? আমি চাই তুমি তোমার নাগরিক কর্তব্য পালন কর। তোমার জানা উচিত যে এই সব লোক তোমায় ঘৃণা করে। যদি ব্রতৈল ক্ষমতা পায় তাহলে তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না ও। ওর ধারণা তুমি একজন র‍্যাডিকাল, তান্ত্রিক আর পপুলার ফ্রন্টের হাতের পুতুল। দেখ, তোমার সম্পর্কে কি লিখছে ওরা।'

একটা ইস্তাহার বার করে দিল ফুজে। তেসা দেখল তার নাম লেখা আছে তাতে। তার হাত দুটো ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। বলল, 'পড়া বড় কষ্টকর। হাত দুটো এমন কাঁপে।' তবু কোন রকমে কথাগুলো পড়ল : 'আমরা ওকে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে ফাঁসি দেব।' ইস্তাহারের নীচে লেখা—'মন্ত্রশিষ্যদের হেড-কোয়ার্টার।'

গাড়ী ধীরে ধীরে পরিষদের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। তেসা দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'মাফ কোরো যদি তোমায় ব্যথা দিয়ে থাকি। কিন্তু আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভয়ানক কঠিন, সত্যিই ভয়ানক কঠিন।'

তার ঘরে গিয়ে তেসা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ইস্তাহারটা পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল—ফুজেই ঠিক : তার মুষ্টিবদ্ধ হাত, ভীইয়ারের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা কিংবা দেনিসের হয়ে ওকালতির জন্যে কখনো তাকে ক্ষমা করবে না ব্রতৈলের বন্ধুরা! আধ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিল সে; ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল : আশ্রয়প্রার্থী, ট্যাঙ্ক আর ফাঁসিকাঠ। ঘুমিয়ে উঠে সোফায় বসে হাঁটু দুটো চেপে ধরল হাতের মধ্যে, তারপর সজোরে বলতে শুরু করল, 'প্রশ্নটা আমাকে নিজেকে নিয়ে নয়। গোটা ফ্রান্সের কথা ভাবতে হচ্ছে আমাকে।' এক সপ্তাহ আগে সে সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে ভেবেছিল। এখন সে শান্ত হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তবু তার দায়িত্ব আছে—সে একজন মন্ত্রী। দেশকে রক্ষা করবার চেষ্টা করবে সে।

দুকানটার অবশ্য কোন অসুবিধা সেই। পাগলাটা নিজেকে নিয়েই মত্ত। ও যুদ্ধে গিয়েছে স্রেফ নিজের প্রচারের জন্যে। লোকটার কী দুরবস্থা—একজন ডেপুটি কিনা লেফটেনেন্টের পোষাক পরেছে! ওসব করে কী হবে? ও ছাড়া যেন আর লেফটেনেন্ট নেই!

না! এখন দরকার নতুন চালাকি, নতুন পন্থা আর অসাধারণ চালবাজী। মাদেলের মত, মস্কোর সঙ্গে ফ্রান্সের বন্ধুত্ব করা উচিত। জার্মানরা বহুদিন থেকে বুঝেছে যে রাশিয়ার সঙ্গে একটা হিসাব-নিকাশ হওয়া দরকার। কিন্তু ঐ নির্বোধ দালাদিএটার জন্যেই রাশিয়ানদের সঙ্গে ফ্রান্সের মৈত্রী সম্ভব হয়নি (এতক্ষণে তেসার মনে পড়ল যে সে ম্যানারহাইমকে সাহায্য করার বিরোধী ছিল)। গু ভিসে বলছে, আমাদের বিমানবহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা অত্যন্ত কম। কিন্তু রাশিয়ার কাছ থেকে হাজার খানেক বোমারু কেনা বা বিনিময়ে নেওয়া এমন কিছু একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়।

তেসা উৎসাহী হয়ে উঠল: একটা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। তার চারদিকে ন্যাকা-বোকা লোকদের ভীড়—ময়ূরপুচ্ছ রেনো আর নির্বোধ দালাদিএ। কিন্তু সে একটা জোরালো রকমের খেলা খেলতে যাচ্ছে; মস্কোর সঙ্গে বোঝাপড়া করবে সে। তাহলে আর ইতালীর এদিকে এগোনোর সাহস হবে না। আর জার্মানীও ভীত হয়ে উঠবে। একটা পরিবর্তন দেখা দেবে ফ্রান্সে। জনসাধারণও যুদ্ধজয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। প্রত্যেকে বলবে, তেসাই দেশকে বাঁচিয়েছে, যেমনি ক্লেমসো বাঁচিয়েছিল ১৯১৭ সালে।

ফুজেকে ডেকে পাঠাল তেসা। বলল, 'ওহে, দেখা করতে এসেছ বলে ধন্যবাদ। তোমার সঙ্গে কথা বলবার পর আমি অনেক কিছু বুঝতে পেরেছি। ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, আমরা মাছের তেলে মাছ ভাজছি। কিন্তু আরো একটু ব্যাপকভাবে ভেবে দেখ। আমি এক্ষুনি আমার পরিকল্পনাটা তোমায় বলছি। হয় তোমায় নয়তো কংকে মস্কোয় পাঠাব আমরা।'

'মস্কোয়? কিসের জন্যে?'

'তোমাকে ওরা ভীষণ শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু তুমি যদি না যেতে চাও তাহলে আমরা কংকে পাঠাব।'

'কিন্তু কিসের জন্যে?

'কিসের জন্যে? এতে একটা মস্ত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। এর প্রভাব পড়বে ইতালীর ওপর। আমাদের মনোবল দৃঢ় হবে। আর তাছাড়া, রাশিয়ানরা আমাদের গোলাবারুদ দিতে পারে—উড়োজাহাজও দিতে পারে গোড়ার দিকে।'

ফুজে ক্ষেপে গেল। চিৎকার করে বলল, 'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? রাশিয়ানরা তোমায় কি করতে উড়োজাহাজ দিতে যাবে? মাস দুয়েক আগে তুমি নিজেই গলাবাজি করে বেড়াচ্ছিলে—বাকুকে ধ্বংস করে ফেলা উচিত।'

'ব্যাপারটা আসলে ঠিক তা নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে এর বিরোধীই ছিলাম। ও সমস্তই দালাদিএর একগুঁয়েমি। ওকে 'ভাক্লুসের ষাঁড়' বলাটা ঠিক নয়। ও একটা গাধা। কিন্তু অতীতের কথা খুঁচিয়ে লাভ কি? বর্তমানে আমরা বন্ধুভাব রাখতে চাই। তুমি তাতে আমাদের সাহায্য করতে পার।'

'রাশিয়ানরা জাহান্নমে পাঠাবে তোমায়, আর সেটা কিছু অন্যায় হবে না। প্রথম প্রশ্ন হল: তুমি কাদের প্রতিনিধি? তোমার পেছনে তো কোন সমর্থন নেই। মজুরদের এখনো গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। খবরের কাগজে আজ আরো

আটজন কমিউনিস্টের বিচারের কথা বেরিয়েছে। তোমার ঐ 'ভাক্‌লুসের গাধাটাই' তো পররাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী। করাসী জনসাধারণ মস্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারে—কিন্তু তুমি পার না। তুমি একটা কাজ করতে পার—মন্ত্রীসভার সভাপতিকে চিঠি দাও আর পদত্যাগ-পত্র পাঠিয়ে দাও তোমার। আমাদের একটা জননিরাপত্তা সমিতির দরকার।'

ফুজে দরজায় ধাক্কা মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তেসা ভাবতে লাগল—আর কি করতে পারে সে। কমিউনিস্টদের কাছে একটা আবেদন জানালে মন্দ হয় না! কী দুর্ভাগ্য, দেনিসের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গেছে তার!

তেসা ফেরনে-র সঙ্গে কথা বলবে স্থির করল; লোকটা উকিল, আদালতে প্রায়ই কমিউনিস্টদের পক্ষ সমর্থন করে। তাকে শিগগিরই এসে দেখা করতে বলবে সে।

'জানি বহু কমিউনিস্টের সঙ্গে পরিচয় আছে আপনার। দয়া করে এই চিঠিটা দিয়ে দিবেন।' তেসা বলল।

'কাকে?'

লজ্জিত হয়ে উঠল তেসা। বলল, 'আমার মেয়েকে। চিঠিটা ভয়ানক জরুরী। যত তাড়াতাড়ি পারেন দেবেন—এর ওপর আমার একজন প্রিয়জনের জীবন নির্ভর করছে।'

'আচ্ছা,' ফেরনে বলল। তারপর ম্লান হেসে যোগ দিল, 'অবশ্য যদি আপনার পুলিশরা আমার পিছু না নেয় তাহলে চিঠিটা বিকেলেই দিয়ে দেব।'

তেসা লিখেছে:

> দেনিস,
>
> তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। কথাটা ব্যক্তিগত নয়, জরুরী জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে। কাল সকালে নটার সময় আসবার জন্যে তোমায় অনুরোধ করছি। আবার বলছি কথাটা আমাকে নিয়ে বা অন্য কোন গোপন ব্যাপার সম্পর্কে নয়। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমার আসার খবর ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারবে না।
>
> তোমার হতভাগ্য বাবা
>
> পল তেসা

সন্ধ্যাবেলা তেসাকে মন্ত্রীদের এক সভায় যেতে হল। অন্যমনস্কভাবে রেনোর রিপোর্টটা শুনল: 'ওয়েগ্যাঁ ফিরে এসেছে। অবশ্য অবস্থাটা সত্যিই শোচনীয়,

তবু আমরা প্রতি-আক্রমণের তোড়জোড় করছি। বৃটিশরা ইতিমধ্যে আক্রমণ শুরু করেছে। ৫নং সৈন্যবাহিনী আরাস-এর কাছাকাছি পৌছল বলে।'

তেসা কিন্তু নিজের চিন্তায় ডুবে আছে। সভা শেষ হবার পর সে রেনোকে পাশে ডেকে নিয়ে গেল।

'মস্কোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা সম্পর্কে তোমার কি মনে হয়?' তেসা শুধোল।

'গত কয়েকদিন থেকে পরিস্থিতিটা এত জটিল হয়ে উঠেছে যে আমি সামরিক বিষয় নিয়েই ডুবে আছি। কূটনীতিক ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়েছি বোদ্যুঁয়ার হাতে।'

তেসা বাড়ী ফিরে ঘুমের ওষুধ খেল। ঘুম ভাঙল ঠিক আটটায়। প্রাতর্ভোজন করতে করতে শুনল কে একজন মহিলা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তার সঙ্গে দেখা করবে বলে অপেক্ষা করছে। তেসা চিৎকার করে বলল, 'ওকে এখানে নিয়ে এস।'

রাজনৈতিক খেলা নিয়ে সে এমন মেতে উঠেছে যে পিতৃসুলভ হৃদয়বৃত্তি পর্যন্ত মুছে গিয়েছে তার মন থেকে। তার মনে হল যেন কোন মহিলা রাজপ্রতিনিধিকে সে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

দেনিস নীরস গলায় বলল, 'উত্তেজনা সৃষ্টিই যদি এর উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোন ফল হবে না বলে দিচ্ছি। পার্টিকে জানিয়েই আমি এখানে এসেছি।'

তেসা বলল, 'পার্টিকে জানিয়ে এসেছিস? চমৎকার! দেনিস, বুঝতেই পারিস, অবস্থাটা কী রকম গুরুতর। পরাজয়ের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা। এ সময়ে আত্মাভিমানকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। ফ্রান্সের মুক্তি আজ সংকটাপন্ন। কিন্তু উদ্দীপনা না হলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। আমিই প্রথম কমিউনিস্টদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি। দমননীতি তুলে নিতে রাজী আছি আমরা। কিন্তু কমিউনিস্টরাও তাদের প্রচার বন্ধ করুক। বুঝলি ব্যাপারটা। কমিউনিস্টদের নাগরিক কর্তব্য হল মস্কোর ওপর প্রভাব বিস্তার করা। আমরা বোধ হয় কৎকে মস্কো পাঠাচ্ছি। প্রথমে ফুজের কথা ভেবেছিলাম কিন্তু ও লোকটা বুড়ো আর উঁচকপালে পণ্ডিত। অবশ্য কথাটা তোর আর আমার মধ্যেই থাকে যেন। আমার প্রস্তাবটা তুই তোরে, দুক্লো বা কাশ্যাঁ অর্থাৎ তোর মনিবদের কাছে গিয়ে বলবি। দরকার হলে আমি ওদের সঙ্গে দেখা করব। আমি যথাসাধ্য করতে প্রস্তুত আছি।'

দেনিস বলল, 'আমার মনে হয় না তোমার কথার কেউ গুরুত্ব দেবে। এখনো চৌত্রিশ হাজার কমিউনিস্ট জেলে পচছে! আগে তাদের ছাড়, তোমরা বিদেয় হও আর জনসাধারণের হাতে তুলে দাও ক্ষমতা।'

'ক্ষমতাটা মোড়কের মত তুলে দেওয়া যায় না।' তেসা চটে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সংযত করল নিজেকে। 'গঠনতন্ত্র মাফিক আমরা চলি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পার্লামেন্টের আস্থা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি ততক্ষণ বিদায় নিতে পারি না। ধৃত লোকদের মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটা হয়ত সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্রীরা এর বিরুদ্ধে। সেরল্ আমায় গতকাল বলছিল যে কমিউনিস্টদের সে দেওয়ানি আইনের পর্যায়ভুক্ত করতে রাজী নয়। কিন্তু আমি যখন তাকে বর্তমানে জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনীয়তায় কথা বললাম, সে বলল—কমিউনিস্টরা আগে নিজেদের নিরস্ত্র করুক। বুঝতেই পারিস ব্যাপারটা কী রকম ঘোরালো। দক্ষিণপন্থীরা তো একটা সুযোগের অপেক্ষায়ই আছে। আমরা যদি কমিউনিস্টদের ছেড়ে দিই তাহলে প্রথম ব্যালটেই মন্ত্রীসভার পতন ঘটবে।'

দেনিস অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে উঠেছে। গত কয়েকদিন ধরে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও ভীরুতার ভয়াবহ কাহিনীগুলো কানে এসেছে তার। আশ্রয়প্রার্থীদের অবিচ্ছিন্ন স্রোত মানবিক দুঃখবোধের মতই সমস্ত পারীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কমিউনিস্টদের ধরপাকড় সমানে চলেছে। গতকাল লুসিকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। দেনিস যখন ওর সঙ্গে কারখানায় কাজ করত তখন সারাক্ষণ হাসিতামাসা করত মেয়েটি। রাস্তার ওপর পুলিশ ওকে গ্রেপ্তার করেছে। মেয়েটি বাড়ীতে তার কোলের শিশুটাকে রেখে এসেছিল, বাড়ী গিয়ে তাকে আনতে চাওয়ায় পুলিশ বলেছে, 'ওকে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না তোমায়।' মিশো উত্তরে অবরুদ্ধ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আটক পড়েছে। মে মাসের যুদ্ধের পর আর কোন চিঠি পায়নি দেনিস। সমস্ত স্নায়ুগুলো কেমন দুর্বল হয়ে এসেছে তার। দেনিস কেঁদে ফেলল।

অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল তেসা। ফুজের আর তার নিজের পরিকল্পনার কথা সমস্তই ভুলে গেল সে। এই তো তার মেয়ে দেনিস! বড্ড রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা! নিশ্চয়ই বড় দুঃসময় যাচ্ছে। লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে বোধ হয়, প্রতি রাত্রি কাটাচ্ছে গ্রেপ্তারের আশঙ্কায়।

'বেচারী মেয়ে!' মৃদুভাবে বলল তেসা।

কথাটা শুনে দেনিস প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল তেসার দিকে।

'তুমি কক্ষনো বুঝবে না কেন আমি কাঁদছি। তুমি আমার বাবা এবং আমরা দুজনেই ফরাসী বলি ও একই বোমায় মারা পড়তে পারি আমরা দুজনে—কথাগুলো ভাবতেই কেমন ভয় হয় আমার। তুমি বুঝবে না! তোমার সঙ্গে যে যুক্ত আছি—এ আমার পক্ষে একটা অসহ্য যন্ত্রণা।'

'কিন্তু তুই যে আমার মেয়ে এ কথা কোনদিন আমি ভুলিনি।' তেসা ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করতে লাগল। ভাবল, দেনিসকে রাজী করাতেই হবে। 'দেনিস, আমাদের দলগত ঝগড়া তোলা থাক এখন। তোকে সাহায্য করতেই হবে। আমি ফ্রান্সকে রক্ষা করতে চাই, সুতরাং ফ্রান্সের খাতিরে......'

'থাম। আগে যেমন তুমি বলতে 'মা-র খাতিরে।' কিন্তু ফ্রান্স সম্পূর্ণ আলাদা কথা।'

দেনিস থামল। আশ্রয়প্রার্থী আর সৈনিকদের কথা মনে হতেই কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার। কিন্তু তেসা পাছে আবার তার দুর্বলতা লক্ষ্য করে এই ভেবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল দেনিস।

তেসা দুঃখিত হয়ে মনে মনে ভাবল, 'কী ভয়ানক গোঁড়া মেয়েটা!' লুসিয়ঁটা অপদার্থ ছিল ঠিকই কিন্তু অনেক বেশী দয়ামায়া ছিল তার। আর এই মেয়েটা নিজেও বেঁচে নেই, অন্য কেউ বাঁচুক তাও চায় না! অদ্ভুত মূর্ছাগ্রস্ত জীব একটা!

কং-এর দৌত্য সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যে বোদুয়াঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল তেসা। বোদুয়াঁ ফাঁকা ফাঁকা জবাব দিল আর ইতালীর প্রসঙ্গে টেনে ঘুরিয়ে নিল আলোচনাটা। তার ধারণা, কিছু ত্যাগস্বীকার করা উচিত এখন, জিবুটি কিংবা টিউনিসিয়ার একটা অংশ ছেড়ে দেওয়া হোক এবং চাপ দেওয়া হোক বৃটিশদের ওপর—ওরাও কিছু ছাড়ুক, যেমন ধর মাল্টা। মুসোলিনী তো আপোষ করতে রাজীই ছিল; কিন্তু কোন উপযুক্ত লোক পাঠানো উচিত রোমে—লাভাল কিংবা ব্রতৈলকে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে তেসা ফুজেকে টেলিফোন করল। বলল, 'আমার মনে হচ্ছে আমার কথাটা সঠিক বুঝতে পারনি তুমি। আমরা তোমায়

কিংবা কংকে যা হোক কিছু একটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠাতে চাই। যেমন ধর, গালিসিয়ান শিল্পের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে একটি মীমাংসা করতে বা কাঠ কিনতে গেলে তুমি। তারপর সেখানে গিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করে দেখলে। বাইরেতে এর ফল কিন্তু একই রকম হবে। এতে আমরা কোন বাঁধাধরায় পড়ছি না। দক্ষিণপন্থীদের আমরা বলব: মস্কোতে আমাদের একজন রাজদূত পর্যন্ত নেই। ব্রতৈলও কোন ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে পারবে না কারণ এদিকে আমরা মুসোলিনীর সঙ্গে আপোষরফা করছি! নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার মধ্যে থেকে বৃটিশরা ইতালিয়ান্ জাহাজ বাদ দিয়েছে। এই তো একটা জিত। বুঝলে?'

কোন জবাব এল না। রাগে রিসিভারটা নীচে রেখে দিয়েছে ফুজে।

তেসার পরিকল্পনা কার্যকরী হল না। শহরের বাইরে গিয়ে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে চাইল সে। কী অদ্ভুত সুন্দর দিন! লিলাক, জেসমিন আর উইস্তারিয়া ফুল ফুটে রয়েছে, চারদিকে তার মৃদু সৌরভ। তেসা সত্যিই সান্ত্বনা পেল; এ সমস্ত সত্ত্বেও বসন্ত এসেছে আবার।

ফিরবার পথে বোয়া দ্য ভ্যাঁসেন-এ কয়েকটা সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল তার। ট্যাঙ্ক-বিরোধী ট্রেঞ্চ কাটছে তারা। পথে থেমে তাদের সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত গল্প করল তেসা; নির্ভয়ে বলল, 'হ্যাঁ, পারীতে ঢুকবার এতটুকুও ফাঁক পাবে না ওরা। সিংহের মত আত্মরক্ষা করবে পারী।'

২১

পিকার্ডির সমস্ত শহরগুলোর মত এও একটা অত্যন্ত ছোট্ট শহর: একটা স্কোয়ার আর একটা দীর্ঘ পথ, তারপরেই বেঁটে বেঁটে ইঁটের বাড়ী। স্কোয়ারের মধ্যে একটা ষোড়শ শতাব্দীর টাউন হল, তার চূড়োর ওপর সোনার সিংহ-মূর্তি। টাউন হলের পরেই দুটো কাফে, একটা বিভাগীয় দোকান ও 'শাদা ঘোড়া' নামে একটা হোটেল।

শহর থেকে মাইল খানেক দূরে একটা সাইকেলের কারখানা। সেই কারখানার কর্মচারীরাই এই শহরের জনসংখ্যার প্রধান অংশ। আবার অনেক স্ত্রীলোক আছে যারা ভাল ফিতে তৈরী করতে পারে! খোলা জানলার ধারে বসে বসে তাদের বুনবার কাঠি চালাতে দেখা যায়। মাঝে মাঝে গ্রীষ্মকালে টহলদাররা

আসে। তারা টাউন হল দেখে স্কোয়ারে গিয়ে বিয়ার নিয়ে বসে। শীতকালে কাফেগুলোতে মজুররা আড্ডা জমায়, লম্বা লম্বা মাটির পাইপ টানে আর রাজনীতি আলোচনা করে। যুদ্ধের আগে এক কমিউনিস্ট নগরকর্তা ছিল, টাউন হলের ওপর তেরঙা আর লাল দুটো ঝাণ্ডাই তুলেছিল সে। দেওয়ালের ওপরকার সেই লেখাগুলো আজও মুছে যায়নি: 'ফ্যাশিজম ধ্বংস হোক!' 'পপুলার ফ্রন্ট জিন্দাবাদ!' আর তারই সঙ্গে অত্যন্ত আনাড়ী হাতে আঁকা হাতুড়ী-কাস্তের প্রতিকৃতি। রবিবার দিন লোকে জিন খায় আর বসে বসে মোরগের লড়াই দেখে। সেদিন সিনেমায় 'মৃত্যুর চুম্বন' ছবিটা দেখানো হয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা খালের ধারে বেড়াতে বেড়াতে পদ্ম ফুল পেড়েছে। অত্যন্ত সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়েছে সমস্ত শহরের লোক; রাত এগারোটায় রাস্তায় একটি জনপ্রাণীরও চিহ্ন নেই। কেবল টাউন হলের ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি সময় নির্দেশ করছে বা কতকগুলি স্ত্রীলোক ছোট ছোট ঘরের মধ্যে শিশুদের ঘুম পাড়াচ্ছে: 'সোনা মানিক আমার, কেঁদো না, ঘুমিয়ে পড় লক্ষ্মীটি। খোকা ঘুমোলো!'

রেল-স্টেশনের কাছাকাছি দুটো বাড়ীর ওপর প্রথম বোমাটা পড়ল। এক বুড়ো কামার মারা গেল আর জখম হল দুজন স্ত্রীলোক। দ্বিতীয় বোমায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল টাউন হলটা। পাথর আর ইঁটের ভগ্নাংশে ছেয়ে গেল সমস্ত স্কোয়ারটা। সোনার সিংহমূর্তিটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। অধিবাসীরা পালাতে আরম্ভ করল। আঠারো হাজার লোকের মধ্যে অবশিষ্ট রইল মাত্র একশোজন।

একটি স্ত্রীলোক নীল এনামেলের কফি-পট এনে মিশোর জন্যে কফি ঢালল। শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমরা কি চলে যাচ্ছ?'

'এই তো সবে এসে পৌঁচেছি আমরা।'

'ওরা বলছিল তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ। সবাই চলে গেছে। কিন্তু মা অসুস্থ বলে আমায় থেকে যেতে হল। আমি মাকে প্রায়ই বলি যে তোমরা নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবে না।'

মিশো হাসল, 'নিশ্চয়ই যাব না। চারদিকে যা ব্যাপার ঘটছে তা দেখে-শুনে মন খারাপ হয়ে যায়। লোকে কেবল এলোপাথাড়ী ছুটছে আর অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে। কেউ থামাচ্ছেও না তাদের। কী চমৎকার অদৃষ্ট! ওরাই আমাদের ফিনল্যাণ্ডে পাঠাতে চেয়েছিল আর এখন ওরাই জার্মানদের দেখে

পালিয়ে যাচ্ছে। লজ্জার কথা! আমাদের অদৃষ্ট যদি অন্য রকম হত! সাহস হারিও না। চলে যাচ্ছি না আমরা। ভাল তলঘর আছে তোমার? তাহলে সবকিছু সেখানে নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে থাক। অন্য সব ব্যবস্থা আমরাই করছি।'

ব্যাটালিয়ন কর্মাণ্ডার ফেব্‌র্ যে কোন উপায়ে শহরকে রক্ষা করতে নির্দেশ দিয়েছে। সবাই মনে করে লোকটা নির্দোষ; সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্ষুধা উদ্রেককারী মদ খায় আর ক্যাকটাসের সৌন্দর্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেয়। কিন্তু গত কয়েক দিন থেকে অত্যন্ত সাহসী আর জ্ঞানী বলে খ্যাতি হয়েছে তার। কামব্রাই থেকে পিছু হটার সময় ব্যাটালিয়ন জোর প্রতিরোধ দিয়েছে শত্রুকে। দু দুবার প্রতি আক্রমণ চালিয়ে জার্মানদের হাত থেকে বিশজন বন্দীকে ছিনিয়ে এনেছে। যখন ডুবুরী বোমারুর আক্রমণ শুরু হল, ফেব্‌র্ একজন সৈনিকের হাত থেকে রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে বোমারুর উদ্দেশ্যে গুলি করতে লাগল। ফলে, শান্ত হল লোকে, কেউ আর তেমন আতঙ্কগ্রস্ত হল না। একটা বোমারু সত্যি সত্যিই গুলিতে ঘায়েল হল। তবু আট দিনে এক তৃতীয়াংশ শক্তি ক্ষয় হল ব্যাটালিয়নের। ওপরআলার নির্দেশ পেয়ে রীতিমত ঘাবড়ে গেল ফেব্‌র্, 'যে কোন উপায়ে শহরকে রক্ষা করা' বলাটা ওদের কাছে সহজ। জার্মানরা যদি তাদের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক আক্রমণ করে, তাহলে কী দিয়ে ঠেকাবে তারা?

ফেব্‌র্ জানে, দলের মধ্যে মিশো অত্যন্ত জনপ্রিয়। কর্নেল কোরিয়ে ভীত হয়ে দুটো কোম্পানী ভেঙে দিতে চাইলে ফেব্‌র্ প্রতিবাদ করল। এবং লা হেভ্‌র্-এর বিদ্রোহের কথাটাও চাপা পড়ে গেল। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ফেব্‌র্ মিশোকে জিজ্ঞেস করে, 'মসিয়ঁ ডন কুইকসোটের মতামতটা কি?' এবারও সে তাই করল।

মিশো বলল, 'আমরা প্রতিরোধ করব।'

পার্টির নির্দেশ কি তা মিশোর জানা নেই; বহু দিন হল তার কোন যোগাযোগ নেই পারীর সঙ্গে, সুতরাং তাকে নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হল! দ্বিধাবোধ করল না মিশো। না, কমিউনিস্টরা কাপুরুষ নয়! তারা দেখিয়ে দেবে—তারা লড়তে পারে। এখন প্রশ্নটা রেনো, ভেসা বা দালাদিএকে নিয়ে নয়, এ হল ফ্রান্সের জন্যে সংগ্রাম করার প্রশ্ন।

চারদিকে শত্রু। কেউ হাতে হাতকড়া পরাচ্ছে, কেউ বোমা ফেলছে।

থায়েলমানকে ফাঁসিকাঠে উঠিয়েছিল আর স্পেনকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল যে মৃত্যু-দূত নাৎসীরা, তারা এসে পড়েছে। ঘরের মধ্যেও ফ্যাসিস্টরা সক্রিয়—হিটলারের বন্ধু ব্রতৈল, গ্রঁদেল আর পিকার্।

শান্তিপূর্ণ আর নিরুপদ্রব ফ্রান্সের মৃত্যু হয়েছে। শত্রুর দাক্ষিণ্যের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে সমস্ত দেশকে। এমন কি এখানেও সেই ধ্বংস আর মেয়েদের আর্তনাদ। 'তোমরা কি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ?' মিশো টাউন হলের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে রইল। অধ্যাপক মালে একবার বাড়ী সম্পর্কে বলেছিলেন—'রেনেসাঁর মুক্তো।' একটা দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা কথা চোখে পড়ল মিশোর—'রুটি, শান্তি, স্বাধীনতা।' ১৯৩৬-এর কথা মনে পড়ল—ধর্মঘট, ঝাণ্ডা আর সংগীতের সমারোহ।

দেশের এই দুর্দিনে তার দেশপ্রেম তীব্রতর হয়ে উঠেছে। কত জিনিসের সংমিশ্রণেই না এই আবেগের সৃষ্টি—সাভোয়ার পর্বতমালা, গুঞ্জনমুখর নদী আর রোদ ঝলসানো মাঠ যেখানে সে তার শৈশব কাটিয়েছে; পারী—তার নিজের দেশ পারী, ধূসর-রঙা বাড়ী আর হাস্যমুখর শহর, যে শহরে জিনোর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু ক্র্যাঁস বেঁচে আছেন, পারী আর দেনিস। সে জানে, পাহাড়ী ফুলের মত ক্ষীণপ্রাণ এক নীল-চোখ মেয়েকে সে রক্ষা করতে চলেছে। স্বাভাবিকভাবেই সে আবৃত্তি করল, 'ফ্রান্স...দেনিস...'

সারা দিন ধরে ওরা ট্রেঞ্চ কাটল, বালির বস্তা ভরল আর ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান ও মেশিনগান আড়াল করার কাজে ব্যস্ত রইল। সন্ধ্যাবেলা হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে কথা বলল ফেব্র্। ওরা বলল, 'সর্বত্রই আমরা শত্রুকে ঠেলা মারছি। আমরা নতুন সৈন্য পাঠাচ্ছি আপনাদের জন্যে। যদি পিছু হটেন তাহলে দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নকে পেছন দিককার কাজে ব্যবহার করবেন।'

মিশো একবার কারখানার দিকে তাকিয়ে দেখল। মেশিনগান লাগানো হয়েছে। গতকালই ওখানে বোমা পড়েছিল। বৃষ্টি হয়েছিল সকালের দিকে, কারখানার একটা বোমা-ধ্বসা গর্তে টল টল করছে সেই বৃষ্টির জল। জলের ওপরে যন্ত্রের কতকগুলি অংশ বেরিয়ে আছে। কারখানার আরেক অংশে যাঁতাকলটা একেবারে অক্ষত অবস্থায় আছে কিন্তু। মিশো মনে মনে খুশি হয়ে উঠল, তার কোন শৈশবের সাথীকে খুঁজে পেয়েছে যেন। যন্ত্রপাতি ভালবাসে সে। তাদের ধমক দিয়ে আর যত্ন করে প্রাণবন্ত করে তোলে—যেন ঐ যন্ত্রগুলো তারই ছেলেমেয়ে। লোকদের কী হয়েছে ভেবে রীতিমত অবাক

হয়ে গেল সে! তারা সবাই কাজ, ভালবাসা আর সুখ চেয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল সমুদ্র আর মানুষ নিজেকে ভাসিয়ে রাখবার জন্যে আপ্রাণ সংগ্রাম করতে লাগল। বন্দরে পৌঁছুতে পারবে না সে, তার আগেই তার মৃত্যু হবে। কিন্তু অন্যরা পৌঁছুবে। পিয়ের, লেগ্রে, বুড়ো হ্যাশেন—ওরা থাকবে। যন্ত্রপাতিগুলো থাকবে—আর থাকবে দেনিস···ম্যাগ্নিটোগর্ক্স্-এর মত বড় বড় কারখানা গড়ে তুলবে ওরা। ছবিগুলো তার স্পষ্টই মনে আছে। গতকাল তারা ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে মার্চ করে এসেছে। চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে ফসলগুলো। আর কেই বা ফসল কাটবে? কিন্তু বসন্ত গেলে ওরা আবার ফসল বুনবে। সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে জীবন। কিন্তু এখন ভয়ানক শক্ত...

শহরের সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হল মিশো। তার সঙ্গীরা কোনমতে জেগে আছে, কী করে প্রতিরোধ করবে তা-ই আলোচনা করছে। তারা মাত্র তিনশোজন। এদিকে জার্মানদের সঙ্গে ট্যাঙ্ক আছে। মিশো তাদের উৎসাহ দিল এবং স্পেন-যুদ্ধের গল্প বলল:

'কখনো কখনো আমরা মাত্র ত্রিশজন একটা ব্যাটালিয়নের মুখোমুখি হতাম। ওদের ট্যাঙ্ককে শায়েস্তা করতাম হাত-বোমা দিয়ে। আমাদের হাতে আর অন্য কিছু ছিল না। পেপে বলে একটা ছেলে আট-আটটা খতম করে দিয়েছিল।'

'ও ছিল অন্য রকম ট্যাঙ্ক। কিন্তু জার্মানদের ট্যাঙ্কগুলো সাঁজোয়া—ও রকম ট্যাঙ্ক আর কারও নেই।'

'ওদেরও শায়েস্তা করা যায়। কিন্তু তার জন্যে দরকার স্পেনের সেই লোকদের মত যোদ্ধা। লোহা দিয়ে তৈরী মানুষ।'

'ওখানে তুমি জানতে কিসের জন্যে তুমি যুদ্ধ করছ। আমি নিজেও ওখানে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখানে তুমি কেন প্রাণ দিতে বসেছ? কাকে রক্ষা করছি আমরা? তেসাকে?'

মিশো জবাবটা সঙ্গে সঙ্গেই দিল না। সে নিজে চিন্তিত, তার নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সে সচেতন।

মিশো দৃঢ়ভাবে বলল, 'না, ওদের সঙ্গে হিসেব-নিকেশটা আমরা পরে করব। কিন্তু এটা তো আমাদের নিজেদেরই দেশ। মেয়েদের দেখেছ তোমরা? ওদের স্বামীরা আমাদের সঙ্গে ফ্রন্টে এসে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফ্রন্ট ছেড়ে চলে যেতে পারি না। কমিউনিস্টরা নিশ্চয়ই একটা দৃষ্টান্ত দেখাবে। আর

তাছাড়া, বাস্তবিকই সমস্ত কিছু ছেড়ে যাওয়া কি সম্ভব? একটা ধাঁতাকল দেখেছি আজ...'

বক্তব্য শেষ করার আগেই বিস্ফোরণের একটা শব্দ হল। ভোর হওয়ার আগেই প্রথম গোলাটা এসে উপস্থিত হয়েছে। ছোট ছোট অপস্রিয়মান তারাগুলো এখনো দেখা যাচ্ছে ম্লান আকাশে। বিস্ফোরণগুলোর শব্দ রীতিমত ভয়াবহ; সূর্য ওঠার আগে গোলাবর্ষণ শুরু হবে একথা ভাবতে পারেনি কেউ। কেমন শীত শীত বোধ করল মিশো, বোধ হয় হিম পড়ছে; কিন্তু ঠাণ্ডাটা ভেতর থেকেই আসছে। মেশিনগানটা আঁকড়ে ধরে মুহূর্তে একটা প্রশান্তি বোধ করল সে।

মিনিট পনের পরে গোলাবর্ষণ থামল। ধীরে ধীরে সূর্য উঠছে আকাশে, মাঠে মাঠে পাখীর কলগুঞ্জন শুরু হয়েছে, কেমন গোলাপী হয়ে গেছে জলের রং। লোকগুলো চুপ মেরে আছে। দেনিসের কথা ভাবছে মিশো।

স্পেনে থাকতে যেমন সে দেনিসের স্তনের উষ্ণতা আর ঠোঁটের নোনা স্বাদ অনুভব করত আজও ঠিক তেমনি একটা অনুভূতি এল। পাইন পাতার গন্ধ ভেসে আসছে। মিশো মনে মনে বলল, 'দেনিস। প্রিয়তমা! এই-ই শেষ!' তামাসা করার সময় নয় এটা; অত্যন্ত বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কিন্তু ভয়াবহ নয় তাই বলে। একমাত্র দুঃখের বিষয় যে দেনিসের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না...

ট্যাঙ্কগুলো খালের ধারে এসে পৌঁচচ্ছে। চারদিকে প্রচণ্ড গর্জন; যেন পৃথিবীটাই আর্তনাদ করছে। মিশো তাকিয়ে দেখল, ফেব্র্ হাত দোলাচ্ছে।

'গোলা ছোঁড়ো ওদের ওপর!'

আর একবার নিস্তব্ধতা নামল।

'ওরা আবার এক্ষুনি শুরু করবে। ওরা জানে কোথায় আছি আমরা।'

'তাতে কোন ক্ষতি নেই।' মিশো হাসল। 'আমি ওদের স্পেনে দেখেছি। লোককে পালাতে ওরা দেখতে ভয়ানক ভালবাসে। কিন্তু পাল্টা আক্রমণ পছন্দ করে না ফ্যাশিস্টরা।'

'মিশো, তুমি কি চাও প্রতিরোধ করি আমরা?'

'আমি বলি, নিশ্চয়ই। ঠিক তাই!'

নটা নাগাদ জার্মানরা আবার আক্রমণ শুরু করল। গোলা লেগে চূর্ণবিচূর্ণ

হয়ে গেল হতভাগ্য বাড়ীগুলো। মিশোর কাছ থেকে তিন গজ দূরে একটা ট্যাঙ্কে আগুন ধরেছে।

'বাঁ দিকে, ঠিক আলুর ক্ষেতটা পেরিয়েই......'

জার্মান মোটরসাইকেল-বাহিনী এগিয়ে আসছে। ওরা থামল। তারপর ট্যাঙ্কগুলো অগ্রসর হতে শুরু করল। আহত লোকগুলোর ওপর দিয়ে এগিয়ে আসছে ট্যাঙ্কগুলো। চিৎকার করে উঠল ফেব্‌র্, 'শুয়োর! জানোয়ার! নিজেদের লোকদের চাপা দিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা!'

গুলি লেগে কোম্পানী কমাণ্ডারের মৃত্যু হল। দৃশ্যটা সহ্য করতে না পেরে তলঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল সার্জেন্ট। ফেব্‌র্ বুকে হেঁটে মিশোর কাছে এসে বলল, 'কারও কথা শুনো না। চালিয়ে যাও। টের পাইয়ে দাও ব্যাটাদের।'

সেই মুহূর্তের পর কত সময় কেটেছে—কয়েকটা মুহূর্ত না পুরো এক ঘণ্টা? ক্রমান্বয়ে কেবল বিস্ফোরণের শব্দ। মিশো তার বাঁ হাতে ঝাঁকুনি দিল, রক্তে ঢেকে গেছে সমস্তটা।

'হামাগুড়ি দিয়ে এস এদিকে!'

কিন্তু মিশো নড়ল না। এমন কি কথাটা শুনল না পর্যন্ত।

'আরেক বেল্‌ট্ গোলা দাও!.........এইবার, হারামজাদারা, এই নাও!......'

দুপুরে শান্ত পৃথিবীটার ওপর ছড়িয়ে পড়েছে দুরান্তের জমকালো সূর্য। গুলির শব্দ বা আর্তনাদ থিতিয়ে গিয়েছে। নিস্তব্ধতায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আহতদের ঘেঙানি পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। পরে তাদের একটা লরিতে বোঝাই করা হল। মিশো তার কমরেডদের দিয়ে নিজের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধালো কিন্তু যেতে চাইল না। মৃতদের গোর দিল তারা। গরম জল খেল বসে বসে, জলে টিনের বাক্‌সের গন্ধ। যেন দীর্ঘ রোগ ভোগের পর কেমন একটা ক্লান্তি বোধ করছে সবাই। তারা হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাধারণ ও বিস্ময়কর ঘটনাগুলো মনে পড়ল তাদের—শহরের ওপরকার আক্রমণকে প্রতিহত করেছে তারা।

মিশোর কাছে গিয়ে ফেব্‌র্ বলল, 'সাবাস, ডন কুইকসোট! স্পেনে তুমি কী ছিলে?'

'লেফ্‌টেনেণ্ট।'

'এই জন্তে কর্নেল তোমায় হাজতে পাঠাতে চেয়েছিল, না? কিন্তু আজ

আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি জেনারেল করে দিতুম তোমায়। ওরা বলে তুমি নাকি কমিউনিস্ট? ব্যাপারটা কী হাস্যকর!......এখন আমরা জেনেছি তুমি সত্যিই কী!......'

চোখ দুটো মুছে বোতল থেকে এক ঢোঁক 'রাম' খেল সে।

'আমি হেড-কোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টা করছি। সুসংবাদটা জানানো উচিত ওদের।'

সংযুক্ত হবার পর তেমনি নির্লিপ্ত কণ্ঠস্বর কানে এল। গতকাল ওরা ফেবৃকে বলেছিল, 'যে কোন উপায়ে ঠেকিয়ে রাখুন।' আজ ওরা তার যা বলার আছে সমস্তই শুনল, তারপব বলল, 'রাত্রির অন্ধকারে শহর ছেড়ে চলে আসুন।' ফেব্‌র্ চিৎকার করে উঠল, 'কেন?' উত্তর এল, 'নতুন ভাবে সৈন্য সমাবেশ করছি আমরা।'

রিসিভারটা সশব্দে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফেব্‌র্, 'জেনারেল? ও বেটা জেনারেল না আর কিছু। অপোগণ্ড একটা!'

'বিশ্বাসঘাতক ওরা!' মিশো তার কমরেডদের বলল, 'আত্মসমর্পণের পথে নিয়ে যাচ্ছে দেশকে।'

সত্যটা উপলব্ধি করল প্রত্যেকে আর নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

বিদায়, যাতাকল! বিদায়, টাউনহলের স্বর্ণ সিংহমূর্তি! বিদায়, নীল কফিপটউলী মহিলা, অসুস্থ মা, আতঙ্কিত ও উন্মত্ত দুটি চোখ! ধূলি-ধূসর পথ দিয়ে বিষণ্ণভাবে হেঁটে চলল মিশো। এই পথ দীর্ঘ, এই পশ্চাদপসরণের পথ। দুপুরে উত্তাপ আর প্রশান্তির মধ্যে যুদ্ধ-জয়ের স্বপ্ন দেখেছিল সে। আর সেই যুদ্ধজয়ের চোখ দুটি ছিল কফিপটউলী মহিলাটির মত...বিদায়, নির্বোধ স্বপ্ন!...

২২

সন্ধ্যাবেলা পারীকে মনে হয় নির্জন অরণ্যের মত; এমন কি ছোট ছোট নীল বাতিগুলো পর্যন্ত নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে। পথচারীদের রাস্তায় থামিয়ে তাদের পরিচয়-পত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। গুপ্তচর আর প্যারাস্যুটিস্টদের উপস্থিতি সম্পর্কে গুজব রটেছে নাকি। রু শের্‌স্ মিদির এক খোঁড়া দুধওলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে; সে নাকি বিমানের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠাচ্ছিল। লোকে জোর

গলায় বলতে শুরু করেছে যে পারীতে ৪০,০০০ ছদ্মবেশী জার্মান সৈন্য এসে আশ্রয় নিয়েছে। তিনজন 'মন্ত্রশিষ্য'কে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দিল মাদেল। ইতালীয়ান নামঠিকানার তালিকা এবং বিমান-বিধ্বংসী কামানের অবস্থিতি চিহ্নিত পারীর মানচিত্র পাওয়া গিয়েছে তাদের কাছে। ব্রতৈল ক্ষেপে আগুন। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সাধু ফরাসীদের গ্রেপ্তার করার অর্থটা কি?' পরের দিন সকালে 'মন্ত্রশিষ্য'রা ছাড়া পেল। ব্রতৈলের স্ত্রী কাঁদুনি গেয়ে চলল, 'জার্মানরা এসে পড়ল এখানে!' ব্রতৈল বলল, 'ভগবানের নাম নাও। কিন্তু কি হবে না হবে কে জানে? হয়ত মার্শাল পেতাঁাই ফ্রান্সকে রক্ষা করবে...'

পথে পথে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়। উদাসীনের মত রেল স্টেশনের চারদিকে তারা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, শূন্য, নিরাসক্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পারীকে।

মহানগরীর কোলাহল কিন্তু তাদের কানে পৌঁচচ্ছে না। মোটরচালকরা ব্যর্থ হয়ে হর্ন বাজাচ্ছে, দাঁত খিঁচিয়ে উঠছে; আশ্রয়প্রার্থীরা শুনতে পাচ্ছে না কিছু; যেন অন্য কোন ভয়ানক শব্দে কান দিয়ে আছে তারা।

পরিশ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা ফুটপাথে এসে আশ্রয় নিয়েছে। লোকে তাদের চারদিকে ভীড় করে প্রশ্ন করছে—কোত্থেকে এসেছে তারা? এখনো পারীবাসীদের ধারণা যে যুদ্ধ অনেক দূরে; সংবাদপত্রওলারা এখনো উত্তর নরওয়ের যুদ্ধ সম্পর্কে খবরাখবর দিচ্ছে। কেবল আশ্রয়প্রার্থীরাই শান্তিভঙ্গ করে বলছে, 'জার্মানরা মেরে ফেলছে লোকদের। কোনক্রমে বেঁচে গেছি আমরা।' শ্রোতাদের ভীড় সরিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে পুলিশ। ভয়াবহ গল্প শুনে কী লাভ?

বেশী সতর্ক যারা তারা প্রদেশে তাদের আত্মীয়দের বাড়ীতে গিয়ে উঠেছে। অন্যেরা কাজকর্ম করছে, ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, ফূর্তি করছে। প্রথম দিনের বিমান-সংকেতধ্বনির পর যে ক্যাবারেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলো খোলা হবে কি হবে না তাই নিয়ে আলোচনা করছে সংবাদপত্রওলারা। বৃদ্ধরা তরুণদের সান্ত্বনা দিচ্ছে, '১৯১৪ সালের মত এবারেও ওদের হটিয়ে দেওয়া হবে।'

পেতাঁার প্রতিভা, ওয়েগ্যাঁর নীতি বা দৈব ঘটনা—কোনটিতেই আস্থা নেই ডীইয়ারের। তার ধন-সম্পত্তি বাক্সবন্দি করতে ব্যস্ত সে। ভোরবেলা থেকে তার ফ্ল্যাটে হাতুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুলিরা আসছে আর যাচ্ছে।

ছবিগুলোর ভাগ্য ছাড়া আর কোন কিছুতেই আগ্রহ নেই ভীইয়ারের। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকটি ক্যানভাস কালো বাক্সে রাখল, তারপর নির্লিপ্তভাবে চোখ বুলিয়ে নিল খবরের কাগজে। বুঝল, সমস্ত কিছু ডুবে গেছে। যবনিকা-পতনের জন্যে অপেক্ষা করতে কেমন বিরক্ত বোধ করল সে।

তার বিরক্তির মধ্যে ক্রোধও আছে। তার স্বাভাবিক শান্ত ও বিষণ্ণ চোখ দুটোর ওপর একটা ক্রুদ্ধ বিস্ফার ঝিলিক দিয়ে উঠল। কেন ওরা তার কঠোর জীবনকে নিরুপদ্রবে কাটাতে দিল না? সে জানে না কাকে দোষারোপ করবে। সুতরাং সবার প্রতি ঘৃণা বোধ করল ভীইয়ার; জার্মানরা আর দালাদিএ, তেসা আর কমিউনিস্টরা, বৃটিশরা আর অপদার্থ সেনাপতিরা।

পেরেক-আঁটা বাক্সগুলির দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের কথা মনে হল ভীইয়ারের। আভিঞ্যঁতে তার ছোট বাড়ীটার কি হবে? উইসটারিয়া-ঢাকা ছোট্ট লতামণ্ডপ আর বাদামী বালির ওপর সূর্যের ঝিকিমিকির কথা ভেসে উঠল তার মনে। ডুবে গেছে পারীর ভবিষ্যৎ। কিন্তু জার্মানরা যদি আরো অগ্রসর হতে চায়! না, তা অসম্ভব। তারা পারী ত্যাগ করবে, দু-তিন দিনের জন্যে পারীতে প্রবেশ করে প্রাশিয়ান অহমিকা চরিতার্থ করুক ওরা। তারপর তারা সন্ধি করবে। আসলে আলসাস-লোরেনটা একটা খেলার ঘুঁটি—সামনে পেছনে ছুটোছুটি করছে কেবল। বিশ বা চল্লিশ বছর স্ট্রাসবুর্গ জার্মানদের করতলগত থাকবে। অন্যদিকে কিন্তু এর ফলে শান্তি আসবে। কিন্তু তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পারীর পতনের পরও যদি চার্চিল রেনোকে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার প্ররোচনা দেয়? ফ্রান্স তো এখন বৃটিশদের একটা উপনিবেশ মাত্র। এই সময় ভীইয়ার কাশল আর ক্রুদ্ধ হয়ে তাকিয়ে দেখল তার চাকর আর কুলিদের দিকে। এতে আর ওদের কী? ওরা খাটে, চুরি করে আর ফূর্তি করে।

দরজার বেল বাজার শব্দ হবার সঙ্গে সঙ্গে তেসা এসে ঘরে ঢুকল। তেসাকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল ভীইয়ার। তেসার না-কামানো জীর্ণ মুখখানা দেখে কেমন একটা আনন্দ হল তার। তাহলে তেসারও দুঃসময় যাচ্ছে! জঞ্জালটা সে-ই সাফ করে দেখুক না!

সাড়ম্বরে আরম্ভ করল তেসা। বলল, 'মন্ত্রীসভায় মার্শাল পেতাঁকে নেবার সময় ভেবেছিলাম যে ও সমস্ত দুরূহ সমস্যাগুলোর সমাধান করবে। কিন্তু

পরিস্থিতিটা প্রতিদিনই জটিলতর হয়ে উঠছে। ভয়ানক দুঃসংবাদ জানাতে এসেছি তোমায়। বেলজিয়ামের রাজা আত্মসমর্পণ করেছে।' তেসা ভীইয়ারের দিকে তাকাল, নির্লিপ্ত হয়ে প্যাঁশনের লেন্স মুছছে সে। 'জেনারেল ব্লাঁশারকে একটু সতর্ক করল না আগে থেকে। সৈন্যবাহিনীর অবস্থা ভয়ানক খারাপ। শয়তানিটা কতদূর বুঝতে পারছ? লোকে ওর বাবা আলবেরকে বলত 'লা রোয়া শেভালিএ' কিন্তু ইতিহাসে লিওপোল্ডের নাম মূর্তিমান ধূর্ত হিসেবে অখ্যাত হয়ে থাকবে।'

'তার দিক থেকে রাজা অবশ্য কোন অন্যায় করেনি।' ভীইয়ার শান্তভাবে বলল, 'এ ছাড়া আর কীই বা করতে পারত সে? কতকগুলো অবস্থায় আত্মসমর্পণ করাটাই বীরত্বের কাজ।'

'আমরা ও রকম 'বীরত্ব' দেখালে হিটলার আমাদের কাছে কী শর্ত পেশ করত একবার ভেবে দেখছ? ও হয়ত আলসাস চেয়ে বসবে। এমন কি লিল্ অধিকার করতে চাইবে ও।'

'একথা তোমার আগেই ভেবে দেখা উচিত ছিল। আমি দোষ দিচ্ছি না কিন্তু পরাজয়কে প্রতিরোধ করার মত কিছুই করোনি তুমি। যুদ্ধ না করেই ঘাঁটি-গুলো ছেড়ে দিয়েছ ওদের হাতে। হার তো মিউনিকেই তৈরী হয়েছিল। কিন্তু সে সময় তুমি মন্ত্রীসভায় এসে ঢুকলে।'

'প্রসঙ্গক্রমে, তুমিও তা সমর্থন করেছিলে। তাছাড়া, হারের কারণই যদি খতিয়ে দেখ তাহলে ১৯৩৬-এর ধর্মঘট আর চুয়াল্লিশ ঘণ্টা সপ্তাহের কথা ভুলে গেলে চলবে না। শিল্পগুলোয় বিশৃঙ্খলা আনল কারা? আর স্পেনের কথাই ধর না। মুসোলিনীকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিল ব্লুম। তুমি ফ্রাঙ্কোকে ক্ষেপিয়ে দিলে, তারপর অবশ্য যুদ্ধজয়ে সাহায্য করলে বটে। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে?'

গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনাকে প্রকাশ করতে গিয়ে সপ্তমে উঠল তেসার গলার আওয়াজ। ভীইয়ার অসংলগ্নভাবে কথা বলল; তার কাঁপা কণ্ঠস্বরটা শোনাল কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের মত। বহুক্ষণ তারা পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করল। আর পুরনো পার্লামেণ্টারী চক্রান্ত, অবিবেচকসুলভ ঘোষণা এবং চেম্বারের অনৈক্যের কথা আলোচনা করল।

প্রথমে কিন্তু তেসাই দমন করল নিজেকে। বলল, 'পরস্পরকে গালিগালাজ করে কোন লাভ নেই। ধৈর্যের প্রশ্নটাই এখানে বড়। কিন্তু ভয়ংকর

একটা সময়ের মধ্যে বাস করছি আমরা, ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো উচিত আমাদের। আমি প্রস্তাব নিয়ে এসেছি যে তুমি মন্ত্রীসভায় যোগ দাও। রেনো একটা কিছু চমকপ্রদ করবে বলে প্রস্তুত হচ্ছে। মন্ত্রীত্বসংকট দেখা দিলে বিদেশে একটা খারাপ ধারণা হবে, সুতরাং আমরা ঠিক করেছি ব্যাপারটা ঘরোয়াভাবে সেরে ফেলব। সর্বপ্রথমে, দালাদিএটাকে হটিয়ে দিতে হবে। গাধাটা ফ্রান্সকে একেবারে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে। আরো কিছু রদবদল করব আমরা। সারোকে সরাতে হবে। বোদুয়াঁ আর প্রুভোসকে দলে নিতে হবে। কাজের লোক ওরা। কিন্তু জাতির বিবেকের প্রতীক হিসেবে তুমি আমাদের কাছে অপরিহার্য। তাছাড়া তোমাকে পাওয়া মানে শ্রমিক শ্রেণীকে সঙ্গে পাওয়া।'

ব্যঙ্গাত্মক হাসি হাসল ভীইয়ার। ওরা কি বোকা ভেবেছে তাকে? আত্ম-সমর্পণের ঠিক আগেই সে মন্ত্রীসভায় ঢুকবে? তার মানে বশ্যতা স্বীকার করছে সে, আদর্শের জন্যে তার পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামকে মুছে ফেলবে একেবারে। আর কিসের জন্যে? না তেসা বাইরে বলে বেড়াবে, 'দেখ, ভীইয়ারও সই দিয়েছে।' না, নিজেকে অতটা নীচে নামাতে প্রস্তুত নয় সে!

ভীইয়ার বলল, 'রেনো আর তোমার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমি রীতিমত অভিভূত হয়েছি। কিন্তু মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে চাই না। আমার পার্টির প্রতিনিধি তো মন্ত্রীসভায় আছেই। সমাজতন্ত্রীরা যে দায়িত্ব এড়াতে চায় একথা বলতে সাহস পাবে না কেউ। কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা আমাকে দু চক্ষে দেখতে পারে না। এমন কি ইংলণ্ডেও ওরা একজন তরুণকে পেলে খুশি হয়। কাজেই আমি নামে মাত্র মন্ত্রী থাকব শুধু।'

তেসা তর্ক করে তাকে রাজী করাতে চেষ্টা করল, 'ওগুস্ত, না বলতে পারবে না তুমি! খাদের মুখে এসে পৌচেছি আমরা। যা কিছু আমাদের প্রিয় সবই ধ্বংস হয়ে যাবে—ফ্রান্স, পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি, মার দুধ খেয়ে যে সব বোধশক্তি অর্জন করেছি আমরা......'

নিজের কথায় নিজেই অভিভূত হয়ে গেল তেসা; মনে পড়ল আমালির মৃত্যু, দেনিসের সঙ্গে তার সাম্প্রতিক সাক্ষাৎ, আশ্রয়প্রার্থী, পেতাঁার জেদ আর সমস্ত কিছুর উত্তরে সেই একই জবাব: 'অনেক দেরী হয়ে গেছে।' তার কণ্ঠস্বরে অশ্রুপাতের আভাস।

ভীইয়ার স্বস্তি বোধ করল কিন্তু সন্তুষ্ট হল না। সে মর্মান্তিক আঘাত দিতে

চাইল তেসাকে। বলল, 'কী সব বাজে কথা বলছ? আমাদের দুজনেরই দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। অবশ্য অর্থনৈতিক উদারনীতির কথা যদি বল তাহলে বলব তোমার চিন্তাধারা দেউলে হয়ে গেছে। কিন্তু আমি সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেছি। হিটলার কী নিয়ে আসছে? সমাজতন্ত্রবাদ! কথাটা নিঃসন্দেহে কিছুটা বিকৃত কিন্তু জার্মান রীতিনীতির সঙ্গে মিশ-খাওয়ানো। কিন্তু আমরা যদি এই জাতীয়-সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করি এবং তার সঙ্গে স্যাঁ-সিমোঁ, প্রুঁধো ও আমাদের ট্রেড ইউনিয়নের নৈতিক শিক্ষাগুলি যোগ দিই তাহলে অত্যন্ত খাঁটি ও নিতান্ত ফরাসী একটা কিছু লাভ করব আমরা।'

তেসার আর সে সব দিকে কান নেই, মতবাদ নিয়ে তর্ক করার ইচ্ছা নেই তার। হঠাৎ চোখে পড়ল পড়বার ঘরে কেমন একটা বিশৃঙ্খলা—চারদিকে ট্রাঙ্ক আর বাক্স ছড়িয়ে আছে এলোমেলোভাবে।

'তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?' তেসা জিজ্ঞাসা করল।

বিব্রত হয়ে ভীইয়ার বলল, 'হ্যাঁ, মানে, আমি নিজে থাকছি। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে চাই আমি। কিন্তু ছবিগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি। সংগ্রহ-গুলোকে নষ্ট করার আমার কোন অধিকার নেই। ফরাসী আত্মার প্রতীক এই ছবিগুলো। রাজনৈতিক ব্যবস্থা উচ্ছন্নে যেতে পারে কিন্তু শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলোকে থামকা বোমা লেগে ধ্বংস হতে দিতে পারি না।'

হল পর্যন্ত তেসাকে পৌঁছে দিল ভীইয়ার। বিদায় জানাবার সময় হঠাৎ কেমন একটা উষ্মা পেয়ে বসল তেসাকে, 'যত বিপদই আসুক না কেন, আমি পারীতেই থাকতে চাই। আমার কোন সংগ্রহ নেই। আর ফ্রান্সের কথা ভাবতেই হবে আমাকে......'

২৩

মিয়েজার আতঙ্কিত না হয়ে স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে চলেছে। কেবল প্রতি রাত্রে বিমান-ধ্বংসী কামানের গর্জনের মধ্যে ঘুমোবার জন্যে ভেরোনল খেতে হয় তাকে। তার উদাসীন মুখে হাসিটুকু লেগে আছে—লিয়ঁ অধিবাসীর চাইতেও সে জার্মান বা সুইডদের মত দেখতে। লোকটা স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর, নিজের চেহারার ওপর রীতিমত যত্ন নেয়। মোটা না হবার জন্যে টেনিস খেলে। তার অভিজাত ফ্ল্যাটে কেমন একটা পবিত্র প্রশান্তি। তার পড়ার ঘরে

কোন ছবি বা কোন টুকিটাকি জিনিস পর্যন্ত নেই। লেখবার টেবিলের সামনে নেপোলিয়নের একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি। কয়েকটা রেফারেন্স-বই বাদে সমস্ত বইয়ের আলমারিটা একেবারে খালি। পড়াব প্রতি ম্যিয়েজারের আকর্ষণ নেই, বরং সে সংগীতটা পছন্দ করে, বিশেষ করে বাক্। ম্যিয়েজাব বলতে ভালবাসে, 'এ আমার ধর্মের অনুকল্প।'

দুটি সন্তানের বাবা সে। তার ছেলে সম্প্রতি ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা শেষ করেছে। ভুল বোঝাবুঝির আশঙ্কা এড়াবাব জন্যে ম্যিয়েজার তাকে সৈন্যবাহিনীতে লেরিদোর দপ্তরে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে এক বিরাট পয়সাওলা লোকের সঙ্গে, লোকটি অত্যন্ত অল্প সময়েব মধ্যে সমস্ত নিকেলের শেয়ারগুলো হাতিয়ে নিয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে থাকে ওরা।

ম্যিয়েজার ছ-ছটা ভাষা জানে আব সে একজন নামজাদা পরিব্রাজক। যে কোন জায়গা হোক সে সমান স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে; বলে—সাংহাই-এর রেস্তোরাঁয় বাঁশের ডগা দিয়ে মুরগীর তরকারি, ক্যালিফোর্নিয়ার ফল বা আলজিরিয়ার সুরুয়া তার একই রকম ভাল লাগে। টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে সে মাথা ঘামায় না, ও সব সে ইঞ্জিনীয়ারদের ওপরই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কাঁচামালের দর আর বাজারের হালচাল সম্পর্কে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ। প্রত্যেক জায়গাতেই তার ব্যবসায়গত সম্পর্ক। জার্মানীর কেমিক্যাল শিল্প, নরওয়েজিয়ান নাইট্রেট্স্ আব চ্যাকো প্ল্যাটিনামের ওপর তার বিশেষ আগ্রহ। ম্যিয়েজারের ধারণা—দেসেরটা বোকা আর আনাড়ী—'ক্ষয়িষ্ণু যুদ্ধোত্তর যুগেই ওর মত লোকের পক্ষে এতটা জনপ্রিয়তা পাওয়া সম্ভব।' সে কেবল দেসেরের নিশ্চিন্ত মুখাবয়ব ও রূঢ় আচরণ দেখে ঘৃণাভরে হাসে।

দেসেরের অবনতিতে ম্যিয়েজার খুব খুশি হল। ঘটনাগুলোরও নিজস্ব একটা যুক্তিবাদ আছে! কিন্তু ভয়ানক দুঃসময় এটা, মনে মনে ভাবল ম্যিয়েজার। ব্যবসা খুব ভাল চলছে সন্দেহ নেই, কিন্তু পরে কি ঘটবে? যুদ্ধমান দেশগুলির ক্লান্তি কিন্তু ভাল লক্ষণ নয়। পরাজয় হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে, হয়ত বিপ্লব হবে একটা। আর যদি জয় হয় তাহলে তো দেসেরের মত লোক জনসাধারণের সামনাসামনি আসবে, এক ঘণ্টার খলিফা হয়ে উঠবে। ম্যিয়েজার তার পূর্ব-পুরুষদের নিয়ে গর্ব করে; তার ঠাকুরদা ছিল তিন-চতুর্থাংশ রেলওয়ে ব্যবস্থার মালিক আর তার ঠাকুরদার বাবা ছিল মস্ত বড় মহাজন, বালজাক উল্লেখ করেছিলেন তার কথা।

যুদ্ধটা তার কাছে প্রাচীন কালের একটা স্মৃতিচিহ্ন মাত্র। দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের প্রতি তার মনোভাব ব্যঙ্গোক্তির সমতুল্য। অবশ্য হাসি গোপন করতে সে জানে যাতে অপরে না মর্মাহত হয়; যেমন সে বৌয়ের সঙ্গে কখনো হাসিতামাসা করে না; তার বৌ লুর্দের অলৌকিকতায় বিশ্বাস করে। যা কিছু তার বিচারে মধ্যযুগীয়, সে সব কিছুতেই সে ঘাড় নাড়ে, কিন্তু বৌকে পয়সা দেবার বেলায় কার্পণ্য করে না, যে পয়সা বিভিন্ন গির্জার সাহায্যেই ব্যয়িত হয়। ম্যিয়েজারের বিশ্বাস—জাতিগুলো যখন সংকীর্ণভাবে জীবন যাপন করে তখন যুদ্ধ অত্যন্ত ন্যায্য। কিন্তু এখন বিভিন্ন জাতির স্বার্থ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আমেরিকানদের পক্ষে বৃটিশ রবার বিনা কাজ চালানো অসম্ভব। জার্মানদের প্রয়োজন তেল এবং তার জন্যে ডেটেরডিং বা বলশেভিকদের ওপর নির্ভরশীল ওরা। ফরাসীরা তো প্রত্যেকের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যুদ্ধ করে কী লাভ? ইউরোপটা বোকাদের শাসনে না থেকে ম্যিয়েজারের মত ব্যবসায়ী লোকদের শাসনে থাকলে একটা আপোষ-রফা সম্ভব হত।

যখন যুদ্ধ বাধল তখন মিত্রশক্তির যুদ্ধজয়ে বিশ্বাস রাখতে পারল না মিয়েজার। এমন কি জার্মানরা জিতবে কিনা তাতেও সন্দেহ হল তার। মনে মনে বলল, এতে জিতটা হবে তৃতীয় পক্ষের। যন্ত্রটা থামাতে চাইল সে, মাদ্রিদে গিয়ে জার্মানদের সঙ্গে কথা বলল। শীতকালে সে ভাবল যে, সহজ-বুদ্ধি প্রাধান্য লাভ করছে কিন্তু আসলে উল্‌টোটাই ঘটল। চেম্বারলেন বিদায় নিল আর এদিকে খেদিয়ে দেওয়া হল ব-নেকে। তারপর এল ১৯৪০-এর মে মাস।

এখনো যা রক্ষা করা সম্ভব তা রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয় অনিবার্য। এক সময় হয়ত একথা শুনে লোকে বিচলিত হত, ফরাসীদের কাছে ফ্রান্সই ছিল গোটা পৃথিবী। কিন্তু এখন...হিটলারকে জার্মানদের মনোভাবের সঙ্গে একটা হিসেব-নিকেশ করতেই হবে, ওরা ভার্সাই সন্ধির প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু হিটলার লোকটা চালাক। তাছাড়া, ছিচ-কাঁদুনের কাছে এ সমস্তই একটা হৃদয়াবেগের প্রশ্ন। সৌভাগ্যবশত, পল দেরুলেদে ও তার স্বদেশী গানের অনুরাগীরা আজ আর নেই। যুদ্ধের বহু আগে থেকেই ফ্রান্স স্থানচ্যুত হয়েছে। ছিচকাঁদুনেরা অবশ্য কিছু সময়ের জন্যে চিৎকার জুড়ে দেবে তারপর থিতিয়ে যাবে ধীরে ধীরে আর তারপর দেশের ক্ষতস্থানটা শুকিয়ে আসবে।

সুতরাং যখন জেনারেল পিকার্ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আপনি যা বলছেন

তার অর্থ তো আত্মসমর্পণ' মিয়েজ্ঞার উত্তর দিল, 'কথাগুলো শুনে ভয় পাবেন না। বর্তমান অবস্থায় যা একমাত্র সম্ভাব্য তাই বলছি।'

এর পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। নেপোলিয়নের আবক্ষ মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল জেনারেল পিকার। পারীর চাকুরে মেয়েরাও কাঁদল, কিন্তু পিকার তো ছেলেমানুষ নয়। সে জানে কিসের আয়োজন চলেছে। সে নিজে ব্রতৈলের বন্ধু। সে বহুবারই বলেছে, 'জার্মানরা আমাদের হারিয়ে দেবে।' তাহলে 'আত্মসমর্পণ' শব্দটা শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল কেন সে?

মিয়েজ্ঞার বলল, 'আমি আবার বলছি এই-ই একমাত্র উপায়। উত্তরগামী সৈন্যবাহিনীর ভবিষ্যৎ তো নির্ধারিত। বেলজিয়ানরা খেলার মাঠ থেকে সরেই গেছে। বৃটিশরা ছেনালি করছে ছুঁড়ীদের মত। কিন্তু জার্মানরা ইংলণ্ডের ওপর হাওয়াই হামলা করলেই ওদের সতীপনার বড়াই কেটে যাবে। বৃটিশদের থেকে এগিয়ে থাকা, অন্তত একটা আলাদা সন্ধি করে, তাতে তো আমাদেরই সুবিধে। আমরা যদি যুদ্ধ চালিয়ে যাই তাহলে হিটলার এসে পারী দখল করবে আর মার্সাই দখল করবে ইতালীয়ানরা। আর ওদিকে কমিউন গড়ে উঠবে লিয়ঁতে। কোনটা বাঁচানো সব চেয়ে জরুরী—পুরনো সীমান্ত না সভ্যতা? সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই কমিউনিস্টরা একটা অভ্যুত্থান ঘটাবে ...'

গত কয়েক মাস ধরে পিকারের সমস্ত চিন্তা একটা ঘূর্ণির মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। দিনে দশবার করে সে মত বদলায়। কখনো বলে আমরা হেরে যাব, এবং হেরে যাওয়াই উচিত। এখনই এই কলঙ্কিত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটানো দরকার। আবার কখনো কখনো ফরাসী সৈন্যবাহিনীর গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা মনে করে পিকার ভাবে, 'হয়ত আমরাই জিতব।' হিটলারকে সে শ্রদ্ধা করে, শত্রু মনে করে না এবং জার্মান আশ্রয়প্রার্থীদের সে ঘৃণাভরে বলে, 'দলত্যাগী।' জার্মান অগ্রগতির গোড়ার দিকে সে ভীত হয়ে উঠেছিল। নির্দেশ দিয়েই তৎক্ষণাৎ প্রত্যাহার করেছিল সেগুলো। চিৎকার করে বলেছিল যে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখাটাই প্রয়োজন; কিন্তু সে নিজে প্যারাট্রুপকে সাংঘাতিক ভয় পায়: যদি সেনা দপ্তরের ওপর আক্রমণ চালায় ওরা? রাজনৈতিক খেলায় জড়িয়ে পড়েছিল পিকার। ব্রতৈলের কাছে গিয়ে সমস্ত প্রশ্নগুলো উত্থাপন করল সে। ব্রতৈল বলল, 'শত্রুকে অন্তত এক মাস ঠেকিয়ে রাখ। আমরা রেনোটাকে খেদিয়ে দিয়ে জার্মানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসব।' পিকার হৃদয়স্পর্শী নির্দেশ পাঠাল: 'সৈনিকগণ, বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও নয়!'

'এক পাও পিছু হোটো না!' জার্মানরা দিনে ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে আসছে। পিকার্ ব্রতৈলের কাছে ফেটে পড়ল, 'আমরা আর ঠেকাতে পারছি না!' ব্রতৈল স্থির হয়ে উত্তর দিল, 'তোমরা যে ঠেকাতে পারবে একথা মনেও ঠাঁই দিইনি আমি।'

যাই হোক, এখনো পর্যন্ত পিকারের সঙ্গে কেউ আত্মসমর্পণ সম্পর্কে আলোচনা করেনি। ম্যিয়েজার যখন সোজাসুজি বলল, 'আমাদের বেলজিয়মের পথ অনুসরণ করা উচিত,' পিকার্ ঘাবড়ে গেল। কাঁদতে লাগল সে। কিছুটা শান্ত হবার পর সে অস্ফুট গলায় বলল, 'ওরা কিন্তু আমাদের হাতে সৈন্যবাহিনী ছেড়ে দেবে না......'

ম্যিয়েজোর বলল, 'আমি বুঝি, এটা আপনার পক্ষে একটা মস্ত বড় আঘাত। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারালে চলবে না। ১৯৩৬ সালে আমি ভেবেছিলাম সমস্ত বুঝি ডুবে গেল। ধর্মঘটীরা দখল করে বসেছিল আমার কারখানাগুলো। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমি কাজ করে যেতে লাগলাম। হয়ত ওরা অল্প কিছু সৈন্য আমাদের হাতে ছেড়ে দেবে। তরুণ অফিসারদের সামরিক শিক্ষা দিতে পারবেন আপনি। আপনার জ্ঞান ব্যর্থ হবে না। বর্তমানে কিন্তু পারীকে আপনি রক্ষা করতে পারেন। আমি প্রতিরোধের কথা বলছি না। মন্ত্রীদের মধ্যে অবশ্য অনেক স্থির-বুদ্ধি লোক আছে। গতকাল ত্থর্মজি আলাপ আলোচনা শুরু করেছে। কিন্তু রেনো সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। আর মাদেলের কথাও ভুলে গেলে চলবে না। ও লোকটা ফ্রান্সের দুষ্ট প্রতিভা। ও ফ্রান্সকে রক্ষা করতে চায়। তার মানে রাজধানীর ধ্বংস আর অসংখ্য নরহত্যা। আপনি তো ক্ষমতাশালী লোক। গভর্নমেণ্টকে আপনার জানানো উচিত যে সামরিক দিক বিচার করেই পারীর প্রতিরোধ একটা আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র। এই কাজ করলে আপনি ফ্রান্সের একটা মস্ত উপকার করবেন।'

জুলাইয়ের সেই ঝলমলে দিন, আর্ক দ্য ত্রিঁয়ফের কাছে বজ্রমুষ্টি এবং লালঝাণ্ডার মেলা—দৃশ্যগুলো ভেসে উঠল পিকারের মনে।

'আচ্ছা, আমি আমার কর্তব্য করব।' পিকার্ উত্তর দিল, 'শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব। কিন্তু যদি ওরা ওয়েগ্যার প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙে বেরিয়ে আসে, পারী ছেড়ে পিছু হটার কথা প্রস্তাব করব আমি। আমাদের পৌত্র প্রপৌত্রদের জন্যে পারীকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শহরকে যথাযথভাবে শত্রুর হাতে তুলে দেব, পুলিশবাহিনীকে পর্যন্ত সরাবো না।'

২৪

গ্র দেলের পরামর্শ মত যুদ্ধ-কারখানাগুলির নিরাপত্তা আলসাসবাসী বাইসের হাতে তুলে দেওয়া হল। পূর্ণোদ্যমে কাজ করে যেতে লাগল বাইস। তার কথা মত কারখানায় কারখানায় ধ্বংসকার্যের অনুসন্ধানে গুপ্তচর পাঠাল প্রেফে। উৎপাদন সম্পর্কে গুপ্তচরদের কোন ধারণা না থাকায় তারা নির্বোধ উক্তি, অযথা হয়রানি ও হুমকির সাহায্যে শ্রমিকদের উষ্মার উদ্রেক করল মাত্র। বিশেষ করে ম্যিয়েজারের বিমান কারখানার গুপ্তচররা রুদ্র মূর্তি ধারণ করল। 'সাহসী বীরসব! তোমরা বরং যুদ্ধে গিয়ে লড়াই কর। জার্মানরা বোভাস-এ এসে পড়েছে। লোকের কাজে বাধা দিচ্ছ এটা বুঝতে পারছ না তোমরা?' এই ক্রুদ্ধ উক্তি করার জন্যে একটি মেয়ে শ্রমিককে গ্রেপ্তার করল ওরা। পুলিশ রিপোর্টে দেখা গেল, মেয়েটি নাকি কারখানায় ছুতোরদের বেঞ্চ নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেছিল।

গুমোট দিন। ঝড় উঠবার পূর্বাভাস। শাদা আলো জল জল করছে, নিশ্বাস নেবার জন্যে হাঁপাচ্ছে লোকগুলো। ম্যিয়েজারের কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা। প্যারীর দিকে এগিয়ে আসছে জার্মানরা! সৈন্যরা বলছে তাদের হাতে একটিও বিমান নেই। বড়লোকরা উর্ধ্বশ্বাসে শহর ত্যাগ করছে কিন্তু বিশৃঙ্খলা দূর করবে কারা?

দুপুরে খাওয়ার সময়ে কারখানার পেছনে পতিত জমিতে শ্রমিকরা একটা সভা ডাকল। জমির উপর পোড়া কয়লার গায়ে জংলী আগাছা জন্মেছে। হিটলার, পুলিশের চর আর আসন্ন নাটকীয় ঘটনা সম্পর্কে কথা বলল শ্রমিকরা।

এই বেআইনী কমিউনিস্ট সংগঠনের মধ্যে তরুণ তালা-কারিগর ক্লদই প্রধান প্রাণশক্তি। সে মাত্র গত জানুয়ারী মাস থেকে কারখানায় কাজ করছে কিন্তু শ্রমিকরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে আপন করে নিয়েছে। যক্ষ্মা হবার ফলে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছে সে। তার চোখের দীপ্তিকে মানসিক উত্তেজনা বলে ভুল হয়। ছেলেটি সত্যিই আবেগে ফেটে পড়ছে কিন্তু তার সশব্দ ও চপল শ্বাসপ্রশ্বাসের ভঙ্গীতে তার অসুস্থতা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ক্লদ কল্পনাপ্রবণ, সারা রাত সে বই পড়ে কাটায়—টলস্টয় ও ফ্লবেয়ার, শলোকভ

আর মালরো। পাঁচ বছর আগে সে মেজোঁ দ্য কুলতুর-এ যেত, সেখানেই লুসিয়ঁর সঙ্গে আলাপ হয়। একদিন অনেকক্ষণ কথা বলেছিল ওরা দুজন। লুসিয়ঁ কেবল 'চিরন্তন ঝড়ের' কথাই বলে যাচ্ছিল। ক্লদ বিনীত হয়ে উত্তর দিয়েছিল, 'আমি আপনাকে শ্রদ্ধা করি। প্রত্যেকটা জিনিস আপনার জানা। কিন্তু তা-ই যথেষ্ট নয়। আমার মতে কবিদের সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। তাই নয় কি? লুসিয়ঁ মনে মনে বলেছিল, 'মধ্যবিত্ত মন!' ক্লদকে কেমন ভাল লেগেছিল ভাইলার, সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কবিতা লেথ নাকি? মনে হচ্ছে তুমি লেথ।' ক্লদ কোন জবাব দেয়নি। সে কবিতা লেখে ঠিকই কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা পায়। তার কবিতাগুলো কেমন অদ্ভুত। সে নিজেই জানে না কেন সে অমন কবিতা লেখে। তার কবিতা ধর্মঘটের বর্ণনা দিয়ে শুরু হয় কিন্তু তারপরই হঠাৎ সে লিখতে আরম্ভ করে জলা-জঙ্গলের জ্বলন্ত ফার্ন গাছ বা জাহাজের দড়ি-দড়ার বর্ণনা। সে নিজের মনে মনে বলে, 'আমি তামাসা করছি নিজের সঙ্গে।'

দু বছর আগে সে স্পেনে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সীমান্তে আটক করে তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল পারীতে। সে সময়ে সে 'সীন' কারথানায় কাজ করত। লেগ্রে বলেছিল, 'তুমিই আমাদের প্রধান বক্তা।' যদিও ক্লদ কেমন অস্থিরচিত্ত আর নিতান্ত গোবেচারা গোছের মানুষ কিন্তু লোককে তার বক্তব্য বোঝাতে পারে সে। লোকের সঙ্গে কথাবলার সময়ে সে নিজের পন্থা সামনে তুলে ধরে না, বরং কি করা যেতে পারে সে সম্পর্কে মতামত জিজ্ঞাসা করে তাদের। তার কথোপকথনের ভঙ্গী, হঠাৎ-থামা, শব্দের জন্যে দুরূহ সন্ধান কেমন একটা গভীর নিষ্ঠা আর ছেলেমানুষির পরিচয় দেয় এবং সে যা বলে বিশ্বাস করে লোকে।

যুদ্ধের গোড়াতে ক্লদ গ্রেপ্তার হয়ে চার মাস কারাদণ্ড ভোগ করেছে। ছাড়া পেয়েছে চিকিৎসকের পরীক্ষার পর। কোন চাকরি সংগ্রহ করতে পারবে এ আশা ক্লদের ছিল না কিন্তু হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল। মিয়েজ্ঞারের কারথানায় টার্নার নেওয়া হচ্ছে। আবেদনকারীদের কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে আপিসে। 'ক্লদ ভিভাল'—নামটা নজরে পড়ল ওদের। পৃথিবীতে কত ভিভালই না আছে। তাকে কাজে নেওয়া হল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুপ্ত চক্র গড়ে তুলল ক্লদ।

শ্রমিকরা তাকে ঘিরে ধরল। তার বক্তব্য ওরা জানতে চায়। ক্লদ বলল,

'রেনো দালাদিএর চেয়ে কী এমন ভাল? ওরা আমাদের পেছনে ছুরি বসাবে...' সে কাশতে আরম্ভ করল।

শ্রমিকদের মধ্যে থেকে একজন বলল, 'কাগজে তো লিখছে যে ওরা আমাদের রক্ষা করবে। ওরা বলছে সৈন্যবাহিনীর আর পিছু হটা উচিত নয়। আর অন্যদিকে পারীর বাইরে গড়খাই খুঁড়ছে ওরা। আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

ক্লদ বলল, 'ওরা যদি সত্যিই প্রতিরোধ করতে চায়, তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে আছি। প্রাণপণ খাটব। তাই না? মিয়েজারের কিন্তু এতে কিছু যাবে আসবে না। রেনোই হোক আর হিটলারই হোক ও নির্বিবাদে পয়সা কামিয়ে যাবে। কিন্তু এই উড়োজাহাজগুলোকে আমি অন্য দৃষ্টিতে দেখি। আমরা পারীকে বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারি। ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারি আমরা। সৈন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা শুধু জিজ্ঞেস করে—আমাদের বিমান-বাহিনী কোথায়? জার্মানরা আমাদের আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর মেশিনগান চালাচ্ছে, কিন্তু একটাও লড়ায়ে-বিমান নেই আমাদের। আমরা সৈন্যদের যথাসম্ভব সাহায্য করব। ওরা শুধু পুলিশের চরগুলোকে হটিয়ে নিয়ে যাক এখান থেকে। এসব শয়তানদের মাঝখানে কাজ করা অসম্ভব। তাই না?'

শ্রমিকরা একটা প্রতিনিধি-দল নিযুক্ত করবে স্থির করল। তারা উৎপাদন বাড়াতে প্রস্তুত—একথা ঘোষণা করবে প্রতিনিধি-দল কিন্তু অন্যদিকে কারখানা থেকে ঐ গুপ্তচরদের সরিয়ে দেওয়ার জন্যে চাপ দেবে।

প্রতিনিধি-দল সাক্ষাৎ করতে গেলে বাইস ক্লদের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে হাসল। বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ। পারীর শ্রমিকদের দেশপ্রেমের কথা আমি ভাল করেই জানি। প্রত্যেকটা বাড়তি বিমান যুদ্ধজয়ের সময়কে আরও সংক্ষিপ্ত করে তুলবে। আপনারা যাদের ছদ্মবেশী পুলিশ বলছেন, তাদের কারখানায় পাঠানো হয়েছে ছদ্মবেশী কমিউনিস্টদের খুঁজে বের করার জন্যে। আমার বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।'

বাইসের নীল চোখের সঙ্গে ক্লদের চোখোচোখি হল। মুখ ফিরিয়ে নিল ক্লদ।

মিয়েজারের কারখানার শ্রমিকরা চলে যাবার পর অন্যেরা এল। সমস্ত বড় বড় কারখানাই নিজেদের কাজের সময় বাড়াতে রাজী হল এবং পুলিশের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করার জন্যে দাবী জানাল।

১১৪ জন শ্রমিককে ছাঁটাইয়ের হুমকি জারী করা সম্পর্কে বাইস মিয়েজারের সঙ্গে দেখা করতে এল। তালিকার দিকে নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে থেকে মিয়েজার

বলল, 'এরা সবাই সুদক্ষ কারিগর! যাই হোক, তাতে কিছু যাবে আসবে না। ভাল কথা, শহরত্যাগের ব্যবস্থা কি হয়েছে বলুন দেখি।'

'সমস্ত মজুরকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হবে। অরাজকতার সময় ওরা এখানে যত কম থাকে ততো ভাল।'

'ঠিক কথা। কিন্তু যন্ত্রপাতি সরাতে চাই না আমি। ভয়ানক হাঙ্গামার ব্যাপার, তাছাড়া কোন লাভ নেই ওতে।'

ঝাইস হেসে বলল, 'আতঙ্কগ্রস্ত হননি দেখে ভয়ানক খুশি হচ্ছি, মসিয় মিয়েজার। এ পর্যন্ত যত লোক দেখলাম, কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন যে যন্ত্রপাতিতে আমরা হাতও দেব না।'

ক্লদের বন্ধুরা পর পর সতর্ক করে দিয়ে গেল। কারখানার ফটকগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গীরা তাকে উঁচু বেড়া ডিঙোতে সাহায্য করল। হঠাৎ হুইশিলের শব্দ এল কানে। ক্লদ পালাতে পালাতে এক পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিল। এক স্তূপ নোংরা কাপড়ের মধ্যে একজন বুড়ী বসে আছে। বুড়ী চিৎকার করে উঠল, 'প্যারাস্যুটিস্ট!' ক্লদ নম্র গলায় বলল, 'ভয় পেও না। আমি একজন ফরাসী, একজন মজুর।' বুড়ী তাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত হল। ঝড় উঠতে এখনো দেরী আছে। ছোট্ট কুঁড়ে-ঘরের মধ্যে এক রাশ নোংরা কাপড়ের ভেতর ক্লদের শ্বাসরোধ হয়ে এল। তার সঙ্গীদের সতর্ক করে দেওয়া দরকার। বাইরে তাকিয়ে দেখল ক্লদ। কেউ কোথাও নেই। 'পের ওজেন' কাফে পর্যন্ত সে অগ্রসর হল, এইখানে তার সঙ্গীরা এসে জড়ো হয়।

দুটি ঘর নিয়ে এই কাফে। বাইরের ঘরে জিঙ্কের কাউণ্টার। এইখানে অনিয়মিত খরিদ্দারেরা এসে বিয়ার খায় আর মালিক 'পের ওজেন'-এর সঙ্গে আড্ডা জমায়। লোকটা মোটা আর ভদ্র প্রকৃতির, ঘন কালো গোঁফ, কোট পরে না। জীবনে দুটি মানুষের ওপর তার অনুরাগ। একজন তার স্ত্রী, মেদস্ফীত শরীর আর গোঁফ আছে মহিলাটির। অপর জন মোরিস তোরে। '১৯৩৭ সালে ময়দানের সেই সভার পর আমি মোরিসের কাছে গেলাম, তিনি করমর্দন করলেন।' কথাগুলো সে গর্বের সঙ্গে বলে। পের ওজেন জানে, পেছনকার ঘরে কমিউ-নিস্টরা মিলিত হয়। ও ঘরে কোন নতুন লোককে যেতে দেয় না সে। বলে, 'বিলিয়ার্ড ঘরটায় লোক আছে।' সেই সময়ে বিলিয়ার্ড টেবিলের ধারে বিভিন্ন

জেলার প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পার্টির নির্দেশ আলোচনা করবার সময় বিলিয়ার্ডের কাঠি ধরে বসে থাকে পাছে কোন আগন্তুক এসে পড়ে।

ভেতরে ঢুকেই 'নোম' কারখানার জুল-এর দেখা পেল ক্লদ। পরে অন্যরাও এল। সবার মুখে গ্রেপ্তারের আলোচনা। সাত শো মজুরকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

একটু পরেই দেনিস এসে চারজনের বিচারের কথা বলল, 'ধ্বংসকার্যের অপরাধে ওদের চারজনকে গুলি করে মারা হবে। ওদের মধ্যে সব চেয়ে ছোটটার বয়স আঠারো বছর। ফেরনে ওদের পক্ষ সমর্থন করেছে। এইমাত্র কথা বলছিলাম ওর সঙ্গে। ওর ধারণা—ব্যাপারটা আগাগোড়া তৈরী করা। আদালতেই তা জাহির হয়ে গেছে। ফেরনে বাইসকে সন্দেহ করেছে।'

ক্লদ বলল, 'ভয়ানক সাংঘাতিক লোক ও! ওর সঙ্গে যখন দেখা করতে গিয়েছিলাম ও চোখ ঘোঁচ করে আমার দিকে তাকিয়েছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে আমি কে। আর ও যে কে তা বুঝতে আমারও বাকী থাকেনি। কী যে সব কাণ্ড করছে ওরা। দেশ শাসনের ভার আজ হিটলারের গুপ্তচরদের হাতে।'

ক্লদকে উৎসাহিত করতে চাইল দেনিস কিন্তু কি বলবে ভেবে পেল না।

ফিস ফিস করে বলল, 'কিন্তু জনসাধারণ......'

সে কি বলতে চাইছে ক্লদ বুঝল না কিন্তু কোন প্রশ্নও করল না।

হঠাৎ দেনিস বাইরে চলে গেল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরেই দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'ক্লদ, তোমার জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা করেছি। ওখানে তোমার গায়ে হাত দেবে না কেউ।'

অন্ধকার, ছোট কাফেটা কেমন উষ্ণ আর নিরিবিলি। প্রত্যেকের কথা বলা থেমে এসেছে। মুহূর্তের জন্যে বিমান-বিধ্বংসী কামানের গর্জন তাদের কাছে বজ্রধ্বনি বলে মনে হল, কেমন একটা আনন্দ বোধ করল তারা। তারপর সাইরেনগুলো ককিয়ে উঠল। এতটুকু নড়ল চড়ল না কেউ। পরিশ্রান্ত হয়ে সবাই সরু সোফাটার ওপর বসে আছে আর ভাবছে আগামী নাটকীয় মুহূর্তের কথা।

জার্মানরা কি সত্যিই আসছে?

আধঘণ্টা পরে কান-ফাটানো সোঁ সোঁ শব্দ করে বৃষ্টি নামল একটানা। ক্লদ

নিশ্বাস নেবার জন্যে রাস্তার দিকে তাকাল। ম্যাঁ আর স্যা ক্লু-র অরণ্য যেন পারীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। প্লেনগাছের পাতাগুলো দেখাচ্ছে ঠিক এক পাল ভেড়ার মত। সোঁদা মাটির গন্ধ উঠেছে।

দেনিস তার পেছনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'ক্লদ, কবে যে ফ্রান্স.........' আবার দেনিসের কথাগুলো অসম্পূর্ণ থেকে গেল। ওজেন কিছু বিয়ার এনে হাজির করেছে।

'মিশোর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পেয়েছ?' দেনিস জিজ্ঞাসা করল।

'বহুদিন কোন চিঠি পাইনি। উত্তরাঞ্চলের কোথাও সে আছে।'

ওজেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'চুলোয় যাক গে। ওরা তো ওখানে লড়ছে আর মরছে। কিন্তু এরা এখানে কী করছে? কতগুলো নিরীহ লোককে গ্রেপ্তার করছে, এই তো! আর এই সব কাজ কারা করছে? জার্মানীর গুপ্তচররা! মোরিস যদি মন্ত্রী হত তাহলে পারীর ত্রিসীমানায় পৌঁছতে পারত না জার্মানরা!'

পরে সন্ধ্যার দিকে বাইস গ্রঁদেলের সঙ্গে দেখা করে তার কাছে সারা দিনের ঘটনার বিবরণ পেশ করল।

বাইস বলল, 'মোটের ওপর প্রত্যেকটি জিনিস বেশ ভালই উৎরেছে। আমার মনে হয় এখন আমরা কারখানার সব চেয়ে হাঙ্গামাকারী লোকদের হটিয়ে দিতে পেরেছি। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি লোকজন সরিয়ে ফেলা যায় ততই ভাল। সব চেয়ে ভাল কথা যে বিচারটা বেশ সহজে হয়ে গেছে। এবার বাছাধনরা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'অবশ্য যদি দণ্ডটা ওরা রদ না করিয়ে দেয়। ফেরনে প্রেসিডেণ্ট লেব্র্যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। লেব্র্যাঁ তার কথা শুনে কেঁদে ফেলল। ব্রতৈলের কথাই ঠিক, যত লোক তৃতীয় রিপাব্লিকের প্রেসিডেণ্ট হয়েছে তাদের মধ্যে ওই লেব্র্যাঁটাই সব চেয়ে ছিচকাঁদুনে। মোটের ওপর, ওর ব্যবহারটা অবশ্য খুব ভদ্র।'

'তার মানে?'

'মানে, যা করা দরকার লেব্র্যাঁ তাই করে। কাঁদা ছাড়া আর কিছুই করে না সে।'

তারা দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ল।

বাইস চলে গেলে গ্রঁদেল টাইটা ঢিলে করে সোফার ওপর শরীরটা এলিয়ে দিল। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগছে, তার কাজকর্ম খুব চমৎকার এগোচ্ছে কিন্তু। তার ভাগ্যে কী আছে তা কি সে নিজেই ভাবতে পেরেছিল। সে যে কিলমানের সংস্পর্শে এসেছে এতো একটা দৈব ঘটনা। জুয়োখেলায় ক্রমাগত ক্ষতিস্বীকার ও আত্মহত্যার চিন্তার মধ্য দিয়ে এর শুরু। সে ভেবেছিল—এ একটা ভ্রম, মারাত্মক রকমের ভ্রান্তি, তার কুল-মর্যাদার কলঙ্ক। কিন্তু এই পথেই তার সাফল্যের সূত্রপাত হল। অবশ্য সে মাঝে মাঝে সঠিক পথের সন্ধান করেছে। অনেক বিপর্যয়, অপমান ও হীনতা মাথা পেতে নিতে হয়েছে তাকে সেজন্যে। তেসা—ঐ ছিঁচকে ঘুষখোর তেসাটা পর্যন্ত তার দিকে এমন ভাবে তাকাত যেন একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলা রাস্তার ছোঁড়াকে দেখছে। কুছ পরোয়া নেই, এই সমস্ত লোকদের মধ্য দিযেই সে এগিয়ে যাবে। যখন জার্মানরা পারী দখল করবে, সর্বেসর্বা হয়ে বসবে সে। তখন সবাই খোসামোদ করবে তাকে। জুয়োখেলায় সব চেয়ে আসল কথা, সঠিক নম্বরটা আঁচ করতে পারা। আর ঠিক নম্বরটার ওপরই বাজী ধরেছে সে। এখন কেবল আরও কিছু সময় ধৈয ধরে থাকা। তারপরই শক্তি, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা। সবার মুখের ওপর নিঃসংকোচে তাকাতে পারবে সে। কিলমান? জার্মান মুদ্রা? চুলোয় যাক ওসব! ব্যক্তিগত স্বার্থে আগ্রহ নেই কারও। আসলে সে ফ্রান্সকেই রক্ষা করতে চলেছে। আত্মসমর্পণের শর্তে যথাসম্ভব অল্পে রাজী করাবে জার্মানদের এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন সম্ভব করে তুলবে। এই সত্যিকার দেশপ্রেম—ডুকানের মত মূর্ছাগ্রস্তের প্রলাপ নয়!

কাউকে অপমান করে নিজেকে বড় করার ইচ্ছা পেয়ে বসল গ্রঁদেলকে। শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। চওড়া বিছানার ওপর শুয়ে আছে মুশ্। দীর্ঘ অসুস্থতা তাকে একেবারে ভেঙেচুরে ফেলেছে। গ্রঁদেল মনে মনে বলল, 'ভাবতেই পারি না, একে কোনদিন জড়িয়ে ধরেছিলাম!' গ্রঁদেলের চোখে মুশ্ আজ অর্ধ-মৃত। ওষুধের গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল তার। গ্রঁদেল বলল, 'তিন বছর আগে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে খেয়াল চেপেছিল তোমার। সে সময়ে আমি কিছু বলিনি। তুমি তাহলে হয়ত ভাবতে আমি তোমায় ঈর্ষা করছি। কিন্তু এখন আমরা নিঃসংকোচে কথা বলতে পারি। মনে হয় তোমার প্রেমিকদের সম্পর্কে এখন আর মাথা ঘামাও না তুমি। তোমার এখন পরলোকের কথা ভাবা উচিত। আমার চেয়ে একজন

অপদার্থ হতচ্ছাড়াকে পছন্দ হয়েছিল তোমার, কেমন? ওর বাবার চেয়েও ও হতভাগা। শ্রীমতী, ওর কোঁকড়া চুল আর সম্ভ্রান্ত ভাবভঙ্গী দেখে মজে গিয়েছিলে তুমি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তোমার নাগর একজন ছিঁচকে চোর আর বেশ্যার দালাল। ভেবেছিলে—আমি অপদার্থ, সন্দিগ্ধ চরিত্রের লোক আর গুপ্তচর। ভয়ানক ভুল করেছিলে, শাহাজাদী! আমিই একমাত্র লোক যে ফ্রান্সকে রক্ষা করতে পারে।'

একটুও না নড়ে চড়ে মুখ্ যেমন ছিল তেমনি শুয়ে রইল। বালিশ থেকে মাথাটা ঝুলে পড়েছে তার।

'শাহাজাদী নির্বাক যে? কথা বলো না খুকী।'

মুখের বিবর্ণ ঠোঁটে ছোট ছোট বুদ্‌বুদ নজরে পড়ল—সদ্যজাত শিশুর ঠোঁটে যেমন দেখা যায়। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভ্রূভঙ্গী করে ঘর ছেড়ে চলে গেল গ্রঁদেল।

২৫

সন্ধ্যার দিকে সূর্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আর বিবর্ণ কমলালেবুর মত দেখাল সমুদ্রের শাদা শাদা কুয়াশা। বালিয়াড়িগুলো ঠিক চাঁদের মানচিত্রের মত দেখতে। চুলের হালকা ঢেউয়ের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে বালির কণাগুলো। বালির স্তূপের সংলগ্ন শুকনো লতানে ঘাসগুলো প্রস্তরীভূত বলে মনে হয়। কাছেই সমুদ্র ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে—এইমাত্র ভাঁটা পড়েছে সমুদ্রে। বিস্ফোরণে জলের পশলা হাওয়ায় ছিটকিয়ে উঠছে; ফেটে যাওয়া গোলা পড়ে ফুলে ফুলে উঠছে সমুদ্রের জল। বোমাবর্ষণের নির্ঘোষ সত্ত্বেও, এই বালি-জলের পৃথিবীটা কেমন রহস্যময় আর নিষ্প্রাণ!

এই কুয়াশার দেওয়ালকে ছিন্নভিন্ন করে আর বালির স্তূপকে উড়িয়ে দিয়ে লুসিয়ঁ সমুদ্রকে কাছে ডেকে আনতে চাইছে যেন। নরম বালিতে বার বার হোঁচট খাচ্ছে সে। বৃটিশ গোলন্দাজ বাহিনী কাছাকাছি কোথাও আছে, ঠিক কোথায় তা সে নিজেই জানে না। সমস্ত গুলিবারুদ শেষ হয়ে গিয়েছে। বর্তমান বিক্ষুব্ধ জীবনে একটিমাত্র হাতবোমাই তার অবলম্বন। হাত-বোমাটার দিকে সস্নেহে তাকাল লুসিয়ঁ—জলের শেষ বিন্দুর মত এই জিনিসটিও তার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

গত এগারো দিন ধরে যুদ্ধ চলেছে। এমন কি মানচিত্রটার দিকে পর্যন্ত সে

তাকায়নি। এই তো সমুদ্র—এইখানেই সব কিছুর পরিসমাপ্তি! তার সঙ্গীরা ডাকছে; কুয়াশার আবরণ ছাড়িয়েই বৃটিশ জাহাজের অবস্থিতি আর চ্যানেল পার হলেই প্রাণের প্রাচুর্য। এখান থেকে ফিরবার ইচ্ছা নেই তার। সারা দিন সে বৃটিশদের সঙ্গে কাটিয়েছে, আর চলে এসেছে তারপর। এখন এই অভিশপ্ত বালিয়াড়ির মধ্যে সে একা।

যুদ্ধের সেই প্রথম দিন থেকেই লুসিয়ঁ মৃত্যুর খোঁজ করছে। প্রাণপণ করে মৃত্যুর সন্ধানে ঘুরেছে সে। মেশিনগানের গোলাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে সে যাতায়াত করেছে, হাত-বোমা নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ট্যাঙ্কের পিছু পিছু গিয়েছে, এক বেলজিয়ান জোতদারেব বাড়ীর ছাদের ঘর থেকে জার্মান প্রহরীকে গুলি করেছে। কিন্তু মৃত্যু যেন ইচ্ছে করেই তাকে এড়িয়ে গেছে। সে কখনো সংবাদপত্র পড়ে না। একদিন টমেটো-মোড়া এক টুকরো কাগজের ওপর চোখ বুলিয়েছিল। তাতে এই কথাগুলো পড়েছিল সে: যন্ত্র-সজ্জিত যোয়ান অফ আর্ক আমাদের সাহায্য করবে।' কাগজের টুকরোটা সে উড়িয়ে দিয়েছিল, এতটুকু অভিযোগ করেনি পর্যন্ত। তার সঙ্গীরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' কথাটা নিয়ে গলাবাজি করে। কেউ কেউ জার্মানদের গাল দেয়, কেউ বা ইংরেজদের আবার কেউ বা ফরাসী জেনারেলদের। লুসিয়ঁ কোন কথা বলে না, মাঝে মাঝে সে অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে:

'এই যে রে তোর খাটিয়া আর এই যে তাতে বিছানা তোর পাতা,
সাঁই করে এক শব্দ হবে, ফাটবে বোমা, গুঁড়োবে তোর মাথা।'

বেলজিয়ানরা আত্মসমর্পণ করেছে তাহলে? জাহান্নমে যাক ওরা! যুদ্ধজয়ে লুসিয়ঁর আস্থা নেই; গোপন কাগজপত্র কি ভাবে ব্রতৈলের কাছে নিয়ে গিয়েছিল সে কথা মনে পড়ল তার; তার বাবা আর জেনারেল পিকারের পক্ষে যে-কোন কাজ করা সম্ভব। গোটা দলটাই হিটলারের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছে। অর্থাৎ এইখানেই সব কিছুর সমাপ্তি। অতীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে মৃত্যু কামনা করেছে লুসিয়ঁ। তলদেশ স্পর্শ করে দেখেছে, এখন সে সাঁতরে পার হয়ে যেতে চায়। কিন্তু অনুরক্ত ও পরাজিত বাহিনীর সৈনিকের পক্ষে বেপরোয়া সাহসিকতাই একমাত্র পথ। বিপদ এসে ব্রতৈলের জাল থেকে মুক্তি দিয়েছে লুসিয়ঁকে, ডলার ও যৌবনের সমস্ত কলঙ্ক—যে কলঙ্কের উপর বিবন্ন ভাঁড়ামির ছাপ, তাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়ে গেছে। গত দশদিন ধরে একটিমাত্র চমকপ্রদ ঘটনাই তাকে আলোড়িত করেছে। তা

হল অভিনেতা জঁতোইএর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। পারীতে জঁতোই-এর নাম কে না জানে? দেবতাদের প্রিয়পাত্র সে, সুদর্শন, খুব একটা প্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও সবাইকে হাসাতে পারে, ভালভাবে থাকতে পারে, ইচ্ছেমত পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে—যেন জীবনটা তাসের টেবিলের সবুজ মেঝের মত; ছোট্ট পাখীর শস্য-কণা আহরণের মত অত্যন্ত সহজে সে মেয়েদের যৌতুক ও বিধবাদের সঞ্চয় হাতের নাগালের মধ্যে খুঁজে পায়। আর এখন সে ট্যাঙ্কচালকে রূপান্তরিত হয়েছে। আটটি ফরাসী ট্যাঙ্ক শত্রুপক্ষের ঘাঁটি পর্যন্ত গিয়ে পৌচেছিল, কিন্তু পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় সেখানেই থামতে হল তাদের।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা শত্রুদের প্রতিরোধ করল। তারপর সকালের দিকে সাহায্য এল। পাঁচটি ট্যাঙ্ক পুড়ে গিয়েছে। কোনমতে বেঁচে গিয়েছে জঁতোই। সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গিয়েছে তার। এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় সে নিরুত্তর রইল। তাকে দেখে আঁরির কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর—কয়েকটা মুহূর্ত একটা মানুষেব জীবনে কী রূপান্তরই না আনতে পারে!

জীবনটা অনেক সহনীয় হয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে; সঙ্গীদের সঙ্গে নিজেকে আরও ঘনিষ্ঠ করে আনল সে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন কিছু না ভেবেই একাধিকবার সে তাদের রক্ষা করতে অগ্রসর হল। সমুদ্র দেখে ভয়ানক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। তার প্রথম প্রতিক্রিয়াই হল: 'এবার আলফ্রে রক্ষা পাবে।' কিন্তু আলফ্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? সে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক, বুড়ো ভূত আর নির্বোধ, আর ন্যায়নীতিতে আস্থা রাখে। লুসিয়ঁ মনে মনে বলল, 'না, এইভাবে দেখাটা ঠিক নয়। আলফ্রে সত্যিই ভাল লোক।' এর আগে এই সহজ কথাগুলো মাথায় ঢুকত না কোনদিন; তখন সে মানুষকে বিচার করত তার মেধা, দীপ্তি আর প্রতিভা দিয়ে আর এখন 'ভাল লোক' সম্পর্কে কথা বলছে সে। হঠাৎ লজ্জিত বোধ করল লুসিয়ঁ; মনে পড়ল কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেতের চোখ, মুশের যন্ত্রণাকাতর কান্না আর জেনীর শোবার ঘরের বিরাট বিছানা যা দেখে গিল্টি-করা শববাহী গাড়ীর কথা মনে হয়।

সৈন্যবাহিনীর বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলগুলো সমুদ্রতীরে শত্রুদের ঠেকিয়ে রাখছে। আজ শহরত্যাগের শেষ দিন। সমুদ্রতীরের বালির স্তূপের মধ্যে ছোট ছোট সংঘর্ষ চলছে; যোদ্ধারা বালিয়াড়ির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে পরস্পরের

কাছে আসছে, তারপর আক্রমণ করছে হাত-বোমা, বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে। ইতিমধ্যে কুয়াশার শাদা শাদা স্তম্ভগুলো সূর্যের আলোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল।

লুসিয়ঁ একটা বালির স্তূপের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। দূরে সমুদ্রতীরের জল-সিক্ত বালিয়াড়ি। অর্ধনগ্ন লোকেরা হামাগুড়ি দিয়ে ডুব দিচ্ছে জলে। তাদের মধ্যে অনেকেই বুলেট-বিদ্ধ হয়েছে। অসংখ্য মাছের উল্লাসের মত ফুলে ফুলে উঠেছে সমুদ্র। আরও দূরে গোলা পড়ে জলের ফোয়ারা উঠেছে। একমাত্র বেপরোয়া সাহসিকতাই বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে। অন্যেরা আরও অদম্যসাহসী ও মরিয়া হয়ে বালির স্তূপের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাইফেল হাতে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করছে। এদিকে জার্মান বোমারুরা বোমা ফেলেছে সমুদ্রতীরে ও জলের ওপর। ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে; কেমন ঘোলাটে আর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে সমস্ত সমুদ্র।

শুকনো ঘাসের মধ্যে লুসিয়ঁ একটা হেলমেট নড়ে উঠতে দেখল; জার্মান সৈন্যরা হামাগুড়ি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে। হাত-বোমাটা ছুঁড়ে লাফিয়ে চিৎকার করে উঠল লুসিয়ঁ। বালির স্তূপগুলো সশব্দে ফেটে পড়ল আর তার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে যেতে কামানের গর্জনের মধ্যে মিশে গেল। একজন জার্মান এগিয়ে এল তার দিকে। লুসিয়ঁও বালিতে হোঁচট খেতে খেতে ছুটল। তারপর একই সঙ্গে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা, যেন আলিঙ্গন করছে।

ঐ জার্মান লোকটিকে কি করে পরাস্ত করল মনে নেই লুসিয়ঁর। এইটুকু তার মনে আছে যে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ভয়ানক কষ্ট হয়েছিল তার—হাত দিয়ে তার গলাটা টিপে ধরেছিল ঐ লোকটি। সরু হলেও তার হাতটা বেশ সবল, শিরাগুলো ফোলা ফোলা। লুসিয়ঁ হঠাৎ মনে মনে বলল, 'লোকটা নখ কাটেনি!' কিন্তু লোকটার মুখের দিকে সে তাকিয়ে দেখেনি পর্যন্ত। চুলোয় যাক ও!

কিন্তু এখন শেষ হাত-বোমা পর্যন্ত ফুরিয়ে গিয়েছে। ভিজে বালির ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল লুসিয়ঁ—অনেক দূরে সরে গিয়েছে সমুদ্র। ভাবল, অতদূর কক্ষনো যেতে পারবে না সে। তারপর জলে ডুব দিয়ে সাঁতার কাটতে লাগল। নিজেকে সে রক্ষা করতে চাইছে না: বুলেট আর গোলার কাছাকাছি

এগিয়ে যাচ্ছে সে। পরিশ্রমের ব্যথায় অর্ধেক খোলা আছে তার মুখটা। আর তার বাদামী চুলগুলো ঝলসে উঠছে আগুনের মত।

মৃত্যু আবার সরে গেল তার কাছ থেকে; সাঁতার কাটতে কাটতে লুসিয়ঁ একটা বৃটিশ মোটর-বোট পর্যন্ত পৌছল। তারা তাকে এক জোড়া ট্রাউজার আর এক বোতল হুইস্কি দিল। পান করতে করতে অভিশাপ দিল লুসিয়ঁ—স্বপ্ন কেটে গিয়েছে। একজন ইংরেজ ছেলেমানুষি হাসি হেসে ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে বলল, 'এই যুদ্ধ জিততে হবে আমাদের।'

লুসিয়ঁ মাথা নাড়াল। মনে মনে বলল, 'বাঁচতেই হবে। এই পথই সহজ। সহজ আর অনেক বেশী কষ্টকর।'

২৬

প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে পরস্পর কানাকানি করল। আনের প্রশান্তির কারণ খুঁজে পেল না তারা। কিছু লোক প্রশংসা করে বলল, 'একটা সবল চরিত্র বটে!' কেউ কেউ পরোক্ষে নিন্দা করাই পছন্দ করল, 'স্বামীর জন্যে ও এতটুকুও তোয়াক্কা করে না।' পড়ার খাতা পরীক্ষা করে, গাছের পাতা আর ফুলের কেশর এঁকে, ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে আর তুতুর জন্যে ছোট ছোট পায়জামা বুনে আনের সময় কাটতে লাগল। সরকারী হলদে খাম তার হস্তগত হওয়ার পর আনের জীবনে যেন কোন পরিবর্তনই ঘটেনি। ওরা তাকে ছয়শো ফ্রাঁ (উপার্জনকারীর মৃত্যুতে তার প্রাপ্য স্বরূপ) দিয়ে বলল, 'রসিদে সই করো।' আনের কলম এতটুকু কাঁপল না, চোখ দিয়েও জল পড়ল না এক ফোঁটা। তুতু বারবার জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায়। আনে জবাব দিল, 'শিগ্‌গিরই আসবে।' সকালে তুতুকে মেলানির কাছে নিয়ে যায় সে, আনে স্কুলে গেলে সেই তাকে দেখাশোনা করে। তুতুকে দেখে প্রায়ই কান্না পায় মেলানির। তুতু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কাঁদছ কেন?' সে উত্তর দেয়, 'দাঁত ব্যথা করছে।' আনে কোনদিন কাঁদে না। অতীতে পিয়েরই একমাত্র তার চরিত্রের সবলতা বুঝত, বলত, 'বুলেটের মুখোমুখি হতে পারবে ও।' শোক আর নিঃসঙ্গতা তার চেহারাকে পর্যন্ত বদলে দিয়েছে; তার দয়ার্দ্র ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো কেমন কঠিন হয়ে গেছে আর আগে যেখানে সে কুঁজো হয়ে চলত, এখন মাথা উঁচিয়ে চলে। বুড়ীরা কথা

বলাবলি করে, 'বসন্তের ডেজি ফুলের মত ফেটে পড়ছে ও। দেখে নিও, শিগগিরই ও আর একটা স্বামী পাকড়াবে।'

এমন কি রাত্রেও আনে কাঁদে না। চোখ খুলে ঘুমের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় শুয়ে থাকে; যা ঘটে গেছে তা বুঝবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। পিয়ের কিসের জন্যে প্রাণ দিল? এই চিন্তা তার মনে তোলপাড় করে। আনের মনে পড়ে—তাদের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজিত তর্ক হত। রাজনীতিতে পিয়েরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। ও বিপ্লবে বিশ্বাস করত আর স্পেনের প্রতিটি শহরের পতনে যন্ত্রণায় ছটফট করত। আনে ওর সঙ্গে একমত না হলেও এটুকু বুঝত যে ওর প্রকৃতি অত্যন্ত উৎসাহপ্রবণ আর সে জন্যে সে ঈর্ষা বোধ করত। পিয়ের স্পেনে যাবার পর আনে কেমন বিক্ষিপ্তচিত্ত হয়ে উঠেছিল, দরজা ঠোকার শব্দের জন্যে অপেক্ষা করত আর মনে মনে বলত, 'ও মারাও যেতে পারে।' তারপর যুদ্ধ এল আর ও চলে গেল কোন কোন কথা না বলে আশাহত হয়ে, হতভাগ্য মানুষের মত। স্টেশনে ও আনেকে বলেছিল, 'এ যুদ্ধ আমাদের যুদ্ধ নয়।' আর এখন অপরের যুদ্ধে কিনা তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। ওর শেষ চিন্তার কথা মনে মনে আঁচ করতে চেষ্টা করে আনে। আনে এবং তুতু? কিংবা অন্য যুদ্ধ, 'সত্যিকার' যুদ্ধের কথা? নিজের সঙ্গে বোঝা-পড়া করার, বুঝবার আর ন্যায়কে সন্ধান করার ব্যর্থ চেষ্টা করে আনে। সে উঠে দাঁড়িয়ে তুতুর দোলনার কাছে যায় আর অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুতুর নিশ্বাস-পতনের শব্দ শোনে। আচ্ছা, ওরা যদি তুতুকেও হত্যা করে? যে জীবন সে ফেলে এসেছে সেই বসন্ত-দিনের একমাত্র অবলম্বন তুতু।

কিন্তু প্রতিদিন সকালে সে অনেক সবল আর সতেজ হয়ে ক্লাশে যায়, তার রাত্রি-গুলি কিভাবে কাটে এতটুকু বুঝতে পারে না কেউ।

আনের এই সাহস সহজাত। কঠিন পরিশ্রম, জীবন-সংগ্রাম আর প্রিয়-জনের মৃত্যুতে অভ্যস্ত পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এ জিনিস সে আহরণ করেছে; পারীর উপকণ্ঠের ঘরগুলোর মত আনের পূর্ব-পুরুষরাও রাস্তার যুদ্ধের ধোঁয়ার মধ্যে লালিত হয়েছে। তার বাবা আনেকে বলত, যুদ্ধের সময় সে সারা দিন কাজ করেছে, পায়জামা জোড়া লাগিয়েছে, লাইটার বানিয়েছে, জোতদারের বাড়ীর জানলার ফ্রেম মেরামত করেছে আর ঘাস বোঝাই করেছে গাড়ীতে। আর তারপর হেসে বলত, 'বুঝলে, এই করে টিঁকে ছিলাম আমি।' ঠিক এ ভাবে আনেও নিজের জীবিকা চালাচ্ছে।

পথে পথে আশ্রয়প্রার্থীদের আবির্ভাব আর বোমা-বিধ্বস্ত গাড়ীতে শিশুদের ভীড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল আনে। পিয়েরের মৃত্যু বা দুদুর আসন্ন ভবিষ্যতের কথা ভেবে সে চিন্তিত হয়নি, কিন্তু তবু ভীত না হয়েও পারেনি। বিধ্বস্ত যন্ত্রটা তার যন্ত্রণা-ভারাক্রান্ত রাত্রিগুলির নিরবিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল তার মনে। আবার বাড়ীর জানলাগুলো সরু সরু কাগজের ফালিতে ছেয়ে গেল। একটা জটিল নক্‌সা সৃষ্টি করল আনে। তার জানলা দেখে মনে হল যেন তার সর্বাঙ্গ শিশিরে ঢেকে গিয়েছে—গোলাপ ফুল, তারা আর পামগাছের সমারোহ। দুদু জিজ্ঞাসা করল, 'ওটা কি?' আনে বলল, 'উড়োজাহাজ' আর তারপরই যোগ করল, 'ফুলের বাগান।' পিয়েরের ছোট বেলায় লেখা একটা কবিতা মনে পড়ল আনের, কবিতাটা তাকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল পিয়ের:

মৃত্যুর মুহূর্তে দেখা ভাগ্যের সে লতাজালখানি—
হেমন্তের জীর্ণ হাতে গেঁথে তোলা যৌবনের গ্লানি।

দিনগুলো গড়িয়ে চলল। ক্রমে ক্রমে আরও আশ্রয়প্রার্থী এসে ভীড় করল পারীতে। তাদের মধ্যে আছে লিলের অধিবাসী, ভালেঁসিয়েনের তাঁতী, লেঁ-র খনিমজুর আর পিকার্ডির চাষী। যে স্কুলে আনে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে সেই স্কুলবাড়ী তাদের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হল এবং আনে মনপ্রাণ ঢেলে দিল তার এই নতুন কাজে। দুদুকে নিয়ে স্কুলবাড়ীতে এসে আশ্রয় নিল। পীড়িতদের সেবা, খাবার আর ওষুধ দেওয়া, রান্না করা সবই করতে লাগল সে। একটা বিরাট পরিবারকে দেখা শোনা করছে যেন, তাদের সান্ত্বনা দিচ্ছে আর মন দিয়ে শুনছে তাদের দীর্ঘ অসংলগ্ন গল্প। ফুরমি-র এক মহিলা তাকে এ্যাডভেঞ্চারের গল্প বলেছে, 'ঠিক সাতটা তখন। কি জানি জার্মান উড়োজাহাজ কখন এসে পড়বে।' বাদামী রক্ত-রাঙা একটা কাঁথা আছে মহিলাটির কাছে, কাঁথাটা কখনো সে হাত-ছাড়া করেনি। মহিলাটি বলেছে, 'ও তখন পরিজ খেতে বসেছে। শয়তানের দল!' এক বেলজিয়ান মহিলা—খনি মজুরের বৌ—আনেকে বলেছে, কি করে পথে আসতে আসতে তার পাঁচ বছরের মেয়েকে হারিয়েছে সে। রুবের এক বুড়ো তার পুত্রবধূ আর নাতীদের তল্লাসে ফিরছে। আনে জিজ্ঞাসা করেছে, 'তোমরা চলে এলে কেন?' কেউ কেউ বলেছে, 'সে ভয়ানক অবস্থা। জার্মান বোমারুরা খুব নীচু থেকে একেবারে আমাদের মাঝামাঝি বোমা ফেলতে লাগল।' অন্তেরা বলেছে, 'জার্মানদের রাজত্বে থাকব? না, পুরনো অভিজ্ঞতা আছে আমাদের। গত যুদ্ধে চার বছর তাদের শাসনে কাটিয়েছি। পারীর লোকরা

কিছু জানে না বটে কিন্তু আমরা জানি। গত যুদ্ধে রুয়ের জার্মানরা যুদ্ধ-বন্দীদের গুলি করে মারত। আমাদের এলাকায় ওরা দুটো লোককে গ্রেপ্তার করে তাদের নিজেদের কবর খুঁড়তে বলেছিল। আর এমনিভাবেই প্রাণ দিল তারা। শিশুদের ওপর ওরা এতটুকু দয়ামায়া দেখাত না। অপদার্থ শয়তান কোথাকার! কোন কোন আশ্রয়প্রার্থী খোলাখুলিই বলেছে, 'আমারা দেখলাম প্রত্যেকে পালিয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আমরাও চলে এলাম।' একজন মজুরনী বলেছে, 'শহরে বেরজের এসে হাজির হল। আমরা সবাই জানি, ও লোকটা ফ্যাশিস্ট। ও চিৎকার করে বলল, যত তাড়াতাড়ি পার পালিয়ে যাও! না গেলে একেবারে মারা পড়বে। কিন্তু জার্মানদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ও নিজে ওখানে থেকে গেল। বিশ্বাসঘাতক!'

আশ্রয়প্রার্থীরা ক্রমেই বদলে বদলে যাচ্ছে। এক-একটা দলকে দক্ষিণাঞ্চলে পাঠিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন দল এসে উপস্থিত হচ্ছে। একমাত্র বুড়ো রিকে থেকে গেল। লোকটা অসুস্থ, কোন মতে পারী পর্যন্ত এসে পৌঁছতে পেরেছে। সে আনেকে বলল, 'অনেকদিন হল বুড়ী মারা গেছে। আমার ছেলেটাকেও ফৌজে নিয়ে গেছে। জানি না ও বেঁচে আছে কিনা। আমি তো একাই থাকতাম। সব পড়শীরা বলল—ঐ হারামজাদারা আসছে। চল, চলে যাই। আমার এমন ভাল খরগোস ছিল, সে সব ফেলে আসতে হল। কিন্তু আমার কুকুরটা সঙ্গে সঙ্গে এল, খাসা কুকুর কিন্তু। ওর নাম ফোলেৎ। বারো বছর থেকে ও আমার সঙ্গে আছে, একেবারে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। কঁপিএঞ-এ ওরা আমাদের ট্রেন থেকে নামিয়ে দিল। পায়ে হেঁটে আসতে হল। ঠিক আমাদের মাঝখানে বোমা ফেলল হারামজাদারা। গত বছরেও ঠিক এমনি করেছিল। সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমি যখন চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম, ফোলেৎকে দেখতে পেলাম না।'

আনে বহুবার লক্ষ্য করেছে, বুড়ো লোকটা যখন ঝিমোয় তখন তার ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে আর সে ফোলেৎকে ডাকে।

চমৎকার এক গ্রীষ্মের দিনে বোমারুরা পারীর উপর উড়ে এল। সমস্ত আকাশটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল গর্জনে। ঝন ঝন করে উঠল জানলার কাঁচগুলো। দুদু চিৎকার করে উঠল, 'বুম-বুম!' আনে আলু ছাড়াচ্ছিল। সে মুহূর্তের জন্যে ছুরিটা রেখে দিল, তারপর আবার মন দিল কাজে। তৎক্ষণাৎ লোকে ছুটতে ছুটতে ভেতরে এসে ঢুকল। 'দু-হাজার লোক মারা গেছে।' তারা খবর দিল।

আনে ভীত হয়ে হুহুকে হাতের মধ্যে তুলে ধরল। ভয় হল, এই লোকগুলো মেরে ফেলবে না তো হুহুকে? সঙ্গে সঙ্গেই লজ্জা পেল আনে। মনে মনে বলল, 'এখন আর আমার ভয় পাবার কি আছে?'

সন্ধ্যাবেলা নদীর ধারে বেড়াতে বার হল আনে। একটা বিরাট বাড়ীর ধ্বংসাবশেষের কাছে একদল লোক হাঁ করে তাকিয়ে আছে; উষ্মা প্রকাশ করছে আর ঠাট্টাতামাসা করছে। কে একজন বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'যাই বলো, কী নিখুঁত লক্ষ্য দেখেছ! জীবনটা যেন তার বিভিন্ন উপাদানে বিভক্ত হয়ে গেছে—পাথর, লোহা, কাঠ আর থাম। কার একজনের সই করা চামড়া-বাঁধা একটা বই আনের নজরে পড়ল। একটা দাঁড়ানো দেওয়ালের গায়ে বিয়ের পোষাক পরা কোন এক মহিলার ছবি। হঠাৎ শিশুদের দোলনা দেখতে পেল আনে—বারান্দার রেলিং-এর ওপর ঝুলছে। সে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল। ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর পাশে এক কাফেতে বসে লোকেরা মনের আনন্দে হাসছে, আর শত শত মদের পিপের বেঁকা নলগুলো ঝলমল করছে নীল আকাশের মত।

সে রাত্রে আনে আবার পিয়েরের সাক্ষাৎ পেল। বুঝল, ও আর কিছু ভাবছে না; অসুস্থ, শীত-শীত আর কেমন ফাঁকা বোধ করছে ও। পিয়েরকে উষ্ণ করে তুলতে চাইল সে কিন্তু পারল না; বিছানায় এদিক-ওদিক নড়ে চড়ে নিজের মনে মনে প্রলাপ বকল। ভোর হওয়ার আগেই গর্জন করে উঠল বিমান-বিধ্বংসী কামানগুলো। আর হুহু ঘুমে বিড় বিড় করে বলল কতকগুলি সরল ছেলেমানুষি কথা।

২৭

প্রচণ্ড উৎসাহে ঘুম থেকে উঠল তেসা।

জোলিওর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সাড়ম্বরে বলল, 'ওয়েগ্যাঁর সৈন্যবাহিনীর কাছে ওরা ছাতু হয়ে যাবে। তুমি কাগজে লিখতে পার যে সবেমাত্র একটা বিরাট যুদ্ধের সূচনা হয়েছে।'

জোলিও বলল, 'কথা বলা অনেক সহজ –কিন্তু আসলে ওটা প্রশ্নই নয়। আপনি উপহাস করতে পারেন কিন্তু আমি যে গোঁড়া একথাটা কোনদিন গোপন করিনি। ভগবানের নামে বলছি ওরাই তো জার্মানদের ডেকে এনেছে। 'ওরা আসবে!'

'ওরা আসবে।' কথাটা কতবার বলা হয়েছে ভাবুন তো। আর এখন সত্যিই ওরা এসেছে।'

'ওসব বুড়ীদের কথা। ওরা যে আসেনি—এই সত্যি কথাটা মেনে নিয়েই কাজ আরম্ভ করা যাক। এখন সম্-এর ধারে যুদ্ধ চলছে।'

'হতে পারে। জায়গাটায় যাইনি কোনদিন। কিন্তু একটা কথা খুব ভাল করেই জানি যে গতকাল ওরা মার্সাই-এর ওপর বোমা ফেলেছে। ব্যাপারটা বুঝলেন? মার্সাই ফ্রান্সের অপর এক প্রান্তে। কে ভাবতে পেরেছিল ওদের এতটা সাহস হবে? ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে কাল কিংবা পরশু ইতালিয়ানরা আক্রমণ শুরু করবে। আর ওয়েগ্যাঁ তার সৈন্যবাহিনীকেও ইতালিয়ান সীমান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এখন সম্ নিয়ে কি আঙুল চুষব আমরা?'

নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ত ভঙ্গীতে হাত নাড়ল তেসা। তারপর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইতালিয়ান রেডিওর ঘোষণা শুনেছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগেই শুনেছি। ওরা কিন্তু একেবারে নীরব। মানে, ওরা পম্পেইর চিত্রের ওপর বক্তৃতা দিচ্ছে। লক্ষণ সুবিধার নয়।'

'চিত্র?' তেসা হাসল, 'ঠিক ভীইয়ারের মনের মত জিনিস। হ্যাঁ ভাল কথা, 'শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাটি' তার মালপত্তর বাক্সবন্দী করে ফেলেছে। মনে হয় কেটে পড়বার তালে আছে ও। আচ্ছা, বিদায়! সন্ধ্যাবেলা এসে একবার দেখা কোরো আমার সঙ্গে। কিছু ভাল খবর দিতে পারব হয়ত।'

তেসা মনে মনে মন্ত্রীসভার আংশিক পুনর্গঠন সম্পর্কে চিন্তা করছিল।

সবেমাত্র সে 'রিগোলেত্তো' থেকে একটা সুর শিস দিতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় পিকাব্ এসে হাজির—একরকম অনাহূত হয়েই। তেসা তার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়েই বুঝল, ব্যাপারটা সুবিধার নয়। পিকাব্ বলল, 'জার্মানরা সম-এর প্রতিরোধ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। রুয়ের দিকে এগিয়ে আসছে ওদের ট্যাঙ্কবাহিনী। দু-তিন দিনের মধ্যে সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়ে যাবে।'

তারপর বলল, 'একমাত্র পাগলরাই প্যারী প্রতিরোধ করার কথা ভাবতে পারে।'

তেসা মাথা ঝাঁকুনি দিল। কেমন বিষণ্ণ আর গম্ভীর দেখাল তার মুখখানা।

ঠিক এমনি মুখভঙ্গী করেই সে মন্ত্রী বা সেনেটরদের শবযাত্রায় যোগদান করে। নীরবে পিকারের করমর্দন করল। জেনারেল চলে যাবার পর তেসা মনে মনে বলল, 'এই মুহূর্তগুলি মারাত্মক! আমরা আলোচনা করেছি, চিন্তিত হয়েছি আর আশা করেছি আর এখন শেষ অঙ্কের অভিনয় প্রত্যক্ষ করছি।' তার এই উপলব্ধিকে অন্য কারও সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইল সে কিন্তু আতঙ্ক সৃষ্টি করাটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

মন্ত্রীদের সভায় পৌঁছনোর পর তেসা ফ্রান্সের ভাগ্যর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হল। মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। কতকগুলি নিয়োগ যে অত্যন্ত সার্থক হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৈদেশিক নীতি যে বোদুয়ঁার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এটা সত্যিই একটা কাজের মত কাজ। গুপ্তচর বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হয়েছে তেসার বন্ধু প্রুভস্ত। অন্যদিকে দেল্বর নিয়োগে সে মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এ নিশ্চয়ই একটা চক্রান্ত—সবাই জানে দেল্ব ক্রুজের বন্ধু। তার চেয়েও বেশী বিরক্ত হল সে গ্রগলকে জাতীয় প্রতিরোধ বিভাগের সহকারী সম্পাদকপদে অধিষ্ঠিত হতে দেখে। স্রেফ পাগলামি! দায়িত্বশীল পদে একজন দুঃসাহসীকে বসানোটা কী বিপজ্জনক!

তেসা নিজের চিন্তার মধ্যে এতটা ডুবে আছে যে অন্যদের কথায় কর্ণপাত করছে না। ওরা ফ্রণ্টের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছে। পিকারের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তেসা রেনোকে বলল, 'আপনি কিসের ওপর ভরসা করছেন?'

রেনো বলল যে ম্যাজিনো লাইন আর ইতালিয়ান ফ্রণ্ট থেকে নতুন সৈন্য আসছে। বৃটিশরা কিছু ডিভিশন পাঠাবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গত কাল রেনো নিজে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছে।

তেসা বিরক্ত হয়ে ভুরু কোঁচকাল। বলল, 'আমার বক্তব্য হল, জার্মানরা যখন পারীতে এসে পৌঁছবে তখন কী করবেন আপনি?'

রেনা উত্তর দিল, গভর্নমেণ্টকে তুর-এ স্থানান্তরিত করা হবে, দরকার হলে সেখান থেকে বোর্দোয় নিয়ে যাওয়াও যেতে পারে।

'আর তারপর?'

'সে রকম অবস্থায় পড়লে আলজিরার্স-এ চলে যাব। আমাদের হাতে নৌবাহিনী আর উপনিবেশ আছে।'

তেসা নিরুত্তর রইল: পাগলের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। আসলে এ একটা গবর্নমেন্টই নয়, আত্মহত্যা সমিতি মাত্র। ব্রতৈলই তেসাকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু সে তা করবে না। 'মন্ত্রশিষ্য'দের ইস্তাহারের কথা মনে পড়ল তেসার, সে চোখ বুজল—কেমন ভয় হচ্ছে তার।

তেসা তবু ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করতে গেল: দুশ্চিন্তার চেয়ে মৃত্যুও ভাল। ব্রতৈলও যদি তাকে সাহায্য না করে তাহলে ফুক্তের সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় আসবে সে—কিংবা আমেরিকায় চলে যাবে।

স্থির হয়ে লেখবার টেবিলের ধারে বসে আছে ব্রতৈল। কেমন ঋজু আর উদ্ধত দেখাচ্ছে তাকে, যেন 'পোজ' করে আছে।

সেদিন সকালে একটা বিশ্রী ঘটনা হয়ে গেছে তার স্ত্রীর সঙ্গে। চোখের জলে ফেটে পড়ে তার স্ত্রী বলেছে, 'জার্মানরা পারী অধিকার করবে। এইই তো তুমি চেয়েছিলে। পশু!' রাজনৈতিক শত্রুদের আঘাতে ব্রতৈল বিচলিত হয় না; সে জানে দুকান আর ফুক্তে সমস্ত দোষ তার ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। যেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা যে একটা অপরাধ এ সম্পর্কে আগে থেকে সতর্ক করে দেয়নি ব্রতৈল! কিন্তু যে স্ত্রী তার ছেলের স্মৃতি মনে পড়ায় চিৎকার করে উঠেছে, 'তুমিই তাকে খুন করেছ! সবাইকে খুন করেছ তুমি!' তাকে সে কী উত্তর দেবে!

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ব্রতৈল। আত্মসমর্পণ, শান্তি ..... কিন্তু তারপর? গতকালকার শত্রুরা কি বুঝবে যে ফ্রান্স ঠিক আলবানিয়া বা এমন কি চেকোশ্লোভাকিয়ার মতও নয়? হয়ত বুঝবে না ওরা: কারণ ওরা আলাদা জাতের মানুষ, সম্পূর্ণ আলাদা মানসিক গঠন ওদের। তার পরেই পরিসমাপ্তি। লোরেন, তার আপনার দেশ লোরেন জার্মানীর হাতে তুলে দেওয়া হবে! আগামী যুগের মানুষ ব্রতৈলের নামকে অভিশাপ দেবে। ওদের চোখে ঐ ভাঁড় দুকানটাই হবে প্রধান নায়ক।

সামনের দিকে না তাকিয়েই ব্রতৈল বহু বছর কাটিয়ে এসেছে। একটিমাত্র উপলব্ধি যা তার মনকে প্রভাবান্বিত করেছিল তা হল পপুলার ফ্রন্টের প্রতি ঘৃণা। হিটলার, মুসোলিনী ও ফ্রাঙ্কোর সাফল্য তার কাছে নিজের সাফল্য বলে মনে হয়েছিল। বেনেস যে এখন আর প্রাগে নেই এতে রীতিমত খুশি হয়েছিল সে। এবং ওলন্দাজ সরকারের সাম্প্রতিক

ঘোষণা শুনে সে এই ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল যে সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা আবার পিছু হটছে।

তাহলে হঠাৎ সে এত অস্থির হয়ে উঠল কেন? ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্নায়বিক। তাকে নিজেকেই সমস্ত কিছু শাসন করতে হবে। এবার সমস্ত সরকারী কর্তৃত্ব তারই হাতে আসবে। এই পার্লামেন্টকে ভেঙে দেবে সে; শান্তি ফিরিয়ে আনবে। অনেক অসম্মান, দুঃখ ও চোখের জল দিয়ে মূল্য দিতে হবে এর। তবুও এই নতুন ফ্রান্স—হোক সে শোকসন্তপ্তা বিধবা বা কৃচ্ছ্রসাধিকার মত—'বিদূষক মারিয়ান'-এর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দর মনে হবে তাকে।

তেসা যখন এসে পৌঁছল তখন স্ত্রীর ভর্ৎসনা আর নিজের ভীরুতার কথা সমস্তই ভুলে গিয়েছে ব্রতৈল। কেমন নিরুৎসাহ ও উদাসীন দেখাচ্ছে তাকে।

'ওদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' তেসা চিৎকার করে উঠল। 'ঐ আহাম্মকটা ম্যাডাগাস্কারে যাবার প্রস্তাব করছে—সেখানকার অগম্য জঙ্গলগুলোয় ঘুরবার লোভ আছে ওর। কিন্তু এদিকে জার্মানরা রুয়েঁতে এসে পৌঁচচ্ছে। আমাদের একটা কিছু করতেই হবে। অত্যন্ত অল্প সময়ই হাতে আছে।'

'আমি তোমাকে আগেই সতর্ক করে দিইনি?'

'আমাকে সতর্ক করে দিয়েছিলে? কি ভাবে? আমায় মন্ত্রীসভায় থাকবার পরামর্শ কে দিয়েছিল? তুমি। আর এখন সমস্ত কিছু থেকে সরে পড়তে চাও, কি বল?' তেসা অঙ্গভঙ্গী করে চারদিকে নাচতে লাগল। 'আমি জানি, তোমার 'মন্ত্রশিষ্যরা' আমার খুব বিরোধী। কিন্তু ও সমস্তই ভুল বোঝাবুঝির ফল। ব্যাপারটা তুমি তাদের বুঝিয়ে বোলো। তোমার সাহায্য পেয়েই আমি চেম্বারে নির্বাচিত হয়েছিলাম। এই সংকটের সময়ে তুমি তোমার বন্ধুদের ছেঁটে ফেলতে পার না!'

'অকারণে উত্তেজিত হচ্ছ।' ব্রতৈল বলল। 'আমি বলছিলাম যে, প্রতিরোধের ব্যর্থতা সম্বন্ধে তোমায় সতর্ক করেছিলাম আমি। কিন্তু জাতীয়তাবাদীরা তোমায় খুব শ্রদ্ধা করে। এখানে সবাই তোমার আপন জন। কোন ভয় নেই। সমস্ত পরিস্থিতিটা আমাদের আলোচনা করে দেখা দরকার। নতুন গভর্নমেণ্টে কাকে কাকে নেওয়া হবে তাও ভাবতে হবে।'

'মন্ত্রীসভা আজ পুনর্গঠিত হয়েছে।'

'এটা স্রেফ একটা তালির ওপর আরেকটা তালি লাগানো। আমি নতুন গভর্নমেণ্ট সম্পর্কেই বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই আপোষের কথা উঠবে।

সুতরাং একটা শক্তিশালী গভর্নমেণ্ট অপরিহার্য। কমিউনিস্টরা কোন দুর্বলতা পেলেই তার সুবিধা নেবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব নেবে মার্শাল। তাছাড়া নামটাও চমৎকার—ভের্দ্যুর বীর। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করে ফেলা যেতে পারে।'

'রেনোর কী হবে?'

'ও সরে পড়বে। নইলে আমরাই ওকে রাজদূত করে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেব। তাহলে ওই বুড়োকেই সর্দার হিসেবে পাব আমরা। তারপর লাভাল তো আছেই। আমিও আছি। পুরনো মন্ত্রীদের মধ্যেও দু-একজনকে ডাকব আমরা।'

'আমার মনে হয় বোদুয়াঁকে বাদ দেওয়াই উচিত।'

'ঠিক। ইতালিয়ানরা ওকে বড় বেশী পছন্দ করে। তারপর প্রুভস্ত রয়েছে। ও তো শিল্পপতিদের প্রতিনিধি। মিয়েরজাবের ধারণা ও খুব কর্মিৎকর্মা। তালিকায় তোমাকেও আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি।'

তেসা তার আনন্দ গোপন করতে পারল না, কিন্তু বিনয় দেখাবার জন্যে মুখে বলল, 'আমি বুড়ো হয়ে গেছি। যোয়ান দেখে কাউকে নেওয়াটাই উচিত।'

'না, তুমি খুব কাজে লাগবে। মন্ত্রীসভার পুনর্গঠনকে কিন্তু শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন বলে ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। এখন অবস্থাকে আয়ত্তে আনাটাই একটা মস্ত বড় কাজ। কিন্তু তোমার সঙ্গে সবাই পরিচিত। অনেকে বলতে পারে যে ফ্রান্সের সাধারণ লোকের কাছে তুমিই একমাত্র ভরসা যে কোন কিছুর পরিবর্তন ঘটবে না। এই সময়ে সব চেয়ে জরুরী কাজ হল দেশকে শান্ত করা।'

তেসা ঝলসে উঠল। ঐ বদমাশ ফুজেটারই কাণ্ড। ঐ ইস্তাহারটা একেবারে ভাঁওতা। ব্রতৈল বুঝল, তেসা সত্যিই একজন খাঁটি ফরাসী। আর তেসাও তার সাম্প্রতিক দুশ্চিন্তার কথা ভুলে গিয়ে নতুন মন্ত্রীসভার কর্মপদ্ধতি আলোচনা করতে বসল।

'আমরা যদি মন্ত্রীসভার বিবৃতিতেই ঘোষণা করি যে আপোস আলোচনা করতে আমরা প্রস্তুত আছি তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত।' তেসা বলল, 'আমার শুধু ভয় হচ্ছে যে জার্মানরা অতিরিক্ত দাবীদাওয়া পেশ করবে। এই অপূর্ব জয়লাভে মাথা ঘুরে যাবে ওদের। কিন্তু ওদের বুঝিয়ে রাজী করাতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে। তোমার তালিকা থেকে একটা নাম বাদ গেছে কিন্তু, বুঝলে। অবশ্য আমি যা বলছি তা রীতিমত

দুঃসাহসিক কাজ। অনেকের কাছে বিপজ্জনক কাজও বটে। কিন্তু এই সংকটের সময়ে অনেক বেশী সহনশীল হতে হবে।'

'ভীইয়ারের কথা বলছ ?'

'ভীইয়ার ?' তেসা বিস্মিত চোখে ব্রতৈলের দিকে তাকাল। 'ঐ বেতো ঘোড়াটা! ভাল কথা, ও বোধ হয় কেটে পড়েছে। না আমি গ্রঁদেলের কথা ভাবছিলাম। তুমি আমি পুরনো বন্ধু, আমরা মন খুলেই কথা বলতে পারি। অবশ্য ঐ দলিলের কথাটা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার......'

ব্রতৈল ক্রুদ্ধ হয়ে রুল দিয়ে টেবিলে বাড়ি মারল।

বলল, 'আমি আগেই বলেছি ওটা একেবারে জাল। এই সময়ে এমনি ইতরামির কথা কেন মনে হল তোমার ?'

'আমায় ভুল বুঝেছ। কথাটা আমি ওকে ছোট করার জন্যে বলিনি। বরং তার উলটোটাই। বার্লিনে গ্রঁদেলের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। বর্তমান সময়ে ওর মত লোক অপরিহার্য......'

ব্রতৈল নীরস কেতাদুরস্ত গলায় উত্তর দিল, 'আমার মতে অনুমান করে লাভ নেই। অবশ্য বাইরে গ্রঁদেলের নাম আছে। লোকটা সুবক্তা আর পণ্ডিত। আমাদের গভর্নমেণ্টে ও খুব কাজে আসবে। কিন্তু পারীতে কারও থাকা উচিত। একজন বড় রকমের রাজনীতিজ্ঞকে থাকতে হবে পারীতে। লাভাল আর আমাকে তো ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্যে রেনোর পিছু পিছু যেতে হবে। তোমাকেও আমি পারীতে থাকতে বলতে পারি না। পালামেণ্টারী দলগুলো সম্বন্ধে তুমি জানো শোনো সুতরাং তুমি আরো বেশী প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এই দুরূহ অবস্থার মধ্যে তোমায় ফেলে যেতে চাই না—একজন ফরাসীর পক্ষে পারীতে বিদেশী সৈন্যবাহিনীর উপস্থিতিটা একটা সহজ কথা নয়। আর তাছাড়া তোমাকে না পেলে জার্মানরা মোটেই দুঃখিত হবে না। ওদের পক্ষে আমাদের সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি বুঝে ওঠা রীতিমত শক্ত ব্যাপার। ওরা তোমাকে পপুলার ফ্রণ্টের পুতুল বলে মনে করে, বজ্রমুষ্টিওলা এক মানুষ.........'

ছোট হয়ে গেল তেসার মুখখানা। দীর্ঘ সময় তারা দুজনেই চুপ করে বসে রইল। পাশের ঘরে ব্রতৈলের বৌ কাঁদছে আর ব্রতৈল তার ফোঁপানি শুনে ভুরু কোঁচকাচ্ছে থেকে থেকে। অবশেষে তেসা কথা বলল, 'কী মনে হয় তোমার ? ওরা কি খুব শিগগির এসে পড়বে ?'

'কয়েকটা দিনের ব্যবধান মাত্র, হয়ত কয়েক ঘণ্টা.........'

ব্রৈতেলের কাছ থেকে ফিরে এসে বিমূঢ় বোধ করল তেসা। নতুন মন্ত্রীসভায় সে যে একটা পদ পাবে—এ চিন্তা তাকে আর এতটুকুও খুশি করে তুলল না। জগৎটা কেমন দুর্বোধ্য আর প্রতিকূল বলে মনে হল। আচ্ছা, রেনো যদি জানতে পারে যে, সে ব্রৈতেলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় এসেছে? মান্দেল সব কিছু করতে পারে: তাকে গ্রেপ্তার করাব হুকুম দিতে পাবে, গুলিও করতে পারে। তাবা বিশ্বাসঘাতক বলে তাকে অবজ্ঞা করবে। আব জার্মানরা তো তাকে প্রায় কমিউনিস্ট বলেই মনে কবে। রাজনীতিটাই জঘন্য ব্যাপার। সৈন্যরাই বেশ সুখে আছে—ওরা অন্তত জানে যে শত্রু কোথায়। কিন্তু তেসার শত্রু তো সর্বত্র ....

তেসা কুঁজো হয়ে বসল। তাব সেক্রেটারী দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল, 'বৃহস্পতিবাবেব অভ্যর্থনাব আয়োজনটা আমি সেরে রেখেছি।'
তেসা মনে মনে বলল, 'আহা বেচারীরা! ওরা জানেই না যে বৃহস্পতিবার জার্মানরা এসে পড়বে এখানে। কেউ কিছু জানে না......' বেড়াতে যাবে বলে স্থির করল তেসা। হয়ত টাটকা হাওয়ায় তাব বমি বমি ভাবটা কেটে যাবে। অন্ধকার শহরটা কেমন অসহ্য লাগছে। চারদিকে আর্তনাদ, চিৎকার আর দুর্বোধ্য শব্দ। দেউড়িগুলোতে ভীড় করছে লোকে। নানা বকম টিপ্পনি কানে এল তেসার:
'ওরা বলছে গামলাঁ্য নাকি গুলি করে আত্মহত্যা করেছে।'
'রেনো তো সরে পড়েছে আমেরিকায়।'
'ওরা সবাই পালাবে আর আমাদেরই এখানে থেকে সমস্ত জঞ্জাল সাফ করতে হবে।'

'জার্মানদের আমি ভয় পাই না। আমার আর কী? আমি কেউ নই। জার্মানরা আমাকে ছোঁবেও না। আমার ভয় কেবল বোমাকে।'
'সাংঘাতিক জীব ঐ জার্মানরা! বাবার কাছে শুনেছি ওরা কি ভাবে ১৯১৫ সালে আমার কাকা জাক্‌কে জ্যান্ত কবর দিয়েছিল।'
'তেসা তো হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করে ফেলেছে।'
কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। অন্ধকারে ল্যাম্পপোস্টের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল তেসা। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে তার। কল্পনায় রাস্তার ওপর সৈন্যবাহিনীর পদধ্বনি শুনল সে। চোখ বন্ধ করে নিজের আর্তনাদকে বাধা

দিতে চাইল তেসা। কার পদধ্বনি? কোথাও কিছু নেই, চাঁদোয়ার ওপর ভাবী বৃষ্টির ফোঁটা ফেটে ফেটে পড়ছে।

তার সারা জীবনে কখনো সে এত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেনি। কোন মতে দপ্তরখানার দরজা পর্যন্ত দৌড়ে গেল। নিজের পড়ার ঘরে ঝলমলে আলো দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল শিশুর মত।

তারপর বিমান-বিধ্বংসী কামানের গর্জন শুরু হল। জানলার কাছে ছুটে গিয়ে আবার পিছু হটে এল। পারীর দিকে এগিয়ে আসছে জার্মানরা। ওদের বিশ্বাস—সে একজন কমিউনিস্ট। এদিকে শ্রমিকরা বলছে, সে হিটলারের সঙ্গে একটা গোপন চুক্তি করেছে। প্রত্যেকে তার বিরুদ্ধে। ওরা তাকে গুলি করে মারবে। কিংবা পীড়ন করবে। ও কিসের বিস্ফোরণ! নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও বোমা ফেটেছে। একেবারে দপ্তরখানার ওপর লক্ষ্য করেছে ওরা। পাঁচশো পাউণ্ডের এক বোমা। সে মরে গেলে তার দেহকে পর্যন্ত সনাক্ত করতে পারবে না লোকে। একটা কিছু করা দরকার! নিরাপদ আশ্রয়ের চেষ্টা করা উচিত।

কি করবে ভেবে না পেয়ে ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল তেসা। বসে পড়ে লাফিয়ে উঠল আবার। মনে হল সর্বাঙ্গ হিম হয়ে আসছে। শেষে সেক্রেটারীকে টেলিফোন করে আদেশ দিল, 'গাড়ীটা তৈরী রাখ। পেট্রল যেন প্রচুর থাকে। মফস্বলে গিয়ে বিশ্রাম নেব আমি।'

তেসার প্রতিশ্রুত ভাল খবরের জন্যে জোলিও যখন সাড়ে আটটার সময় উপস্থিত হল, তাকে বলা হল, 'মন্ত্রীমশাই মফস্বলে চলে গিয়েছেন।' জোলিও আর কোন প্রশ্ন না করে বাড়ীর দিকে দৌড়ল। বৌকে গিয়ে বলল, 'মারি! এক্ষুনি চলে যেতে হবে আমাদের। জোচ্চোরটা ইতিমধ্যে কেটে পড়েছে। হারামজাদা! সকালবেলা ও বলছিল, কী সুন্দর বাগান! এক সময়ে ওরা বলত—ইঁদুররা জাহাজ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। ক্যাপ্টেনরাই সরে পড়ছে। ইঁদুরদের ভাগ্য তাদের হাতেই ছেড়ে দিয়ে ওরা চলে যাচ্ছে। কিন্তু ইঁদুররাও বোকা নয়। চল চল, চটপট সেরে নাও!'

২৮

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জিনেৎকে কেমন বিমর্ষ আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। বাস্তবিকই কোন কিছুতে আগ্রহ বা কৌতূহল নেই তার। কঠিন পীড়াগ্রস্ত রোগীর অর্ধ-বিকারের মত তার জীবন। দেসেরের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর যে শূন্যতা সে বোধ করেছিল তা এখন প্রবল ও শ্বাসরোধী হয়ে উঠেছে।

স্টুডিওতে তার কাজ করে যাচ্ছে জিনেৎ। চারপাশের লোকের মুখে যুদ্ধের কথাবার্তা; খবরের কাগজের শেষ সংস্করণগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায় তাদের মধ্যে। এইসব কথাবার্তায় কান দেয় না সে। আগের মতই সে তার কৃত্রিম অর্থপূর্ণ কণ্ঠস্বরে ওষুধের বড়ি আর মদের প্রশস্তি গায় এবং তারপর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে গাছপালা, নিস্তব্ধতা আর বাতাস সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলে যে-সব সম্পর্কে কারও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বহুদিন হল জিনেৎ বিজ্ঞাপন থেকে কবিতাকে আলাদা করে চিনতে পারে না। এমন কি নিজের পালা আসার আগে ঘোষকরা যে সব কথা বলে তাও যেন তার কাছে কতকগুলো বিচিত্র কোম্পানীর বিজ্ঞাপন বলে মনে হয়: এত টন রেজিস্ট্রীকৃত জাহাজ ডুবে গিয়েছে ....তেলের দাগ দেখা গিয়েছে জলের ওপর।

শহরের ব্যস্ততা আর কোলাহলের মধ্যে নিজেকে ভুলে থাকার উদ্দেশ্যে রবিবার দিন সে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াল। কী চমৎকার দিন! পারী-বাসীরাও হতাশা-ম্লান গুজবের কথা ভুলে গিয়ে বোয়া দ্য বুলোঞ-এ ভীড় করেছে—টেনিস খেলছে, জলের ওপর নৌকা বাইছে বা ছায়াঘন কাফেতে বসে বসে সবুজ পুদিনার আরক বা কমলালেবুর সোনালী সরবত পান করছে। ছোট ছোট ছেলেরা বালি দিয়ে চমৎকার কচুরি তৈরী করছে। একটা ছটফটে কালো পাখী দেখতে পেল জিনেৎ। পাখীটা ঠোঁট দিয়ে ডানা ঠোকরাচ্ছে। জিনেৎ ক্লান্তভাবে ডাকল, 'কালো পাখী', সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গেল পাখীটা। এক অন্ধকার এভেন্যুএ সে এক দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল—একটি সৈনিক আর একটি বিস্রম্ভালাপরত মেয়ে—মুখে তিলের দাগ আর পরনে গোলাপী রঙের ফ্রক। সৈনিকটির অত্যন্ত ছেলেমানুষি গম্ভীর মুখ আর কালো গোঁফ। লোকটি টিনের টুপিটা হাতে ধরে আছে আর মেয়েটি কাঁদছে। সৈনিকটি বলল, 'দেখে নিও, এর ফল ভালই হবে।' জিনেৎ কেমন একটা ঈর্ষার জ্বালা বোধ করল। এমনিভাবে বিদায় গ্রহণ

করতে পারাটা কী সুখের! আর তাকে ছেড়ে চলে যাবার সময় কোন আশ্বাস, চোখের জল, এমন কি দুঃখ কোন কিছুই ছিল না।

সোমবার সকালে জানলার সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ করে বাড়ীতে বসে রইল জিনেৎ। আলোর মুখোমুখি হতে চায় না সে। কিন্তু বিকেলে বাইরে বেরিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। পারীকে যেন একেবারেই চেনা যায় না। দোকান পাট আর কাফেগুলো সমস্তই বন্ধ। কাঁপা হাতে লেখা 'দোকানবন্ধ'-এর ছোট ছোট শাদা বিজ্ঞপ্তি দরজাগুলোয় আঁটা। কতকগুলি বাড়ীতে লোকেরা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে জানলায় কাঠ লাগাচ্ছে বা তোরঙ্গ, বাণ্ডিল আর অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে-বাধা পার্সেল বের করে আনছে। রাস্তা পার হওয়া অসম্ভব; সীমাহীন মোটরের সারি এগিয়ে চলেছে। গাড়ীর মাথাগুলো তোষকে বোঝাই, জানলার বাইরে সন্ত্রস্ত ও অশ্রু-লাঞ্ছিত মুখ।

মাত্র গতকাল পারীবাসীরা আশ্রয়প্রার্থীদের জিজ্ঞাসা করছিল, 'কেন তোমরা আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলে না? ওয়েগাঁ্যা লাইনের কী খবর?' আর এখন তারাই চলে যাচ্ছে। রেল স্টেশনে গিয়ে ভীড় করছে, লরির ছাদে উঠছে আর তাদের বাঁচাবার জন্যে ড্রাইভারদের কাকুতি মিনতি করছে। প্রতি ঘণ্টায় শহর ক্রমশ জনশূন্য হয়ে উঠছে—ঠিক একটা শতচ্ছিন্ন বস্তা থেকে ময়দা ঝরে পড়ার মত।

দপ্তরখানার অবসরভাতা বিভাগের সামনে লরিগুলো দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন কারণেই হোক টেবিল, কাপ প্লেট রাখবার আলমারি আর ডেস্কগুলো ফুটপাথে এনে রাখা হয়েছে। এক বুড়ী একঘেয়ে গ্রামোফোন রেকর্ডের মত বলে চলেছে, 'আমাকে নিয়ে চল! আমাকেও নিয়ে চল!'

ভীত হয়ে জিনেৎ জিজ্ঞাসা করল, 'ইস! এসব কী ব্যাপার '

উদ্দেশ্যহীনভাবে তাকিয়ে থেকে বুড়ী উত্তর দিল, 'জানো না বুঝি? জার্মানরা রুয়েঁতে এসে পড়েছে।' বুড়ীর হাত থেকে ব্যাগটা পড়ে গিয়ে সমস্ত জিনিস রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল—এক দলা উল, একটা তোয়ালে, মোমবাতি আর কমলালেবু। কাঁদতে লাগল বুড়ীটা। সঙ্গে সঙ্গে জিনেৎও কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছু একটা করা দরকার। খুব শিগগিরই জার্মানরা এখানে এসে পড়বে। বোমা ফেলবে আর গুলি করবে ওরা। জিনেৎ ছুটতে লাগল। জিনেৎ আর জিনেৎ নেই, সে যেন হতাশা-ম্লান পথে উড়ে-চলা খড়ের একটা কুটো মাত্র।

জিনেৎ হঠাৎ থেমে দাঁড়াল—কোথায় যাবে সে? বিষণ্ণ লিয়ঁ আর বাবার রুদ্ধ জীর্ণ মুখখানার কথা মনে পড়ল তার। তারপর মনে পড়ল ক্ল্যারিব কথা—আঙুরক্ষেতের নীল পত্রগুচ্ছ, উষ্ণ দিন আর মাছির গুঞ্জন-ক্লান্ত নিস্তব্ধতা। বাঁচতে চাইল সে। এমন করে এর আগে আর সে বাঁচতে চায়নি। যে জীবন নির্মম ছিল, তা-ই মধুর বলে মনে হল জিনেতের কাছে। হ্যাঁ, এখান থেকে চলে যাবে সে।

গার দ্যু লিয়ঁতে গিয়ে উপস্থিত হল। স্টেশনে পৌঁছবার বহু আগে থেকেই দীর্ঘ রাস্তাটা মানুষের ভীড়ে ঠাসা। স্টেশনের প্রাঙ্গনে ঢোকাই একটা অসম্ভব ব্যাপার। পুলিশের বিরাট বাহিনী পর্যন্ত ভীড়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। জনতা চিৎকার করছে আর অঙ্গভঙ্গী করছে, 'শালা অপদার্থ! নিজেরা পালিয়ে গিয়ে আমাদের পেছনে ফেলে গেছে! বিশ্বাসঘাতক! ইঁদুরের মত ফাঁদে ধরা পড়ে গেছি আমরা।'

পুলিশরা ভাসা-ভাসা উত্তর দিচ্ছে যে সন্ধ্যা নাগাদ আরো ট্রেন আসবে। ক্ষুধার্ত আর দুর্বল হয়ে লোকে রাত্রের আহারের সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করল। যে সমস্ত দোকান এখনো খোলা আছে সেগুলোর তল্লাশে বের হল কিংবা ফুটপাথে বসে বসে সামান্য জলখাবার খেয়ে উদরপূর্তি করতে লাগল। এক বুড়ো মজুর এক টুকরো ছোট রুটির সঙ্গে কয়েক টুকরো সসেজ জিনেতের হাতে দিল। জিনেৎ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাইল কিন্তু কথা বলতে পারল না। নিজের ঠোঁট দুটো নাড়াল মাত্র। কিছু খেতেও পারল না; মনে হল আগুনের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে সে।

অন্যদিনের চেয়ে অনেক আগে রাত্রি এল; সারা শহরের ওপর কালো শবাস্তরণের মত ঝুলে রইল রাত্রি। লোকে বলল রুয়েঁতে আগুন জ্বলছে। কে যেন তাকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বলল—ওটা শত্রুপক্ষকে আড়াল করে রাখার জন্যে ধোঁয়ার জাল মাত্র। অন্ধকারে মেয়েরা বন্য আর্তনাদ করে উঠল থেকে থেকে। জিনেতের মনে হল শ্বাসরোধ হয়ে মারা যাবে সে। সকালে, ভোরবেলার প্রথম অস্পষ্ট আলোয় আরো লোক এসে ভীড় করল স্টেশনে। কিন্তু স্টেশনে একটা গাড়ীরও দেখা নেই।

জিনেৎ রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে নদীর ধারে এসে পৌঁছল। তার ভয়-চকিত বীভৎস চোখের দিকে আর কেউ তাকিয়েও দেখছে না: এখন সবার চোখই তার মত হয়ে উঠেছে। লোকেরা পথচারীদের থামিয়ে জিজ্ঞাসা করছে কোথায়

স্যুটকেশ আর হাতগাড়ী পাওয়া যায়। টুকরো টুকরো খবর একসঙ্গে জট বেঁধে ভেসে বেড়াচ্ছে: 'জার্মানরা মঁাৎ-এ এসে পড়েছে'—'ওরা শাঁতিলিতে এসে পড়েছে'—'প্যারাস্যুটবাহিনী নেমেছে সাঁজ-এলিজেতে'—'ট্রেনগুলো গার দোস্তেরলিৎস থেকে ছাড়ছে'—'না, তা নয়'—'ওরা আমাদের সঙ্গে বেইমানী করেছে, ওরা আমাদের...!'

একটি মেয়ে হ্যাংলার মত আইসক্রীমের একটা দিক চাটতে চাটতে কাঁদছে। রাস্তা দিয়ে জেনারেল গেল একজন। একটা বুড়ো লোক তার দিকে তাকিয়ে থেকে কাঁপা গলায় বলল, 'বারোটা বেজে গেছে তোমাদের!' পাশের রাস্তায় একটি ছোট্ট মেয়ে একটা মস্ত মুণ্ডুহীন পুতুলকে আলিঙ্গন করে আর্তনাদ করে উঠল।

রু স্যাঁ জাক্‌এর মোড়েই এক রুটিওলার দোকান খোলা আছে। টাটকা রুটির গন্ধে জেগে উঠল জিনেৎ—বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা আবার নতুন করে উপলব্ধি করল সে। মনের ভেতর কতকগুলো অস্থির চিন্তা খেলে গেল: কী করবে সে? স্টুডিওর দিকে এগিয়ে চলল। দরজাগুলো বন্ধ। এমন কি কুলিরা পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারপর মারেশালের কথা মনে পড়ল তার। তার ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখল, সে স্যুটকেশে বই, একটা ফ্লাস্‌ক্ আর নিগ্রো-পুতুল ভর্তি করছে। পুতুলটা কিছুতেই ভেতরে যাবে না। বারবার কেবল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে আর কুটিল চোখে হাসছে।

'নতুন খবর—ইটালিয়ানরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।' মারেশাল বিড়বিড় করে উঠল। 'ব্যাপারটা বুঝতে পারলে, ওরা আজ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। হতচ্ছাড়া শয়তান! আর এদিকে গভর্নমেণ্টও কেটে পড়েছে। এই তোমার 'সফল না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম করার সংকল্প!' প্রচুর মোটর গাড়ী কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। আমরা একসঙ্গে দল বেঁধে একটা কিনেছি। গ্রঁদেৎ পেট্রলের খোঁজে বেরিয়েছে। যদি পেট্রল পায়, তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।'

জিনেৎ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। জিজ্ঞাসা করল, 'ফ্ল্যারিতে পৌছে দেবে আমায়?'

পেট্রল পাওয়া গেল না। ভোর নাগাদ বিষণ্ণ মুখে ফিরে এল গ্রঁদেৎ। বলল, 'শার্লে গতকাল মোটরে করে বেরিয়েছিল কিন্তু হেঁটে ফিরে আসতে হয়েছে। কোথাও এতটুকু পেট্রল নেই, উচ্ছন্নে যাক! যদি আমরা একটা ঘোড়াও পেতাম! তাহলে নির্ঘাৎ বেরিয়ে পড়তে পারতাম। পের লাশেস কারখানায় ওরা কামান বসিয়েছে। আমি নিজের চোখে দেখলাম। সৈন্যরা

কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। কিছুই বুঝলাম না। ওরা বলছে আমেরিকাও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমার তো বিশ্বাস হয় না।'

মারেশাল চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরের কাগজ নেই। রেডিও নেই। একটা কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসেছে ওরা! এর অর্থটা বুঝতে পেরেছ? ওরা পারী ছেড়ে চলে গিয়েছে।'

নিশ্বাস নেবার পর জিনেৎকে বলল, 'আমাদের হেঁটে রওনা হতে হবে।'

জিনেৎ মুহূর্তের জন্যে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার একটা ছেলেমানুষি ধারণা আছে যে ক্যারিতে হেঁটে যাওয়াটা বেশ মজার। ঘরে গিয়ে সে নিজের মনে মনে বলল: 'অন্য কোন একটা জুতো পরা দরকার। এই জুতো পরে গেলে ওখানে আর পৌঁছতে হবে না।'

তার উত্তেজনা শিগগিরই মিলিয়ে এল। রাস্তায় ভয়াবহ কোলাহল—মোটর গাড়ীর হর্ন আর মানুষের ঠেলাঠেলি, চিৎকার ও কান্না—সমস্ত কিছু তাকে ক্লান্ত ও বিমর্ষ করে তুলল। কোথায় পালাবে সে? আর পালিয়েই বা কী লাভ? যেখানেই যাক, তার ভাগ্যে সবই এক।

হোটেলের কর্ত্রী জিনেৎকে অভিবাদন জানাল, যেন সে তার কত নিকট আত্মীয়। বলল, 'আপনি না গিয়ে ভালই করেছেন। এই জায়গায় একটা জনপ্রাণীও নেই, স্রেফ আতঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। দেখে শুনে নিজেরই কেমন লজ্জা করে। কী জন্যে ওরা পালাচ্ছে? দয়া করে বলবেন একটু! ১৯১৪ সালে জার্মানরা মেও-এ ছিল। সে সময়েও লোকে পালিয়েছিল। কিন্তু জার্মানরা পারী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। দুধউলীটা বলছিল চল্লিশ ডিভিশন সৈন্য আমদানী করা হচ্ছে। তার মানে, জার্মানদের নির্ঘাৎ ভাগিয়ে দেওয়া হবে।'

জিনেৎ নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকুনি দিল। এক ঘণ্টা বা তারও বেশী নিশ্চল হয়ে বসে রইল সে। হোটেল কর্ত্রীর ছোট ঘরখানা, যা হোটেলের আপিসের কাজে লাগে, রোদ পড়ে উষ্ণ হয়ে উঠছে। এক ফালি রোদকে ধরবার জন্যে ফুটপাথের ওপর খেলা করছে একটা বেড়ালছানা। বেড়ালটাকে দেখে লাফিয়ে উঠল জিনেৎ। যদি সেও বাঁচতে পারত!

তাড়াতাড়ি মারেশালের ফ্ল্যাটে ফিরে চলল সে। দরজার ওপর একটা খবর লেখা: 'জিনেৎ, আমি তোমার জন্যে দঁফের রশেরকো মেট্রো স্টেশনের বাইরে চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।' ব্যাকুলভাবে ঘড়ির দিকে তাকাল জিনেৎ। এরি মধ্যে তিনটে বেজে গেছে। তবু সময় আছে এখনো। একটা খোলা দোকানে গিয়ে

এক বোতল ও-ডি-কোলন কিনল। দোকানী অনেক সময় নিচ্ছে দেখে জিনেৎ আরো ক্ষিপ্র হতে অনুনয় করল তাকে।

স্টেশনগুলো কী করে ঘুলিয়ে ফেলল সে? পাঁচটা পর্যন্ত আলেসিয়া স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করে রইল। তারপর হাতব্যাগ থেকে কাগজটা বের করল আর সমস্ত কিছু অস্পষ্ট হয়ে এল তার চোখের সামনে। কিন্তু যখন সে দঁফের-রশেরকো স্টেশনে পৌঁছল সেখানে একটিও লোক নেই। ডাকঘরে ধাওয়া করল জিনেৎ। কিন্তু ডাকঘরও বন্ধ হয়ে গেছে। হোটেলে না পৌঁছনো পর্যন্ত টেলিফোন করার কথাও তার মনে হল না। দেসেরকে ফোনে ডাকল। মান-অভিমানের প্রশ্ন নয়। দেসের তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। ফোনে কোন উত্তর নেই। জিনেৎ তার নোট বই বের করে সমস্ত নম্বরগুলোই একবার করে ডাকল, ভেবে দেখল না কাকে সে ডাকছে। কিন্তু একটানা গুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। আতঙ্কিত হয়ে জিনেৎ মনে মনে বলল, 'কেউ নেই!'

ইতিমধ্যে হোটেল-কর্ত্রী তার দেওরের সঙ্গে দেখা করল। সে বলল, 'এখানে কোন ডিভিশনই নেই। কেবল পুলিশ আর অগ্নিনির্বাপক দল শহরে রয়ে গেছে। জেনারেল গিয়েছে শাঁতিলিতে জার্মানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।' উত্তর দিক থেকে কামানের গর্জন ভেসে এল। জিনেৎকে 'কেউ নেই' কথা দুটো উচ্চারণ করতে দেখে হোটেল-কর্ত্রী হাতের একটা ভঙ্গী করে উন্মাদের মত মালপত্র গোছাতে শুরু করল।

জিনেৎ ওপরে উঠে এল তার ঘরে। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জানলায়। দীর্ঘ পথ দিয়ে বিরাট জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। কেউ কেউ হাতগাড়ীতে আসবাব বোঝাই করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে হাতগাড়ীর ওপর একটা বুড়ী বসে আছে বা ছোট্ট কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। সমস্ত খড়খড়িগুলো খুব শক্ত করে বন্ধ করা। জিনেৎ আবার আর্তনাদ করে উঠল, 'কেউ নেই!'

একটা লোক কাঁধে আর্ম-চেয়ার নিয়ে চলেছে, তার ওপর কাঠের ঘোড়া নিয়ে বসে আছে একটা ছোট্ট ছেলে—ঘোড়াটাকে ছাড়তে কিছুতেই রাজী নয় ছেলেটা। এক বুড়ী পাখীর খাঁচা দোলাতে দোলাতে চলেছে।

প্যাশনে-পরা একটা লোক থলির মধ্যে বেড়াল নিয়ে যাচ্ছে। বেড়ালটা ছটফট করছে আর চিৎকার করছে। এক বুড়ী ঠাকুমাকে হাতগাড়ীতে বসিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর অন্য একটি স্ত্রীলোকের দুই কাঁকে দুই শিশু। শেষ সাইকেল-চালকরা ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে। জনশূন্য শহরে পড়ে থাকা কী ভয়াবহ!

জিনেং নীচে নেমে গেল। হোটেল-কর্ত্রী ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে। সব কিছু ফেলে গিয়েছে এখানে। যাবার আগে জিনেংকে খবর পর্যন্ত দেয়নি এবং তালাও দিয়ে যায়নি নিজের ঘরে। জিনেং রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল। কেমন একটা পোড়া গন্ধ, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। তেলের ট্যাঙ্কগুলোয় আগুন লেগেছে। তারপর বৃষ্টি নামল এক সময়ে, বৃষ্টির ফোঁটা ধোঁয়ায় কালো হয়ে গিয়েছে। কালো অশ্রু নেমে এল জিনেঙের গাল বেয়ে। ফাঁকা মন ও বিস্ফারিত দৃষ্টি নিয়ে জিনেং ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল, পালিয়ে চলল ধূমায়িত শহরের গ্রাস থেকে।

২৯

আনে সমস্ত সকালটা খবরের কাগজের অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। যে সমস্ত কিয়স্ক্ এতক্ষণ খোলা ছিল সেখানে কেবল পুরনো সাপ্তাহিক পত্রিকার ভীড়; তারপর সে কিয়স্কগুলিও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। লোকে বলাবলি করল যে খবরের কাগজ আর বার হবে না। কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কাগজওলার চিৎকার শুনে তার হাত থেকে একটা কাগজ ছিনিয়ে নিল আনে। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা ছবি—সীন নদীর ধারে একজন মহিলা কুকুরকে স্নান করাচ্ছেন, ছবিটির শিরোনামা দেওয়া হয়েছে: 'পারী আজো সেই পারীই আছে।' আনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল; লোকটা তাকে পুরনো কাগজ গছিয়ে দিয়ে গেল নাকি! না তারিখটা ১০ই জুনই আছে......তাড়াতাড়ি স্কুলে এসে উপস্থিত হল আনে, তারপর রেডিওটা খুলে দিল। উপাসনা-উৎসব ঘোষণা করছে ওরা। তারপর মার্কিন রাজদূত বুলিট যোয়ান অফ আর্কের মূর্তির পাদদেশে এক গুচ্ছ রক্তগোলাপ উপহার দিয়ে ইঙ্গ-স্যাক্সন কণ্ঠস্বরে চিৎকার করে উঠল: 'ওদের রক্ষা করো, যোয়ান!' এর পর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল ট্যাঙ্গো নাচের সুর:

কিরে ছোঁড়া, কিলো ছুঁড়ি
কিসের তরে চাস আনারস ঝুড়ি ঝুড়ি?

অবশেষে ঘোষকের জোরালো কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'নারভিক-এর পূর্ব দিকে আমাদের বীর শাস্তর আলপিনরা অগ্রসর হয়ে চলেছে......'
রিকে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বলল ওরা রেডিওতে?'

'কিছু না। হয়ত রিপোর্টের জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। আগামী কাল আমাদের জানাবে।' আনে উত্তর দিল।

কিন্তু পরদিন সকালে রেডিও সম্পূর্ণ নির্বাক রইল। হতাশায় ডুবে গেল আনে। প্রথমে ভাবল ডাক্স্-এ তার বাবার কাছে চলে যাবে সে। সেখানে কক্ষনো পৌঁছতে পারবে না জার্মানরা।

শূন্য ঘরগুলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল আনে। চারদিকে ছেঁড়া নেকড়া আর টিনের ডিবে। আশ্রয়প্রার্থীরা গতকাল পর্যন্ত এইখানে ছিল। ওদের মধ্যে একমাত্র রিকেই রয়ে গেছে। খেঙিয়ে খেঙিয়ে বলেছে, 'আমি যেতে পারব না।' আনে কি করবে তাও সে জিজ্ঞাসা করেনি। সে বুঝেছে যে, আনে চলে যাবে। তবুও তার উৎকণ্ঠিত চোখ দুটো দিয়ে সে আনের গতিবিধি লক্ষ্য করছে—যেন সে আশা করছে, আনে হয়ত শেষ পর্যন্ত যাবে না। একা থাকাটাকে সে সব চেয়ে বেশী ভয় করে।

'সবাই তো চলে গেছে। শহরে কী হচ্ছে এখন?' রিকে জিজ্ঞাসা করল।

'ওরাও চলে যাচ্ছে।'

একটু থেমে আনে বলল, 'আমি যাচ্ছি না।'

রিকে হাসতে চেষ্টা করল কিন্তু তার মুখখানা টান টান হয়ে উঠল স্নায়বিক আক্ষেপে। দুদুকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আনে অবাক হয়ে ভাবল—কেন সে এখানে পড়ে থাকবার সিদ্ধান্ত নিল। সে রিকের জন্যে দুঃখিত বলে? কিন্তু তাকে তো দুদুর কথাও ভাবতে হবে। নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত দুদুকে। সে তো পথে হারিয়ে যেতে পারে? যেমন বেলজিয়ান মহিলাটি তার মেয়েকে হারিয়েছিল। কিন্তু এখানে তো বোমাবর্ষণ হবে। আরো হাজার দুয়েক লোক মারা যাবে। এর চেয়েও আরো ভয়াবহ হবে অবস্থা। সে চলে যায়নি কেন? শুধু তার আত্মমর্যাদার জন্যে? ঘণ্টাখানেক আগে রেডিওতে ফাঁপা শব্দ ছাড়া আর কিছু না শুনতে পেয়ে কেমন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল আনে। পালিয়ে যাওয়াটা অত্যন্ত লজ্জাকর। তার ইচ্ছাশক্তি প্রবল হয়ে উঠেছে, পরিত্যক্ত শহরে থেকে গিয়ে সে একটা কাজের কাজ করবে।

ত্রস্ত পায়ে ঘরে এসে ঢুকল মেলানি আর আনেকে তার সঙ্গে যাবার জন্যে পরামর্শ দিল।

বলল, 'মজুরদের সঙ্গে আমরা চলে যেতে পারব। ওদের সঙ্গে চারটে লরি আছে। হাজার হোক, আপনার লোকের মধ্যেই থাকব।'

আনে বলল, সে এখানে থাকবে বলে স্থির করেছে। মেলানি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল— তাহলে লোকে যা বলত তাই ঠিক: আনের হৃদয় বলে কোন জিনিস নেই, যে-ই তার স্বামীকে নিহত করে থাকুক না কেন তার কাছে সবাই এক। জার্মানদের সঙ্গে থাকবে সে!

মেলানি বলল, 'তোমার ব্যাপার, তুমিই বোঝো।'

রিকেকে খেতে দিয়ে আনে রাস্তায় বের হল। লোকে এখনো শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওদের সঙ্গে যেতে পারলে কী ভালই না হত! আনে বার বার নিজের মনকে শাসালো: 'কক্ষনো না।' মেরির দেওয়ালে একটা ছোট্ট বিজ্ঞপ্তি চোখে পড়ল। বিজ্ঞপ্তির গোড়াতে লেখা আছে: 'ফরাসী রিপাবলিক। স্বাধীনতা। সাম্য। মৈত্রী। তার নীচে লেখা: 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে—জেনারেল দেনংস, সামরিক গভর্নর।' খড়ের টুপি পরা এক বেঁটে মত বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞপ্তিটা পড়ছে।

'উন্মুক্ত শহর মানে?' আনে প্রশ্ন করল।

বেঁটে বুড়ো লোকটা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'জানি না। শহরটা যে দুর্গ নয়—এই কথাই বোঝাতে চাইছে হয়ত। কিংবা এটা পোপের অনুরোধ। যাই হোক, এতে খুশি হবার কিছু নেই, মাদাম।'

একজন মজুর বিজ্ঞপ্তিটা পড়ে চিৎকার করে উঠল, 'শয়তান কোথাকার! তলে তলে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে ওদের!'

লোকটার একটা চোখ কাঁদছে। অন্য চোখটা নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে আছে আনের দিকে—কাঁচের চোখ ওটা।

বিরাট দাড়িওলা একটা মোটা মত পুলিশ দাঁত বের করে হেসে বলল, 'শান্তি রক্ষার জন্যে ওরা আমাদের এখানে রেখে গেছে। 'উন্মুক্ত শহরের' অর্থ হল জার্মানরা আমাদের মারবে না। এবার চট পট সন্ধি করে ফেলবে ওরা।'

লোকেরা এখনো শহরত্যাগ করছে। ঈর্ষান্বিত হয়ে তাদের দিকে তাকাল আনে—হাঁটবার সময় চিন্তার অবকাশ কোথায়।

সন্ধ্যার সময় রিকেকে সান্ত্বনা দিল, 'পারীকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তার মানে ওরা গুলিও করবে না, বোমাও ফেলবে না।'

'আমি বোমায় ভয় পাই না। পথে আসার সময় ওরা সমস্তক্ষণ বোমা ফেলেছে। আমার ভয় হয় ওরা পারী পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

আনে মুখ ফিরিয়ে নিল। এই প্রথম কান্নায় ফেটে পড়ল সে। বুঝল, রিকের

মত তারও একমাত্র ভয় যে জার্মানরা আসবে। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সে নিজেকে সমস্ত ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল; ভেবেছিল: 'এতে কীই বা যায় আসে?' জার্মানরা অন্য সবার মতই মানুষ, শুধু পোষাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন রকম। আর এখন বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা বোধ করল সে—ওরা কি সত্যিই আসবে? পারীতে আসবে জার্মানরা! কথাগুলো বার বার আবৃত্তি করল সে, আর চোখের জল ঝরে পড়তে লাগল তার গাল বেয়ে।

স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না সে, ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। অপরিচ্ছন্ন, পরিশ্রান্ত সৈনিকরা মাথা হেঁট করে ঢালু পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শহর থেকে চলে যাবার পথে তারা বন্ধ জানলাগুলোর দিকে ক্লান্ত হয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের একজনকে কিছু রুটি আর চকোলেট দিল আনে। তার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি স্থির হয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। বিদায়!'

তার চোখ দুটো ভুলতে পারবে না আনে। আর অমন অদ্ভুত কথা বলল কেন লোকটা—'বিদায়?'

বাড়ীতে গিয়ে রেডিও খুলে বসল আনে। তুলুজ বেতারকেন্দ্র থেকে রেনোর বক্তৃতা প্রচার করা হচ্ছে। রেনো বলছে, রুজভেল্টকে সে শেষ আবেদন জানিয়েছে। ক্রমে মিলিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। তারপরই বিশপ জনসাধারণকে অনুশোচনার জন্যে আহ্বান করলেন—'এ হল ভগবানের শাস্তি।' নানা শব্দের সংমিশ্রণে একটা বিকট গর্জন ধ্বনিত হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল—যেন আওয়াজটা পাশের ঘর থেকে আসছে: 'জাতীয় জাগৃতি বেতারকেন্দ্র থেকে ঘোষণা করছি। আত্মসমর্পন করুণ! আমরা গোপন সৈন্যবাহিনী গঠন করছি। আমাদের ১৬নং বাহিনী আর্লসের সমস্ত তান্ত্রিকদের ও মার্কস্‌বাদীদের গুলি করে মেরেছে। গ্রেনোব্‌ল্-এ ৪৭নং বাহিনী......'

রিকে অনুরোধ করল, 'বন্ধ করে দিন! ও সব শোনবার মত ধৈর্য নেই আর!'

আনে ঘুমোতে পারল না। সারা রাত্রি সে অন্ধকার জানলার ধারে বসে ইঞ্জিনের গুঞ্জন আর কামানের গর্জন শুনল। মানুষ মরে গেলে যে শোক জাগে পারীর জন্যে সেই শোকে অভিভূত হল সে। সকালবেলা দুদুকে নিয়ে বের হল, তার আর রিকের জন্যে কিছু দুধ সংগ্রহের আশায়। না, সমস্ত দোকানগুলোই বন্ধ। একটি স্ত্রীলোক ছাড়া আর কোন জন প্রাণীও নেই। স্ত্রীলোকটি একটা

ছোট্ট গাড়ীতে এক পাল ছেলে মেয়ে বোঝাই করে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এখনো তাহলে লোক যাচ্ছে।

একটা কোণ থেকে একজন সৈনিক ছুটে এল। তাকে দেখে পিয়েরের কথা মনে পড়ল আনের—তামাটে রং আর দুই চোখের ধারে বড় বড় শাদা দাগ।

'পোং হ্যরলেঅঁায় যাবার রাস্তা কোন্‌টা? শিগগির!' চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল সৈনিকটি।

রাস্তাটা বলে দিয়ে আনে প্রশ্ন করল, 'জার্মানরা কোথায়?'

সৈনিকটা হাত দোলাতে দোলাতে ছুটে বেরিয়ে গেল। হাঁটতে লাগল আনে। সমস্ত খড়খড়িগুলো বন্ধ। একটা জনপ্রাণীও চোখে পড়ে না। স্কোয়ারের ঘড়িটা পর্যন্ত থেমে গিয়েছে। তিনের ঘরে এসে আটকে গেছে কাঁটাটা। চারদিকে কেমন একটা মড়ার মত স্তব্ধতা।

তারপর গোঁ গোঁ শব্দে আলোড়িত হয়ে উঠল আকাশ। বিমানগুলো খুব নীচুতে উড়তে উড়তে এগিয়ে আসছে; পাখার ওপর কালো স্বস্তিকা চিহ্নগুলো সুস্পষ্ট।

'এইবার ওরা বোমা ফেলবে,' আনে ভাবল। নিজের স্থৈর্যে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে—দুদুকে মেরে ফেলতে পারে ওরা, কিন্তু তাতেই বা তার কি এল গেল? আনে ভাবল, নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে তার; কিছু বুঝতে পারছে না সে।

দুদুকে নিয়ে বুলভার পর্যন্ত অগ্রসর হল। তারপর থেমে গেল হঠাৎ—জার্মানরা তার দিকে এগিয়ে আসছে। রাইফেল নিয়ে খোলা গাড়ীতে বসে আছে সৈনিকরা। কোন কিছু না ভেবে আনে তার হাত দিয়ে দুদুর চোখ দুটো ঢেকে দিল যাতে সে ওদের দেখতে না পায়। কোন স্পষ্ট ধারণা নেই তার, কি করবে তাও সে জানে না। তবু সে বিদেশীর মুখগুলোর দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইল। এবং সারাক্ষণ সে মনে মনে বলতে থাকল: 'ওরা এসেছে!'

একটা ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে থাকল আনে। মাথায় কালো রুমাল-বাঁধা এক বুড়ী বেরিয়ে এল ভেতর থেকে, জার্মানদের দেখে কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে গেল। ভুরু পর্যন্ত রং মেখে দুজন গণিকা রাস্তায় টহল দিচ্ছে। হেসে হেসে এক অফিসারের উদ্দেশ্যে রুমাল নাড়াচ্ছে তারা।

তুতু হঠাৎ খুশি মাখা গলায় বলল, 'মা, মা কত সৈন্য দেখেছ? বাবা আসছে, না?'

চিৎকার করে উঠল আনে: 'চুপ! ওরা জার্মান!'

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল। তুতু কাঁদছে। শক্ত করে তুতুর হাত ধরে সরু পথ দিয়ে আনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ীর দিকে রওনা হল।

কী অসহ্য দুপুরের রোদ! রাস্তার নোংরাগুলো রোদের মধ্যে পচছে। প্রত্যেক বাড়ীর বাইরেই একটা করে ডাস্টবিন। তিন দিন আগে, যে সময়ে পথে লোকজন ছিল, এই ডাস্টবিনগুলো বের করে দেওয়া হয়েছিল বাইরে। স্কুলের ফটকের কাছেই একটা মরা জানোয়ার পড়ে আছে। পচা মাংসের বিশ্রী গন্ধে রাস্তার হাওয়া ভারাক্রান্ত। লেড়ি কুত্তারা পায়ের মধ্যে লেজ গুটিয়ে হন্যে হয়ে ফুটপাথ শুঁকে বেড়াচ্ছে, আর আকাশের দিকে নাক তুলে কেঁউ কেঁউ করছে।

বারান্দায় রিকেকে দেখতে পেল আনে। চিৎ হয়ে মেঝের ওপর শুয়ে আছে। আধ-খোলা একটা দরজার একাংশ আঁকড়ে ধরে আছে দু হাতে। মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে জিভটা।

'কী হয়েছে কাকার?' প্রশ্ন করল তুতু।

আনে কোন উত্তর দিল না।

যুদ্ধ-সংগীতের জোরালো সুর ভেসে আসছে রাস্তা থেকে।

৩০

আঁদ্রে পেছনে পড়ে রইল। যখন সে জানতে পারল জার্মানরা পারীতে এগিয়ে আসছে তখন ট্রেন বা গাড়ী পাওয়া আর সম্ভব নয়। চোট-লাগা পা নিয়ে হেঁটে যেতেও পারবে না সে। যে বাড়ীতে সে থাকে সেখানে একটা মানুষও আর অবশিষ্ট নেই। দু দিন ধরে জার্মানদের যুদ্ধ-সংগীত ও সৈন্যদের বুটের শব্দ শুনল সে। ঘরে কোন রকম খাদ্য নেই, তবু ক্ষুধার্ত বোধ করল না। কি ঘটেছে তাও বুঝে দেখবার চেষ্টা করল না; ওপড়ানো গাছের মত সোফায় শুয়ে রইল আর মাঝে মাঝে ঝিমোতে লাগল! এত স্বপ্ন সে জীবনে কোনদিন দেখেনি। নানা রকম স্বপ্নের একটা সংমিশ্রণ। আঁদ্রে স্বপ্নে দেখল, আপেল বাগানে এক মেশিনগানের ধারে সে শুয়ে

আছে আর তার বাবা তার হাতে কার্তুজের পেটি তুলে দিচ্ছেন। হঠাৎ বিয়ের বাসরের দৃশ্য ভেসে উঠল। তার হাতে সাইডার মদ দিচ্ছে নিভেল; আর জিনেৎ বলছে, 'এইমাত্র বিয়ে হল আমার।' কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে হল? আঁদ্রে ঘুম থেকে উঠে স্বল্পালোকিত স্টুডিওর চারদিকে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল। সে তো পারীতে বসে আছে। আর পারীর চারদিকে আছে জার্মানরা।

রাস্তা থেকে জার্মান সৈনিকদের হেঁড়ে গলা তার কানে আসে। জানলা থেকে দূরে থাকার দরুণ ওদের মুখোমুখি হয়নি সে। আঁদ্রে মনে মনে বলল, 'কী দুর্ভাগ্য যে আমি মারা যাইনি!'

তৃতীয় দিন দরজায় শব্দ শোনা গেল। আঁদ্রে উঠে পড়ে নিজেকে পরিপাটি করল একটু! কে হতে পারে? নিশ্চয়ই জার্মানরা ছাড়া আর কেউ নয়। সজাগ হয়ে উঠল আঁদ্রে। কিন্তু দরজা খুলে দেখল যে একটা চোখে কালো ব্যাণ্ডেজ বেঁধে লরিএ দাঁড়িয়ে আছে।

'ও তুমিও তাহলে রয়ে গেছ?' আঁদ্রে বলল।

'যেতে পারলাম না। আমার যা কিছু সবই দিতে চেয়েছিলাম—টাকা আর ঘড়ি। একটা লোক তার গাড়ীতে আমায় নিতে চেয়েছিল কিন্তু হঠাৎ সে মত বদলাল। আমার মা বুড়ী হয়েছেন। তাঁকে একা ছেড়ে যেতে পারলাম না। আঁদ্রে, কী ঘটে গেল বুঝতে পেরেছ?'

'বুঝিনি। বুঝতে চাইও না।'

'আমরা তো একটা ছোট্ট পাহাড়কে রক্ষা করেছি। কিন্তু অন্যেরা কী করেছে? ওরা এমনিই ছেড়ে দিয়েছে পারীকে।'

আঁদ্রে নিরুত্তর রইল।

'তুমি কি একা আছ এখানে?' জিজ্ঞাসা করল লরিএ।

'হাঁ একাই। জার্মানরা আসার পর আমি আর বাইরেও বের হইনি। কিন্তু বাইরে বেরতে হবে, তামাক শেষ হয়ে গেছে।'

রু শের্স্ মিদি একেবারে জনমানবহীন। তামাকের দোকান বন্ধ। আঁদ্রে হঠাৎ থেমে মনে মনে ভাবল, 'কী অদ্ভুত সুন্দর!' শহর যেন ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে। ভোরবেলার ম্লান আলোয় ছাড়া আর কখনো আঁদ্রে রাস্তাগুলোকে এমনটি দেখেনি। কিন্তু এখন তো দুপুর—ঝলমলে রোদ আর ছোট ছোট ছায়া। আর চারদিকে কী গভীর প্রশান্তি...পম্পেইর রাস্তা দিয়ে টহলদারদের হাঁটবার

সময়ে নিশ্চয়ই এমনি মনে হয়। টহলদারদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক হতে পারে, কিন্তু সে আর লরিএ তো এখানকার বাসিন্দা।

'আমরা যেন খানিকটা পম্পেইর অবস্থাতেই বাস করছি।' আঁদ্রে লরিএকে বলল আর হেসে উঠল ক্লান্তভাবে।

পার হয়ে এল তারা দুধের দোকান আর পাইপের দোকান,—এই দোকানের পাইপগুলো আঁদ্রে ভাবী তারিফ করত এক সময়। প্রাচীন সংগ্রহের দোকান, যেখানে বুড়ো বোয়ালো চিনেমাটির মেষপালিকা-মূর্তির ওপর থেকে ধুলো ঝাড়ত, আর একটু এগিয়েই যোসেফিনের রেস্তোরাঁ—যোসেফিন মাংসের কোর্মা পরিবেশন করত ওখানে। কিন্তু ওখানে ওটা কি জিনিস? বাড়ীর এক কোণে সামনের দিকে পেলিকেন পাখী তার বাচ্চাদের রক্তপান করাচ্ছে। পাখিটার বয়স পাঁচশো বছরেরও বেশী, নিশ্চয়ই সে অনেক কিছুই দেখেছে। কিংবা হয়ত কিছুই দেখেনি—কেবল বাচ্চাদের খাইয়েছে, অন্যদিকে তাকাবার ফুরসতই পায়নি।

লরিএ তার মা-র কথা বলল, 'মা কেবলই জিজ্ঞাসা করে বেহালা দিয়ে কি করবি? কিছুই করবার নেই যদি না জার্মানদের বিয়ের উৎসবে বেহালাটা বাজাই।'

আঁদ্রেকে চাঙ্গা করে তুলবার জন্যে হাসতে চেষ্টা করল সে। বোমাবিধ্বস্ত বাড়ীর মত দেখাচ্ছে চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মুখখানা। আঁদ্রে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রুটির দোকানের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। হঠাৎ নিজেকে ক্ষুধার্ত মনে করল আঁদ্রে। দুজনে ভেতরে ঢুকল। চমৎকার ফিটফাট দোকানটা; সাঁ জের্মাঁ অঞ্চলের বাড়ীগুলোয় খাবার যায় এখান থেকে। পঞ্চাশ বছর বয়স্কা, গালে রং-মাখা দোকান-কর্ত্রী একজন মহিলা খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বলছে।

দোকান-কর্ত্রী বলছে, 'সবাই বলত—বর্বররা আসছে। কিন্তু ভয়ানক ভদ্র ওরা, প্রত্যেকটি জিনিস দাম দিয়ে কেনে।'

'আমাদের গিন্নী বলে—ওরা ঠিক শৃঙ্খলা রক্ষা করবে আর মজুরদের দিয়ে কাজ করাবে। কথাটা ঠিক বটে!'

আঁদ্রে একমুখ মিষ্টি রুটি খেতে খেতে বলল, 'বেশ খাসা গিন্নীটি তোমার!

কেশিয়ার ফিসফিস করে বলল, 'ও হল মাদাম মিয়েজারের বাড়ীর চাকরানী। দামটা কিসে দেবেন আপনি—ফ্রাঁ না মার্ক-এ?'

আঁদ্রে হেসে বলল, 'আমার কাছে একটাও ফ্রাঁ নেই। একটা ফ্রাঁও রোজগার করতে পারিনি। আমি তো আর মঁসিয় মিয়েজ্জার নই!'
ব্যঙ্গটা ধরতে না পেরে কেশিয়ার ব্যবসায়ী ভঙ্গীতে বলল, 'ওরা বলে মার্কগুলো নাকি খাঁটি নয়। জার্মানীতে নাকি এ টাকা অচল। আমার মনে হয়, কথা-গুলো একেবারে ভূঁয়ো। রীতিমত ভদ্রলোক ওরা, অচল টাকা ওরা কক্ষনো দেবে না।'

লরিএর পিঠ চাপড়াল আঁদ্রে।

'কথাগুলো শুনলে? মাদাম মিয়েজ্জার। আমাদের লেফটেনেন্ট ফ্রেসিনে এদের উদ্দেশ্য আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। লোকটা গুলি করে আত্মহত্যা করেছে এতে অবাক হবার কিছু নেই। ও বেঁচে গেছে কিন্তু তুমি আমি কী করব?'

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলল আঁদ্রে—এই রাস্তার প্রতিটি বাড়ী আর ল্যাম্পপোস্ট তার পরিচিত, কিন্তু এখন তার নিজের শহরে নিজেকে কেমন বিদেশী মনে হল।
মিষ্টি রুটি খেয়ে খিদে পেয়ে গেছে আঁদ্রের। তারা দুজনে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। সমস্ত টেবিলগুলিই জার্মানরা অধিকার করে বসে আছে। পেটুকের মত খাচ্ছে সবাই, বড় বড় ডিশগুলো গোগ্রাসে গিলছে আর বিয়ার ও শ্যাম্পেন পান করছে। ভোজে মত্ত হয়ে আছে বিজয়ীরা। উৎসবের আবহাওয়া। তার প্রকাশ পতাকা-সজ্জা বা বিউগল-ধ্বনির মধ্যে নয়—ক্ষমতায় মদমত্ত মানুষের লোলুপ আহার আর উদ্গীরণের মধ্যে। দশটি ডিমের তৈরী এক-একটি অমলেট। প্রত্যেকটি লোকের জন্যে একটা পুরো মুরগী। পাঁচ বোতল শ্যাম্পেন। নতুন মার্কের নোটগুলো খস খস করছে চতুর-চক্ষু খোসামুদে রেস্তোরাঁ মালিকের হাতের মধ্যে।

আঁদ্রে আর লরিএ তাদের প্রতিবেশীদের দিকে না তাকাবার চেষ্টা করল। নীরবে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তারা খেয়ে যেতে লাগল যেন কোন একটা কঠিন কাজ করছে তারা। হঠাৎ লরিএ প্লেটটি সরিয়ে রাখল, কেমন বিবর্ণ দেখাল তাকে।
আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে তোমার?'
'ওটা দেখেছ?'

একটা বড় আয়নার দিকে আঙুল দেখাল লরিএ যার ওপর লেখা আছে:
'ইহুদীদের আহার পরিবেশন নিষিদ্ধ।'

'ওতে কি হয়েছে?' আঁদ্রে বিড় বিড় করে বলল। 'নতুন প্রভুদের সম্মানে জায়গাটাকে সাজিয়েছে ওরা।'

'হাঁ, কিন্তু আমি......' মুহূর্তের জন্যে এতটা উত্তেজিত হয়ে উঠল লরিএ যে তার কথা আটকে গেল, 'আমি একজন ইহুদী—! আগে এ কথা কোনদিন মনে হয়নি আমার।'

আঁদ্রে তার খাওয়া শেষ না করেই উঠে দাঁড়িয়ে দামটা দিয়ে দিল। দোকান মালিক তাড়াতাড়ি ছুটে এসে অনুনয় করে বলল, 'ভাল করে খেয়েছেন তো, মঁসিয়?'

আঁদ্রে তার দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে বলল, 'ঐ বিজ্ঞপ্তিটা কি আপনি টাঙিয়েছেন?'

লোকটা ফিসফিস করে বলল, 'এতে আমার কোন হাত নেই। খদ্দেরদের কথা বিচার করতে হবে আমাদের। ভাববেন না যে আমি...........ওটা শুধু ওদের জন্যেই।'

লরিএ তার একটা তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা চোখের ওপর আঙুল দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আর এটা কিসের জন্যে? ওদের জন্যে না আমাদের জন্যে?'

নীরবে তারা বেরিয়ে এল! কী কথা বলবে এখন?—পাহাড়ে মেশিনগানের পাশে শুয়ে দিন কাটছিল যখন তাদের, তখন তারা ছিল স্বাধীন মানুষ আর এখন তারা আত্মসমর্পণ করেছে জার্মানদের কাছে। তাদের হাত ঘড়ি আর দেওয়াল ঘড়িগুলোকে এখন বার্লিনের সময় মেনে চলতে হবে—দেওয়ালে তারই নির্দেশ-নামা। জার্মানদের চিন্তাধারা ও হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে এখন তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে। কিন্তু তারপর তারা কী করবে? জার্মানদের বিবাহ উৎসবে বেহালা বাজাবে? তুলি দিয়ে বার্লিনের হিসাবরক্ষকদের রুবেন্সের মত মহাভোজের চিত্র আঁকবে? আঁদ্রে মনে মনে ভাবল, 'না' আজ আর এখানে তুলি, নীহারিকা, জিনেৎ কিছুই নেই।'

চতুরচক্ষু এক মাতাল ভবঘুরে বেঞ্চীর ওপর বসে আছে! তার পাশেই খাড়া হয়ে আছে একটা বোতল।

'শাস্তি?' নেশায় বুঁদ হয়ে লোকটা বকে চলেছে, এক টুকরো কাগজ দাও আমায়, আমি সই করে দিচ্ছি। কেনই বা সই করব না? গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেবারে, একটু মাল দাও দিকি বাবা।'

তরুণ জার্মান সৈনিকরা রু শেরস্ মিদি দিয়ে মার্চ করে চলেছে। ওদের চোখ-গুলো চকচকে আর ফাঁকা। চিৎকার করে গান করছে ওরা আর পুরনো ধূসর বাড়ীগুলো সে গান শুনছে—যে গান তাদের কাছে দুর্বোধ্য। একজন সৈন্য দাঁড়িয়ে পড়ে ফাটলের মত একটা সংকীর্ণ গলির দিকে তাকিয়ে দেখল। হেসে উঠল ও, 'কী নোংরা শহর! আর একেই পারী বলে ওরা! জায়গাটা নিগ্রোদের উপযুক্ত!'

তারপর এগিয়ে গেল লোকটা।

আঁদ্রে বলল, 'আমরা এখনো ভাবছি আমাদের কী করা উচিত। সোজা কথা—পারীকে সাফ করতে হবে আমাদের; এখন এ জায়গাটা নিগ্রোদেরও নয়, ফরাসীদেরও নয়।' আঁদ্রের বাড়ীর কাছে এক গয়লানী তার দুই বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। জার্মানদের দিকে তাকিয়ে দেখছে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। চোখের জলের মধ্য দিয়ে আঁদ্রেকে অভিবাদন জানাল স্ত্রীলোকটি। বলল 'ভেবে দেখ একবার, এ আমি কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারব না।'

সৈন্যদের মধ্যে থেকে একজন মাঝ বয়সী ক্লান্ত চেহারার লোক গয়লানীর কাছে এগিয়ে এসে কী যেন বলল, তাকে সান্ত্বনা দিতে চাইল যেন। ওর ভাষা বোধগম্য হল না গয়লানীর কাছে। লোকটা একটা ছবি টেনে বের করল নিজের পকেট থেকে। ছবিতে সৈনিকটি রবিবারের পোষাক পরা অবস্থায় চারজন ছেলেমেয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে। তাকে বোঝানোর জন্য চারটে আঙুল তুলে ধরল ও। গয়লানীর ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত দিতে চাইল, কিন্তু ভয়ে মার পেছনে আত্মগোপন করল তারা। সে ওকে ধন্যবাদ জানাল, এমন কি হাসি ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করল কিন্তু সৈনিকটি চলে গেলে আঁদ্রেকে বলল, 'সব চেয়ে সাংঘাতিক কথা—ওকে দেখে মুহূর্তের জন্যে দুঃখ হয়েছিল আমার। এখন আর আমাদের দুঃখ বোধ করা উচিত নয়। এখন আমাদের...............'

আবার চোখের জলে ফেটে পড়ল সে। কী সে বলছে কিছুই বুঝল না আঁদ্রে। শ্লথ গতিতে, ভারী পদক্ষেপে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আঁদ্রে উঠে গেল।

'এখন কুঠরীতে ফিরে আসা গেছে। ধূমপান করা যাক। জানি না আমরা কি করতে পারব। ১৯৩৬ সালে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলাম, অন্তত ভেবেছিলাম যে বুঝতে পেরেছি। পিয়ের বলে আমার এক বন্ধু ছিল। স্ট্রাসবুর্গের কাছে ও মারা গেছে। না, পিয়েরকে পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি, কিন্তু ওর উদ্দীপনা ছিল, আর ছিল বিশ্বাসের জোর। তখনকার সময়ে জনসাধারণও ছিল

আশাবাদী। ওরা কথা বলত, তর্ক করত আর হাসত। কিন্তু এখন তুমি আর আমি একা। তুমি যদি জানতে কি রকম হতবুদ্ধি হয়ে গেছি আমি! প্রত্যেকটি লোকই ধাঁধিয়ে গেছে। বেঁচে থাকা সম্ভব কি না এ কথা নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না; এদিকে পারীতে এসে গেছে জার্মানরা।'

লরিএ নিরুত্তর। দীর্ঘ সময় তারা মুখোমুখি বসে রইল আর নীরবে ধূমপান করল। বাইরে থেকে ভেসে এল উচ্চ সংগীতের শব্দ আর তারপর সেই সংগীত উচ্চশ্রাবী হয়ে উঠল।

৩১

ভোর না হওয়া পর্যন্ত জিনেৎ হেঁটে চলল। পদশব্দ, ছেলেমেয়েদের কান্না আর দুরাগত গুলির আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল অন্ধকারে। সকালবেলা মুসড়ানো ঘাসের ওপর অবসন্ন হয়ে বসে পড়ল জিনেৎ আর তার সঙ্গীরা। কয়েক ঘণ্টা ঘুমোনোর পর আবার সে বিস্ফোরণের শব্দে উঠে বসল। লাফিয়ে উঠে দেখল দূরে ধোঁয়া দেখা দিয়েছে। লোকেরা চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছে, যেন মিশিয়ে যেতে চাইছে মাটির সঙ্গে। পরে একটা ছোট্ট মেয়ে পেটে গুলি লেগে ছিটকে বেরিয়ে গেল। পরিশ্রান্ত হয়ে ক্ষত পা নিয়ে আরো বিশ মাইল পথ হাঁটল জিনেৎ। তার পা দুটো যন্ত্রণায় ভারী হয়ে উঠেছে, খিদেয় কাতর বোধ করছে সে। সঙ্গীদের সঙ্গে যখন সে একটা গ্রামে এসে পৌঁছল, গ্রামটা তখন একেবারে পরিত্যক্ত। গ্রামের সমস্ত লোক পালিয়ে গেছে। একটা বন্ধ দোকানের বাইরে সবাই জড়ো হল—কে একজন চিৎকার করে উঠল: 'এতে কোন দোষ নেই। দু'দিন আমার ছেলেমেয়েরা কিছু খেতে পায়নি।'

দোকানটা লুট করল তারা। বোতল আর টিন নিয়ে টানাটানি করল। এক বুড়ি জ্যাম লেপে দিল তার সর্বাঙ্গে। একজন মজুর জিনেতের হাতে এক টিন ফলের মোরব্বা আর কিছু বিস্কুট দিল। জিনেতের ভয়, এ পর্যন্ত যাদের সঙ্গে সে হেঁটে এসেছে তাদের থেকে পিছিয়ে পড়বে সে। সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়বে শুধু সেই ভয় নয়, এমন কি অনেক কিছু সে হারাবে—বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটির ধবধবে শাদা চুল, ছোট ছেলেটির নাবিকের মত কোট আর সশব্দ কেটলিশুদ্ধ হাতগাড়ী। জিনেৎ তার সঙ্গীদের ধরবার জন্য দৌড়ল আর খেতে থাকল সঙ্গে সঙ্গে।

পাশের গ্রামে এখনো কিছু চাষী রয়ে গেছে। একটা বাড়ীর দরজার সামনে একজন লোক আর তার বৌ দাঁড়িয়ে। জিনেং এক গ্লাশ জল চাইল তাদের কাছে।

ক্রুদ্ধ হয়ে বৌটা বলল, 'এটা পারী নয়। কূয়ো থেকে জল তুলে আনতে হয় আমাদের। এক ফ্রাঁ দক্ষিণা দাও।'

স্বামী বৌয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল যেন তাকে আগে কোনদিন দেখেনি। তারপর চিংকার করে উঠল : 'হতভাগী।'

ইঞ্জিনের শব্দে ভারী হয়ে উঠল আকাশ। লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। গরম ধুলো এসে ঢেকে দিয়ে গেল জিনেংকে। আবার যখন সে চলতে আরম্ভ করেছে, তখনো তার কানে আসছে বৌটার প্রাণান্তিক আর্তনাদ। মারা গিয়েছে তার স্বামী।

পথের ধারে কতকগুলো সৈন্যের সঙ্গে দেখা হল। আশ্রয়প্রার্থীরা জিজ্ঞাসা করল, 'জার্মানরা কত দূর? আমরা কি লয়ার নদীর বাঁ দিকে প্রতিরোধ করব?'

'প্রতিরোধ না আর কিছু।' সৈন্যরা বলল, 'কে জানে ওরা কি করবে। কর্নেল তো সরে পড়েছে। ওরা বলছে বাঁ দিকে নাকি এসে গেছে জার্মানরা। ঐখানেই আমাদের শেষ। এ তো খুব সহজ কথা। দালাদিএ এর জন্যে পঞ্চাশ লক্ষ ফ্রাঁ পেয়েছে। সেই অনুসারে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করে যাচ্ছে ওরা। হারামজাদারা। গর্দান নিলেও ওদের উচিত শাস্তি দেওয়া হবে না।'

সৈন্যদের মধ্যে একজন তরুণ সৈনিকের মাথায় বিরাট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। জিনেতের কাছে গিয়ে চিংকার করে উঠল সে, 'প্রথমে স্পেন। তারপর চেকরা। এ সবের জন্যে কে দণ্ড দিচ্ছে? আমি। আমি এর শাস্তি ভোগ করছি। ওরা তো বোর্দোতে সরে পড়েছে। বলতে পার একটা লোক আর কতটা সহ্য করতে পারে?'

জিনেং তার দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে উত্তর দিল : 'অনেকটা।'

রাত্রে আশ্রয়প্রার্থীরা গির্জায় আশ্রয় নিল। গির্জার মধ্যে ধূপ আর শুকনো ফুলের গন্ধ।

একজন মহিলা জিনেতের পাশে সংকুচিত হয়ে বসে তার শিশুকে সযত্নে মাই খাওয়াচ্ছে। এক বুড়ী তার কপাল কুটছে বেদীর কাছে বসে। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চুপ করে গেল বাড়ীটা। রঙিন কাঁচের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত

হয়ে এল সূর্যের বেগুনী রঙা আলো। বুড়ী তার তীক্ষ্ণ নাক গুম্বজের দিকে লক্ষ্য করে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। কেউ জানল না সে ঘুমুচ্ছে না মরে গেছে।

জিনেৎ বসে বসে ঝিমোচ্ছে। টুকরো টুকরো স্মৃতি যাওয়া আসা করছে তার মনের মধ্যে, বিশেষ করে সেই জুলাই-এর রাত্রি যখন সে আঁদ্রের সঙ্গে সরু রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল.. ...নাগরদোলার সেই ঝলমলে নীল হাতী, লণ্ঠন আর ঝাঁকড়ামাথা বাদাম গাছের নীচে চুম্বন।

উঠে বসল সবাই আর বিড় বিড় করতে করতে পথ ধরে এগোল। বুড়ীরাই কেবল পড়ে রইল রোদ-ঝলমলে চুনকাম-করা গির্জার মধ্যে।

দুপুর বেলা পাহাড়ের ওপর থেকে জিনেৎ দেখতে পেল ফ্র্যারির দৃশ্য। সেখানকার নদীর বুকে চিকন ঢেউগুলো পর্যন্ত তার দৃষ্টি এড়াল না। জিনেৎ মনে মনে বলল, 'আমি বেঁচে গেছি।' অন্যান্য পথযাত্রীদের মত সেও মনে করল, লয়ার পার হলেই ওপারে জীবন অপেক্ষা করছে তার জন্যে।

চারদিকে পোড়া আর ফেলে আসা মোটর গাড়ী ইতস্তত ছড়ানো। সমস্ত গাছ-পালা ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। টেলিগ্রাফের তারগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হয়ে পড়ে আছে। একটা ঘোড়ার মৃতদেহের ওপর হোঁচট খেল জিনেৎ। তার বড় বড় হলদে দাঁতগুলো বাইরে বেরিয়ে আছে, দেখে মনে হয়—ঘোড়াটা হাসছে।

রাস্তার ধারে বসে আছে একজন আহত স্ত্রীলোক। আরেকজন স্ত্রীলোক প্রথম স্ত্রীলোকটির পাশে বসে হাত দিয়ে তার চোখ দুটো ঢেকে আছে। গিয়ঁ শহর ধ্বংস হয়ে গেছে। চাটু, বই আর সৈনিকদের রসদের ঝুলি স্তূপের মধ্যে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। অক্ষত দেওয়ালে একটা ঘোষণাপত্র লটকান, 'লয়ারের দুর্গগুলি ফ্রান্সের মুক্তার সমতুল্য।'

জিনেৎ কোন মতে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছে। আগুন ঝলসানো সূর্য। পাথরের স্তূপের ভেতর থেকে অস্বাস্থ্যকর গন্ধ আসছে : তার নীচে চাপা পড়েছে অসহায় মানুষ। এখানে ওখানে মানুষের মাথা, মেয়েদের জুতো-পরা দুটো পা বা বৃদ্ধ লোকেদের হাত বাইরে বেরিয়ে আছে। জিনেৎ পাগলের মত অগ্রসর হয়ে চলল। কোনও দিকে তাকিয়ে দেখল না—নদীর উদ্দেশ্যে চলেছে সে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে আর্তনাদ করে উঠল জিনেৎ। সাঁকোটা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একটা পাথরের ওপর বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগল সে। কয়েক

দিন আগে সে ট্রেনের প্রতীক্ষা করেছিল; কেমন একটা স্থূল একাগ্রতা পেয়ে বসেছিল তাকে, চারদিকে দেখবার বা চিন্তা করবার কিছু পায়নি। আর যখন জার্মান বোমারুরা আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর মেশিনগান চালিয়েছে, সেই জায়গা থেকে জিনেৎ এতটুকুও নড়েনি। সকাল পর্যন্ত সেইখানেই বসে থাকত সে যদি না তার সঙ্গীরা এসে তাড়া দিত তাকে। একই দুর্ভাগ্য তাদের সবাইকে সম-ব্যথী করে তুলেছে। তারা সবাই খাবার ভাগ করে খায়, আহতদের বহন করতে সাহায্য করে, এমন কি একটা বুড়ীর কুকুরকে পর্যন্ত পেছন থেকে খুঁজে এনে দিয়েছে তারা।

কে যেন জিনেৎকে বলল, 'কতকগুলো ডিঙ্গি আছে ওখানে।' জিনেৎ উঠে বসে ভীড়ের পিছু নিল।

নদীর ওপারে গিয়ে হাসিতে উপচে উঠল জিনেৎ। গাছপালাদের বলতে চাইল, 'এই যে, বেঁচে ফিরে এসেছি আমি।'

একটা পাহাড়ে উঠতে চেষ্টা করল যদিও একটা পদক্ষেপের পর আরেকটা পদক্ষেপ ফেলার শক্তি নেই তার।

'জিনেৎ!' কে যেন তাকে ডাকল।

নোংরা, না-কামানো চেহারার সৈনিকটি যে লুসিয়ঁ—এটা বুঝতে কিছুটা সময় নিল জিনেৎ। জিনেতের করমর্দন করল লুসিয়ঁ। হেসে উঠল, চার বছর ওরা পরস্পরে মিলিত হয়নি। কেবল একবার থিয়েটারের হলঘরে তাকে দেখেছিল লুসিয়ঁ আর তারপর তার অলক্ষ্যে পাশ কাটিয়ে গিয়েছিল। আর এখন আনন্দে উচ্চহাস্য করছে সে, এই সময়ে জিনেতের দেখা পাওয়াটা কী আনন্দের! হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়াটা ভাগ্যের কথা। লুসিয়ঁ ভাবল, জিনেতের প্রতি তার ভালবাসা থেকে কোনদিন নিরস্ত হয়নি সে। সেই ষড়যন্ত্রের খেলা, জেনী আর বালির স্তূপের ঘটনার পর যা ঘটেছে তা সমস্তই একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন মাত্র। আর এখন কথা বলছে জিনেৎ, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে সে!

'লুসিয়ঁ! কী হয়েছে বলত? রীতিমত ভয়াবহ ব্যাপার সব! নদীর ঐ পারে ওরা নারী শিশু সবাইকে মেরেছে,—এইমাত্র মারা গেল একটা ছোট্ট ছেলে। কিছুই বুঝছি না।' জিনেৎ বলল।

বিদ্রূপের হাসি হাসল লুসিয়ঁ। বলল, 'শুধু এই রাস্তাতেই বিশ হাজার আশ্রয়-প্রার্থী মারা গিয়েছে। আর এর মত কত রাস্তাই না আছে! উত্তরদিকে সমস্ত

ব্যাপার আমি নিজের চোখে দেখেছি। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্যে আমরা সৈন্য চলাচল করতে পারিনি। আর জার্মানরা ঠিক ঐ আশ্রয়প্রার্থীদের মুখোমুখি ছিল। বুঝতে পারছ? চক্রান্তকারীরা এইই চেয়ে এসেছে প্রথম থেকে। সৈন্য বাহিনীকে ফাঁদে ফেলে চম্পট দিয়েছে ওরা। আমাদের একেবারে গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছে। ঐ চক্রান্তকারীদের মধ্যে আমার বাবাও একজন। কতবার উনি বলেছেন—জার্মানরা এলে খুব ভাল হয়। এবার সেই 'ভাল'কে পেয়েছে ওরা!'

বিষণ্ণ হয়ে জিনেতের হাত স্পর্শ করল লুসিয়ঁ। বলল, 'তোমাকে এগোতে হবে। জার্মানরা বোমা ফেলবে এবার। এক পাল সৈন্য দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু ওদের সঙ্গে ক-জন অফিসার আছে জানো? তিনজন। বাকী সবাই পালিয়ে গেছে। ওরা বলছে পাহাড়টাকে ওরা রক্ষা করবে। আমার তো বিশ্বাসই হয় না। এইই তো দেখছি সব সময়ে। আমরা ট্রেঞ্চ কাটি আর অপেক্ষা করি তারপর পিছু হটার নির্দেশ আসে। জার্মানরা আসে আর বোমা ফেলে। হাঁটা শুরু কর, জিনেৎ।'

'লুসিয়ঁ তুমি কি এখানে থাকবে?'

'আমি? আমি তো ডানকার্কেও ছিলাম। মৃত্যুই আমার পক্ষে ভাল।'

'কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি। আমি বাঁচতে চাই, লুসিয়ঁ।'

লুসিয়ঁকে একটা উষ্ণ চুমু দিয়ে নিজের পথ ধরল জিনেৎ। পাহাড়ের চুড়োয় গিয়ে থেমে দাঁড়াল। অস্তগামী সূর্যটা কেমন প্রকাণ্ড আর রক্তাভ। পাহাড়ের ওপর থেকে ধ্বংসাবশেষগুলো চোখে পড়ে না, সারা পৃথিবীটা মনে হয় কেমন শান্ত, চারদিক কেমন সবুজ আর সতেজ। দূরে চওড়া অগভীর লয়ার নদীটা ঝলমল করছে অলসভাবে। ছোট ছোট বালিয়াড়ি দ্বীপগুলো ঝোপঝাড়ে ঢাকা। জিনেতের কাছাকাছি দুটো গাছ সান্ত্রীর মত স্থিরভাবে পাহারা দিচ্ছে, ঘন কালো পাতাগুলোর নক্সা আকাশের বুকে খোদাই করা। দূরের গাছগুলো ঘন নীল। বাবুই পাখী ঘাস খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে। অনেক দূরে একটা কুকুর ডাকছে নীচু গলায়। একটা পরিত্যক্ত ছোট্ট শাদা বাড়ী নিরুপদ্রব আশ্রয়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে হাতছানি দিচ্ছে তাকে। ব্যাগ থেকে একটা বিস্কুট বের করতে করতে জিনেৎ ভাবল: 'কী অদ্ভুত সুন্দর এই জায়গাটা!' জীবনের অনাবিল আনন্দের কুহক পেয়ে বসল তাকে।

আবার সেই পরিচিত গুঞ্জন ধ্বনি শুরু হয়েছে। নিঃসংকোচে ঘাসের ওপর শুয়ে

পড়ল জিনেং। তার সঙ্গীরা আগে যে ভাবে শুয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবে সেও সবার অলক্ষ্যে শুয়ে শুয়ে ঘাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইল নিজেকে। আর কী অদ্ভুত ঘাসের গন্ধ—তার শৈশব আর বসন্তের প্রথম উল্লাসের গন্ধ এই ঘাসের মধ্যে। টিপ টিপ করছে জিনেতের বুক। গুঞ্জনধ্বনি আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। এর মধ্যেও জিনেং ভাবছে: 'নিশ্চয়ই কোন সুগন্ধী ঝাড় আছে কাছাকাছি। সুগন্ধী ঝাড়ের গন্ধ আসছে......'

জিনেতের মৃত্যু-যন্ত্রণা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। তার জামাকাপড় আর চার-দিকের ঘাস লাল হয়ে উঠল রক্তে। কেমন প্রশান্তি তার মুখে। বাতাসের ঝলকে তার দীর্ঘ ঢেউয়ের মত চুলগুলো নেচে উঠল। আর তার বড় বড় স্বপ্নীল চোখ দুটো তাকিয়ে রইল প্রথম পাণ্ডুর তারাগুলির দিকে।

৩২

'কক ড্'অর রেস্তোরাঁয় স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে লাঞ্চ খাচ্ছে তেসা। ক্রমেই রীতিমত ক্লান্তিকর হয়ে উঠছিল তাদের আলোচনাটা। কিন্তু বোর্দোর রান্না ও রেস্তোরাঁর বিখ্যাত মদের ভাঁড়ার অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করল তাদের।

একটা ভয়ংকর সপ্তাহ অতিক্রম করতে হয়েছে তেসাকে। মন্ত্রীসভার সহকর্মীদের আসার দিন দুই আগে তুর-এ এসে পৌঁচেছে সে। আর সেই জন্যেই এমনি চমৎকার একটা থাকবার জায়গা সংগ্রহ করতে পেরেছে। অন্যান্য মন্ত্রীদের গৃহহীন ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। বোমায় বিধ্বস্ত হয়ে গেছে শহরটা। রেনো রুজভেল্টকে কতকগুলো তার পাঠানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি। তেসা রসিকতা করে বলল, 'আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইউনাইটেড প্রেসের বিশেষ সংবাদদাতা নিযুক্ত হয়েছেন।' বিশৃঙ্খলা এতই বেশী যে রুজভেল্টের কাছে পাঠানো একখানা তার সারা রাত টেলিগ্রাফ আপিসেই পড়ে রইল। আর এ দিকে প্রতিদিন পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে এগিয়ে আসতে থাকল জার্মানরা।

তেসা ব্রতৈলের সঙ্গে দেখা করার বহু চেষ্টা করল। কিন্তু কেমন বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে সে, কিছুতেই তার সাড়া মিলছে না। ব্রতৈল জানিয়েছে যে তার স্ত্রী নাকি স্নায়বিক অসুস্থতায় ভেঙে পড়েছে। বাজে অজুহাত! তেসা বুঝে উঠতে পারল না ব্রতৈল নিজে কেন ভেঙে পড়েনি। একমাত্র লাভালই ফূর্তিতে

আছে; তার শাদা ধবধপে টাইটা দেখাচ্ছে ঠিক নতুন বরের প্রসাধনের মত। কিন্তু তেসাকে এতটুকু ভ্রুক্ষেপও করল না লাভাল। মন্ত্রীসভার অন্যান্য সভ্যেরা নির্বোধের মত রেনোর বাড়ী থেকে শহর পর্যন্ত ছুটোছুটি করে তাদের হারানো মাল পত্রের সন্ধান করল। সেক্রেটারীরা জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' মন্ত্রীরা তাদের প্রশ্ন আমলেই আনল না।

মন্ত্রীদের সভায় আপোষ আলোচনা শুরু করার সমর্থনে তেসা একটা প্রস্তাব আনল। রেনো বাধা দিয়ে বলল, 'মিত্রশক্তির সঙ্গে আমাদের যে সব বাধ্যবাধকতা আছে তার কী হবে? আমাদের অপেক্ষা করে দেখা উচিত রুজভেল্ট্ কি উত্তর দেয়। মাদেল তেসার দিকে একদৃষ্টে তাকাতেই তেসা চোখ ফিরিয়ে নিল। ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। ওর ধারণা, তেসা বিশ্বাসঘাতক। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানে যে, মাদেল যাকে ধ্বংস করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তার মৃত্যু সংবাদ আগে থেকে লিখে রাখা যায়। মুখখানা কী বীভৎস—এক ফোঁটা রক্ত নেই মুখে! গুপ্তচর!

অপ্রত্যাশিতভাবে সাহায্য জুটে গেল। জেনারেল পিকার্ সভায় যোগদানের দাবী জানাল, ভয়ানক জরুরী খবর দেবার আছে। সাধারণত সংযত পিকার্কে কেমন উত্তেজিত মনে হচ্ছে। চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলল পিকার্ আর তেসা হঠাৎ লক্ষ্য করল তার একটাও দাঁত নেই। দাঁতগুলি কী করে হারাল? তেসা প্রথমে বুঝতেই পারেনি যে জেনারেল কথা বলছে। পিকার্ বলেই চলেছে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমিউনিস্ট বিপ্লব। এক দল ছোট লোক গিয়ে দখল করছে এলিজে প্রাসাদ। ভীষণ আগুন লেগেছে......'

আতঙ্কে তেসার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। বোমা বা গোলাগুলিকে সে ভয় পায় না। এমন কি বন্দী জীবনকে কল্পনা করে তার সঙ্গেও সে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। ব্যাপারটা সত্যি ভয়াবহ কিন্তু জার্মানরা সংস্কৃতিবান মানুষ, মন্ত্রীর সঙ্গে কয়েদীর মত ব্যবহার করবে না ওরা। কেবল কমিউনিস্টদেরই সে ভয় করে। দেনিসের সঙ্গে কথা বলে এটুকু বুঝেছে তেসা যে, কমিউনিস্টরা তাকে ঘৃণা করে। ওরা ক্ষমতা পেলে হাড়িকাঠে তুলবে তাকে! আর তা ছাড়া ফ্রান্সের কী দুর্ভাগ্য! জার্মানরা যেদিন পারীতে ঢুকবে সেদিন কিনা উদযাপিত হবে জাতীয় শোক প্রকাশ দিবস। যাই হোক জার্মানরা কিন্তু কমিউনিস্টদের তুলনায় অনেক ভাল। এলিজে প্রাসাদে নিজেদের ঝাণ্ডা ওড়াবে জার্মানরা কিন্তু প্রাসাদকে এতটুকু স্পর্শ করবে না। আর কমিউনিস্টরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে

সাফ করে দেবে সমস্ত কিছু যেমন করেছিল ১৮৭১ সালে। এখনি আগুন জ্বালাতে শুরু করেছে। গোঁয়ার আর বন্য পশুর সমতুল্য ওরা!

মান্দেল পারীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে আধ ঘণ্টা পরে ঘোষণা করল, 'পারীতে পূর্ণ শান্তি বিরাজ করছে।' পিকার প্রথমে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করলেও শেষে আত্ম-সন্তুষ্টির হাসি হেসে বলল, 'অবশ্য! জেনারেল দেন্‌ৎস আমার বন্ধু। সামরিক নেতাদের মধ্যে ও একজন ক্ষমতাবান লোক। শত্রুকে যে-সব সন্ত্রাসবাদীরা সশস্ত্র বাধা দিতে চেষ্টা করবে তাদের গুলি করে মারবার জন্যে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছে ও।'

তেসা বার বার বলল, 'তুর ছেড়ে যাবার সময় হয়ে এসেছে!' আরেকটা দিন গেল। আরো পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ অগ্রসর হয়ে এল জার্মানরা। ১৪ই জুলাই—কী ভয়ানক দিন আজ। তেসার বদ্ধমূল ধারণা—চোদ্দ নম্বরটা তার জীবনে অত্যন্ত মারাত্মক। চোদ্দ তারিখেই আমালি মারা গিয়েছে। নাপিতের দোকানে বসে বসে তেসা খবর পেল যে জার্মানরা পারী অধিকার করেছে। যদিও ঘটনার জন্যে সে প্রস্তুত হয়েই ছিল তবু সমস্তটা গ্রহণ করতে কেমন যেন একটু বাধল। চিৎকার করে উঠল তেসা: 'কী দুর্ভাগ্য!' নাপিতও সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দিল, 'চলে যান! চুল কাটতে মন লাগছে না আর!' নিশ্চয়ই লোকটা কমিউনিস্ট না হয়ে যায় না।

সন্ধ্যাবেলা তেসা বোর্দোয় রওনা হল।

মাত্র গতকালকার ঘটনা, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একশো বছরের পুরনো। কত দীর্ঘ সময়ই না সে অতিক্রম করে এসেছে! একটা দিন থেকে আর একটা দিনকে আলাদা করে চিনবার ক্ষমতা নেই তার। জার্মানরা ক্রমাগতই এগিয়ে আসছে; লয়ারের ধারে এসে পৌঁচেছে ওরা। পারীতে যারা থেকে গিয়েছিল কী সৌভাগ্যবান তারা—তাদের পক্ষে সমস্ত কিছু চুকে গেছে! কিন্তু এখানে কিছু করা বা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। চাৰ্চিল ভয় দেখিয়ে সুবিধে আদায় করছে। গুজব রটেছে—দ্য গল নাকি বোর্দোয় এসে পৌঁচেছে। কে জানে, কমিউনিস্টদের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকতেও পারে হয়ত! শহরে অনেক ডক-মজুর আছে। প্রেফেক্ট-এর ধারণা, ওরা নাকি ভয়ানক জীব। রেনোকে সরানো দরকার, কিন্তু লেব্রঁ এখনো মনস্থির করতে পারেনি। কেবল কাঁদছে বসে বসে। এখানে চোখের জলের কোন স্থান নেই। এখন সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হল কড়া হাতের শাসন।

তেসাকে স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে কথা বলতে বলল ব্রতৈল ; বার্লিন থেকে আপোষের শর্তগুলো জানা দরকার। ব্রতৈল বলল, এই আলোচনার ওপরই অনেক কিছুই নির্ভর করছে। তেসা এই দৌত্যকর্মে একই সঙ্গে কেমন গর্বিত ও নিরুৎসাহ বোধ করল। স্পেন দেশের লোকটির সঙ্গে রসিকতা করতে চেষ্টা করল। রাজদূতটি বোর্দোর মদের প্রশংসা করায় তেসা কূটনৈতিক চালের সঙ্গে উত্তর দিল, 'আপনাদের 'বিওজাও' আমি খেয়ে দেখেছি। আমাদের শ্রেষ্ঠ মদের তুলনায় কোন অংশে খারাপ নয় ও মদ।'

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আপনাদের দেশের সেই যুগান্তকারী ঘটনার সময়ে আমার ছেলে সালামাঙ্কায় ছিল। অনেক ফ্যালাঞ্জিস্টদের সঙ্গেই গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল ওর, আর জেনারেল ফ্রাঙ্কোকে ও নিজে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল।'

'উনি এখন কোথায় ?'

'মারা গেছে। কমিউনিস্টরা খুন করেছে ওকে।'

মুরগীর রোস্ট 'আ লা ব্রোশ' খাওয়ার পর তেসা আসল কথা শুরু করল। বার্লিনের শর্তগুলি কী! প্রথমে অস্পষ্টভাবে উত্তর দিল স্পেন দেশীয় লোকটি—খুঁটিনাটি বিবরণ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি হবেই, ফ্রান্সকে হেয় করার ইচ্ছা বিজেতাদের নেই। 'খুঁটিনাটি বিবরণ' যখন বলতে আরম্ভ করল লোকটি তেসার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

চিৎকার করে উঠল সে, 'এ সব কথা উঠতেই পাবে না।'

'অবশ্য কতকগুলো বিষয় বদলানো যেতে পারে। আমি এক্ষুনি যা বললাম—আসল কথা হল সংযোগ স্থাপন করা। আপনাদের নৌবাহিনীর ভাগ্যের ওপর অনেকটা নির্ভর করছে। মার্শাল ক্ষমতা পাবার পর সে সমস্ত কিছু আয়ত্তে আনতে পারবে বলে বার্লিনের তেমন ভরসা হচ্ছে না। তা ছাড়া বিশেষ করে মরোক্কো আর সিরিয়ার অপ্রীতিকর মনোভাবে বার্লিন রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছে।'

'ও শুধু ভুল বোঝাবুঝির ফল। ভের্দ্যাঁর বীরের মত প্রভাব ফ্রান্সে আর কারো নেই।'

'তাহলে তো ভাল কথা......ঠিকই বলেছেন আপনি। এখানকার আর্মাঞ্যাকটা দেখছি সত্যিই খাসা।'

স্পেন দেশীয় লোকটির সঙ্গে লাঞ্চ খাওয়ার পর ব্রতৈলের কাছে গেল তেসা।

বলল: 'জার্মানরা একেবারে পাগল। এমন শর্তের কথা জীবনে কেউ কোন দিন শোনেনি। আমি তো সোজা কথা বলছি—শর্তগুলো অসম্মানকর! আমার মনে হয় রেনোই ঠিক—শেষ পর্যন্ত আমাদের ম্যাডাগাস্কারে কেটে পড়তে হবে।'

তেসা যখন দেখল ব্রতৈল জার্মান শর্ত শুনে এতটুকু বিস্মিত হল না, সে থিতিয়ে গেল। বলল, 'অবশ্য জিনিসটাকে অত্যন্ত সাবধানে বিচার করতে হবে আমাদের। আর তাছাড়া প্রথমে যতটা ভয়াবহ মনে হয়েছিল আসলে ততটা ভয়াবহ নয় কিন্তু। আমার শুধু মনে হয় শর্তগুলি এখনই প্রকাশ করা উচিত হবে না। আগে আমরা দস্তখৎ করে দিই তারপর ছেপে বের করব। নইলে কমিউনিস্টরা এই নিয়ে একটা গোল বাধাবে। কিংবা দ্য গল একটা কিছু করবে। ভাল কথা, ও এখন বোর্দোয় বসে আছে। জানা দরকার বসে বসে কী করছে লোকটা। হ্যাঁ, আগামী কয়েকটা দিন আমাদের পক্ষে সংকটজনক। কিন্তু পরে সমস্ত কিছু আবার স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

সন্ধ্যাবেলা রেনো পদত্যাগ করল। তেসা পেতাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে বলল, 'বিজয়ীর গৌরব লাভ করেছেন আপনি।'

কাঁপা ও জীর্ণ গলায় মার্শাল উত্তর দিল, 'ধন্যবাদ।'

গভীর রাত্রে তেসা জোলিওকে নতুন মন্ত্রীসভার নাম খুলে বলল। ছোট্ট বেঁটে খাটো সম্পাদকটি ইতিমধ্যে বোর্দোয় এসে 'লা ভোয়া নুভেল'-এর একটা ক্ষুদে সংস্করণ বের করতে সমর্থ হয়েছে।

'অবশ্য মন্ত্রীত্ব সংকটটা নিয়ম মাফিক কেটে যায়নি। মার্শাল নিজের একটা তালিকা তৈরী করে রেখেছিলেন। চেম্বারে অবশ্য তা ঘোষণা করা সম্ভব হবে না। উপায় নেই—বর্তমানে আমাদের অবস্থা আশ্রয়প্রার্থীদের মত।'

'জার্মান শর্তগুলি কী?' জোলিও জিজ্ঞাসা করল।

'ও সম্পর্কে আমি কিছু বলব না—ব্যাপারটা গোপন আছে এখন। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে শর্তগুলো আমাদের মর্যাদাহানিকর নয়। অন্য কিছু হলে মার্শাল তা গ্রহণই করত না।'

সন্দেহে চোখ দুটো কোঁচকাল জোলিও। বলল, 'মর্যাদাটা অবশ্য একটা স্থিতি-স্থাপক জিনিস। আমি যেটুকু জানতে চাই তা হল—জার্মানদের এখানে আসতে দেওয়া হচ্ছে কি না? আমি একটা চলনসই ছাপাখানা যোগাড় করেছি। আর তাছাড়া, আমার আর মোটর গাড়ীতে বাস করা চলছে না!'

'তুমি এখানেই বসবাস করতে পার। বোর্দোই হবে দ্বিতীয় রাজধানী।'
ঘণ্টাগুলি মাসের মত শ্লথগতিতে গড়িয়ে চলল। জার্মানরা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। ক্রমাগত অগ্রসর হয়ে আসছে ওরা। দিনে দু বার করে মানচিত্রের ওপর শত্রু-অধিকৃত এলাকাগুলিতে দাগ দিল তেসা: অরলেঁআ, শেরবুর্গ, রঁন, দিজঁ, বেলফোর। চতুর্থ দিন তেসা মানচিত্রটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ দিল। অত্যন্ত ক্লান্তভাবে পমারেকে জিজ্ঞাসা করল, 'তার চেয়ে কোন্ কোন্ জায়গাগুলি এখনো আমাদের হাতে আছে তাই বল।'
হঠাৎ শর্তা তেসার কথায় প্রতিবাদ করল, 'ওরা আমাদের একেবারে খতম করে দিতে চায়। শর্তগুলোও এমন যে কোন ফরাসী তাতে সই দিতে রাজী হবে না।' তারপর খানিকটা হেসে শর্তা আবার বলল, 'অবশ্য, তোমার ঐ গ্রঁদেল ছাড়া, কিন্তু সে তো পারীতে রয়ে গেছে।'
'গ্রঁদেল আবার আমার হল কবে থেকে?' তেসা রুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করল, 'আর তাছাড়া, আত্মসমর্পণ করতেই হবে এমন কথাও জোর করে কোনদিন বলিনি আমি। সম্মান বজায় রেখে সন্ধি করতে চাই। এতো খুবই স্বাভাবিক। দরকার পড়লে আমরা আলজিয়ার্সে চলে যাব। অবশ্য গোড়াতে পেরপিঞাঁতে গেলেও চলবে—ওখানে ভঁদর-বন্দর থেকে জাহাজ পেতে অসুবিধা হবে না।'
এমন কি প্রতিরোধ করার কথাও ভাবতে শুরু করল তেসা। অনেকক্ষণ ধরে সে মানচিত্র অধ্যয়ন করল, জেনারেল লেরিদোর সঙ্গে কথা বলল তাই নিয়ে আর তারপর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বেতারে ঘোষণা করল: 'সৈনিকগণ ও নাবিকগণ! এখনো পর্যন্ত সন্ধি হয়নি। সংগ্রাম চলছে। মিত্রশক্তির হাতে হাত দিয়ে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে আমাদের সম্মান রক্ষা করো।'
সন্ধ্যাবেলা তেসা বেড়াতে বেরুলো—মাথা ধরেছে, টাটকা হাওয়া লাগানো দরকার। ঘাটের ধারে কয়েকজন ডক-মজুর চিৎকার করে উঠল তেসাকে চিনতে পেরে: 'বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দেওয়ার কী হল? তাদের নাকি ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে বলা হয়েছিল?'
তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি ডেকে তার ওপর লাফিয়ে উঠে বসল তেসা নিরাপদ হওয়ার জন্যে। গুমোট আর গরম হওয়া সত্ত্বেও জানলাগুলো তুলে দিল। মনে মনে ভাবল, ওরা বোধহয় তার পিছু নিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ব্রতেলের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হল।

শত্রু। 'আবার ঘোঁট পাকাচ্ছে,' তেসা বলল। 'ও চায়, আমরা প্রথমে পেরপিঞা ও তারপর আফ্রিকায় গিয়ে হাজির হই।' চার্চিল আবার তার ফন্দি আঁটতে শুরু করেছে। শত্রু কক্ষনো পরস্পরকে প্রত্যাখ্যান করে না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার ব্যাপারটা মনে করে দেখলেই বুঝতে পারবে। আমি মনে করি জার্মানদের শর্ত মেনে নেওয়াই উচিত। বিপ্লব আর বিশৃঙ্খলায় ডুবে যেতে বসেছি আমরা।'

জার্মানরা উত্তর দেওয়াটা এখনো দরকার মনে করেনি। বোর্দোর দিকে এগিয়ে আসছে ওরা।

ভোরবেলা বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ঘুম থেকে তেসা উঠে বসল। জার্মান বোমারু শহরের ওপর অত্যন্ত নিচুতে উড়ছে। এক ঘণ্টা পরে খবর এল সাতশো লোক হতাহত হয়েছে। হাসপাতাল পরিদর্শনে গেল একবার। আহত শিশুদের দেখে আর ইথারের গন্ধে আচ্ছন্ন বোধ করল সে। 'আমরা ওদের তাড়া করি, আর বোমা দিয়ে উত্তর দেয় ওরা।' তেসা আর্তনাদ করে উঠল। বোর্দোর নগরকর্তা মাকে দু-জনায় এসে দাবী করল, শহরকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্টকে এখান থেকে স্থানান্তরে পাঠান হোক। তারপর আতঙ্ক পেয়ে বসল। তেসা সারাদিন কাটাল স্পেনের রাজদূতের সঙ্গে। সন্ধ্যেবেলা সে গিয়ে জোলিওকে বলল, 'জনসাধারণকে তুমি আশ্বাস দিতে পারো। জার্মানরা মার্শালকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ওরা শহরকে স্পর্শ করবে না।'

কথাটা জোলিওকে বলেছে বলে পরের দিন রীতিমত অনুতাপ বোধ করল তেসা। নানা জায়গায় উন্মত্ত আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড় এসে শহরটাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটা পর্যন্ত একটা অসম্ভব ব্যাপার। রুটিওলার দোকানে এক টুকরো রুটি পর্যন্ত পড়ে নেই। খামারে লোকেরা রাত কাটাচ্ছে। তবু শহরে এসে জমায়েত হচ্ছে তারা।

প্রেফেক্ট-এর ডাক পড়ল তেসার কাছে। তেসা আদেশ করল: 'কাউকে শহরে ঢুকতে দিও না। তাহলে মারা পড়ব আমরা। অটোম্যাটিক পিস্তল দিয়ে পুলিশদের দাঁড় করিয়ে দাও। সৈন্যদের উপর নির্ভর করে কোন লাভ নেই—ওদের মনোবল ভেঙে পড়ছে। আশ্রয়প্রার্থী, জার্মান আর কমিউনিস্ট—সবাইকেই ঢুকিয়ে বসে থাকবে ওরা।'

ভুল শহর প্রতিরোধ করছে জানতে পেরে তেসা ভয়ানক ক্ষেপে উঠল। কী

পাগলামি! কী লাভ হবে হিটলারকে চটিয়ে? তার নির্দেশ মাফিক ফ্রান্সের সমস্ত শহরগুলিতে 'উন্মুক্ত' বলে ঘোষণা করা হল।

তেসা বেতারে আরেকটা বক্তৃতা দিল। আবেগে কেঁপে উঠল তার কণ্ঠস্বর: 'আমরা আশা করি আমাদের শত্রুপক্ষ উদারতার পরিচয় দেবেন। ফরাসীরা চিরদিনই বাস্তববাদী মানুষ। সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি আমরা। আমাদের যদি তলোয়ার কোষবদ্ধ করতে হয়, আমরা বলব—আত্মা অপরাজেয়। কিন্তু, হায় এই মুহূর্তে আত্মার চেয়ে ট্যাঙ্কই বেশী শক্তিশালী!'

ক্লান্ত হয়ে তেসা বসে পড়ল, তার মুখ বেয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। বাইস এসে ঘরে ঢুকল হঠাৎ। আগে থেকে খবর না দিয়ে বাইসকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়াতে রীতিমত আশ্চর্য হল তেসা। তেসা যে একজন মন্ত্রী আর বোর্দো যে বর্তমান রাজধানী—এ কথা যেন মনেই নেই ওদের।

বাইস এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সই করে দিন।'

'কী ওটা?'

বাইস বুঝিয়ে বলল: 'একদল বৈমানিক ইংলণ্ডে উড়ে যাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। ওদের আটকানো দরকার। পেট্রল পাওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

'কিন্তু ও আমার কাজ নয়। আপনি গিয়ে জেনারেলের সঙ্গে দেখা করুন।' তেসা বলল।

ধূর্ত হাসি খেলে গেল বাইসের মুখে। বোঝাতে চাইল, 'দরকার পড়লে কোনদিন জেনারেলের দেখা মেলে না। আর এ ব্যাপারটা জরুরী। আমার উপদেশ, নিয়মানুবর্তিতার কথা বাদ দিন আপনি। এখন আর মন্ত্রিত্বের মার্কা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। আর প্রতিটি ঘাটতি বিমানের জন্যে জার্মানদের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে আপনাকে। বুঝতে পারলেন?'

তেসা চিৎকার করে উঠতে চাইল: 'শয়তান! গুপ্তচর!' কিন্তু চেপে গেল। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল বাইসের দিকে। তারপর কলমটা বার করে চোখ দুটো লাল করে কাগজটায় সই করল। অত্যন্ত বিনীত হয়ে ধন্যবাদ জানাল বাইস।

৩৩

তুর শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছে। শহরের প্রতিরোধকারীরা দু-দুবার উড়িয়ে দিয়েছে ভাসমান সাঁকোগুলোকে। ধূসর-রঙা ঘরগুলো আর তারই সামনে কলনাদে লয়ার নদীর দিকে জার্মানরা তাকিয়ে আছে অবাক চোখে। পোয়াতিএর ছাড়িয়ে সুদূর দক্ষিণগামী রাস্তাটা তুরের মধ্যে দিয়ে চলে গিয়েছে। এই অপ্রত্যাশিত প্রতিরোধে ক্ষেপে গিয়েছে অগ্রগামী সৈনিকেরা। একজন জার্মান জেনারেল, পাণ্ডিত্য প্রকাশে যার অশেষ আগ্রহ, তার অফিসারদের বলল, 'তোমরা এদের কাছে কী প্রত্যাশা করতে পারো? ক্ষুদে ব্যাঙাচিরা বালজাকের জন্মস্থান রক্ষা করছে।'

তুরকে উন্মুক্ত শহর বলে ঘোষণা করা হয়নি কেন? শোনা গেছে নগরকর্তা নাকি নাগরিকদের প্রতিরোধ করতে আবেদন করেছিলেন এবং নাগরিকদের সাহসিকতায় সৈন্যেরা এতদূর লজ্জিত হয়েছিল যে তারা পিছু হটবে না বলেই স্থির করল। প্রথম আক্রমণগুলো স্থানীয় হাসপাতালের আহতরাই ঠেকিয়ে দিল। মাটির নীচের কুঠরীগুলোয় মদের পিপেগুলোর মাঝখানে লুকিয়ে থাকা নাগরিকদের মধ্যে নানারকম গাল-গল্প তৈরী হল। ব্যাটালিয়নগুলো পরিণত হল ডিভিশনে। এক আশ্চর্য রকম গোলা নিয়ে লোকে আলোচনা করল, যে গোলা লেগে জার্মান ট্যাঙ্ক নাকি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ছে। তুর যে কেন প্রতিরোধ করছে এ কথা কেউ বুঝে উঠতে পারল না। আপাতদৃষ্টিতে ঘোর আতঙ্কের সময়েও কতকগুলো সাহসী লোক আর দুর্জয় শহরের অভাব ঘটেনি। দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য, কয়েক শো আহত সৈনিক ও নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক—বয়স্ক লোক যারা গত যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল আর তরুণরা যারা সামরিক কাজে যোগ দেবার মত সাবালক নয়—সবাই মিলে তুরকে ঠেকিয়ে রাখল।

প্রতিরোধকারীদের মধ্যে পার্লামেন্টের ডেপুটি লেফটেনেন্ট দুকান অন্যতম। সৈনিকরা তাকে বলে—'দাদা', গত এক বছরে ভয়ানক বুড়িয়ে গেছে সে। জীবনে যে সব আশাকে অবলম্বন করে সে বেঁচে থেকেছে সবই মিথ্যা বলে মনে হয়েছে তার কাছে। সে অন্ধ নয়; নিজের ভুল সে বুঝতে পেরেছে কিন্তু গোপনে গোপনে সে এই আশাই পোষণ করেছে যে আত্মত্যাগী মানুষের রক্ত আবার পুরনো ফ্রান্সকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে—যে পুরনো ফ্রান্সের সঙ্গে

তার পরিচয় হয়েছে বইয়ের মারফৎ। তুরের প্রতিরোধ তার চোখে ভাগ্যের শেষ উপহার ছাড়া কিছু নয়।

পঁয়ত্রিশ বছর আগে ডুকান তার কয়েকজন সাহিত্যিক বন্ধুর এক পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিল। সে সময়ে অত্যন্ত কুৎসিত ছিল ডুকানের চেহারাটা...দু পাশে দুটো বড় বড় কান ফুঁড়ে বেরিয়েছে...তখন সে স্বপ্ন দেখত বৈমানিক হবার। কবি শার্ল পেগি কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছিল সে সময়ে:

'স্বদেশের চতুঃসীমা তরে
ন্যায়যুদ্ধে প্রাণ দেন যারা
যুগে যুগে বরণীয় তারা।'

যুদ্ধের প্রথম দিনেই পেগি মারা গিয়েছিল। তার মৃত্যুর পর সে যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছিল মার্নের যুদ্ধ। যুদ্ধে যে জয় হবে একথা জানত না সে। চারদিকে পরাজয়, আতঙ্ক ও পলায়ন—এরই মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছিল, প্যারী প্রতিরোধ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছিল তার। আর অবশেষে জয়ী হয়েছিল ফ্রান্স। এই দুঃসময়ে তার কবিতার প্রিয় লাইনগুলি মনে মনে আবৃত্তি করে ডুকান। হতাশা-ভারাক্রান্ত মুহূর্তে পেগির কবিতা পড়ে পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে সে। বোর্দোয় কি ঘটছে না ঘটছে সে চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ডুকান। অশেষ ক্লান্তি, গোলাবর্ষণের নির্ঘোষ আর আহতদের আর্তনাদের মধ্যে বহু বিনিদ্র রাত্রিযাপনের পরও সে যুদ্ধজয়ে বিশ্বাস করে; এই ছোট শহরের প্রতিরোধ করাটাই তার কাছে গোটা ফ্রান্সের জন্যে যুদ্ধ করা।

লয়ারের ডানদিকে জার্মান কামানগুলি তুরকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে। আর ধ্বংসকার্যে সাহায্য করছে বোমারুরা। ভারী ভারী বোমায় মধ্যযুগীয় গঠন, স্তম্ভ আর চূড়ায় সজ্জিত পুরনো বাড়ীগুলো ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রতিরোধকারীদের খাদ্যদ্রব্য, ঔষধপত্র ও গোলাগুলি ফুরিয়ে গিয়েছে সমস্ত। ফরাসী কামানের গর্জন থেমে এল; কেবল মেশিনগানগুলো দূরে সরিয়ে রাখল শত্রুদের।

দ্বিতীয় দিনের শেষ দিকে একটা সংক্ষিপ্ত বিরাম পাওয়া গিয়েছে। ডুকান আর সার্জেণ্ট মাইয়ো রাতের খাবার খাচ্ছে ক্রুটির সামনের এক বাড়ীতে বসে। সৈনিকরা কিছু রুটি আর এক টুকরো মাংস সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তাদের। মনের আনন্দে তারা চিবিয়ে খাচ্ছে আর অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতায় সেই চিবিয়ে

ওয়ার শব্দ শোনাচ্ছে ঠিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিধ্বনির মত। বালির বস্তায় ঢাকা পড়ে গিয়েছে জানলাগুলো। ঘরখানা কেমন অন্ধকার। আসবাবপত্র পুরনো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়: তাকের ওপর গোলাপী মোরগ আঁকা চীনেমাটির পাত্রগুলি সাজানো। সিগারেটের অবশিষ্টাংশ, খালি টিন আর ছেঁড়া চিঠিপত্রে মেঝেটা ছেয়ে গেছে। পাশের ঘরে সৈনিকেরা বিশ্রাম নিচ্ছে।

কে যেন রেডিওর সুইচটা ঘুরিয়ে দিল। বোদো থেকে বক্তৃতা দিচ্ছে তেসা। নতুন গভর্নমেণ্টের মন্ত্রী ট্যাক্স আর 'অমর আত্মা' সম্পর্কে ভাষণ দিচ্ছে।

'মুখ বন্ধ করে দাও শয়তানটার!' আর্তনাদ করে উঠল ডুকান।

সৈন্যেরা হাসিতে ফেটে পড়ল: 'ও বেটা দাদাকে শান্তিতে খেতে পর্যন্ত দেবে না।'

রেডিওটা বন্ধ করে দিল ওরা। সার্জেণ্ট মাইয়ো এক মুখ ঘন ধূসর দাড়ি আর ফুলে ওঠা লাল চোখ নিয়ে হঠাৎ ডুকানকে প্রশ্ন করল 'তুমি ওদের সাহায্য করেছিলে কেন ১৯৩৬ সালে? তুমি তো অত্যন্ত সবল মানুষ। মনে হচ্ছে, আমরা আর এখান থেকে বার হতে পারব না। আমি বুঝতে চাই.....'

'বুঝতে চাও?' ডুকান হাসল। 'আমি নিজে অবশ্য কিছুই বুঝতে পারি না। শাদা কালো হয়ে গেছে আর কালো সবই শাদা। আর সেইজন্তে আমরাও অন্ধ হয়ে গেছি। কিংবা একটা কিছু দেখতে পেয়েছি আমরা। জানি না ঠিক। কিছু খাঁটি লোক নিশ্চয়ই আছে—যেমন দ্য গল। বৃটিশরা মাথা নোয়াবে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্য... ..' হাত দোলাতে লাগল ডুকান।

'গত যুদ্ধে আমি উত্তরে—আরাসে ছিলাম।' মাইয়ো বলল। 'বললে গেলে সমস্ত শহরটাই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মাটি থেকে। এবারও যুদ্ধের প্রথম দিকে আবার আমি আরাসে ছিলাম। ভারী মজার, না? দেখলাম বিশ বছরে লোকে আবার গড়ে তুলেছে শহরটাকে। কেমন নিরিবিলি চারদিক। একেবারে বেলজিয়ানদের পেছন দিকে। কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি যে যুদ্ধটা ওখান পর্যন্ত গড়াবে। কিন্তু যুদ্ধ এল। আমরা যখন আরাস ছেড়ে এলাম, তখন সেখানে আর কিছু নেই—শুধু ধুলো আর কাঁকর। ওরা আবার গড়ে তুলবে। অসম্ভব! এইভাবে জীবন ধারণ করা কি সম্ভব? একটা কিছু বদলাতে হবেই এবং ঠিকভাবে......'

'তুমি কি কমিউনিস্ট ?'

'না, আমি শিক্ষক ছিলাম। পপুলার ফ্রন্টের পক্ষে এবং তোমার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলাম আমি। রাজনীতি নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু এখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। গতকাল ক্যাপ্টেন গ্রেমি বলেছিল—আমি সাচ্চা ফরাসী নই। সব কি একই রকম থাকবে চিরদিন ?'

ডুকান চিৎকার করে বলল, 'আমরা যদি বেঁচে থাকি তাহলে আমিই সর্বপ্রথমে বলব—না! কিন্তু ও কথা বলার সময় আসেনি। বল, তুমি কি বলতে চাও তুমি যাবে না... ..' তোতলাতে লাগল ডুকান, কোনক্রমে কথা খুঁজে পেয়ে বলল—'শহর প্রতিরোধ করতে ?'

উত্তরে গোলার গর্জন কানে এল—বিরাম ফুরিয়ে গেছে।

তৃতীয় দিন সব কিছু নির্ধারিত হয়ে গেল। তুবের মধ্যে অবরোধ ভেঙে ঢুকে গেল জার্মানরা। লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। বুলভার আর জাহাজ-ঘাটার মাঝামাঝি সরু রাস্তাগুলোতে সংঘর্ষ চলল। ধোঁয়ার মধ্যে সূর্যটাকে কেমন ঘোর লাল দেখাচ্ছে। চারদিকে পোড়া গন্ধ।

ছাদের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে রইল ডুকান। তার চোখের সামনে টালি-দেওয়া ছাদ আর দীর্ঘ ঘোরানো রাস্তার বিস্তৃতি। গুলি ছুঁড়তে সে ওস্তাদ। যে ছোট্ট শহরে সে মানুষ হয়েছে, সেখানে ইহুদীদের পরবে মেলা বসে। মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করতে পারে না ডুকান, কারণ সে তোতলার, নিজের কুৎসিত চেহারায় নিজেই সে লজ্জিত, কিন্তু গুলি ছোঁড়ায় তার খুব নাম। মেলায় দর্শকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রুদ্ধশ্বাসে বলাবলি করত, 'কী গুলিই ছোঁড়ে ছেলেটা!' তখন সেটা ছিল তরুণ বয়সের আত্মপ্রত্যয় আর এখন সেটাই তার শেষ আশা। নিরর্থক জীবনটাকে নষ্ট করবে না সে।

দূরে কতকগুলি জার্মানকে দেখতে পেল ডুকান। ধূসর-রঙা দেওয়ালের ধার ঘেঁষে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে ওরা। রাস্তার মাঝখানে পিপে, আসবাব পত্র আর তোষকের অবরোধ।

হঠাৎ একজন ফরাসী সৈনিককে দেখা গেল। লোকটি সার্জেন্ট মাইয়ো। ও কী করছে ? পাগল হয়ে গেছে নাকি ? জার্মানদের দিকে ছুটে গেল মাইয়ো তারপর থেমে দাঁড়িয়ে হাত বোমা ছুঁড়ল। শানের ওপর পড়ে গেল তিনজন জার্মান। বাকী সবাই চম্পট দিল।

উল্লসিত হয়ে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল ডুকান। চিৎকার করে বলল, 'সাবাস সার্জেন্ট!' প্রস্তরীভূতের মত নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো মাইরো। গুলির শব্দ হল একটা; তার হাতিয়ার ফেলে দিয়ে নীচে পড়ে গেল মাইরো।

আবার জার্মানদের দেখা মিলল। তাক করে করে গুলি করতে লাগল ডুকান। ঠেকাতে না পেরে জাহাজ-ঘাটার দিকে পালিয়ে গেল জার্মানরা।

ডুকান রুমাল নিয়ে তার ঘর্মাক্ত কপালটা মুছল; ফ্লাস্কটা টেনে বের করল তারপর—কিছুক্ষণ থেকে ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে তার। জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে রাইফেলটা আঁকড়ে ধরল। বাড়ীর ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিয়ে আসছে জার্মানরা। লম্বা লাল চুলওলা এক সৈনিক তার চোখের সামনে। ওরা দুজন বহুক্ষণ সংগ্রাম করল, তারপর জার্মানটাকে নীচে ফেলে দিল ডুকান।

মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধতা নামল। একটা ভ্রমর ঘরের মধ্যে ঢুকে একঘেয়ে শব্দে গুন গুন করে চলল। ডুকান রাইফেলটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল—জার্মানরা ছাদের ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। আরো দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। খানিকটা ভেবে বলল, 'এই নিয়ে নটা... .' টলতে টলতে কাটা গাছের মত নীচে লুটিয়ে পড়ল ডুকান।

৩৪

পরিশ্রান্ত হয়ে তেসা শরীরটা সোফার ওপর এলিয়ে দিয়েছে। মাছিদের জ্বালায় নিশ্চিন্ত হয়ে বসারও উপায় নেই—কখনো নাকে, কখনো বা কপালে এসে বসছে তারা বা কানে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। নড়া চড়ার শক্তি তেসার নেই; ঘুমের আশায় বসে আছে তবু ঘুম আসতে রাজী নয়। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে সময়ের ক্লান্তিকর মরুভূমির মত। কিন্তু এক সময়ে তার জীবনে দিন আর মাসগুলো যেন হু হু করে কেটে গেছে। উদ্বেগের সঙ্গে দেনিসের কথা মনে পড়ল তেসার। এখন সে কোথায়? জার্মানদের হাতে পড়েছে হয়ত। আর পলেৎ নিশ্চয়ই মারা গেছে। নইলে ও নিশ্চয়ই তেসাকে খুঁজে বের করত—মন্ত্রীকে খুঁজে বের করা কী আর এমন শক্ত ব্যাপার। প্রত্যেকে বলাবলি করছে পথ ঘাট নাকি আশ্রয়প্রার্থীদের মৃতদেহে ছেয়ে গিয়েছে। আর লুসিয়ঁ নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। যে রকম অস্থিরমতি ছেলে ও। ওর মত লোক সবার আগে তলিয়ে যায়।

এবার কী হবে? লাভালের মুখে তো হাসি হাসি ভাবটা লেগেই আছে। বোর্দোর মদের কথায় ম্যর্কের গর্ব আর ধরে না। ব্রতৈল কেবল সরাসরি বলে দেয়, 'এ সব ঠিক হয়ে যাবে।' আলোর সামান্যতম রেখাটুকুও কোনদিকে দেখা যাচ্ছে না। জার্মানরা এগিয়েই আসছে, ব্রেষ্ট আর লিয়ঁ দখল করা হয়ে গেছে। বোর্দোর অনতিদূরে লা রশেল-এ এসে পৌঁচেছে ওরা। সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পিকার সমভিব্যাহারে রাজপ্রতিনিধিরা রওনা হয়েছে। কে জানে, জার্মানরা কি বলবে? হয়ত ওরা ইচ্ছে করেই দেরী করছে। এদিকে ফুঁসে উঠছে সারা দেশ। পমারে বলেছে, কমিউনিস্টরা নাকি মার্সাইএর ময়দানে ময়দানে গলা ফাটিয়ে বেড়াচ্ছে, আর বোর্দোর লোকদের মনোভাবও কী জঘন্য! ডক-মজুরদের সঙ্গে তার সাক্ষাতের সেই ঘটনাটার কথা মনে পড়ায় তেসা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। দ্য গল তো সোজাসুজি অসহযোগ করতে উস্কানি দিচ্ছে, 'বিমান আর যুদ্ধের মালপত্র ধ্বংস করো, যাতে তারা শত্রুর হাতে গিয়ে না পড়ে।' অবশ্য বাইস লোকটা কেমন অশিষ্ট কিন্তু ওর কথাই ঠিক—বিমানগুলোর হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে জার্মানদের। কোন কোন র‍্যাডিকালপন্থী লোক আফ্রিকায় পালিয়ে যাবার কথা ভাবছে। মতলবটা মন্দ নয়! ওরা 'মাসিলা' জাহাজে একটা বার্থ পর্যন্ত তেসাকে দিতে চেয়েছিল। তেসাও তো প্রায় রাজীই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ব্রতৈল বলল, 'মাসিলার' আরোহীদের আমরা দেওয়ালে টাঙিয়ে মারব।' তেসাও সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'ঠিক কথা। এই দুঃসময়ে লোকে কখনো নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে পারে?'

টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল; মন্ত্রীদের সভায় ডাক পড়েছে তেসার।

লেব্রাঁকে নাক ঝাড়তে দেখা মাত্রই তেসা বুঝল খবরটা সুবিধার নয়। পিকারের টেলিগ্রাফ করা জার্মান শর্তগুলো ব্রতৈল সমাধি-স্তবের মত সুর করে পড়ে যাচ্ছে।

তেসা বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'শর্তগুলো অসম্মানকর!'

ব্রতৈল তার দিকে কড়া নজরে তাকিয়ে বলল, 'আমরা যে হেরে গেছি একথা ভুলে গেলে চলবে না।'

তেসা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমি অবশ্য সই করারই পক্ষে।'

ক্লান্তিতে আধ-মরা হয়ে তেসা মাইক্রোফোনের কাছে উঠে গেল এবং তারপর গলাটা সাফ করে নিয়ে তার স্বাভাবিক আড়ম্বরের সঙ্গে জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা

ক্ষ করল: 'আসুন, নিরুৎসাহ হয়ে কোন লাভ নেই! সন্ধির যে সব
ও আমাদের প্রতিনিধিরা মেনে নিয়েছেন সেগুলি নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠোর
কন্তু তাই বলে শর্তগুলি অপমানজনক নয়। শর্তগুলি মর্যাদাপূর্ণ। আমার
গাটা জীবনটাই তার জামীন হয়ে রইল!'

কিন্তু পরে, এক গ্লাশ সোডা খাওয়ার পর অত্যন্ত নরম গলায় ব্রতৈলকে বলল,
'দেখো, বক্তৃতাটা ছাপা না হয় যেন। অন্তত সৈন্যরা আত্মসমর্পণ না করা
পর্যন্ত। আগুন নিয়ে খেলা করে লাভ নেই। ওদের মধ্যে অনেক মাথা-গরম
লোক আছে।'

পিকার বোর্দোয় ফিরে এল। তেসা তৎক্ষণাৎ ছুটল তার সঙ্গে দেখা
করতে।

'তারপর, কী রকম দেখলে?' তেসা জিজ্ঞাসা করল, 'মানে, আবহাওয়াটা
দেখলে কেমন?'

স্নান ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থেকে জেনারেল উত্তর দিল, 'আমার নিজের
উর্দির কথা ভেবে বার বার মাথা হেঁট হয়ে আসছিল।'

'শুধু এইটুকুই? আমার কিন্তু খুঁটিনাটির ওপরই বেশী আগ্রহ।'

'খুঁটিনাটি? নিশ্চয়ই। একটা টেবিল, এক পাত্র জল, একটা কলমদানি আর
কিছু কলম—এগুলোই ওদের ওখানে নজরে পড়ল। অফিসারটি আমায় বলল,
'আমরা আপনাকে গভীর মহানুভবতার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি, তাই না?' বলেই
জলের পাত্রটির দিকে আঙুল দেখাল। তারপর তার সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে
বলল—আমি মার্শাল ফশ নই।'

'তাহলে ও লোকটা বলতে চায় কী? তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করল?'

'লোকটা ফিল্মের অভিনেতার মত। সদর্পে পায়চারি করল, হৈ চৈ করল আর
তারপর বক্তৃতা দিল—কী হেঁড়ে গলা লোকটার! মাঠে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জুতো
দিয়ে ঘাস মাড়াল, যেন বলতে চাইল: 'আমি ফ্রান্সের মাটিকে পায়ের নীচে
মাড়াচ্ছি।' এইটুকু। বাকী যা ঘটেছে তা আমি নিজের কাছেও বলতে
পারব না—ভয়ানক লজ্জাকর সমস্ত ব্যাপারটা।'

আরো তিন দিন কাটল। তেসা ব্যতিব্যস্ত রইল নিজের কাজে। সারাদিনের
ভাবনাচিন্তা তাকে তার নিজস্ব চিন্তাস্রোত থেকে দূরে সরিয়ে রাখল। নানা
কাজ করতে হল তাকে—সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলল, পুলিশ বেষ্টনীগুলি
পরীক্ষা করল, ময়দার সরবরাহ তদারক করল আর দস্তরমত-মহড়ম করল স্পেনের

রাজদূতের সঙ্গে। আর—তারপর মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হল; নতুন মন্ত্রী নেওয়া হল দুজন।

আপোষপ্রার্থী দূতরা রওনা হল রোমে। সবাই শেষ সমাধানের প্রতীক্ষায় আছে। এদিকে শহরগুলোর ওপর বোমাবর্ষণ করছে জার্মানরা।

'আমার আর কারো ওপর আস্থা নেই।' জোলিও ঘেউিয়ে উঠল, 'দেখে নিও, ওরা ঠিক বোর্দো পর্যন্ত ধাওয়া করবে।'

'অবশেষে আপোষের শর্তগুলি সাধারণ্যে প্রকাশ করা হল। ব্রতৈল প্রস্তাব করল, 'জাতীয় শোকদিবস' উদযাপন করা হোক।

তেসা হেসে বলল, 'ও লোকটা শুধু একটা জিনিস জানে, আর তা হল খ্রীষ্ট নাম জপ করা। ধূপের গন্ধ ওর খুব পছন্দ।'

শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে পবিত্র উপাসনা-সভা ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। পের্ত্যা এবং সমস্ত মন্ত্রীরাই উপস্থিত হল সেই সভায়। শবযাত্রায় যাওয়ার মত তেসা একটা কালো টাই পরে এসেছে। গির্জার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কিছু লোক চিৎকার করে বলছে, 'মার্শাল দীর্ঘজীবী হোক।' তেসা বিরক্ত হল; আবার ওরা মার্শালকে আলাদা করে দেখছে।

উৎসবটা এত বেশী বিরক্তিকর মনে হল তার কাছে যে নানা রকম অর্থহীন চিন্তা তার মাথার মধ্যে আনাগোনা করতে থাকল। আচ্ছা, পলেৎ যদি বেঁচে থাকে আর প্রেমে পড়ে থাকে অন্য কারো সঙ্গে। অবশ্য ভীটয়ার যে মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়নি তাতে সে নিজেই আনন্দিত। পরে সে বলে বেড়াবে: 'আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি সইও দিইনি।' দু-এক দিনের মধ্যেই তাদের অন্য কোথাও সরে যেতে হবে। কী হাস্যকর পরিণতি! আর হিটলারের ছোট্ট গোঁফটা কিনা ঠিক চার্লি চ্যাপলিনের মত। গির্জার ভেতরটা কী গরম!

গির্জা থেকে বেরিয়ে আসতেই এক সুদর্শন প্রৌঢ় লোক এসে তেসাকে ধরল। লোকটার বোতাম ঘরে একটি ফিতে লাগানো।

তেসা ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কী চাই আপনার?'

কোন উত্তর না দিয়ে আগন্তুকটি একটা চড় মারল। তেসা গালে হাত দিয়ে শুধু চিৎকার করে উঠল, 'কী জন্যে?'

কালো ক্রুদ্ধ দু চোখে তাকিয়ে থেকে লোকটি বলল, 'আমি আমার দু-দুটো ছেলেকে হারিয়েছি।'

লাকটি আর কিছু বলতে পারল না, পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ভীড় জমল। এক শোকাচ্ছন্ন বৃদ্ধা কেঁদে উঠল। কে যেন চাপা হাসি হেসে বলল, 'জোর ঘুষি মেরেছে ওরা ওর চোয়ালে।' তেসা তাড়াতাড়ি উঠে বসল তার গাড়ীতে।

যখন জোলিও হন্তদন্ত হয়ে এসে পৌছল তখনো তেসা তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি।

'আবার তুমি আমায় গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়েছ।' জোলিও কেঁদে পড়ল। 'দেখা যাচ্ছে যে, শর্ত অনুযায়ী ওরা নাকি বোর্দো দখল করবে। আমার অবাক লাগছে, মার্সাইটাও দিয়ে দিলে না কেন এর সঙ্গে?'

তেসা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। বলল, ক্লেরমঁ-ফেব্যায় ভাল ভাল ছাপাখানা আছে এবং ওখানে খবরের কাগজও খাসা চলবে—তেসা নিজে একটা অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থাও করে দেবে।

জোলিও আর্তনাদ করে উঠল: 'যেন তোমার সাহায্যের জন্যে আমি হা পিত্যেশ করে আছি! ওর আর কাণাকড়িরও দাম নেই। একজন ভদ্রলোকের দালালী করা যেতে পারে কিন্তু তাই বলে দালালদের দালালী করা চলে না! তার চেয়ে মার্সাইয়ের পথে পথে মাছ ফিরি করে বেড়াব আমি।'

জোলিও অনেকক্ষণ বসে বসে গজরালো। তারপর ফিরে গেল হোটেলে, মারি তার জন্যে অপেক্ষা করছে। শান্ত হতে কিছু সময় নিল জোলিও—পুরো এক পাত্র মদ পান করে ফেলল। অবশেষে নিশ্বাস নিতে পারল প্রাণ ভরে। স্ত্রীকে বলল, 'তেসা ক্লেরমঁ-ফেব্যায় চলে যাচ্ছে। এই নিয়ে চার নম্বর রাজধানী। এর পর হবে পাঁচ নম্বর। কিন্তু আমার ঘেন্না ধরে গেছে। এবার পূর্ণচ্ছেদ। যাই হোক জার্মানরাই তো এখন ফ্রান্সের শাসনকর্তা। সুতরাং আমরা পারীতে ফিরে যেতে পারি। অন্তত ওখানে আমাদের নিজস্ব ফ্ল্যাট আছে।'

'কিন্তু পারীতে গিয়ে কি করব?'

'যা আগে করতাম। লা ভোয়া নুভেল্ চালাব। জার্মানদের বুঝি আর কাগজের দরকার নেই! আর কে আমার পিছু লাগবে? তেসা? ও এইমাত্র চোয়ালে একটা ঘুষি খেয়েছে। গাল ফুলে গেছে। যাহোক কিছুটা সান্ত্বনা পাওয়া গেল।'

কয়েকদিন পরেই গভর্নমেন্ট ক্লেরমঁ-ফেব্যায় স্থানান্তরিত হয়ে গেল। তেসা তার দলিলপত্র বিরাট হাত-ব্যাগটায় ভরল আর তোরঙ্গের তালাগুলো

পরীক্ষা করে দেখল। তারপর জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখে পিছনে সরে এল। রাস্তা দিয়ে জার্মান সৈন্য মার্চ করে আসছে। ফিটফাট লেফ্‌টেনেণ্টটি বিনয়ের ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে কয়েকজন পথচারীর দিকে। তেসা চটে উঠেছে; সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না জার্মানরা। সত্যিই কী বিশ্রী। একই সঙ্গে স্বাধীন গভর্নমেণ্টের অবস্থান আর বিদেশী শক্তির প্রবেশ। বিদেশে লোকে কি ভাববে? ভেলভেটের পরদাগুলো টেনে দিল তেসা—জার্মানদের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতে চাইল নিজেকে।

সেক্রেটারী এসে খবর দিল গাড়ী তৈরী হতে এক ঘণ্টা সময় লাগবে। ইঞ্জিন মেরামত করা হচ্ছে। রওনা হওয়ার আগে খানিকটা শুয়ে নিল তেসা। সোনালী সূর্যের কিরণ পরদার মধ্যে দিয়ে এসে দেওয়ালের গায়ে লাফালাফি করছে। হঠাৎ তেসার মনে হল যে লোকটা তাকে অপমান করেছিল, তার ধাতব চোখগুলো সে যেন দেখতে পাচ্ছে। লোকটার কী হল কে জানে। তার পিতৃসুলভ হৃদয়বৃত্তিকে স্বীকার করতেই হবে।......দেনিস কী করছে? আর লুসিয়ঁ?

এই সব চিন্তার পর তেসা প্রিফেক্টকে ফোন করল, 'তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আজ একটা লোক আমায় আক্রমণ করেছিল। হ্যাঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, ঠিক আছে। আমি চাই লোকটাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। ও বলছিল ওর ছেলেরা নাকি যুদ্ধে মারা গেছে। তুমি একটা পরিবারের কর্তা। তুমি বুঝবে কতটা দুর্ভাগ্য এটা। ব্যাপারটা একটা মানুষকে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আমারও দুটো ছেলে মেয়ে আছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারা গেছে ওরা।'

তেসা কোন মতে কথাটা শেষ করল, কান্নায় কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার।

সেক্রেটারী এসে জানাল, 'গাড়ী তৈরী হয়ে গেছে।'

নিজেকে তুলে দাঁড় করাল তেসা। কয়েক মুহূর্ত পরেই একটা লোক এসে বসল গাড়ীতে, এমন একটি লোক, যে মনে মনে বিশ্বাস করে যে সারা জাতির আস্থার অধিকারী সে।

৩৫

গভর্নমেণ্ট ক্লেরম-ফের‍্যাঁয় উঠে এল তার কারণ তার আশেপাশে অনেকগুলি ঝরণা আর তার চারদিকে উষ্ণ প্রস্রবণ সমৃদ্ধ একাধিক আরামপ্রদ হোটেলের সমারোহ। লাভাল ক্লেরম-ফের‍্যাঁয় রইল। আর বাকী মন্ত্রীরা কেউ ভিশি,

কেউবা ম-দোর বা লা বুরবুল পছন্দ করল। তেসার বিচারে রয়া-ই সবচেয়ে উপযোগী জায়গা—রিপাব্লিকের সভাপতির জন্তে আসন সংরক্ষিত করা হয়েছিল এখানে।

বড় খাবারের দোকান 'লা মারকিস স্ত সেভিনি' খদ্দেরের ভীড়ে ছাপিয়ে উঠেছে। খালি টেবিল পাওয়ার আশায় বাইরে অপেক্ষা করছে জনতা। রয়া-র স্বনামধন্ত ঘন চকোলেটের আকর্ষণ আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে ততোটা নয় যতটা তার অভিজাত সমাজের। এত সব বিভীষিকার পর নিজের বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিলিত হতে আর আপন চক্রের মাঝে ফিরে যেতে সত্যিই অদ্ভুত লাগে। সাঁজ এলিজের প্রায় সমস্ত কাফেগুলিই এখানে উঠে এসেছে—মারিনি, কাল্‌ত্‌ বার আর লুসিয়ঁর প্রিয় কাফে—ফুকেৎ।

উত্তাপ আর দুঃখের বোঝায় হাঁপাতে হাঁপাতে মাদাম মন্তিনি তার গল্প বলে চলেছে: 'বিপর্যয়ের এক সপ্তাহ আগেই আমায় প্যারীতে ফিরতে হল—আমার স্বামী কণ্ঠ-প্রদাহে ভুগছিলেন। ওখান থেকে কোন রকমে চলে আসতে পেরেছি আমরা। উঃ, কী ভীষণ পথ! নেভের্‌-এ গাড়ীটা রেখে আসতে হল—পেট্রল পাওয়া গেল না। তারপর কতগুলো গুণ্ডা এসে ভিশিতে পৌছে দিয়ে গেল আমাদের। আমার বোধহয় গাড়ীটা এখনো অক্ষত অবস্থায় পড়ে আছে......'

অন্ত একটা টেবিলে এক সৌখিন নাট্যকার তার দুঃখের কথা বলছে: 'ষোলো তারিখেই প্রথম অভিনয় হবার কথা কিন্তু দশ তারিখ থেকেই গণ্ডগোল বাধল আর এখন কে জানে নাটকের মরশুম কবে শুরু হবে. .....'

শেয়ার বাজারের এক দালাল তার এক কানে যন্ত্র লাগানো কালা সঙ্গীকে চিৎকার করে বলছে, 'নিউ ইয়র্কের বাজার দর না দেখে নিশ্চিত কোন কিছু বলা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু আমি ঝুঁকি নেব না। যখন সব কিছু থিতিয়ে যাবে শেয়ারের দাম আপনিই বাড়বে।'

গাল-গল্প, অনুযোগ-অভিযোগ ও ভবিষ্যদ্বাণী শুনে দেসের অত্যন্ত দুঃখের হাসি হাসল। কি ঘটেছে ওরা এখনো বুঝতে পারেনি। ভাবছে, এক সপ্তাহ বা এক মাসের মধ্যে আবার পুরনো জীবন ফিরে আসবে।

দেসেরই বা এখানে এসেছে কেন? অভিজাত জায়গার প্রতি তার কোন আকর্ষণ নেই এবং চকোলেটের চেয়ে মদই সে বেশী পছন্দ করে। আর এই বিমূঢ় আর চিন্তিত মেয়েদের বকবকানি, ধুলোটে বিছানা-পত্রওলা পুরুষদের বিলাপ, পিকিনিজ আর বাচ্চা টেরিয়ারদের ঘেউ ঘেউ ধ্বনি, দীর্ঘশ্বাস ("মুর্ল্যান

আমি আমার স্যুটকেশটা হারিয়েছি'), বড়াই ('কুলিটাকে একটা ঘরের জন্তে আমি তিন হাজার ফ্রাঁ দিয়েছি'), অভিজাত সমাজের উত্তেজনাপ্রসূত হুড়োহুড়ি আর তাদের মোসায়েবের দল—সমস্ত কিছু দ্বিগুণ বীভৎস মনে হল দেসেরের কাছে। কিন্তু পেট ভরে খেতে আর পান করতে চায় সে। তেসাকে খাবারের দোকানে ঢুকতে দেখে দেসের গাড়ী থেকে নেমেছে।

বকবকানি শুনতে শুনতে শ্বাসরোধ হয়ে এল দেসেরের। সমস্ত কিছু নীচতা আর নোংরামি এসে জমা হয়েছে এখানে! দেসের এখনো চোখের সামনে রক্ত দেখতে পাচ্ছে। পারী থেকে নীস পর্যন্ত যে 'নীল পথ' গিয়েছে সেই পথ দিয়েই এসেছে সে। আগে এই পথ দিয়ে যাওয়া আসা করত পয়সাওলা ফুলবাবু, ছোট ইজের-পরা মহিলা, ফোতোবাবু আর দক্ষিণাঞ্চলে বেড়াতে কিংবা রুলেং খেলতে যারা ভালবাসে। এখন এই পথেই আশ্রয়প্রার্থীরা জটলা পাকিয়েছে। জার্মান উড়োজাহাজ নেমে এসেছে অত্যন্ত নীচুতে আর তারপর বৈমানিকরা হাসতে হাসতে একে অপরকে উড়বার পথ করে দিয়েছে। গোরস্থানগুলো নজরে পড়েছে দেসেরের আর চোখে পড়েছে হাজার হাজার নিরাশ্রয় মানুষ। পারীর বাস্‌গুলো বাসস্থানে পরিণত হয়েছে আর সেই বাস-গাড়ীর বাসিন্দারা সেজন্তে ভাগ্যবান মনে করেছে নিজেদের। অভুক্ত সৈনিকরা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে বীট আর সালগমের সন্ধানে। মেয়েরা উন্মাদের মত তাদের হারানো সন্তানদের উদ্দেশ্তে চিৎকার করে আহ্বান জানিয়েছে। শহরগুলি পরিণত হয়েছে ধ্বংসাবশেষে। না-দোয়া গরুরা পাগলের মত ডেকে বেড়িয়েছে। চারদিকে কেমন পোড়া আর মৃতদেহের গন্ধ।

'নীল পথের' কথা মনে করে দেসের চোখ বুজল। তেসার হাসি শুনে আবার চোখ মেলে চাইল সে।

'কী হে, তুমিও দেখছি এখানে?' তেসা বলল। 'সত্যিই পৃথিবীটা ভয়ানক ছোট! কে ভাবতে পেরেছিল যে এত কাণ্ডের পর আবার আমরা লা মার্‌কিস গু সেভিনিতে মিলিত হব!'

দেসের কিছু বলল না। তেসা বলে চলল, 'তোমাকে সুস্থ দেখাচ্ছে না। জুল, এটা খুব খারাপ কথা কিন্তু। চাঙ্গা হয়ে ওঠা উচিত তোমার। আমি নিজে তো অনেক খারাপ অবস্থা হবে আশঙ্কা করেছিলাম। কিন্তু সব কিছুই ঠিক ঠিক হয়ে গেল। আহাম্মুকদের ব্যাপার তো জানই—মাদেল আর তার দলবল—ওরা সরে পড়তে চেয়েছিল আফ্রিকায়। কিন্তু আমরা যেতে দিলাম না। এই সময়ে

সমস্ত জাতির ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত। খুব শিগ্‌গিরই সমস্ত ব্যাপার মিটে যাবে। জার্মানরা লণ্ডনের দিকে ধাওয়া করবে। এ কেবল দু-তিন মাসের ব্যাপার। খেলা থেকে আমরা সরে গেছি আর এতে আমাদেরই সুবিধে। তুমি কী করবে ভাবছ? তুমি আমাদের সাহায্য করতে পার—আমরা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ হাতে নিচ্ছি। হাসছ কেন? কথাগুলো মিছিমিছি বলছি না।'

দেসেরের হাসি মিলিয়ে গেল। বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'একটা ভাল কথা যে, কিছুই মাথায় ঢোকে না তোমার। তোমার ভাববার দরকার নেই, চকোলেট খাও। আসলে তুমি একটা অভিজাত লোক। রাগ কোরো না, তুমি সত্যিই একটা বনেদী আর সদ্বংশ অভিজাত মানুষ। থাকতেও তুমি এক বনেদী সম্ভ্রান্ত বাড়ীতে। এখন বাড়ীটা জ্বলে পুড়ে গেছে। কিন্তু তুমি সেই অভিজাত মানুষটিই থেকে গেছ। তবে, এর আর কী মূল্য আছে? তোমার জন্যে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

তেসা উষ্মায় ফেটে পড়ল, 'তুমি বরং নিজের জন্যে দুঃখিত হলেই ভাল কাজ করবে। আমি তোমার করুণার অপেক্ষায় বসে নেই। আমি বুড়ো নই, বুঝলে। হাল আমলের ধ্যান-ধারণাওলা মানুষ আমি। আসলে তুমিই অতীতকে আঁকড়ে ছিলে—পপুলার ফ্রণ্ট, উদারনীতি আর আমেরিকা। জেনে রাখ, দেশটাকে সাফ করতে চলেছি আমরা। আমি নতুন গঠনতন্ত্র তৈরী করছি। হিটলারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান সে সব কিছুই আমরা নেব—সমস্ত শ্রেণীর সহযোগিতার আদর্শ, যান্ত্রিকতন্ত্র, শৃঙ্খলা আর আমরা তার সঙ্গে মেলাব আমাদের ঐতিহ্য, পরিবারগত ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, ফরাসী নীতিবোধ আর তারপর ... ...'

তেসার কথায় কর্ণপাত করল না দেসের। সে কেবল বারবার ভাবুকের মত আবৃত্তি করে চলল: 'আহা বেচারী বনেদী এ্যারিস্টোক্রাট!'

তেসা উঠে পড়ল। দেসের তবু বসে রইল সেখানে। প্রতিবেশীদের কথাবার্তা আর শুনছে না সে বা তাদের দিকের তাকিয়েও দেখছে না। এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে অস্থির পদক্ষেপে হেঁটে গেল দরজা পর্যন্ত। কে যেন জোরে বলে উঠল, 'এই যে দেসেরও দেখছি এখানে! তার মানে হালচাল ঠিকই আছে সব।'

দেসের ফিরে দাঁড়াল না; হয়ত সে শুনতেই পায়নি। আবার সেই কালো তুষারাচ্ছন্ন পারী, শকট-আরোহী আশ্রয়প্রার্থী আর নুড়ি-বিছানো পাহাড়কে

দেখতে পেল সে। এই ফ্রান্সকেই তো সে রক্ষা করতে চেয়েছিল—তার শৈশব, মৎসশিকারী, চীনা লণ্ঠন আর কাফে দ্য কমের্সের ফ্রান্স।

একবার সে এক নিরিবিলি নির্জন রাস্তার ধারের আলো-ঝলমল জানলাগুলো দেখিয়েছিল লুসিয়ঁকে—যেখানে লোকে স্যুপ খায়, তাদের পড়া তৈরী করে, বেল্ট বোনে, প্রেম করে আর চুমু খায়। এখন আর সেখানে সে সব কিছু নেই: আছে শুধু চোখের কোটরের মত অন্ধকারাচ্ছন্ন জানলা, বোমা-চিহ্নিত দেওয়াল আর প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ জার্মানদের ভীড়। তাকে অনেক ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্তে আসতে হয়েছে। অনেক কিছুই সে রক্ষা করতে চেয়েছিল। অনেক, অনেক অভিজাত বংশের লোককেই সে আপ্যায়িত করেছে। শাদা-সিদে মদের দোকান আর লক্ষ লক্ষ টাকা সে ভালবাসত। কিন্তু সে সব কিছুই ভুয়ো! আর এই জন্যেই চিন্তিত বোধ করত জিনেৎ। হ্যাঁ, তার দীর্ঘ জীবনে সে এক চঞ্চলমতি, নগণ্য ভাল মেয়েকে ভালবেসেছে। জিনেতের কী হয়েছে কে জানে? হয়ত সে এইখানেই কোথাও রাত্রের আশ্রয়ের জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদি সে পথে মারা গিয়ে থাকে? কিংবা হয়ত পারীতে বয়ে গিয়ে দীর্ঘ জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে? পুরনো রাস্তা দিয়ে ধূসর-সবুজ রঙা উর্দি পরে সৈনিকরা মার্চ করে যাচ্ছে এখন। সত্যিই, জিনেৎকে বাঁচাতে পারল না সে; সবাইকেই সে পথে বসিয়েছে।

হোটেল, দোকানপাট আর গাড়ীর ভীড় ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে দেসের। গাড়ী চালিয়ে চলেছে সে; ঘাসের কেমন একটা টাটকা গন্ধ ভেসে আসছে। জীবনযুদ্ধে পরিশ্রান্ত চোখ দুটি পুলকিত হয়ে উঠেছে ঘন-সবুজ ঘাস দেখে। কোথায় চলেছে তা না জেনেই গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে দেসের। কোন এক অজ্ঞাত কারণে সে দক্ষিণ দিকের খাড়া রাস্তাটার ওপর গাড়ীটা ঘুরিয়ে নিল। কী ঠাণ্ডা আর টাটকা বাতাস! আহা, কী মধুর! গাড়ীটা থামিয়ে নেমে পড়ল সে। জায়গাটা একেবারে নির্জন। অনেক দিন পরে এই প্রথম সে একা রয়েছে। মাঠ আর হলদে, গোলাপী ও বেগুনী ফুলগুলোর দিকে খুশির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল দেসের। ঐ ফুল গাছগুলোকে লোকে বলে 'স্ন্যাপড্রাগন'। কী ছেলেমানুষি নাম! আর এই সব ছাড়িয়েই ঘন নীল পাহাড়ের সারি। তার ওপরকার মেঘগুলোকে দেখাচ্ছে ঠিক ভেড়ার মত।

এখানকার হাওয়াটা এত নির্মল যে দেসের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে নিশ্বাস

ল। সম্প্রতি তার মনে হচ্ছিল তার শ্বাসরোধ হয়ে আসছে। কিন্তু এখানে সে তার হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, কপালের রগ দুটো টিপ টিপ করছে আর ান দুটো আলোড়িত হয়ে উঠেছে গোঁ গোঁ শব্দে।

াব পুরনো বন্ধু বেরনারের কথা মনে পড়ল। প্রত্যেকেই বেরনারকে অভিজ্ঞ মস্ত্র-চিকিৎসক বলে জানত। গতকাল দেসের খবর পেয়েছে যে বেরনার গুলি রে আত্মহত্যা করেছে। ওর মুখখানা ছিল ঠিক যেন ইব্‌সেন-বর্ণিত কোন াদরীর মত—কেমন যেন নীরস আর দৃঢ়। কিন্তু জীবনকে ও ভালবাসত, ফুলের বাগান তৈরী করত আর খেলা করত ওর ছোট্ট মেয়েটার সঙ্গে। আর এখন গুলি করে আত্মহত্যা করেছে বেরনার—ও জানলার ধার দিয়ে জার্মানদের যাতায়াত করতে দেখেছিল, তাই হিজিবিজি কাটবার খাতা থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে লিখেছিল: 'এ আমার পক্ষে অসহ্য। মৃত্যুকেই আমি শ্রেয় মনে করি।'

এক সময়ে মৃত্যুর কথা ভেবে দেসের আতঙ্কিত হয়ে উঠত। কেমন বিচিত্র আর দুর্বোধ্য মনে হত তার। এখন বেরনারের মৃত্যুকে সমীচীন মনে করল সে, জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত এই মৃত্যু। দেসের অকস্মাৎ বুঝতে পারল যে মৃত্যু জীবনেরই একটা অংশ, আর মরণের ভয় কেটে গেল তার মন থেকে।

দেসের মাঠের মাঝখান দিয়ে গাছ পর্যন্ত হেঁটে চলল। বিচিত্র তার হাঁটবার ভঙ্গী—ফুলগুলোকে মাড়াতে চায় না সে। গাছটা দেখে ফ্র্যারি আর জিনেত্তের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা মনে পড়ল দেসেরের।

> 'সংসারের খেয়াঘাটে খুঁজে নেব মোরা দুইজনে
> মরণের পরপারে দূরযাত্রী স্বপ্নের জাহাজ
> আলোঝরা সেই স্বর্গে আমাদের মুক্ত অভিসার......'

আর এই তো সেই বিস্মৃতির লীলাভূমি, স্বর্গ।

একজন বেঁটে আর মোটা প্রবীণ লোক দীর্ঘ ওভারকোট পরে মাঠের মাঝখান দিয়ে ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে আর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বিড় বিড় করে বলছে, 'শস্ত...ভালবাসা...ঠাণ্ডা...' সত্যিই বিচিত্র একটা দৃশ্য! কিন্তু তাকে লক্ষ্য করবার মত এখানে কেউ নেই। শুধু পাহাড়ের ধারে রাখালরা আগুন জ্বালছে; রেডিওর চিৎকার আর আশ্রয়প্রার্থীদের আর্তনাদ নেই এখানে। অতীতের শান্তির মধ্যে বাস করছে ওরা।

পাহাড়ের নীচে সূর্য ডুবে গেল। হাল্‌কা কুয়াশার রূপ নিয়ে মৃত্যু এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশাটা কেমন সজীব আর কম্পমান, ভেড়ার মত তার গতিবিধি।

অন্যমনস্ক হয়ে হেসে উঠল দেসের, তারপর উরুর পকেট থেকে টেনে বের করল মস্ত বড় একটা রিভলবার। বন্দুকের মুখের ওপর ঠোঁটটা চেপে ধরল ব্যগ্রভাবে, যেন ওটা একটা বোতলের মুখ আর গ্রীষ্মের দিনে তেষ্টায় ছটফট করছে সে।

গুলির শব্দ পুনরুক্ত হল প্রতিধ্বনিতে। রাখালরা সতর্ক হয়ে দাঁড়াল, ভাবল সর্বনাশা যুদ্ধের কালছায়া বুঝি তাদের মধ্যেও এসে উপস্থিত হয়েছে!

৩৬

ইতিমধ্যে জুলাই মাস শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু লিমুস্যাঁর ময়দানগুলো মে মাসের মতই ঝলমলে সবুজ। লুসিয়ঁ ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে রইল এই সবুজাভ বিস্তৃতির দিকে। সত্যিই, কী স্নিগ্ধ। তারপর মাঠ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পথ চলতে শুরু করল। সে নিজেই জানে না কোথায় চলেছে। অনেক আগেই ঐ বিরাট এ্যাশ্ গাছটার নীচে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ত লুসিয়ঁ কিন্তু খিদের জ্বালায় উঠে দাঁড়িয়েছে সে। এই তার শেষ মানবিক উপলব্ধি—মনে মনে হেসে উঠল লুসিয়ঁ। গাজর আর বীট খেয়ে বেঁচে আছে সে। কখনো কখনো তারই মত অপরিচ্ছন্ন আর দাড়ি গজানো কোন সৈনিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে সে লুসিয়ঁর সঙ্গে রুটি ভাগ করে নেয়। মাঝে মাঝে কোন এক গ্রামে এক বাটি টাটকা দুধ জুটে যায় তার ভাগ্যে আর রুটির উষ্ণ গন্ধ—যা আগে পীড়িত করে তুলত তাকে—চমৎকার মনে হয় তার কাছে ...বিগত যৌবনের স্মৃতিচিহ্ন আর জীবনের সৌরভ।

লুসিয়ঁ নিজের জন্যে একটা ছড়ি বানিয়ে নিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সে ব্লণাজনের ৮৭ নং পল্টনের সৈনিক ছিল। কিন্তু এখন আর সৈন্যবাহিনী বলে কোন কিছু নেই, লুসিয়ঁ তার নিজের ধারণায় একজন ভবঘুরে মাত্র। ছোট্ট এক গ্রামে সে তার বাবাকে বেতারে আপোষের শর্ত ঘোষণা করে বক্তৃতা দিতে শুনল। তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বুড়ী আর্তনাদ করে উঠল: 'সব চুকে গেল? যাক বাবা, এ একটা ভাল খবর বৈকি!' তার পরে তার শুয়োরটাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলল বুড়ীটা—শুয়োরটার গোলাপী রংটা যেন কোন চিত্রকরের আঁকা নগ্ন নারীদেহের মতই। সৈনিকরা গাল পাড়তে লাগল কিন্তু লুসিয়ঁ মন দিয়ে শুনতে

গেল তার বাবার কণ্ঠস্বরের ছন্দ-লালিত্য। হ্যাঁ, এই তো তার বাবার কণ্ঠস্বর। অনেক পুরনো শৈশবের স্মৃতিকথা জেগে উঠল মনের মধ্যে। মনে পড়ল, তার রোগশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে বাবা একবার বলেছিলেন, 'আমালি, লক্ষীটি, চিন্তা কোরো না। বিজ্ঞান সত্যিই সর্বশক্তিমান।' এখন তার বাবা বলছেন, 'আত্মা অমর।' কিন্তু জিনেৎ তো বাঁচতে চেয়েছিল। লুসিয়ঁ আরও অনেককে দেখেছে যারা বাঁচতে চেয়েছিল। ঐ জার্মান বৈমানিকদের তো দানবীয় শক্তি— স্ত্রীলোকদের আর শিশুদের লক্ষ্য করে সোজাসুজি গুলি করল ওরা কীই বা অর্থ এই বক্তৃতার? আসলে ব্রতৈলের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে তার বাবা আর খুব সম্ভবত হিটলার একটা 'লৌহ ক্রশ' দেবে তার বাবাকে। লুসিয়ঁ ঘন ঘন হাই তুলছে। কেউ কি দুধ খেতে দেবে তাকে? কিন্তু হাজার হাজার সৈনিকই তো এই ভাবে তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে। সমস্ত চাষীরা ঘরের দরজাগুলো বন্ধ করে দিচ্ছে তাকে দেখে আর সেই বুড়ী, যার সঙ্গ ধরে ফেলেছে লুসিয়, সে তার গোলাপী শুয়োরটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কেঁদে চলেছে, 'আমার কিছু নেই, কিছু নেই আমার!'

সন্ধ্যাবেলা ভয়ানক ক্ষুধার্ত বোধ করল লুসিয়ঁ। বন্দুক দিয়ে ভয় দেখাল বুড়ীটাকে। কান্না থামিয়ে বুড়ী শুয়োর-বাঁধা দড়িটা আরো আঁকড়ে ধরল ঘনিষ্ঠভাবে, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'আমার দেবার মত কিছু নেই।' জমিতে থুতু ফেলে লুসিয়ঁ গর্জন করে উঠল, 'কেন গজগজ করছিস।' শুয়োরটার কথা ভাবছে সে।

লুসিয়ঁ নিজের পথ ধরে এগিয়ে চলল। রাস্তা থেকে কিছু দূরেই একটা খামার। খড়খড়িগুলো বেশ শক্ত করে বন্ধ করা। রাত্রির দিকে তাকাতে ভয় পায় চাষীরা। কুকুরদের একটানা ঘেউ ঘেউ শব্দ ছাড়া আর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। লুসিয়ঁ চেঁচিয়ে উঠল, 'এই হতভাগারা, কিছু খেতে দে আমায়।' কেউ কোন উত্তর দিল না, কেবল কুকুরগুলো আরও প্রচণ্ডভাবে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাস্তার ধারে ছোট্ট নদীটার দিকে অগ্রসর হল লুসিয়ঁ। তার উষ্ণ জল পান করল, জলে কেমন কাদার গন্ধ। তারপর একটা গরু-ভেড়া থাকবার আটচালার নীচে শুয়ে পড়ল। মেয়েলী কণ্ঠস্বর শুনে ঘুম ভাঙল তার, একটি মেয়ে তাকে ডাকছে, 'সৈনিক। সৈনিক।' মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। রাত্রির পোষাকের ওপরে মেয়েটি পুরুষদের ওভারকোট পরেছে। জ্যোৎস্না-ঝলকানো রাত, মেয়েটির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখল

লুসিয়ঁ। এমন কি মনে মনে ভাবল: 'মেয়েটি দেখতে মোটেই খারাপ নয়।' ঝলমলে চোখ আর খাঁদা নাকে চমৎকার মানিয়েছে তাকে যদিও তার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হবার মত কিছু নেই। মেয়েটি বার বার বলে চলেছে: 'সৈনিক। তুমি ঘুমোচ্ছ, সৈনিক?' মেয়েটি তার জন্যে মস্ত বড় এক টুকরো রুটি আর কিছু মাংস এনেছে।

মেয়েটি বলল, 'গিন্নী-মা না ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হল। উনি মাংসটা বাইরে রেখে বাকী সব ভাঁড়ারঘরে তালাবন্ধ করে দিলেন। তোমায় আমি উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। আসলে মনিব লোক খারাপ নয় কিন্তু আজকাল তোমাদের মত কত লোকই তো আসছে। উনি বলেন, আমরা সবাই না খেতে পেয়ে মারা যাব। আমি বাইরে এসে দেখি তুমি নদীর দিকে নেমে যাচ্ছ। ওঁনারা শুতে যাওয়া মাত্র আমি খাবার নিয়ে দৌড়ে এসেছি।'

লুসিয়ঁ কথা বলল না, শুধু তার ছুরিটা বের করে গোগ্রাসে গিলতে লাগল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখতে লাগল মেয়েটি। অনেকক্ষণ ধরে খেল লুসিয়ঁ—ভয়ানক তৃপ্তি পেয়েছে সে। কিন্তু খাওয়াটা থামাতে পারল না। ক্লান্তি আর ঘুমে প্রায় হতচেতন হয়ে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে লুসিয়ঁ প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বাড়ীর মেয়ে?'

'আমি ঝি।'

অবশেষে খাওয়া শেষ হলে ঘাসের ওপর ছুরিটা মুছে নিয়ে মেয়েটির দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল লুসিয়ঁ। বুঝল, মেয়েটিও তার দিকে সতৃপ্ত নয়নে তাকিয়ে আছে। রীতিমত অবাক লাগল লুসিয়ঁর—তার ধারণা তার চেহারাটা যে কোন লোককে ভয় পাইয়ে দেবার মত বস্তু। তার সারা মুখে খোঁচা খোঁচা শক্ত বাদামী দাড়ি। কিন্তু তার সবুজ চোখ দুটো চক চক করে সব সময়ে। ধুলো আর ঘামে তার সারা পোষাক আচ্ছন্ন। লুসিয়ঁ হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলল। মেয়েটি তার কথামত এসে বসল। লুসিয়ঁর চেয়ে মেয়েটি প্রায় এক মাথা বেঁটে। ধীরে ধীরে যেন অনেক ভেবে চিন্তে তার কাঁধে হাত রাখল লুসিয়ঁ, তারপর অত্যন্ত সযত্নে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে চুমু খেল তাকে। ভাবল, জল খাচ্ছে সে। আবেগভরে লুসিয়ঁ তাকে অনেকবার চুমু দিল আর তারা দুজন ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লে মেয়েটি ফিস ফিস করে বলল, 'সৈনিক! সৈনিক!'

ার হতে শুরু করেছে। মেয়েটি ছটফট করে উঠল। চুপি চুপি বলল, এই বার গিন্নী-মা ঘুম ভেঙে উঠবেন।'

সিয়ঁ শুধোলো, 'তোমার নাম কি?'

জিন প্রেলি।'

কটা তোলপাড় করে উঠল লুসিয়ঁর। ধীরে ধীরে মেয়েটির লাল রুক্ষ হাতে টোকা মেরে ঠোঁট নাড়াল—কিছু একটা ভালবাসার কথা বলতে চাইল সে কিন্তু পারল না। অবশেষে বলল, 'জিনেৎ...'

'আর তোমার নাম?'

'লুসিয়ঁ।'

'আর কি?'

'লুসিয়ঁ গ্রিভাল।'

তার উর্দি থেকে মাটি ঝেড়ে ফেলে পথ চলতে শুরু করল লুসিয়ঁ, একবার পেছন ফিরে তাকালও না। নদীর ধারে এই রাত্রি-যাপন তার বিচারে ভাগ্যের উপহার—হতভাগ্য মানুষের স্বপ্ন। এখন সে ঘুম থেকে উঠেছে। গ্রিভাল, চুবাঁ, প্রেলি—এসব বাদে যে কোন লোককে বেছে নেওয়া যেতে পারে! ওরা তো লুসিয়ঁকে নিয়ে মাথায় তুলে নাচত, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করবে না। একবার শুধু বললেই হল যে সে তেমার ছেলে, তাহলেই ওরা তাকে খাওয়াবে, পরাবে এবং গাড়ীতে করে ভিশিতে নিয়ে যাবে। কিন্তু এর চেয়ে সে বরং ঐ বুড়ীটাকে খুন করবে, সেই বুড়ী—একটা শুয়োর ছিল যার সঙ্গে।

এক অপরিচিত সৈনিকের দেখা মিলল, লাঠি হাতে হেঁটে চলেছে সে। তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চোখ কোঁচকাল।

সৈনিকটি রসিকতা করে বলল, 'মার্শাল দেখছি পল্টন হারিয়ে ফেলেছেন।'

'হ্যাঁ, আলপিনের মত।'

তারা যে যার আলাদা পথে চলে গেল। নতুন দিন শুরু হয়েছে, খাবারের সন্ধান করতে হবে তাদের।

অবশ্য মার্শাল পেতাঁর মাথা ব্যথাটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে নয়। গতকালই সে ফরাসী জাতিকে উদ্দেশ্য করে বক্তৃতা দিয়েছে। বলেছে, সে কারো সঙ্গে প্রতারণা

করতে চায় না। অসন্তুষ্ট হয়ে সে পর পর ঘোষণা করেছে, 'রাষ্ট্রের ওপর নির্ভর করবেন না। রাষ্ট্র কিছু দিতে পারবে না আপনাদের। আপনাদের সন্তানসন্ততিদের ওপর নির্ভরশীল হোন। তাদের মধ্যে ধর্মভাব ও পারিবারিক নীতিবোধ জাগিয়ে তুলুন। তারাই আপনাদের বাঁচিয়ে রাখবে।' মার্শালের বক্তৃতা শুনে তেসা প্রথমে ভয়ানক মুশড়ে গেল। তাকে তো কেউ বাঁচিয়ে রাখবে না—ঐ হতচ্ছাড়া লুসিয়ঁ টাও নয়, উগ্রমতি মেয়ে দেনিসও নয়। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে সে বিদ্রূপ করে লাভালকে বলল, 'পঁচাশি বছর বয়সে এ কথা বলা অবশ্য ন্যায়সঙ্গত, বিশেষ করে যখন ছেলেমেয়েরা নয়, রাষ্ট্রই ওর ভরণ-পোষণ করছে।'

সৈনিকদের কথা কারও মনে নেই। রাজদূত ও প্রতিনিধি বাছাই, ব্রতৈলের নেতৃত্বে প্যারীতে প্রতিনিধি দল প্রেরণ, নতুন গঠনতন্ত্র রচনা, যুদ্ধের মাল মশলা জার্মানদের হস্তান্তর করা ও দ্য গলের গোরিলা দলের সঙ্গে মোকাবিলা—মন্ত্রীরা এই সব নিয়ে ব্যস্ত। সৈন্যবাহিনী—নিজের খেয়াল খুশি মত ভেঙে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে। রেল গাড়ীর চলাচল বন্ধ। অনধিকৃত এলাকার লোকেরা পায় হেঁটে দক্ষিণমুখো আসছে। প্যারীর বাসিন্দা আর উত্তরাঞ্চলের লোকদের অবস্থা ঠিক ভবঘুরের মত. এদিকে চাষীরা সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে পুলিশের কাছে অনুনয় বিনয় করছে।

লুসিয়ঁ একটা পাহাড়ের মাথায় উঠে বসল। সারাদিন শুয়ে রইল ঘাসের ওপর, এতটুকু নড়াচড়া করল না পর্যন্ত। দিনটা কেমন ঠাণ্ডা। পূর্বাঞ্চলের দুটি প্রতিবেশী শহরের ধূসর-রঙা দুর্গের উদ্দেশ্যে ভাসমান বিরাট স্ফীতকায় মেঘগুলির পেছনে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। লুসিয়ঁর কাছে কেমন অদ্ভুত লাগল এই মেঘের গতিবিধি। কোন কিছুই তার স্পষ্ট মনে পড়ছে না এবং অতীতের দিনগুলোকেও সে ফিরিয়ে আনতে চায় না, কিন্তু মেঘগুলির গতিবিধির মধ্যে সে একটা সময়-জ্ঞান খুঁজে পেল। মনে হল সে যেন আবার সংক্ষিপ্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করছে। আঁরির মৃত্যু, কেমিস্টের দোকানের বাইরে জিনেতের চাউনি, বালিয়াড়ির পেছনকার সমুদ্র আর ঐ দুটি দুর্গের ওপরকার হালকা কুয়াশা—সমস্ত কিছু যেন এক সঙ্গে মিশ খাওয়ানো। সেই জন্যে সূর্যাস্ত ও দ্রুতগামী গোধূলির মধ্যে মেঘগুলির বিলুপ্তির পর জীবনটা যেন ফুরিয়ে এল লুসিয়ঁর কাছে। খানিক ঠাণ্ডা আর খানিক ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠল সে। এর আগে সে কোনদিন মৃত্যুকে ভয় করেনি। কিন্তু ম্লান কুয়াশাচ্ছন্ন তারাগুলির নীচে পাহাড়ের এই

ভর্সেতে সন্ধ্যায় সে ভীত হয়ে উঠল কেন? বিস্মিত হয়ে নিজেই সে হঠাৎ ৎকার করে উঠল, 'রুটি!' সত্যিই সারাদিন সে কিছুই খায়নি। তাকে ঠে গিয়ে সন্ধান করতেই হবে।

পত্যকার মধ্যে নেমে পড়ল লুসিয়ঁ। ছোট ছোট চতুষ্কোণ জানলায় আলো ঝলমল করছে গাছপালার মধ্যে। দরজায় ঘা দিয়ে লুসিয়ঁ বলে উঠল: 'সৈনিকের জন্যে কিছু রুটি মিলবে?' কেউ জবাব দিল না। সেজ্রে নামে এক একগুঁয়ে বুড়ো এই বাড়ীটার মালিক। ধর্মযাজকের কাছে স্বীকারোক্তি করার দরুণ তার স্ত্রীকে সে না খেতে দিয়ে মেরেছে। সিংহের মত তার শক্তি; হাতের জোরে তামার পয়সা বেঁকাতে পারে সে। গুহার মধ্যে ওৎ পেতে থাকা ভাল্লুকের মত এই লোকটি। এক সন্ত্রস্ত যুবতী ঝি সঙ্গে থাকে তার। মনিবের বকুনি খেলেই সে ঢেঁকি তুলতে শুরু করে। তার বড় ছেলে বহুদিন হল কানাডা গিয়েছে। ছোট ছেলেটি পাশের গ্রামে তার শ্বশুরের সঙ্গে থাকে। মাসখানেক আগে তাকে সৈন্যদলভুক্ত করা হয়েছে যদিও বাঁ হাত দিয়ে সব কাজ করার অভ্যাস ছিল বলে সামরিক কাজ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল সে। ভাগ্যই লুসিয়ঁকে সেজ্রের বাড়ীতে এনে উপস্থিত করল।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে লুসিয়ঁ চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছু রুটি দে না।' পাশের জানলা থেকে বাঁধাকপি আর পেঁয়াজের গন্ধ ভেসে আসছে, স্যুপ তৈরী করছে ঝিটা। গন্ধ পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল লুসিয়ঁ। একটা বন্য ভাব জেগে উঠল তার মধ্যে, আলোকোজ্জ্বল জানলাটা কিন্তু নিস্তব্ধ। লুসিয়ঁর কাছে অসহ্য লাগল এই নিস্তব্ধতা। ওরা তাকে গালাগালি দিয়ে খেদিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাই বলে সাড়া দেবে না কেন? উচ্ছন্নে যাক সব। কাদের জন্য তাহলে যুদ্ধ করল সে?

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল। শার্সীর মধ্যে একটা বুড়ো লোকের মুখ দেখা যাচ্ছে। লোকটাকে দেখে ব্রতৈলের কথা মনে পড়ল লুসিয়ঁর। সেজ্রে মোটেই 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতার মত দেখতে নয়, কিন্তু লুসিয়ঁ এতটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে যে তার মনে হচ্ছে এই লোকটির মধ্যে সে ব্রতৈলের সাদৃশ্যই দেখতে পেয়েছে। খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে লুসিয়ঁ আর্তনাদ করে উঠল, 'দোর খোল শয়তান কোথাকার! নইলে গুলি করব তোকে!'

লুসিয়ঁ ঐ আলোকোজ্জ্বল অপয়া জানলাটাকে লক্ষ্য করেই গুলি করত কিন্তু তার আগেই গুলির শব্দ হল; লুসিয়ঁ যেন নাচছে এমনি ভাবে পা দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে মাটিতে পড়ে গেল।

পড়বার সময়ে একটা কথাও উচ্চারণ করল না লুসিয়ঁ। সের্জেই কেবল আর্তনাদ করে উঠল। আশেপাশে কোন বাড়ীঘর থাকলে লোকেরা তক্ষুনি ছুটে আসত, কিন্তু সের্জের বাড়ীটা একটা নির্জন উপত্যকার মাঝখানে আর সেখান থেকে কেবল একটা প্রতিধ্বনি ফিরে এল: 'এ্যাই!' আর রান্নাঘরের ঝিটা ভয়ে হেঁচকি তুলতে তুলতে নিস্তেজ হয়ে এল।

এক সময়ে সের্জে শুয়োর শিকারে যে বন্দুক ব্যবহার করত সেটা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি লুসিয়ঁর কাছে দৌড়ল। লুসিয়ঁ শেষ নিশ্বাস ফেলছে। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হল তার কুয়াশাচ্ছন্ন চাঁদ সবুজ আলোয় স্নান করিয়ে দিচ্ছে লুসিয়ঁর গাল দুটো। বেড়ালের মত চক চক করছে তার চোখ আর তার চুলগুলো যেন ঝলসে উঠছে আগুনে। কোন জনপ্রিয় ফিল্মের কন্দর্পকান্তি দস্যুর মত দেখাচ্ছে তাকে। সের্জের লণ্ঠনের আলোয় তার উর্দির ওপরকার রক্ত ঘন টাটকা রঙের মত ভেসে উঠল।

লণ্ঠনটা নীচে নামিয়ে রেখে সের্জে মৃতদেহের পাশে গিয়ে বসল। গভীর রাত্রি পর্যন্ত একই ভাবে বসে রইল সে; মাঝে ধূমপান করার ইচ্ছে হওয়ায় তামাকের থলিটা টেনে বের করল কিন্তু তারপর ভুলে গেল তার কথা। স্থির হয়ে বসে রইল সের্জে; কেবল উস্কোখুস্কো ধূসর চুলশুদ্ধ বিরাট মাথাটা একটু একটু করে এদিক ওদিক দুলতে থাকল।

ঝিটা বাইরে বেরিয়ে এল। ত্রস্ত পায়ে মৃতদেহের কাছে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ইস! কী সুন্দর চেহারাটা!'—তারপরই হেঁচকি উঠে কণ্ঠরোধ হয়ে এল তার। সের্জে গর্জে উঠল: 'চুপ!' মেয়েটি চলে যেতে চাইল কিন্তু সের্জে থাকতে বলল তাকে। এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে বিচিত্র ও অবিচলিত গলায় বলল, 'ডাকাত! কিন্তু কে সে? একজন সৈনিক! একজন ফরাসী......'

মেয়েটি হঠাৎ ভয়ে ছাইএর মত শাদা হয়ে গেল, মৃত লোকটির পাশে বসে চিৎকার করে কাঁদছে তার মনিব:

'পিয়েরো! আমার খোকা!'

সকালে একটা রিপোর্ট লেখা হল। সের্জে সই করে দিয়ে বলল, 'এবার আমায় নিয়ে চলুন।' কিন্তু পুলিশের হাতে ইতিমধ্যে বহু লোক জমা হয়ে গিয়েছে, যাদের সংগ্রহ করতে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করতে হয়নি। সার্জেন্টটি বলল, 'ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখা হবে। তারপর দরকার পড়লে, ওরা

...কে পাঠাবে আপনাকে।' লুসিঁয়র পকেট হাতড়ে ওরা কোন কাগজ খুঁজে পেল না। তাই রিপোর্টে লিখল: 'অপরিচিত লোক—পরনে সৈনিকের ...র্দি।' হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল, 'এই যে পেয়েছি।' লুসিয়ঁর ...কাটের ভেতরকার পকেট থেকে যে কাগজের টুকরো পাওয়া গিয়েছে সেটা দেখাল মেয়েটি। সার্জেণ্ট কাগজটা খুলল। বড় বড় হরফে তিনটি কথা লেখা আছে কাগজটিতে: 'ফ্রান্স, জিনেৎ, মেরদ্।'

থুতু ফেলে সার্জেণ্টটি চেঁচিয়ে উঠল, 'ডাকাত।'

৩৭

ক্লামাসের ফ্ল্যাটে দেনিস আত্মগোপন করেছে। বৃদ্ধা মহিলাটি যে এখনো পারীতে আছেন তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই। ড্রামের বাজনা বা গানের শব্দ এই রুদ্ধ গলির ভেতর পৌঁছয় না। নিঃশব্দতাটা প্রায় অসহ্য। দেনিস বহুবার চলে যেতে চেয়েছে কিন্তু ক্লামাঁস বলে কয়ে ধরে রেখেছেন তাকে।

ক্লামাঁস বলেছেন, 'দুটো দিন সবুর করে যাও। দেখছ তো লোকজন আর কেউ নেই। এখন বেরোলেই ধরা পড়বে।'

প্রতিদিন সকালে ক্লামাঁস থলে হাতে বেরিয়ে যান, ফিরে আসেন রুটি তরকারী আর মাঝে মাঝে কিছুটা মাংস নিয়ে। রান্না করতে বসেন খুশি মনে যেন জিনোর জন্যে সপ্তব্যঞ্জন তৈরী করছেন।

সমস্ত খবর তিনি বলেন দেনিসের কাছে: 'দেভিলরা তো ফিরে এসেছে। রুশো আর তার বৌকেও দেখলাম। আরো অনেকে নাকি ফিরে আসছে। দেভিলের তো দেখলাম বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কমিউনিস্টরা কোথায়? বললাম কমিউনিস্টরা গা-ঢাকা দিয়েছে, সহজে ওদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার মত লোকও ওরা নয়। এ ছাড়া ওকে আর কীই বা বলা যায়? ও কিন্তু একটু স্মুস্থই হল যেন। সবাই বলছে, 'আমরা আর কিসের আশায় বেঁচে থাকব?' জার্মানদের আধিপত্য কেউই চায় না। ও কি, আর একটু সসেজ খাও। বাজারে মাংস নেই, দু-একদিনের মধ্যে অন্য কোন জিনিসও আর পাওয়া যাবে না। জার্মানরা

হাতের কাছে যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। টাকার তো আর অভাব নেই, খুশিমত নোট ছাপিয়ে সৈন্যদের ভেতর বিলি করা হচ্ছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তকমাধারী ফৌজ রাশি রাশি মালপত্র মাথায় নিয়ে চলেছে। কোন বাছবিচার নেই। কফি, মোজা, জুতো—হাতের কাছে যা পাচ্ছে তাই নিচ্ছে। যা পার খেয়ে নাও। কে জানে, হয়ত দু দিন পরে উপোস শুরু হবে। কিন্তু তোমাদের শক্তি যেন এক তিলও ক্ষয় না হয়। দেভিলের কথাই ঠিক—তোমরাই এখন আমাদের ভরসা।'

আতঙ্কের শুরুতেই দেনিসকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেন সে শহরেই থাকে এবং গাস্তর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে পারীর কাজ চালিয়ে যায়। জার্মানরা আসবার আগের দিন। দেনিসকে যে ঠিকানাটা দেওয়া হয়েছিল সেখানে সে গেল। দরজা খুললেন একজন বৃদ্ধা মহিলা, অশ্রু-ভারাক্রান্ত চোখে তিনি বললেন, 'গাস্তকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি আর এখানে থাকব না, পায়ে হেঁটেই পালাচ্ছি'। একে একে সমস্ত কমরেডের বাড়ী ঘুরে এল। বাড়ীগুলো ফাঁকা। সবাই কি পালাল নাকি? নাকি গা-ঢাকা দিয়েছে?

তারপরের দিনগুলোর নিষ্ক্রিয়তাটা সব চেয়ে ভয়ংকর মনে হল তার কাছে। সময় কাটত একটু একটু করে। রাত্রিবেলা ঘড়িটার অবিশ্রান্ত টিক্ টিক্ শব্দ শুনে প্রবল একটা ইচ্ছা হত ওটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলে। বেসিনের ওপর কলের জল পড়ত ফোঁটা ফোঁটা—টিপ্, টিপ্, টিপ্।

মিশো কোথায়? মিশো বেঁচে আছে কিনা সে খবরটা না জেনেই হয়ত তার মৃত্যু ঘটবে। হয়ত সে আর কোন দিন মিশোকে বলতে শুনবে না—'ঠিক তাই!' ইচ্ছা করলেই তারা দুজনে একসঙ্গে থাকতে পারত; সুখী হত দুজনে। কিন্তু এখন আর কিছুই নেই—না আছে সভা সমিতি, না আছে জীবন। পারী জার্মানদের কবলে। কথাটা সহজে বিশ্বাস হয় না। আর মিশো নেই। হয়ত নিহত বা বন্দী। জীবিত অবস্থায় জার্মানদের হাতে ধরা পড়াটা কী ভয়ংকর! সমগ্র বাহিনীকে ওরা বন্দী করেছে।

জুন মাসের রাত্রি অনন্ত দীর্ঘ মনে হল দেনিসের কাছে। বারবার মনে মনে উচ্চারণ করল, 'মিশো! মিশো!' এবং এই একই নামের পুনরাবৃত্তি কেমন একটা অবচেতন আচ্ছন্নতা সৃষ্টি করল তার মনে।

তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনে পড়ল ক্লদের কথা; ক্লদ তাকে বলেছিল যে ও পারীতেই থাকবে। ওকে খুঁজে বার করবে সে। ওর ঠিকানা সে জানে।

ং মাসের হাঙ্গামার সময় ওর জন্যে সে ঘর ভাড়া করেছিল। সেই বাড়ীতেই এখনো ও আছে কি না কে জানে ?

বরুবার আগে ক্ল্যমাঁস দেনিসকে আলিঙ্গন করলেন যেন সে দীর্ঘ ভ্রমণে যাচ্ছে।

ক্ল্যমাঁস বললেন, 'ঠোঁটে আর একটু রং মেখে নাও। রং-মাখা মেয়েদের জার্মানরা ছোঁয় না।'

পারী শহরের কেন্দ্রস্থল দিয়ে দেনিসের যাবার রাস্তা। প্রথম জার্মান সৈন্য চোখে পড়তেই দু পা সরে গেল সে, প্রায় দৌড়ে পালিয়ে যাবার মত অবস্থা। কী কুৎসিত মুখ! জামার আস্তিনে স্বস্তিকা চিহ্ন আঁকা। কিন্তু এতটা সন্ত্রস্ত হলে চলবে না, মনে মনে নিজেকেই নিজে বলল। সমস্ত কিছু গোপন করে চলতে হবে এখন। নিজের পথ ধরে সে এগিয়ে চলল, তার মনে এখন একমাত্র চিন্তা ক্লদকে খুঁজে বার করে আবার সে কাজ শুরু করতে পারবে কিনা।

বুলভারে পৌঁছে সে চেষ্টা করল কোন দিকে না তাকাতে কিন্তু না তাকিয়েও পারল না। বড় বড় কাফের বারান্দায় জার্মান অফিসার আর বেশ্যাদের ভীড়। মেয়েগুলোর সাজপোষাকের ঘটা দেখলে মনে হয় যেন ওরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। অনাবৃত উরু, পায়ে স্যাণ্ডাল, এনামেল করা হাতের নখগুলো মুক্তার মত ঝকঝকে। হো হো করে হাসছে, শ্যাম্পেন গিলছে আর গ্লাশে গ্লাশে ঠোকাঠুকি করছে। দোকানের জানলায় জানলায় অভিধান আর জার্মান ভাষায় পারীর পথ-বিবরণী। সৈন্যদের জন্যে থরে থরে সাজানো নানা রকমের স্মৃতি উপহার—খেলনার আকারে ঈফেল টাওয়ারের প্রতিরূপ, ছোটখাটো অলংকার, পোস্টকার্ডে ছাপানো ছবি আর অশ্লীল ফটো। কলাও ব্যবসা শুরু হয়ে গেছে। ফ্রাঁ বদলে মার্ক নিচ্ছে সবাই। খবরের কাগজের হকাররা হাঁকছে, 'লে মাতাঁ', 'লা ভিক্তোয়ার।'

একটা খবরের কাগজ কিনে দেনিস তাকিয়ে দেখল। প্রথমেই চোখে পড়ল এক জায়গায় লেখা—'আমাদের অমায়িক অতিথিরা যে ফরাসী খাবারের সুক্ষ্ম স্বাদ সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।' তারপরেই একটা বিজ্ঞাপন—'আমি দুইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছি। জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারি। পরিচারকের কাজ পেলে অনুগৃহীত হব।'

কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দেনিস।

পরিত্যক্ত অধিকৃত শহরে কীট আর পিশাচের অস্বাস্থ্যকর গোপন রাজত্ব শুরু হয়েছে। নিজের বলতে আর কিছুই নেই কারও। দেওয়ালের ছবি, গায়ের জামা, মুখের হাসি, এমন কি শেষ আত্মসম্মানটুকু বিক্রী করছে লোকে। বিরক্তির সঙ্গে দেনিস নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, 'এই কি পারী ?'

নদীটা পার হয়ে বাঁ তীর ধরে বহুক্ষণ সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। রাস্তায় লোকজন নেই, জনশূন্য রাস্তাগুলো আরও বেশী দীর্ঘ বলে মনে হয়।

যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ শহর! দোকানগুলো পরিত্যক্ত, কিন্তু সচরাচর যেমন থাকে তেমনিভাবে সাজানো রয়েছে টাই, খেলনা, খোদাই করা মদের পাত্র। একটা হাঁ-করা দরজায় বুড়ো মানুষের মত ঠেস দিয়ে রয়েছে একটা ভুলে-ফেলে যাওয়া ছাতা। ওপাশে বারান্দায় একটা ফুলের টবে গাছটা শুকিয়ে ঝরে গেছে। বারান্দায় ঝোলানো পাখীর খাঁচা, ভেতরে একটা মৃত ক্যানেরি পাখী। 'নিদ্রাচ্ছন্না সুন্দরী' কথাটা মনে পড়ল দেনিসের। রূপকথার বইয়ে দেখা সেই ছবিটাও মনে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

কারুকার্য খচিত অট্টালিকা, রেনেসাঁ প্রতিমূর্তি, অষ্টাদশ শতাব্দীর স্তম্ভ,—এমন খুঁটিয়ে এসব জিনিসকে সে আর কোন দিন দেখেনি। একদিন এই পাথরকে ক্ষয় করেছিল মানুষ, আজ মানুষের পরাজয়ে পাথরের আনন্দোৎসবের দিন।

বুলভার পোর্ট রয়াল-এ একটা কুঁজো লোক গাছের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাঠি দিয়ে রাস্তা ঠুকতে ঠুকতে একজন অন্ধ রাস্তা পার হয়ে গেল। ওপাশে এক যুবক নেঙচাতে নেঙচাতে পথ চলছে। যত বিকলাঙ্গ আর পিশাচ বেরিয়ে এসেছে গর্ত ছেড়ে। অন্যদের মত এরা পালিয়ে যেতে পারেনি, শহরের মানুষ বলতে এখন এরাই।

লেবুগাছে ফুল ধরেছে, বাতাসে দূরাগত গ্রাম্য গন্ধ। আতঙ্কিত পাখীর দল এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে—আকাশের যান্ত্রিক গর্জনে ওরা এখন পর্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। অধিকৃত শহরের ওপর দিন-রাত্রি জার্মান বিমান উড়ে বেড়াচ্ছে। এত নীচু দিয়ে উড়ছে মনে হয় ছাদের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে বুঝি।

তারপর এই জনশূন্য অঞ্চলে হঠাৎ একদিন লোকজন ফিরে এল। রাস্তায় রাস্তায় ঘুমন্ত শিশু কোলে আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড়। এক সপ্তাহ আগে ওরা শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। তখন ওদের মুখে ছিল ভয় ও আশার চিহ্ন।

বার জিজ্ঞাসা করেছিল কোন রাস্তা ধরে এগুতে হবে, অভিশাপ দিয়েছিল সঘাতকদের, নিরাপদ স্থানে পৌছবার চেষ্টায় ছুটোছুটি করেছিল এখানে ানে। আর এখন কসাইখানার গরু-ভেড়ার মত ধীর মন্থর ওদের গতি।

কয়দিনে কী ভয়ংকর সব দৃশ্যই না তারা দেখেছে। মেশিনগানের গুলি লা থেকে আত্মরক্ষা করেছে, লুণ্ঠিত ট্রেন ছেড়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, বিষাক্ত য়ার জলের ওপর অশ্রুবর্ষণ করেছে। অনেকেরই প্রিয়জন মৃত, প্রত্যেকেই শাহীন। পালিয়ে যাবার সময় কেউ বুঝতে পারেনি যে পারী চারদিক কে অবরুদ্ধ। শাৎর, অরলেআঁ আর জিয়ঁতে পৌছে জার্মানদের সঙ্গে থা হয়েছে। সেখান থেকে হটিয়ে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে ওদের। জেল-ৎ পলাতক আসামীর মত ওরা ফিরে এসেছে নিজের দেশে। জার্মানদের কে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ক্রন্দনরত শিশুর কানে কানে মা বলছে, 'চুপ র বাছা।'

একটা প্রাচীরপত্র দেনিসের চোখে পড়ল। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একজন জার্মান সৈনিকের কোলে একটি শিশু, পাশে একটি হাস্যমুখী মহিলা। তলায় লেখা, 'ফরাসী জনসাধারণের রক্ষাকর্তা।' তার পাশেই একটা বিবর্ণ ছিন্ন ঘোষণাপত্র : 'ওদেয়ঁ......প্রথম অভিনয়...শেক্স্পীয়রের নাটক।' জার্মান সৈনিকটির চোখ উজ্জ্বল নীল। এই রকমের আরো বহু জোড়া চোখ এখন চারদিক থেকে দেনিসের দিকে তাকিয়ে আছে। দেনিস চোখ ফিরিয়ে নিল, তবুও সেই চোখ এড়াতে পারল না। রাস্তাটা পার হয়ে অপর দিকে এসে দাঁড়াল, কিন্তু সেখানেও সেই উজ্জ্বল নীল পাদাটে চোখ। আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল দেনিস—দেওয়ালের গা থেকে বেরিয়ে এসে চোখ দুটো তার দিকে এগিয়ে এল যেন। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি যে ওটা জীবন্ত মানুষ। কিন্তু লেফ্টেনেন্টটি কৌতুকভরে মুখের পাইপটা দু-একবার নাড়াল শুধু।

পরের রাস্তাটার নাম এ্যাভেন্যু দে গোবেলাঁ। খরা রৌদ্রে বিশ-ত্রিশজন স্ত্রীলোক লাইন করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল যেন। কে যেন বলে উঠল, 'ওরা সৈন্যদের এক-এক করে বন্দী করছে।'

হঠাৎ সামনে একটা বাড়ীর দিকে স্ত্রীলোকেরা ছুটে গেল। খানিকটা নীল দুধ ছিটকে পড়ল রাস্তার এ্যাস্ফল্টের ওপর। বাড়ীটার ভেতর থেকে একজন যুবককে বন্দী করে বেরিয়ে এল একদল পুলিশ। যুবকটির পরনে

ফৌজী পাৎলুন, আর শ্রমিকের নীল কোর্তা। কে যেন বলে উঠল, 'ওর মা আসুক!'

একজন বৃদ্ধা মহিলা—মুহূর্তের জন্যে দেনিসের মনে হল যেন মহিলাটি ক্ল্যর্মাস—এগিয়ে গিয়ে সৈনিকটিকে আবেগভরে আলিঙ্গন করল। 'আচ্ছা যাই মা!' ফিসফিস করে বলল যুবকটি।

একটি পুলিশ-ভ্যানের ভেতরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল যুবকটিকে। পুলিশের দলটা কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছে। তাদের দিকে তাকিয়ে মহিলাটি কঠোর স্বরে বললেন, 'ও, এতক্ষণে বোঝা গেল কে তোমাদের লেলিয়ে দিয়েছে!'

তারপর আবার সেই নীল শাদাটে চোখ—কনিয়াক মদ টানছে, সসেজ খাচ্ছে, দাঁত কড়মড় করছে।

রাস্তাটার মোড় ঘুরে দেনিস গিয়ে দাঁড়াল প্লাস দিতালিয়ের পেছনে দরিদ্র অঞ্চলে। বাড়ীগুলো কেমন নেড়া নেড়া। চারদিকে নোংরা আর আবর্জনা। এখন আর কোন সাজসজ্জা নেই—না আছে কলরবমুখর জনতা, না আছে আলোকোজ্জ্বল দোকানের জানলা। এক জায়গায় কয়েকজন বৃদ্ধা তাস খেলছে। দরজায় দরজায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে বহু স্ত্রীলোক, ভঙ্গীটা এমন যেন সৈন্যদের দেখামাত্রই অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু জার্মানরা এখানে আসে না।

দেনিস ঘণ্টা টিপল কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। কে বলতে পারে? শেষ সময়ে লোকে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও পালিয়ে গেছে। বিরাট চলমান জনতার ছন্দোবদ্ধ পদধ্বনি এবং দূরদেশে পালিয়ে যাবার উন্মাদ ইচ্ছা তাদের চালিত করেছে। তাছাড়া ক্লদ গ্রেপ্তারও তো হতে পারে। জার্মানরা বাড়ী বাড়ী ঢুকেছে। দরজায় কান পেতে দেনিস শুনতে চেষ্টা করল। কোন রকম শব্দ নেই।

কিন্তু ভেতরে দরজার ছিটকিনিতে হাত রেখে ক্লদ উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবছিল, 'এবার ওরা এসেছে!' কিছুক্ষণ সে দরজা খুলল না—আরও কিছুক্ষণ সে স্বাধীনতাটুকু উপভোগ করে নিতে চায়।

'তুমি!'

বহুক্ষণ দুজনে কোন কথা বলতে পারল না। কথা শুরু করল ক্লদ: 'আমাদের কপালে শেষকালে এই ছিল! কোন দিন ভাবিনি যে এমন ঘটনা ঘটবে! কথাটা বুঝতে পারছ বোধ হয়—পারীতেও জার্মানদের আবির্ভাব ঘটল!'

দেনিস ওর দিকে তাকাল। গাল দুটো ফ্যাকাশে—কিন্তু চোখের ভেতর আগুন জ্বলছে যেন। অত্যন্ত শ্রীহীন একটা ঘর। টেবিলের ওপর এক টুকরো রুটি, কবিতা লেখা একটা খাতা, আর একটা বই—নাম 'ইস্পাত-তৈরীর ইতিকথা।'

দেনিস বলল, 'আমাদের কিছু একটা করতে হবে। তোমার সঙ্গে আর কারও যোগাযোগ আছে?'

'না। আমাদের লোকজন যারা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জুলিএঁর থাকবার কথা। কিন্তু ওর ঠিকানা আমি জানি না। ভেবেছিলাম ও নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু আমার মনে হয় না যে ও রাস্তায় বেরুতে পারবে। আমরা এখন দাগী লোক হয়ে উঠেছি। আমাদের তল্লাশে ওরা ঘোরাফেরা করছে। শিয়াপ যে এখানে থেকে গেল, তার পেছনে কোন কারণ নেই ভাবো নাকি—ও তো এখন জার্মানদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে।'

'ক্লদ, কিছু একটা করতেই হবে আমাদের। আশ্রয়প্রার্থীরা ফিরে আসছে। প্রথমেই ওরা কাদের কথা জিজ্ঞেস করছে জান? কমিউনিস্টদের কথা। বসে থাকলে চলবে না। এখন বসে থাকাটা রীতিমত অপরাধ।

'আমার এখানে হেক্‌টোগ্রাফ যন্ত্র, কালি আর কাগজ আছে। কিন্তু ওসব দিয়ে এখন আর কি কাজ হবে? ঠিক এই মুহূর্তে কি ধরনের লেখা দরকার তা কি আমরা জানি?'

কথাটা বলে ক্লদ টেনে টেনে কাশতে লাগল। কোন কথা বলল না দেনিস। সে বুঝতে পারছে, কথাটার কোন যৌক্তিকতা নেই। ক্লদ যে একজন অত্যন্ত ভাল কমরেড, যে কোন কাজে ও যে নির্ভীকচিত্তে অগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু দেনিস নিজে যতটা জানে ও তা জানে না। এমন অন্য কেউ নেই যার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে।

নিশ্চেষ্ট ভঙ্গীতে জানলার পাশে বসল দেনিস। সামনে প্রসারিত প্রাণহীন রাস্তা। হঠাৎ সব কথা মনে পড়ল দেনিসের। এই রাস্তা দিয়ে মিছিল গিয়েছিল। বারান্দায় বারান্দায় লাল উত্তরীয় আর সংগীতমুখর জনতা, গাছের ডালে ডালে ছোট ছোট ছেলেদের চড়ুই পাখীর মত লম্ফঝম্প—সব মনে আছে দেনিসের। মেয়েরা বজ্রমুষ্টি তুলেছিল আকাশের দিকে। বিচিত্র, উজ্জ্বল, প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছিল সব কিছু। আর সেই মিছিলের আগে আগে ছিল

মিশো। ঘাড় টান করে বসল দেনিস। মিশো, কোথায় তুমি? কোন উত্তর নেই। সম্মুখে দৃষ্টি রেখে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে মিশো। দীর্ঘ দেহ, প্রাণবন্ত, জার্মান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দীর্ঘ পদক্ষেপে পরিখার পর পরিখা পার হয়ে চলেছে। মিশো জানে, সে ভুল করবে না, সে থামবে না কোনদিন। এগিয়ে চলেছে সে।

অস্পষ্ট হাসল দেনিস, ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল।

'ক্লদ, আমাকে এক টুকরো কাগজ দাও তো।'

ক্লদের মনে হল, দেনিস কবিতা লিখছে। পা টিপে টিপে এক কোণে সরে গেল সে। কিন্তু দেনিস কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল কথাগুলো সে ধরতে পেরেছে, কিন্তু কিছুতেই প্রকাশ করতে পারছিল না। বুলভারে যেতে যেতে যে কথাগুলো তার মনে ভেসে এসেছিল, সেগুলো আবার মনে করতে চেষ্টা করল, 'এই কি পারী?' তারপরেই আরও বহু কথা মনে পড়ল: 'বিপ্লবের লালনাগার......কমিউন প্রতিষ্ঠাকারী নগরী......ফ্রান্সের হৃৎপিণ্ড......'

তার মনে হল যেন সে বহু কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। যে সব সৈনিক সর্বজন-পরিত্যক্ত হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর, নাৎসীদের বিদ্রূপ শুনতে শুনতে যে সব যুদ্ধ-বন্দী রাস্তার পাথর ভাঙছে তাদের কণ্ঠস্বর, যে সব আশ্রয়প্রার্থী অনন্ত দীর্ঘ পথে পথে দিন কাটাচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বর। এ কণ্ঠস্বর ফরাসী জনসাধারণের। আর এই জনশূন্য নগরীতে একটিমাত্র মেয়ে কান পেতে শুনছে সমস্ত কান্না, সমস্ত নিস্তব্ধতা, আশা ও ক্রোধের সমস্ত বাণী। একবারও না থেমে সে লিখে চলল যেন অন্য কেউ বক্তব্য বিষয় তাকে বলে দিচ্ছে।

আগাগোড়া পাণ্ডুলিপিটা নিঃশব্দে পড়ে ক্লদ চোখ মুছল। হাতে খানিকটা বেগুনী কালি লেগেছিল—কালি লেগে নোংরা হয়ে গেল মুখটা।

'দেনিস, কি করে লিখলে তুমি?'

'চুপ!'

টহলদারী সৈন্যের ভারী পায়ের শব্দ তার কানে গিয়েছিল। তারপর গাড়ীর ছাদে লাগানো লাউড-স্পীকারের গলা ভেসে এল:

'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়ে গেছে! বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়ে গেছে!'

৩৮

মার্শাল পেতাঁার দ্বারা আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ভিশিতে হবার কথা। এই উপলক্ষে কাসিনো হলঘরটিকে সাজানো হয়েছে। অল্প কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই মতিনি বাজী ধরে তাস খেলত আর লুসিয়ঁর আকর্ষণ ভুলবার জন্যে একটা প্রাণপণ চেষ্টায় যোসেফিন ট্যাঙ্গো নাচত ভেনিজুয়েলার সংবাদ বিভাগের প্রতিনিধির সঙ্গে।

ফ্রান্সের এই বিপর্যয় এমন একটা সময়ে ঘটেছিল যখন কয়েক হাজার বহিরাগত ভিশিতে আসে সেখানকার জলবাতাসে যকৃতের অসুখ ভাল করবার জন্যে। শীতকালে কয়েকটা হোটেলকে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করা হল। এখন দেখা যাবে পীড়িত ও আহত সৈন্যরা বিচিত্র জনতার দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভিশিকে এখন আর চেনা যাবে না। শুধু যে ডেপুটিরা আর সেনেটররা ভীড় করে এসেছে তা নয়, পারীর অভিজাত সমাজ উঠে এসেছে এখানে। শিল্পপতি, দালাল, বড় বড় কর্মচারী, সাংবাদিক, বারবণিতা—সবাই এসেছে এখানে। চলতে ফিরতে নানারকম মন্তব্য শোনা যাবে: 'এই যে কাউন্ট, তুমিও এখানে!' 'আরে বুল, তুমিও আসতে পেরেছ দেখছি?' 'কিন্তু সেই ক্ষুদে বান্ধবীটি গেল কোথায়?,

সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, এই অভূতপূর্ব বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আজ ঘটবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন এই ঘটনার কেন্দ্রমূল। লাভালের ইচ্ছা, কোন রকম জাঁকজমক না হয়। কিন্তু ব্রতৈল প্রচলিত রীতিনীতির পক্ষপাতী। সুতরাং ঠিক হল, যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে তৃতীয় রিপাব্লিকের কবর দেওয়া হবে।

তেসা বহুকাল ধরে এই ঘটনার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এসেছে, স্বভাবতই সে এখনো আশাবাদী। দীর্ঘ ভ্রমণের উত্তেজনা কেটে যাবার পর সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ, বেঁচে থাকবার ইচ্ছাটা পেয়ে বসেছে আবার। বারবার সে নিজেকে এই কথা বলেছে যে মার্শালের পরিকল্পনা তার পক্ষেই সুবিধাজনক, এখন আর তাকে নির্বাচিত হতে হবে না, সে মনোনীত হবে। মনোনীত হওয়াটা অনেক বেশী নির্ঝঞ্ঝাটের। কিন্তু তবুও মনে মনে উদ্বেগ অনুভব না করে পারছে না। দেসেরের মন্তব্যটা কিছুতেই মন থেকে দূর করা গেল না: 'বেচারা বনেদী এ্যারিস্টোক্রাট!'

অবশ্য দেসেরের চিন্তা এখন আর তার মনে নেই, কিন্তু এই অপ্রীতিকর মন্তব্যের ভেতর কিছুটা সত্যি আছে বৈকি। সে; তেসা, অপরের স্বার্থে ব্যবহৃত হয়েছে আর তারা আত্মগোপন করেছিল তার দূরপ্রসারী খ্যাতির আড়ালে। আর আজ তারাই তাকে কোণঠাসা করবার চেষ্টা করছে। আগামী কাল যে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হবে না এমন কোন নিশ্চয়তা আছে কি? দক্ষিণপন্থীরা তাকে র‍্যাডিকাল বলে মনে করে। বোর্দোতে সবাই তার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হেসেছিল আর এখানে লাভাল তো তার পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কুশল প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করল না। লেবুর রস তৈরী হয়ে যাবার পর নিংড়ে-নেওয়া লেবুটাকে নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়?

প্রায় কান্না পেল তেসার। সবাই তাকে অপমান করছে। সে কি লাভালকে সাহায্য করেনি? জার্মানদের সঙ্গে সন্ধি করা যখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল তখন সেই ভয়ংকর স্প্যানিয়ার্ড লোকটির সঙ্গে কে বোঝাপড়া করেছিল? কে সর্বপ্রথম বলেছিল যে কমাপিএঞ-এ গৃহীত শর্তাবলী সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য? লোকের স্মরণশক্তি এত কম! এমন কি তার নিজের পরিবারের লোকেরাও তাকে বুঝতে পারেনি। ওই খামখেয়ালী দেনিসের কথাই ধরা যাক না কেন। ওকে সে কত ভালবাসত, কত তোয়াজ করত। আর এখন জার্মানরা তো ওর মাথা উড়িয়ে দেবে। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয়! ঠাট্টাতামাসা করে কোন কথা হিটলার বলে না, বলে না বলেই হিটলারের জয়লাভ হয়েছে। দেনিসের কপালে কি আছে কে জানে? দু বার নাক ঝাড়ল তেসা, জল গড়াতে লাগল চোখ থেকে। তারপর লুসিয়ঁর বাদামী রঙের চুলের কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল তেসা। ও নিশ্চয়ই তেসার নাম ডোবাবে। এটা ওর রক্তের দোষ, ঠিক ওর কাকা রবেরের মতই ও হয়েছে। তফাৎ শুধু এই যে রবের চার বছর জেল খেটেই ছাড়া পাবে কিন্তু লুসিয়ঁটার হাড়ে হাড়ে বজ্জাতী। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে ও মারা গেছে? তাহলে তেসার বংশ এখানেই শেষ। আর ফ্রান্সেরও তো কোন ভবিষ্যৎ নেই। হাতটা একবার নাড়ল তেসা। হঠাৎ তার মুখে চোখে একটা ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠল—পলেতের কথা ভাবছে সে। ওই নরকের কীটটা এখন বোধ হয় জার্মানদের মন ভোলাচ্ছে। জাতির বিপদে ওর কি আসে যায়, অল্পবয়সী ফুর্তিবাজ কোন লোককে পেলেই ওর হল।

এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল তেসার মনোভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। এই পরিবর্তনের কারণ ছোট্ট একটি ঘটনা। ব্রতৈল টেলিফোন করে তার খবরাখবর

নিয়েছে। এখন তেসা বুঝেছে যে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়নি। যদিও জাতীয় পরিষদের সভায় মোড়লী করবার দায়িত্ব সে প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু ছোট্ট একটি মর্মস্পর্শী বক্তৃতা সে দেবে। 'লুমানিতে' কাগজে একজন আলশেসিয়ান ইহুদীর আসবাবের দোকানের বিজ্ঞাপন হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে। বিষয়টির উল্লেখ করে সে মন্তব্য করবে: 'এই হচ্ছে ইহুদী পুঁজি আর কমিউনিস্টদের ভেতর যোগসূত্র। এই আত্মঘাতী যুদ্ধের মূল এখানে।'

একেবারে শেষ মুহূর্তে ব্রতৈল তেসাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে বলল, 'শোন, তোমার আজ বক্তৃতা না দেওয়াই ভাল।' বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে তেসা তাকিয়ে রইল। ব্রতৈল বুঝিয়ে বলল যে বক্তৃতা না দেওয়াটাই বিচক্ষণতার পরিচয়। লোকের বিভ্রান্তি ভাবটা এখনো কেটে যায়নি, সবাই চেষ্টা করবে অতীতের সমস্ত ঘটনা টেনে বার করতে। স্টাভিস্কি, পপুলার ফ্রন্ট এবং এমনি আরো নানা কথা উঠবে।' প্রস্তাবে তেসা রাজী হল বটে কিন্তু আবার নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল। বেঁচে থাকতে চায় সে, কিন্তু তার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে যেন।

মনের এই ভাবটা একটু কাটল সদ্য পারী প্রত্যাগত গ্রঁদেলের কথায়। বাইরে বারান্দায় তেসা দাঁড়িয়েছিল। গ্রঁদেল তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে এসে অন্তরঙ্গভাবে পারীর খবরাখবর বলতে আরম্ভ করল: 'প্রথম দিকে ওখানে লোকজন ছিল না বললেই চলে। কিন্তু একে একে সবাই ফিরে আসছে। দু-একদিনের মধ্যে অপেরাগুলো শুরু হয়ে যাবে। মোটামুটি বলা চলে, জার্মানরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে। আর ওদের ব্যবহারও খুব ভাল। ওরা যে বিজয়ীর জাত তা বোঝাই যায় না। মনে হয় যেন অভিভাবক...'

আশে পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ডেপুটি নিঃশব্দে গ্রঁদেলের কথা শুনছিল। একজন সেনেটর বলে উঠল, 'অঃ!' শব্দটা হর্ষসূচক না অসন্তোষসূচক তা একেবারেই বোঝা গেল না।

তেসার হাতে সজোরে একটা নাড়া দিয়ে বের্জেরি বলল, 'এখানে এসে তুমি যে আবার কর্তব্যভার তুলে নিয়েছ তা খুবই সুখের কথা। ফ্রান্সের এই বিপদের দিনে আশা করি তুমি স্থান ত্যাগ করবে না।'

উত্তরে তেসা তার পাখীর মত মাথাটা অল্প একটু কাত করল। খাড়া নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে। বের্জেরির মন্তব্য অভিভূত করেছে তাকে। দেখা যাচ্ছে যে কয়েকজন লোক খুব ভাল করেই তার গুরু দায়িত্বের কথা বোঝে।

একটা লজ্জাকর সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করে এসে অতীতের কবর রচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারাটা কি খুবই সহজ ব্যাপার ?

সে বলল, 'আমি ফ্রান্সের সেবক। হ্যাঁ, ভাল কথা, এখানে ব্লুম আর ফ্লজে দুজনেই হাজির। ভোটাভুটির সময় ওরা কি করে দেখতে হবে। বিশেষ করে ফ্লজে। পড়ে পড়ে মার খেতে পারাটা তো আর সহজ ব্যাপার নয়, কি বল হে! দেখ না কী কাণ্ডটা হয়। 'বিরুদ্ধে' ভোট দিতে সাহস হবে না ওর। দুকান এখানে নেই, বড় আফসোসের কথা। থাকলে দেখা যেত যুদ্ধ লাগাবার জন্যে কত উস্‌কানিও দিতে পারে।'

'কোথায় আছে ও ?'

'খুব সম্ভব ফৌজে।'

গ্রঁদেল যোগ করল, 'আর খুব সম্ভব ও-ই সবার আগে হাল ছেড়ে বসে আছে। ওই সব 'শেষ রাতের মারদেনেওলা ওস্তাদদের' আমি খুব ভাল করেই জানি।'

'কিন্তু ভীইয়ার কোথায় ?'

'কেউ জানে না। আমরা তুর ছেড়ে আসবার পর ওর আর কোন খোঁজ নেই।'

'আমি শুনেছি ও স্পেন হয়ে লিসবনের দিকে পালিয়েছে।'

'বল কি ? স্প্যানিয়ার্ডরা ওকে ওদেশের মাটি মাড়াতে দেবে ভেবেছ ?'

'ভারী মজা হবে কিন্তু—ভীইয়ার গেছে ফ্রাঙ্কোর কাছে ভিসা চাইবাব জন্যে!'

'শোনা যাচ্ছে যে স্প্যানিয়ার্ডরা নাকি সীমান্তে মেশিনগান খাড়া করে রেখেছে। সীমান্ত পার হয়ে ওদিকে গেলেই বন্দীশিবিরে যেতে হবে।'

তেসা হাসল। আসলে ইতিহাস কি, ভাবল সে। অনেকটা চারজোড়া মেয়ে-পুরুষের চতুষ্কোণী নাচের মত—একবার সামনে, একবার পেছনে, আর মাঝে মাঝে সঙ্গীবদল......স্প্যানিয়ার্ডরা হয়ত ভীইয়ারকে ধরে গারদে পুরেছে; নাকের ডগায় প্যাঁশনে ঝোলা অবস্থায় ভীইয়ারের ক্রুদ্ধ চেহারাটা বেশ কল্পনা করা যায়। আর ওর ছবিগুলোর কি হল ? ছবিগুলো কি সত্যিই ও আভিঞঁতে ফেলে গিয়েছে ?

তেসা বলল, 'দুঃখের ভেতরেও কিছুটা ব্যঙ্গ থাকে। ভীইয়ারের কথা ভেবে আমার মজা লাগছে। কি রকম ভয় পেয়েছে ভাবো যে ছবির সংগ্রহকে পর্যন্ত ফেলে যেতে হয়েছে! ওর মুখের ভাব কল্পনা করতে পার ?'

তেসার পেছন থেকে আহত গলায় কে যেন বলল, 'কল্পনা করতে না পার তো, চোখে দেখে নিলেই পার। পল, তোমার ঠাট্টাটা মাঠেই মারা গেল।'

ভেসা আশ্চর্য হয়ে ফিরে তাকাল, 'আরে ওগুস্ত, তুমি? কোথেকে এলে?'
'আভিঞ্জঁ থেকে। আমাকে দেখে এত অবাক হবার কি আছে? চিরদিনের মত আজও আমি স্বস্থানেই আছি।'

তারপর ভীইয়ার ব্যাখ্যা করতে শুরু করল যে সে নতুন ব্যবস্থার একজন উৎসাহী সমর্থক। বলল 'পরাজয়ের ভেতর দিয়ে আমরা ব্যাধিমুক্ত হব। বিজয়ীদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষনীয় অনেক কিছু আছে। হিটলার প্যারীতে আসতে পারল কি করে? কারণ তার সাহস ছিল। মার্শাল পেতাঁ এই হিসেবে পথ-প্রদর্শক। বয়স আশি হলে কি হবে কিন্তু এখনো তিনি দুঃসাহসী। আমি মুক্তকণ্ঠে তাঁর প্রশংসা করি।'

ভীইয়ারের কথা শুনে গ্রঁদেল পর্যন্ত বিব্রত বোধ করল। ভেসা ভাবল, 'ধাড়ী শেয়াল! বুদ্ধিতে এখনো সবাই ওর কাছে হার মানবে।'

অবশেষে সভাপতির ঘণ্টা বেজে উঠল। বক্তাদের কথায় কান দিল না ভেসা। লাভাল তো এখন বলবেই। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে কেন ও চুপ করে ছিল? ভীইয়ারের প্রশংসায় জল ফেটে পড়ছে। ব্লমের চোখে মুখে ক্রোধের চিহ্ন। ব্লম যে 'বিরুদ্ধে' ভোট দেবে কোন সন্দেহ নেই—যাই করুক ওর দিন শেষ হয়ে গেছে।

বিরতির সময় ডেপুটিরা গ্রঁদেলকে ঘিরে দাঁড়াল। সবাই ওকে খোশামোদ করছে, আর মাঝে মাঝে ঘাড় নেড়ে উদাসীন গলায় ও বলছে, 'আচ্ছা বেশ, বেশ, এ সম্পর্কে আমি আবেৎস-এর সঙ্গে কথা বলব।' লুসিয়ঁ যে দলিলটা চুরি করেছিল সেটার কথা মনে পড়ল ভেসার। তুচ্ছ একটা গুপ্তচর আজ ফ্রান্সের ত্রাতা—এ কথা কল্পনা করাও অসহ্য।

বিরতির পরে ব্রতৈল বক্তৃতা দিল। বক্তৃতায় সে বলল যে দেশের এই দুরবস্থা পাপের শাস্তি ছাড়া কিছু নয়, এক 'মহান প্রায়শ্চিত্তের' ভেতর দিয়ে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। তারপর বৃটিশকে গালাগালি দিল কিছুক্ষণ এবং অবশেষে দু বাহু প্রসারিত করে উদাত্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের দেশকে যাঁরা জয় করেছে, তাঁরা যে কত মহৎ তার পরিচয় আমরা পেয়েছি।' ভেসা হাই তুলল—কত বড় ভণ্ড লোকটা! ওর নিজের দেশ লোরেনই তো জার্মানদের কবলে। কী ধড়ীবাজ! কিন্তু এদিকে আলাপ-আলোচনায় একেবারে নীরেট।

হঠাৎ সবাই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মঞ্চের ওপর ফ্লুজে উঠেছে। উঠে

দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই সে হুংকার দিয়ে বলতে শুরু করল, 'দেশের যারা শত্রু, আর যারা নীচমনা, তারা যখন হাত তোলে......' তাকে আর বলতে দেওয়া হল না। তারপর শুরু হল ভোটাভুটি। আধ ঘণ্টা পরে সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল, 'পক্ষে—৫৬৯, বিপক্ষে—৮০।'

তেসা এমন ক্লান্ত বোধ করল যেন সে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে উঠেছে। বাগানে মহিলারা চিৎকার করছে, 'লাভাল দীর্ঘজীবী হোক!' এই চিৎকার শুনেও তেসার মনে এতটুকু ঈর্ষা এল না। মাথা ধরেছে তার। ক্লান্ত পায়ে সে হোটেলে ফিরে গেল।

কিন্তু ভাগ্য তার প্রতি সুপ্রসন্ন। হোটেলের বসবার ঘরে একটি অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে নজরে পড়ল। উন্নত বুক, সিঁদুরের মত টকটকে ঠোঁট, মেয়েটিকে দেখে পলেতের কথা মনে পড়ল তেসার। উৎফুল্ল হয়ে সে এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। এতক্ষণে তার নজরে পড়ল যে মেয়েটির চোখে জল।

মেয়েদের কান্না চিরকালই তেসার কাছে তাদের বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করে তোলে। উত্তেজিত হয়ে সে বলতে শুরু করল ফ্রান্সের নানা দুর্ভাগ্যের কথা। অপরিচিতা সুন্দরী মেয়েটি মাথা নেড়ে সায় দিল। কথার শেষে অত্যন্ত বিনীতভাবে তেসা যোগ করল, 'মন্ত্রী হিসেবে আমি...' মেয়েটি হাসল তারপর নিজের নানা দুর্ভাগ্যের কথা বলতে শুরু করল। নেভের-এ সে একটা ট্রাঙ্ক হারিয়েছে। তার মা পড়ে আছে পারীতে। এখানে তার কাকার আসবার কথা। তিনি শ্রম-দপ্তরে কাজ করেন এবং দেখে শুনে মনে হয় যে তিনি ক্লেরম-ফের‍্যাতেই থেকে গেছেন। এখন সে নিজে যে কি করবে জানে না। তার ব্যাগে মাত্র একশো ফ্রাঁর একটা নোট ছাড়া কিছু নেই।

তেসা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিল এবং সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও খানিকটা সান্ত্বনা পেল যেন। দুজনে নৈশভোজন করল একসঙ্গে। ফূর্তি ও আমোদের ভাবটা ফিরে এল তেসার। 'চিরঞ্জীব ফ্রান্স' ও 'চিরঞ্জীব প্রেমের' উদ্দেশ্যে পান করল দুজনে।

রাত্রিবেলা হালকা সুরে তেসা বলল, 'শ্রীমতী, আমার বয়স কত আন্দাজ করতে পার?

'পঞ্চাশ?'

তেসা হাসল তারপর মেয়েটির মুখের সামনে হাতের আঙুল নাচাতে

নাচাতে বলল, 'উঁহু! প্রেমের ব্যাপারে আমার বয়স আঠারো। কিন্তু সাধারণের কাছে অনেক বেশী। অবশ্য মার্শাল আমার বাবার বয়সী।'

হঠাৎ এই ঐতিহাসিক দিনের ঘটনাগুলো নতুন করে মনে পড়ল তেসার: ব্রতৈলের রূঢ় দৃষ্টি, ভীইয়ারের শঠতা, ফুজের দাড়ি, আর সেই বিরক্তিকর সংখ্যা ৮০। মাত্র আশিজন অপাপবিদ্ধ! ভবিষ্যতের স্মৃতিকথায় এই আশিজনের সম্পর্কে নিশ্চয়ই এই কথা লিখিত হবে যে এরা 'আত্মসমর্পণের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভবিষ্যৎ বংশধররা এই ক্লান্তিকর দিনটিকে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের দিন বলে মনে করবে। আর এই বছরটাই তো সে হার্টের অসুখে ভুগল। কাদা-খোঁচা পাখীর মাংসটা তার খাওয়া উচিত হয়নি। মাংসটা খাবার পর থেকেই তার শরীরটা খারাপ লাগছে, মাথা ধরেছে। কিংবা হয়ত এটা শ্যাম্পেন খাবার ফল। চেয়ার থেকে একটু উঠে সে মেয়েটির ঘুম-জড়ানো চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। মনে হল গলার ভেতর কি যেন একটা আটকেছে।

'আজ ক্যাসিনো হলে কি কাণ্ড ঘটল জান?' বিড়বিড় করে বলল তেসা।

'কুলির মুখে শুনলাম। কি যেন একটা জরুরী অধিবেশন ছিল।'

'আসলে কি হয়েছে জান? হারিকিরি। বুঝতে পারছ না বোধ হয়। আচ্ছা বুঝিয়ে বলছি। ডেপুটিরা আর সেনেটররা তো এল দল বেঁধে। বক্তৃতা হল লাভালের। লাভাল তো সব সময়েই শাদা টাই পরে। তারপর ...হ্যাঁ, তারপর আমরা আত্মহত্যা করলাম। বিশ্বাস হচ্ছে না, না? আমি শপথ করে বলছি। প্রথমে আমরা ঘোষণা করলাম যে আমরা মরে গেছি তারপর প্রচণ্ডভাবে হাততালি দিলাম। ৫৬৯টা মড়া আর ৮০জন বেয়াড়া প্রকৃতির লোক ছিল সেখানে। ব্যস, এখন তোমার সামনে যে বসে আছে সে তেসার ভূত, তার ছায়া মাত্র।' একটা হেঁচকি তুলে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে সে আবার বলল, 'এতটা শ্যাম্পেন খাওয়া আমার উচিত হয়নি, কিন্তু এখন আর কিছু আসে যায় না। মৃত্যুর পরোয়ানা অনেক আগেই এসে গেছে।'

মেয়েটির ঘুম পাচ্ছিল, কিন্তু জোর করে ঘুম চেপে বলল, 'দুঃখ করে লাভ কি? জার্মানরা যখন প্যারী ছেড়ে চলে যাবে, আমরা আবার আগের মত দিন কাটাব। আপনি নিজেই বললেন যে মনের দিক থেকে আপনি তরুণ...' একটা হাই চেপে ফিসফিস করে বলল, 'আপনি—আপনি একজন খাঁটি প্রেমিক।'

মাথা নেড়ে তেসা বলল, 'না। ও সব অতীতের কথা। আজকে স্পষ্ট করে সত্যি কথা বলবার দিন এসেছে। শোন, নিজের সম্পর্কে একটা কথা বলছি। আমি একটা ছারপোকা। ফাটলের ভেতরে বুড়ো বনেদী ছারপোকা।'

কথাটা বলে সে টলতে টলতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

ভীষণ একটা উত্তেজনা নিয়ে ফুজে কাসিনো হল ছেড়ে বেরিয়ে এল। হাত পা নেড়ে অনবরত সে বিড়বিড় করছিল, যেন কয়েকজন অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশ্যে কথা বলছে। একদল কাপুরুষের হাতে রিপাব্লিকের মৃত্যু হল। কিসের জন্যে ভাল্মির বীরেরা আত্মদান করেছিল? কিসের জন্য বীরের মত সংগ্রাম করেছিল ভের্দ্যার সৈন্যরা। এ লজ্জা ঢাকবে কিসে বন্ধুগণ! ফ্রান্সকে হিটলারের পদলেহন করতে দেখে সমস্ত পৃথিবী যে ঘৃণায় মুখ ফেরাবে। অবশ্য ফুজে প্রতিবাদ জানিয়েছে। কিন্তু ওরা তাকে সত্যপ্রকাশ করতে দেয়নি। এখন সে ফিরে চলেছে নিজের হোটেলে। তারপর ওয়েটার স্যুপ নিয়ে আসবে, স্যুপটা খেয়ে শুতে যাবে সে। কিন্তু আজকে যা ঘটে গেল, তারপরে এই নিশ্চিন্ত জীবন একেবারেই অসহ্য। শহীদ হতে হবে তাকে। বোমা ফাটুক, গিলোটিন নেমে আসুক। লোকগুলোর কাণ্ড দেখ না! কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে কাফের বারান্দায় বসে ভারমুথ টানছে!

সারা রাত্রি সে ঘরের ভেতর অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াল। মারি-লুই বা ছেলের চিন্তা এখন আর নেই। সমস্ত শরীর রি রি করে উঠছে। কবলেনৎস-এ সে ছিল। হ্যাঁ, ভিশি হচ্ছে দ্বিতীয় কবলেনৎস। ১৭৯২ সালে এই কবলেনৎস-এ বহিরাগত প্রতি-বিপ্লবীদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল। কে ছিল সেই বিশ্বাসঘাতকদের নেতা? সেই লোকটি যদি লাভাল হয় তো কেউ আশ্চর্য হবে কি? সবাই জানে লাভাল এমন একটা জীব যে শয়তানের কাছেও আত্মবিক্রয় করিতে পারে। তেসা থাকলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পয়সার জন্যে ও লোকটা সব কিছু করতে পারে। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকদের দলে রয়েছেন রিপাব্লিকের একজন বীর সৈনিক, বৃদ্ধ মার্শাল। চিরকালের জন্যে সৈনিকদের নাম কলঙ্কিত হয়ে রইল। বৃদ্ধদের পক্ককেশের প্রতি আর কারো শ্রদ্ধা রইল না। কাকে বিশ্বাস করা যায়? সমস্ত কিছু কলঙ্কিত, অপব্যয়িত, নিঃশেষিত—কাফের বারান্দায়—আত্মসম্মান ও সাধারণ সৌজন্যবোধ দুটোর কোনটাই আর অবশিষ্ট নেই।

আগামী কাল হয়ত চিৎকার শোনা যাবে, 'ফ্রান্সের ত্রাণকর্তা মহানহৃদয় বশ্যরা

দীর্ঘজীবী হোক!' প্রাশিয়ানদের সামনে নতজানু হয়ে তোষামোদ করবে সবাই! গোয়েরিংকে যোয়ান অফ আর্ক আখ্যা পর্যন্ত দেওয়া হতে পারে। ব্যাপারটা হাস্যকর নয়—রীতিমত বিরক্তিকর।
কার উদ্দেশ্যে ফুজে কথা বলছে?' দেওয়ালের প্রজাপতি? আয়নায় নিজের অস্পষ্ট ছায়া? ম্লান প্রত্যুষ?
নটার সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। একদল পুলিশ, পরনে আলপাকার কোট। একজন বলল, 'কোন একটা অনুসন্ধানকার্যের জন্যে আপনাকে গ্রেপ্তার করবার পরোয়ানা নিয়ে আমরা এসেছি।'
হাসতে হাসতে ফুজে বলল, 'বেশ, চলুন। কিন্তু জার্মান ভাষায় কথা বলছেন না যে? জার্মান ভাষাটা শিখে ফেলুন না! কত আর অনুবাদ হবে! মূল ভাষাই আমি পছন্দ করি, যাক্‌গে, লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। আপনারা তো আর ভের্দাঁর বীর নন।' তারপর দাড়ি আঁচড়িয়ে টুপি পরে সে আবার বলল, 'আমি প্রস্তুত। রিপাব্লিক জিন্দাবাদ!'
সিঁড়িতে তেসার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দাড়ি কামিয়ে প্রাতরাশ শেষ করে তেসা চলেছে উকিলদের একটা বৈঠকে। ফুজেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল তেসা। কেমন কঠিন আর থমথমে হয়ে উঠল মুখটা—যেন সে মৃতের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ফুজে অভিশাপ দিল, 'জাহান্নমে যাও তোমরা!'

৩৯

পারীতে থাকতে ক্লেনাবেল লেরিদো বলেছিল, "যে যুদ্ধে জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই, সে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কোন অর্থ হয় না। এমন কি সেটা আমার মতে মূর্খতার পরিচয়।'
ব্রতৈলের ইচ্ছা ছিল, যে প্রতিনিধি-দল সন্ধি-শর্তে স্বাক্ষর করবে তার মধ্যে লেরিদোও থাকুক। কিন্তু লেরিদো যকৃতের অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। এবং এই অসুখকে সৌভাগ্য বলেই মনে করল সে। ইতিহাসের পাতায় এই শোচনীয় দলিলে স্বাক্ষর রাখবার ইচ্ছা তার ছিল না।
সরকারী পুনর্গঠনের সময় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রী নিযুক্ত হল লেরিদো। লা বুরবুলের কাছে একটা পাহাড়ে জায়গায় যুদ্ধাস্ত্র-মন্ত্রীর দপ্তর। লা বুরবুল হাঁপানী

রোগের চিকিৎসার জন্তে বিখ্যাত; শুনে সে রীতিমত দুঃখিত হল। তার আশা ছিল ভিশিতে যাবে এবং সেখানে যকৃতের চিকিৎসা করাতে পারবে। তবুও সে প্রতিদিন চিকিৎসালয়ে যাতায়াত করতে লাগল। বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। এখন পুনর্গঠনের সময়। চিকিৎসা যে অসুখেরই হোক না কেন, তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

বৌকে আনিয়ে নিল নিজের কাছে, বাদামী ড্রেসিং-গাউন পরা বৌকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল খুশিতে। দুজনে থাকল একটা হোটেলে। বৌ আসবার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিশ্রী ঘরটায় একটা গৃহস্থালীর শ্রী ফিরে এল যেন; উপকরণ বিশেষ কিছু নয়—বুনবার সাজসরঞ্জাম, ইলেক্‌ট্রিক ইস্ত্রি এবং জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা সম্পর্কে কথাবার্তা। কোন দুঃখ রইল না লেরিদোর। তবু একটিমাত্র দুশ্চিন্তা তার ছিল—সেটা হচ্ছে নিজের কাজের দায়িত্ব। সন্ধির শর্তানুযায়ী, সমস্ত যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের হস্তান্তর করতে হবে। সে বলত, 'আমি মনে করতাম যে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত করাটাই খুব একটা শক্ত কাজ। কিন্তু এখন কি দেখছি জান সোফি, নিরস্ত্রীকরণটা তার চেয়েও শক্ত কাজ।'

সে মনে করত যত বেশী সম্ভব যুদ্ধ-উপকরণ জার্মানদের কাছ থেকে গোপন রাখা তার দায়িত্ব। কর্নেল মোরো ছিল তার সহকারী, তাকে সে বলত, '১৯৬০ সালের জন্তে এখন থেকেই প্রস্তুত হতে হবে। হ্যাঁ কোন সন্দেহ নেই! গতবার পরাজয়ের পর জার্মানরা একটি মুহূর্তও নষ্ট না করে ভবিষ্যতের জন্তে প্রস্তুত হতে শুরু করেছিল। প্রকৃতির নিয়মই এই।' কিন্তু মোরো প্রশ্রয়ের হাসি হাসত: 'কোন চিন্তা নেই। চাঁদ কখনো সূর্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না।'

সকালবেলা চিকিৎসালয় থেকে ফিরে এসে লেরিদো কফি পান করছিল, এমন সময় দরজায় কে যেন করাঘাত করল। বোধ হয় তার সহকারী কিংবা আর্দালী মনে করে জেনারেল বলল, 'ভেতরে এস!' ভেতরে ঢুকল বাইস।

কোলমার থেকে নির্বাচিত ভূতপূর্ব র‍্যাডিকালটি এখন লাভালের প্রাণের বন্ধু এবং যুক্ত ফরাসী-জার্মান কমিশনের একজন সভ্য।

চিকিৎসালয় থেকে ফিরে এসে জেনারেল তখনো ড্রেসিং গাউন ছাড়েনি। সেই বেশে তাকে মনে হচ্ছিল যেন কার্নিভালের পুতুল। হাসি চাপতে পারল না বাইস। লেরিদো কেমন বিব্রত বোধ করল: সেনাপতির উচিত আপন মর্যাদার উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করা।

সে বলল, 'আমাদের তাঁবু ফেলা হচ্ছে; আমার সহকারীটি অনভিজ্ঞ।'

'এত ভোরে এসেছি বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে।'

মিনিট পনের পরে যখন জেনাবেল লেরিদো আবার বাইসের কাছে এল, তখন তার পরিপূর্ণ সাজপোষাক, বুকের ওপর ছটা সম্মানপদক।

বাইস সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা জেনাবেল, মঁপেলিএ-তে বিয়াল্লিশটা মাঝারি ট্যাঙ্ক ছিল না কি? কিন্তু মাত্র ষোলটি হস্তান্তর করা হয়েছে।'

লেরিদো মাথা নাড়ল, তারপর সবলভাবে উত্তর দিল, 'নিশ্চয়ই। জার্মানরা ষোলটার কথাই বলেছিল।'

'কিন্তু আমাদের শর্তটা কি?'

'মঁশিয় বাইস, আমি মনে করি যে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের কর্তব্য ..'

বাধা দিয়ে বাইস বলল, 'এই ঘটনার সঙ্গে অত সব বড় বড় কথার সম্পর্ক কি? ষোল মানে ষোল। বিয়াল্লিশ মানে বিয়াল্লিশ। ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক লুকিয়ে রাখবার পক্ষে কি যুক্তি থাকতে পারে?'

এবার লেরিদোও গলা চড়াল, 'কি বলতে চান আপনি? আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি। আপনি এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আমি স্কুলের ছেলে। আমি একজন ফরাসী সৈনিক, মশিয়ঁ!'

কথাটা বলে সে টান হয়ে দাঁড়াল। বেঁটেখাটো মানুষটি, তবুও তার মনে হল যেন বাইসকে সে অবজ্ঞা করতে পেরেছে।'

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বাইস বলল, 'আপনি মিথ্যে ঘাবড়াচ্ছেন, জেনারেল। আপনি এখানে যুদ্ধ করতে আসেননি। এটা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি আপনার ওপরওলাকে বলব যেন আপনাকে একটু পাটিগণিত শিক্ষা দেওয়া হয়।'

কথাটা বলে বাইস ঘর ছেড়ে চলে গেল। ধাক্কাটা সামলে উঠতে অনেকক্ষণ সময় লাগল লেরিদোর।

সোফির কাছে সে বলল, 'যারা আমাদের শত্রু ছিল, তাদের হাতে কেন যে ছাব্বিশটা ট্যাঙ্ক তুলে দিতে হবে আমি বুঝি না। লাভালের বন্ধু, ব্রতৈলের বিশ্বস্ত একজন ফরাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। এমনভাবে সে

আমার সঙ্গে কথা বলল যেন সে একজন জার্মান অফিসার। এমন অদ্ভুত কাণ্ড আর দেখিনি।'

পরের দিন লেরিদো গেল জেনারেল পিকারের সঙ্গে দেখা করতে। সামরিক ব্যাপারে বাইসের মত রাজনীতিকদের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে সে একটা রিপোর্ট তৈরী করেছিল। এই হস্তক্ষেপের অর্থ মার্শালের নির্দেশ অমান্য করা।

কোন রকম উৎসাহ না দেখিয়া পিকার্ বলল, 'মনে হচ্ছে গু গলের প্রলাপ আপনাকে প্রভাবান্বিত করেছে। আপনি মিথ্যে সময় নষ্ট করছেন। জার্মানরা যে লণ্ডনে পৌঁছবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খুব দেরী হয় তো আগস্ট মাসের মাঝামাঝি। আপনার বয়সটা কম নয়, অভিজ্ঞতাও হয়েছে অনেক। আপনার অতীত সৈন্যজীবন একটা বাধ্যবাধকতার সৃষ্টি করেছে। বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক আপনি রাখতে পারেন না।'

লেরিদো বিব্রত বোধ করল। একবার সে মুখ ফুটে বলতেও পারল না যে এই অভিযোগ তার প্রাপ্য নয় বলেই সে মনে করে।

পিকার্ বুঝতে পারল যে একটু রূঢ় উক্তি হয়ে গেছে। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনের। লা বুরবুল্-এ ফিরে এসে গণ্ডগোল দূর করবার কাজে মন দিল লেরিদো। সমানে ধমকাতে লাগল সাঙ্গপাঙ্গদের: 'ওই মেশিনগানগুলোর জন্যে তুমিই দায়ী মেজর! মনে কোরো না ওদের যা বলবে তাই বুঝবে। আমাদের পূর্বতন শত্রুদের দেখিয়ে দিতে হবে যে তুচ্ছ খুঁটিনাটি ব্যাপারে পর্যন্ত আমরা চুক্তি রক্ষা করে চলি। ক্যাপ্টেন, দেখো যেন একটা বোতামের হিসেবেও ভুলচুক না হয়! বুঝলে তো?'

রাত্রিবেলা খাবার পরে মোরোর সঙ্গে খানিকটা রাজনীতি আলোচনা হল। সে বলল, 'ওই অপরিণামদর্শী গু গলটা ভুল ঘোড়ার ওপর বাজী ধরেছে। আমি এটা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। উপকূলের কাছে জার্মানরা বিরাট ফৌজ জড়ো করেছে। চ্যানেল পার হবে কি করে বলছ? ওসব বাজে কথা রাখ! সমুদ্র পার হয়ে কি ভাবে ফৌজ নামাতে হয় সে সম্পর্কে সমস্ত ধারণা ওরা নার্ভিক-এ পালটে দিয়েছে। এক মাসের মধ্যে হিটলার লণ্ডনে হাজির হবে। এ তো অ-আ-ক-খর মত সোজা! আমার মনে হয় লাভালের পথই ঠিক। অবশ্য আমরা সৈন্যবাহিনীর লোক, রাজনীতিতে অনধিকার চর্চা করা আমাদের উচিত নয়। কিন্তু এখন তো আর এটা পার্লামেণ্টারি তর্কবিতর্ক নয়, ফ্রান্সের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িত। তোমাকে একটা স্পষ্ট কথা বলছি,—জার্মানদের জয়

হলে আমাদেরই সুবিধা। ইতালীর সঙ্গে সমপর্যায়ে আমরাও নতুন ইউরোপে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারব। ইংলণ্ডকে শেষ করবার পর হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। অবশ্য রাশিয়ার লালফৌজ আছে। কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। ওই দেশটাই বড়, বুঝলে বন্ধু, প্রকাণ্ড দেশটা। আমার স্থির বিশ্বাস, এই কাজে আমাদের সাহায্য না নিয়ে হিটলারের উপায় নেই, তখন আমরা কিছু কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারব। জেনারেল পিকার্ মনে করে হিটলার যদি কিয়েভ অধিকার করতে পারে তবে সঙ্গে সঙ্গে আমরা লিল ফিরে পাব। আচ্ছা ধরা যাক ইংলণ্ড এই যুদ্ধে জিতবে। তা যদি হয় তো ফল ভীষণ খারাপ। আমরা জার্মানীর সঙ্গে পৃথক সন্ধি করেছি এই অপরাধে চার্চিল কক্ষনো আমাদের ক্ষমা করবে না। আর স্থ গলের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ তারা তো সব অখ্যাত চুনোপুটি। ও যদি কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে যায় তবুও আমি আশ্চর্য হব না। আরে এসব লোক সব পারে! ব্যক্তিগতভাবে আমি জার্মানদের পছন্দ করি। ওরা আমাদের শত্রু ছিল বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে ওরা খাঁটি। পেরুর্ত বা ভূতপূর্ব ডেপুটিদের মনে সন্দেহ আসতে পারে, কিন্তু আমি মনস্থির করে ফেলেছি। জার্মানদের সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে হবে, আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, মনেপ্রাণে। তুমি কি মনে কর কর্নেল?'

অলস ভঙ্গীতে মোরো উত্তর দিল, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে চাঁদের আলোটা নিজস্ব নয়, ধার করা। যা প্রত্যক্ষ তার বিরুদ্ধে যাওয়া সহজ নয়। এ কথা ঠিক যে ওরা যদি জার্মানদের পরাজিত করতে পারে, তবে আমাদের প্রতি ওদের ব্যবহারটা খুব সদয় হবে না। এ কথাও আমি মনে করি যে গাছের ডালে ঝোলার চেয়ে লা বুরবুল্-এ থাকা ভাল।'

কয়েকদিন পরে জেনারেল লেরিদো একটা পিকনিকের আয়োজন করল। সোফি আর কর্নেলকে সঙ্গে নিয়ে সে গেল একটা পার্বত্য হ্রদে। গাঁ পর্যন্ত তারা গাড়ীতে গেল, তারপর একটা ছোট্ট পথ ধরে হেঁটে গেল হ্রদ পর্যন্ত। চারপাশের দৃশ্য দেখে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে গেল লেরিদো। ধূসর পাথরের স্তূপগুলো বিশৃঙ্খল—মনে হয় যেন কাজটা কারও ইচ্ছাকৃত। কোথাও ফুল নেই বা গাছ নেই—রুক্ষ, কর্কশ প্রান্তর। শুধু এখানে ওখানে পাথরের ফাঁকে ফাঁকে কাঁটাগাছের মত খানিকটা জঙ্গল—চারপাশের অন্য সব কিছুর মত ধূসর। হ্রদের জলটার রংও ধূসর। আত্মসমর্পণের পর পৃথিবীর চেহারাটা বোধ হয় এই রকমই হয়েছিল।

হঠাৎ কেন জানি তার মনে পড়ল আরদেনের সবুজ জঙ্গল আর একটি খোঁড়া মেয়ের কথা...

সঙ্গে ঠাণ্ডা খাবার ছিল। জেনারেলের বৌকে মোরো এক বাক্স বাদামের বরফি উপহার দিয়ে বলল, 'এটা এখানকার নামজাদা খাবার।' তীক্ষ্ণবুদ্ধি সোফি একবার ঢোঁক গিলে মনে মনে ভাবল, লোকটা নিশ্চয়ই পাগল, নইলে এই দুর্দিনে মিষ্টি কিনে আশি ফ্রাঁ খরচ করে!

সূর্য উঠবার পর হ্রদের জল গোলাপী হয়ে গেল। মনে মনে একটা প্রশান্তি ও পরিপূর্ণতা অনুভব করল লেরিদো, বলল, 'এই প্রকৃতি, একমাত্র প্রকৃতির মধ্যেই মানুষের আবেগের খাঁটি ভারসাম্য খুঁজে পাওয়া যায়।'

'মিঞঁ' থেকে একটা গান গাইতে লাগল সোফি। সোফির দিকে কোমল ও বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোরো ভাবল, 'পোষা পাখীটি আমার, আমার কাছেই তুমি ধরা দেবে।' লেরিদো ঢুলছিল—বাতাসে এমন একটা তীব্র অনুভূতি যে উৎফুল্ল ভাবও আসে, দুর্বলও বোধ হয়।

এ্যাড্‌জুটেন্টের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত লেরিদোর বিহ্বল ভাবটা কাটল না। সম্পূর্ণভাবে সজাগ হবার পর সে হুংকার দিয়ে উঠল, 'এখানে আসবার অনুমতি তোমাকে কে দিল? আজ রবিবার। আর এটা তো আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়!'

'ভীষণ একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, জেনারেল।'

যে দুর্ঘটনার জন্যে জেনারেলের রবিবারের আনন্দ নষ্ট হয়ে গেল, তার মূলে ছিল ২৮৭তম রেজিমেন্টের একজন কর্পোরাল, 'সীন' কারখানার ভূতপূর্ব শ্রমিক, নাম লেগ্রে।

মে মাস পর্যন্ত লেগ্রেকে ব্রিয়ার্শর কাছে একটা বন্দীশালায় আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে তাকে পাথরের চাঁই টেনে তুলতে হত পাহাড়ের ওপর। পাথরগুলোকে কেন যে টেনে তুলতে হচ্ছে কেউ জানত না। দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা নির্জন রাস্তার ধারে পাথরগুলো পড়েছিল। লেগ্রে অসহিষ্ণু হয়নি বা রক্ষী-সৈন্যদের সঙ্গে ঝগড়াও করেনি। তার মনের ভেতরে কি যেন একটা ভেঙে পড়েছিল। কথাবার্তা সে বড় একটা বলত না—শূন্য ও ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি।

মে মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হল। বন্দীদের উদ্দেশ্যে একটা বক্তৃতায় কর্নেল বারবার বলল, 'ফ্রান্স পীড়িত।' মুক্ত বন্দীদের পাঠানো হল ইতালীয়ান সীমান্তে। এমন কি লেগ্রে তার কর্পোরালের পদকও ফিরে পেল। ভাগ্যের এই পরিবর্তন লেগ্রের মনে এতটুকু উৎসাহ জাগাল না। কিন্তু যেদিন সে খবরের কাগজে পড়ল যে জার্মানরা বেলজিয়মে ঢুকেছে, সেদিন থেকে তার নির্লিপ্ততা একেবারে কেটে গেল, পুরনো সংগ্রামী ও আন্দোলনকারীর রূপ অনেকটা ফিরে এল যেন। এখন সে রাইফেল ধরতে লাগল সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টি নিয়ে এবং উত্তর সীমান্তে তাকে পাঠানো হচ্ছে না বলে অভিযোগ করতে লাগল বারবার।

একেবারে ফ্রন্টে যেতে চাইত সে, যদিও এই যুদ্ধে জয় হবে বলে বিশ্বাস তার ছিল না। সমস্ত শীতকালটা ধরে তার মনে শুধু একটিমাত্র চিন্তাই ছিল—ফ্রান্স হৃতদৃষ্টি, মোহাচ্ছন্ন, প্রতারিত, বিরাট এক দেশ থেকে মনাকোর মত ছোট্ট এক স্থানে পরিণত। এত বড় একটা অন্যায় অনুষ্ঠিত হতে দেখে তার সমস্ত আশাভরসা একেবারে নির্মূল হয়ে গেল, পুনরুত্থানের সম্ভাবনা আছে বলে বিশ্বাসটুকুও আর রইল না। তার এই ভয়কে বাস্তবে পরিণত হতে দেখবার জন্যে তাকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হল না। এক মাস পরেই ইতালীয়ানরা ফ্রান্স আক্রমণ করল। লেগ্রের বাহিনীকে রাখা হয়েছিল পেতি স্যাঁ-বের্নারের কাছে একটা জায়গায়। একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্রতিরোধ করল লেগ্রে।

চার দিন ধরে অনবরত গোলাবর্ষণ করে গেল ইতালীয়ানরা। কিন্তু প্রতিরোধ-কারীদের এতটুকু হটানো গেল না। চারদিন পরে নিশ্বাস ফেলবার মত একটু সময় পাওয়া যেতেই খাবার আনা হল কিন্তু খবরের কাগজ ছিল না। শাবেরী প্রত্যাগত একজন লেফটেনেন্ট বলল যে জার্মানরা প্যারী অধিকার করেছে। ফরাসী সরকার যে কোথায় কেউ জানে না।

সৈন্যদের ভেতর নানা রকম গুঞ্জন উঠল।

'ওসব সরকার-টরকার আর কিছু নেই।'

'বোধ হয় ফ্যাশিস্টরা ক্ষমতা লাভ করেছে—লাভাল, দোরিও, পুরো দলটাই।'

'তার মানে লাভালের জন্যে প্রাণ দিতে হবে? আমি এর মধ্যে নেই!'

লেগ্রে জ্বলে উঠল। চিৎকার করে বলল, 'ভয় পাচ্ছ বুঝি তোমরা? লাভালের জন্যে কেউ প্রাণ দিতে চায় না। কিন্তু কি করে জানলে যে

লাভালই এখন সরকারী কর্তা হয়ে বসেছে? লোকে বলছে? লোকে তো অনেক কথাই বলে। লাভাল তো আর যুদ্ধ করবে না। ও মুসোলিনির হাতের পুতুল। কার হাতে ক্ষমতা গেছে তা আমরা জানি না।' তারপর পশ্চিম দিকে আঙুল দেখিয়ে সে বলল, 'কিন্তু ওদিকে আমাদের সামনে যে কারা রয়েছে তা আমরা জানি। এতে ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার কিন্তু আমি কিছুতেই ওই ফ্যাশিস্টদের দেশের ভেতরে ঢুকতে দেব না।'

মুহূর্তের জন্যে তার শূন্য চোখ দুটো ক্ষোভে ও ক্রোধে জ্বলে উঠল।

সঙ্গীরা সমর্থন জানাল সবাই। পরদিন ইতালীয়ানরা আত্মসমর্পণ করতে বলল ফরাসীদের। ফরাসীরা রাজী হল না। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা আরও পাঁচ দিন প্রতিরোধ করল।

'সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছে'—কথাগুলো প্রথম শুনে লেগ্রের মনে হল যেন সে স্বপ্ন দেখছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা কটূক্তি বেরিয়ে এল মুখ থেকে—'এটা লাভালের কীর্তি!' বাইরে বেরোতেই চোখে পড়ল দুজন ইতালীয়ানের সঙ্গে একজন ফরাসী কর্নেল। কে যেন ক্রুদ্ধ মন্তব্য করল, 'ম্যাকারনি!' আর একবার নিরুৎসাহ ও গম্ভীর হয়ে গেল লেগ্রে।

যে সব বাহিনীকে ভেঙে দেওয়া হল না তার মধ্যে লেগ্রের বাহিনী একটি। ক্লেরমঁ-ফের‍্যার কাছাকাছি একটা জায়গায় ওদের রাখা হল। শহরের কাছেই বিরাট এক অস্ত্রাগার, বারুদ ও যুদ্ধ উপকরণে ঠাসা। একদিন লেগ্রের কানে গেল লেফটেনেন্ট ব্রেজিএকে মেজর বলছে—'আগামী বুধবার আমরা জার্মানদের সব কিছু হস্তান্তর করব।' জলের ভেতরে সূর্যের আলো ঢুকবার মত এই কথাগুলোও লেগ্রের চেতনায় অস্পষ্ট একটা ছাপ রেখে গেল।

সেদিন রাত্রিটা বেশ গরম। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ঠাণ্ডা পড়েনি। লেগ্রের ডিউটি পড়েছে। সে ভাবছিল জোসেতের কথা। একটিও চিঠি লেখেনি জোসেৎ। হয়ত লিখেছে কিন্তু পৌঁছয়নি। আর এখন তো ডাক বলতে কিছু নেই। ট্রেন অচল। তার নিজের জীবনের মত সব কিছু ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। মিশো কোথায়? পার্টির অস্তিত্ব আছে কি? হয়ত আছে, হয়ত এই কাছাকাছি কোথাও—কোন প্রতিবেশীরই মনের মধ্যে। কিংবা হয়ত অনেক দূরে। তারা যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে: নাৎসীরা এসেছে এবং ফ্রান্সে তাদের বহু বন্ধু,

সাহায্যকারী, পদলেহনকারীও জুটেছে। দু বছর আগে 'লুমানিতে' যে সব কথা লিখেছিল তা এমন পরিপূর্ণভাবে ফলে যাবে তা কল্পনাও করা যায়নি। কী ভীষণ দুঃখের মধ্যেই না টেনে আনা হয়েছে দেশকে! জার্মানরা সর্বগ্রাসী—যন্ত্রপাতি, চিনি, জুতো, যা পাচ্ছে চালান দিচ্ছে। আর যুদ্ধবন্দীদের একজনকেও এখনো ছাড়েনি। মিশো যদি ওদের হাতে বন্দী হয়ে থাকে? এবার বৃটিশদের পালা। তারপর রাশিয়ানদের। ইঁদুরের জাত ওরা, ক্ষুধার্ত ইঁদুর! কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না; কাজ, বীরত্ব, এমন কি সাধারণ মানবিক জীবনও ধ্বংস হবে—তাও কি সম্ভব?

এইভাবে দীর্ঘ দুশ্চিন্তার জাল বোনার মধ্যে দিয়ে রাত্রি শুরু হল। এই রকম রাত্রি লেগ্রের জীবনে এই প্রথম নয়। দিনের বেলা সে কথা বলতে চেষ্টা করেছে, শূন্য চোখের দৃষ্টি মেলে ভাঙা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করেছে নানাজনকে। কেউ কিছু বলতে পারেনি। এই ঘটনার আঘাতে কারো আর কোন অস্তিত্ব নেই যেন। আপন আপন আত্মীয়স্বজনের সন্ধানে বা খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই। এই ট্রাজেডি নিয়ে চিন্তা করবার অবসর কারো নেই। এই ট্রাজেডিই তো তাদের জীবন।

কিন্তু ভোরের আলোয় যখন গাছপালার ওপর থেকে অন্ধকার সরে গেল, তখন লেগ্রের মনেও একটা সিদ্ধান্ত দানা পাকিয়েছে। নিজের অজানতেই সিদ্ধান্তটা তার মনে এসেছে। বিচারবিশ্লেষণ করে দেখবার অবসর আর হয়নি। এটা তার একটা প্রেরণা। গত কয়েক সপ্তাহের উত্তেজনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির নিষ্ফল প্রতিরোধ, আশ্রয়প্রার্থীদের অভিযোগ, গৃহহীন পথাশ্রয়ী বুভুক্ষু সৈন্যদের গল্প, আর মেজরের কাপুরুষোচিত ও নির্লজ্জ উক্তি—'আগামী বুধবার আমরা হস্তান্তর করব'—এ সব কিছু তাকে এই একটিমাত্র পথই দেখিয়েছে। না! হস্তান্তর করতে দেওয়া চলবে না, জার্মানদের হাতে তুলে দেওয়া চলবে না কিছুতেই!

সৈন্য তিনজনকে লেগ্রে পাঠিয়ে দিল শহরে। লেফটেনেন্ট ব্রেজিএ নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছে, আশে পাশে কেউ কোথাও নেই। লেগ্রে একাই প্রাণ দিল। তার জীবনের মত তার মৃত্যুও হল সহজ, আড়ম্বরহীন ও আন্তরিক, সমগ্র অঞ্চল কেঁপে উঠল সেই বিস্ফোরণে, ডাল ছেড়ে উড়ে গেল পাখীগুলো। পাঁচ মাইল দূরের ইঁটের কারখানার জানলাগুলো পর্যন্ত কেঁপে উঠল থর থর করে।

সমস্ত ঘটনা শুনে জেনারেল লেরিদো দু হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। ফ্রান্সের পরাজয়ের চেয়েও বড় দুর্ঘটনা বলে মনে হল এই বিস্ফোরণকে। তাকেই এর জন্যে দায়ী করা হবে। জার্মানরা কক্ষনো বিশ্বাস করবে না যে এটা কোন একজন দুর্বৃত্তের কাজ। আর পিকারও সমস্ত দোষ তার ঘাড়েই চাপাবে। হঠাৎ সেই অনাত্মীয় ধূসর হ্রদ ও স্তূপীকৃত পাথরের কথা মনে পড়ল লেরিদোর। সোফিকে বলল, 'সমস্ত কিছু উড়ে গেছে, বোমা ফেলা হয়েছে সব জায়গায়। প্রকৃতিও সে আঘাত থেকে রক্ষা পায়নি। মানুষের হৃদয়ও নয়।'

৪০

জোলিও পারীতেই থেকে গেছে। সেখান থেকেই 'লা ভোয়া নুভেল' আবার প্রকাশিত হচ্ছে, ভিশি থেকে যেমন সে ফ্রাঁ পাচ্ছে, তেমন জার্মানদের কাছ থেকে পাচ্ছে মার্ক। কিন্তু গোলগাল ছোটখাটো মানুষটির মুখে সব সময়েই অনুযোগ শোনা যায় যে, জার্মান দূতাবাসের সীবার্গ লোকটি নাকি অর্থপিশাচ ও জঘন্য। সে বলত, 'খট্টাশের সঙ্গে ওকে এক খাঁচায় আটকে রাখ, দেখবে দম আটকে খট্টাশ মারা যাবে।'

জেনারেল ফন শোমবের্গ জোলিওর প্রতি সহৃদয়। মার্সাইএর এই লোকটির খামখেয়ালী উচ্ছ্বাস ও চমক জেনারেলের ভাল লাগে। কিন্তু জোলিও মনমরা ও বিষণ্ণ, ঠাট্টাতামাসায় যোগ দেয় না, সামাজিকতার ধার ধারে না। আপিস থেকে বাড়ী ফিরে জামাজুতো না খুলেই বিছানার ওপর বসে নিঃশব্দে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে থাকে। বৌ যদি জিজ্ঞাসা করে—কি হয়েছে, সে শুধু মাথা নাড়ে—যেন সে বলতে চাইছে 'কিছু নয়।'

আগের দিন ব্রতৈল একটা প্রবন্ধ নিয়ে আপিসে এসেছিল। প্রবন্ধটা না পড়েই জোলিও লিখে দিল—'যাবে।' কিন্তু ব্রতৈল বলল, 'যা ব্যাপার দেখছি, মনে হয় আর কিছুদিন পরে আমাকে আবার গির্জায় যাতায়াত শুরু করতে হবে।' চাঞ্চল্যকর হেডলাইনের কথা জোলিও এখন আর ভাবে না। কি লাভ ভেবে? কেউ কাগজ পড়বে না। পারীর লোকেরা এই কাগজটা ঘৃণা করে। জার্মানদের নিজেদের কাগজ আছে। জার্মান থেকে অত্যন্ত কাঁচা অনুবাদ নানারকম প্রবন্ধ আসে মাঝে মাঝে। লেখাগুলোর 'আমরা' কথাটার

জায়গায় 'জার্মানরা' কথাটা সে বসিয়ে দেয়: 'লা ভোয়া নূভেল' যে ফরাসী কাগজ, অন্তত এ চরিত্রটুকু বজায় থাকুক। আর তাছাড়া জোলিও এজন্যে টাকা পায়। ব্রতৈল কি পায় না? হয়ত সেও পায়। কিন্তু ব্রতৈলকে চায় কারা? অতীতের কথা ভাবতেও কষ্ট হয়—৬ই ফেব্রুয়ারী, 'মন্ত্রশিষ্য,' চেম্বারের বক্তৃতা। সবই অতীতের ঘটনা। ফ্রান্সের অস্তিত্ব ছিল তখন। আর এখন খরগোসের মত লালচে-চোখ ওই জার্মান বড়কর্তা ফ্রাঙ্ককে দেখা যাবে 'লা ভোয়া নূভেল' আপিসে বসে থাকতে। সময়নিষ্ঠ আর নোংরা।

জোলিও তার বৌকে বলল, 'ব্রতৈল হাজির হয়েছে, একে একে আসুক সবাই! লাভাল আর তেসাকেও শিগ্‌গিরই দেখা যাবে।'

বৌ গজরাতে লাগল, 'তাতে আমাদের কি, আমরা যেমন আছি তেমনি থাকব। আজ সারা বাজার ঘুরেছি, কোথাও এক টুকরো সাবান নেই। কোন কিছু পাওয়া যায় না, সব লুটে নিয়ে গেছে ওরা।'

'সে তো দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু আমরা কোথায় যাই বল তো? মার্সাইএর অবস্থাও এই। এই হতভাগা ইঁদুরগুলো গোটা ইউরোপটাকে এক টুকরো মাখনের মত গিলে নিয়েছে। ব্রতৈলের কাছে শুনলাম, দেসের গুলি করে আত্মহত্যা করেছে অভের্‌ঞ্-র কাছাকাছি কোন এক জায়গায়। এই হচ্ছে বীরের মত কাজ—মার্ন বা ভের্দাঁ যখন নেই। কী অদ্ভুত! আমার কি মনে হচ্ছিল জান? ওরা যদি—' জানলাটা বন্ধ করে গলা নামিয়ে সে বলল, 'যদি ওরা হেরে যায় তাহলে কি হয় বল দেখি? সেটা যে কী ভীষণ একটা চাঞ্চল্যকর ব্যাপার তা তুমি কল্পনাও করতে পার না! এক সন্ধ্যায় পঞ্চাশ লক্ষ বিশেষ সংস্করণ বিক্রী হয়ে যাবে। আর ব্রতৈলের গলায় দড়ি বেঁধে . '

'বলছ কি! বৃটিশরা যদি জেতে ওরা তোমাকেও খুন করবে।'

সাড়ম্বরে মাথা নেড়ে জোলিও বলল, 'ঠিক কথা! ভালই হয় তাহলে! ভগবানের পৃথিবীতে শয়তানগুলোর গলা কাটবে কে! এ-দৃশ্য দেখবার জন্যে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসি যাওয়াও ভাল!'

আপিসে যাবার পথে ঠিক করল, এক গ্লাস সরবত খেলে বেশ হয়—এর পর তো সবই ওদের পেটে যাবে। গলির ভেতর এমন একটা ছোট্ট কাফে সে খুঁজে বার করল যেখানে জার্মানরা ঢোকে না বলেই মনে হয়।

যে মেয়েটি খাবার দিয়ে গেল, তার চোখ দুটি অশ্রুলাঞ্ছিত। একটা খবরের কাগজ তুলে নিল জোলিও। কাগজটা সে পড়ল না, অন্য কিছু

ভাবছিলও না সে। আজকাল প্রায়ই এই রকমের একটা আচ্ছন্নতায় সে ডুবে যায়; কোন একটা দূর দেশে পাড়ি দিচ্ছে যেন সে। দরজাটা শব্দ করে উঠল, ভেতরে ঢুকল একজন জার্মান অফিসার, ভারী চোয়াল, নির্বোধ দৃষ্টি। ভদ্রভাবে সে সকলকে অভিবাদন জানাল, কেউ উত্তর দিল না। মেয়েটি এক পাত্র বিয়ার আনল তার জন্যে। বিয়ার হাতে নিয়ে সে বসতে বলল ওকে কিন্তু নিঃশব্দে প্রত্যাখ্যান করল মেয়েটি। আর এক পাত্র বিয়ার খেয়ে সে মেয়েটিকে বলল, 'মুখে কথা নেই কেন সুন্দরী? কই, মুখ বন্ধ করে রইলে যে?'

হাতের ট্রে দিয়ে মুখ ঢেকে ও উত্তর দিল, 'মঁশিয়, আমি ফরাসী মেয়ে।'

অফিসারটি চটে গেল। উঠে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে চিৎকার করে বলে গেল, 'আরসিতে নিজের মুখটা একবার ভাল করে দেখো। তোমার মা নিশ্চয়ই কোন নিগ্রোর সঙ্গে রাত্রিবাস করেছিল।'

অনেকক্ষণ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল মেয়েটি: 'কেন, কেন আমাদের হাতে একটিও ট্যাঙ্ক ছিল না?'

জোলিও ওকে বলল, 'আমাদের ট্যাঙ্ক ছিল। সেগুলো ছিল ভেসার হাতে। কেঁদে লাভ কি? চোখের জলে তো ওদের তুমি তাড়াতে পারবে না। ওগুলো হচ্ছে ইঁদুর, না মারলে রেহাই নেই। কিন্তু ওটা আমার কাজ নয়। না, কারণ আমি ওদের কাছ থেকে টাকা নিই। সবাই নেয়। আমি কি করতে পারি? এমন কি মার্সাইএরও কোন অস্তিত্ব নেই। ধরতে গেলে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই প্রায়—খালি আছে ওই জার্মানগুলো আর কপালের দুঃখ। বাছুরের মত কান্না থামাও দিকি। তার চেয়ে বরং দু গ্লাশ বিয়ারের দামটা রেখে দিতে চেষ্টা কোরো। হয়ত শেষ পরিণতি ভালই হবে—ল্যাম্পপোস্টের দড়ি থেকে আমি ঝুলতে থাকব আর তুমি নাচতে থাকবে মার্সাইএর কোন লোকের সঙ্গে। জানো তো, মার্সাইএ আমরা বেপরোয়াভাবে নাচি।'

৪১

নানা রকম তর্ক তুলে ন্যায়ের দোহাই দিয়ে ব্রতৈল চেষ্টা করল নিজের কথার যৌক্তিকতা বোঝাতে। কিন্তু জেনারেল ফন শোমবের্গ অবিচলিত। গোল গোল নীল চোখে ব্রতৈলের দিকে তাকিয়ে কড়া চুরুট টানতে টানতে

জেনারেল মাঝে মাঝে বলে চলেছে, 'না, না!' যেন তার অভিধানে এই একটিমাত্র কথাই আছে।

জেনারেল ফন শোমবের্গ মনে করে যে ফরাসীদের কথায় কোন গুরুত্ব দিতে নেই। জোলিওকে পছন্দ হয় তার। সংগীত ভবনের একজন অভিনেত্রীকে সে লাঞ্চে আপ্যায়িত করে। 'ফ্রান্স হচ্ছে ছুটি কাটাবার পক্ষে চমৎকার দেশ, আর পারী সে দেশের আশ্চর্য প্রমোদ ভবন'—কথাগুলো বলতে সে ভারী ভালবাসে। ব্রতৈলকে সে মনে করে একজন 'গুরুগম্ভীর ফরাসী', অর্থাৎ অন্য কথায় বোকা।

ইতিপূর্বে বোর্দোতে জার্মানদের দাবীর বহর দেখে ব্রতৈল খানিকটা হতবুদ্ধি হয়েছে। সে মনে করেছিল, এটা একটা জুয়ো খেলা, হাতের তাস লুকিয়ে রেখে শয়তানী বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। পরিবর্তে জার্মানরা তাকে শুধু হুমকি দিয়েছে। সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর সমস্ত বেতারকেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হবে—জার্মানদের এই দাবী শুনে তার বুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা। কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে সে বলেছে, 'ওরা চায় ফ্রান্স বোবা হয়ে যাক।' কিন্তু তবুও বোর্দোতে ব্রতৈল আশা ত্যাগ করেনি। বাহ্যিক আড়ম্বর হিটলার ভালবাসে, এবং কমপিএঞর লজ্জাকর দৃশ্যটা এই জন্যে তার কাছে প্রয়োজন ছিল। রক্তের ধার রক্তে শোধ করাটাই এতদিনের রীতি, কিন্তু হিটলার চায় চোখের জল দিয়ে চোখের জল মুছতে। যাই হোক, উৎসবের মত্ততা থামবে একদিন, স্তব্ধ হবে জার্মানীর ঘণ্টাধ্বনি, পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় জয়ের উদ্দেশ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা যাবে নিভে—আর তখন সম্ভব হবে কিছু একটা আলাপ আলোচনা করা। ফ্রান্স পরাজিত হয়েছে বটে কিন্তু ফ্রান্সের শক্তি অতীতেও যেমন বিরাট ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। উপনিবেশ ছিল ফ্রান্সের, ছিল নৌশক্তি। আর হিটলারের হাতে এখনো ইংলণ্ড রয়েছে। ফ্রান্সকে যোগ্য মর্যাদা দিতেই হবে হিটলারকে।

কতগুলি জরুরী বিষয় স্থির করবার জন্যে ব্রতৈলকে পারীতে পাঠিয়েছে পেতাঁ। অনধিকৃত অংশে লক্ষ লক্ষ গৃহহীন লোক অনাহারে রয়েছে। কিন্তু আশ্রয়প্রার্থীদের অধিকৃত অংশে ঢুকতে দিতে জার্মানরা অনিচ্ছুক। বন্দীদের দিয়ে ওরা জোর করে গুরু পরিশ্রমের কাজ করাচ্ছে, আহতদের জন্যে কোন ব্যবস্থা নেই।

এই সমস্ত কথা ব্রতৈল জেনারেল ফন শোমবের্গকে বুঝিয়ে বলল। মন দিয়ে

ব্রতৈলের কথা শুনল জেনারেল। কিন্তু ব্রতৈল যখন জিজ্ঞাসা করল, 'এই সব বিষয়ে আপনি আমার সঙ্গে একমত তো?' জেনারেল সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, 'না।'

এই কথাও ব্রতৈল উল্লেখ করল যে লোরেনের দখলকারী সৈন্যরা ফরাসী ভাষার সমস্ত চিহ্ন মুছে দিচ্ছে। কথাটা শুনে জেনারেল একটু সজাগ হয়ে উঠল, তারপর বলল, 'লোরেনে কোন দখলকারী সৈন্য নেই। লোরেন এখন জার্মানীর অংশ।'

ব্রতৈল আর সহ্য করতে পারল না। এই প্রথম সে কোন রকম কুটনীতিক ভাষার আশ্রয় না নিয়ে সোজাসুজি বলে উঠল, 'আমি একজন লোরেনবাসী।'

ফন শোমবের্গ সযত্নে ছাইদানির প্রান্তে চুরুটটা ঠুকে ঠুকে ছাই ফেলল, কিন্তু কোন কথা বলল না। আবার আশ্রয়প্রার্থীদের প্রসঙ্গে ফিরে গেল ব্রতৈল। বিরক্ত হয়ে জেনারেল একটা উখো নিয়ে ঘষে ঘষে হাতের নখ পরিষ্কার করতে লাগল, হাই তুলল কয়েকবার এবং অবশেষে এই বিরক্তিকর আলাপ-আলোচনা বন্ধ করবার জন্যে বলল:

'ওসব খুঁটিনাটি আলোচনায় আমি যেতে চাই না।'

'কিন্তু আমাদের কাছে এগুলো খুঁটিনাটি নয়। লক্ষ লক্ষ ফরাসীর জীবনমরণের প্রশ্ন এর সঙ্গে জড়িত। জার্মান কর্তৃপক্ষের প্রত্যাখ্যান এই দুই জাতির সহযোগিতায় বাধা সৃষ্টি করবে। আমি আশা করি...'

'না।'

ব্রতৈল উঠে দাঁড়াল। লম্বা, শুকনো চেহারা—দেখে মনে হয় জার্মান অফিসার। ফন শোমবের্গ একটু বিব্রত বোধ করল যেন।

বলল, 'আপনি আমার কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি, সেজন্যে আমি দুঃখিত। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা। আপনি কথা বলেন কুটনীতিকের মত। কিন্তু আমি একজন সামরিক লোক ছাড়া কিছু নই। আমার কাছে ফ্রান্স পরাজিত দেশ। আমরা নিশ্চয়ই বদান্যতা দেখাব। কিন্তু আপনি যে সমস্ত অনুরোধ করলেন সেগুলো আমার কাছে বিবেচনাযোগ্য বলে মনে হল না।' কথাটা বলে ব্রতৈলের দিকে একবার তাকিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে আবার বলল 'না মহাশয়, না!'

বাইরে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত ব্রতৈল সুস্থ হল না। প্লাস দ্য লা কঁকর্দ-এ একটি

অভিজাত হোটেলে ফন শোমবের্গের হেডকোয়ার্টার। জনশূন্য প্রকাণ্ড স্কোয়ারটার দিকে ব্রতৈল তাকিয়ে দেখল। চারদিকে জার্মান পতাকা। রাস্তায় রাস্তায় জার্মান সৈন্য মার্চ করে চলেছে—রাইট্‌-লেফ্‌ট্‌, রাইট্‌-লেফ্‌ট্‌। সবুজাভ ধূসর উর্দি...চারদিকে নীল রঙের সমারোহ—আকাশ, সীন নদী, ঘরবাড়ী।

ফন শোমবের্গের কথা মনে পড়তেই ব্রতৈল ভুরু কোঁচকাল: 'কী শয়তান লোকটা!' হ্যাঁ, এই জার্মানগুলো মনে করে যে ওরা বিজয়ী জাত। জয়ের নেশায় আকণ্ঠ ডুবে আছে ওরা, অন্তত দশ বছরের আগে ওরা প্রকৃতিস্থ হবে না। 'না! না!'...এই রকম লোকের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পর্কে কথা বলে লাভ কি? কোনদিন সে কারো কাছে নতজানু হয়নি আর আজ সে ফরাসী জাতিকে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করছে।

রয়ালের দিকে ঘুরে গেল ব্রতৈল। নিজের চিন্তায় এমন ডুবে ছিল যে প্রহরীর হাঁক শুনতে পায়নি। জার্মান সৈন্যটি গালাগালি দিতে দিতে তার পেছনে ছুটে এল: 'এই হাঁদারাম রাস্তায় নেমে!' কোন প্রতিবাদ না করে ব্রতৈল ফুটপাথ থেকে নেমে এল। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এমনিতে সে বড একটা হাসে না, নিজের কর্কশ হাসি শুনে নিজেই ভয় পেল সে। আজ সব কিছুতেই তার হাসি পাচ্ছে—হাসি পাচ্ছে এই ভেবে যে ওরা তাকে ফুটপাথ থেকে নামিয়ে দিল, গ্রি-নেকে একদিন সে খুন করেছিল, লোরেন জার্মানীর অংশ, আর সব কথাতেই জেনারেলের সেই উত্তর—'না!' সব থেকে মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে ফ্রান্সের আর কোন অস্তিত্ব নেই। পারী আছে—আছে পারীর পথঘাট, ঘরবাড়ী, দোকানের সাইনবোর্ড আর আছে বৃদ্ধ মার্শাল ও চার কোটি দুর্ভাগা মানুষ। কিন্তু ফ্রান্স নেই, আর এই একটি মাত্র বিষয়ে জেনারেলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যেন বল' চলে—'না! না!'

কিন্তু রইল কি? নিজের প্রশ্নে নিজেই ভয় পেল ব্রতৈল। জনশূন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ঠোঁট নাড়তে লাগল—ছেলেবেলার পরিচিত একটা প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করছে সে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সান্ত্বনা পেল না। কথাগুলো মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পর ছাপ রেখে গেল না কিছু। স্যাঁ অগস্তিন গির্জার কাছে এসে সে ভেতরে ঢুকল। ভেতরটা ঠাণ্ডা ও শান্ত—আশ্রয়প্রার্থীদের ভীড় নেই, জার্মানরা নেই। সভাগৃহের দরজার সামনে একজন পাদ্রী দাঁড়িয়ে ছিল, ব্রতৈলকে তিনি আশীর্বাদ করলেন। ব্রতৈল জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছেন মঁশিয়?'

তিনি বললেন, 'বড় ভাল নয়। গোড়া থেকেই আমি পারীতে আছি। এত দুঃখকষ্ট আমরা কোনদিন দেখিনি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্ধ শাসনকর্তাদের তিনি ক্ষমা করুন। জনসাধারণকে তারা ত্যাগ করেছে। আর জার্মানদের কথা যদি বলতে হয় তো বলব যে ওদের বিবেক বলে কিছু নেই।'

ব্রতৈল চোখ বুজল। পাদ্রী বুঝতে পারলেন না তাঁর কথায় এত বিচলিত হবার কি আছে।

ব্রতৈল, বলল, 'ভগবান জানেন এ আমি চাইনি। কিন্তু এখন এই বলে নিজের পক্ষ সমর্থন করার সময় নেই। আমার ছেলে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আবার বেঁচে উঠবে। কিন্তু আমি পারব না। অর্থাৎ আমার আর কোন অস্তিত্বই নেই। হয়ত কোন কালেই আমার অস্তিত্ব ছিল না—প্রতিবিম্ব বা প্রতিরূপ...'

'এই আর একজন।' পাদ্রী ভাবলেন। বিভিন্ন ঘটনায় মানুষের মাথার ঠিক নেই। দিনের পর দিন তাঁকে বহু অসংলগ্ন প্রলাপ শুনতে হচ্ছে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে এল ব্রতৈল। দম দেওয়া যন্ত্রমানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে—দীর্ঘ অস্থিসার চেহারা, মাথায় কালো টুপি, 'মন্ত্রশিষ্য'দের নেতা। একাধিকবার তার আদেশে বহু লোককে অখ্যাত মৃত্যু বরণ করে নিতে হয়েছে। পরলোকে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটবে এই আশা নিয়েই সে বেঁচে ছিল। লোরেনের লোক সে, কিন্তু লোরেন আব নেই। এখন কোন কিছুই নেই, সব শেষ—'মন্ত্রশিষ্য', শেষ বিশ্বাস, এমন কি শেষ ফরাসী মাটি পর্যন্ত। রাস্তায় প্রাশিয়ানদের ভীড় আর দুর্বোধ্য ভাষায় কথাবার্তা। যা কিছু পাচ্ছে চালান দিচ্ছে ওরা—সসেজের মোড়ক, জুতো, মোজা, পুতুল, বৌয়ের জন্যে উপহার, ভোজের উপকরণ, দুর্দিনের সঞ্চয়, ফ্রান্সের রক্তমাংস। ফিসফিস করে ব্রতৈল বলল, 'মাংসখাদক, রক্তপায়ী।'

মোটা মোটা ভাঙা গলায় একজন স্ত্রীলোক চিৎকার করছিল, 'লা ভোয়া নূভেল! শেষ সংস্করণ!' অন্তত খবরের কাগজ কেনার কোন বাধা নেই। কাগজটা খুলে ব্রতৈল পড়ল, 'সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হচ্ছে।' গতকাল, ফন শোমবের্গের সঙ্গে দেখা করতে যাবার আগে এই প্রবন্ধটা সে নিজেই লিখেছিল। আর এর পরেও আগামী কাল সে লিখবে, 'সহযোগিতার নীতি ফলপ্রসূ হয়েছে।' আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে আর কোন গণ্ডগোল নেই, বন্দীরা

চমৎকার সুখে দিন কাটাচ্ছে। জার্মান বুটের তলায় ফ্রান্সের কোন দুঃখ নেই। জোলিও সম্পাদক, ব্রতৈল লেখক।

লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে লাগল। তারপর এক সময়ে লাউড-স্পীকারের আর্তনাদ শোনা গেল—'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়েছে!'

পরিত্যক্ত বাড়ীতে ফিরে সোফার ওপর ছড়ানো জামাকাপড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ব্রতৈল সশব্দে হাই তুলল। তারপর সে ঠিক করল কিছু কাজ করবে। এক টুকরো কাগজের ওপর ছোট্ট একটা ক্রশ এঁকে সে লিখল, 'মানবিক আত্মার ক্লান্তি।' কলমটা রেখে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। শিশুর দোলনাটার সামনে থেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ—কোন কিছু ভাবছিলও না, প্রার্থনাও করছিল না। ফিরে এসে আবার বসল টেবিলের সামনে।

তারপর দ্রুত লিখে গেল :

মহামান্য হের জেনারেল ফন শোমবের্গ সমীপেষু—

দ্যু গল এবং ইংলণ্ডের পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদের ধ্বংসমূলক কার্যকলাপের দরুণ আমি মনে করি যে জার্মান কর্তৃপক্ষের এমন মনোভাব অবলম্বন করা উচিত যাতে জনসাধারণ শান্ত থাকে—এবং এই উদ্দেশ্যে অন্তত সকল বৃহৎ পরিবারস্থিত গৃহিনীদের পারীতে প্রবেশ করবার অনুমতি দেওয়া উচিত। বৃটিশ দালাল, কমিউনিস্ট ও দ্যু গল পক্ষাবলম্বীয় ব্যক্তিদের নির্মূল করবার কাজে আমি সর্বপ্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। এই সঙ্গে দুষ্ট প্রকৃতির ফরাসী ব্যক্তিদের একটি তালিকা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করছি...

অনেকক্ষণ ধরে সে লিখল। টেবিলের ওপর নিশ্চল হয়ে রইল তার ছায়াটা—বাঁশের ছায়ার মত দীর্ঘ ও তীক্ষ্ণ।

৪২

এতদিন পারীর লোকেরা বাইরে বেরোয়নি। রাস্তার জার্মান সৈন্যের আবির্ভাবে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারছিল না। সকালবেলা আনে বাজার করতে বেরলো। লোকে কোন কিছু না ভাববার চেষ্টা করছে। মনকে অন্যমনস্ক করবার কাজে এক পাউণ্ড আলু বা এক বোতল দুধের সন্ধান করাটা বেশ কার্যকরী। যদিও বা কোন সময়ে দু-একটা কথা হয়, সেটা হয় হারানো আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে—কেউ স্বামী হারিয়েছে, কেউ ছেলে।

কেউ কোন উত্তর দেয় না, সবাই ভাবে : 'ফ্রান্সও গেল !'

পারীর স্তম্ভগুলির দিকে তাকিয়ে মৃত ব্যক্তির স্মৃতিচিহ্নের কথা মনে পড়ে লোকের। জল আসে চোখে। কবির বীণা নির্বাক। ফরাসী মার্শালরা মৃত অশ্বের পৃষ্ঠারোহী। কবুতরের সঙ্গে কথা বলছে বক্তারা। অতীতের কথা মনে পড়ে লোকের : 'দাতঁর প্রতিমূর্তির নীচে আমি মাদেলিনের জন্যে অপেক্ষা করতাম।'

এই মিথ্যে জীবনের ভার বয়ে চলতে কেউ রাজী নয় কিন্তু তবুও বেঁচে থাকতে হয়,—দাঁড়াতে হয় লাইনে, রান্না করতে হয়, চিঠি লিখতে হয়। চিঠি লেখে সেই সব পুরনো ঠিকানায় যার কোন অস্তিত্ব এখন আর নেই। ডাক অচল। পরিত্যক্ত শহরে শুধু শোনা যায় জার্মান সৈন্যদের দুর্বোধ্য গান এবং ছায়াচ্ছন্ন স্কোয়ারে স্কোয়ারে পাখীর কাকলি।

যে স্কুলে আনে থাকে, তার কাছেই একটা স্কোয়ার। কয়েকটা প্লেন গাছ ছাড়া স্কোয়ারের ভেতর আর কিছু নেই। বিস্তৃত গাছগুলোর নীচে দুদু খেলা করে, গুঁড়ো গুঁড়ো সোনার মত বালি তোলে মুঠো মুঠো। তাম্রাভ ছোট্ট ছেলেটি, পিয়েরের মতই অশান্ত ও অস্থির, আনের জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

প্রথমে আনে চেয়েছিল পারী ছেড়ে চলে যেতে। প্রথমেই মনে পড়েছিল দাক্‌স্-এর কথা, যেখানে তার বাবা থাকে। কিন্তু দাক্‌সেও জার্মান সৈন্য আছে শুনে ভুরু কোঁচকাল। পালিয়ে যাবার শেষ আশ্রয়ও আর রইল না। মনে মনে বলল 'তার মানে জার্মানদের সঙ্গেই বসবাস করতে হবে !'

তার দিন চলত পুরনো জিনিসের দোকানে জামাকাপড়, বইপত্র, এটা-ওটা বিক্রী করে। বুনো জানোয়ারের শীতকালীন ঘুমের মত তার স্বপ্নময় স্থূল অস্তিত্ব। এই রকম জীবন তার একারই নয়, সমগ্র পারীর লোক এইভাবে থাকে। অন্যত্র লোকে এই সব কথা আলোচনা করে, ঠাট্টাতামাসা করে পারীর জীবন নিয়ে বা দুঃখিত হয়। কিন্তু পারীতে কেউ কিছু অনুভব করে না। যেন অস্ত্রোপ্রচারের টেবিলে রুগী শুয়ে আছে, ক্লোরোফর্মের ঠুলিটা খুলে ফেলবার ক্ষমতা তার নেই।

একদিন এক গুমোট সন্ধ্যায় দুদুকে বিছানায় শুইয়ে আনে জানলার কাছে বসেছিল। সময়ের গতি মন্থর। একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় দরজায় করাঘাত শোনা গেল। এই সময়ে আর কে হতে পারে? ওরা ছাড়া কেউ নয়...জার্মানদের সম্পর্কে সে 'ওরা' ছাড়া আর কিছু বলে না। কেন ওরা

এসেছে? একটা চিন্তা খুব স্পষ্টভাবেই তার মনে এল—'যদি মৃত্যু হয় তো আমি তার জন্যে প্রস্তুত নই।'

দরজা খুলে দেখল তিনজন যুবক দাঁড়িয়ে।

'ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে।' যুবক তিনজন বলল।

শূন্য, অপরিষ্কার বসবার ঘরে আনে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল।

বয়োজ্যেষ্ঠ যুবকটি বলল, 'আমি একজন সৈনিক। ও আমার ভাই আর ও ভাইয়ের বন্ধু। বোভাস থেকে আমরা এসেছি। এ পর্যন্ত আমরা নিরাপদেই আসছিলাম, কিন্তু মেট্রোর কাছে ওরা আমাদের আটকাল।

আমরা ছুটে গেলাম মেট্রোর দিকে। কত ধাক্কা দিলাম, ঘণ্টা টিপলাম, কিন্তু কেউ এল না। বোধ হয় সবাই পালিয়েছে।'

হঠাৎ নীচের দরজায় প্রচণ্ডভাবে কড়ানাড়ার শব্দ শোনা গেল। আতঙ্কিত হল আনে: এখন কি করা উচিত? হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভাঁড়ার-ঘরে কতগুলো বড় বড় বাক্স আছে। ছেলে তিনটিকে তাড়াতাড়ি বাক্সের ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে ওপরে ছেঁড়া কম্বল বিছিয়ে দিল—আশ্রয়প্রার্থীদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া কম্বল ছিল অনেক। তারপর কি মনে হতেই হঠাৎ ডুডুকে কোলে নিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে।

ভেতরে ঢুকল দুজন জার্মান ও একজন ফরাসী।

'কে থাকে এখানে?'

'আমি। আর আমার এই চার বছরের ছেলে।'

'আর কেউ?'

'খুঁজে দেখতে পারেন......

ফরাসী লোকটি প্রথমে ঘরটায় ঢুকে দেওয়াল-আলমারিটার ভেতর দেখল, তারপর কি মনে করে টেবিলের ওপর রাখা বইটা নিল হাতে। জার্মান দুজনের একজন বিনীতভাবে বলল, 'ক্ষমা করবেন, মাদাম। ভুল হয়ে গেছে।'

ওরা চলে যাবার পর ডুডুকে বিছানায় শুইয়ে দিল আনে। ডুডু ভীষণ চিৎকার করছিল—মাঝে মাঝে অকারণেই ও এ রকম করে। তারপর সে গেল ভাঁড়ার-ঘরে। প্রথমে বেরিয়ে এল একেবারে ছোট ছেলেটি, নাম জাক।

'আমার ভয় হচ্ছিল যে আমি হয়ত হেঁচে ফেলব। ভেতরে এত ধুলো যে নাকটা আটকে যাবে।' জাক হাসল।

'দেখি তোমাদের কিছু খেতে দিতে পারি কিনা।' আনে বলল।

কপালগুণে তখনো কিছুটা ঝোল, ছোট রুটি আর খানিকটা তরকারী ছিল।

এক টুকরো রুটি চিবোতে চিবোতে সৈন্যটি বলল, 'কাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি।'

'এবার নিশ্চিন্ত হয়ে একটু বিশ্রাম করো।' আনে বলল।

'না। ঘণ্টাখানেক এখানে থাকব। যতক্ষণ না গোলমালটা থেমে যায়। তারপর আবার আমাদের যেতে হবে। অন্তত শার্ৎর পর্যন্ত আমরা যেতে চাই। সেখানে লোক আছে, সে আমাদের বার করে দেবে।'

'কিন্তু শার্ৎর থেকেই বা যাবে কোথায়? এমন জায়গা কোথায় যেখানে জার্মানরা নেই?'

পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল তিনজনে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই জানতে চাইছে কথাটা আনের কাছে ভেঙে বলা উচিত কিনা।

সৈন্যটি বলল, 'আমরা কিছু বলব না। কিন্তু আপনি ফরাসী মহিলা, আপনি বুঝতে পারবেন। আমরা যাচ্ছি লণ্ডনে, জেনারেলের কাছে, যুদ্ধ করতে।'

'যুদ্ধ করতে?' আনে বোকার মত বলল, 'কিন্তু সন্ধি তো হয়ে গেছে।'

ঘৃণাকুঞ্চিত মুখে জাক চিৎকার করে উঠল, 'কারা করেছে সন্ধি? বিশ্বাসঘাতকরা!'

'আস্তে! আস্তে!' তারপর আনের দিকে ফিরে সৈন্যটি বলল, 'যুদ্ধ শেষ হয়নি। আমি ডানকার্কে ছিলাম। আমার ভাই আর জাকের তখনো সৈন্যদলে ডাক পড়েনি। কিন্তু এখন সমস্ত সৎ লোককে এগিয়ে আসতে হবে যুদ্ধ করবার জন্যে। ফ্রান্সের কি অবস্থা দেখুন! বোভাস-এ...এসব কথা থাক এখন...না, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। জেনারেল দ্য গল সবাইকে ডাক দিয়েছেন। রেডিওতে তার বক্তৃতা আমরা শুনেছি। শার্ৎর থেকে বৃটানিতে যেতেই হবে আমাদের। সেটা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়—বহু জেলে নৌকো পাব। আসল কাজ কোন রকমে পারীর বাইরে যাওয়া। আমার একটা জ্যাকেট আর জামা আছে বটে কিন্তু এগুলো..'

বলে সে তার ফৌজী পোষাকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল। তক্ষুনি ছুঁচ সুতো নিয়ে বসল আনে: 'পোষাক তৈরী করতে হবে।' কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে কয়েকটা পোষাক বানিয়ে ফেলল সে। গায়ে

ঠিক হয় কিনা দেখবার জন্তে পরে দেখল তিনজনে। হেসে উঠল প্রত্যেকে। একটু ছোট, কিন্তু কাজ চলবে।

হঠাৎ আনে বলল, 'আমার স্বামী যুদ্ধে মারা গেছেন। যুদ্ধজয়ে আমাদের লাভ কি?' আনের মনে হল সে পিয়েরের সঙ্গে তর্ক করছে, উত্তেজিত হয়ে বলে চলল, 'আসল কথাটা কি জান? তা হচ্ছে আত্মা। কিন্তু লোকে শুধু যুদ্ধক্ষেত্র আর মানচিত্রের কথাই ভাবে...'

'সে আত্মাকে আমরা চিনেছি!' জাক চিৎকার করে উঠল। (আবার সৈন্যটি বলল, 'আস্তে!') 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আত্মা! মানচিত্রে কি ফ্রান্স নেই? আছে, খুব স্পষ্টভাবেই আছে। ফ্রান্স না থাকলে আমি বাঁচব না। আঠারো বছর বয়স আমার, বেঁচে থাকতে চাই আমি, অত্যন্ত প্রবলভাবে বেঁচে থাকতে চাই...আমরা যদি মরে যাই তো ক্ষতি কি? আর একজনের প্রাণ বাঁচবে। আপনার একটি ছেলে আছে। সেই ছেলেই তো ফ্রান্সের প্রতীক, নয় কি?'

আনে মাথা নাড়ল, এখনো তার মত পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু ছেলে তিনটিকে বিদায় জানাবার সময় গভীর আবেগে তিনজনকেই সে চুম্বন করল। জল এল চোখে।

তারপর তুতুর বিছানার পাশে বসে সে কাঁদতে লাগল। কয়েক মুহূর্তের কান্না, কিন্তু তার মনে হল যেন দীর্ঘ সময় পার হয়েছে। হঠাৎ আর্ত চিৎকার করে জানলার কাছে ছুটে এল আনে। খুব কাছেই দুবার গুলির শব্দ হয়েছে। ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে লাগল তুতু। প্রচণ্ড শব্দে দরজা ভেঙে জার্মান সৈন্যরা ছুটে এল ঘরের ভেতর।

ফরাসী পুলিশটিকে আনে চিনল, আগের বারেও সে এসেছিল। 'এই সেই!' চিৎকার করে উঠল পুলিশটা। জার্মান অফিসারটি কি যেন বলতেই দুজন সৈন্য এগিয়ে এসে আঁকড়ে ধরল তাকে। অফিসারটি ফরাসী লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোকগুলো পালাল কি করে?' তুতু কাঁদছিল। সৈন্যরা আনেকে গাড়ীর কাছে নিয়ে গেল। দু হাত মুচড়ে ধরা সত্ত্বেও কোন রকম ব্যথা বা ভয় সে অনুভব করছিল না। হঠাৎ একটা চিন্তা ঝিলিক দিয়ে উঠল: 'তুতুর কি হবে?' অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

জার্মান অফিসারটি ধমকে উঠল, 'চুপ! এটা প্রণয়-আলিঙ্গন নয়।'

রাত্রিটা যেন আজ বেশী রকম অন্ধকার। আনের মনে হল যেন সে অরণ্য

দেখছে—বাড়ীগুলো যেন গাছ। একটা লম্বা সরু রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। চামড়া, কপি আর প্রস্রাবের গন্ধ! একটা খালি কামরার ভেতর তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। 'আমি কয়েদখানায় নই,' ভাবল সে। কি ছিল এখানে? মেঝের ওপর কালির দাগ। হয়ত একটা স্কুল? ...মনে হল পিয়েরের ভাব্রাভ মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে যেন। তার কাঁধের ওপর দিয়ে পিয়ের তাকিয়ে রয়েছে খাতার দিকে আর চুমু খাচ্ছে তাকে। কী চোখ-ঝলসানো আলো! একেবারে কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো। দেওয়াল ঠেস দিয়ে মেঝের ওপর সে বসল। মনে পড়ল, বাড়ীতে ছুছু একা রয়েছে। মনে পড়তেই গভীর একটা হতাশা এল মনে, আচমকা অজ্ঞান হয়ে পড়বার মত ভারী আর বিশ্রী বোধ হল শরীরটা। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল—দেওয়ালের গায়ে কি যেন লেখা রয়েছে, হাতের নখ বা পিন দিয়ে লেখা: 'বিদায় মা! বিদায় ফ্রান্স! রবের।' আর ঠিক এই লেখাটার নীচে কেন সে লিখতে চাইল 'বিদায় ছুছু'? কেন তার মনে হল যে এই কথা দুটো লিখতে পারলেই সে আরাম বোধ করবে? কিন্তু তার কাছে পিন নেই। হাতের ছোট ছোট নখের দিকে তাকিয়ে তার কান্না পেল। হঠাৎ আর একটা চিন্তা এল—'ওরা বলাবলি করছিল যে তিনজনে পালিয়ে গেছে। তার মানে ওরা ধরা পড়েনি। ওদের জেনারেলের কাছে যেতে পারবে ওরা। চমৎকার ছেলে জাক।' মনে হল, তার জীবনে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেন এই যে ওরা পালাতে পেরেছে।

প্রশ্ন করবার জন্যে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। জার্মান অফিসারটি ভাল ফরাসী বলতে পারে, দোভাষীর দরকার হল না। অফিসারটি প্রথমে কতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলল, 'দু বছর আমি গ্রেনোব্‌ল্‌-এ কাটিয়েছি। ভারী সুন্দর শহর।' লোকটির কথাবার্তা অত্যন্ত ভদ্র, আনেকে সে সান্ত্বনা দিল—'আপনার ছেলে যত্নেই আছে।' তারপর সে চেষ্টা করল আনের মুখ থেকে কথা বার করতে—'আচ্ছা বলুন তো ওই লোক তিনজন কে? বললেই আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

আনেকে চুপ করে থাকতে দেখে সে চটে উঠল—'মাদাম, নষ্ট করবার মত সময় আমার হাতে নেই। আপনি চুপ করে আছেন যে? তার মানে আপনি ইংরেজদের চর।'

আনে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।' চোখের দৃষ্টি হল মৃদু ও কোমল, ঠিক

যেমনটি হয়েছিল পিয়েরের তর্জনগর্জন শুনে বেলভিলের জানলার নীচে দাঁড়িয়ে। বলল 'হ্যাঁ, আমি চর। কেন তোমরা আমাদের দেশে এসেছ? সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে। এমন কি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। আমি বলব না এই তিনজন কে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তোমরা ওদের ধরতে পারনি। সেটাই বড় কথা। এখন তোমরা ইচ্ছা করলে আমাকে মেরে ফেলতে পার। আমি আর কি কাজে আসব? বন্দুক ধরতে পর্যন্ত জানি না আমি।'

এখন তার মনে হল যেন সে মরতে প্রস্তুত। মনের এই ভাব তার উদ্দীপনা ও প্রফুল্লতা ফিরিয়ে আনল। এই কিছুক্ষণ আগেও তিনটি ছেলের সঙ্গে সে তর্ক করেছে। আর এখন তার মনে হচ্ছে যে এই সুসজ্জিত লোহিতকায় অফিসারটির সামনে দাঁড়িয়ে একবারও না থেমে সেই ছেলে তিনটির কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করে। কেমন পরিপাটি সিঁথি জার্মান অফিসারটির!

জার্মানটি কেমন যেন বিভ্রান্ত হয়ে গেল। দোয়াতদানিটা ঠেলে সরিয়ে বলল, 'থাক, আর জাহির না করলেও চলবে। আপনাকে এখানে বক্তৃতা দেবার জন্যে ডাকা হয়নি। আপনি শুধু যেটুকু খবর জানেন বলবেন। ভাল চান তো উত্তর দিন। আপনি ওদের চেনেন?'

'চিনি।'

'কে এরা?'

'ফরাসী!'

প্রচণ্ড রাগে অফিসারটির কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সাধারণত তার ব্যবহার খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহারের গুণে এই বছরখানেক আগেও সে সুইনমুণ্ড-এর মেয়েদের মুগ্ধ করেছে—কিন্তু আজ হঠাৎ সে ছুটে এসে আনেকে মুখের ওপর মারল। আনে কাঁদল না, নিজের অজ্ঞানতেই হাতটা উঠে এল মুখের কাছে এবং রক্তমাখা হাতের দিকে তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। মানুষের ভেতরে যে সব জন্মগত অনুভূতি থাকে তার বাইরে চলে গেছে সে এখন। কোন রকম ব্যথা সে অনুভব করছে না, এই সুসজ্জিত সুরভিত অফিসারটির পশুসুলভ ব্যবহারেও সে ক্ষুব্ধ হয়নি। কেমন একটা আত্ম-বৈরাগ্য ও উল্লাস তাকে অভিভূত করেছে যেন। আপন মনেই সে বলে চলেছে, 'ভালবাসি, ভালবাসি দুদুকে, ভালবাসি পিয়েরকে, ভালবাসি বাবাকে, ভালবাসি জাককে, ভালবাসি রবেরকে, ভালবাসি অন্য সবাইকে যারা গত কয়েকদিনে প্যারীর শৃঙ্খলিত পথে পথে ক্লান্ত বিষণ্ণ পদক্ষেপে এগিয়ে গেছে।' তাদেরই একজন

তাকে বলেছে, 'বিদায়!' 'না,' মনে মনে সে বলল, 'বিদায় নয়, বলতে হবে —কেমন আছ, ভাল তো? আবার আমাদে. মলন হয়েছে! মিলন পিয়েরের সঙ্গে, মিলন পারীর সঙ্গে।'

বারান্দায় বসে সে এই কথাগুলো জোরে জোরে উচ্চারণ করল। কর্নেলের কাছে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। কর্নেলের চিবুকে একটা কাটা দাগ, মাছের মত চোখ দুটো চক্রাকারে ঘুরছে। আনেকে বসতে বলল সে।

বলল, 'আমি আপনাকে বাঁচাতে চাই। আপনি শুধু বলুন, লোক তিনজন কে? নিজের ছেলের জন্যেও কি আপনার এতটুকু দরদ নেই? আমিও সন্তানের পিতা—দুটি মেয়ে আছে আমার।'

আনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এই কথাগুলো তাকে অন্য এক জগত থেকে ফিরিয়ে এনেছে, যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছে এই রকম চাপা গলায় সে উত্তর দিল, 'ছেলের জন্যে কি আমার দুঃখ হচ্ছে? না। আজ আমি সব কিছু বুঝেছি। একজনের জীবনদান মানে অপর একজনের জীবন রক্ষা। অন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই তার এই জীবনের মূল্যে বাঁচবার অধিকার পাবে... জনসাধারণ...আমার দেশের জনসাধারণ...' হঠাৎ মনে পড়ল তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। গোলগাল কাঁধ দুটো টান হয়ে গেল, লোহার রডের মত খাড়া হয়ে উঠল পিঠটা, কথা বলল অন্য সুরে: 'আপনি নিজেকে সন্তানের পিতা বলছেন? কথাটা সত্যি নয়। শুনতে চান আপনি কি? আপনি হচ্ছেন বশ্! খাঁটি বশ্!'

শান্ত্রীকে ডেকে কর্নেল আদেশ দিল, 'নিয়ে যাও ওকে!'

তারপর আনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'মাদাম, শেষ সময় উপস্থিত আপনার।'

কর্নেলের মাথার ওপর দিয়ে তাকিয়ে আনে উত্তর দিল, 'ফ্রান্সের শেষ সময় নয়, এখানে শেষ নয়। শেষ নেই।'

৪৩

দেনিস ছুটে গেল না, জড়িয়ে ধরল না। শুধু অশ্রুভরা চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে যেমন ছিল কিছুটা ভয়, তেমনি ছিল কিছুটা আনন্দ।

মিশো হাসছিল। তারপর কেমন বোকার মত মনে হল নিজেকে, 'ব্যাপারটা কি, দেনিস ?'

এই মুহূর্তটির জন্যে সে এতকাল অপেক্ষা করেছে! নয় দিন আগে পাহারারত শান্ত্রীকে একটা পাথর ছুঁড়ে সে মারে। রোদে পোড়া গরম পাথর। পড়ে গিয়ে লোকটি আর ওঠেনি। সন্ধ্যা পর্যন্ত একটা খানার ভেতর সে লুকিয়ে ছিল।

এক বুড়ী তাকে কিছু জামাকাপড় দিয়েছে, নিজের বাড়ীতে থাকতেও বলেছে সকাল পর্যন্ত। শাদা দেওয়ালের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে মিশো বসে ছিল আর বুড়ী তার জামার বোতাম বদলে দিয়েছে। বোতামগুলো বুড়ীর মৃত স্বামীর, তিনি ছিলেন 'পেট্রোনেজ কাপোলিক্ স্থ স্যা জুস্ত'-এর পরিচালক। খবরের কাগজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করতে বুড়ী বলেছে যে খবরের কাগজ সে পড়ে না কারণ কাগজগুলো সব জার্মান হয়ে গেছে। ঘড়ির ঘণ্টা বেজেছে দীর্ঘ বিরতির পরে পরে। দুজনের কেউ ঘুমোতে চায়নি। মাঝে মাঝে দু-একটা কথা হয়েছে, আর সে সব কথাও অসংলগ্ন ও কেমন যেন অদ্ভুত।

মিশো বলেছে, 'তার নাম লেগ্রে। সেও ছিল কমিউনিস্ট ..'

'আমি অন্য এক জগতে বাস করি। আমি ধর্মবিশ্বাসী। কিন্তু হিটলার...'

'হিটলারকে আমি ঘৃণা করি!'

'সে জন্যেই তো তোমাকে ঘরে ডেকে আনলাম। স্যা জুস্ত-এ ওরা নোটিশ টাঙিয়েছে। বন্দীদের যে কেউ সাহায্য করবে, গুলি করে মারা হবে তাকে।'

'ওরা আমাকে পথ দেখিয়ে দিল। একদিনের জন্যে ওরা এটা মানেনি। সবেমাত্র ভোর হয়েছে। পাখীর...'

'আমার বয়স আটান্ন। কোন রকমে দিন কাটছে, কিন্তু তবুও তো জীবন। সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে গেছে যেন, আমার স্বামী মনে করতেন যে কমিউনিস্টরাই দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমারও তাই ধারণা ছিল। তখনকার দিনে হয়ত এই ধারণাই ঠিক। কিন্তু এখন... আমি 'লোরন্ত্রে' কাগজ নিতাম। দুকান লিখেছিল যে কমিউনিস্টরা দেশপ্রেমিক।'

'দুকান্ কথাটা বড় দেরীতে বুঝেছে।'

'কিন্তু তোমরা প্রত্যেকেই বড় দেরী করেছ, আর ইতিমধ্যে জার্মানরা এসে গেছে। এখন আমি ভাবি, সত্য কি—সাময়িক সত্যের কথা বলছি না, প্রকৃত চিরঞ্জীব সত্য।'

কথাটা বলে ক্রুশবিদ্ধ খ্রীষ্ট মূর্তির দিকে তাকিয়েছে বুড়ী। ধূসর প্রত্যুষের আভাস এসেছে জানলার ফাঁক দিয়ে, দেনিসের কথা ভেবেছে মিশো, প্রাণবন্ত জীবন্ত দেনিস—তারপর টুপিটা হাতে নিয়ে বুড়ীকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এসেছে। আর এখন তার পাশেই দেনিস তবুও দেনিসের মুখে হাসি নেই। দেনিসকে চুমু খেল মিশো, কেবল ঠাণ্ডা নিরুত্তাপ ঠোঁট দেনিসের।

'দেনিস! হল কি তোমার? এই দেখ আমি চলে এসেছি। পালিয়ে এসেছি ওখান থেকে।'

কান্নাভরা গলায় দেনিস বলল, 'মিশো, যখন তুমি আমাকে চুমু খেলে, আমার কেমন যেন ভয় হল। বেঁচে আছি বলে বিশ্বাস হয় না আমার। বুঝতে পারলে না কথাটা? আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না। আমার কেন জানি মনে হয় যে আমরা সবাই মরে গেছি আর তবুও আমরা বেঁচে থাকবার ভান করছি কারণ জার্মানদের আদেশ বেঁচে থাকতে হবে।'

মিশো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। এ কথাও সে স্বীকার করতে চাইল না যে আরাস-এর ঘটনার পর এই কথা সে নিজেও একাধিকবার ভেবেছে। যতবার ভেবেছে, নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে ভীরুতার জন্যে। দেনিসের চিন্তাতেই এতকাল বেঁচে ছিল সে। কেন জানি তার মনে হয়েছিল যে দেনিস তার কাছে আসবে মুখে হাসি নিয়ে, শরীরে উত্তাপ নিয়ে, আর জীবন নিয়ে। দেনিসের নৈরাশ্য দেখে বিমূঢ় বোধ করল মিশো, নিঃশব্দে তার হাতটা টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে।

পোর্ৎ দ্য ভার্সাইএর কাছাকাছি ছোট্ট লোহার দোকানটার ভেতরে দুজনের কথা হচ্ছিল। এখানেই দেনিস আর ক্লদ ইস্তাহার ছাপে। মিশোর সঙ্গে দেখা হবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেনিস শান্ত থেকেছে, ক্লদের সঙ্গে কথা বলেছে সংগ্রাম শক্তি ও জয় সম্পর্কে। আর এখন মিশো আর সে ছাড়া আর কেউ নেই।

'কেঁদো না, দেনিস,' মিশো বলল।

ঘরে ঢুকল ক্লদ। মিশোকে সে প্রথমে দেখতে পায়নি। উত্তেজিতভাবে সে বলতে লাগল, 'কাল টাইপ্ পাওয়া যাবে। বুঝেছ?' তারপর হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল, 'মিশো! তুমি! আর আমাদের চিন্তা নেই! দেনিস, আমরা বেঁচে গেলাম। বুঝেছ?'

ক্লদের কাছে মিশোর আগমনের অর্থ তাদের উদ্দেশ্য সাফল্যযুক্ত হওয়া। তার

উল্লাস মিশোকে আত্মশক্তি পুনরুজ্জীবিত করতে সহায়তা করল। সে বুঝতে পারল যে তারা তার অপেক্ষাতেই ছিল এতদিন, নিজের জন্যে লজ্জিত বোধ করতে শুরু করেছিল সে। আর দেনিস ভেবেছিল যে দেনিসের জন্যেই মিশোর এই লজ্জা।

মিশো বলল, 'আমরা আবার কাজ শুরু করে দেব। ক্লদ আমাদের সঙ্গে থাকাতে ভাল হয়েছে। আর ক্লদ এটা তোমার মস্ত কৃতিত্ব যে তুমি টাইপ যোগাড় করতে পেরেছ, এবার আমরা ইস্তাহার ছাপাতে পারব।'

'বড় জোর পাঁচশো।' দেনিস দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল।

'এই দিয়েই শুরু করব। আর পাঁচশোই বা মন্দ কি! আমাদের আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। লুমানিতে পাঁচ লক্ষ বিক্রী হত, কিন্তু তবু আমরা হেরে গেলাম। এই সময়টুকুর জন্যে যে ক্ষতি হল, তা পূরণ করে নিতে হবে আমাদের। ভাল লোক যারা আছে, তারা সবাই আজ বিভ্রান্ত। দুষ্কৃতিকারীদের জয় হচ্ছে। দোরিওর কাগজটা আজ দেখলাম। লোকটার ময়ূরের মত আত্মাভিমান। মনে হবে যেন ও-ই পারী অধিকার করেছে। এ সব কিছু মেনে নিতে হবে। ফ্যাশিজ্‌ম-এর যুগে বেঁচে থাকার অর্থটা কি বুঝতে পার? ইতিহাসের একটা যুগ হিসাবে এর ওপর হাজার হাজার বই লেখা হবে। এই একশো বছরের মধ্যেই...কিন্তু আমরা এই যুগেই বেঁচে থাকব এবং জয়লাভও করব। আমি বলছি দেনিস, জয় আমাদের হবেই, ঠিক তাই!'

মিশোর হাতটা চেপে ধরল দেনিস। 'মিশো!' বলল সে।

দেনিসের মনে হল, এই তার পূর্ব পরিচিত মিশো। তার মানে সেও বেঁচে আছে। বেঁচে আছে পারী। এবং এ সব সত্ত্বেও বেঁচে থাকা সম্ভব। বেঁচে থাকা এবং জয়লাভ করা...

ক্লদ বলল, 'ওদের শক্তি কিন্তু বিরাট। প্রতি রাত্রে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হচ্ছে। এখন ওরা চলেছে দক্ষিণ থেকে সমুদ্রের দিকে। ইংলণ্ড জয় করতে চায় ওরা।'

মিশো হাসল, 'ওরা চায় কিন্তু দেখতে হবে ওরা পারবে কিনা। ওরা কি পারী জয় করেছিল? পারীকে সোজাসুজি ওদের গ্রাসে তুলে দেওয়া হয়েছে। যাই হোক চার্চিল পেতাঁ নয়। আমি বলছি না যে জার্মানদের বিরাট শক্তি নেই। আমি দেখেছি কী প্রচুর পরিমাণ ট্যাঙ্ক আছে ওদের। আর আছে ওদের সংযম শক্তি। ঠিক জার্মান রীতিতেই সব কিছু চলে। কিন্তু ওদেরও প্রতিদ্বন্দ্বী

আছে, থাকবেই। হয়ত ইংলণ্ডে কিংবা অন্য কোন জায়গায়। কোথায় আমি জানি না, কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই হবে ওদের। আমাদের শক্তি অনেক বেশী।

দেনিস চোখ তুলে তাকাল—'কি করে আমাদের শক্তি অনেক বেশী?'

'হিসেব করে দেখ। ইংলণ্ড—অর্থাৎ, নৌশক্তি, রাজকীয় বিমানবাহিনী, জনসাধারণ। আমেরিকা। তারপর আছে বিজিত দেশগুলি। এক এক করে ধর—নরওয়ে, হলাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, ফ্রান্স, পোলাণ্ড, চেকো-শ্লোভাকিয়া। দেখ, গুণে গুণে সাতটা হল। এই সব দেশের সেনাবাহিনী নেই বটে কিন্তু দেশের জনসাধারণও একটা বড় শক্তি। আর তুমি কি মনে কর জার্মানীতে আমাদের নিজেদের লোক নেই? আছে। দেখ না কি হয়। আর আসল শক্তি হচ্ছে রাশিয়া।'

'কিন্তু ওদের সঙ্গে তো অনাক্রমণ-চুক্তি আছে,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্লদ বলল।

'তাতে কি হয়েছে? দেখো, হিটলার নিশ্চয়ই ওদের আক্রমণ করবে। তুমি মনে কর, এতবড় শক্তির অস্তিত্ব হিটলার মেনে নেবে? এ কথা তো শিশুও বোঝে। রাশিয়ানরা ওদের খানিকটা শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। লালফৌজকে আমরা দেখতে পাব দেনিস। নিশ্চয়ই পাব।'

'বল, ঠিক তাই!' দেনিস হাসল।

'নিশ্চয়ই বলব—ঠিক তাই!'

কাগজ আনবার জন্য ক্লদ বেরিয়ে গেল। পথে যেতে যেতে মিশোর কথাগুলো সে ভেবে দেখল। মিশো যখন বলেছে না হয়ে যায় না। অর্ধ-মৃত পারী শহরের নোংরা পরিত্যক্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনের খুশিতে ক্লদ হাসতে লাগল। হাসল জার্মান সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে। আসলে সে কিন্তু ওদের দেখছিল না, দেখছিল অন্য কিছু—শাদা কুয়াশার মাঝখানে ছোট একটা লাল তারা। ক্রম-বর্ধমান অসুখের জন্যে এবং নানা দুঃখকষ্টে রোগা শুকিয়ে-যাওয়া শরীর, তবুও শিশুর মত খুশি হয়ে উঠল সে। তারপর পকেট থেকে এক টুকরো খড়ি বার করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সামনের ধূসর দেওয়ালের গায়ে লিখল, 'হিটলার শুরু করেছে, স্টালিন শেষ করবে।' লেখাটা শেষ করে চোখ টিপল নীল এ্যাসফল্টের ওপর বসে থাকা কালো পাখীটার দিকে তাকিয়ে।

দোকানে লোক নেই। মিশো এবং দেনিস পরস্পরের বাহুবেষ্টনে নিঃশব্দে

বসে আছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দেনিস বলল, 'প্যারীর যে কি অবস্থা তা তুমি জান না। কাল একজন জার্মানকে দেখলাম রিভলবার দিয়ে একজন শ্রমিকের মাথায় বাড়ি মারতে। লোকটি পড়ে গেল, কিন্তু জার্মানটা ফিরেও তাকাল না। লণ্ডন বেতার শুনেছে বলে ভেমিএকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে। ছ দিন সমানে ওর ওপর অত্যাচার চালিয়েছে ওরা। একজন জার্মান অফিসার এসে মারিকে বলল,—'তোমার বাবার জামাটায় রক্ত লেগে গেছে। একটা নতুন জামা দাও।' নতুন জামা এনে দেবার পর অফিসারটি জামাটা নিয়ে চলে গেল। তারপর এক সময়ে ফিরে এসে বলল—তুমি এখনো রয়েছ? কার জন্যে অপেক্ষা করছ তুমি? তোমার বাবা অনেক আগেই ইংরাজদের স্বর্গে চলে গেছেন। সিশো, ওরা কি মানুষ?'

'না। ওরা ফ্যাশিস্ট। আমিও ঠিক এমনি দৃশ্য দেখেছি। একটি শিশুকে ওরা খুন করেছিল। আচ্ছা ও কথা বরং থাক। কিন্তু আমি বলছি দেনিস, সুখের দিন আসছে, অত্যন্ত সুখের দিন। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? জয়লাভ যে আমাদের নিশ্চিত সেটা আগে তোমাকে বুঝতে হবে। রাত্রির পর যেমন দিন, শীতের পর যেমন বসন্ত—তেমনি সহজ সত্য এটা। এ না হয়ে পারে না। আমাদের পক্ষে বিরাট জনসাধারণ, জীবন দিতেও তারা প্রস্তুত। কিন্তু ওদের দলে কারা? ডাকাত কিংবা বদমাইশ। নিশ্চয়ই আমরা জিতব! তারপর আসবে সুখের দিন। সেই দিনের জন্যেই উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে সবাই! মোটা, সাধারণ সুখ, সামান্যতম সুখও যদি হয় তবুও—সহজভাবে বেঁচে থাকা, পায়ের শব্দ শুনেই ভয় না পাওয়া, সাইরেনের আর্তনাদ না শোনা, ছেলেমেয়েদের আদর করা আর ভালবাসা—যেমন ভালবাসা আছে তোমার এবং আমার মধ্যে ...সুখের দিন আসবে...'

গম্ভীর স্বরে বরদান করবার মত দেনিস বলল, 'তথাস্তু।'

৪৪

সকালটা বেশ গরম। দীর্ঘ সময় আঁদ্রে কাটাল স্টুডিওর ভেতর। বাইরে যেতে ভয় হচ্ছিল। গতকাল লরিও নাকি খুন হয়েছে। কে যেন চিৎকার করে বলেছিল 'ইহুদী!' আর তারপরেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ে লরিওর অন্ধ চোখের ওপর থেকে কালো ব্যাণ্ডেজটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে।

সারা রাত আঁদ্রে স্টুডিওর ভিতরে পায়চারি করেছে। আর বারবার প্রশ্ন করেছে নিজেকে—কি লাভ এই পাহাড়ের জন্যে যুদ্ধ করে? কি লাভ এই বন্ধুত্বে? আঁদ্রে পার পেয়েছে, কিন্তু লরিএকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। একচক্ষুর দৃষ্টি দিয়ে সে এই ভয়ংকর শহরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। ভয়ংকর এবং বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু তবুও আঁদ্রে কেন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল? কেন সে ঘুরে বেড়াতে লাগল এই ঘৃণ্য শহরের রাস্তায় রাস্তায়?

সমস্ত বিরূপ মনোভাব ছাপিয়ে তার প্রিয় শহরের সৌন্দর্য আবার তাকে মুগ্ধ করেছে। এত কলঙ্ক সত্ত্বেও পারী এখনো সুন্দর। আঁদ্রের হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ, কিন্তু চোখে সে যা দেখছে তাতে মুগ্ধ না হয়ে পারছে না। আইল স্যাঁ লুই-এর সারি সারি থমথমে বাড়ী, লেথ-এর মত চিররহস্যময়ী সীন নদীর জল, অস্পষ্ট বিবর্ণ আকাশ—অভিভূত হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আঁদ্রে। খানিকটা সান্ত্বনাও পেল যেন। মনে মনে সে ভাবল, এ ছাড়াও অন্য বহু জিনিস আমরা দেখেছি। আমরা আছি এবং আমরা থাকব। আমরাই হলাম লুটেশিয়া, জাহাজ ও পারীর প্রাণকেন্দ্র।

শাভেলে পর্যন্ত সে হেঁটে গেল। অদ্ভুত লাগছে তার—এত নিঃশব্দ রাস্তায় সে অভ্যস্ত নয়। মোটরগাড়ী অদৃশ্য। লোক হাসে না, চাপা গলায় কথা বলে। রু দ রিভলির খিলানের নীচে থপ্ থপ শব্দ হচ্ছে—জার্মান সৈন্যেরা ঢুকছে দোকানে, রেস্তোরাঁয়, এমনভাবে পা ঠুকছে যেন এটা কুচকাওয়াজের ময়দান। মেয়েদের চেহারা আগের চেয়েও ফ্যাকাশে। হয় তারা প্রসাধন করে না, কিংবা সত্যিই তাদের শরীর খারাপ। প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে আরও বেশী সাদাসিধে হতে, আরও কম নজরে পড়তে, আরও নগণ্য হতে। কীটের মত, আঁদ্রে ভাবল। যেন আত্মাহীন শরীর—পারীর কঙ্কাল। কিন্তু পারী এ নয়, এ অন্য এক বিদেশী শহর।

হঠাৎ শিঙার শব্দ শুনে সে চমকে উঠল। প্লাস দ লোপেরা-তে যে সে পৌঁছে গেছে তা এতক্ষণ টের পায়নি। সবুজ-ধূসর পোষাক পরা জার্মান বাদকদল রঙ্গমঞ্চের সিঁড়ির ওপর বসে শিঙা বাজাচ্ছে। জার্মান সামরিক বাদ্যে কোথায় যেন ভীষণ রকমের একটা দৈন্য আছে—অনেকটা খিলানের নীচে ভবঘুরেদের অবসর যাপনের মত; কুচকাওয়াজের তালে তালে বাঁধা জীবনের পদক্ষেপ। কাফের বারান্দায় বারান্দায় পানাহাররত জার্মান অফিসার, তাদের ঘিরে রয়েছে

বাহারে সাজপোষাক পরা মেয়ের দল। কিন্তু ঠিক আগের মতই প্যারীর আকাশ।

একটা দেওয়ালে ঠেস দিয়ে জাঁন্রে দাঁড়াল। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সে বুঝতে পারল না আসলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে। আবার কেমন একটা ভোঁতা আচ্ছন্নতায় তাকে পেয়ে বসল। কতগুলি টুকরো টুকরো অসংলগ্ন ছবি ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে—এক চোখে লেন্স লাগান একজন অফিসার, ফোয়ারার জলকন্যা মূর্তি ও তার হাতের শূন্য পাত্র, তুইয়েরিসের পথে লম্বা লম্বা ঘাস, আর একটা পাহাড়, সেই যে পাহাড়ে...

একটি মেয়ের চিৎকারে সে সজাগ হয়ে উঠল। মেয়েটি সান্ধ্য কাগজ বিক্রী করছিল। বিরক্ত হয়ে সে সরে যেতে বলল মেয়েটিকে। অপরাধীর মত চাপা গলায় ফিসফিস করে মেয়েটি বলল, 'আমি জানি। কি করব, বাড়ীতে আমার একটা ছোট্ট বোন আছে।'

মেয়েটিকে একটি মুদ্রা দিয়ে কাগজটা সে তুলে ধরল। তারিখটার ওপর চোখ পড়তেই কিন্তু সে না হেসে থাকতে পারল না। ১৪ই জুলাই। বোধ হয় এই জন্যেই জার্মানরা শিঙা ফুঁকছে। আজ যে ছুটির দিন তা কারো মনে নেই। কেউ দাঁড়িয়ে আছে দুধের লাইনে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে দরজার আড়ালে।

একদিন এই প্যারীই বাস্তিল কারাগারকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল...

আর একটা রাত্রির কথা তার মনে পড়ল—নাগরদোলা, চকচকে নীল হাতী, বাদাম গাছ আর চীনে লণ্ঠনের ঝাড়। জিনেৎ এখন কোথায়? সে কি এই অভিশপ্ত শহরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে? পরিচিত ঘরবাড়ী কি তার চোখে পড়ছে না? বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না হয়ে বারবার দেখা হচ্ছে সবুজ-ধূসর জার্মানদের সঙ্গে? না কি সে পালিয়েছে কোন নিরাপদ জায়গায়? কিন্তু এত দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়? নিরাপদ জায়গা কি আছে? 'প্রতারিত আমি তাই মৃত্যুপথগামী!' তখনকার দিনে এটা ছিল বিজ্ঞাপনের ভাষা। কেউ বুঝতে চায়নি যে একটি নিঃসঙ্গ মেয়ে রাত্রির আকাশের তলায় বসে বসে কেঁদেছে—আর রাস্তায় ধুলো ও রক্তে কলঙ্কিত, মৃত ফ্রান্সেরও কান্না উঠেছে সেই সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো বলতে বলতে সে স্টুডিওর সিঁড়ি দিয়ে উঠে জানলার সামনে দাঁড়িয়েছিল। সামনে রু শেয়স মিদি। মার্চ করে চলেছে জার্মান সৈন্যেরা।

যোসেফিন তাকে বলেছে, 'রেস্তোরাঁটা আবার খুলব ভাবছি। খেয়ে বাঁচতে হবে তো।' কথাটা বলে সংকুচিত হয়ে সে তাকিয়েছে আঁদ্রের দিকে—আঁদ্রে যে কথা বলেনি সেটা যেন তার পক্ষে অপমানজনক। হ্যাঁ, এবার থেকে ও জার্মানদের জন্যে খাবার তৈরী করবে। মুচিরা সেলাই করবে জার্মানদের জুতো। ফুলের দোকানের মেয়েটি মারা যাবে আর সে জায়গায় আর একজন এসে ফুলের তোড়া তুলে দেবে এক চোখে লেন্স লাগানো এক জার্মান অফিসারের হাতে। কিন্তু রাস্তাগুলো পারীর রাস্তাই থাকবে : এই চক্র থেকে কারো পরিত্রাণ নেই। দেওয়ালের ওই হুকটার গায়ে দড়ি লাগিয়ে ঝুলে পড়লেও কোন ক্ষতি নেই। ঐ ধূসর দেওয়ালের গায়ে কালো বিন্দুটা থেকে আঁদ্রে কিছুতেই চোখ সরিয়ে নিতে পারল না।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনে কেমন যেন বিব্রত বোধ করল সে : যেন কেউ তাকে কোন একটা অন্যায় করতে দেখে ফেলেছে। দরজার কাছাকাছি পৌঁছবার পর তার মনে চিন্তাটা এল—কে হতে পারে? যদি জার্মানরা হয়. কিন্তু তার চিন্তা অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

স্টুডিওর ভেতরে ঢুকল একজন জার্মান; সবুজ ধূসর পোষাকটা দেখে আঁদ্রে হাসল।

বলল, 'যাক, ভালই হয়েছে। কোন্ দিকে যেতে হবে। সঙ্গে আমি কিছু নেব না।'

জার্মানটি বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? মাদাম কোয়াদের বাড়ীতে আমি থাকতাম। আপনার আঁকা দৃশ্যপটগুলো আমার ভারী ভাল লাগত। 'তামাকখোর কুকুরে-এ আমাদের পরিচয় হয়েছিল।'

জার্মানটি করমর্দন করতে চাইল, কিন্তু আঁদ্রে হাত বাড়াল না।

'এবার মনে পড়েছে,' আঁদ্রে বলল, 'মাছ সম্পর্কে আপনার আগ্রহ আছে। আপনি হচ্ছেন...কি যেন কথাটা ভুলে গেছি।'

'মৎস্যবিজ্ঞানবিদ।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আপনি বলেছিলেন পারী ধ্বংস হবে।'

'এখানে থাকবার সময় আপনার আগ্রহটা মাছের চেয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতেই বেশী ছিল হয়ত। বার্লিনের গুপ্ত খবর আপনার অজানা ছিল না। বেশ খুশি হয়েছেন তো? একথা সত্যি যে আপনারা পারী ধ্বংস করেননি।' জার্মানটির আরও কাছে সে সরে এল, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন যে পারী আপনারা

.ধকার করতে পেয়েছেন? ভুল, মঁশিয়, ভুল, এটা আপনাদের বিকৃত কল্পনা। রী আপনাদের মুঠোয় নেই। আপনি হয়ত বলবেন যে ভবিষ্যতে আসবে। তাও আমি স্বীকার করি না। যোসেফিন তার দোকান খুলেছে, একে একে ফিরে আসছে সবাই—কিন্তু পারী নেই। পারীকে আপনারা ফিরে পাবেন না। পারীর অস্তিত্ব মুছে গেছে। একেবারে মুছে গেছে। যাক্ এসব কথা! চলুন .কাথায় নিয়ে যাবেন।'

'কোথায় নিয়ে যাব?'

'জানি না। আপনিই ভাল জানেন। অধিনায়কের আপিসে, কিংবা বন্ধ ঘরে, কিংবা পাতালে—যে চুলোয় খুশি।'

জার্মানটি একটিও কথা বলল না। আঁদ্রে সমানে গালাগালি দিয়ে চলল। অবশেষে জার্মানটি বলল, 'এত মেজাজ খারাপ করছেন কেন?'

'মেজাজ খারাপের প্রশ্নই ওঠে না। প্রথমত—আপনাদের ট্যাঙ্ক আছে। দ্বিতীয়ত—বোমারু বিমান, তৃতীয়ত—মেশিনগান, চতুর্থত—টমিগান। আর পঞ্চমত—আপনাদের ওই মোটা মোটা মাথা। আমার কথা যদি বলেন তো ওই একটা আছে। নিয়ে যাবেন তো চলুন, নইলে আপনার গলা টিপে ধরব।'

'আপনাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া বা না যাওয়া আমার কাজ নয়। আমি কেন যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি তা আমি নিজে জানি না। হয়ত আপনাকে মনে আছে বলেই ভেবেছিলাম যে দেখা করলে মন্দ হয় না। আজ লেফটেনেণ্ট আমাকে বলছিল যে আমি নাকি জার্মান হিসেবে পরিচয় দেবার অযোগ্য। কী কাণ্ড বলুন তো—কাল হয়ত ওরা আমাকে গুলি করে মারবে।'

'তাই নাকি?' আঁদ্রের গলায় বিস্ময়ও ছিল না, সহানুভূতিও ছিল না। ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে সে কাঁধঝাঁকুনি দিল। যেখানে মৃত্যুর জন্যে সে প্রতীক্ষা করছিল, তার পরিণতি হল কিনা এক নৃতত্ত্ববিজ্ঞানবিদের ব্যক্তিগত মনস্তোষে। আঁদ্রে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আপনার আপত্তি কিসে? যাবার? না চ্যানেল পার হতে গেলে আপনার মাছ আপনাকে খেয়ে ফেলবে?'

'কি করে বোঝাব জানি না। কিসে আমার আপত্তি জানেন? আমার আপত্তি পারীর জার্মানদের সম্পর্কে। এই ফৌজী সাজ পরে যে আপনার স্ট ডিওতে আমাকে আসতে হয়েছে, তাতেও আমার আপত্তি।'

'তাই নাকি! তাহলে আপনি তো দেখছি রীতিমত সৌন্দর্যরসিক! ছাই রঙা-ধূসর রং, আরো কত কি! কিন্তু মঁশিয়, আপনি কি এটুকুও বুঝতে পারেন না যে আমি এই ফ্রান্সেরই লোক?'

'নিশ্চয়ই বুঝি। আর বুঝি বলেই মন খুলে কথা বলতে পারছি না। আমি মনে করতাম, আমরা একই সংস্কৃতির মানুষ। কিন্তু এখন দেখছি আমাদের ভেতর আকাশ পাতাল তফাৎ। এই তফাৎ যে কি করে ঘুচবে আমি জানি না।'

'আমিও না।' আঁদ্রের গলার স্বর একটু কোমল হল, 'রক্ত দিয়ে এই ফাঁককে ভরাট করতে হবে। রক্ত ছাড়া এখানে এই তফাৎ দূর করা অসম্ভব।'

'যথেষ্ট রক্তপাত কি হয়নি?'

'প্রচুর হয়েছে। কিন্তু ঠিকভাবে হয়নি। আচ্ছা, এবার আপনি যান।'

'জানি আমাকে যেতেই হবে। এ সমস্তই খাপছাড়া। এখানে আমার আসাটাই বোকামি হয়েছে। এবং বোকার মতই একটা প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। কেন জানি না প্রশ্নটা আমি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। প্রশ্নটা ব্যাকরণের। আচ্ছা, এই রাস্তাটার নাম শেরস-মিদি—তার মানে, দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। কেন?'

'তার কারণ এক সময়ে এই রাস্তার লোকদের ওই নামেই ডাকা হত। কোন কিছু খরচ না করে কোথায় খাবার পাওয়া যায় তারই প্রতীক্ষায় থাকতে হত তাদের। ঠিক আপনাদের হিটলারের মত। কিন্তু নামটা বেশ ভাল। দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়। শুধু এই রাস্তাটাই কোনদিন দ্বিপ্রহরকে চায়নি। এখানকার লোকেরা জানলার খড়খড়ি বন্ধ করে নরম পালকের লেপ গায়ে দিয়ে আরামে ঘুমোত। রাত্রির প্রতীক্ষায় ছিল এই রাস্তা। আর এখন তো আপনারাই এসেছেন।'

জার্মানটি বলল, 'আপনি কি মনে করেন যে এজন্যে আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। এভাবে বাঁচা যায় না। প্রত্যেকে আমাদের ঘৃণা করে। কাল আমি রু মঁজ দিয়ে হাঁটছিলাম। একটি স্ত্রীলোক আসছিল কিন্তু আমাকে দেখেই ছুটে পালিয়ে গেল—যেন আমি স্বয়ং মৃত্যু। ব্যক্তিগতভাবে আমি আজ পর্যন্ত কোন লোককে খুন করিনি কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এ কথাও আমি বলতে পারতাম যে হিটলার দোষী। সেটা সব চেয়ে সহজ কাজ। কিন্তু কথাটা সত্যি নয়, আমারও দোষ আছে। প্রত্যেককেই সিদ্ধান্ত

নতে হবে। আমিও সেই চেষ্টাই করব। আচ্ছা আসি, আবার দেখা হবে।'

বিদায়। কাল হয়ত আপনি সত্যিই খুব ভাল লোক হয়ে উঠবেন। কিন্তু তখন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। আজকের দিনে সৌজন্যতাকে প্রমাণ করতে হবে রক্ত দিয়ে। এমনি সময়েই আমরা বাস করছি। সমস্তই দুর্বোধ্য। আপনি কেন এখানে এসেছেন? কোন অর্থ হয় না! আপনি যদি কমিউনিস্ট হতেন তো অন্য ব্যাপার। ওরাই হয়ত কিছু করতে পারে। আর একটু হলে এখানে ওদেরই জয়লাভ হত, কিন্তু এখন তসা ও আপনাদের লেফটেনেন্ট রয়েছে, কি করতে চান আপনি? এখানে আপনি একা। আমিও তাই। আর আমরা দুজনে মিলে দুই হই না, শূন্য হই। জীবন আমাদের বিরুদ্ধে, আপনি যদি ভাল লোক হন তো আপনার প্রতি আমার অভদ্র আচরণের জন্যে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনি ছিলেন লুবেকের জার্মান, একটু মাথা-পাগলা গোছের, কালভাদো পান করতেন। আর এখন আপনি ধূসর-সবুজ পোষাকী সৈন্য। অবশ্য এ সমস্তই পারীর নিজস্ব সমস্যা।'

জার্মানটি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আঁদ্রে তার কথা ভুলে গেল—যেন কেউ কখনো আসেনি। কয়েকবার সে পায়চারি করল স্টুডিওর ভেতরে। জানলায় নীল গোধূলির আভাস। আর জানলাটার ঠিক উল্টো দিকে একটা দৃশ্যপট। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে আঁদ্রে তাকিয়ে দেখল: নাগরদোলা, বাদাম গাছ, লণ্ঠন, আর দূরের ছায়া। সেদিনটাও ছিল ১৪ই জুলাই। সেদিন পর্যন্ত হেসেছিল জিনেৎ, নাচ চলেছিল পারীর রাস্তায় রাস্তায়, মিছিল বেরিয়েছিল ঝাণ্ডা উড়িয়ে। আর ছিল আশা। সে এক অন্য জীবন। চমৎকার আঁকা হয়েছে ছবিটা। এই তার শ্রেষ্ঠ ছবি। আর এই ছিল পারী। আর এই পারীই এখনো আছে। ওরা মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলবে, ছবি নষ্ট করবে—কিন্তু পারী থাকবে ঠিক আগের মতই।

হাসছিল আঁদ্রে। তারপর এগিয়ে গেল জানলার কাছে। রু শেরস্ মিদির জানলার খড়খড়িগুলো তেমনি শক্তভাবে বন্ধ করা, বাড়ীর সামনে জানলার খড়খড়িতে তেমনি কালো কালো দাগ। ওপাশে চিলেকোঠার জানলা থেকে নুয়ে পড়েছে একটা শুকিয়ে যাওয়া ফুল। ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্বাসী বেড়ালগুলো, কাঁদছে ফুলের দোকানের স্ত্রীলোকটি, চিৎকার করছে একটি

নবজাত শিশু। র শেরস্ মিদি—'দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষায়'...'এবং এই দ্বিপ্রহরের প্রতীক্ষাতেই থাকব আমি,' ভাবল সে, 'দ্বিপ্রহর আসবেই—আকাশে আলোর উৎসব—মধু, ফুল, আসমানী রং—দিনের পাখী...'

লাউড-স্পীকারের গর্জন আন্দ্রে যেন শুনতেই পেল না: 'বাড়ী ফিরে যাও! সময় হয়েছে। সময় হয়েছে!'

আগস্ট ১৯৪০—জুলাই ১৯৪১